নির্বাচিত ভূতের গল্প

নির্বাচিত ভূতের গল্প

রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়
স ম্পা দি ত

৮বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
শ্রীবিশ্বনাথ মৈত্র
৮ বি, কলেজ রো,
কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রকাশকাল—ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩

মুদ্রণে
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫/৭ কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০৭৩

সূচীপত্র

●

লুল্লু

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

চুরি

"লে লুল্লু," আমীর শেখের মুখ দিয়া যখন এই কথা দুইটি নির্গত হইল, তখন তিনি জানিতেন না, ইহাতে কি বিপত্তি ঘটিবে। কথা দুইটি আমীরের অদৃষ্টে বজ্রাঘাতরূপে পতিত হইল। আমীরের বাটী দিল্লী শহরে, আমীর জাতিতে মুসলমান। একদিন অন্ধকার রাত্রিতে আমীরের বিবি একেলা বাহিরে গিয়াছিলেন। পরিহাস করিয়া, স্ত্রীকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত আমীর ভিতর হইতে বলিলেন, "লে লুল্লু।" অর্থাৎ কিনা, "লুল্লু! তুই আমার স্ত্রীকে ধরিয়া লইয়া যা।" লুল্লু, কোনও দুরন্ত বাঘেরও নাম নয়, কিংবা ছুরিধারী কানকাটারও নাম নয়। "লুল্লু" একটি বাজে কথা, ইহার কোন মানে নাই, অভিধানে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না, পরিহাস করিয়া আমীর কেবল কথাটি যোড়-তাড় করিয়া বলিয়াছিলেন।

কিন্তু যখন বিপত্তি ঘটে, কোথা হইতে যেন উড়িয়া আসে। আশ্চর্যের কথা এই, লুল্লু একটি ভূতের নাম ছিল। আবার, দৈবের কথা শুন, লুল্লু সেই রাত্রিতে, সেই মুহূর্তে আমীরের বাটীর ছাদের আলিসার উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ কে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। সে চমকিয়া উঠিয়া শুনিল, কে তাহাকে কি লইতে বলিতেছে; চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে এক পরমাসুন্দরী নারী। তাহাকেই লইয়া যাইবার নিমিত্ত লুল্লুকে অনুরোধ করা হইতেছে। এরূপ সামগ্রী পাইলে দেবতারাও তদ্দণ্ডে নিকা করিয়া ফেলেন, তা ভূতের কথা ছাড়িয়া দিন। চকিতের ন্যায়, দুর্ভাগা রমণীকে লুল্লু আকাশপথে কোথায় যে উড়াইয়া লইয়া গেল, তার আর ঠিক নাই।

আমীর, ঘরের ভিতর থাকিয়া মনে করিতেছিলেন, স্ত্রী এই আসে। এই আসে, এই আসে করিয়া অনেকক্ষণ হইয়া গেল, তবুও তাঁহার স্ত্রী ফিরিয়া আসিলেন না। তখন তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল; তখন তিনি স্ত্রীকে ডাকিলেন, কিন্তু সাড়াশব্দ পাইলেন না। বাহিরে নিবিড় অন্ধকার, নিঃশব্দ। বাহিরে আসিয়া, এখানে-ওখানে চারিদিকে স্ত্রীকে খুঁজিলেন, কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তবুও মনে এই আশা হইল, স্ত্রী বুঝি তামাসা করিয়া কোথাও লুকাইয়া আছে। তাই, পুনরায়

প্রদীপ হাতে করিয়া আতি-পাতি করিয়া সমস্ত বাড়ি অনুসন্ধান করিলেন, বাড়ির ভিতর স্ত্রীর নাম-গন্ধও নাই। আবার আশ্চর্যের কথা এই যে, বাড়ির দ্বার বন্ধ। সন্ধ্যাকালে নিজে তিনি যেরূপ বন্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বন্ধই রহিয়াছে। তবে তাঁহার স্ত্রী কোথায় যাইলেন? পতিব্রতা সতীসাধ্বী আমীর-রমণী বাড়ির বাহিরে কখনই পদার্পণ করিবেন না। আর যদিও তাঁহার এরূপ কুমতি হয়, তাহা হইলে দ্বার খুলিয়া তো যাইতে হইবে! দ্বার তো আর ফুড়িয়া যাইতে পারেন না। দারুণ কাতর হইয়া আমীর এইসব চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমীরের চক্ষু হইতে বুক বহিয়া অবিরত জল পড়িতে লাগিল। প্রিয়তমা গৃহলক্ষ্মীকে গৃহে না দেখিয়া গৃহ শূন্য, জগৎ শূন্য, হৃদয় শূন্য—আমীর সবই শূন্য দেখিতে লাগিলেন। কেবল শূন্য নয়, গ্রীষ্মকালের আতপতাপিত বালুকাময় মরুভূমির ন্যায় ধূ-ধূ করিয়া হৃদয় তাঁহার জ্বলিতে লাগিল। "আমি আমার অমূল্য নারী-রত্নকে আপন হাতেই বিলাইয়া দিলাম; আমার কথামত তাহাকে জিনেই লইয়া গেল, কি ভূতেই লইয়া গেল, কি স্বয়ং শয়তান আসিয়াই লইয়া গেল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হায়! হায়! কি হইল!" এইরূপে আমীর নানাপ্রকার খেদ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে চক্ষু মুছিয়া, দ্বার খুলিয়া পাড়া-প্রতিবাসীকে ডাকিলেন। পাড়া-প্রতিবাসীরা সকলে দৌড়িয়া আসিল। সকলেই পুনরায় তন্ন তন্ন করিয়া আমীরের বাটী অন্বেষণ করিল। আমীরের বাটী দেখিবার পর, পাড়ার এ-ঘরে ও-ঘরে যথাবিধি অন্বেষণ হইল। গলি-ঘুঁজি সকল স্থানই দেখা হইল। খুঁজিতে আর কোথাও বাকি রহিল না, কিন্তু আমীরের স্ত্রীকে কেহই খুঁজিয়া পাইলেন না। প্রতিবাসীরা ক্রমে কানাকানি করিতে আরম্ভ করিল, নিশ্চয়ই আমীরের বিবি কোনও পুরুষের সঙ্গে বাহির হইয়া গিয়াছে। এরূপ সুন্দরী নবযৌবনা রমণী আফিমচীর ঘরে কতদিন থাকিতে পারে? আমীর একটু একটু পাকা-আফিম খাইতেন, তাঁহার এই দোষ। এক তো স্ত্রী গেল, তারপর যখন এই কলঙ্কের কথা আমীরের কানে উঠিল, আফিমচী হউন, তখন তাঁহার হৃদয়ে বড়ই ব্যথা লাগিল। তিনি ভাবিলেন, "দূর হউক, এ সংসারে আর থাকিব না, লোকের কাছে আর মুখ দেখাইব না, ফকিরী লইয়া দেশে দেশে বেড়াইব, যদি সে প্রিয়তমা লায়লারূপী সাধ্বীকে পুনরায় পাই, তবেই দেশে ফিরিয়া আসিব, না হইলে মজনুর মত এ ছার জীবন একান্তই বিসর্জন দিব।"

এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া, ফকিরের বেশে আমীর ঘর হইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে কিছুই লইলেন না; লইলেন কেবল একটি টিনের কৌটা, একটি বাঁশের নল, আর একটি লোহার টেকো। আমীর কিছু সৌখিন পুরুষ ছিলেন। টিনের কৌটার ঢাকনের উপর কাচ দেওয়া ছিল, আরসির মত তাহাতে মুখ দেখা যাইত। পান খাইয়া আমীর তাহাতে কখন কখন মুখ দেখিতেন, ঠোঁট লাল হইল কি না। বাঁশের নলটি তাঁহার বড়ই সাধের জিনিস ছিল। এক সাহেবের সঙ্গে খানসামা হইয়া একবার তিনি পাহাড়ে গিয়াছিলেন, সেইখানে এই শখের জিনিসটি ক্রয় করেন। ইহার গায়ে হিজি-বিজি কালো-কালো অনেক দাগ ছিল। আমীর মনে করিতেন, নলের সেগুলি অলঙ্কার, তাই সেই হিজি-বিজিগুলির বড়ই গৌরব করিতেন। বস্তুতঃ কিন্তু সেগুলি অলঙ্কার নহে, সেগুলি অক্ষর,—চীনভাষার অক্ষর। তাহাতে লেখা ছিল, "চীনদেশীয় মহাপ্রাচীরের সন্নিকট লিংটিং শহরের মোপিঙ নামক কারিগরের দ্বারা এই নলটি প্রস্তুত হইয়াছে। নল-নির্মাণ কাজে মোপিঙ অদ্বিতীয় কারিগর, জগৎ জুড়িয়া তাঁহার সুখ্যাতি। মূল্য চারি আনা। যাঁহার নলের আবশ্যক হইবে, তিনি তাঁহার নিকট হইতে যেন ক্রয় করেন, বাজে মেকরদিগের কাছে গিয়া যেন বৃথা অর্থ নষ্ট না করেন। মোপিঙের নল ক্রয় করিয়া যদি কাহারও মনোনীত না হয়, তাহা হইলে নল ফিরাইয়া দিলে, মোপিঙ তৎক্ষণাৎ মূল্য ফিরাইয়া দিবেন।" যাহা হউক, আমীর যে নলটি কিনিয়াছিলেন, মনের মত হইয়াছিল তাই রক্ষা। না হইলে, মূল্য ফেরত লইতে হইত। যুধিষ্ঠির যে পথ দিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন, সেই তুষারময় হিমগিরি অতিক্রম করিয়া, তিব্বতের পর্বতময় উপত্যকা পার হইয়া, তাতারের সহস্র ক্রোশ মরুভূমি চলিয়া চীনের উত্তরসীমায় লিংটিং শহরে আমীরকে যাইতে হইত, সেখানে যাইলে তবে মোপিঙের সহিত সাক্ষাৎ হইত, মোপিঙ সিকিটি ফিরাইয়া দিতেন। তাই বলি, ধর্মে রক্ষা করিয়াছে যে, নলটি আমীরের মনোনীত হইয়াছিল। এত মনোনীত হইয়াছিল যে, প্রতিদিন ইহাতে অতি যত্নে আমীর তৈল মাখাইতেন। তেল খাইয়া খাইয়া, পাকিয়া, ইহা ঈষৎ রক্তিমাবর্ণ হইয়াছিল। কৌটার ভিতর বড়ই সাধের ধন, আমীরের প্রস্তুত করা আফিম থাকিত, ইতর ভাষায় যাহাকে লোকে চণ্ডু

খঁলে। বাঁশের নলটি দিয়া চণ্ডুর ধূম পান করিতেন। টেকো দ্বারা কৌটা হইতে আফিম তুলিয়া নলের আগায় রাখিতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রোজা

এই সকল সরঞ্জাম লইয়া আমীর গৃহ হইতে বাহির হইলেন। দিল্লী পার হইলেন, কত নদ-নদী গ্রাম-প্রান্তর অতিক্রম করিলেন। দিনের বেলায় ভিক্ষা করিয়া খান, সন্ধ্যা হইলে, গাছতলায় হউক, কি মাঠে হউক, পড়িয়া থাকেন। খোদা খোদা করিয়া কোনমতে রাত্রি কাটান। এইরূপে কতদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। স্ত্রীকে পুনরায় পাইবার আশা আমীরের মন হইতে ক্রমেই অন্তর্হিত হইতে লাগিল। হয় ফকিরী করিয়া সমস্ত জীবন কাটাইতে হইবে, না হয় একটা বুড়োহাবড়া নিকা করিয়া পুনরায় ঘরকন্না করিতে হইবে, এই ভাবিয়া শোকে তিনি নিতান্তই আকুল হইয়া পড়িলেন। একদিন তিনি একটি গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে একজনদের বাটীর সম্মুখে অনেকগুলি লোক বসিয়া আছে দেখিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সে গ্রামটি পশ্চিমের চক্রবেড়বিশেষ। যেখানে লোক বসিয়াছিল, সেটি জানের বাড়ি। গৃহস্বামী একজন প্রসিদ্ধ গণৎকার। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সকলই প্রত্যক্ষ দেখিতে পান। সংসারে তাঁহার কাছে কিছুই গুপ্ত নাই। অদৃষ্টের লিখন তিনি জলের মত পড়িতে পারেন। সামুদ্রিকে হনূমানের চেয়ে ব্যুৎপত্তি। ললাটে কি হাতে, যে ভাষায় বিধাতা কেন আঁচড়-পিচড় পাড়িয়া থাকুন না, —ইংরেজীতে হউক, কি ফারসীতে হউক, দেবভাষায় হউক, কি দানব ভাষায় হউক—সকলই তিনি অবাধে পড়িতে পারেন। চুরি-জুয়াচুরি সকলই বলিয়া দিতে পারেন। অবোধ গবর্নমেন্ট যদিও তাঁহাকে একটিও পয়সা, কি একটিও টাইটেল দেন নাই সত্য, কিন্তু দূর-দূরান্তর হইতে তাঁহার নিকট লোক আসিয়া থাকে। পাঁচটি পয়সা আর পাঁচ ছটাক আটা দিয়া ভূত-ভবিষ্যৎ গণাইয়া লয়। আমীর বলিলেন, "আমিও জানের বাড়ি যাই, সে গণিয়া দিবে।" আমীর গিয়া জানের বাটীর সম্মুখে বসিলেন। অন্যান্য লোকের গণা-গাঁথা হইয়া যাইলে, অতি বিনীতভাবে গণৎকারের নিকট তিনি আপনার দুঃখের কথা আগাগোড়া বলিলেন। গণৎকার ক্ষণকালের নিমিত্ত গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অবশেষে চারিখানি খাপ্‌রা হাতে লইলেন। মন্ত্র পড়িয়া সেই চারিখানি খাপ্‌রায় ফুঁ দিতে লাগিলেন। যখন মন্ত্র পড়া আর ফুঁ দেওয়া হইয়া গেল, তখন একখানি উত্তরদিকে, একখানি দক্ষিণে, একখানি পূর্বদিকে, আর একখানি পশ্চিমে ছুড়িয়া ফেলিলেন। তারপর কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "ফকিরজী! আপনার স্ত্রীর সন্ধান পাইয়াছি। আপনার স্ত্রীকে ভূতে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু করিব কি! আমি ভূতের রোজা নই। ভূতের উপর আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে এতক্ষণ কোন্‌কালে আপনার স্ত্রীকে আনিয়া দিতাম। তবে আপনাকে সন্ধান বলিয়া দিলাম। আপনি এক্ষণে একটি ভাল রোজার অনুসন্ধান করুন। ভাল রোজা পাইলে নিশ্চয় আপনার স্ত্রীকে ভূতের হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন।" এইরূপে আশ্বাস পাইয়া আমীরের মন কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। তাঁহার স্ত্রী যে কোনও দুষ্ট লম্পটের কুহকে পড়িয়া ঘর হইতে বাহির হয় নাই, এ দুঃখের সময় তাহাও শান্তির কারণ হইল।

এখন রোজা চাই। কিন্তু ইংরেজের প্রভাবে আমাদের সকল ব্যবসাই একরূপ লোপ পাইয়াছে। অন্য ব্যবসার কথা দূরে থাকুক, ভূতদিগের ভূতে পাওয়া ব্যবসাটি পর্যন্ত লোপ হইয়া গিয়াছে। এই হতভাগা দেশের লোকগুলো এমনই ইংরেজীভাবাপন্ন হইয়াছে যে, কাহাকেও ভূতে পাইলে কি ডাইনে খাইলে, বলে কি না হিস্টিরিয়া হইয়াছে! এ কথায় রক্তমাংসের শরীরে রাগ হয়, ভূতদেহে তো রাগ হইবেই। তাই ঘৃণায় ভূতকুল একবাক্য হইয়া বলিল, "দূর হউক, আর কাহাকেও পাইব না।" ডাইনীকুল আজ তাই মৌনী ও ম্রিয়মাণ। শ্মশান-মশান তাই আজ নীরব! রাত্রি দুই প্রহরের সময়, জনশূন্য মাঠের মাঝখানে, আকাশপানে পা তুলিয়া জিহ্বা লকলক করিয়া, চারিদিকে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া সেকালে ডাইনীরা যে চাতর করিত, আজ আর সে চাতর নাই। মরি! মরি! ভারতের সকল গৌরবই একে একে লোপ হইল! এ অবস্থায় আর রোজার ব্যবসা কি করিয়া চলিবে? তাহাও

একপ্রকার লোপ হইয়াছে। নানা স্থানে কত শত গঙ্গা ময়রার ঘরে আজ অন্ন নাই। পায়ের উপর পা দিয়া, সোনাদানা পরিয়া, যাহারা সুখে-স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইত, আজ তাহারা পথের ভিখারী। আমীর দেখিলেন, ভাল রোজা পাওয়া বড় সহজ কথা নয়। আমীর কিন্তু হতাশ হইবার ছেলে ছিলেন না। মনে করিলেন যে, "যদি আমাকে পৃথিবী উলট-পালট করিয়া ফেলিতে হয়, তাহাও আমি করিব, যেখানে পাই সেইখান থেকে ভাল রোজা নিশ্চয় বাহির করিব।" এই বলিয়া তিনি পুনরায় দেশপর্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। যেখানে যান, সেইখানেই সকলকে জিজ্ঞাসা করেন, "হাঁগা! তোমাদের এখানে ভাল ভূতের রোজা আছে?" ছোটখাটো অনেক রোজার সঙ্গে দেখাও হইল। অনেক মুসলমান আসিল, যাঁহারা তাবিজ লিখিয়া ভূত-প্রেত-দানা-দৈত্যকে দূর করেন, তাঁহাদেরও সহিত সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু মনের মত কাহাকেও পাইলেন না; বুক ফুরিয়া কেহই বলিতে পারিল না যে, "ভূত মারিয়া আমি তোমার স্ত্রীকে আনিয়া দিব।" অবশেষে অনেক পথ, অনেক দূর যাইয়া আমীর একটি গ্রামে গিয়া পৌঁছিলেন। সেই গ্রামে প্রথমেই একটি বৃদ্ধার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। আমীর যথারীতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁগা! তোমাদের এখানে ভাল রোজা আছে?" বৃদ্ধা উত্তর করিল, "হাঁ বাছা, আছে। আমাদের গ্রামের মহাজনের কন্যাকে সম্প্রতি একটি দুর্দান্ত ভূতে পাইয়াছিল। মহাজনের টাকার আর অবধি নাই। সে যে কত ডাক্তার, কত বৈদ্য, কত হেকিম, কত রোজা আনিয়াছিল, তাহার আর কি বলিব, দু' পা দিয়া জড় করিয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই, কেহই সে ভূত ছাড়াইতে পারে নাই। অবশেষে এই গ্রামের একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ একটি মন্ত্র পড়িয়াই তাহাকে আরোগ্য করেন। ব্রাহ্মণ পূর্বে খাইতে পাইত না, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর উদরে অন্ন ছিল না, অঙ্গে বস্ত্র ছিল না, এখন অন্ন-বস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, দ্বারে হাতী ঘোড়া, উট বাঁধা।"

তৃতীয় অধ্যায়

তাঁতি

বলা বাহুল্য, আমীর এই কথা শুনিয়া অবিলম্বে ব্রাহ্মণের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ঝুঁকে সেলাম করিয়া, তাঁহাকে আদ্যোপান্ত আপনার দুঃখের কাহিনী বলিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "দেখ, ভূতে পাইলে আমি ছাড়াইতে পারি। ভূতে যদি কাহাকেও একেবারে উড়াইয়া লইয়া যায়, তাহার আমি কি করিতে পারি? পাহাড়ে লইয়া গিয়াছে, কি সমুদ্রের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা আমি কি করিয়া জানিব? ফকির সাহেব! তোমার স্ত্রীকে আনিয়া দেওয়া আমার সাধ্যাতীত।" এই কথা শুনিয়া আমীর মাথা হেঁট করিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন, চক্ষু দিয়া টপ্, টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। দুর্বাসা মুনির জাতি! যেমন কঠিন, তেমনি কোমল! সেই জলেই ব্রাহ্মণের মন ভিজিয়া একেবারে গলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "শুন ফকিরজী! তোমাকে মনের কথা বলি—প্রকাশ করিও না। তাহা হইলে রোজা বলিয়া আমার যা কিছু মান-সম্ভ্রম-প্রতিপত্তি হইয়াছে, সকলই যাইবে। তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি প্রকৃত রোজা নই, ভূত ছাড়াইবার একটি মন্ত্রও জানি না। এমন কি, গায়ত্রী পর্যন্ত জানি না, আর লেখাপড়া বিষয়ে, ক-খ পর্যন্ত শিখি নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি একজন পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। চৌকায় বসিয়া খাই। আজকালের ইংরেজী-পড়া বাবুভায়াদিগের মত নই।" আমীর বলিলেন, "সে কি মহাশয়! তবে আপনি মহাজনকন্যার ভূত ছাড়াইলেন কি করিয়া?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "সে কথা তোমাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিতেছি। প্রকাশ করিও না, তাহা হইলে আমার বড়ই মন্দ হইবে।" আমীর বলিলেন, "আল্লার কসম, আমার মুখ দিয়া একথা বাহির হইবে না।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এই গ্রামে একটি তাঁতি বাস করে। তাঁতি তাঁত বুনিয়া খায়, কোন ল্যাঠাই ছিল না। একদিন কি মতি হইল, সে তাঁত বুনিতে বুনিতে একটু গুন গুন স্বরে গান করিল। নিজের কানে সুরটি-স্বরটি বড়ই সুমধুর বলিয়া লাগিল। পুনর্বার আস্তে আস্তে গাইয়া দেখিল, বড়ই মিষ্ট বটে! তাঁতি মনে মনে ভাবিল, 'আমি একজন প্রকৃত গাইয়ে। এ গুণটি এতদিন প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বৃথা নষ্ট হইতেছিল। জগতের দশাই এই, তা না হইলে হীরামণিমুক্তা উপরে চক্‌মক্ না করিয়া, মাটি কি

জলের ভিতরে কেন বৃথা পড়িয়া থাকিবে ? যাহা হউক, এখন হইতে গান গাইয়া আমি জগৎ মুগ্ধ করিব, মধুর তানে অবিরত জগতের কর্ণকুহরে সুধা ঢালিয়া দিব। আপাতত প্রতিবাসীদিগকে আমার গুণের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই।' এই বলিয়া তাঁতি ক্রমে গলা ছাড়িয়া গান আরম্ভ করিল। একদিন যায়, দুই দিন যায়, গ্রামবাসীরা শশব্যস্ত। দুইচারি দিন পরে গ্রামের লোক অস্থির হইয়া পড়িল। প্রাণ লইয়া সকলের টানাটানি। সুতরাং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে গিয়া তাঁতির দ্বারে উপস্থিত। তাঁতিকে ডাকিয়া বলিল, 'বাপু হে! পুরুষানুক্রমে বহুদিন ধরিয়া আমরা এই গ্রামে বাস করিতেছি। তোমার গানের প্রভাবে আর আমরা এখানে তিষ্ঠিতে পারি না। বল তো ঘর-দ্বার ছাড়িয়া উঠিয়া যাই, আর না হয় চুপ কর, গানে ক্ষান্ত দাও। তাঁতি বলিল, 'না মহাশয়! সে কি কথা ? গ্রাম হইতে উঠিয়া যাইবেন কেন ? সুরবোধ নাই বলিয়া যদি আমার গান আপনাদিগের কানে ভাল না লাগে, তাহা হইলে আপনাদিগকে আর বিরক্ত করিতে চাহি না। আজ হইতে মাঠে বসিয়া আমি গান করিব। যাহার বোধাবোধ আছে, তিনি মাঠে গিয়া আমার গান শুনিবেন, আর পারিতোষিকস্বরূপ একপণ করিয়া আমি তাঁহাকে কড়ি দিব।' এইরূপ আশ্বস্ত হইয়া গ্রামের লোকে যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল। তাঁতি গিয়া মাঠের মাঝখানে এক অশ্বত্থগাছের নিচে তাঁত খাটাইল। সেখানে বসিয়া মনের সুখে গান করিতে লাগিল। তবে খেদের বিষয় এই, শুনিতে কেহ যায় না, জনপ্রাণী সেদিক মাড়ায় না। কাক-পক্ষী সেদিকে ভুলিয়াও উড়িয়া যায় না।

ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, "ফকিরজী! আমি বড়ই দরিদ্র ছিলাম। এ গ্রামের ভিতর আমার মত দীনদুঃখী আর কেহ ছিল না। গৃহিণী ও আমি যে কত উপবাস করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। নিজের যাহা হইক, ব্রাহ্মণীর শীর্ণ দেহ, মলিন মুখ দেখিয়া সততই আমার প্রাণ কাঁদিত। কি করিব, কোনও উপায় ছিল না, মনের আগুন মনেই নিবাইতাম, চক্ষের জল চক্ষেই শুকাইতাম। ব্রাহ্মণী একদিন আমাকে বলিলেন, 'আজ ঘরে আটা নাই। তাঁতি বলিয়াছে, তাহার গান শুনিলে একপণ কড়ি দিবে। যাও না, একটুখানি কেন শুনিয়া এস না ? একপণ কড়ি পাইলে ঘরে অন্ন হইবে, দুইজনে খাইয়া বাঁচিব।' আমি বলিলাম, 'দেখ ব্রাহ্মণী! ও কথাটি আমাকে বলিও না। শূলে যাইতে বল, তা যাইতে পারি, কিন্তু তাঁতির গান আমাকে শুনিতে বলিও না, তিলেকের নিমিত্তও সে দগ্ধানি আমি সহ্য করিতে পারিব না।' এই কথা লইয়া ব্রাহ্মণীর সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ বচসা হইল। ব্রাহ্মণী আমাকে ঘর হইতে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন, 'যাও, একটুখানি তাঁতির গান শুনিয়া একপণ কড়ি লইয়া আইস।' পথে বাহির হইয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম, কি করিব! তাঁতির গান কি করিয়া শুনি ? অথচ কড়ি না লইয়া আসিলে ব্রাহ্মণী আর রক্ষা রাখিবেন না। তাঁতির গান শুনার চেয়ে মরা ভাল। এ ছার জীবনে আর কাজ নাই। গলায় দড়ি দিয়াই মরি। এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া একজনদের বাটী হইতে একগাছি দড়ি চাহিয়া লইলাম। এ মাঠে তাঁতি গান করিতেছে, অন্যদিকে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে একটি অশ্বত্থ গাছে দড়িটি খাটাইলাম, ফাঁসটি ঠিক করিয়া লইলাম। গলায় দিই আর কি, এমন সময় সেই গাছের ভিতর হইতে একটি ভূত বাহির হইল। ভূত আমাকে বলিল, 'ওরে বামুন, তুই করিতেছিস্ কি ?' আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা তাহার নিকট বর্ণন করিলাম। ভূত বলিল, 'আর ভাই! ও কথা বলিস্‌নে। যে গাছের তলায় এখন তাঁতি গান করিতেছে, যুগ-যুগান্তর হইতে ওই গাছে আমি বাস করিতেছিলাম। গাছটি আমার বড়ই প্রিয় ছিল। কিন্তু হইলে হইবে কি, যেদিন হইতে তাঁতি উহার তলায় গান আরম্ভ করিল, সেই দিন হইতেই আমাকে ও-গাছ ও-মাঠ ছাড়িয়া পলাইতে হইল। দেখিতেছি, দুই জনেই আমরা বিপদে বিপন্ন। তা তোর আর ভাবনা নাই, তুই বাড়ি ফিরিয়া যা। তোদের গ্রামের মহাজনের কন্যাকে আমি গিয়া পাইব। কিছুতেই ছাড়িব না, কেবল তুই গিয়া যখন আমার কানে কানে বলিবি যে, আমি সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়াছি, তখনই আমি ছাড়িয়া দিব। মহাজনের অনেক টাকা আছে, আর সেই একমাত্র কন্যা। অনেক ধন-দৌলত দিয়া তোকে বিদায় করিবে, তোর দুঃখ ঘুচিবে।' ব্রাহ্মণ বলিলেন, "শেখজী! শুনিলে তো। আমি রোজা নই, আমি তন্ত্রমন্ত্র কিছুই জানি না। দৈবক্রমে আমার একটি ভূতের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা হইতেই আমার এই যা-কিছু বল। মহাজনের কন্যার ভূত ছাড়িলে চারিদিকে আমার নাম বাহির হইল যে, আমার মত রোজা আর পৃথিবীতে নাই। ভূতে পাইলে সকলে আমাকে লইয়া যায়। আমাকে আর কিছু করিতে হয় না, কেবল আমি রোগীর কানে কানে গিয়া বলি, "শীঘ্র ছাড়িয়া যাইবে

তো যাও, না হইলে এখানে তাঁতির গান দিব। তাঁতির নামে সকল ভূতই জড়-সড়, পলাইতে পথ পায় না।"

চতুর্থ অধ্যায়

উদ্যোগ

আমীর বলিলেন, "মহাশয়! তাহাই যদি সত্য, তবে চলুন না কেন? আপনার সেই ভূতটিকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া, আমার স্ত্রীকে উদ্ধার করিয়া দেন? কারণ, ভূতে ভূতে অবশ্যই আলাপ-পরিচয় আছে, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে, শাদি-বিয়াতে অবশ্যই সাক্ষাৎ হইয়া থাকিবে। আমার স্ত্রীকে যে ভূতে লইয়া গিয়াছে, তাহাকে যদি দুটো কথা বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমার অনেক উপকার হইতে পারে। না হয়, স্ত্রীকে কি করিয়া পাই, তাহার একটা না একটা উপায়ও তিনি বলিয়া দিতে পারেন।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এ পরামর্শ মন্দ নয়, তোমার দুঃখ দেখিয়া আমি বড়ই কাতর হইয়াছি, আচ্ছা চল যাই, দেখি কি হয়।" ব্রাহ্মণ দুর্গা বলিয়া আমীর বিস্মিল্লা বলিয়া, যাত্রা করিলেন। ক্রমে তাঁহারা যে মাঠে ভূত থাকে, সেই মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে গাছে ভূত থাকে, সেই গাছতলায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দাঁড়াইয়া গাছের দিকে চাহিয়া ঊর্ধ্বমুখে দুই জনে স্তুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হে ভূত! আশ্রিত সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ আজ পুনরায় তোমার নিকট আসিয়াছে। তোমার কৃপায় তাহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। তোমার কৃপায় তাহার দরিদ্রতা মোচন হইয়াছে। পৃথিবীতে যত ভূত আছে, সকল ভূতের তুমি শ্রেষ্ঠ। ভূতের তুমি রাজা। কৃপা করিয়া দেখা দাও, আর একবার আবির্ভাব হও।" মুসলমান বলিল, "ভূতসাহেব! হুজুরের নাম শুনিয়া কদম-বোসী করিতে এখানে আসিয়াছি। আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করুন। হুজুরের এই গাছতলায় কাঁচা-পাকা সিন্নি চড়াইব।" এই প্রকারে নানারূপ স্তব করিতে করিতে গাছটি দুলিতে লাগিল, ডালপালা সমুদয় মড়মড় করিতে লাগিল। তারপর গাছের ডগায়, একস্থানে সহসা অন্ধকারের আবির্ভাব হইল। দিন দুইপ্রহরে, চারিদিকে সূর্যের কিরণ, আর সকল স্থানেই আলো, কেবল সেই স্থানটুকুতেই অন্ধকার। ক্রমে সেই অন্ধকাররাশি জমিয়া গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। অবশেষে তাহা এক ভীষণ প্রকাণ্ড নরমূর্তিতে পরিণত হইল। নরমূর্তি ধরিয়া ভূত গাছ হইতে নামিয়া আসিল, বৃক্ষের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

এখানে এখন একটি নতুন কথা উঠিল। বিজ্ঞানবেত্তারা—বিশেষত ভূততত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা—এ বিষয়টি অনুধাবন করিয়া দেখিবেন। এখানে স্থির হইল এই, যেমন জল জমিয়া বরফ হয়, অন্ধকার জমিয়া তেমনি ভূত হয়। জল জমাইয়া বরফ করিবার কল আছে, অন্ধকার জমাইয়া ভূত করিবার কল কি সাহেবেরা করিতে পারেন না? অন্ধকারের অভাব নাই। নিশাকালে বাহিরে তো অল্প-স্বল্প অন্ধকার থাকেই। তারপর মানুষের মনের ভিতর যে কত অন্ধকার আছে, তাহার সীমা নাই, অন্ত নাই। কোদাল দিয়া কাটিয়া কাটিয়া ঝুড়ি পূরিয়া এই অন্ধকার কলে ফেলিলেই প্রচুর পরিমাণে ভূত প্রস্তুত হইতে পারিবে। তাহা হইলে ভূত খুব সস্তা হয়। এক পয়সা, দুই পয়সা, বড় জোর চারি পয়সা করিয়া ভূতের সের হয়। সস্তা হইলে গরীব-দুঃখী সকলেই যার যেমন ক্ষমতা ভূত কিনিতে পারে।

গাছের পাশে দাঁড়াইয়া, কিছু রাগতভাবে ভূত বলিল, "বামুন! আজ আবার কেন আসিয়াছিস? তোর মত বিট্‌লে বামুন আমার অবধ্য নয়। ইচ্ছা হইলে এখুনি তোর ঘাড় মুচড়াইয়া দিতে পারি। আমার অবধ্য, সেই ইংরেজী-পড়া বাবুলোক। তাঁহাদের ভয়ও করি, ভক্তিও করি! ভয় করি, পাছে মহাপ্রভুরা গায়ে টলিয়া পড়েন, কি বমন করিয়া দেন। ভক্তি করি, কেননা, এটা-সেটা খাইয়া তাঁহাদের মর্ত্যলোকেই তাঁহারা সদাশিবত্ব প্রাপ্ত হন, অন্য লোকের মত তাঁহাদের মন জিলেপির পাকবিশিষ্ট নয়।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "প্রভু! আমি নিজের জন্য আপনার নিকট ভিক্ষা করিতে আসি নাই। আপনার প্রসাদে আমার আর কিছুরই অভাব নাই। এই লোকটি নিদারুণ সন্তাপিত হইয়াছে, ইহার নিমিত্তই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি।"

এই কথায় ভূতের রাগ কিছু পড়িয়া আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "সঙ্গে তোমার ও লোকটি

কে ?" ব্রাহ্মণ তখন আমীরের সকল কথাই ভূতকে শুনাইলেন। শুনাইয়া বলিলেন, "মহাশয় ! আপনাকে ইহার একটা উপায় করিতে হইবে, না করিলে এ লোকটি প্রাণে মরিবে। আপনি দয়ার্দ্রচিত্ত, আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, ইহারও প্রাণরক্ষা করুন।" ভূত বলিল, "ইহার স্ত্রীকে নিশ্চয়ই লুল্লু লইয়া গিয়াছে। লল্লু সবে নূতন ভূতগিরি পাইয়াছে, ভূতগিরিতে তাহার নব অনুরাগ, সে বড়ই দুরন্ত।" ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "নূতন ভূতগিরি পাইয়াছে ? মহাশয় ! সে কি প্রকার কথা ?" ভূত হাসিয়া বলিল, "একথা তোমরা কিছুই জান না। লোকে বলে, অমুক মানুষ মরিয়া ভূত হইয়াছে। ঠিক সেটি সত্য নয়। মানুষ নিজে মরিয়া নিজের ভূত হয় না। মানুষ মরিলে আমরা কেহ গিয়া তাহার ভূতগিরি করি। লক্ষ লক্ষ ভূত পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতেছে। কেহ বা ভূতগিরি করিবার কর্ম পাইয়াছে, কেহ বা ভূতগিরি করিবার উমেদারি করিতেছে, আবার কেহ বা বেকার বসিয়া আছে। আমাদের যিনি কর্তা, তিনিই ভূতদিগকে এই কার্যে নিযুক্ত করেন। ভূতকে তিনি বলেন, 'যাও অমুক মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থাক, সে মরিলে তাহার ভূত হইও, তাহার ভূতগিরি তোমাকে দিলাম।' সেই দিন হইতে ভূতটি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। মানুষের মাথাটি ধরিলে তাহার আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না ; কেন না, মরিলেই তাহার ভূতগিরি করিতে পাইবে। এরূপ যে ঘটনা হয়, সে কেবল তোমাদের নিজ দোষে। দেশীয় সংবাদপত্রসকল তোমাদিগকে কত সুশিক্ষা দিয়া থাকে, যদি কায়মনচিত্তে পালন করিতে, তাহা হইলে তোমাদের এ দুর্দশা হইত না। এই দেখ, দেশ একেবারে নির্ধন হইয়া যাইতেছে, বিলাতী কাপড়ের দ্বারা বিদেশীয়েরা ধন লুটিতেছে ! ভাল, কাপড় না পরিলেই তো হয় ? যদি কাপড় না পর, তাহা হইলে তো আর তোমাদিগের ধন কেহ লুটিতে পারে না। রেল করিয়া বিদেশীয়েরা ধন লইয়া যাইতেছে। ভাল, রেলে না চড়িলেই তো হয়, পায়ে হাঁটিয়া কেন কাশী-বৃন্দাবন যাও না ? তা যদি কর, তাহা হইলে বিদেশীয়েরা তোমাদিগের দেশে রেল করিতে কখনই আসিবে না, দেশের ধন দেশেই রহিয়া যাইবে। সেইরূপ আমরা তোমাদিগের ভূতগিরি করি। আমরা তোমাদিগের ভূতগিরি করিবার উমেদারিতে থাকি। ভাল, তোমরা যদি মরা ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে তো কেহ তোমাদের ভূতগিরি করিতে আসে না ? তাই বলি, না মরিলেই তো সকল কথা ফুরাইয়া যায়। নিজে তোমরা মরিবে, আর যত দোষ আমাদের ? অপরাধের মধ্যে এই যে, মরিলে আমরা তোমাদিগের ভূতগিরি করি।

"যাহা হউক, লুল্লু বহুদিন হইল, ভূতগিরি করিবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল। তাহার কপালে ভাল ভূতগিরি কোথাও জুটে নাই। অবশেষে কর্তা তাহাকে দুখিরাম চণ্ডালের ভূতগিরির উমেদারিতে নিযুক্ত করেন। দুখিরাম যদিও বৃদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি তাহার শক্তি-সামর্থ্য বিলক্ষণ ছিল। কিছুতেই মরিতে চায় না। বৃদ্ধের কুব্যবহারে লুল্লু বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল। আজ অল্পদিন হইল, দুখিরামের মৃত্যু হইয়াছে, লুল্লু তাহার ভূতগিরি পাইয়াছে। লুল্লু একটি সভ্য ভব্য নব্য ভূত। সে যে এতদিন পরে এখন মনের সাধে ভূতগিরি করিতেছে, তোমাদের মুখে একথা শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "সে কি কথা মহাশয় ? দুরাচার লুল্লুর কার্যে আপনি সন্তুষ্ট ! আমরা যে, আপনার নিকট তাহার নামে অভিযোগ করিতে আসিয়াছি। ইহার স্ত্রীকে আপনি উদ্ধার করিয়া দিবেন, সেই প্রার্থনায় যে, আপনার কাছে আসিয়াছি !" এইরূপ অনেক বাদানুবাদের পর ভূত বলিল, "দেখ, আমি এক্ষণে বৈরাগ্য-ধর্ম অবলম্বন করিয়াছি, সংসারের বাদবিসংবাদ, ভাল-মন্দ কিছুতেই থাকি না। আমি জানি না লুল্লু এখন কাহার স্ত্রীকে কোথায় রাখিয়াছে। অন্বেষণ করি, এরূপ অবকাশ আমার নাই। তোমরা এক কাজ কর ; এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে মাঠের মাঝখানে একটি পুরাতন কূপ আছে, সে কূপে এখন জল নাই। তাহার ভিতর ঘ্যাঁঘোঁ বলিয়া একটি ভূত বাস করে। ঘ্যাঁঘোঁ সকল সংবাদ রাখিয়া থাকে। ভূতদিগের মধ্যে একরূপ গেজেট। তোমরা তাহার নিকট যাও, সে সকল সন্ধান বলিয়া দিবে। তবে কথা এই, আজ কিছুদিন হইল, ঘ্যাঁঘোঁ মনোদুঃখে জ্বর-জ্বর হইয়াছে। মনের খেদে বিরলে সে কূপের ভিতর বসিয়া আছে। কথা কহে না, ডাকিলে উত্তর দেয় না, তাহার দেখা পাওয়া ভার ! চেষ্টা করিয়া দেখ।"

পঞ্চম অধ্যায়

ঘ্যাঁঘোঁ

ব্রাহ্মণ এবং আমীর, আর করেন কি ? দুই জনে ঘ্যাঁঘোঁর অনুসন্ধানে চলিলেন। যাইতে যাইতে সেই মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কূপের ধারে গিয়া ঘ্যাঁঘোঁকে ডাকিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ডাকিলেন, "ঘ্যাঁঘোঁ মহারাজ। ঘ্যাঁঘোঁবাবু ! ঘরে আছেন ?" মুসলমান ডাকিলেন, "ঘ্যাঁঘোঁসাহেব ! বাড়ি আছেন ?" ডাকিয়া ডাকিয়া দুই জনেরই গলা ভাঙিয়া গেল, তবুও ঘ্যাঁঘোঁ কূপ হইতে বাহির হইল না, উত্তর পর্যন্ত দিল না। দুই জনে তখন ভাবিলেন, এ তো বড়ই বিপদ ! এর আবার উপায় কি করা যায়। ব্রাহ্মণ অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিলেন, "চল, আমরা তাঁতির কাছে যাই।" বিরস-বদনে দুই জনে ফিরিলেন। পুনরায় গ্রামে আসিয়া দুই জনে তাঁতির নিকট যাইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁতিকে বলিলেন, "ভায়া ! তোমাকে একটি উপকার করিতে হইবে। ঘ্যাঁঘোঁ নামে একটি ভূত আছে। সে আমার পরম বন্ধু। তাহার কানের ভিতর অতিশয় পোকা হইয়াছে, সে পোকা কিছুতেই বাহির হইতেছে না। দারুণ ক্লেশে ঘ্যাঁঘোঁ এখন একটি কূপের ভিতর আশ্রয় লইয়াছে। আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, তাহারই ভিতর অবস্থিতি করিতেছে। ডাকিলে উত্তর দেয় না, বাহিরেও আসে না। মনুষ্যের কানে পোকা হইলে অনেক কালোয়াতের গানে বাহির হইতে পারে, কিন্তু ভূতের কানের পোকা তোমার গান ভিন্ন কিছুতেই বাহির হইবে না। অতএব যদি তুমি একবার সেই কূপের ধারে বসিয়া একটু গান কর, তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হইব।" এ পর্যন্ত ইচ্ছাসত্ত্বে কেহ তাঁতির গান শুনে নাই। আজ তাহাকে গান গাওয়াইবার জন্য লোকে উৎসুক। এ অহঙ্কার রাখিবার কি আর স্থান আছে ? আহ্লাদে আটখানা হইয়া তাঁতি বলিল, "আমি এইক্ষণেই যাইতেছি। কাপড় পরিয়া আসি।" তাঁতি কাপড় পরিয়া তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে বাহির হইল। তিন জনে পুনরায় সেই কূপাভিমুখে চলিলেন। কূপের ধারে পৌঁছিয়া, তাঁতি আসন করিয়া গান আরম্ভ করিলেন ; ব্রাহ্মণ ও আমীর কানে অঙ্গুলি দিয়া কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন। যখন তাঁতির গান কূপের ভিতর গিয়া প্রবেশ করিল, তখন ঘ্যাঁঘোঁ ভাবিল, "মনের খেদে জ্বর-জ্বর হইয়া বিরলে কূপের ভিতর বসিয়া আছি, এখানে আজ আবার এ কি ভীষণ ব্যাপার ! সেকালে কবির চিতেন শুনিয়াও প্রাণ ধরিতে পারিয়াছিলাম, তাহাতেও প্রাণ বাহির হয় নাই ; আজ যে দেখিতেছি, মহাপ্রাণী ধড়ফড় করিয়া বাহির হয়।" ঘ্যাঁঘোঁ তবুও কিন্তু সহজে কূপ হইতে বাহির হয় নাই। যখন দেখিল, তাঁতির গানে নিতান্তই প্রাণ বাহির হইয়া যায়, তখন করে কি ? কাজেই বাহির হইতে হইল। হামাগুড়ি দিয়া কূপ হইতে বাহির হইল। ঘ্যাঁঘোঁ বেঁটে-খেঁটে, হাড়-ওঠা বুড়ো-সুড়ো ভূত। মনের খেদে দেহ তার এতই জ্বর-জ্বর হইয়াছিল যে, তাহার চক্ষু, মুখ, নাসিকা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল।

কূপ হইতে বাহির হইয়া ভূত একদিকে উর্ধ্বশ্বাসে পলাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে ব্রাহ্মণ ও আমীর আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিলেন, "ঘ্যাঁঘোঁ, তুমি পলাইও না, তোমার ভয় নাই, ওই দেখ তাঁতি ভায়া চুপ করিয়াছে। আর পলাইবে বা কোথা ? যেখানে যাইবে, সেইখানে গিয়া তাঁতি ভায়া গান জুড়িয়া দিবেন। তার চেয়ে, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য সত্য উত্তর দাও, আমরা তাঁতি ভায়াকে লইয়া ঘরে ফিরিয়া যাই।" ঘ্যাঁঘোঁ ব্রাহ্মণের মুখপানে চাহিল, আমীরের মুখপানে চাহিল, তাঁতির মুখপানে চাহিল। দেখিল, গলা পরিষ্কার করিয়া তাঁতি আর একটি গান আরম্ভ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। তাহা দেখিয়াই ঘ্যাঁঘোঁর আত্মা-পুরুষ শুকাইয়া যাইল। সে বলিল, "আচ্ছা কি বলিবে বল, কি জিজ্ঞাসা করিবে ?" ব্রাহ্মণ বলিল, "লুল্লু নামক তোমাদের যে ভূত আছে, সে এই আমীরের স্ত্রীকে লইয়া গিয়াছে। কোথায় রাখিয়াছে, তুমি বলিতে পার ? আর কি করিয়াই বা তাহার উদ্ধার হয় ;" ঘ্যাঁঘো বলিল, "অনেকদিন ধরিয়া ঘোর দুঃখে জ্বর-জ্বর হইয়া আমি এই কূপের ভিতর বসিয়া আছি। সংসারের সংবাদ বড় কিছু রাখি নাই। তবে তাঁতির গান যদি আর না শুনাও, তাহা হইলে অনুসন্ধান করিয়া বলিতে পারি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "অনুসন্ধান করিতে যাই বলিয়া তুমি পলাইয়া যাইবে, শেষে আর তোমার দেখা পাইব না। আমরা তেমন বোকা নেই যে, তোমাকে ছাড়িয়া দিব।" ঘ্যাঁঘোঁ উত্তর করিল, "পলাইয়া আর কোথায় যাইব ? যেখানে যাইব, সেইখানে গিয়া তোমরা তাঁতির গান জুড়িয়া দিবে। তাছাড়া

আমীরের স্ত্রী কোথায়, অনুসন্ধান না করিয়াই বা আমি কি করিয়া বলি ?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "সত্য কর যে, শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে ?" ঘ্যাঁঘোঁ বলিল, "আমি সত্য বলিতেছি, শীঘ্র ফিরিয়া আসিব।" তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আচ্ছা, তবে যাও, শীঘ্র আসিও, আমরা এখানে বসিয়া রহিলাম।" ঘ্যাঁঘোঁ বলিলেন, "রও, আমি আমার বড় নাগরা জুতা জোড়াটি পায়ে দিয়া আসি। সে জুতাটি পায়ে দিলে আমি বাতাসের উপর উত্তম চলিতে পারি। মুহূর্তের মধ্যে সমুদয় ভারতভূমি ভ্রমণ করিতে পারি।" এই বলিয়া ঘ্যাঁঘোঁ পুনরায় কূপের ভিতর যাইল, নাগরা জুতা পায়ে দিয়া বাহিরে আসিল, বাতাসের উপর উঠিয়া হনহন করিয়া অতি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল ; শীঘ্রই অদৃশ্য হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ, আমীর ও তাঁতি সেইখানে বসিয়া রহিলেন। ঘ্যাঁঘোঁ ফিরিয়া আসে কি না, এই কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। সকলেই একদৃষ্টে আকাশপানে চাহিয়া রহিলেন। "কখন্ আসে—কখন্ আসে" এই কথা সকলেই মনে মনে করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমীর বলিয়া উঠিলেন, "ওই আসিতেছে, ওই যেন উত্তরদিকে কালো দাগটির মত কি দেখা যাইতেছে।" নিকটবর্তী হইলে সকলেই বলিয়া উঠিলেন, "ঘ্যাঁঘোঁ বটে, নাগরা জুতা পরিয়া ঘ্যাঁঘোঁ আসিতেছে। " ঘ্যাঁঘোঁ নিকটে আসিলে সকলেই তাহার মহা সমাদর করিলেন। সকলেই বলিলেন, "ঘ্যাঁঘোঁ ! তুমি সত্যবাদী বটে ! মনোদুঃখে জ্বর জ্বর হইয়াও তুমি আপনার সত্যরক্ষা করিয়াছ। এখন বল, সংবাদ মঙ্গল তো ?" ঘ্যাঁঘো বলিল, "সু-সমাচার বটে, আমীরের স্ত্রীর আমি সন্ধান পাইয়াছি।" সকলে বলিলেন, "তবে শীঘ্র বল, আমীরের স্ত্রী এক্ষণে কোথায় ? সে ভাল আছে তো ?"

ঘ্যাঁঘোঁ বলিল, "হিমালয়-প্রদেশে ভীমতাল নামক একটি হ্রদ আছে। হ্রদের ভিতর পাহাড়ের গায় লুল্লু একটি ঘর খুদিয়াছে। জলে ডুব দিয়া তবে সে ঘরের ভিতর যাইতে পারা যায়, অন্য পথ নাই। তাহার ভিতর লুল্লু আমীরের স্ত্রীকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। সেই 'সে' বিহনে অশোকবনে সীতা যেরূপ কাঁদিয়াছিলেন, সেই ঘরের ভিতর একাকিনী বসিয়া আমীরের রমণীও সেইরূপ কাঁদিতেছে। কেন যে কাঁদিতেছেন, তা বলিতে পারি না। লুল্লু আমাদের একটি সভ্য ভব্য নব্য ভূত। সে লইয়া গিয়াছে, তার আবার কান্না কি ? লুল্লু তাহাকে এক বৎসর কাল সময় দিয়াছে। এক বৎসরের মধ্যে যদি শান্ত হইয়া তাহাকে নিকা না করে, তাহা হইলে তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। কথা এই, মনুষ্যের সাধ্য নাই যে, হ্রদের ভিতর প্রবেশ করে, প্রবেশ করিয়া লুল্লুর ঘরের ভিতরে যায়। আমরা ভূত হইয়া ভূতের বিপক্ষতা করিতে পারি না ; তাহা হইলে ভূতসমাজে আর মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না। তবে এইমাত্র বলিয়া দিতে পারি যে, যদি তোমরা একটি হৃষ্টপুষ্ট ভূত ধরিয়া তাহার তেল বাহির করিতে পার, আর যদি সেই তেল মাখিয়া জলে প্রবেশ কর, তাহা হইলে লুল্লুর ঘরে পৌঁছিতে পারিবে। তারপর কৌশল করিয়া আমীরের স্ত্রীকে উদ্ধার করিও। তা বলিয়া যেন আমাকে ধরিয়া তেল বাহির করিও না। মনের খেদে জ্বর-জ্বর আছিই, তার উপর আবার তাঁতির গান শুনিয়া আমার শরীরে আর শরীর নাই, একবিন্দুও তেল বাহির হইবে না। তবে এক কাজ কর, এই মাঠের প্রান্তভাগে একটি গাছ আছে। সেই গাছে গোঁগোঁ নামে একটি গলায় দড়ি ভূত বাস করে। নিকটে গ্রামের লোককে গলায় দড়ি দিয়া মরিতে সে প্রবৃত্তি দিয়া থাকে। যে কেহ তাহার প্রলোভনে পতিত হয়, সে এই গাছে আসিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরে। শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যু হইবে বলিয়া, এই ভূত তখন তাহাদের পা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়ে। তোমরা যদি ভূতটিকে ধরিয়া তেল বাহির কর, তাহা হইলে আমি বড়ই সন্তোষলাভ করি। কারণ, সে দুরাচার আমার পরম শত্রু। আমার যেখানে বিবাহের সম্বন্ধ হয়, সে গিয়া ভাংচী দিয়া আসে। প্রেতিনী, শঙ্খচূর্ণী, চুড়েল প্রভৃতি নানাপ্রকার ভূতিনীদিগের সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। দুই-এক স্থানে কন্যাও দেখিতে গিয়াছিলাম, কন্যা দেখিয়া মনও মোহিত হইয়াছিল, কিন্তু এই দুরাচার গিয়া কন্যার পিতামাতার কাছে আমার নানারূপ কুৎসা করে। সে জন্য—দুঃখের কথা বলিব কি ! ভূতগিরি করিতে করিতে বুড়া হইয়া যাইলাম, আজ পর্যন্ত আমার বিবাহ হয় নাই। সংসারে আমি আধখানা হইয়া আছি, পূরা ঘ্যাঁঘোঁ হইতে পারিলাম না। আর কত লোক দশটা-কুড়িটা বিবাহ করিয়া ষোল আনার চেয়ে বেশি হইয়া পড়ে। সে যাহা হউক, মনুষ্যের দ্বারা ভূত ধরা কিছু সহজ কথা নয়। সেকালের মত এখন আর রোজা নাই যে, ভূত ধরিয়া পাল্কির বেহারা করিবে, কি গাড়িতে যুতিয়া দিবে। কৌশল করিয়া ধরিও।"

"বিবাহের কথা মনে করিয়া আমার প্রাণ এখন বড়ই হু-হু করিতেছে। একটি পরম রূপবতী

ভূতিনীর সঙ্গে আমার বিবাহের কথা হইয়াছিল। তাহার রূপের কথা আর বলিব কি ? তাহার নাকটি দেখিয়াই আমার মন একেবারে মুগ্ধ হইয়াছিল। ও হো নাকেশ্বরি ! তোমাকে না দেখিয়া প্রাণ যে আর ধরিতে পারি না ! একবার তোমার ছবিখানি দেখিয়া প্রাণ শান্ত করি। আমিও দেখি, তোমরাও দেখ, দেখিয়া চক্ষু জুড়াও।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভূতের তেল

নাকেশ্বরীর ছবি দেখিয়া ঘ্যাঁঘোঁর প্রাণ কিঞ্চিৎ শান্ত হইল ; সে একে একে সকলের করমর্দন করিয়া প্রস্থান করিল। তখন আমীর, ব্রাহ্মণ ও তাঁতিকে বলিলেন, "আপনাদিগকে আমি অনেক কষ্ট দিয়াছি। ঘর-সংসার ছাড়িয়া আপনারা আমার সঙ্গে ঘুরিতেছেন। আর আপনাদিগকে আমি ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করি না। আপনারা বাটী ফিরিয়া যান, আমার কপালে যাহা আছে, তাহা হইবে।" কিন্তু ব্রাহ্মণ ও তাঁতি কিছুতেই আমীরকে একলা ফেলিয়া যাইতে চাহিলেন না। আমীরের অনেক অনুনয়-বিনয়ে শেষে স্বীকৃত হইয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া, বিরস-বদনে দুই জনে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহারা চলিয়া গেলে ঘ্যাঁঘোঁর কূপের ধারে বসিয়া আমীর অনেকক্ষণ কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর মনকে প্রবোধ দিয়া ভাবিলেন, "কাঁদিলে কি হইবে ? এখন ভূত ধরিবার উপায় চিন্তা করি, তবে তো স্ত্রীর উদ্ধার হইবে।" অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আমীর মাথা হইতে পাগড়ীটি খুলিলেন। পাগড়ীটি উত্তমরূপে পাকাইলেন, আর তাহার একপাশে একটি ফাঁস করিলেন। এইরূপে সুসজ্জ হইয়া, যে আমগাছে গোঁগোঁ নামক গলায়-দড়ি ভূত থাকে, সেইদিকে চলিলেন। গাছের নিকট উপস্থিত হইয়া গাছের উপর উঠিতে লাগিলেন। অনেকদূর উঠিয়া গাছের ডালে পাগড়ীর অপর পার্শ্ব বাঁধিয়া ফাঁসটি গলায় দিতে উদ্যত হইলেন। ফাঁসটি গলায় দেন আর কি, এমন সময় চাহিয়া দেখেন যে, সেই গলায়-দড়ি ভূত সহাস্যবদনে তাঁহার সম্মুখে আর একটি ডালে বসিয়া রহিয়াছে।

ভূত বলিল, "নে নে, শীঘ্র শীঘ্র গলায় ফাঁস পরিয়া ঝুলিয়া পড়, নিচে হইতে আমিও সেই সময় তোর পা ধরিয়া টানিব এখন, তা হইলে সত্বর তোর মৃত্যু হইবে, তাহা হইলে আমার বেকার নাতিজামাই তোর ভূতগিরি করিতে পাইবে।" আমীর কোনও কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে জেব হইতে আফিমের কৌটাটি বাহির করিলেন। কৌটাটির ঢাকন ভূতের সম্মুখে ধরিলেন। ভূত তাহাতে উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওর ভিতর ও—কে ?" আমীর বলিলেন, "একটি ভূত।" গোঁগোঁ বলিল, "ভূত ! কৈ, ভাল করিয়া দেখি।" খুব ভাল করিয়া দেখিয়া গোঁগোঁর নিশ্চয় বিশ্বাস হইল যে, ভূত বটে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "উহার ভিতর তুই ভূত ধরিয়া রাখিয়াছিস কেন।" আমীর বলিলেন, "আমি একখানি খবরের কাগজ খুলিবার বাসনা করিয়াছি ; সম্পাদক ও সহকারী-সম্পাদকের প্রয়োজন। ডিবের ভিতর যে ভূতটি ধরিয়া রাখিয়াছি, তাহাকে সহকারী-সম্পাদক করিব। আর তোরে মনে করিয়াছি, সম্পাদক করিব।" গোঁগোঁ বলিল, "আমি যে লেখা-পড়া জানি না।" আমীর বলিলেন, "পাগল আর কি ! লেখা-পড়া জানার আবশ্যক কি ? গালি দিতে জানিস তো ?" গোঁগোঁ বলিল, "ভূতদিগের মধ্যে যে-সকল গালি প্রচলিত আছে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি।" আমীর বলিলেন, "তবে আর কি ! আবার চাই কি ? এতদিন লোকে মানুষ ধরিয়া সম্পাদক করিতেছিল, কিন্তু মানুষে যা কিছু গালি জানে, মায় অশ্লীল ভাষা পর্যন্ত, সব খরচ হইয়া গিয়াছে ; সব বাসি হইয়া গিয়াছে। এখন দেশশুদ্ধ লোককে ভূতের গালি দিব। আমার অনেক পয়সা হইবে।" ভূত বলিল, "তবে কি তুমি গলায় দিয়া মরিবে না ? ঐ যে পাগড়ী ? ঐ যে ফাঁস ?" আমীর বলিলেন, "আমি তো আর ক্ষেপে নি যে, গলায় দড়ি দিয়া মরিব। পাগড়ী আর ফাঁস হইতেছে টোপ, ওরে বেটা ! তোরে ধরিবার জন্য টোপ। যদি এ ফন্দি না করিতাম, তাহা হইলে তুই কি গাছের ভিতর হইতে বাহির হইতিস ? এখন চল, ইহার ভিতর প্রবেশ কর।" এই বলিয়া আমীর তাহাকে চণ্ডুর নলটি দেখাইলেন। ভূত জিজ্ঞাসা করিল, "ও আবার কি ?" আমীর বলিলেন, "ইহার নাম বাম্বু, নে, শীঘ্র ইহার ভিতর প্রবেশ কর।" ভূত ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া আমীর টেকোটি বাহির করিয়া বলিলেন, "দেখিতেছিস ?" ভূত জিজ্ঞাসা করিল, "ও আবার কি ?" আমীর বলিলেন,

"এর নাম আটখিল্লে। সাধুভাষায় ইহাকে থক্ বলে। নলের ভিতরে যদি না প্রবেশ করিস্, তাহা হইলে ইহা দিয়া তোর চক্ষু উপাড়িয়া লইব।" বাস্তবিক থক্‌টি তখন যেরূপ চক্‌চক্ করিতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল যেন সে আজন্মকাল ভূতের চক্ষু তুলিয়া আসিতেছে, যেন ভূতের চক্ষু না তুলিয়া থক্ কখনও জলগ্রহণ করে না। আর যেন আমীর যদি নাও উপড়ান্ তো থক্ নিজে গিয়া সেই মুহূর্তে ভূতের চক্ষু তুলিয়া ফেলিবে। টেকোর এই প্রকট মুর্তি দেখিয়া ভূত বড়ই ভয় পাইল, ভয়ে তাহার সর্বশরীর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মনে করিল, "কাজ নাই বাপু! পরের চাকর হইয়া, এডিটারি করিয়া না হয় খাইব তা বলিয়া অন্ধ হইয়া থাকিতে পারিব না।" এই ভাবিয়া সে আপনার কলেবর হ্রাস করিল, আর সুড়সুড় করিয়া নলের ভিতর প্রবেশ করিল। নলের ছিদ্রে ভাল করিয়া সোলা আঁটিয়া দিয়া, আমীর গাছ হইতে নামিয়া আসিলেন।

আমীরের মনে এখন কিঞ্চিৎ স্ফুর্তির উদয় হইল। শিস দিতে দিতে তিনি গ্রামাভিমুখে চলিলেন, গ্রামে উপস্থিত হইয়া লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের এ গ্রামে কলুর বাড়ি আছে?" লোকে বলিল, "হাঁ আছে।" কলুর বাড়িতে উপস্থিত হইয়া আমীর কলুকে বলিলেন, "কলু ভায়া! আমার একটি বিশেষ উপকার করিতে হইবে। এই বাঁশের নলটির ভিতর আমি একটি ভূত ধরিয়া আনিয়াছি, যদি অনুগ্রহ করিয়া সেই ভূতটিকে ঘানিতে মাড়িয়া তেল বাহির করিয়া দেন, তাহা হইলে আমার বড়ই উপকার হয়।" কলু বলিল, "তার আটক কি! এখনই দিব। তিল সরিষা, তিসি, পোস্ত, কত কি পিষিয়া তেল বাহির করিলাম, আজ একটু ভূতের তেল বাহির করিয়া দিব, সে আর কি বড় কথা! কৈ, লইয়া এস।" দুই জনে ঘানিগাছের কাছে গেলেন। আমীর নল হইতে ভূতটিকে আস্তে-আস্তে বাহির করিয়া ঘানিগাছের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলেন। কলু তৎক্ষণাৎ ঘানি চালাইয়া দিলেন। কলুর বলদ মৃদুমন্দ গতিতে ঘুরিতে লাগিল। ভূতের হাড় মড়মড় করিয়া ভাঙ্গিতে লাগিল। ভূত, "ত্রাহি মধুসূদন! ত্রাহি মধুসূদন!" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। আর বলিতে লাগিল, "এই বুঝি তোমার এডিটারির পদ? এই বুঝি খবরের কাগজের সম্পাদকতা করা?" আমীর হাসিয়া বলিলেন, "জান না ভায়া! সম্পাদক হইতে আমি এইরূপেই প্রবন্ধ বাহির করিয়া থাকি। কেমন! উত্তম উত্তম গালি, ভাল ভাল প্রবন্ধ, এখন মনে উদয় হইতেছে তো? গোঁগোঁ ভায়া! সেকালের হরিণের গল্পটাও কি ছাই শুন নাই? যাহাতে কথা আছে, 'ওহে ভাই শশধর! আগে এ দায়ে তো তর, তারপর কাজ কাম কর আর না কর।" ঘানি হইতে ক্রমে টপ্‌টপ্ করিয়া তেল পড়িতে লাগিল। প্রায় একশিশি তেল প্রস্তুত হইল। যখন ভূতের দেহ একবারে তেলশূন্য শুষ্ক হইয়া গেল, তখন বলদ থামিল, ঘানিগাছ আর ঘুরিল না। আমীর সেই ছোবড়ারূপ ভূতকে বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। বলা বাহুল্য যে, ভূত না হইয়া যদি মানুষ হইত, তাহা হইলে কোন্‌কালে মরিয়া যাইত।

সপ্তম অধ্যায়

উদ্দেশ

তেলের শিশিটি পকেটে লইয়া আমীর পুনর্বার চলিলেন। যাইতে যাইতে কত পথ চলিয়া অবশেষে হিমালয়ের তলভাগে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হিমালয়ের উপর উঠিয়া কত চড়াই-উতরাইয়ের পর ভীমতাল দেখিতে পাইলেন। ভীমতালের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘ্যাঁঘোঁ যেরূপ নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল, সেই স্থানটিতে গিয়া বসিলেন। জানিলেন, এই স্থানটিতে ডুব মারিতে হইবে, ইহার নিচেতেই লল্লুর ঘর। সেই স্থানে বসিয়া, শিশিটি বাহির করিয়া উত্তমরূপে সর্বশরীরে ভূতের তেল মর্দন করিলেন। তেল মাখিয়া তাঁহার শরীরে যে কেবল আসুরিক বল হইল তাহা নহে, দেহ এত লঘু হইল, যেন তিনি পাখির মত উড়িতে পারেন। তেল মাখা হইলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আর 'বিসমিল্লা' বলিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন। জলে ডুব মারিয়া ক্রমেই নিচে যাইতে লাগিলেন। পাতাল পর্যন্ত ততদূরে যাইতে হয় নাই, কিন্তু অনেক, অনেকদূরে গিয়া পাহাড়ের গায়ে একটি ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। সেই ছিদ্রের ভিতর প্রবেশ করিতেই একেবারে শুষ্ক ভূমিতে পদার্পণ করিলেন। সেখানে আলোর অভাব ছিল না। উত্তম দিনের আলো ছিল। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বাসস্থানের মত পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলি গর্ত দেখিতে পাইলেন, কিন্তু কি মনুষ্য, কি ভূত কাহাকেও দেখিতে

পাইলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, "এখনও দিন রহিয়াছে, এত প্রকাশ্যভাবে এখানে বিচরণ করা ভাল নয়। রাত্রি হইলে সকল সন্ধান লইব।" এই মনে করিয়া একটি ছোট গর্তে লুকাইয়া রহিলেন।

জলে ডুব দিয়া যে শুষ্ক ঘরের ভিতর প্রবেশ করা যায়, একথা শুনিয়া কেহ যেন অবাক হইবেন না। লোকে পাছে ভাবেন যে, আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা অলীক গল্পকথা, সেজন্য আমাকে ঐতিহাসিক প্রমাণ দিতে হইল। আকবরের সময় একজন মিস্ত্রি লাহোরে এরূপ একটি ঘর নির্মাণ করিয়াছিল যে, নিকটস্থ একটি জলাশয়ের জলে ডুব না দিয়া সে ঘরে যাইবার আর অন্য পথ ছিল না। আগ্রাতে জাহাঙ্গীর বাদশাহও এইরূপ একটি ঘর দেখিয়াছিলেন। ওয়াকিয়াত-ই-জাহাঙ্গীরি নামক পুস্তকে জাহাঙ্গীর লিখিয়াছেন, "আমার পিতার সময় লাহোর নগরে যেরূপ একটি জলগৃহ নির্মিত হইয়াছিল, সেইরূপ একটি জলগৃহ দেখিতে রবিবার দিন হাকিম আলির বাটীতে গিয়াছিলাম। আমার সহিত কতকগুলি পারিষদও ছিল, যাহারা এরূপ গৃহ কখনও দেখে নাই। জলাশয়টি দীর্ঘে-প্রস্থে প্রায় ছয় গজ, ইহার পাশে একটি কামরা, যাহাতে উত্তমরূপে আলো ছিল, এবং যাহার ভিতর যাইতে হইলে এই জলের ভিতর দিয়া ভিন্ন অন্য পথ ছিল না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই কামরায় একবিন্দুও জল প্রবেশ করিতে পারে না। কামরায় দশ-বার জন লোক বসিতে পারে। ইহাব ভিতর হাকিম আমাকে টাকা ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি উপঢৌকন দিলেন। কামরা দেখিয়া আমি বাটী ফিবিয়া আসিলাম। হাকিমকে পুরস্কারস্বরূপ দু'হাজারীর পদে নিযুক্ত করিলাম।" এক্ষণে ইতিহাস দ্বারা এ গল্পটি সত্য বলিয়া প্রমাণ হইল। পৃথিবীতে যে কত অদ্ভুত বিষয় আছে, তাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়।

আমীব পাহাড়ের গর্তে লুকাইয়া রহিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, যখন কতক রাত্রি গত হইয়া গেল, তখন সেই গিবিগহ্বরে সহসা তুমুল ঝড় উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জলের ভিতরও ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল। আমীব কান পাতিয়া শুনিলেন, কে যেন জল ফুঁড়িয়া উপরে যাইতেছে। ভাবিলেন, "রাত্রি হইয়াছে, এইবার ভূত বুঝি চরিতে যাইতেছে।" যখন পুনরায় সেস্থান নিঃশব্দ হইল, তখন আমীর আস্তে আস্তে গর্ত হইতে বাহির হইলেন। অতি সাবধানে, এ-ঘর সে-ঘর, অর্থাৎ কি না এ-গর্ত সে-গর্ত খুঁজিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে অতি দূরে একটি সামান্য আলো তাঁহার নয়ন-গোচর হইল। সেইদিক পানে গিয়া দেখিলেন, অপেক্ষাকৃত এক বৃহৎ ঘরের ভিতর একটি প্রদীপ মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। সেই প্রদীপের কাছে গালে হাত দিয়া, মস্তক অবনত করিয়া, এক মলিন-বসনা বিরস-বদনা ললনা বসিয়া রহিয়াছেন। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আমীর চিনিতে পারিলেন যে, এই রমণী তাঁহারই স্ত্রী। স্ত্রীকে দেখিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে যেন হাতুড়ির ঘা পড়িতে লাগিল। এমনি হৃদয়ের আবেগ উপস্থিত হইল যে, মনে করিলেন, এখনি দৌড়িয়া গিয়া ধরি, আর বলি, "প্রিয়তমে! জানি! আর ভয় নাই, আমি আসিয়াছি, আমি তোমার আমীর আসিয়াছি।" কিন্তু আপনাকে সংবরণ করিলেন, মনে করিলেন, "ভয় নাই কিসে? এখনও তো আমরা ভূতের হাতে! এখনও তো স্ত্রীকে উদ্ধার করিতে পারি নাই! স্ত্রীর দেখিতেছি, শীর্ণ দেহ, মলিন মুখ। বোধ হয়, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে। একেবারে দেখা দেওয়া হইবে না। আমি যে এখানে আসিয়াছি, ক্রমে জানিতে দিব।" এই ভাবিয়া কিছুক্ষণের নিমিত্ত আমীর একটু অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমীর-রমণী কাঁদিতেছিলেন। অবিরল ধারায় অশ্রুস্রোত তাঁহার নয়নযুগল হইতে বহিতেছিল। মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছিলেন, এক একবার চক্ষু মুছিতেছিলেন, কখনও কখনও অপরিস্ফুট ভাষায় খেদোক্তি করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন, "হায়! আমার দশা কি হইল! শয়তানের হাতে পড়িয়া আমার জাতিকুল সকলি মজিতে বসিল। ধর্ম বিনা স্ত্রীলোকের আর পৃথিবীতে আছে কী? ভূতই হউক আর শয়তানই হউক, এ ধর্ম আমি তাহাকে কখনই বিনাশ করিতে দিব না। সে দুর্বৃত্ত অঙ্গীকার করিয়াছে, এক বৎসর কাল আমাকে কিছু বলিবে না। এই এক বৎসরের মধ্যে দুর্বলের বল, নিঃসহায়ের সহায়, ঈশ্বর কি আমায় পাপিষ্ঠের হাত হইতে মুক্ত করিবেন না? আমীর! আমীর!! একবার আসিয়া দেখ, আমার কি দশা হইয়াছে।" আমীর আস্তে আস্তে বলিলেন, "ভয় নাই, ঈশ্বর তোমার প্রতি কৃপা করিয়াছেন, আমি আসিয়াছি।" আমীর-রমণী চমকিত হইয়া মুখ তুলিলেন। চক্ষুর্দ্বয় তখন তাঁহার জলে প্লাবিত ছিল, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ভাবিলেন, মনের ভ্রান্তিবশতই

তিনি এরূপ শব্দ শুনিলেন। তবুও মনে একটু আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু সহসা চক্ষু মুছিতে সাহস করিতেছিলেন না ; পাছে সত্য সত্যই ভ্রান্তি হইয়া পড়ে, পাছে সে আশাকণাটুকুও উড়িয়া যায়। আমীর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন, বলিলেন, "চাহিয়া দেখ ! সত্য সত্যই আমি আসিয়াছি। ভয় নাই, ঈশ্বরের কৃপায় নিশ্চয় এ ঘোর বিপদ হইতে আমরা মুক্ত হইব।" এই বলিয়া একেবারে স্ত্রীর নিকটে গিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন, স্ত্রীও তাঁহার গলা ধরিলেন। এইভাবে বসিয়া দুই জনে অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

তাহার পর আমীর চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "আর কাঁদিও না। এখন এখানকার সকল কথা আমাকে বল। প্রথম আমাকে বল, ভূত তোমাকে কি করিয়া ধরিয়া আনিল।" আমীর-রমণী বলিলেন, "তাহার আমি কিছুই জানি না। ঘরের ভিতর হইতে যেই বাহিরে আসিয়া পা দিলাম, তুমি কি ভিতর হইতে বলিলে, শুনিতে পাইলাম। তারপর যেন একটা ঝড় আসিয়া আমাকে একেবারে ভূমি হইতে উঠাইয়া লইল, একেবারে শূন্যে তুলিয়া ফেলিল, একেবারে উড়াইয়া লইয়া চলিল। আমি অজ্ঞান সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম, বলিতে পারি না। যখন প্রভাত হইল, চক্ষু মেলিয়া দেখি, দিন হইয়াছে, সম্মুখে এক বিকটমূর্তি বিষমদেহ নরাকার রাক্ষস। তাহাকে দেখিয়া পুনর্বার অজ্ঞান হইয়া যাইলাম। তারপর পুনরায় যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম, রাত্রি হইয়াছে, ঘরে আর কেহ নাই, একেলা পড়িয়া আছি। এই প্রদীপটি মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে, নানারূপ আহারীয় দ্রব্য ঘরে রহিয়াছে। আমি কিন্তু কিছুই খাইলাম না। মনে করিলাম, অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব। তাহার পরদিবস প্রাতঃকালে সেই বিকটমূর্তি আবার আমার কাছে আসিল। এবার আমি তাহাকে দেখিয়া অজ্ঞান হই নাই। বড়ই ভয় হইয়াছিল সত্য, অজ্ঞান হইবার উপক্রমও হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সাহস করিয়া বুক বাঁধিলাম। মনে করিলাম, শুনিতে হইবে সে কে, আর কেনই বা আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে। সেই বিকটমূর্তি আমার নিকট আসিয়া বলিল, 'সুন্দরি ! এক্ষণে আর তুমি আমীরের রমণী নও, এক্ষণে তুমি আমার গৃহিণী। তোমার স্বামী নিজে তোমায় আমাকে দান করিয়াছে। এখন আমার সমুদয় ঘরকন্না তোমার। অনুমতি হইলেই এইক্ষণেই আমাদের কাজিকে ডাকিয়া আনি, তিনি আমার সহিত তোমার নিকা দিয়া দিবেন।' সাহসের উপর ভর করিয়া আমি বলিলাম, 'তুমি কে ? স্বামী আমায় তোমাকে কি করিয়া দিলেন ?' সে বলিল, 'আমি ভূত। আমার নাম লুল্লু। আমি সামান্য ভূত নই, আমি একজন সভ্য ভব্য নব্য ভূত। আর এই ধনসম্পত্তি, এই গিরিগহ্বর আমার ; আমি দুখিরাম চণ্ডালের ভূতগিরি করিতেছি। ভূত-সমাজে আমি অতি প্রবল-পরাক্রান্ত বলিয়া পরিচিত, আমার মান-মর্যাদা রাখিতে আর স্থান নাই।' আমি বলিলাম, 'স্বামী আমায় তোমাকে দিয়াছেন, একথা একেবারেই মিথ্যা। তারপর মানবী হইয়া ভূতের রমণী কবে কে হইয়াছে ? দেখ, আমরা খোদাপরস্ত মুসলমান, ভূতপরস্তদিগের মত শয়তানের শাগ্‌রেদ নই। আমার প্রতি অত্যাচার করিলে খোদা তোমাকে দণ্ড করিবেন।'

"এইরূপ প্রতিদিন ভূতের সহিত বাদানুবাদ হয়। ভূত কিন্তু আমার গায়ে হাত দিতে সাহস করে নাই। প্রথম কয়েকদিন আমি আহার-নিদ্রা একেবারেই পরিত্যাগ কবিয়াছিলাম। তারপর যখন দেখিলাম যে, আপাতত ভূত আমার প্রতি বিশেষ কোনরূপ অত্যাচার করিতে সাহস করিতেছে না, তখন আহার করিতে লাগিলাম। মনে ভাবিলাম, ভূত শাসন করিবার নিমিত্ত নানারূপ তাবিজ আছে। আমিলদিগের নিকট হইতে তাহা আনিয়া নিশ্চয় তুমি আমায় উদ্ধার করিবে। ভূত প্রতিদিন আসে আর বলে,—কেমন, আজ কাজি আনি ? প্রতিদিন দেখিয়া দেখিয়া, এখন তাহাকে দেখিলে আর আমার বড় ভয় হয় না, পূর্বেকার চেয়ে মনে সাহসও অনেক হইয়াছে। নিকা করিবার কথা বলিলে, এখন তাহাকে একপ্রকার দূর দূর করিয়া দিই। একদিন কিন্তু সে ভয়ানক রাগিয়া গেল। শরীর ফুলিয়া দ্বিগুণ হইল, ভূত না হইলে হয়ত ফাটিয়া মরিয়া যাইত। সমুদয় শরীর হইতে অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল। রাগে নিজের হাতটি খুলিয়া লইল, অপর হাত দিয়া ভোঁ-ভোঁ করিয়া ঘুরাইতে লাগিল। পা দুইটা খুলিয়া লইল আর সেইরূপ ঘুরাইল। দুইটি হাত, দুইটি পা ঘুরান হইলে, চক্ষু-কোটর হইতে চক্ষু দুইটি বাহির করিয়া লইল, আর যেরূপ লোকে ভাঁটা লুফিয়া থাকে, সেইরূপ দুই হাতে লুফিতে লাগিল। তারপর সমস্ত মুণ্ডটি খুলিয়া লইল, হাতে লইয়া বলিল, 'সুন্দরি ! যদি তুমি আমাকে বিবাহ না কর, তাহা হইলে তোমার সাক্ষাতে আমি এই আপনার মুণ্ডটি আপনি চিবাইয়া

খাইব।' কি করিয়া নিজের মুণ্ড নিজে খাইবে, তাহা কিন্তু আমি বুঝিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক, আমি বলিলাম, 'তুমি নিজের মুণ্ড নিজেই খাও, আর পরেই থাক, আমি কেন ভূতকে বিবাহ করিতে যাইব ? ভাল চাও তো আমাকে ঘরে রাখিয়া এস।' তখন সে বলিল, 'আচ্ছা ! আজ আমি তোমাকে কিছু বলিলাম না, আজ হইতে এক বৎসরকাল তোমাকে কিছু বলিব না। এক বৎসর পরে আমাকে নিকা কর ভালই, না কর তোমাকে প্রাণে মারিয়া ফেলিব। তোমার স্বামী তোমায় আমাকে দিয়াছে, আমি তোমাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা করিব। মনে করিও না আর কখনও তোমার স্বামীকে তোমায় ফিরিয়া দিব।' সেইদিন হইতে আর আমাকে বিরক্ত করে না। রাত্রি হইলে চরিতে যায়, সকাল হইলে বাড়ি আসে, পরে ঐ বড় গর্তটিতে শুইয়া সমস্তদিন নিদ্রা যায়। মেঘগর্জনের ন্যায় নাক ডাকার শব্দ শুনিতে পাই, আমার কাছে বড় আসে না। কেবল তিন-চার দিন অন্তর একবার আসিয়া আহারীয় সামগ্রী দিয়া যায়, আর জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন, এখন তোমার মন শান্ত হইয়াছে তো ? কাজি আনিব কি ?' গতবার আসিয়া বলিল, 'দেখ, এখন আমি সাবাং মাখিতে আরম্ভ করিয়াছি। রোজ সাবাং মাখি। রং অনেক ফর্‌সা হইয়া আসিয়াছে। আর কিছুদিন পরে লোকে আমাকে আর চিনিতে পারিবে না। যেখানে যাইব, সকলে বলিবে, 'এ লুল্লু নয়, এ সাহেব-ভূত ; কোন লার্ডের ছেলে হইবে। তখন তুমি আর আমাকে বিবাহ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। তখন তুমি বলিবে, 'আমার লুল্লু কই ? আমার লুল্লু কোথা গেল ?' তখন তুমি বলিবে, 'আর বিলম্ব সহে না, শীঘ্র কাজি ডাক, শীঘ্র আমাকে নিকা কর।' কিন্তু তা আমি করিব না। তখন আমি নলপতঃ করিব। নিকা করিবার জন্য তুমি আমার সাধ্য-সাধনা করিবে, তা দেখিয়া আমি বড়ই সন্তোষলাভ করিব। মনে করিব, এ আমাকে বড়ই ভালবাসে, আমি ইহার জীবনসর্বস্ব। সকল ভূতেই বলে যে, লুল্লু সভ্য ভব্য নব্য ভূত। আমি আর আমার গেঁটে দাদা, দুই জনেই সভ্য ভব্য নব্য। দেখিতে পাও তো, ভোর না হইলে কখনও বাড়ি আসি না। যাই, এখন সাবাং মাখিগে। এই কথা বলিয়া সে চলিয়া গিয়াছে। দু'-একদিনের মধ্যে আবার বোধ হয় আসিবে।"

আমীর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কি ভূতের মেস্, না মুফলিসের বাড়ি ? অর্থাৎ কিনা, এখানে অপরাপর ভূত থাকে, না লুল্লু একেলা থাকে ?" আমীর-রমণী বলিলেন যে, "এখানে লুল্লু ভিন্ন আর কোন ভূতকে দেখি নাই ! লুল্লু একেলা থাকে, এই আমার বিশ্বাস।" আমীর বলিলেন, "এখন সকল কথা বুঝিলাম, ঈশ্বর আমাদের প্রতি কৃপা করিবেন। কিন্তু কিরূপে যে বিপদ হইতে উদ্ধার হইব, তাহা জানি না। আপাতত আমার বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে। যদি কিছু খাবার থাকে তাহা হইলে আমাকে দাও।" আমীর-রমণী বলিলেন, "খাবারের এখানে কিছুমাত্র অভাব নাই। ভূত প্রচুর পরিমাণে সে সকল আনিয়া দেয়।" এই বলিয়া তিনি পোলাও, কালিয়া, কুর্মা, কোপ্তা, কাবাব, কারি আনিয়া স্বামীকে উত্তমরূপ আহার করাইলেন।

অষ্টম অধ্যায়

চণ্ডু-মাহাত্ম্য

আহারান্তে বিছানায় শুইয়া আমীর নল দ্বারা চণ্ডুধূম পান করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন, "কি করিয়া স্ত্রীকে ভূতের হাত হইতে উদ্ধার করি।" ধূমপান করিতে করিতে স্ত্রীকে বলিলেন, "এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার নিমিত্ত আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি, তুমি কি বল ? লুল্লু সভ্য ভব্য নব্য ভূত। ভূতের তেল মাখিয়া যদিচ আমার শরীরে ভূতের বল হইয়াছে, তথাপি তাহার সহিত বোধ হয় সম্মুখ-সংগ্রামে আমি জয়লাভ করিতে পারিব না। বিশেষত ঘ্যাঁঘোঁ আমাকে বলিয়া দিয়াছে, 'কৌশল করিয়া স্ত্রীর উদ্ধার করিও।' সেজন্য তুমি একটি কাজ কর। অল্প অল্প লুল্লুকে প্রশ্রয় দাও। দিনকতকাল তাহাকে চণ্ডুর ধূমপান করাও। তারপর কি হয় বুঝা যাইবে। গোকুলের বাঁকা কালাচাঁদের সহিত পরিণয় করিলে রক্ষা আছে, কিন্তু আফিম-কালাচাঁদের সহিত প্রেম করিলে আর রক্ষা নাই। চণ্ডুর পরিণয়ে তুমি তাহাকে আবদ্ধ কর। আমার সমুদয় সরঞ্জাম তোমার নিকট রাখিয়া যাইব। দিনকতকাল কাঁচা আফিম খাইয়া না হয়, কষ্টে সৃষ্টে কাল কাটাইব।" আমীর-রমণী বলিলেন, "এ পরামর্শ মন্দ নয়।"

এইরূপ কথোপকথনে নিশা অবসান-প্রায় হইল। তখন আমীর-রমণী বলিলেন, "আর তুমি এখানে থাকিও না। ভূতের আসিবার সময় হইয়াছে। ভূত চরিতে গেলে, কাল আবার রাত্রিতে আসিও। চণ্ডুর আসবাব রাখিয়া যাও। দেখি কি করিতে পারি। কিছু খাবার-দাবার সঙ্গে লইয়া যাও, দিনের বেলায় খাইবে।" আমীর, স্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় সেই গর্তে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন।

প্রাতঃকাল না হইতে হইতে ভূত বাটী ফিরিয়া আসিয়াই, প্রথমে আপনার গর্তে গিয়া শুইল। ঘোরতর নাক ডাকাইয়া অনেকক্ষণ নিদ্রা যাইল। তারপর উঠিয়া হ্রদের জলে স্নান করিতে যাইল। পাথর দিয়া, ঝামা দিয়া, বালি দিয়া, সাবাং দিয়া উত্তমরূপে গা মাজিল। শরীরের নানাস্থানে রক্ত ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। আপনা আপনি বলিল, "ক্রমে এইবার দুধে-আলতার রং হইয়া আসিতেছে ?" তারপর সাজগোজ করিয়া আমীর-রমণীর নিকট গমন করিল। বলিল, "কী সুন্দরি ! দেখিতেছ ? দিন দিন কি হইতেছি ? দুধে-আলতার রং !" আমীর-রমণী বলিলেন, "তাই তো ! তোমাকে যে আর চেনা যায় না।" ভূত বলিল, "পাথর, ঝামা, বালি, সাবাং !" আমীর-রমণী বলিলেন, "সত্য সত্যই তুমি সভ্য ভব্য নব্য ভূত।" ভূত বলিল, "তবে কাজি ডাকি ?" আমীর-রমণী বলিলেন, "কাজি ডাকায় আমার কিছু আপত্তি নাই, তবে কি না জান, তুমি হইলে ভূত, আমি হইলাম মানুষ, দুই জনে মিলিবে কি করিয়া তাই ভাবিতেছি। মানুষের মত একটু-আধটু যদি তোমার ব্যবহার দেখি, তাহা হইলে বুঝি, হাঁ, দুই জনে পরিণয় হইতে পারিবে। এই দেখ, এত খাদ্যদ্রব্য তুমি আমাকে আনিয়া দাও, নিজে কিন্তু একদিনের জন্যেও একটু খুঁটিয়া মুখে দাও না। কি খাও, কি না খাও, তাহাও জানি না। সাপ খাও, কি ব্যাং খাও— কিছুই বলিতে পারি না। হয়তো কোন্‌দিন পচা মড়া খাইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইবে। মুখের গন্ধে আমার প্রাণ বাহির হইবে। তারপর দেখ, মানুষে পান খায়, তামাক খায়, গ্যাঁজা খায়, আরও কত কি খায়। আহা ! আমার স্বামী আমীর কেমন চণ্ডু খাইতেন ! কাছে বসিয়া মনের সাধে কেমন তাঁহাকে আমি চণ্ডু খাওয়াইতাম। যখন চণ্ডুর ধূম আমার নাকে প্রবেশ করিত, তখন কেমন আমি স্বর্গসুখ লাভ করিতাম। তাঁহার চণ্ডুর আসবাবগুলি আমি আমার কাঁধের ঝুলি করিয়া রাখিয়াছিলাম। শয়নে উপবেশনে সর্বদাই আমার নিকট রাখিতাম। আহা ! আজ পর্যন্ত সেই ঝুলিটি আমার কাঁধেই রহিয়াছে।" ভূত বলিল, "বটে ! তা, আমিও চণ্ডু খাইব, নিয়ে এস, এখনি খাইব।" আমীর-রমণী বলিলেন, "তাহা যদি করিতে পার তো বড় ভালই হয়। ভূত-ভূতিনীদিগের কাছে তুমি সভ্য ভব্য নব্য ভূত বটে, কিন্তু আমাদের নাকে তোমাদের গায়ের একটু গন্ধ লাগে, একটু বোট্‌কা বোট্‌কা গন্ধ। রীতিমত চণ্ডুটি খাওয়া অভ্যাস করিতে পারিলে, আর তোমার গায়ে সে গন্ধ থাকিবে না, মানুষ-মানুষ গন্ধ হইবে।" ভূত বলিল, "তা দাও, খাইব।" আমীর-রমণী বলিলেন, "কাঁচা আফিম হউক, কি গুলি হউক, কি চণ্ডু হউক, অল্প অল্প করিয়া খাইতে অভ্যাস করিতে হয়। একেবারে অধিক খাইলে অসুখ করে। তোমার অসুখ করিলে প্রাণে আমি বড়ই ব্যথা পাইব। কারণ, তোমার প্রতি এখন আমার নব অনুরাগ বই তো নয় ? যাহা হউক, চণ্ডু শুইয়া খাইতে হয়। মূর্খ লোকের বিশ্বাস এই যে, চণ্ডু একবার টানিলেই অচেতন হইয়া পড়ে বলিয়া, সকলে ইহা শুইয়া খায়। তাহা নহে, শুইয়া খাইতে বাগ হয় বলিয়া খায়।" এই বলিয়া আমীর-রমণী চণ্ডুর আসবাব বাহির করিয়া দিলেন। প্রদীপের নিকট ঘরের একপার্শ্বে মাটিতে শুইয়া তাহাকে ধূমপান করিতে বলিলেন। কি করিয়া খাইতে হয়, তাহাও বলিয়া দিলেন। সে অল্প অল্প ধূমপান করিলে, আমীর-রমণী বলিলেন, "এখন আর নয়, চরিতে যাইবার পূর্বে পুনরায় ও-বেলা আসিয়া খাইও। কিছু কি টের পাইতেছ ?" ভূত বলিল, "আর কিছু টের পাইতেছি না, কেবল গা চুলকাইতেছে, আর একটু বমিবমি করিতেছে।" আমীর-রমণী বলিল, 'ঐটুকুই এর আয়েস, একেই নেশা বলে।" ভূত তখন চলিয়া গেল। পুনরায় সন্ধ্যাবেলা আসিয়া আর একবার চণ্ডু খাইল। রাত্রি হইলে যথানিয়মে চরিতে যাইল। তখন আমীর আসিয়া স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলেন।

নবম অধ্যায়

উদ্ধার

ভূতের চণ্ডু খাওয়ার বিবরণ স্ত্রীর নিকট আদ্যোপান্ত শুনিয়া আমীর বড়ই আনন্দলাভ করিলেন। পূর্বেকার মত কথোপকথনে দুইজনে একত্রে রাত্রি কাটাইলেন। প্রভাত না হইতে হইতে আপনার গর্তে ফিরিয়া গেলেন। এইরূপ কিছুদিন চলিতে লাগিল। ভূত দিনে দুইবেলা আসিয়া চণ্ডু খায়। আমীর রাত্রিতে স্ত্রীর নিকট থাকেন। আমীর যখন দেখিলেন, চণ্ডুপানে ভূতের বিলক্ষণ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, আব ছাড়িবার যো নাই, তখন তিনি একদিন স্ত্রীকে বলিলেন, "কাল তুমি ভূতকে আর চণ্ডু দিও না ; বলিও চণ্ডু ফুরাইয়া গিয়াছে, মনুষ্যালয় হইতে চণ্ডু আনিতে বলিবে।" তার পরদিন প্রাতঃকালে যখন ভূত চণ্ডু খাইতে আসিল, আমীর-রমণী তাহাকে বলিলেন, "দেখ, সঙ্গে করিয়া যাহা কিছু চণ্ডু আনিয়াছিলাম, সমস্ত ফুরাইয়া গিয়াছে, আজ তোমাকে খাইতে দিই এমন আর নাই, তুমি লোকালয় হইতে চণ্ডু লইয়া আইস।" এই কথা শুনিয়া ভূতের মন বড়ই উদাস হইয়া পড়িল। কিন্তু তখনও সে জানিতে পারে নাই, কি সর্বনাশের কথা সে শুনিল! বিরসবদনে আপনার ঘরে ফিরিয়া গেল। যত বেলা হইতে লাগিল, শরীরে ও মনে ততই ক্লেশ হইতে লাগিল। প্রথম আকর্ণ পূরিয়া হাই উঠিতে লাগিল, তারপর চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, গা-ভাঙ্গিতে লাগিল। সর্বশরীরে ঘোর বেদনা হইল, প্রাণ আই-ঢাই করিতে লাগিল। সেদিন আর নিদ্রা হইল না। বৈকালবেলা খালি নলটি লইয়া প্রদীপের শীষের কাছে ধরিয়া একবার টানিল। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ক্লেশ দূর হইল না। একান্তমনে সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিয়া রহিল, কখন সন্ধ্যা হইবে যে, লোকালয়ে যাইয়া চণ্ডু আনিয়া প্রাণরক্ষা করিবে। সেদিন যেই সন্ধ্যা হইল, অমনি ভূত ঘর হইতে বাহির হইল। ভীমতালেব জল ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। উপরে গিয়া আর সব চিন্তা ছাড়িয়া, কেবল চণ্ডুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। এ-গ্রাম সে-গ্রাম, এ-নগর সে-নগর, এ-দেশ সে দেশ, সমস্ত ভারতভূমি ঘুরিল, চণ্ডু কোথাও পাইল না। আবকারির এমনই কড়া নিয়ম যে, সন্ধ্যা না হইতেই সকল দোকান বন্ধ হইয়া যায়। এদিকে চণ্ডু বিনা প্রাণ বাহির হয়। উদরেরও বিলক্ষণ গোলযোগ উপস্থিত হইল। শরীর আর বয় না, আর উড়িতে বা চলিতে পারে না। তখন ভাবিল, "বৃথা আর ঘুরিয়া কি হইবে? মরি তো ঘরে গিয়া মরি, প্রিয়তমার মুখ দেখিতে দেখিতে মরিব! তাহাকে বলিব, 'দেখ, তোমার প্রেমের ভিখারী হইয়া আমি প্রাণ বিসর্জ্জন করিলাম।' হয়তো আমাকে বাঁচাইবার জন্য ইহার একটা উপায়ও করিতে পারে। অতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া, ঘোরতর যাতনায় ব্যথিত হইয়া, ভূত সেদিন সকাল সকাল বাটী ফিরিয়া আসিল। আমীর জানিতেন, কি ঘটনা ঘটিবে, তাই তিনিও সেদিন স্ত্রীর নিকট হইতে সকাল সকাল বিদায় লইয়া আপনার ঘরে গিয়াছিলেন। ভূত কিন্তু আপনার ঘরে আসিয়াই সেইখানে শুইয়া পড়িল। শরীর এতই বিকল হইয়াছিল যে, সেখান হইতে নড়িতে আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সেইখানে পড়িয়া ক্রমাগত উঃ আঃ করিতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত শরীর হিমাঙ্গ হইয়া গেল। সমুদয় গ্রন্থি শিথিল হইতে লাগিল, লিগেমেন্ট সমস্ত আলগা হইল, শরীরের জয়েন সব একেবারে খুলিয়া গেল, হাড়ের সন্ধি সমুদয় একে একে খসিয়া গেল, যাবতীয় অস্থি পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পড়িল। উত্থানশক্তি-রহিত। ঘোর বেদনায়, ঘোর যাতনায় লুল্লু পড়িয়া রহিল। প্রভাত হইলে, হাসিতে হাসিতে হাত ধরাধরি করিয়া, আমীর ও আমীর-রমণী আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। আমীর বলিলেন, "কি হে বাপু! সভ্য ভব্য নব্য ভূত! পুরাতন কথাটা কি কখনও শুন নাই?" 'থোড়া থোড়া করকে খাও-মুঝে, ময় লগুঁ কড়ুয়া। আর জরু বেচো, গরু বেচো, মুঝকো লাও ভেড়ুয়া।'

ইহার অর্থ এই, আফিম বলিতেছেন, 'অল্প অল্প করিয়া আমাকে প্রথম খাও ; কেন না, আমি তিত লাগি। এখন ভেড়ুয়া। স্ত্রী বিক্রয় কর, কি গরু বিক্রয় কর, বিক্রয় করিয়া যেখান হইতে পাও আমাকে লইয়া আইস।' ভূত চিঁচিঁ করিয়া বলিল, 'এ বিপদের সময় মুখনাড়া দিচ্ছিস তুই আবার কে?" আমীর বলিলেন, "আমি আমীর, এই রমণীর স্বামী, যাহাকে তুই নিদারুণ ক্লেশ দিয়াছিস ; তাই আজ তোর যাতনা দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিতেছি।' ভূত বলিল, 'তোমার জরু তুমি ফিরিয়া লও, অমন জরুতে আমার কাজ নাই। বাবা! ও তো জরু নয়! সুখে-স্বচ্ছন্দে ভূতগিরি করিতেছিলাম, এ কি বাপু! ভূতের আবার চণ্ডু খাওয়া কি? ওই তো আমাকে মজাইল। এখন

তোমার কাছে যদি আফিম কি চণ্ডু থাকে তো দিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর। ধড়ে প্রাণ আসিলে তোমার স্ত্রীকে এবং তোমাকে ঘরে লইয়া যাইব। কেবল ঘরে রাখিয়া আসিব না, এখন দেখিতেছি আমাকে চিরকাল তোমার গোলামি করিতে হইবে। চণ্ডু না পাইলে তো আর বাঁচিব না ; সুতরাং চণ্ডুর জন্য তোমার গোলামি করতে হইবে। দুইবেলা চণ্ডু দিও, যা বলিবে তাহা করিব, তোমার সংসারে ভূতের মত খাটিব।' আফিমের মহিমা আমীর ভালরূপেই জানিতেন। তিনি বুঝিলেন, লুল্লু যাহা বলিতেছে, তাহা প্রকৃত কথা। প্রতারণা ইহাতে কিছুই নাই। পকেট হইতে বাহির করিয়া প্রথমে তাহাকে একটু কাঁচা আফিম খাইতে দিলেন। ইহাতে ভূতের শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল ; শরীরের অস্থি-সমুদয় পুনরায় যে যাহার স্থানে গিয়া যোড়া লাগিল। তখন সে উঠিয়া বসিল। তারপর আমীর তাহাকে চণ্ডুপান করিতে দিলেন। তাহাতে তাহার দেহে পুনরায় প্রাণ-সঞ্চার হইল, শরীর স্বচ্ছন্দতা লাভ করিল। লুল্লু তখন আমীরের পদতলে পড়িয়া বলিল, "মহাশয় ! আপনার নিকট আমি ঘোর অপরাধে অপরাধী, বড়ই দোষ করিয়াছি, কৃপা করিয়া আমার অপরাধ মার্জনা করুন। বড়ই নিদারুণ ক্লেশ হইতে আপনি আপনাকে মুক্ত করিলেন। আপনার ঋণ কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না। চিরকাল দাসানুদাস হইয়া আপনার এবং এই বিবিজীর সেবা করিব। এখন স· লে সকাল আহারাদি করিয়া লউন। আজই রাত্রিতে আপনাদিগকে ঘরে লইয়া যাইব।" আমীর ও আমীরের রমণী তখন সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন।

সন্ধ্যার পর ভূত আসিয়া দ্বারে উপস্থিত হইল। দুই জনে লুল্লুর পিঠে বসিলেন। জল হইতে বাহির হইয়া লুল্লু আকাশপথে উঠিল। তড়িত বেগে আকাশপথে চলিতে লাগিল। প্রায় রাত্রি দুই প্রহরের সময় সকলে দিল্লী নগরে আসিয়া পৌঁছিলেন। আমীরের ছাদে গিয়া ভূত ইঁহাদিগকে নামাইয়া দিল। আমীর ফকির-বেশে গৃহত্যাগ করিবার সময় ঘরে চাবি দিয়া গিয়াছিলেন। চাবি খুলিয়া স্ত্রী-পুরুষে ঘরে প্রবেশ করিলেন। লুল্লুর জন্য একটি ঘর নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "লুল্লু ! এই ঘরটি তোমার, তুমি এই ঘরে থাকিবে। আফিম কি চণ্ডু যাহা চাহিবে, তাহাই তোমাকে দিব।" লুল্লু বলিল, "হাঁ, এ জনমে আপনাদিগকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। ছাড়িবার যোও নাই।" পরদিন প্রাতঃকালে আমীর প্রতিবাসীদিগকে ডাকিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা তাঁহাদিগকে শুনাইলেন। আমীর বাটী ফিরিয়া আসিয়াছেন দেখিয়া সকলে সুখী হইলেন।

দশম অধ্যায়

লুচি

যে যাহার ঘরে ফিরিয়া যাইলে, লুল্লু ও আমীর দুইজনে একসঙ্গে শুইয়া মনের সুখে অনেকক্ষণ ধরিয়া চণ্ডুপান করিলেন। এইরূপে ভূতে-মানুষে ক্রমে বড়ই ভাব হইল। একদিন চণ্ডু খাইতে খাইতে আমীর বলিলেন, "হে লুল্লু ! হে চণ্ডুসেবক-কুল-তিলক ! আমার বড় সাধ হইতেছে যে, পুনরায় বন্ধুদিগের সহিত একবার সাক্ষাৎ করি, যাঁহারা স্ত্রী-উদ্ধার বিষয়ে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তখন তুমি আমার শত্রু ছিলে, এখন কিরূপ প্রাণের মিত্র হইয়াছ, তাহাও তাঁহারা একবার আসিয়া দেখুন। প্রথম হইতেছেন সেই জান্, যিনি বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তুমি আমার স্ত্রীকে লইয়া গিয়াছ। তারপর সেই ব্রাহ্মণ যাঁহার মত রোজা এ ধরাধামে কখনও হয় নাই, হবে না। তারপর আমাদের তাঁতিভায়া, যাঁর মত সঙ্গীত বিদ্যাবিশারদ পৃথিবীতে হয় নাই, হবে না। তারপর সেই কলুর পো, যাঁর মত তৈলনিষ্পীড়ক জগতে হয় নাই, হবে না। আর যদি ভূতদিগকে আনিতে পার, তাহা হইলে তো বড়ই সন্তুষ্ট হই। সেই ভূততত্ত্ববিৎ মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণের ভূত, সেই অমানুষিক অভৌতিক প্রেমিক ঘ্যাঁঘোঁ, আর সেই ভাবি সম্পাদক তৈলপ্রদায়ক গোঁগাঁ ! তোমার গেঁটে দাদার সহিত আলাপ পরিচয় করিতেও আমার বড়ই ইচ্ছা। আর একটি কথা—আহা ! ঘ্যাঁঘোঁর বিবাহ হয় নাই, তাহার সেই নাকেশ্বরীকে আনিয়া যদি দুইজনে মিলন করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে বড়ই সন্তুষ্ট হই।" লুল্লু বলিল, "আপনার সমুদয় আদেশ পালন করিতে আমি সমর্থ। আমি এই রাত্রিতেই সকলকে এখানে আনিতেছি।" সন্ধ্যার সময় ভূত ঘর হইতে বাহির হইল। রাত্রি একপ্রহরের মধ্যে জান্, ব্রাহ্মণ, তাঁতি ও কলুকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। আমীর সকলকে যথাবিধি অভ্যর্থনা

করিলেন। তিনি আপনার বিবিকে পাইয়াছেন শুনিয়া সকলে পরম সুখী হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লুল্লু পুনর্বার আকাশ-পথে যাত্রা করিয়া ব্রাহ্মণের ভূত, ঘ্যাঁঘো, গোঁগাঁ ও সভ্য ভব্য নব্য গেঁটে দাদাকে লইয়া আসিল। ঘ্যাঁঘোঁর মনোহর নাক-ধারিণী বিশ্ববিমোহিনী সেই ভূতিনীকেও আনিয়া দিল। ভূতিনী অন্তঃপুরে আমীর-পত্নীর নিকট গমন করিলেন। পুরুষ-মানুষ ও পুরুষ-ভূত সকলে বহির্বাটীতে উপবেশন করিলেন। পরস্পরে আলাপ-পরিচয় হইলে, আমীর অনুনয়-বিনয় করিয়া সকলকে বলিলেন, "মহোদয়গণ! আজ রাত্রিতে আমার এ গরীবখানাতে পদার্পণ করিয়া আপনারা বড়ই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে আমার মনে একটি বাসনা বড়ই প্রবল হইয়াছে, আপনারা তাহা করেন। বড় ইচ্ছা, নাকেশ্বরীর সহিত ঘ্যাঁঘোঁর বিবাহকার্য আজ রাত্রিতেই সমাধা করি। গোঁগাঁ যে ঘ্যাঁঘোঁর নামে মিথ্যা কুৎসা করিয়াছিল, তাহা আমার পত্নী, নাকেশ্বরীর মাসীকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। গোঁগাঁও একথা এখন স্বীকার করিতেছে। নাকেশ্বরীর মাসী বিবাহে সম্মতিদান করিয়াছেন, এখন আপনাদিগের কি মত?" সকলেই একবাক্য হইয়া বলিলেন, "তথাস্তু, শুভকার্যে বিলম্বে প্রয়োজন নাই।" তখন আমীর, লুল্লু প্রভৃতি ভূতদিগকে পৃথিবীর সমস্ত ভূত নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে বলিলেন। কিন্তু উপস্থিত ভূতগণ সকলেই মৌন হইয়া রহিল। আমীরের আদেশপালনে কেহই তৎপর হইল না। আমীর জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কি তোমাদিগকে কোন দুঃসাধ্য কার্য করিতে অনুরোধ করিয়াছি? পৃথিবীর সমস্ত ভূত নিমন্ত্রণ করা কি তোমাদের অভিপ্রেত নয়?" লুল্লু উত্তর করিল, "মহাশয়! আপনি যেরূপ সদাশয় লোক, তাহাতে আপনার সমস্ত আদেশই আমাদের শিরোধার্য। তবে কি না, আমরা ভারতীয় ভূত, ভারতের বাহিরে আমরা যাইতে পারি না। সমুদ্রের অপর পারে পদক্ষেপ করিলে আমরা জাতিকুল-ভ্রষ্ট হইব। আমাদের ধর্ম কিঞ্চিৎ কাঁচা। যেরূপ অপক্ব মৃত্তিকাভাণ্ড জলস্পর্শে গলিয়া যায়, সেইরূপ সমুদ্র-পারের বায়ু লাগিলেই আমাদের ধর্ম ফুস্ করিয়া গলিয়া যায়, তাহার আর চিহ্নমাত্র থাকে না, ধর্মের গন্ধটি পর্যন্ত আমাদের গায়ে লাগিয়া থাকে না। কেবল তাহা নহে, পরে আমাদের বাতাস যাঁহার গায়ে লাগিবে, দেবতা হউন কি ভূত হউন, নর হউন, কি বানর হউন, তিনিও জাতিভ্রষ্ট হইবেন। যার পক্ষে যেরূপ ব্যবস্থা,—দিবারাত্রি তাঁহাদিগকে পঞ্চামৃত খাইতে হইবে, কিংবা কল্মা পড়িতে হইবে, তবে তাঁহাদের ধর্ম টায়টোয়ে বজায় থাকিবে। আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম, এখন যেরূপ অনুমতি হয়।" আমীর বলিলেন, "তবে আর তত আড়ম্বরের আবশ্যক নাই। ভারতীয় ভূত-সমাজকেই কেবল নিমন্ত্রণ কর।"

নানাবিধ চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় পান-ভোজনের সামগ্রীরও আয়োজন হইল। মুহূর্তের মধ্যে ভূতেরা অনেক লুচি, অনেক সন্দেশ, অনেক দধি জমা করিয়া ফেলিল। নগরবাসী অনেক লোককে আমীর সেই রাত্রিতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সমাগত হইলে, আহারীয় দ্রব্যসামগ্রী সমুদয় আয়োজন হইলে, মহাসমারোহে নাকেশ্বরীর সহিত ঘ্যাঁঘোঁর বিবাহকার্য সমাধা হইল। আমীর নিজে কন্যাদান করিলেন, ব্রাহ্মণ পুরোহিত হইলেন। বিবাহের মন্ত্র তিনি জানিতেন না সত্য, কিন্তু একটি দীর্ঘ ফোঁটা কাটিয়া ওঁ-আং করিয়া কোন রকমে সে রাত্রির কার্য সারিলেন। পূর্ণযৌবনী ভূতকামিনী ঘ্যাঁঘোঁপত্নীর রূপমাধুরী দেখিয়া সকলেরই মন বিমোহিত হইল। একমনে অনিমেষনয়নে সকলে সেই রূপ দেখিতে লাগিলেন। যিনি যত দেখেন, দেখিয়া পিপাসা হৃদয়ে তাঁহার ততই প্রজ্বলিত হইল। বরকে সকলে বলিলেন, "ঘ্যাঁঘোঁ! তুমি অতি ভাগ্যবান্ পুরুষ যে, এরূপ অমূল্য কন্যারত্নকে লাভ করিলে।" ঘ্যাঁঘোঁ চক্ষু ঠারিয়া ঈষৎ হাসিলেন। বর কি না? অধিক কথা তো আর কহিতে পারেন না? তবে সেই ঠার, সেই হাসির অর্থ এই—"আমি পূর্বেই না বলিয়াছিলাম, ও রূপ দেখিয়া কার প্রাণ সুস্থির থাকিতে পারে? নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আহারাদি-ক্রিয়াও উত্তমরূপে সমাধা হইল। যিনি যত পারিলেন, লুচি ও সন্দেশ তুলিলেন, ও পুঁটলি বাঁধিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। সভাস্থলেই বাসর-ঘর হইল। বাসর-ঘরে গান গাইবার নিমিত্ত সকলে একবাক্য হইয়া তাঁতিকে অনুরোধ করিলেন। পুলকে পুলকিত হইয়া, সহস্র সহস্র শ্রোতার সম্মুখে তাঁতি সেই রাত্রিতে মনের সুখে গান করিলেন। শ্রোতারা একদৃষ্টে তাঁহার মুখভঙ্গিমা দেখিয়াই আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন। গানের কণামাত্র কাহারও কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। আমীরের অনুরোধে দিল্লীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সে রাত্রিতে সাবধান হইয়াছিলেন। তূলা দিয়া সকলেই কান একেবারে বন্ধ করিয়াছিলেন। সে রাত্রিতে নৃত্যেরও অভাব হয় নাই, ভূত-ভূতিনীরা দলে দলে কতই

যে নাচিল, তা আর কি বলিব। প্রভাত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে মজলিস ভাঙিল। তখন লুল্লু—জান, ব্রাহ্মণ, তাঁতি ও কলুকে ঘরে রাখিয়া আসিলেন। নগরবাসীরা যে যাহার ঘরে চলিয়া গেলেন।

একাদশ অধ্যায়

লেখকদল সাবধান

ভূত ও ভূতিনীসকল বিদায় হইবার পূর্বে আমীরকে তাহারা বলিল, "মহাশয়! আপনার সদাচারে আমরা বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি। যদি কোন বিষয়ে আপনার উপকার করিতে পারি তো বলুন, আমরা বড়ই সুখী হইব।" আমীর বলিলেন, "আমার উপকার করিতে যদি নিতান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমাদের বাসনা আমি পূর্ণ করিব। এখান হইতে চারি ক্রোশ দূরে যমুনার কূলে আমার অনেক ভূমি ছিল; তাহার আয় হইতে পুরুষ-পুরুষানুক্রমে আমাদিগের রাজার হালে চলিত। সেই ভূমি এক্ষণে যমুনার জলপ্লাবনে একেবারে বালুকাময় হইয়া গিয়াছে। তাহা হইতে তোমরা যদি বালুকা সব তুলিয়া ফেলিতে পার, তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার হয়।" ভূতেরা বলিল, "যে আজ্ঞে, আমরা এই ক্ষণেই করিতেছি।" এই বলিয়া যত ভূত সেই মুহূর্তে ভূমির নিকট যাইল এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সমুদয় বালি উঠাইয়া ফেলিল। ভূমি পূর্বের মত উর্বর ও ফলশালী হইল। তখন আমীরের বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া বিদায় লইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। আমীর কিন্তু গোঁগাঁকে যাইতে নিষেধ করিলেন। তাহাকে বলিলেন, "গোঁগাঁ! তুমি যাইও না। তোমার অস্থি-মজ্জা সমুদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তোমার শরীর একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। আফিম আর দুধ, এই দুই বস্তু নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে তোমার শরীর পুনর্গঠিত হইতে পারে। যে হেতু আফিম অতি অপূর্ব পদার্থ, ইহা সেবন করিলে মানুষ যে বয়সে খায়, সেই বয়সেই চিরকাল থাকে, শরীরের কোষ সমুদয় ধ্বংস হয় না, ম্যালেরিয়া বিষজনিত জ্বর ইহার নিকটে আসে না। কি মনুষ্যের, কি ভূতের, ইহা সেবন করিলে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। অতএব তুমি লুল্লুর নিকট অবস্থিতি কর। চণ্ডু পান করিতে অভ্যাস কর।" গোঁগাঁ তাহাই স্বীকার করিল। এইরূপে আমীর স্ত্রীকে লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই লুল্লু গণ্য-মান্য সকলের নিকট প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। একটু-আধটু যাঁহারা নেশা করিতেন, সকলেই তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইলেন। স্ত্রীলোক দেখিলে তিনি 'মা' বলিয়া ভিন্ন কথা কহিতেন না। চণ্ডুর মোহিনী শক্তি প্রভাবে তাঁহার বিকৃতি আকার ক্রমে সুকৃতি হইয়া উঠিল; নব্য না হউন, সত্য সত্যই তিনি একজন সভ্য-ভব্য ভূত হইলেন। চণ্ডুর সহিত দুধ-ঘি খাইয়া তাঁহার রং যথার্থই ফরসা হইয়া উঠিল। তবে তাঁহার দোষ এই, নেশাখোর ভিন্ন অপরের সহিত তিনি বাক্যালাপ করিতেন না। যাহা হউক, এত পোষ মানিয়াছিলেন যে, আমীর-রমণী তাঁহাকে দেখিয়া আর কিছুমাত্র লজ্জা বা ভয় করিতেন না। আমীরের অবস্থা ভাল হইলেও, লুল্লু তাঁহাকে গাড়ি করিতে দেন নাই। তাঁহার যেখানে যাইবার আবশ্যক হইত, তিনি পিঠে লইয়া যাইতেন। তাহার পিঠে চড়িয়া আমীর-রমণী কতবার বাপের বাড়ি গিয়াছিলেন। লুল্লুকে সর্বদা এখানে-সেখানেই যাইতে হইত বলিয়া তিনি স্বর্ণকারের দ্বারা দুইখানি পাখা গড়াইয়া লইয়াছিলেন। কোথাও যাইতে হইলে ঐ দুইখানি পাখা পরিয়া উড়িয়া যাইতেন, তাহাতে তাহাকে দেখাইত ভাল, আর তাহা পরিয়া অনেকদূর যাইলেও শ্রম হইত না। একবার সমুদ্র দেখিতে আমীর-রমণীর বড়ই সাধ হইয়াছিল। লুল্লু এ কথা শুনিয়া বলিলেন, "তার ভাবনা কি? আমার পিঠে চড়। আমার মাথাটি ভাল করিয়া ধর, আমি সমুদ্র দেখাইয়া আনিতেছি।" এই প্রকারে তিনি আমীর-রমণীকে সমুদ্র দেখাইয়া আনিলেন।

কিছুদিন পরে গোঁগাঁর শরীর পুনরায় সবল হইলে, আমীর তাহাকে বলিলেন, 'গোঁগাঁ! আমি তোমার কাছে যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহা করিব। একখানি খবরের কাগজ খুলিব, তাহার সম্পাদক হইবে তুমি।" যথাসময়ে আমীর একখানি সংবাদপত্র বাহির করিলেন। একে ভূত সম্পাদক, তাতে আবার চণ্ডুখোর ভূত,—গুলির চৌদ্দপুরুষ। সে সংবাদপত্রের সুখ্যাতি রাখিতে পৃথিবীতে আর স্থান রহিল না। সংবাদপত্রখানি উত্তমরূপে চলিতে লাগিল, তাহা হইতেও আমীরের বিলক্ষণ দুই পয়সা লাভ হইল।

গোঁগাঁ যে কেবল আপনার সংবাদপত্রটি লিখিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহা নহে। সকল সংবাদপত্র আফিসেই তাঁর অদৃশ্যভাবে গতায়াত আছে। অন্যান্য কাগজের লেখকেরা যখন প্রবন্ধ লিখিতে বসেন, তখন ইচ্ছা হইলে কখনও কখনও গোঁগাঁ তাঁহাদিগের ঘাড়ে চাপেন। ভূতগ্রস্ত হইয়া লেখকেরা কত কি যে লিখিয়া ফেলেন, তাহার কথা আর কি বলিব ! তাই বলি, লেখকদল ! সাবধান !
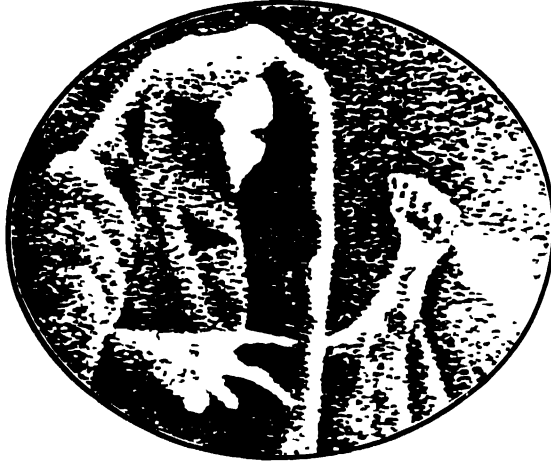
মাস্টারমশায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

রাত্রি তখন প্রায় দুটা। কলিকাতার নিস্তব্ধ শব্দসমুদ্রে একটুখানি ঢেউ তুলিয়া একটা বড়ো জুড়িগাড়ি ভবানীপুরের দিক হইতে আসিয়া বির্জিতলাওয়ের মোড়েব কাছে থামিল। সেখানে একটা ঠিকাগাড়ি দেখিয়া আরোহী বাবু তাহাকে ডাকিয়া আনাইলেন। তাহাব পাশে একটি কোট-হ্যাট-পরা বাঙালি বিলাতফের্তা যুবা সম্মুখের আসনে দুই পা তুলিয়া দিয়া একটু মদমত্ত অবস্থায় ঘাড় নামাইয়া ঘুমাইতেছিল। এই যুবকটি নূতন বিলাত হইতে আসিয়াছে। ইহারই অভ্যর্থনা উপলক্ষে বন্ধুমহলে একটা খানা হইয়া গেছে। সেই খানা হইতে ফিরিবাব পথে একজন বন্ধু তাহাকে কিছুদূর অগ্রসর করিবার জন্য নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইয়াছেন। তিনি ইহাকে দু-তিনবাব ঠেলা দিয়া জাগাইয়া কহিলেন, "মজুমদার, গাড়ি পাওয়া গেছে, বাড়ি যাও।"

মজুমদার সচকিত হইয়া একটা বিলাতি দিব্য গালিয়া ভাড়াটে গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। তাহার গাড়োয়ানকে ভালো করিয়া ঠিকানা বাৎলাইয়া দিয়া ব্রুহাম গাড়ির আরোহী নিজের গম্যপথে চলিয়া গেলেন।

ঠিকা গাড়ি কিছুদূর সিধা গিয়া পার্ক স্ট্রীটের সম্মুখে ময়দানের রাস্তায় মোড় লইল। মজুমদাব আর-একবার ইংরেজি শপথ উচ্চারণ করিয়া আপন মনে কহিল 'এ কী! এ তো আমাব পথ নয়।' তার পরে নিদ্রাজড় অবস্থায় ভাবিল, 'হবেও বা, এইটিই হয়তো সোজা রাস্তা!'

ময়দানে প্রবেশ করিতেই মজুমদারের গা কেমন করিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল—কোনো লোক নাই তবু তাহার পাশের জায়গাটা যেন ভর্তি হইয়া উঠিতেছে; যেন তাহার আসনের শূন্য অংশের আকাশটা নিরেট হইয়া তাহাকে ঠাসিয়া ধরিতেছে। মজুমদার ভাবিল—এ কী ব্যাপার! গাড়িটা আমার সঙ্গে এ কিরকম ব্যবহার শুরু করিল। "এই গাড়োয়ান, গাড়োয়ান!" গাড়োয়ান কোনো জবাব দিল না। পিছনের খড়খড়ি খুলিয়া ফেলিয়া সহিসটার হাত চাপিয়া ধবিল; কহিল, "তুম্ ভিতর আকে বৈঠো।" সহিস ভীতকণ্ঠে কহিল, "নেহি, সাব, ভিতর নেহি জায়েগা!"

শুনিয়া মজুমদারের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল ; সে জোর করিয়া সহিসের হাত চাপিয়া কহিল, "জল্‌দি ভিতর আও ।"

সহিস সবলে হাত ছিনাইয়া লইয়া নামিয়া দৌড় দিল। তখন মজুমদার পাশের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল : কিছুই দেখিতে পাইল না, তবু মনে হইল, পাশে একটা অটল পদার্থ একেবারে চাপিয়া বসিয়া আছে। কোনোমতে গলায় আওয়াজ আনিয়া মজুমদার কহিল, "গাড়োয়ান, গাড়ি রোখো।" বোধ হইল, গাড়োয়ান যেন দাঁড়াইয়া উঠিয়া দুই হাতে রাশ টানিয়া ঘোড়া থামাইতে চেষ্টা করিল—ঘোড়া কোনোমতেই থামিল না। না থামিয়া ঘোড়া দুটা রেড রোডের রাস্তা ধরিয়া পুনর্বার দক্ষিণের দিকে মোড় লইল। মজুমদার ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আরে, কাঁহা যাতা।" কোনো উত্তর পাইল না। পাশের শূন্যতার দিকে রহিয়া রহিয়া কটাক্ষ করিতে করিতে মজুমদারের সর্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। কোনোমতে আড়ষ্ট হইয়া নিজের শরীরটাকে যতদূর সংকীর্ণ করিতে হয় তাহা সে করিল, কিন্তু সে যতটুকু জায়গা ছাড়িয়া দিল ততটুকু জায়গা ভরিয়া উঠিল। মজুমদার মনে মনে তর্ক করিতে লাগিল যে, কোন্‌ প্রাচীন য়ুরোপীয় জ্ঞানী বলিয়াছেন Nature abhors vacum—তাই তো দেখিতেছি। কিন্তু এটা কী রে ! এটা কি Nature ? যদি আমাকে কিছু না বলে তবে আমি এখনই ইহাকে সমস্ত জায়গাটা ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া পড়ি। লাফ দিতে সাহস হইল না—পাছে পিছনের দিক হইতে অভাবিতপূর্ব একটা কিছু ঘটে। 'পাহারাওয়ালা' বলিয়া ডাক দিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু বহুকষ্টে এমনি একটুখানি অদ্ভুত ক্ষীণ আওয়াজ বাহির হইল যে, অত্যন্ত ভয়ের মধ্যেও তাহার হাসি পাইল। অন্ধকারে ময়দানের গাছগুলো ভূতের নিস্তব্ধ পার্লামেন্টের মতো পরস্পর মুখামুখি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এবং গ্যাসের খুঁটিগুলো সমস্তই যেন জানে অথচ কিছুই যেন বলিবে না এমনিভাবে খাড়া হইয়া মিট্‌মিটে আলোকশিখায় চোখ টিপিতে লাগিল। মজুমদার মনে করিল, চট্‌ করিয়া এক লম্ফে সামনের আসনে গিয়া বসিবে। যেমনি মনে করা অমনি অনুভব করিল, সামনের আসন হইতে কেবলমাত্র একটা চাহনি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। চক্ষু নাই, কিছুই নাই, অথচ একটা চাহনি। সে চাহনি যে কাহার তাহা যেন মনে পড়িতেছে অথচ কোনোমতেই যেন মনে আনিতে পারিতেছে না। মজুমদার দুই চক্ষু জোর করিয়া বুজিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু ভয়ে বুজিতে পারিল না—সেই অনির্দেশ্য চাহনির দিকে দুই চোখ এমন শক্ত করিয়া মেলিয়া রহিল যে, নিমেষ ফেলিতে সময় পাইল না।

এ দিকে গাড়িটা কেবলই ময়দানের রাস্তার উত্তর হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে চক্রপথে ঘুরিতে লাগিল। ঘোড়া দুটো ক্রমেই যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল—তাহাদের বেগ কেবলই বাড়িয়া চলিল—গাড়ির খড়খড়িগুলো থরথর করিয়া কাঁপিয়া ঝরঝর শব্দ করিতে লাগিল।

এমন সময় গাড়িটা যেন কিসের উপর খুব একটা ধাক্কা হইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। মজুমদার চকিত হইয়া দেখিল, তাহাদেরই রাস্তায় গাড়ি দাঁড়াইয়াছে ও গাড়োয়ান তাহাকে নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, "সাহেব, কোথায় যাইতে হইবে বলো।"

মজুমদার রাগিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতক্ষণ ধরিয়া আমাকে ময়দানের মধ্যে ঘুরাইলি কেন।"

গাড়োয়ান আশ্চর্য হইয়া কহিল, "কই, ময়দানের মধ্যে তো ঘুরাই নাই।"

মজুমদার বিশ্বাস না করিয়া কহিল, "তবে এ কি শুধু স্বপ্ন।"

গাড়োয়ান একটু ভাবিয়া ভীত হইয়া কহিল, "বাবুসাহেব, বুঝি শুধু স্বপ্ন নহে। আমার এই গাড়িতেই আজ তিন বছর হইল একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল।"

মজুমদারের তখন নেশা ও ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যাওয়াতে গাড়োয়ানের গল্পে কর্ণপাত না করিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু রাত্রে তাহার ভালো করিয়া ঘুম হইল না—কেবলই ভাবিতে লাগিল, সেই চাহনিটা কার।

১

অধর মজুমদারের বাপ সামান্য শিপ-সরকারি হইতে আরম্ভ করিয়া একটা বড়ো হৌসের মুচ্ছুদ্দিগিরি পর্যন্ত উঠিয়াছিলেন। অধরবাবু বাপের উপার্জিত নগদ টাকা সুদে খাটাইতেছেন, তাঁহাকে আর নিজে খাটিতে হয় না। বাপ মাথায় সাদা ফেটা বাঁধিয়া পালকিতে করিয়া আপিসে যাইতেন, এ দিকে তাঁহার ক্রিয়াকর্ম দানধ্যান যথেষ্ট ছিল। বিপদে-আপদে অভাবে-অনটনে সকল শ্রেণীর লোকেই যে তাঁহাকে আসিয়া ধরিয়া পড়িত, ইহাই তিনি গর্বের বিষয় মনে করিতেন।

অধরবাবু বড়ো বাড়ি ও গাড়ি-জুড়ি করিয়াছেন, কিন্তু লোকের সঙ্গে আর তাঁহার সম্পর্ক নাই; কেবল টাকা-ধারের দালাল আসিয়া তাঁহার বাঁধানো হুঁকায় তামাক টানিয়া যায় এবং অ্যাটর্নি আপিসের বাবুদের সঙ্গে স্ট্যাম্প-দেওয়া দলিলের শর্ত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। তাঁহার সংসারে খরচপত্র সম্বন্ধে হিসাবের এমনি কষাকষি যে পাড়ার ফুটবল ক্লাবের নাছোড়বান্দা ছেলেরাও বহু চেষ্টায় তাঁহার তহবিলে দন্তস্ফুট করিতে পারে নাই।

এমন সময় তাঁহার ঘরকন্নার মধ্যে একটি অতিথির আগমন হইল। ছেলে হল না, হল না, করিতে করিতে অনেকদিন পরে তাঁহার একটি ছেলে জন্মিল। ছেলেটির চেহারা তাহার মার ধরনের। বড়ো বড়ো চোখ, টিকলো নাক, রঙ রজনীগন্ধার পাপড়ির মতো—যে দেখিল সেই বলিল, "আহা ছেলে তো নয়, যেন কার্তিক।" অধরবাবুর অনুগত অনুচর রতিকান্ত বলিল, "বড়ো ঘরের ছেলের যেমনটি হওয়া উচিত তেমনই হইয়াছে।"

ছেলেটির নাম হইল বেণুগোপাল। ইতিপূর্বে অধরবাবুর স্ত্রী ননীবালা সংসারখরচ লইয়া স্বামীর বিরুদ্ধে নিজের মত তেমন জোর করিয়া কোনোদিন খাটান নাই। দুটো-একটা শখের ব্যাপার অথবা লৌকিকতার অত্যাবশ্যক আয়োজন লইয়া মাঝে মাঝে বচসা হইয়াছে বটে, কিন্তু শেষকালে স্বামীর কৃপণতার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া নিঃশব্দে হার মানিয়াছেন।

এবারে ননীবালাকে অধরলাল আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, বেণুগোপাল সম্বন্ধে তাঁহার হিসাব এক-এক পা করিয়া হঠিতে লাগিল। তাহার পায়ের মল, হাতের বালা, গলার হার, মাথার টুপি, তাহার দিশি বিলাতি নানা রকমের নানা রঙের সাজসজ্জা সম্বন্ধে ননীবালা যাহা-কিছু দাবি উত্থাপিত করিলেন, সব কটাই তিনি কখনও নীরব অশ্রুপাতে, কখনও সরব বাক্যবর্ষণে জিতিয়া লইলেন। বেণুগোপালের জন্য যাহা দরকার এবং যাহা দরকার নয় তাহা চাইই চাই—সেখানে শূন্য তহবিলের ওজর বা ভবিষ্যতের ফাঁকা আশ্বাস একদিনও খাটিল না।

২

বেণুগোপাল বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বেণুর জন্য খরচ করাটা অধরলালের অভ্যাস হইয়া আসিল। তাহার জন্য বেশি মাহিনা দিয়া অনেক-পাস-করা এক বুড়ো মাস্টার রাখিলেন। এই মাস্টার বেণুকে মিষ্টভাষায় ও শিষ্টাচারে বশ করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন—কিন্তু তিনি নাকি বরাবর ছাত্রদিগকে কড়া শাসনে চালাইয়া আজ পর্যন্ত মাস্টারি মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিয়াছেন, সেইজন্যে তাঁহার ভাষার মিষ্টতা ও আচারের শিষ্টতায় কেবলই বেসুর লাগিল—সেই শুষ্ক সাধনায় ছেলে ভুলিল না। ননীবালা অধরলালকে কহিলেন, "ও তোমার কেমন মাস্টার। ওকে দেখিলেই যে ছেলে অস্থির হইয়া উঠে। ওকে ছাড়াইয়া দাও।"

বুড়া মাস্টার বিদায় হইল। সেকালে মেয়ে যেমন স্বয়ম্বরা হইত তেমনি ননীবালার ছেলে স্বয়ম্মাস্টার হইতে বসিল—সে যাহাকে না বরিয়া লইবে তাহার সকল পাস ও সকল সার্টিফিকেট বৃথা।

এমনি সময়টিতে গায়ে একখানি ময়লা চাদর ও পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতা পরিয়া মাস্টারির উমেদারিতে হরলাল আসিয়া জুটিল। তাহার বিধবা মা পরের বাড়িতে রাঁধিয়া ও ধান ভানিয়া তাহাকে মফস্বলের এন্‌ট্রেন্স স্কুলে কোনোমতে এন্‌ট্রেন্স পাস করাইয়াছে। এখন হরলাল কলিকাতায়

কলেজে পড়িবে বলিয়া প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছে। অনাহারে তাহার মুখের নিম্ন অংশ শুকাইয়া ভারতবর্ষের কন্যাকুমারীর মতো সরু হইয়া আসিয়াছে, কেবল মস্ত কপালটা হিমালয়ের মতো প্রশস্ত হইয়া অত্যন্ত চোখে পড়িতেছে। মরুভূমির বালু হইতে সূর্যের আলো যেমন ঠিকরিয়া পড়ে তেমনি তাহার দুই চক্ষু হইতে দৈন্যের একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি বাহির হইতেছে।

দরোয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কী চাও। কাহাকে চাও।" হরলাল ভয়ে ভয়ে বলিল, "বাড়ির বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চাই।" দরোয়ান কহিল, "দেখা হইবে না।" তাহার উত্তরে হরলাল কী বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া ইতস্তত করিতেছিল এমন সময় সাত বছরের ছেলে বেণুগোপাল বাগানে খেলা সারিয়া দেউড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দরোয়ান হরলালকে দ্বিধা করিতে দেখিয়া আবার কহিল, "বাবু, চলা যাও।"

বেণুর হঠাৎ জিদ চড়িল— সে কহিল, "নেহি জায়গা !" বলিয়া সে হরলালের হাত ধরিয়া তাহাকে দোতলার বারান্দায় তাহার বাপের কাছে লইয়া হাজির করিল।

বাবু তখন দিবানিদ্রা সারিয়া জড়ালসভাবে বারান্দায় বেতের কেদারায় চুপচাপ বসিয়া পা দোলাইতেছিলেন ও বৃদ্ধ রতিকান্ত একটা কাঠের চৌকিতে আসন হইয়া বসিয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতেছিল। সেদিন এই সময়ে এই অবস্থায় দৈবক্রমে হরলালের মাস্টারি বাহাল হইয়া গেল।

রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার পড়া কী পর্যন্ত।"

হরলাল একটুখানি মুখ নিচু করিয়া কহিল, "এন্‌ট্রেন্স পাস করিয়াছি।"

রতিকান্ত ভ্রূ তুলিয়া কহিল, "শুধু এন্‌ট্রেন্স পাস ? আমি বলি কলেজ পড়িয়াছেন। আপনার বয়সও তো নেহাত কম দেখি না।"

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। আশ্রিত ও আশ্রয়প্রত্যাশীদিগকে সকল রকমে পীড়ন করাই রতিকান্তের প্রধান আনন্দ ছিল।

রতিকান্ত আদর করিয়া বেণুকে কোলের কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কত এম. এ. বি. এ. আসিল ও গেল—কাহাকেও পছন্দ হইল না—আর শেষকালে কি সোনাবাবু এন্‌ট্রেন্স-পাস-করা মাস্টারের কাছে পড়িবেন।"

বেণু রতিকান্তের আদরের আকর্ষণ জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, "যাও !" রতিকান্তকে বেণু কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিত না, কিন্তু রতিও বেণুর এই অসহিষ্ণুতাকে তাহার বাল্যমাধুর্যের একটা লক্ষণ বলিয়া ইহাতে খুব আমোদ পাইবার চেষ্টা করিত,এবং তাহাকে সোনাবাবু চাঁদুবাবু বলিয়া খেপাইয়া আগুন করিয়া তুলিত।

হরলালের উমেদারি সফল হওয়া শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল ; সে মনে মনে ভাবিতেছিল, এইবার কোনো সুযোগে চৌকি হইতে উঠিয়া বাহির হইতে পারিলে বাঁচা যায়। এমন সময়ে অধরলালের সহসা মনে হইল, এই ছোকরাটিকে নিতান্ত সামান্য মাহিনা দিলেও পাওয়া যাইবে। শেষকালে স্থির হইল, হরলাল বাড়িতে থাকিবে, খাইবে ও পাঁচ টাকা করিয়া বেতন পাইবে। বাড়িতে রাখিয়া যেটুকু অতিরিক্ত দাক্ষিণ্য প্রকাশ করা হইবে, তাহার বদলে অতিরিক্ত কাজ আদায় করিয়া লইলেই এটুকু দয়া সার্থক হইবে পারিবে।

৩

এবারে মাস্টার টিকিয়া গেল। প্রথম হইতেই হরলালের সঙ্গে বেণুর এমনি জমিয়া গেল যেন তাহারা দুই ভাই। কলিকাতায় হরলালের আত্মীয়বন্ধু কেহই ছিল না—এই সুন্দর ছোটো ছেলেটি তাহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিল। অভাগা হরলালের এমন করিয়া কোনো মানুষকে ভালোবাসিবার সুযোগ ইতিপূর্বে কখনও ঘটে নাই। কী করিলে তাহার অবস্থা ভালো হইবে, এই আশায় সে বহু কষ্টে বই জোগাড় করিয়া কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় দিনরাত শুধু পড়া করিয়াছে। মাকে পরাধীন থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া ছেলের শিশুবয়স কেবল সংকোচেই কাটিয়াছে—নিষেধের গণ্ডি পার হইয়া দুষ্টামির দ্বারা নিজের বাল্যপ্রতাপকে জয়শালী করিবার সুখ সে কোনোদিন পায় নাই। সে কাহারও দলে ছিল

না, সে আপনার ছেঁড়া বই ও ভাঙা শ্লেটের মাঝখানে একলাই ছিল। জগতে জন্মিয়া যে ছেলেকে শিশুকালেই নিস্তব্ধ ভালোমানুষ হইতে হয়, তখন হইতেই মাতার দুঃখ ও নিজের অবস্থা যাহাকে সাবধানে বুঝিয়া চলিতে হয়, সম্পূর্ণ অবিবেচক হইবার স্বাধীনতা যাহার ভাগ্যে কোনোদিন জোটে না, আমোদ করিয়া চঞ্চলতা করা বা দুঃখ পাইয়া কাঁদা, এ দুটোই যাহাকে অন্য লোকের অসুবিধা ও বিরক্তির ভয়ে সমস্ত শিশুশক্তি প্রয়োগ করিয়া চাপিয়া যাইতে হয় তাহার মতো করুণার পাত্র অথচ করুণা হইতে বঞ্চিত জগতে কে আছে!

সেই পৃথিবীর সকল মানুষের নিচে চাপা-পড়া হরলাল নিজেও জানিত না, তাহার মনের মধ্যে এত স্নেহের রস অবসরের অপেক্ষায় এমন করিয়া জমা হইয়া ছিল। বেণুর সঙ্গে খেলা করিয়া, তাহাকে পড়াইয়া, অসুখের সময় তাহার সেবা করিয়া হরলাল স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, নিজের অবস্থার উন্নতি করার চেয়েও মানুষের আর-একটা জিনিস আছে—সে যখন পাইয়া বসে তখন তাহার কাছে আর-কিছুই লাগে না।

বেণুও হরলালকে পাইয়া বাঁচিল। কারণ, ঘরে সে একটি ছেলে; একটি অতি ছোটো ও আর-একটি তিন বছরের বোন আছে—বেণু তাহাদিগকে সঙ্গদানের যোগ্যই মনে করে না। পাড়ার সমবয়সী ছেলের অভাব নাই—কিন্তু অধরলাল নিজের ঘরকে অত্যন্ত বড়ো ঘর বলিয়া নিজের মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখাতে মেলামেশা করিবার উপযুক্ত ছেলে বেণুর ভাগ্যে জুটিল না। কাজেই হরলাল তাহার একমাত্র সঙ্গী হইয়া উঠিল। অনুকূল অবস্থায় বেণুর যে-সকল দৌরাত্ম্য দশ-জনের মধ্যে ভাগ হইয়া একরকম সহনযোগ্য হইতে পারিত তাহা সমস্তই একা হরলালকে বহিতে হইত। এই-সমস্ত উপদ্রব প্রতিদিন সহ্য করিতে করিতে হরলালের স্নেহ আরও দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। রতিকান্ত বলিতে লাগিল, "আমাদের সোনাবাবুকে মাস্টারমশায় মাটি করিতে বসিয়াছেন।" অধরলালেরও মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল, মাস্টারের সঙ্গে ছাত্রের সম্বন্ধটি ঠিক যেন যথোচিত হইতেছে না। কিন্তু হরলালকে বেণুর কাছ হইতে তফাত করে এমন সাধ্য এখন কাহার আছে।

৪

বেণুর বয়স এখন এগারো। হরলাল এফ. এ. পাস করিয়া জলপানি পাইয়া তৃতীয় বার্ষিকে পড়িতেছে। ইতিমধ্যে কলেজে তাহার দুটি-একটি বন্ধু যে জোটে নাই তাহা নহে, কিন্তু ঐ এগারো বছরের ছেলেটিই তাহার সকল বন্ধুর সেরা। কলেজ হইতে ফিরিয়া বেণুকে লইয়া সে গোলদীঘি এবং কোনো-কোনোদিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইত। তাহাকে গ্রীক ইতিহাসের বীরপুরুষদের কাহিনী বলিত, তাহাকে স্কট ও ভিক্টর হ্যুগোর গল্প একটু একটু করিয়া বাংলায় শুনাইত—উচ্চৈঃস্বরে তাহার কাছে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহা তর্জমা করিয়া ব্যাখ্যা করিত, তাহার কাছে শেক্‌সপীয়ারের জুলিয়াস সীজার মানে করিয়া পড়িয়া তাহা হইতে অ্যান্টনির বক্তৃতা মুখস্থ করাইবার চেষ্টা করিত। ঐ একটুখানি বালক হরলালের হৃদয়-উদ্বোধনের পক্ষে যেন সোনার কাঠির মতো হইয়া উঠিল। একলা বসিয়া যখন পড়া মুখস্থ করিত তখন ইংরেজি সাহিত্য সে এমন করিয়া মনের মধ্যে গ্রহণ করে নাই, এখন সে ইতিহাস বিজ্ঞান সাহিত্য যাহা-কিছু পড়ে তাহার মধ্যে কিছু রস পাইলেই সেটা আগে বেণুকে দিবার জন্য আগ্রহ বোধ করে এবং বেণুর মনে সেই আনন্দ সঞ্চার করিবার চেষ্টাতেই তাহার নিজের বুঝিবার শক্তি ও আনন্দের অধিকার যেন দুইগুণ বাড়িয়া যায়।

বেণু ইস্কুল হইতে আসিয়াই কোনোমতে তাড়াতাড়ি জলপান সারিয়াই হরলালের কাছে যাইবার জন্য একেবারে ব্যস্ত হইয়া উঠিত, তাহার মা তাহাকে কোনো ছুতায় কোনো প্রলোভনে অন্তঃপুরে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। ননীবালার ইহা ভালো লাগে নাই। তাহার মনে হইত, হরলাল নিজের চাকরি বজায় রাখিবার জন্যই ছেলেকে এত করিয়া বশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে একদিন হরলালকে ডাকিয়া পর্দার আড়াল হইতে বলিল, "তুমি মাস্টার, ছেলেকে কেবল সকালে এক ঘণ্টা বিকালে এক ঘণ্টা পড়াইবে—দিনরাত্রি উহার সঙ্গে লাগিয়া থাক কেন। আজকাল ও যে মা বাপ কাহাকেও মানে না। ও কেমন শিক্ষা পাইতেছে। আগে যে ছেলে মা বলিতে একেবারে নাচিয়া উঠিত আজ যে তাহাকে ডাকিয়া পাওয়া যায় না। বেণু আমার বড়ো ঘরের ছেলে, উহার সঙ্গে

তোমার অত মাখামাখি কিসের জন্য।”

সেদিন রতিকান্ত অধরবাবুর কাছে গল্প করিতেছিল যে, তাহার জানা তিনচার জন লোক, বড়োমানুষের ছেলের মাস্টারি করিতে আসিয়া ছেলের মন এমন করিয়া বশ করিয়া লইয়াছে যে, ছেলে বিষয়ের অধিকারী হইলে তাহারাই সর্বেসর্বা হইয়া ছেলেকে স্বেচ্ছামত চালাইয়াছে। হরলালের প্রতিই ইশারা করিয়া যে এ-সকল কথা বলা হইতেছিল তাহা হরলালের বুঝিতে বাকি ছিল না। তবু সে চুপ করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ বেণুর মার কথা শুনিয়া তাহার বুক ভাঙিয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল, বড়োমানুষের ঘরে মাস্টারের পদবীটা কী। গোয়ালঘরের ছেলেকে দুধ জোগাইবার যেমন গোরু আছে তেমনি তাহাকে বিদ্যা জোগাইবার একটা মাস্টারও রাখা হইয়াছে—ছাত্রের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন এতোবড়ো একটা স্পর্ধা যে, বাড়ির চাকর হইতে গৃহিণী পর্যন্ত কেহই তাহা সহ্য করিতে পারে না, এবং সকলেই সেটাকে স্বার্থসাধনের একটা চাতুরী বলিয়াই জানে।

হরলাল কম্পিতকণ্ঠে বলিল, “মা, বেণুকে আমি কেবল পড়াইব, তাহার সঙ্গে আমার আর-কোনো সম্পর্ক থাকিবে না।”

সেদিন বিকালে বেণুর সঙ্গে তাহার খেলিবার সময়ে হরলাল কলেজ হইতে ফিরিলই না। কেমন করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া সে সময় কাটাইল তাহা সেই জানে। সন্ধ্যা হইলে যখন সে পড়াইতে আসিল তখন বেণু মুখ ভার করিয়া রহিল। হরলাল তাহার অনুপস্থিতির কোনো জবাবদিহি না করিয়া পড়াইয়া গেল—সেদিন পড়া সুবিধামত হইলই না।

হরলাল প্রতিদিন রাত্রি থাকিতে উঠিয়া তাহার ঘরে বসিয়া পড়া করিত। বেণু সকালে উঠিয়াই মুখ ধুইয়া তাহার কাছে ছুটিয়া যাইত। বাগানে বাঁধানো চৌবাচ্চায় মাছ ছিল। তাহাদিগকে মুড়ি খাওয়ানো ইহাদের এক কাজ ছিল। বাগানের এক কোণে কতকগুলো পাথর সাজাইয়া, ছোটো ছোটো রাস্তা ও ছোটো গেট ও বেড়া তৈরি করিয়া বেণু বালখিল্য ঋষির আশ্রমের উপযুক্ত একটি অতি ছোটো বাগান বসাইয়াছিল। সে বাগানে মালির কোনো অধিকার ছিল না। সকালে এই বাগানের চর্যা করা তাহাদের দ্বিতীয় কাজ। তাহার পরে রৌদ্র বেশি হইলে বাড়ি ফিরিয়া বেণু হরলালের কাছে পড়িতে বসিত। কাল সায়াহ্নে যে গল্পের অংশ শোনা হয় নাই সেইটে শুনিবার জন্য আজ বেণু যথাসাধ্য ভোরে উঠিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, সকালে ওঠায় সে আজ মাস্টারমশায়কে বুঝি জিতিয়াছে। ঘরে আসিয়া দেখিল, মাস্টারমশায় নাই। দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, মাস্টারমশায় বাহির হইয়া গিয়াছেন।

সেদিনও সকালে পড়ার সময় বেণু ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর বেদনা লইয়া মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল। সকালবেলায় হরলাল কেন যে বাহির হইয়া গিয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসা করিল না। হরলাল বেণুর মুখের দিকে না চাহিয়া বইয়ের পাতার উপর চোখ রাখিয়া পড়াইয়া গেল। বেণু বাড়ির ভিতরে তাহার মার কাছে যখন খাইতে বসিল তখন তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাল বিকাল হইতে তোর কী হইয়াছে বল্ দেখি। মুখ হাঁড়ি করিয়া আছিস কেন—ভালো করিয়া খাইতেছিস না—ব্যাপারখানা কী।”

বেণু কোনো উত্তর করিল না। আহারের পর মা তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক আদর করিয়া যখন তাহাকে বারবার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন তখন সে আর থাকিতে পারিল না—ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, “মাস্টারমশায়—”

মা কহিলেন, “মাস্টারমশায় কী।”

বেণু বলিতে পারিল না মাস্টারমশায় কী করিয়াছেন। কী যে অভিযোগ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন।

ননীবালা কহিলেন, “মাস্টারমশায় বুঝি তোর মার নামে তোর কাছে লাগাইয়াছেন।”

সে কথার কোনো অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বেণু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

৫

ইতিমধ্যে বাড়িতে অধরবাবুর কতকগুলা কাপড়চোপড় চুরি হইয়া গেল। পুলিসকে খবর দেওয়া হইল। পুলিস খানাতল্লাসিতে হরলালেরও বাক্স সন্ধান করিতে ছাড়িল না। রতিকান্ত নিতান্তই নিরীহভাবে বলিল, "যে লোক লইয়াছে সে কি আর মাল বাক্সর মধ্যে রাখিয়াছে।"

মালের কোনো কিনারা হইল না। এরূপ লোকসান অধরলালের পক্ষে অসহ্য। তিনি পৃথিবীসুদ্ধ লোকের উপর চটিয়া উঠিলেন। রতিকান্ত কহিল, "বাড়িতে অনেক লোক রহিয়াছে, কাহাকেই বা দোষ দিবেন, কাহাকেই বা সন্দেহ করিবেন। যাহার যখন খুশি আসিতেছে যাইতেছে।"

অধরলাল মাস্টারকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখো হরলাল, তোমাদের কাহাকেও বাড়িতে রাখা আমার পক্ষে সুবিধা হইবে না। এখন হইতে তুমি আলাদা বাসায় থাকিয়া বেণুকে ঠিক সময়মত পড়াইয়া যাইবে, এই হইলেই ভালো হয়—না হয় আমি তোমার দুই টাকা মাইনে বৃদ্ধি করিয়া দিতে রাজি আছি।"

রতিকান্ত তামাক টানিতে টানিতে বলিল, "এ তো' অতি ভালো কথা—উভয়পক্ষেই ভালো।"

হরলাল মুখ নিচু করিয়া শুনিল। তখন কিছু বলিতে পারিল না। ঘরে আসিয়া অধরবাবুকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল, নানা কারণে বেণুকে পড়ানো তাহার পক্ষে সুবিধা হইবে না—অতএব আজই সে বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

সেদিন বেণু ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মাস্টারমশায়ের ঘর শূন্য। তাঁহার সেই ভগ্নপ্রায় টিনের পেঁটরাটিও নাই। দড়ির উপর তাঁহার চাদর ও গামছা ঝুলিত, সে দড়িটা আছে, কিন্তু চাদর ও গামছা নাই। টেবিলের উপর খাতাপত্র ও বই এলোমেলো ছড়ানো থাকিত, তাহার বদলে সেখানে একটা বড়ো বোতলের মধ্যে সোনালি মাছ ঝক্‌ঝক্‌ করিতে করিতে ওঠানামা করিতেছে। বোতলের গায়ের উপর মাস্টারমশায়ের হস্তাক্ষরে বেণুর নাম-লেখা একটা কাগজ আঁটা। আর-একটি নূতন ভালো বাঁধাই করা ইংরেজি ছবির বই, তাহার ভিতরকার পাতায় এক প্রান্তে বেণুর নাম ও তাহার নিচে আজকের তারিখ মাস ও সন দেওয়া আছে।

বেণু ছুটিয়া তাহার বাপের কাছে গিয়া কহিল, "বাবা, মাস্টারমশায় কোথায় গেছেন।" বাপ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "তিনি কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেছেন।"

বেণু বাপের হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাশের ঘরে বিছানার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অধরবাবু ব্যাকুল হইয়া কী করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় হরলাল একটা মেসের ঘরে তক্তপোশের উপর উন্মনা হইয়া বসিয়া কলেজে যাইবে কি না ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ দেখিল প্রথমে অধরবাবুদের দরোয়ান ঘরে প্রবেশ করিল এবং তাহার পিছনে বেণু ঘরে ঢুকিয়াই হরলালের গলা জড়াইয়া ধরিল। হরলালের গলার স্বর আটকাইয়া গেল ; কথা কহিতে গেলেই তাহার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িবে এই ভয়ে সে কোনো কথাই কহিতে পারিল না। বেণু কহিল, "মাস্টারমশায়, আমাদের বাড়ি চলো।"

বেণু তাহাদের বৃদ্ধ দরোয়ান চন্দ্রভানকে ধরিয়া পড়িয়াছিল, যেমন করিয়া হউক, মাস্টারমশায়ের বাড়িতে তাহাকে লইয়া যাইতে হইবে। পাড়ার যে মুটে হরলালের পেঁটরা বহিয়া আনিয়াছিল তাহার কাছ হইতে সন্ধান লইয়া আজ ইস্কুলে যাইবার গাড়িতে চন্দ্রভান বেণুকে হরলালের মেসে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে।

কেন যে হরলালের পক্ষে বেণুদের বাড়ি যাওয়া একেবারেই অসম্ভব তাহা সে বলিতেও পারিল না, অথচ তাহাদের বাড়িতেও যাইতে পারিল না। বেণু যে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বলিয়াছিল 'আমাদের বাড়ি চলো'—এই স্পর্শ ও এই কথাটার স্মৃতি কত দিনে কত রাত্রে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া যেন তাহার নিশ্বাস রোধ করিয়াছে—কিন্তু ক্রমে এমনও দিন আসিল যখন দুই পক্ষেই সমস্ত চুকিয়া গেল—বক্ষের শিরা আঁকড়াইয়া ধরিয়া বেদনা নিশাচর বাদুড়ের মতো আর ঝুলিয়া রহিল না।

৬

হরলাল অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়াতে আর তেমন করিয়া মনোযোগ করিতে পারিল না। সে কোনোমতেই স্থির হইয়া পড়িতে বসিতে পারিত না। সে খানিকটা পড়িবার চেষ্টা করিয়াই ধাঁ করিয়া বই বন্ধ করিয়া ফেলিত এবং অকারণে দ্রুতপদে রাস্তায় ঘুরিয়া আসিত। কলেজে লেক্‌চারের নোটের মাঝে মাঝে খুব বড়ো বড়ো ফাঁক পড়িত এবং মাঝে মাঝে যে-সমস্ত আঁকজোক পাড়িত তাহার সঙ্গে প্রাচীন ইজিপ্টের চিত্রলিপি ছাড়া আর কোনো বর্ণমালার সাদৃশ্য ছিল না।

হরলাল বুঝিল, এ-সমস্ত ভালো লক্ষণ নয়। পরীক্ষায় সে যদি-বা পাস হয় বৃত্তি পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। বৃত্তি না পাইলে কলিকাতায় তাহার একদিনও চলিবে না। ও দিকে দেশে মাকেও দু-চার টাকা পাঠানো চাই। নানা চিন্তা করিয়া চাকরির চেষ্টায় বাহির হইল। চাকরি পাওয়া কঠিন, কিন্তু না পাওয়া তাহার পক্ষে আরও কঠিন ; এইজন্য আশা ছাড়িয়াও আশা ছাড়িতে পারিল না।

হরলালের সৌভাগ্যক্রমে একটি বড়ো ইংরেজ সদাগরের আপিসে উমেদারি করিতে গিয়া হঠাৎ সে বড়োসাহেবের নজরে পড়িল। সাহেবের বিশ্বাস ছিল, তিনি মুখ দেখিয়া লোক চিনিতে পারেন। হরলালকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে দু-চার কথা কহিয়াই তিনি মনে মনে বলিলেন, এ লোকটা চলিবে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাজ জানা আছে ?" হরলাল কহিল, "না।" "জামিন দিতে পারিবে ?" তাহার উত্তরেও "না"। "কোনো বড়োলোকের কাছ হইতে সার্টিফিকেট আনিতে পার ?" কোনো বড়োলোককেই সে জানে না।

শুনিয়া সাহেব আরও যেন খুশি হইয়াই কহিলেন, "আচ্ছা বেশ, পঁচিশ টাকা বেতনে কাজ আরম্ভ করো, কাজ শিখিলে উন্নতি হইবে।" তার পরে সাহেব তাহার বেশভূষার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "পনেরো টাকা আগাম দিতেছি— আপিসের উপযুক্ত কাপড় তৈরি করাইয়া লইবে।"

কাপড় তৈরি হইল, হরলাল আপিসেও বাহির হইতে আরম্ভ করিল। বড়োসাহেব তাহাকে ভূতের মতো খাটাইতে লাগিলেন। অন্য কেরানিরা বাড়ি গেলেও হরলালের ছুটি ছিল না। এক-একদিন সাহেবের বাড়ি গিয়াও তাঁহাকে কাজ বুঝাইয়া দিয়া আসিতে হইত।

এমনি করিয়া কাজ শিখিয়া লইতে হরলালের বিলম্ব হইল না। তাহার সহযোগী কেরানিরা তাহাকে ঠকাইবার অনেক চেষ্টা করিল, তাহার বিরুদ্ধে উপরওয়ালাদের কাছে লাগালাগিও করিল, কিন্তু এই নিঃশব্দ নিরীহ সামান্য হরলালের কোনো অপকার করিতে পারিল না।

যখন তাহার চল্লিশ টাকা মাহিনা হইল, তখন হরলাল দেশ হইতে মাকে আনিয়া একটি ছোটোখাটো গলির মধ্যে ছোটোখাটো বাড়িতে বাসা করিল। এতদিন পরে তাহার মার দুঃখ ঘুচিল। মা বলিলেন, "বাবা, এইবার বউ ঘরে আনিব।" হরলাল মাতার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, "মা, ঐটে মাপ করিতে হইবে।"

মাতার আর একটি অনুরোধ ছিল। তিনি বলিতেন, "তুই যে দিনরাত তোর ছাত্র বেণুগোপালের গল্প করিস, তাহাকে একবার নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়া। তাহাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা করে।"

হরলাল কহিল, "মা, এ বাসায় তাহাকে কোথায় বসাইব। রোসো, একটা বড়ো বাসা করি, তাহার পরে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিব।"

৭

হরলালের বেতনবৃদ্ধির সঙ্গে ছোটো গলি হইতে বড়ো গলি ও ছোটো বাড়ি হইতে বড়ো বাড়িতে তাহার বাস-পরিবর্তন হইল। তবু সে কী জানি কী মনে করিয়া, অধরলালের বাড়ি যাইতে বা বেণুকে নিজের বাসায় ডাকিয়া আনিতে কোনোমতেই মন স্থির করিতে পারিল না।

হয়তো কোনোদিনই তাহার সংকোচ ঘুচিত না। এমন সময়ে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল বেণুর মা মারা গিয়াছে। শুনিয়া মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া সে অধরলালের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

এই দুই অসমবয়সী বন্ধুতে অনেকদিন পরে আবার একবার মিলন হইল। বেণুর অশৌচের সময়

পার হইয়া গেল—তবু এ বাড়িতে হরলালের যাতায়াত চলিতে লাগিল। কিন্তু ঠিক তেমনটি আর কিছুই নাই। বেণু এখন বড়ো হইয়া উঠিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী-যোগে তাহার নূতন গোঁফের রেখার সাধ্যসাধনা করিতেছে। চালচলনে বাবুয়ানা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন তাহার উপযুক্ত বন্ধুবান্ধবেরও অভাব নাই। ফোনোগ্রাফে থিয়েটারের নটীদের ইতর গান বাজাইয়া সে বন্ধুমহলকে আমোদে রাখে। পড়িবার ঘরে সেই সাবেক ভাঙা চৌকি ও দাগি টেবিল কোথায় গেল। আয়নাতে, ছবিতে, আসবাবে ঘর যেন ছাতি ফুলাইয়া রহিয়াছে। বেণু এখন কলেজে যায় কিন্তু দ্বিতীয় বার্ষিকের সীমানা পার হইবার জন্য তাহার কোনো তাগিদ দেখা যায় না। বাপ স্থির করিয়া আছেন, দুই-একটা পাস করাইয়া লইয়া বিবাহের হাটে ছেলের বাজারদর বাড়াইয়া তুলিবেন। কিন্তু ছেলের মা জানিতেন ও স্পষ্ট করিয়া বলিতেন, "আমার বেণুকে সামান্য লোকের ছেলের মতো গৌরব প্রমাণ করিবার জন্য পাসের হিসাব দিতে হইবে না—লোহার সিন্দুকে কোম্পানির কাগজ অক্ষয় হইয়া থাক্।" ছেলেও মাতার এ কথাটা বেশ করিয়া মনে মনে বুঝিয়া লইয়াছিল।

যাহা হউক, বেণুর পক্ষে সে যে আজ নিতান্তই অনাবশ্যক তাহা হরলাল স্পষ্টই বুঝিতে পারিল এবং কেবলই থাকিয়া থাকিয়া সেই দিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন বেণু হঠাৎ সকালবেলায় তাহার সেই মেসের বাসায় গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, 'মাস্টারমশায় আমাদের বাড়ি চলো'। সে বেণু নাই, সে বাড়ি নাই, এখন মাস্টারমশায়কে কেই-বা ডাকিবে।

হরলাল মনে করিয়াছিল, এইবার বেণুকে তাহাদের বাসায় মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিবে। কিন্তু তাহাকে আহ্বান করিবার জোর পাইল না। একবার ভাবিল, উহাকে আসিতে বলিব ; তাহার পরে ভাবিল, বলিয়া লাভ কী—বেণু হয়তো নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবে, কিন্তু, থাক্।

হরলালের মা ছাড়িলেন না। তিনি বারবার বলিতে লাগিলেন, তিনি নিজের হাতে রাঁধিয়া তাহাকে খাওয়াইবেন—আহা, বাছার মা মারা গেছে।

অবশেষে হরলাল একদিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। কহিল, "অধরবাবুর কাছ হইতে অনুমতি লইয়া আসি।" বেণু কহিল, "অনুমতি লইবে হইবে না, আপনি কি মনে করেন আমি এখনও সেই খোকাবাবু আছি।"

হরলালের বাসায় বেণু খাইতে আসিল। মা এই কার্তিকের মতো ছেলেটিকে তাঁহার দুই স্নিগ্ধচক্ষুর আশীর্বাদে অভিষিক্ত করিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, আহা, এই বয়সের এমন ছেলেকে ফেলিয়া ইহার মা যখন মরিল তখন তাহার প্রাণ না জানি কেমন করিতেছিল।

আহার সারিয়াই বেণু কহিল, "মাস্টারমশায়, আমাকে আজ একটু সকালসকাল যাইতে হইবে। আমার দুই-একজন বন্ধুর আসিবার কথা আছে।"

বলিয়া পকেট হইতে সোনার ঘড়ি খুলিয়া একবার সময় দেখিয়া লইল ; তাহার পরে সংক্ষেপে বিদায় লইয়া জুড়িগাড়িতে চড়িয়া বসিল। হরলাল তাহার বাসার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ি সমস্ত গলিকে কাঁপাইয়া দিয়া মুহূর্তের মধ্যেই চোখের বাহির হইয়া গেল।

মা কহিলেন, "হরলাল, উহাকে মাঝে মাঝে ডাকিয়া আনিস। এই বয়সে উহার মা মারা গেছে মনে করিলে আমার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে।"

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। এই মাতৃহীন ছেলেটিকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সে কোনো প্রয়োজন বোধ করিল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল, "বাস্, এই পর্যন্ত। আর কখনও ডাকিব না। একদিন পাঁচ টাকা মাইনের মাস্টারি করিয়াছিলাম বটে—কিন্তু আমি সামান্য হরলাল মাত্র।'

৮

একদিন সন্ধ্যার পর হরলাল আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার একতলার ঘরে অন্ধকারে কে একজন বসিয়া আছে। সেখানে যে কোনো লোক আছে তাহা লক্ষ্য না করিয়াই সে বোধ হয় উপরে উঠিয়া যাইত, কিন্তু দরজায় ঢুকিয়াই দেখিল এসেন্সের গন্ধে আকাশ পূর্ণ। ঘরে

প্রবেশ করিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "কে মশায় ।" বেণু বলিয়া উঠিল, "মাস্টারমশায়, আমি ।"
হরলাল কহিল, "এ কী ব্যাপার । কখন আসিয়াছ ।"
বেণু কহিল, "অনেকক্ষণ আসিয়াছি । আপনি যে এত দেরি করিয়া আপিস হইতে ফেরেন তাহা তো আমি জানিতাম না ।"
বহুকাল হইল সেই-যে নিমন্ত্রণ খাইয়া গেছে তাহার পরে আর একবারও বেণু এ বাসায় আসে নাই । বলা নাই, কহা নাই, আজ হঠাৎ এমন করিয়া সে যে সন্ধ্যার সময় এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে ইহাতে হরলালের মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল ।
উপরের ঘরে গিয়া বাতি জ্বালিয়া দুইজনে বসিল । হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "সব ভালো তো? কিছু বিশেষ খবর আছে?"
বেণু কহিল, পড়াশুনা ক্রমে তাহার পক্ষে বড়োই একঘেয়ে হইয়া আসিয়াছে । কাঁহাতক সে বৎসরের পর বৎসর ঐ সেকেন্ড ইয়ারেই আটকা পড়িয়া থাকে । তাহার চেয়ে অনেক বয়সে-ছোটো ছেলের সঙ্গে তাহাকে একসঙ্গে পড়িতে হয়—তাহার বড়ো লজ্জা করে । কিন্তু বাবা কিছুতেই বোঝেন না ।
হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কী ইচ্ছা ।"
বেণু কহিল, তাহার ইচ্ছা সে বিলাত যায়, বারিস্টার হইয়া আসে । তাহারই সঙ্গে একসঙ্গে পড়িত, এমন-কি তাহার চেয়ে পড়াশুনায় অনেক কাঁচা একটি ছেলে বিলাতে যাইবে স্থির হইয়া গেছে ।
হরলাল কহিল, "তোমার বাবাকে তোমার ইচ্ছা জানাইয়াছ?"
বেণু কহিল, "জানাইয়াছি । বাবা বলেন, পাস না করিলে বিলাতে যাইবার প্রস্তাব তিনি কানে আনিবেন না । কিন্তু আমার মন খারাপ হইয়া গেছে— এখানে থাকিলে আমি কিছুতেই পাস করিতে পারিব না ।"
হরলাল চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল । বেণু কহিল, "আজ এই কথা লইয়া বাবা আমাকে যাহা মুখে আসিয়াছে তাহাই বলিয়াছেন । তাই আমি বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি । মা থাকিলে এমন কখনোই হইতে পারিত না ।" বলিতে বলিতে সে অভিমানে কাঁদিতে লাগিল ।
হরলাল কহিল, "চলো আমি-সুদ্ধ তোমার বাবার কাছে যাই, পরামর্শ করিয়া যাহা ভালো হয় স্থির করা যাইবে ।"
বেণু কহিল, "না, আমি সেখানে যাইব না ।"
বাপের সঙ্গে রাগারাগি করিয়া হরলালের বাড়িতে আসিয়া বেণু থাকিবে, এ কথাটা হরলালের মোটেই ভালো লাগিল না । অথচ 'আমার বাড়ি থাকিতে পারিবে না' এ কথা বলাও বড়ো শক্ত । হরলাল ভাবিল, 'আর-একটু বাদে মনটা ঠাণ্ডা হইলেই ইহাকে ভুলাইয়া বাড়ি লইয়া যাইব । জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি খাইয়া আসিয়াছ ।"
বেণু কহিল, "না, আমার ক্ষুধা নাই—আমি আজ খাইব না ।"
হরলাল কহিল, "সে কি হয় ।" তাড়াতাড়ি মাকে গিয়া কহিল, "মা বেণু আসিয়াছে, তাহার জন্য কিছু খাবার চাই ।"
শুনিয়া মা ভারি খুশি হইয়া খাবার তৈরি করিতে গেলেন । হরলাল আপিসের কাপড় ছাড়িয়া মুখহাত ধুইয়া বেণুর কাছে আসিয়া বসিল । একটুখানি কাশিয়া একটুখানি ইতস্তত করিয়া সে বেণুর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কহিল, "বেণু, কাজটা ভালো হইতেছে না । বাবার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাড়ি হইতে চলিয়া আসা, এটা তোমার উপযুক্ত নয় ।"
শুনিয়া তখনই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বেণু কহিল, "আপনার এখানে যদি সুবিধা না হয় আমি সতীশের বাড়ি যাইব ।" বলিয়া সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল । হরলাল তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "রোসো, কিছু খাইয়া যাও ।"
বেণু রাগ করিয়া কহিল, "না, আমি খাইতে পারিব না ।" বলিয়া হাত ছাড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল ।
এমন সময় হরলালের জন্য যে জলখাবার প্রস্তুত ছিল তাহাই বেণুর জন্য থালায় গুছাইয়া মা তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । কহিলেন, "কোথায় যাও, বাছা ।"

বেণু কহিল, "আমার কাজ আছে, আমি চলিলাম।"

মা কহিলেন, "সে কি হয় বাছা, কিছু না খাইয়া যাইতে পারিবে না।" এই বলিয়া সেই বারান্দায় পাত পাড়িয়া তাহাকে হাতে ধরিয়া খাইতে বসাইলেন।

বেণু রাগ করিয়া কিছু খাইতেছে না, খাবার লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিতেছে মাত্র, এমন সময় দরজার কাছে একটা গাড়ি আসিয়া থামিল। প্রথমে একটা দরোয়ান ও তাহার পশ্চাতে স্বয়ং অধরবাবু মচ্‌মচ্‌ শব্দে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিয়া উপস্থিত। বেণুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

মা ঘরের মধ্যে সরিয়া গেলেন। অধর ছেলের সম্মুখে আসিয়া ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে হরলালের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এই বুঝি! রতিকান্ত আমাকে তখনই বলিয়াছিল, কিন্তু তোমার পেটে যে এত মতলব ছিল তাহা আমি বিশ্বাস করি নাই। তুমি মনে করিয়াছ বেণুকে বশ করিয়া উহার ঘাড় ভাঙিয়া খাইবে। কিন্তু সে হইতে দিব না। ছেলে চুরি করিবে! তোমার নামে পুলিস-কেস করিব, তোমাকে জেলে ঠেলিব তবে ছাড়িব।" এই বলিয়া বেণুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "চল্‌। ওঠ্‌।" বেণু কোনো কথাটি না কহিয়া তাহার বাপের পিছনে পিছনে চলিয়া গেল।

সেদিন কেবল হরলালের মুখেই খাবার উঠিল না।

৯

এবারে হরলালের সদাগর-আপিস কী জানি কী কারণে মফস্বল হইতে প্রচুর পরিমাণে চাল ডাল খরিদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে হরলালকে প্রতি সপ্তাহেই শনিবার ভোরের গাড়িতে সাত-আট হাজার টাকা লইয়া মফস্বলে যাইতে হইত। পাইকেরদিগকে হাতে হাতে দাম চুকাইয়া দিবার জন্য মফস্বলের একটা বিশেষ কেন্দ্রে তাহাদের যে আপিস আছে সেইখানে দশ ও পাঁচ টাকার নোট ও নগদ টাকা লইয়া সে যাইত, সেখানে রসিদ ও খাতা দেখিয়া গত সপ্তাহের মোটা হিসাব মিলাইয়া, বর্তমান সপ্তাহের কাজ চালাইবার জন্য টাকা রাখিয়া আসিত। সঙ্গে আপিসের দুইজন দরোয়ান যাইত। হরলালের জামিন নাই বলিয়া আপিসে একটা কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু বড়সাহেব নিজের উপর সমস্ত ঝুঁকি লইয়া বলিয়াছিলেন—হরলালের জামিনের প্রয়োজন নাই।

মাঘ মাস হইতে এইভাবে কাজ চলিতেছে, চৈত্র পর্যন্ত চলিবে এমন সম্ভাবনা আছে। এই ব্যাপার লইয়া হরলাল বিশেষ ব্যস্ত ছিল। প্রায়ই তাহাকে অনেক রাত্রে আপিস হইতে ফিরিতে হইত।

একদিন এইরূপ রাত্রে ফিরিয়া শুনিল বেণু আসিয়াছিল, মা তাহাকে খাওয়াইয়া যত্ন করিয়া বসাইয়াছিলেন—সেদিন তাহার সঙ্গে কথাবার্তা গল্প করিয়া তাহার প্রতি তাঁহার মন আরও স্নেহে আকৃষ্ট হইয়াছে।

এমন আরও দুই-একদিন হইতে লাগিল। মা বলিলেন, "বাড়িতে মা ন'ই নাকি, সেইজন্য সেখানে তাহার মন টেঁকে না। আমি বেণুকে তোর ছোটো ভাইয়ের মতো, আপন ছেলের মতোই দেখি। সেই স্নেহ পাইয়া আমাকে কেবল মা বলিয়া ডাকিবার জন্য এখানে আসে।" এই বলিয়া আঁচলের প্রান্ত দিয়া তিনি চোখ মুছিলেন।

হরলালের একদিন বেণুর সঙ্গে দেখা হইল। সেদিন সে অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল। অনেক রাত পর্যন্ত কথাবার্তা হইল। বেণু বলিল, "বাবা আজকাল এমন হইয়া উঠিয়াছেন যে আমি কিছুতেই বাড়িতে টিকিতে পারিতেছি না। বিশেষত শুনিতে পাইতেছি, তিনি বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রতিবাবু সম্বন্ধ লইয়া আসিতেছেন—তাঁহার সঙ্গে কেবলই পরামর্শ চলিতেছে। পূর্বে আমি কোথাও গিয়া দেরি করিলে বাবা অস্থির হইয়া উঠিতেন, এখন যদি আমি দুই-চারিদিন বাড়িতে না ফিরি তাহা হইলে তিনি আরাম বোধ করেন। আমি বাড়ি থাকিলে বিবাহের আলোচনা সাবধানে করিতে হয় বলিয়া আমি না থাকিলে তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। এ বিবাহ যদি হয় তবে আমি বাড়িতে থাকিতে পারিব না। আমাকে আপনি উদ্ধারের একটা পথ দেখাইয়া দিন— আমি স্বতন্ত্র হইতে চাই।"

স্নেহে ও বেদনায় হরলালের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সংকটের সময় আর-সকলকে ফেলিয়া

বেণু যে তাহার সেই মাস্টারমশায়ের কাছে আসিয়াছে, ইহাতে কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আনন্দ হইল। কিন্তু মাস্টারমশায়ের কতটুকুই বা সাধ্য আছে।

বেণু কহিল, "যেমন করিয়া হোক, বিলাতে গিয়া বারিস্টার হইয়া আসিলে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাই।"

হরলাল কহিল, "অধরবাবু কি যাইতে দিবেন।"

বেণু কহিল, "আমি চলিয়া গেলে তিনি বাঁচেন। কিন্তু টাকার উপরে যেরকম মায়া, বিলাতের খরচ তাঁহার কাছ হইতে সহজে আদায় হইবে না। একটু কৌশল করিতে হইবে।"

হরলাল বেণুর বিজ্ঞতা দেখিয়া হাসিয়া কহিল, "কী কৌশল।"

বেণু কহিল, "আমি হ্যান্ডনোটে টাকা ধার কবিব। পাওনাদার আমার নামে নালিশ করিলে বাবা তখন দায়ে পড়িয়া শোধ করিবেন। সেই টাকায় পালাইয়া বিলাত যাইব। সেখানে গেলে তিনি খরচ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না।"

হরলাল কহিল, "তোমাকে টাকা ধার দিবে কে।"

বেণু কহিল, "আপনি পারেন না?"

হরলাল আশ্চর্য হইয়া কহিল, "আমি!" মুখে আর কোনো কথা বাহির হইল না।

বেণু কহিল, "কেন, আপনার দরোয়ান তো তোড়ায় করিয়া অনেক টাকা ঘরে আনিল।"

হরলাল হাসিয়া কহিল, "সে দরোয়ানও যেমন আমার, টাকাও তেমনি।"

বলিয়া এই আপিসের টাকার ব্যবহারটা কী তাহা বেণুকে বুঝাইয়া দিল। এই টাকা কেবল একটি রাত্রের জন্যই দরিদ্রের ঘরে আশ্রয় লয়, প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন করে।

বেণু কহিল, "আপনাদের সাহেব আমাকে ধার দিতে পারেন না? নাহয় আমি সুদ বেশি কবিয়া দিব।"

হরলাল কহিল, "তোমার বাপ যদি সিকিউরিটি দেন তাহা হইলে আমার অনুরোধে হয়তো দিতেও পারেন।"

বেণু কহিল, "বাবা যদি সিকিউরিটি দিবেন তো টাকা দিবেন না কেন।"

তর্কটা এইখানেই মিটিয়া গেল। হরলাল মনে মনে ভাবিতে লাগিল, 'আমার যদি কিছু থাকিত, তবে বাড়িঘর জমিজমা সমস্ত বেচিয়া-কিনিয়া টাকা দিতাম।' কিন্তু একটি মাত্র অসুবিধা এই যে, বাড়িঘর জমিজমা কিছুই নাই।

১০

একদিন শুক্রবার রাত্রে হরলালের বাসার সম্মুখে জুড়িগাড়ি দাঁড়াইল। বেণু গাড়ি হইতে নামিবামাত্র হরলালের আপিসের দরোয়ান তাহাকে মস্ত একটা সেলাম করিয়া উপরে বাবুকে শশব্যস্ত হইয়া সংবাদ দিতে গেল। হরলাল তখন তাহার শোবার ঘরে মেজের উপর বসিয়া টাকা মিলাইয়া লইতেছিল। বেণু সেই ঘরেই প্রবেশ করিল। আজ তাহার বেশ কিছু নূতন ধরনের। শৌখিন ধুতিচাদরের বদলে নধর শরীরে পার্শি কোট প্যান্টলুন আঁটিয়া মাথায় ক্যাপ পরিয়া আসিয়াছে। তাহার দুই হাতের আঙুলে মণিমুক্তার আংটি ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। গলা হইতে লম্বিত মোটা সোনার চেনে আবদ্ধ ঘড়ি বুকের পকেটে নিবিষ্ট। কোটের আস্তিনের ভিতর হইতে জামার হাতায় হীরার বোতাম দেখা যাইতেছে।

হরলাল টাকা গোনা বন্ধ করিয়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, "এ কী ব্যাপার। এত রাত্রে এ বেশে যে?"

বেণু কহিল, "পরশু বাবার বিবাহ। তিনি আমার কাছে তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আমি খবর পাইয়াছি। বাবাকে বলিলাম আমি কিছুদিনের জন্য আমাদের বারাকপুরের বাগানে যাইব। শুনিয়া তিনি ভারি খুশি হইয়া রাজি হইয়াছেন। তাই বাগানে চলিয়াছি; ইচ্ছা হইতেছে, আর ফিরিব না। যদি সাহস থাকিত তবে গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিতাম।"

বলিতে বলিতে বেণু কাঁদিয়া ফেলিল। হরলালের বুকে যেন ছুরি বিঁধিতে লাগিল। একজন

অপরিচিত স্ত্রীলোক আসিয়া বেণুর মার ঘর, মার খাট, মার স্থান অধিকার করিয়া লইলে, বেণুর স্নেহস্মৃতিজড়িত বাড়ি যে বেণুর পক্ষে কিরকম কণ্টকময় হইয়া উঠিবে তাহা হরলাল সমস্ত হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারিল। মনে মনে ভাবিল, পৃথিবীতে গরিব হইয়া না জন্মিলেও দুঃখের এবং অপমানের অন্ত নাই। বেণুকে কী বলিয়া যে সান্ত্বনা দিবে তাহা কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া বেণুর হাতখানা নিজের হাতে লইল। লইবামাত্র একটা তর্ক তাহার মনে উদয় হইল। সে ভাবিল, এমন একটা বেদনার সময় বেণু কী করিয়া এত সাজ করিতে পারিল।

হরলাল তাহার আংটির দিকে চোখ রাখিয়াছে দেখিয়া বেণু যেন তাহার মনের প্রশ্নটা আঁচিয়া লইল। সে বলিল, "এই আংটিগুলি আমার মায়ের।"

শুনিয়া হরলাল বহু কষ্টে চোখের জল সামলাইয়া লইল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, "বেণু, খাইয়া আসিয়াছ?"

বেণু কহিল, "হাঁ— আপনার খাওয়া হয় নাই?"

হরলাল কহিল, "টাকাগুলি গনিয়া আয়রন-চেস্টে না তুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে পারিব না।"

বেণু কহিল, "আপনি খাইয়া আসুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আমি ঘরে রহিলাম ; মা আপনার খাবার লইয়া বসিয়া আছেন।"

হরলাল একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "আমি চট্ করিয়া খাইয়া আসিতেছি।"

হরলাল তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া মাকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বেণু তাহাকে প্রণাম করিল, তিনি বেণুর চিবুকের স্পর্শ লইয়া চুম্বন করিলেন। হরলালের কাছে সমস্ত খবর পাইয়া তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। নিজের সমস্ত স্নেহ দিয়াও বেণুর অভাব তিনি পূরণ করিতে পারিবেন না এই তাঁহার দুঃখ।

চারি দিকে ছড়ানো টাকার মধ্যে তিনজনে বসিয়া বেণুর ছেলেবেলাকার গল্প হইতে লাগিল। মাস্টারমশায়ের সঙ্গে জড়িত তাহার কত দিনের কত ঘটনা। তাহার মাঝে মাঝে সেই অসংযতস্নেহশালিনী মার কথাও আসিয়া পড়িতে লাগিল।

এমনি করিয়া রাত অনেক হইয়া গেল। হঠাৎ একসময় ঘড়ি খুলিয়া বেণু কহিল, "আর নয়, দেরি করিলে গাড়ি ফেল করিব।"

হরলালের মা কহিলেন, "বাবা, আজ রাত্রে এইখানেই থাকো-না, কাল সকালে হরলালের সঙ্গে একসঙ্গেই বাহির হইবে।"

বেণু মিনতি করিয়া কহিল, "না মা, এ অনুরোধ করিবেন না, আজ রাত্রে যে করিয়া হউক আমাকে যাইতেই হইবে।"

হরলালকে কহিল, "মাস্টারমশায়, এই আংটি-ঘড়িগুলো বাগানে লইয়া যাওয়া নিরাপদ নয়। আপনার কাছেই রাখিয়া যাই, ফিরিয়া আসিয়া লইয়া যাইব। আপনার দরোয়ানকে বলিয়া দিন, আমার গাড়ি হইতে চামড়ার হ্যাণ্ডব্যাগটা আনিয়া দিক। সেইটের মধ্যে এগুলা রাখিয়া দিই।"

আপিসের দরোয়ান গাড়ি হইতে ব্যাগ লইয়া আসিল। বেণু তাহার চেন ঘড়ি আংটি বোতাম সমস্ত খুলিয়া ব্যাগের মধ্যে পুরিয়া দিল। সতর্ক হরলাল সেই ব্যাগটি লইয়া তখনই আয়রন-সেফের মধ্যে রাখিল।

বেণু হরলালের মার পায়ের ধুলা লইল। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে আশীর্বাদ করিলেন, "মা জগদম্বা তোমার মা হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন।"

তাহার পরে বেণু হরলালের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। আর কোনো-দিন সে হরলালকে এমন করিয়া প্রণাম করে নাই। হরলাল কোনো কথা না বলিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিচে নামিয়া আসিল। গাড়ির লণ্ঠনে আলো জ্বলিল, ঘোড়া দুটা অধীর হইয়া উঠিল। কলিকাতার গ্যাসালোকখচিত নিশীথের মধ্যে বেণুকে লইয়া গাড়ি অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরলাল তাহার ঘরে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া টাকা গনিতে গনিতে ভাগ করিয়া এক-একটা থলিতে ভরতি করিতে লাগিল। নোটগুলা পূর্বেই গনা হইয়া থলিবন্দি হইয়া লোহার সিন্দুকে উঠিয়াছিল।

লোহার সিন্দুকের চাবি মাথার বালিশের নিচে রাখিয়া সেই টাকার ঘরেই হরলাল অনেক রাত্রে শয়ন করিল। ভালো ঘুম হইল না। স্বপ্নে দেখিল—বেণুর মা পর্দার আড়াল হইতে তাহাকে উচ্চস্বরে তিরস্কার করিতেছেন ; কথা কিছুই স্পষ্ট শুনা যাইতেছে না, কেবল সেই অনির্দিষ্ট কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গে বেণুর মার চুনি-পান্না-হীরার অলংকার হইতে লাল সবুজ শুভ্র রশ্মির সূচিগুলি কালো পর্দাটাকে ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া আন্দোলিত হইতেছে। হরলাল প্রাণপণে বেণুকে ডাকিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু তাহার গলা দিয়া কিছুতেই স্বর বাহির হইতেছে না। এমন সময় প্রচণ্ড শব্দে কী একটা ভাঙিয়া পর্দা ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল—চমকিয়া চোখ মেলিয়া হরলাল দেখিল একটা স্তূপাকার অন্ধকার। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠিয়া সশব্দে জানলায় ঠেলা দিয়া আলো নিবাইয়া দিয়াছে। হরলালের সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়া গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশলাই দিয়া আলো জ্বালিল। ঘড়িতে দেখিল চারটে বাজিয়াছে। আর ঘুমাইবার সময় নাই—টাকা লইয়া মফস্বলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

হরলাল মুখ ধুইয়া ফিরিবার সময় মা তাঁহার ঘর হইতে কহিলেন, "কী বাবা, উঠিয়াছিস ?"

হরলাল প্রভাতে প্রথমে মাতার মঙ্গলমুখ দেখিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল। মা তাহার প্রণাম লইয়া মনে মনে তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাবা, আমি এইমাত্র স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, তুই যেন বউ আনিতে চলিয়াছিস। ভোরের স্বপন কি মিথ্যা হইবে।"

হরলাল হাসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। টাকা ও নোটের থলেগুলো লোহার সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া প্যাকবাক্সয় বন্ধ করিবার জন্য উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার বুকের ভিতর ধড়াস করিয়া উঠিল—দুই-তিনটা নোটের থলি শূন্য। মনে হইল স্বপন দেখিতেছে। থলেগুলো লইয়া সিন্দুকের গায়ে জোরে আছাড় দিল—তাহাতে শূন্য থলের শূন্যতা অপ্রমাণ হইল না। তবু বৃথা আশায় থলের বন্ধনগুলাখুলিয়া খুব করিয়া ঝাড়া দিল, একটি থলের ভিতর হইতে দুইখানি চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। বেণুর হাতের লেখা—একটি চিঠি তাহার বাপের নামে আর একটি হরলালের।

তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িতে গেল। চোখে যেন দেখিতে পাইল না। মনে হইল যেন আলো যথেষ্ট নাই। কেবলই বাতি উসকাইয়া দিতে লাগিল। যাহা পড়ে তাহা ভালো বোঝে না, বাংলা ভাষা যেন ভুলিয়া গেছে।

কথাটা এই যে, বেণু তিন হাজার টাকার পরিমাণ দশটাকাওয়ালা নোট লইয়া বিলাতে যাত্রা করিয়াছে, আজ ভোরেই জাহাজ ছাড়িবার কথা। হরলাল যে সময় খাইতে গিয়াছিল সেই সময় বেণু এই কাণ্ড করিয়াছে। লিখিয়াছে যে, 'বাবাকে চিঠি দিলাম, তিনি আমার এই ঋণ শোধ করিয়া দিবেন। তা ছাড়া ব্যাগ খুলিয়া দেখিবেন, তাহার মধ্যে মায়ের যে গহনা আছে তাহার দাম, কত ঠিক জানি না, বোধ হয় তিন হাজার টাকার বেশি হইবে। মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তবে বাবা আমাকে বিলাতে যাইবার টাকা না দিলেও এই গহনা দিয়াই নিশ্চয় মা আমাকে খরচ জোগাড় করিয়া দিতেন। আমার মায়ের গহনা বাবা যে আর-কাহাকেও দিবেন তাহা আমি সহ্য করিতে পারি নাই। সেইজন্য যেমন করিয়া পারি আমিই তাহা লইয়াছি। বাবা যদি টাকা দিতে দেরি করেন তবে আপনি অনায়াসে এই গহনা বেচিয়া বা বন্ধক দিয়া টাকা লইতে পারিবেন। এ আমার মায়ের জিনিস—এ আমারই জিনিস।' এ ছাড়া আরও অনেক কথা—সে কোনো কাজের কথা নহে।

হরলাল ঘরে তালা দিয়া তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ি লইয়া গঙ্গার ঘাটে ছুটিল। কোন্ জাহাজে বেণু যাত্রা করিয়াছে তাহার নামও সে জানে না। মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত ছুটিয়া হরলাল খবর পাইল দুইখানা জাহাজ ভোরে রওনা হইয়া গেছে। দুখানাই ইংলণ্ডে যাইবে। কোন্ জাহাজে বেণু আছে তাহাও তাহার অনুমানের অতীত এবং সে জাহাজ ধরিবার যে কী উপায় তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না।

মেটিয়াবুরুজ হইতে তাহার বাসার দিকে যখন গাড়ি ফিরিল তখন সকালের রৌদ্রে শহর জাগিয়া উঠিয়াছে। হরলালের চোখে কিছুই পড়িল না। তাহার সমস্ত হতবুদ্ধি অন্তঃকরণ একটা কলেবরহীন নিদারুণ প্রতিকূলতাকে যেন কেবলই প্রাণপণে ঠেলা মারিতেছিল—কিন্তু কোথাও এক তিলও

তাহাকে টলাইতে পারিতেছিল না। যে বাসায় তাহার মা থাকেন, এতদিন যে বাসায় পা দিবামাত্র কর্মক্ষেত্রের সমস্ত ক্লান্তি ও সংঘাতের বেদনা মুহূর্তের মধ্যেই তাহার দূর হইয়া গিয়াছে, সেই বাসাব সম্মুখে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল—গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সেই বাসার মধ্যে সে অপবিমেয় নৈরাশ্য ও ভয় লইয়া প্রবেশ করিল।

মা উদ্বিগ্ন হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কোথায় গিয়াছিলে।"

হরলাল বলিয়া উঠিল, "মা, তোমার জন্য বউ আনিতে গিয়াছিলাম।" বলিয়া শুষ্ককণ্ঠে হাসিতে হাসিতে সেইখানেই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

"ও মা, কী হইল গো" বলিয়া মা তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাহার মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে হরলাল চোখ খুলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া উঠিয়া বসিল। হবলাল কহিল, "মা, তোমরা ব্যস্ত হইয়ো না। আমাকে একটু একলা থাকিতে দাও।" বলিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মা দরজার বাহিরে মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন—ফাল্গুনের রৌদ্র তাঁহার সর্বাঙ্গে আসিয়া পড়িল। তিনি রুদ্ধ দরজার উপর মাথা রাখিয়া থাকিয়া থাকিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, "হরলাল, বাবা হরলাল।"

হরলাল কহিল, "মা, একটু পরেই আমি বাহির হইব, এখন তুমি যাও।"

মা রৌদ্রে সেইখানেই বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন।

আপিসের দরোয়ান আসিয়া দরজায় ঘা দিয়া কহিল, "বাবু, এখনই না বাহির হইলে আর গাড়ি পাওয়া যাইবে না।"

হরলাল ভিতর হইতে কহিল, "আজ সাতটার গাড়িতে যাওয়া হইবে না।"

দরোয়ান কহিল, "তবে কখন যাইবেন।"

হরলাল কহিল, "সে আমি তোমাকে পরে বলিব।"

দরোয়ান মাথা নাড়িয়া হাত উল্টাইয়া নিচে চলিয়া গেল।

হরলাল ভাবিতে লাগিল, 'এ কথা বলি কাহাকে। এ যে চুরি। বেণুকে কি জেলে দিব।'

হঠাৎ সেই গহনার কথা মনে পড়িল। সে কথাটা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। মনে হইল যেন কিনারা পাওয়া গেল। ব্যাগ খুলিয়া দেখে তাহার মধ্যে শুধু আংটি ঘড়ি বোতাম হার নহে—ব্রেস্‌লেট চিক সিঁথি মুক্তার মালা প্রভৃতি আরও অনেক দামি গহনা আছে। তাহার দাম তিন হাজার টাকার অনেক বেশি। কিন্তু এও তো চুরি। এও তো বেণুর নয়। এ ব্যাগ যতক্ষণ তাহার ঘরে থাকে ততক্ষণ তাহার বিপদ।

তখন আর দেরি না করিয়া অধরলালের সেই চিঠি ও ব্যাগ লইয়া হরলাল ঘর হইতে বাহির হইল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাও, বাবা।"

হরলাল কহিল, "অধরবাবুর বাড়িতে।"

মার বুক হইতে হঠাৎ অনির্দিষ্ট ভয়ের একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। তিনি স্থির করিলেন, ঐ-যে হরলাল কাল শুনিয়াছে বেণুর বাপের বিয়ে, তাই শুনিয়া অবধি বাছার মনে শান্তি নাই। আহা, বেণুকে কত ভালোই বাসে।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তবে তোমার আর মফস্বলে যাওয়া হইবে না?"

হরলাল কহিল, "না।" বলিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

অধরবাবুর বাড়ি পৌঁছিবার পূর্বেই দূর হইতে শোনা গেল রসনচৌকি আলেয়া রাগিণীতে করুণস্বরে আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু হরলাল দরজায় ঢুকিয়াই দেখিল, বিবাহবাড়ির উৎসবের সঙ্গে একটা যেন অশান্তির লক্ষণ মিশিয়াছে। দরোয়ানের পাহারা কড়াক্কড়, বাড়ি হইতে চাকরবাকর কেহ বাহির হইতে পারিতেছে না—সকলেরই মুখে ভয় ও চিন্তার ভাব; হরলাল খবর পাইল, কাল রাত্রে বাড়িতে অনেক টাকার গহনা চুরি হইয়া গিয়াছে। দুই-তিনজন চাকরকে বিশেষভাবে সন্দেহ করিয়া পুলিসের হাতে সমর্পণ করিবার উদ্‌যোগ হইতেছে।

হরলাল দোতলায় বারান্দায় গিয়া দেখিল, অধরবাবু আগুন হইয়া বসিয়া আছেন, ও রতিকান্ত

তামাক খাইতেছে। হরলাল কহিল, "আপনার সঙ্গে গোপনে আমার একটু কথা আছে।"

অধরবাবু চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তোমার সঙ্গে গোপনে আলাপ করিবার এখন সময় নয়—যাহা কথা থাকে এইখানেই বলিয়া ফেলো।"

তিনি ভাবিলেন, হরলাল বুঝি এই সময়ে তাঁহার কাছে সাহায্য বা ধার চাহিতে আসিয়াছে। রতিকান্ত কহিল, "আমার সামনে বাবুকে কিছু জানাইতে যদি লজ্জা করেন, আমি নাহয় উঠি।"

অধর বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আঃ, বোসো না।"

হরলাল কহিল, "কাল রাত্রে বেণু আমার বাড়িতে এই ব্যাগ রাখিয়া গেছে।"

অধর। ব্যাগে কী আছে।

হরলাল ব্যাগ খুলিয়া অধরবাবুর হাতে দিল।

অধর। মাস্টারে ছাত্রে মিলিয়া বেশ কারবার খুলিয়াছ তো। জানিতে এ চোরাই মাল বিক্রি করিলে ধরা পড়িবে, তাই আনিয়া দিয়াছ—মনে করিতেছ সাধুতার জন্য বকশিশ পাইবে?

তখন হরলাল অধরের পত্রখানা তাঁহার হাতে দিল। পড়িয়া তিনি আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমি পুলিসে খবর দিব। আমার ছেলে এখনও সাবালক হয় নাই—তুমি তাহাকে চুরি করিয়া বিলাত পাঠাইয়াছ। হয়তো পাঁচশো টাকা ধার দিয়া তিন হাজার টাকা লিখাইয়া লইয়াছ। এ ধার আমি শুধিব না।"

হরলাল কহিল, "আমি ধার দিই নাই।"

অধর কহিলেন, "তবে সে টাকা পাইল কোথা হইতে। তোমার বাক্স ভাঙিয়া চুরি করিয়াছে?"

হরলাল সে প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। রতিকান্ত টিপিয়া টিপিয়া কহিল, "ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন-না, তিন হাজার টাকা কেন, পাঁচশো টাকাও উনি কি কখনও চক্ষে দেখিয়াছেন।"

যাহা হউক, গহনা চুরির মীমাংসা হওয়ার পরেই বেণুর বিলাত পালানো লইয়া বাড়িতে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। হরলাল সমস্ত অপরাধের ভার মাথায় করিয়া লইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তায় যখন বাহির হইল তখন তাহার মন যেন অসাড় হইয়া গেছে। ভয় করিবার এবং ভাবনা করিবারও শক্তি তখন ছিল না। এই ব্যাপারের পরিণাম যে কী হইতে পারে মন তাহা চিন্তা করিতেও চাহিল না।

গলিতে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার বাড়ির সমুখে একটা গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। চমকিয়া উঠিল। হঠাৎ আশা হইল, বেণু ফিরিয়া আসিয়াছে। নিশ্চয়ই বেণু! তাহার বিপদ যে সম্পূর্ণ নিরুপায়রূপে চূড়ান্ত হইয়া উঠিবে এ কথা সে কোনোমতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, গাড়ির ভিতরে তাহাদের আপিসের একজন সাহেব বসিয়া আছে। সাহেব হরলালকে দেখিয়াই গাড়ি হইতে নামিয়া তাহার হাত ধরিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আজ মফস্বলে গেলে না কেন।"

আপিসের দরোয়ান সন্দেহ করিয়া বড়োসাহেবকে গিয়া জানাইয়াছে—তিনি ইহাকে পাঠাইয়াছেন।

হরলাল বলিল, "তিন হাজার টাকার নোট পাওয়া যাইতেছে না।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গেল?"

হরলাল তাহাকে 'জানি না' এমন উত্তরও দিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব কহিল, "টাকা কোথায় আছে দেখিব চলো।"

হরলাল তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গেল। সাহেব সমস্ত গনিয়া চারি দিক খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিল। বাড়ির সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া মা আর থাকিতে পারিলেন না—তিনি সাহেবের সামনেই বাহির হইয়া ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে হরলাল, কী হইল রে।"

হরলাল কহিল, "মা, টাকা চুরি গেছে।"

মা কহিলেন, "চুরি কেমন করিয়া যাইবে। হরলাল, এমন সর্বনাশ কে করিল।"

হরলাল কহিল, "মা, চুপ করো।"

সন্ধান শেষ করিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, 'এঘরে রাত্রে কে ছিল ?"

হরলাল কহিল, "দ্বার বন্ধ করিয়া আমি একলা শুইয়াছিলাম—আর-কেহ ছিল না।

সাহেব টাকাগুলো গাড়িতে তুলিয়া হরলালকে কহিল, "আচ্ছা, বড়োসাহেবের কাছে চলো।"

হরলালকে সাহেবের সঙ্গে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মা তাহাদের পথ রোধ করিয়া কহিল, "সাহেব, আমার ছেলেকে কোথায় লইয়া যাইবে। আমি না খাইয়া এ ছেলে মানুষ করিয়াছি—আমার ছেলে কখনোই পরের টাকায় হাত দিবে না।"

সাহেব বাংলা কথা কিছু না বুঝিয়া কহিল, "আচ্ছা, আচ্ছা।"

হরলাল কহিল, "মা, তুমি কেন ব্যস্ত হইতেছে। বড়োসাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া আমি এখনই আসিতেছি।"

মা উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, "তুই যে সকাল থেকে কিছুই খাস নাই।"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া হরলাল গাড়িতে উঠিয়া চলিয়া গেল। মা মেজের উপরে লুটাইয়া পড়িয়া রহিলেন।

বড়োসাহেব হরলালকে কহিলেন, "সত্য করিয়া বলো ব্যাপারখানা কী।"

হরলাল কহিল, "আমি টাকা লই নাই।"

বড়োসাহেব। সে কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জান কে লইয়াছে ?

হরলাল কোনো উত্তর না দিয়া মুখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিল।

সাহেব। তোমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইয়াছে ?

হরলাল কহিল, "আমার প্রাণ থাকিতে আমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইতে পারিত না।"

বড়োসাহেব কহিলেন, "দ্যাখো হরলাল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়া কোনো জামিন না লইয়া এই দায়িত্বের কাজ দিয়াছিলাম। আপিসের সকলেই বিরোধী ছিল। তিন হাজার টাকা কিছুই বেশি নয়। কিন্তু তুমি আমাকে বড়ো লজ্জাতেই ফেলিবে। আজ সমস্ত দিন তোমাকে সময় দিলাম—যেমন করিয়া পার টাকা সংগ্রহ করিয়া আনো— তাহা হইলে এ লইয়া কোনো কথা তুলিব না, তুমি যেমন কাজ করিতেছ তেমনি করিবে।"

এই বলিয়া সাহেব উঠিয়া গেলেন। তখন বেলা এগারোটা হইয়া গেছে। হরলাল যখন মাথা নিচু করিয়া বাহির হইয়া গেল তখন আপিসের বাবুরা অত্যন্ত খুশি হইয়া হরলালের পতন লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

হরলাল একদিন সময় পাইল। আরও একটা দীর্ঘ দিন নৈরাশ্যের শেষতলের পঙ্ক আলোড়ন করিয়া তুলিবার মেয়াদ বাড়িল।

উপায় কী, উপায় কী, উপায় কী—এই ভাবিতে ভাবিতে সেই রৌদ্রে হরলাল রাস্তায় বেড়াইতে লাগিল। শেষে উপায় আছে কি না সে ভাবনা বন্ধ হইয়া গেল কিন্তু বিনা কারণে পথে ঘুরিয়া বেড়ানো থামিল না। যে কলিকাতা হাজার হাজার লোকের আশ্রয়স্থান তাহাই এক মুহূর্তে হরলালের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড ফাঁসকলের মতো হইয়া উঠিল। ইহার কোনো দিকে বাহির হইবার কোনো পথ নাই। সমস্ত জনসমাজ এই অতিক্ষুদ্র হরলালকে চারি দিকে আটক করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ তাহাকে জানেও না, এবং তাহার প্রতি কাহারও মনে কোনো বিদ্বেষও নাই, কিন্তু প্রত্যেক লোকেই তাহার শত্রু। অথচ রাস্তার লোক তাহার গা ঘেঁষিয়া তাহার পাশ দিয়া চলিয়াছে ; আপিসের বাবুরা বাহিরে আসিয়া ঠোঙায় করিয়া জল খাইতেছেন, তাহার দিকে কেহ তাকাইতেছে না ; ময়দানের ধারে অলস পথিক মাথার নিচে হাত রাখিয়া একটা পায়ের উপর আর-একটা পা তুলিয়া গাছের তলায় পড়িয়া আছে ; স্যাকরাগাড়ি ভরতি করিয়া হিন্দুস্থানী মেয়েরা কালীঘাটে চলিয়াছে ; একজন চাপরাসি একখানা চিঠি লইয়া হরলালের সম্মুখে ধরিয়া কহিল, "বাবু, ঠিকানা পড়িয়া দাও"—যেন তাহার সঙ্গে অন্য পথিকের কোনো প্রভেদ নাই ; সেও ঠিকানা পড়িয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল। ক্রমে আপিস বন্ধ হইবার সময় আসিল। বাড়িমুখো গাড়িগুলো আপিসমহলের নানা রাস্তা দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আপিসের বাবুরা ট্রাম ভরতি করিয়া থিয়েটারের বিজ্ঞাপন পড়িতে পড়িতে বাসায় ফিরিয়া চলিল। আজ হইতে হরলালের আপিস নাই, আপিসের ছুটি নাই, বাসায় ফিরিয়া যাইবার জন্য ট্রাম ধরিবার কোনো তাড়া নাই। শহরের সমস্ত কাজকর্ম, বাড়িঘর, গাড়িজুড়ি, আনাগোনা হরলালের কাছে

কখনও বা অত্যন্ত উৎকট সত্যের মতো দাঁত মেলিয়া উঠিতেছে, কখনও বা একেবারে বস্তুহীন স্বপ্নের মতো ছায়া হইয়া আসিতেছে। আহার নাই, বিশ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, কেমন করিয়া যে হরলালের দিন কাটিয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিল না। রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলিল—যেন একটা সতর্ক অন্ধকার দিকে দিকে তাহার সহস্র ক্রূর চক্ষু মেলিয়া শিকারলুব্ধ দানবের মতো চুপ করিয়া রহিল। রাত্রি কত হইল সে কথা হরলাল চিন্তাও করিল না। তাহার কপালের শিরা দব্ দব্ করিতেছে; মাথা যেন ফাটিয়া যাইতেছে; সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলিতেছে; পা আর চলে না। সমস্ত দিন পর্যায়ক্রমে বেদনার উত্তেজনা ও অবসাদের অসাড়তার মধ্যে মার কথা কেবল মনের মধ্যে যাতায়াত করিয়াছে—কলিকাতার অসংখ্য জনশ্রেণীর মধ্যে কেবল ঐ একটিমাত্র নামই শুষ্ককণ্ঠ ভেদ করিয়া মুখে উঠিয়াছে—মা, মা, মা। আর কাহাকেও ডাকিবার নাই। মনে করিল, রাত্রি যখন নিবিড় হইয়া আসিবে, কোনো লোকই যখন এই অতি সামান্য হরলালকে বিনা অপরাধে অপমান করিবার জন্য জাগিয়া থাকিবে না তখন সে চুপ করিয়া তাহার মায়ের কোলের কাছে গিয়া শুইয়া পড়িবে—তাহার পরে ঘুম যেন আর না ভাঙে! পাছে তার মার সম্মুখে পুলিসের লোক বা আর-কেহ তাহাকে অপমান করিতে আসে এই ভয়ে সে বাসায় যাইতে পারিতেছিল না। শরীরের ভার যখন আর বহিতে পারে না এমন সময় হরলাল একটা ভাড়াটে গাড়ি দেখিয়া তাহাকে ডাকিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাস করিল, "কোথায় যাইবে।"

হরলাল কহিল, "কোথাও না। এই ময়দানের রাস্তায় খানিকক্ষণ হাওয়া খাইয়া বেড়াইব।"

গাড়োয়ান সন্দেহ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই হরলাল তাহার হাতে আগাম ভাড়া একটা টাকা দিল। সে গাড়ি তখন হরলালকে লইয়া ময়দানের রাস্তায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তখন শ্রান্ত হরলাল তাহার তপ্ত মাথা খোলা জানলার উপর রাখিয়া চোখ বুজিল। একটু একটু করিয়া তাহার সমস্ত বেদনা যেন দূর হইয়া আসিল। শরীর শীতল হইল। মনের মধ্যে একটি সুগভীর সুনিবিড় আনন্দপূর্ণ শান্তি ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। একটা যেন পরম পরিত্রাণ তাহাকে চারি দিক হইতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। সে যে সমস্ত দিন মনে করিয়াছিল কোথাও তাহার কোনো পথ নাই, সহায় নাই, নিষ্কৃতি নাই, তাহার অপমানের শেষ নাই, দুঃখের অবধি নাই, সে কথাটা যেন এক মুহূর্তেই মিথ্যা হইয়া গেল। এখন মনে হইল, সে তো একটা ভয় মাত্র, সে তো সত্য নয়। যাহা তাহার জীবনকে লোহার মুঠিতে আঁটিয়া পিষিয়া ধরিয়াছিল হরলাল তাহাকে আর কিছুমাত্র স্বীকার করিল না—মুক্তি অনন্ত আকাশ পূর্ণ করিয়া আছে, শান্তির কোথাও সীমা নাই। এই অতি সামান্য হরলালকে বেদনার মধ্যে, অপমানের মধ্যে, অন্যায়ের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো রাজা-মহারাজারও নাই। যে আতঙ্কে সে আপনাকে আপনি বাঁধিয়াছিল তাহা সমস্তই খুলিয়া গেল। তখন হরলাল আপনার বন্ধনমুক্ত হৃদয়ের চারি দিকে অনন্ত আকাশের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল, যেন তাহার সেই দরিদ্র মা দেখিতে দেখিতে বাড়িতে বাড়িতে বিরাটরূপে সমস্ত অন্ধকার জুড়িয়া বসিতেছেন। তাঁহাকে কোথাও ধরিতেছে না। কলিকাতার রাস্তাঘাট বাড়িঘর দোকানবাজার একটু একটু করিয়া তাঁহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে—বাতাস ভরিয়া গেল, আকাশ ভরিয়া উঠিল, একটি একটি করিয়া নক্ষত্র তাঁহার মধ্যে মিলাইয়া গেল—হরলালের শরীরমনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চেতনা তাঁহার মধ্যে অল্প অল্প করিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল—ঐ গেল, তপ্ত বাষ্পের বুদ্‌বুদ একেবারে ফাটিয়া গেল—এখন আর অন্ধকারও নাই, আলোকও নাই, রহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা।

গির্জার ঘড়িতে একটা বাজিল। গাড়োয়ান অন্ধকার ময়দানের মধ্যে গাড়ি লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে বিরক্ত হইয়া কহিল, "বাবু, ঘোড়া তো আর চলিতে পারে না—কোথায় যাইতে হইবে বলো।"

কোনো উত্তর পাইল না। কোচবাক্স হইতে নামিয়া হরলালকে নাড়া দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর নাই। তখন ভয় পাইয়া গাড়োয়ান পরীক্ষা করিয়া দেখিল হরলালের শরীর আড়ষ্ট, তাহার নিশ্বাস বহিতেছে না।

'কোথায় যাইতে হইবে' হরলালের কাছ হইতে এই প্রশ্নের আর উত্তর পাওয়া গেল না।

ছায়া

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

১

মধ্যাহ্ন। ভাদ্র মাসের শেষে মেঘমুক্ত আকাশের নীলিমা প্রখর রৌদ্রকিরণে উজ্জ্বল। যেদিকে চাহিয়া দেখ আকাশসীমাস্পর্শী প্রান্তর, বৃক্ষবিরল। রৌদ্রকিরণে প্রান্তর হইতে বর্ষার জল শোষিত হইতেছে, সূক্ষ্ম বাষ্পের তরঙ্গ চারিদিকে লক্ষিত হইতেছে। অতিদূরে গৃধিনী উড়িতেছে। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন— শব্দ নাই, প্রান্তরে লোক-সমাগম নাই, লোকের যাতায়াত পর্যন্ত নাই।

সেই জনশূন্য রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়া আমার বন্ধু চন্দ্রকুমার ও আমি গমন করিতেছিলাম। কোথায় যাইতেছিলাম, কেন যাইতেছিলাম, আমি তাহা জানিতাম না। চন্দ্রকুমার আমার বাল্যবন্ধু, কয়েক বৎসর গৃহত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছিল ; সম্প্রতি গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার অনুরোধ-মত তাহার সঙ্গে যাইতেছিলাম। কোথায় যাইতেছিলাম, জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর পাই নাই।

দশদিন হইল আমরা গৃহত্যাগ করিয়াছি, কোথায় আসিয়াছি, জানি না। এ কয়দিন রেলে শকটে কিম্বা শিবিকায় আসিতেছিলাম, পদব্রজে চলিতে হয় নাই। অদ্য প্রাতে চন্দ্রকুমাব শিবিকা বিদায় কবিয়া দিয়াছে, বলিতেছে, আমাদিগকে আর অধিক দূর গমন করিতে হইবে না। সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তি নাই। কিছুদূর আসিয়া এই প্রান্তরে পড়িয়াছি। আর কতদূর যাইতে হইবে, জানি না।

নিরুদ্দেশ হইবার পূর্বে চন্দ্রকুমার মজলিসী রকম লোক ছিল, গল্প-গুজব বেশ করিত। ফিরিয়া আসিয়া আর সেরূপ নাই। কথা অল্প কয়, প্রায় মৌনভাব। আজও কথাবার্তা একরূপ বন্ধ।

পার্শ্বে অথবা পশ্চাতে একবারও দৃষ্টিপাত না করিয়া চন্দ্রকুমার বেগে চলিতেছিল। রৌদ্রে ও পথের শ্রান্তিতে আমি ঘর্মাক্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। চন্দ্রকুমারের মুখে ক্লান্তি-চিহ্ন নাই।

মধ্যাহ্ন কাল অতীত হইলে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, সম্মুখে যেমন অনন্ত প্রান্তর, পশ্চাতেও সেইরূপ অনন্ত প্রান্তর। মনে সন্দেহ হইল, চন্দ্রকুমাব পথ হারাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমরা কোথায় যাইতেছি ? তুমি পথ হারাও নাই তো ?'

'কোন চিন্তা নাই। আমার সঙ্গে নিশ্চিন্ত হইয়া আইস।'

আর কোন কথা হইল না। আমরা পূর্বের মত চলিতে লাগিলাম।

সূর্য পশ্চিমে হেলিল, চন্দ্রকুমারের ও আমার ছায়া প্রান্তরে দীর্ঘ হইয়া পড়িল। প্রান্তরের সীমায় ক্রমশ বিটপীশ্রেণী দেখা দিল।

সন্ধ্যার সময় প্রান্তব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বৃক্ষতলে একটি কুটীর দৃষ্ট হইল। কুটীরের সম্মুখে উপনীত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চন্দ্রকুমার কহিল, 'আসিয়াছি।' এই বলিয়া কুটীবে প্রবেশ করিল।

২

তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে আমিও প্রবেশ করিলাম। কুটীর অতি ক্ষুদ্র, একটিমাত্র অপ্রশস্ত গৃহ। ইহাও বুঝিলাম যে, কুটীর এ সময় শূন্য হইলেও একেবারে শূন্য নহে, মানুষের যাতায়াত আছে। চন্দ্রকুমাব এভাবে প্রবেশ করিল, যেন কুটীর তাহার নিজের। আমাকে কহিল, 'বিশ্রাম কর।'

অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হইয়াছিলাম। গৃহের কোণে মৃৎকলসীতে জল ছিল; অঞ্জলি পুরিয়া পান করিলাম। চন্দ্রকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখানে কয়দিন থাকিতে হইবে?'

দাঁড়াইয়া চন্দ্রকুমার কুটীরের বাহিরে দেখিতেছিল। কহিল, 'পরে বলিব।'

আমি আর কিছু বলিলাম না। কুটীরতলে শুষ্ক তৃণ বিস্তৃত ছিল; তাহাতে শয়ন কবিলাম। শ্রান্তিজনিত তন্দ্রা শীঘ্রই আসিল, পরে নিদ্রা আসিল।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখি, চন্দ্রকুমার কুটীরে নাই; বাহিরে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। কুটীরেব বাহিবে গমন কবিলাম।

জ্যোৎস্নালোকে প্রান্তর নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় দেখাইতেছে। চারিদিকে যেন বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মধ্যে মধ্যে কুটীরের পার্শ্বে পেচক ডাকিতেছে। মানুষের মধ্যে আমি একা। চন্দ্রকুমার কোথায়?

রাত্রি হইতে লাগিল। কুটীরে ফিরিয়া আসিলাম। চক্ষে আর নিদ্রা আসিল না।

গভীর রাত্রে মনুষ্যের পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। দ্রুতপদে কে যেন কুটীবের অভিমুখে আসিতেছে। আমি উঠিয়া বসিলাম। চন্দ্রকুমার বেগে কুটীরে প্রবেশ কবিল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিঃশব্দ দ্রুত পদক্ষেপে আর একজন প্রবেশ করিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি স্ত্রীলোক, এই পর্যন্ত বুঝিতে পারিলাম। তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম না।

চন্দ্রকুমার ভীতের ন্যায়, উন্মত্তের ন্যায় কহিল, 'আর কেহ যেন কুটীরে প্রবেশ না কবে, তাহা হইলে আমাদের প্রাণ-সংশয়! তুমি দ্বার রক্ষা কর, কেহ প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে তাহাকে কাটিয়া ফেলিবে। এই ধর।' বলিয়া আমার হস্তে তীক্ষ্ণধার মুক্ত অসি দিল।

আমি কোন কথা কহিলাম না, কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। চন্দ্রকুমারের কোন কথা অন্যথা করিবার যেন ক্ষমতা ছিল না। তরবারি লইয়া কুটীর-দ্বারে দাঁড়াইলাম।

জ্যোৎস্নালোকে প্রান্তরের অনেক দূর দেখা যাইতেছে। যেদিকে বৃক্ষশ্রেণী, সেইদিকে কিছু অন্ধকার। কোথাও কিছু দেখিতে পাইলাম না, কোন শব্দ শুনিতে পাইলাম না। কুটীরে কারো মুখে কোন কথা নাই। ভীতি-রুদ্ধ নিশ্বাসের শব্দ কখনো-কখনো শুনিতে পাইতেছিলাম।

অকস্মাৎ কুটীরের সম্মুখে মনুষ্যের ছায়া পতিত হইল। তরবারির উপর মুষ্ঠি দৃঢ় হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কে যায়?'

ছায়া অপসৃত হইল, মনুষ্যমূর্তি দেখিতে পাইলাম না।

কুটীরে অস্ফুট ভীতিশব্দ হইল, কে করিল, বুঝিতে পারিলাম না।

আবার পূর্ববৎ ছায়া দৃষ্ট হইল, আবার ডাকিলাম, 'কে যায়?' আবার ছায়া অদৃশ্য হইল।

ক্রমে আমার বিশ্বাস জন্মিল যে, কোন ব্যক্তি অলক্ষিত থাকিয়া কুটীর প্রদক্ষিণ করিতেছে। জ্যোৎস্নালোকে এক একবার তাহার ছায়া দেখা যাইতেছে, কিন্তু সে স্বয়ং দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। যতবার আমি ছায়া দেখিতে পাই, ততবার একই প্রশ্ন করি, ততবার ছায়া অপসৃত হয়।

জ্যোৎস্না ক্রমে মলিন হইয়া আসিল, প্রত্যূষের পূর্বগামী অস্পষ্ট অন্ধকার আকাশে দেখা দিল।

তখন কুটীরের পার্শ্বে অতি মৃদু, অতি বিকট হাস্যধ্বনি হইল। আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

৩

প্রভাত হইলে চন্দ্রকুমার কুটীরের বাহিরে আসিল। এক রাত্রে মনুষ্যের মুখে এত পরিবর্তন কখনও দেখি নাই। সে সময়ে সে কথার কোন উল্লেখ করিলাম না। আমার কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার ছিল।

চন্দ্রকুমারকে বলিলাম, 'দুই একটা কথা আমার জানিবার আছে। এ পর্যন্ত তুমি আমায় কিছু বল নাই, আমারও জানিবার জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য হয় নাই; কিন্তু এখন সৎকর্মে অথবা অসৎকর্মে তোমার সহায়তা করিতেছি, জানা প্রয়োজন।'

'সকল কথা বলিতে পারিব না। এই রমণীর অথবা আমার কাহারও অসদভিপ্রায় নাই। একবার এ আমার প্রাণরক্ষা করে। তাহার পর ইহার প্রাণসংশয় হয়। আমি ইহার প্রাণরক্ষা করিয়াছি। এখন আমাদের উভয়ের প্রাণসংশয়। তুমি যদি পার তো আমাদিগকে রক্ষা কর। আমাদের আত্মরক্ষার সাধ্য নাই।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখন দেশে ফিরিয়া যাইবে?'

'যদি বাঁচিয়া থাকি।'

আমি বিস্মিত হইয়া চন্দ্রকুমারের মুখের দিকে চাহিলাম।

আমি অন্য কথা তুলিলাম: 'তুমি যে বলিতেছ তোমাদের উভয়ের প্রাণসংশয়, তাহার কোন কারণ আছে? আর, আত্মরক্ষা করা তোমার অসাধ্য কেন? তোমার বাহুতে বল আমার অপেক্ষা অধিক।'

চন্দ্রকুমার অতি কাতর হাসি হাসিল। কহিল, 'রাত্রে আশঙ্কার কোন কারণ দেখ নাই?'

কুটীর-প্রদক্ষিণকারিণী ছায়া, ছায়ার অলক্ষিতে আবির্ভাব ও আচম্বিতে তিরোধান এবং সেই অতি মৃদু অতি বিকট হাস্য আমার স্মরণ হইল। এসকল সত্য, অথবা ভয়বিচলিত কল্পনা মাত্র? ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলাম, 'যাহা দেখিয়াছিলাম, বুঝিতে বা বুঝাইতে পারিতেছি না।'

'পারিবেও না, পারিলে আশঙ্কা এত হইত না। আমরা যে কারণে আত্মরক্ষায় অক্ষম, তুমি এ পর্যন্ত সে অবস্থায় পতিত হও নাই; সেইজন্য তোমাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি।'

৪

এমন সময় রমণী কুটীরের বাহিরে আসিল। আমাকে দেখিয়া বিশেষ লজ্জিত হইল না। আমিও তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম।

রমণী সুন্দরী বলিলে কিছু বলা হয় না। সুন্দরী বলিলে সে রূপের কিছুই বর্ণনা হয় না। এমন নির্মল সৌন্দর্য কখনও দেখি নাই। মুখে হৃদয় প্রতিবিম্বিত হইতেছে, সে হৃদয় নির্বিকার, নির্মল, প্রসন্ন; সে মুখ দেখিয়া চন্দ্রকুমারের কথায় আর সন্দেহ রহিল না।

রমণীকে দেখিয়া বিদেশীয় ভাষায় চন্দ্রকুমার তাহাকে কি বলিল, রমণীও সেই ভাষায় উত্তর দিল। আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। চন্দ্রকুমার আমাকে কহিল, 'আমাদের ভাষা জানে না।'

তাহার পর চন্দ্রকুমার রমণীকে অন্যান্য কথা বলিতে লাগিল, বুঝিতে পারিলাম, আমার সম্বন্ধে কিছু বলিতেছে। কারণ কথা শুনিতে শুনিতে রমণী এক-একবার সলজ্জ অথচ পুলকিত দৃষ্টিতে আমার নাম বলিয়া দিল।

রমণী ধীরে অশ্রুতপূর্ব নাম একবারে উচ্চারণ করিতে না পারিয়া কহিল, 'প্র-ভা-ত চন্দ্র।'

আমি চন্দ্রকুমারকে বলিলাম, রমণী কতক নিষ্কৃতি পাইয়া আহ্লাদিত হইয়া পূর্বাপেক্ষা দ্রুততর কহিল, 'প্র-ভা-ত।'

রমণীর নাম জানিবার ইচ্ছা হইলেও সহসা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। চন্দ্রকুমার আপনিই কহিল, 'তুমি উহার নাম জিজ্ঞাসা করিবে না?'

'করিব বই কি!'

চন্দ্রকুমারের কথা-মত রমণী আপনার নাম বলিল, 'বাদলা।'

নামটি নিতান্ত বিজাতীয় মত বোধ হইল না। আমাদের সঙ্গে কিছু আহার্য সামগ্রী ছিল।

আহারাদির পর চন্দ্রকুমারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখন কী করিতে ইচ্ছা করিতেছ ?'

চন্দ্রকুমার কহিল, 'তোমার কী পরামর্শ ?'

আর এক পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছিলাম, এ-পর্যন্ত চন্দ্রকুমারের চিত্তবল যেন শিথিল হইয়া পড়িতেছিল, আমার যেরূপ ইচ্ছা তাহারও ইচ্ছা যেন তদনুরূপ।

আমি কহিলাম, 'এখানে আর রাত্রিযাপন করা পরামর্শসিদ্ধ বোধ হয় না। এখানে নানাপ্রকার আশঙ্কা।'

চন্দ্রকুমার কহিল, 'আমার মনে কেবল এক আশঙ্কাই প্রবল। সে আশঙ্কা এখানে যেরূপ অন্যত্রও তদ্রূপ, প্রাণীশূন্য মরুভূমিতে যেমন, লোকালয়েও সেইরূপ ; একাকী অসহায় পথে যেরূপ, সশস্ত্র সৈন্যরক্ষিত দুর্গমধ্যেও সেইরূপ। পলায়ন করিয়া এ আশঙ্কা হইতে রক্ষা পাইব না।'

এসকল কথার মর্ম কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না, কিন্তু শুনিয়া শুনিয়া বিস্ময়ের তীক্ষ্ণতা হ্রাস হইয়া যাইতেছিল। এরূপ অদ্ভুত কথা বিশ্বাস করিব কি না তাহাও বুঝিতে পারিতেছিলাম না।

আমি বলিলাম, 'সে যাহাই হউক, এখানে আর থাকিবারও কোন আবশ্যক দেখিতেছি না।'

'কিছু না। এখনি চল। বাদলাকে ডাকিব ?'

'ডাক।'

চন্দ্রকুমার রমণীকে ডাকিল। আমরা গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

৫

ছায়াশূন্য প্রান্তরে চলিতে চলিতে দিনমান অতিবাহিত হইল।

সন্ধ্যার পর লোকালয়ে উপনীত হইলাম। রাত্রিযাপনের জন্য একটি ক্ষুদ্র গৃহ ভাড়া লইলাম। বাদলা গৃহের ভিতর শয়ন করিল, চন্দ্রকুমার ও আমি দ্বারের নিকট শয়ন করিয়া রহিলাম। রাত্রে আমার ভাল নিদ্রা হইল না—চন্দ্রকুমার ও রমণীর সম্বন্ধে নানারূপ চিন্তা মনে উদিত হইতে লাগিল। কিরূপে ইহাদের পরস্পরের পরিচয় হইল ? কিসের আশঙ্কায় ইহারা এত ভীত ? এই অল্প সময়ের মধ্যে ইহাদের প্রতি আমার অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছিল। মনে হইতেছিল, যেন আমি ইহাদের সুখ দুঃখের ভাগী, ইহাদের কোন বিপদ হইলে আমি তাহার জন্য দায়ী।

নিদ্রিতাবস্থায় দুই-একবার চন্দ্রকুমার অস্পষ্ট ভাষায় একটা কথা কহিয়াছিল। কী বলিতেছিল, ভাল বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে গৃহের ভিতরেও শব্দ শুনিতে পাইলাম। রমণী নিদ্রিতাবস্থায় যেন কি বলিতেছে। আমি মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করিতে লাগিলাম।

রমণী আবার কথা কহিল। এবার বুঝিতে পারিলাম—'মীরাণ !' ভয়পীড়িত, কাতর এবং কিয়ৎ অস্পষ্ট স্বরে এই নাম বলিল। চন্দ্রকুমার পার্শ্ব ফিরিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, 'মীরাণ !'

চন্দ্রকুমার যে নিদ্রিত, তাহাতে আমার কোন সংশয় ছিল না, রমণী নিদ্রিত অথবা জাগ্রত বলিতে পারি না। কিন্তু উভয়ের মুখে এক কথা। যে ব্যক্তির নাম মীরাণ, উভয়েই তাহাকে জানে এবং উভয়েই তাহাকে ভয় করে। মীরাণ কে ?

গৃহে একমাত্র প্রদীপ তৈলশূন্য হইয়া নির্বাণোন্মুখ হইয়া আসিতেছিল। নির্বাণোন্মুখ প্রদীপ থাকিয়া থাকিয়া এক-একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। অবশেষে একবার জ্বলিয়া নিবিয়া গেল।

তখন আমার মনে হইল যেন নিকটেই কাহারও পদশব্দ ও নিশ্বাস শুনা যাইতেছে। আমি শয্যায় উঠিয়া বসিলাম ; শয্যাপার্শ্বে তরবারি ছিল, গ্রহণ করিলাম। কিন্তু দ্বারের নিকট রহিলাম। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। চন্দ্র অস্ত যায়, গৃহ-প্রাচীরে, বৃক্ষশিরে অল্প চন্দ্রালোক রহিয়াছে। নিচে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। মনুষ্যের কোনরূপ চিহ্ন কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

অন্ধকার ক্রমশ গাঢ়তর হইতে লাগিল। মনুষ্য কোথাও দেখিতে পাই নাই, কিন্তু মনুষ্যকণ্ঠ শুনিতে পাইলাম। কোথা হইতে শব্দ আসিতেছে, বুঝিতে পারিলাম না। শরীরে রোমাঞ্চ হইল, অজানিত আশঙ্কায় চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

শব্দ নিকটবর্তী হইল। শব্দ গম্ভীর, কিন্তু উচ্চ নহে। ভাষা বুঝিতে পারিলাম না। কয়েকটি কথা বারংবার মন্ত্রের ন্যায় উচ্চারিত হইতেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কে ?'

কোন উত্তর হইল না। শব্দ দূরে যাইতে লাগিল। কয়েকবার এইরূপ হইল। শব্দ নিকটে আসে, আবার দূরে চলিয়া যায়। একই কণ্ঠ, একই রূপ শব্দ। রাত্রিশেষে দূরে চলিয়া গেল, আর কিছু শুনিতে পাইলাম না।

৬

চন্দ্রকুমারের নিকট ঘটনার উল্লেখ করিলাম না। তাহার মানসিক অবস্থা যেরূপ, তাহাতে এইসকল কথা শুনিলে ভীত হইতে পারে। বলিলেও কোন ফল নাই।

রাত্রিকালে এইরূপ আশঙ্কা ও বিস্ময়জনক ব্যাপার নিত্য ঘটিতে লাগিল। আমি সকল কথাই গোপন রাখিতাম, চন্দ্রকুমার কিছু দেখিতে কিংবা শুনিতে পাইত কিনা বলিতে পারি না। আমাকে কখনো কিছু বলিত না।

পথের তিনদিন অবশিষ্ট রহিল। কয়েকদিন রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় চন্দ্রকুমার এবং রমণীর মুখে মীরাণ এই নাম শ্রবণ করিয়াছিলাম। অবশেষে কৌতূহল সংবরণ করিতে না পারিয়া চন্দ্রকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মীরাণ কে?'

নাম শ্রবণ মাত্র চন্দ্রকুমার শিহরিয়া উঠিল, চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, চক্ষু বিস্তৃত হইল, সর্বাঙ্গ থরথর কাঁপিতে লাগিল। আমার হস্ত ধারণ করিয়া অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'কে তোমায় বলিল?'

'কেহ বলে নাই, নিদ্রিতাবস্থায় তোমার মুখেই শুনিয়াছি।' রমণীর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় তাহার নাম করিলাম না।

চন্দ্রকুমার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'বাদলার মুখে শুনিয়াছ?'

আমি কহিলাম, 'নিদ্রিতাবস্থায় তাহার মুখেও শুনিয়াছি।'

চন্দ্রকুমার কোন কথাই কহিল না। কিছুক্ষণ পরে উর্ধ্বদিকে মুখ তুলিয়া কহিল, 'আর অধিক বিলম্ব নাই।'

আমি বলিলাম, 'কিসের?'

চন্দ্রকুমার কথার উত্তর দিল না, অন্য দিকে চলিয়া গেল।

শয়নের কাল উপস্থিত হইলে চন্দ্রকুমার নীরবে রোদন করিতে লাগিল। রমণীও কাঁদিল। হৃদয়-বিদারক কাতর স্বরে চন্দ্রকুমার কয়েকটি কথা কহিল, তাহাতে রমণীর অশ্রুধারা আরও বেগে বহিতে লাগিল।

গভীর রাত্রে সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইল। দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখি, দ্বারের নিকট মনুষ্যের ছায়া। এবার আমি শয্যাত্যাগ করিলাম না, ছায়ার প্রতি দৃষ্টি স্থির করিলাম। ছায়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল। কিয়ৎকাল পরে আবার দৃষ্ট হইল। দেখিলাম, ছায়ার হস্ত সঞ্চালিত হইতেছে। কয়েকবার এইরূপ হইল। অবশেষে একবার হস্তচ্ছায়া অত্যন্ত সঞ্চালিত হইল। গৃহের ভিতর তীব্র বিদ্যুৎশিখার ন্যায় আলোকরশ্মি প্রবিষ্ট হইল, আবার পূর্বের ন্যায় অন্ধকার। ছায়া অপসৃত হইল, আর কিছুই আমি দেখিতে পাইলাম না।

যে মুহূর্তে বিদ্যুতের ন্যায় আলোক গৃহে প্রবেশ করিল, সেই মুহূর্তে রমণী চিৎকার করিয়া উঠিল। চন্দ্রকুমার শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া রমণীর পার্শ্বে গেল। আমি আলোক লইয়া দেখি, রমণী নিস্পন্দ, নিশ্বাস-প্রশ্বাস রহিত হইয়াছে। বজ্রাঘাতে যেরূপ মৃত্যু হয়, রমণীর সেইরূপ মৃত্যু হইয়াছে। চন্দ্রকুমার রমণীর ললাট নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আমিও তাহার সহিত দেখিলাম, রমণীর ললাটে অঙ্গুলি-চিহ্ন রহিয়াছে।

চন্দ্রকুমার চিৎকার করিয়া কহিল, 'মীরাণ, আমাকে কেন লইলে না?' এই বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় রমণীর মৃতদেহ আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু তৎপূর্বে আর একবার সেইরূপ বিদ্যুৎ চমকিল। চন্দ্রকুমার চিৎকার করিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। দেখিলাম, তাহার ললাটেও অঙ্গুলির চিহ্ন রহিয়াছে।
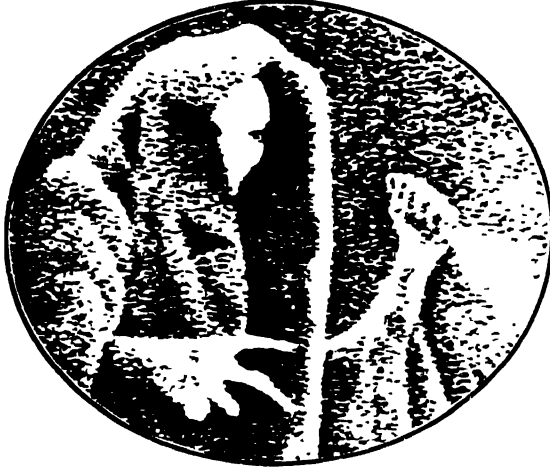
ফার্স্টক্লাশ ভূত

প্রমথ চৌধুরী

আমরা তখন সবে কলকাতায় এসেছি, ইস্কুলে পড়তে। কলকাতাব ইস্কুল যে মফস্বলের চাইতে ভাল, সে বিশ্বাসে নয়। কারণ ইস্কুল সব জায়গাতেই সমান। সবই এক ছাঁচে ঢালা। সব ইস্কুলই তেড়ে শিক্ষা দেয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় কেউই শিক্ষিত হয় না, আর যদি কেউ হয়, তা নিজগুণে—শিক্ষা বা শিক্ষকের গুণে নয়। আমরা এসেছিলুম ম্যালেরিয়ার হাত থেকে উদ্ধার পেতে।

আমরা আসবার মাস তিনেক পরে হঠাৎ সারদা দাদা এসে আমাদের অতিথি হলেন। সারদা দাদা কি হিসেবে আমার দাদা হতেন, তা আমি জানিনে। তিনি আমাদের জ্ঞাতি নন, কুটুম্বও নন, গ্রাম সম্বন্ধে ভাইও নন। তাঁর বাড়ি আমাদের গ্রামে নয়। দেশ তাঁর যেখানেই হোক, সেখানে তাঁর বাড়ি ছিল না। তিনি সংসারে ভেসে বেড়াতেন। আমাদের অঞ্চলে সেকালে উইয়ের ঢিবির মত দেদার জমিদারবাবু ছিলেন, আর তাঁদের সঙ্গে তাঁর একটা-না-একটা সম্পর্ক ছিল। সে সম্পর্ক যে কি, তাও কেউ জানত না; কিন্তু এর-ওর বাড়িতে অতিথি হয়েই তিনি জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন, আব সব জায়গাতেই আদরযত্ন পেতেন। তিনি একে ব্রাহ্মণ তার উপর কথায়-বার্তায় ও ব্যবহারে ছিলেন ভদ্রলোক। তাই তিনি দাদা হন, মামা হন, দূর সম্পর্কের শালা হন, ভগ্নীপতি হন—সকলেই তাঁকে অতিথি করতে প্রস্তুত ছিলেন। টাকা তিনি কারও কাছে চাইতেন না। তাঁর নাকি কাশীতে একটি বিধবা আত্মীয়া ছিলেন, আবশ্যক হলে তাঁর কাছ থেকেই টাকা পেতেন। সে মহিলাটির নাম সুখদা। সুখদার নাকি ঢের টাকা ছিল, আর সন্তানাদি কিছু ছিল না। তাই সুখদার আপনার লোক বলে তাঁর মানও ছিল।

সারদা দাদার আগমনে আমরা ছেলেরা খুব খুশি হলুম, যদিও ইতিপূর্বে তাঁকে কখনও দেখিনি, তাঁর নামও শুনিনি। আমাদের মনে হল, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে বাঁচব। কলকাতায় আমাদের কোন আত্মীয়স্বজনও ছিল না, কোন বন্ধুবান্ধবও ছিল না, যাব সঙ্গে দুটো কথা কয়ে সময় কাটান

যায়। আর ইস্কুলে সহপাঠীদের সঙ্গে গল্প করেও চমৎকৃত হতুম না, কারণ সেকালে কলকাতাই ছেলেদের কথাবার্তার রস কলকাতার দুধের মতই ছিল—নেহাৎ জলো।

সারদা দাদা রোজ সন্ধেবেলায় আমাদের দেদার গল্প বলতেন ; জীবনে তিনি যা দেখেছেন, তারই গল্প। মা অবশ্য আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সারদা যা বলে তার ষোল আনাই মিথ্যে। কিন্তু তাতে আমরা ভড়কাইনি। কেননা মিথ্যা কথা আদালতে চলে না, কিন্তু গল্পে দিবারাত্র চলে। সে যাই হোক, সারদা দাদা বেশির ভাগ ভূতের গল্প বলতেন। তবে সে কথা আমরা মার কাছে ফাঁস করিনি। শুনেছি বাবার একজন প্রিয় তামাকওয়ালা দাদার কাছে নিত্য ভূতের গল্প বলত, ফলে দাদা নাকি রাত্তিরে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে ভয় পেতেন, তারপর বাবা তাব প্রিয় তামাকওয়ালার আমাদের বাড়ি আসা বন্ধ করে দিলেন। পাছে মা সারদা দাদাকে বিদায় করে দেন, এই ভয়ে মার কাছে এ গল্পসাহিত্যের আর পুনরাবৃত্তি করতুম না। তা ছাড়া কলকাতা শহরে তো ভূতের ভয় নেই। বাস্তায় আলো, পথের ধাবে শুধু বাড়ি—জঙ্গল নেই। ভূতেরা আলোকে ভয় করে, ও মানুষের চেঁচামেচিকে। কলকাতায় আলো যতটা না থাক, হল্লা দেদার আছে। অত হট্টগোলের মধ্যে ভূত আসে না। সারদা দাদা শুধু সেই সব ভূতের গল্প বলতেন, যাঁদের তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। আমি তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করলুম—আপনি তো শুধু পাড়াগেঁয়ে ভূতেব গল্প কবেন, আপনি কি কখনও সাহেব ভূত দেখেননি ?

সারদা দা উত্তর কবলেন—দেখব কোত্থেকে ? সাহেববা তো আব এদেশে মরে না। না মবলে তাবা ভূত হবে কি করে ? দেখ, ট্রেনে এত বড় বড় কলিসান হয়, যাতে হাজাব হাজার দেশী লোক মবে, কিন্তু তাতে কোন সাহেব মরেছে, এমন কথা কি কখনও শুনেছ ?

—তবে এত গোরস্থানে কারা পোঁতা আছে ?

—সব ফিরিঙ্গি। তবে দু'চারজন সাহেব যে মরে না, এমন কথা বলছিনে। কিন্তু যারা মরে ভূত হয়, তাদের দেখা আমরা পাইনে।

—কেন ?

—এদেশে তারা গাছেও থাকে না, পায়ে হেঁটেও বেড়ায় না। তারা ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাশ গাড়িতে চড়ে বেড়ায়। আর ফিরিঙ্গি ভূতরা সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়িতে। তবে একবার একজনের দেখা পেয়েছিলুম, তা আর বলবার কথা নয়। আজও মনে হলে কান্না পায়।

—আমরা সেই সাহেব ভূতের গল্প শুনতে চাই।

সারদা দা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—

আচ্ছা বলছি শোন। কিন্তু এ গল্প যেন আর কাউকে বলো না।

—কেন ?

—কি জানি আবার যদি মানহানির মামলায় পড়ে যাই। মরা লোকেরও মানহানি করলে জরিমানা হয়, জেলও হয়। আমার জেল খাটতে ইচ্ছে নেই। এর পর সারদা দাদা বললেন—

আমি একবার কলকাতা থেকে কাশী যাচ্ছিলুম। হাওড়া স্টেশনে যখন পৌঁছলুম, তখন গাড়ি ছাড়ে ছাড়ে। তাই একটা খালি ফার্স্ট ক্লাশ গাড়িতে উঠে পড়লুম এই মনে করে যে, পরের স্টেশনে নেমে থার্ড ক্লাশে ঢুকব। গাড়ি তো ছাড়ল, অমনি বাথ-রুম থেকে একটি সাহেব বেরিয়ে এল। ঝাড়া সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, মুখ রক্তবর্ণ, চোখ গুগলির মত। আর তার সর্বাঙ্গে বেজায় মদের গন্ধ বেরুচ্ছে, আর সে বিলেতি মদের। সে ঘরে ঢুকেই বললে, 'কালা আদমী, নিচু যাও।' আমার তখন ভয়ে নাড়ী ছেড়ে গিয়েছে, আমি কাঁপতে কাঁপতে বললুম, 'হুজুর আভি কিস্তরে নিচু যায়েগা ? দুসরা স্টেশনমে উতার যায়েঙ্গে।' তিনি বললেন—'ও নেহি হো সকতা। তোমারা কাপড়া বহুত ময়লা আর তোমরা দেহ্ মে বহুত বদ্ বু। গোসলখানামে যাকে তোমরা কাপড়া উতারকে গোসল করো। আওর হুঁই বৈঠ্ রহো। হাম চলা যানেসে তুম গোসলখানাসে নিকলিয়ো। হাম যো বোল্তা আভি করো, জানতা হাম রেলকো বড়া সাহেব হ্যায় ?' আমি প্রাণের দায়ে হুজুর যা বললেন তাই করলুম, অর্থাৎ স্নানের ঘরে গিয়ে বিবস্ত্র হয়ে সেই শীতের রাত্তিরে স্নান করলুম। অমনি একটা দমকা হাওয়া এসে কাপড়চোপড় সব উড়িয়ে কোথায় নিয়ে গেল। আমি বিবস্ত্র হয়ে ভিজে গায়ে গোসলখানাতেই বসে রইলুম। আর সাহেব তাঁর কামরায় হুটোপাটি করতে লাগলেন ও মধ্যে মধ্যে চিৎকার করে

আমার প্রতি শূয়োর, গাধা, উল্লুক প্রভৃতি প্রিয় সম্ভাষণ করতে লাগলেন। আমি নীরবে সব গালিগালাজ হজম করলুম।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এই ভাবে কেটে গেল। আমি ভিজে গায়ে হি হি করে কাঁপছি, সর্বাঙ্গে এক টুকরো কাপড় নেই, আর পাশের ঘরে বড়সাহেব মদ খাচ্ছেন ও লাফাচ্ছেন।

মাঝপথে গাড়ি হঠাৎ মিনিটখানেকের জন্য থামল। ক্লিক্ করে একটা আওয়াজ হল— ছিটকিনি খোলবার আওয়াজ। তারপর গাড়ি ফের চলতে লাগল। পাশের ঘরে টুঁ শব্দ নেই; তাই আমি স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে সে ঘরে যাবার চেষ্টা করলুম। ও সর্বনাশ! বড় সাহেব স্নানের ঘরের দুয়োরের ছিটকিনি টেনে বন্ধ করে দিয়েছেন। আমি সেই অন্ধকূপের ভিতর আটক থাকলুম। আধঘণ্টা পর গাড়ি বর্ধমানে এসে পৌঁছল, আর আমি বাথ-রুমের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে, যা থাকে কপালে ভেবে 'কুলি' 'কুলি' বলে চিৎকার করতে লাগলুম। তারপর একজন কুলি এসে, ছিটকিনি খুলে, আলো জ্বেলে আমাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখে ভূত ভেবে ভয়ে পালিয়ে গেল। শেষটায় স্টেশন মাস্টার বাবু এসে—'ভূত নেহি হ্যায়, চোর হ্যায়' বলাতে কুলিরা পাশের ঘরে ঢুকে আমাকে মারতে মারতে আধমরা করে প্ল্যাটফরমের উপর টেনে নিয়ে গেল।

স্টেশনবাবু বললেন, 'শিগগির ওকে একটা কাপড় পরিয়ে দে। যদি কোন মেমসাহেব হঠাৎ এসে উলঙ্গমূর্তি দেখে মূর্ছা যান তাহলে আমার চাকরি যাবে।' একজন যাত্রী আমাকে একটি শাড়ি দিলে, সেই শাড়িখানা পরে আমি স্টেশনবাবুকে সব কথা বললুম। তিনি বললেন যে রেলের বড়সাহেব এখন সিমলায়; তা ছাড়া এ ট্রেনে কোন সাহেব আসেওনি, কোথাও নেমেও যায়নি। এখন বুঝলুম, যার হাতে আমি নাস্তানাবুদ হয়েছি, সে সাহেব নয়—সাহেবের ভূত। তারপর স্টেশনবাবু আমাকে থানায় পাঠিয়ে দিলেন। সেখানেও প্রথম একপত্তন মার হল, তার পর দারোগাবাবুর জেরা। যা ঘটেছিল, সব তাঁকেও বললুম। তিনি ভূতের কথায় বিশ্বাস করলেন, কেননা তিনিও একটি পেত্নীর হাতে পড়ে বেজায় নাজেহাল হয়েছিলেন।

তার পরদিনই দারোগাবাবু আমাকে আদালতে হাজির করলেন। আমার অপরাধ নাকি গুরুতর, আর অবিলম্বে আমার বিচার হওয়া চাই। হাকিমবাবু ছিলেন অতিশয় ভদ্রলোক, উপরন্তু উচ্চশিক্ষিত। তিনি গাড়িতে ভূতের উপদ্রবের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলেন, কারণ তিনি ছিলেন ঘোর থিয়োজফিস্ট। কিন্তু ভগবানের দোহাই ও ভূতের দোহাই ইংরেজের আদালতে চলে না। ভগবান ও ভূত এ দুয়ের অস্তিত্ব বে আইনী। অগত্যা তিনি আমাকে এক মাসের মেয়াদে জেল দিলেন। আমার অপরাধ বিনা টিকিটে বিনা বসনে ফার্স্ট ক্লাশ গাড়িতে গাঁজা খেয়ে ভ্রমণ। তারপর আমাকে সতর্ক করে দিলেন এই বলে যে— গাঁজা খাও তো খেয়ো; কিন্তু গাঁজায় দম দিয়ে আর কখনও বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ো না, বিশেষত তৈলঙ্গস্বামী সেজে ফার্স্ট ক্লাশে তো নয়ই!

আমি বললুম— 'হুজুর, গাঁজা আমি খাইনে।' তিনি বললেন, 'গাঁজাখোর বলেই তো তোমাকে লঘুদণ্ড দিলুম, নইলে তোমাকে দায়রা সোপর্দ করতুম।'

এখন তোমরা ফার্স্ট ক্লাশ ভূতের কথা তো শুনলে। এদের তুলনায় পাড়াগেঁয়ে ভূতেরা ঢের বেশি সভ্য।

উৎপীড়িতের প্রতিহিংসা

দীনেন্দ্রকুমার রায়

১

সিপাহী-বিদ্রোহ তখন শেষ হইয়াছে। ইংরেজের প্রবল পরাক্রমে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া বিদ্রোহীগণ শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু ইংরেজের ক্রোধবহ্নি তখনও নির্বাপিত হয় নাই। অস্ত্রধারী সিপাহী দেখিলেই ইংরেজ সৈনিকগণ তাহাদিগকে ধরিয়া আগুনে পোড়াইয়া মারিতেছে, কিংবা গাছে লটকাইয়া সঙ্গীনের আঘাতে উদর-বিদারণ-পূর্বক নিদারুণ প্রতিশোধ-পিপাসা প্রশমিত করিতেছে।

সিপাহী-বিদ্রোহের বিভীষিকা তখনও দূর হয় নাই। এক একদিন এক-একটা নতুন হুজুগ উঠিয়া রণশ্রান্ত ইংরেজ-সৈনিকগণের হৃৎকম্প উপস্থিত করিতে লাগিল। এই সকল হুজুগ হয়তো সর্ব্বৈব মিথ্যা। কিন্তু একদিনের হুজুগে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। একদিন সকালে জনরব উঠিল, —ছত্রভঙ্গ সিপাহীরা আবার জোট বাঁধিতেছে, টুপিওয়ালার গোঁফে আগুন লাগাইয়া দিবে, বেরেলী বিদ্রোহী সিপাহীদিগের প্রধান আড্ডা হইয়াছে। এই জনরব প্রচারের পর একদিন বেরেলীর ইংরেজ-দুর্গ হইতে আধ ডজন বন্দুক চুরি গেল। সকলে বুঝিল, ইহা নিরস্ত্র সিপাহীদিগেরই কাজ।

চারিদিকে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। ইংরেজ-সেনাপতির আদেশে বেরেলী দুর্গ হইতে দলে দলে অশ্বারোহী সৈন্য বন্দুকচোর সিপাহীদিগের সন্ধানে ছুটিল। কিন্তু চোর ধরা পড়িল না, তথাপি নির্দোষ ব্যক্তিগণ চৌর্যাভিযোগে দণ্ডিত হইতে লাগিল। যিনি ফরিয়াদী, তিনিই বিচারক, সাক্ষী ইংরেজসৈন্য ; অপরাধ সপ্রমাণ ও অপরাধীর প্রতি দণ্ডদান উভয়ই সমান উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিল।

কিন্তু ইহাতে চুরির হ্রাস হইল না। বন্দুকচুরির সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে তাহা চতুর্দিকে সংক্রামিত হইয়া পড়িল, ইংরেজের উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না। শেষে সেনাপতিগণ মন্ত্রণা করিয়া এক মিলিটারী কমিশন বসাইলেন। তাহার সভ্যসংখ্যা দশজন। কমিশনের সভাপতির প্রতি অপরাধীগণের সরাসরি বিচার করিয়া দণ্ডদানের ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। এই সভাপতি মহাশয়ের নাম কাপ্তেন থরন্‌টন্।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যভাগে একদিন অপরাহ্নে কাপ্তেন থরন্টন্ অশ্বারোহণে বায়ুসেবনার্থে সেনানিবাস হইতে বহির্গত হইবেন, এমন সময় একজন এডজুটান্ট একখানি আদেশপত্র তাঁহার স্বাক্ষরের জন্য লইয়া আসিল। মিঃ থরন্টন্ অশ্বগতি সংযত করিয়া তাঁহার সহকারী এডজুটান্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কি ?'

'আবদুল গফুর নামক একজন মুসলমান সিপাহীর কোতলের পরওয়ানা। একজন সারজেন্ট তাহাকে পাহাড়ের উপর গ্রেপ্তার করিয়াছে।'

'আসামীর জবাব কি ?'

'কোম্পানীর সৈন্য দেখিয়া সে তাহার হাতের বন্দুক তাড়াতাড়ি পাহাড়ের এক গুহার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। আসামী বলে, সে তাহার ভাই আবদুল আব্বাসের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছে, তাহার কোন কু-মতলব নাই। আবদুল আব্বাস পাঞ্জাবে সওদাগরী করে, আজ কয়েকদিন এদেশে আসিয়াছে। আসামী আবদুল গফুরের এ কথায় বিশ্বাস করা যায় না। সে সরকারের বন্দুক চুরি করিয়া বিদ্রোহীদিগের সাহায্যের জন্য যাইতেছিল। তাহার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত।' - এই বলিয়া এডজুটান্ট নীরব হইল।

'ঠিক কথা ; বদমায়েসকে গুলি করিয়া পশুর মত হত্যা কর।' কাপ্তেন অশ্বপৃষ্ঠ হইতেই অকম্পিতহস্তে হত্যার আদেশ লিপিবদ্ধ করিলেন।

অবিলম্বে এই আদেশ নির্বিঘ্নে প্রতিপালিত হইল।

২

যাহাদিগের চক্ষুর উপর এই হত্যা ব্যাপার সংসাধিত হইল, তাহাদের মধ্যে আবদুল গফুরের ভ্রাতা আবদুল আব্বাস একজন দর্শক ছিল। নীরবে সে তাহার ভ্রাতার শোচনীয় হত্যা সন্দর্শন করিল। তাহার শোকসন্তাপবিদ্ধ হৃদয়ের সমস্ত প্রবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া তাহার হৃৎপিণ্ডকে সবলে বিদলিত করিতে লাগিল, তাহার অশ্রুহীন চক্ষে প্রতিহিংসার অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

আবদুল আব্বাস তাহার ভ্রাতার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার বিধবা ভ্রাতৃবধূ ধরাতলে পড়িয়া অশ্রুধারায় মৃত্তিকা সিক্ত করিতেছে, শিশুপুত্র দুইটি তাহাদের মায়ের কোলের কাছে পড়িয়া মাটিতে লুটাইতেছে। আবদুল দেখিয়া আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। এই অত্যাচারের প্রতিশোধ দানের জন্য ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। গৃহে একটা পিস্তল ঝুলিতেছিল---পিস্তলটি কিছু পুরাতন ও মরিচা-ধরা। সেই পিস্তলে কাপ্তেনের প্রাণবধের জন্য সে কৃতসঙ্কল্প হইল।

ঠিক এই সময়ে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী আবদুল গফুরের কুটীরে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসী প্রাচীন কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার দেহে যুবজনোচিত সামর্থ্য বর্তমান। সন্ন্যাসীর নাম কি, তাহা কেহ জানিত না। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁহাকে সমভাবে ভক্তি করিত। মুসলমানেরা তাঁহাকে ফকির সাহেব বলিয়া ডাকিত, হিন্দুরা বলিত—স্বামীজি। কোম্পানীর নফরেরা তাঁহাকে কোন বিদ্রোহপরায়ণ ক্ষত্রিয়রাজার 'পলিটিক্যাল স্পাই' মনে করিয়া তাঁহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছিল। কিন্তু কোন বিষয়েই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সংসারের সুখদুঃখ ও জাতিভেদের গণ্ডীর অনেক ঊর্দ্ধে তিনি বিচরণ করিতেন।

সন্ন্যাসী একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভূম্যবলুণ্ঠিতা বিধবা ও তাহার রুদ্যমান সন্তানদ্বয়ের দিকে চাহিলেন। তাহার পর আবদুল আব্বাসকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'আব্বাস মিঞা, প্রতিহিংসার জন্য প্রস্তুত হইতেছ ?'

আবদুল আব্বাস অবিচলিতভাবে বলিল, 'যাহারা আমার নিরপরাধ ভ্রাতাকে অবিচারে হত্যা করিয়াছে, তাহাদের স্বহস্তে বধ করিয়া ভ্রাতৃশোক নিবারণ করিব। প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার।' সে অবিচলিত উৎসাহের সহিত বন্দুক ঘষিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন, 'বৎস, শান্ত হও। অত্যাচারের দণ্ডবিধানের কর্তা স্বয়ং ভগবান, তোমরা যাহাকে খোদা বল, তিনিই। প্রতিদিন প্রচুর রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তুমি আর সে স্রোতের বৃদ্ধি করিও

না। পরমেশ্বর তাঁহার কাজ করিবেন, অনুতাপে পাপীর হৃদয় দগ্ধ হইবে। রক্তপাত করিয়া আর তুমি তাহার অপেক্ষা কি অধিক দণ্ড বিধান করিবে।'

আবদুল আব্বাস দৃঢ়হস্তে বন্দুক চাপিয়া ধরিয়া সন্ন্যাসীর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি সংস্থাপন পূর্বক বলিল, 'ফকির সাহেব, আপনি হিন্দু, তাই হিন্দুর মত পরামর্শ দিয়াছেন। কাফেরের প্রাণবধেই মুসলমানের পরম পুণ্য, তাহাই মুসলমানের পরম ধর্ম। আমি সেই ধর্ম পালন করিব, আপনি বাধা দিবেন না।'

সন্ন্যাসী বলিলেন, 'আব্বাস মিঞা, তোমার এই ক্রোধের জন্য আমি তোমাকে অপরাধী করিতে পারি না। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সকল ধর্মের উপর এক ধর্ম আছে তাহা পরমেশ্বরের হস্তে আত্মসমর্পণ। আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তুমি এই হিন্দু সন্ন্যাসীর অনুরোধ রক্ষা করিলে কখনো কর্তব্যচ্যুত হইবে না। আমি কাহাকেও কখনো অন্যায় অনুরোধ করি নাই।'

আব্বাস মিঞা বন্দুক হাতে করিয়া কতক্ষণ কি ভাবিল, তাহার পর বলিল, 'আমরা সকলে আপনাকে পীরের ন্যায় মান্য করি, কখনো আপনার অবাধ্য হই নাই, আজও হইব না। প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ হস্ত শত্রু শোণিতপাতে বিরত হইবে। কিন্তু প্রতিশোধস্পৃহায় হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছে। কতদিনে এ অন্যায় অত্যাচারের প্রতিফল প্রদত্ত হইবে?'

সন্ন্যাসী একবার আকাশের দিকে চাহিলেন তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। সেই স্তব্ধ সান্ধ্য আকাশে নবোদিত তারকার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া তিনি ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর নবর্তী বনভূমির দিকে চাহিয়া স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বলিলেন, 'এক বৎসরের মধ্যে।'

বন্দুকটা যেখানে ঝুলান ছিল কক্ষমধ্যে প্রবেশপূর্বক আবদুল আব্বাস সেখানেই ঝুলাইয়া রাখিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বাহিরে দেখিল, সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইয়াছেন।

৩

রাত্রি আটটা। কাপ্তেন থরনটন্ তাঁহার শয়নগৃহের বারান্দায় পাদচারণ করিতেছেন। তাঁহার মন আজ চিন্তাপূর্ণ। আজ হঠাৎ তাঁহার মনে হইয়াছে, এই যে তিনি ক্ষমতাদর্পে অন্ধ হইয়া প্রতিনিয়ত মনুষ্যবধের আদেশ প্রদান করিতেছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে কতদূর সঙ্গত বা বৈধ হইতেছে, তাহা কি কোনদিন ভাবিয়া দেখিয়াছেন? কতকগুলি অসহায় দুর্বল মনুষ্যকে ধরিয়া তিনি তাহাদিগের বধের আদেশ দান করিতেছেন, কিন্তু তাহাদের কতটুকু অপরাধ আছে, তাহারা সত্যই অপরাধী কি না, তাহার কি কোনদিন প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন? তিনি ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার দায়িত্ব বিস্মৃত হইবার কিছুমাত্র অধিকার নাই। তিনি তাঁহার এই ব্যবহারে বৃটিশ রাজমহিমাই যে কলঙ্কিত করিতেছেন তাহা নহে, তাঁহার কর্তব্যজ্ঞান ও মনুষ্যত্বকে পর্যন্ত অবজ্ঞাত করিতেছেন। —এ সকল চিন্তা আজ প্রথম তাঁহার মনে উদিত হইয়াছে। তিনি মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ অস্বচ্ছন্দতা, কিছু কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন।

একজন দেশীয় অশ্বারোহী সৈনিকযুবা সহসা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। সে মিলিটারী প্রথায় কাপ্তেন সাহেবকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার হস্তে গালামোহর করা নীলবর্ণের লেফাফা-মোড়া একখানা পত্র প্রদান করিল। কাপ্তেন থরনটন্ যদি সে সময় একবার তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, তাহার মুখ মলিন ভীতি-বিস্ময়সমাকুল, তাহার সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে জ্বলন্ত গোলা অগ্নিস্রোতের ন্যায় সবেগে ছুটিয়া আসিতে দেখিলেও তাহার মনের ভাব হয়তো এরূপ হইত না, আজ সহসা তাহার এ ভাব কেন?

কিন্তু সেদিকে লক্ষ্যপাত মাত্র না করিয়া মিঃ থরনটন্ লেফাফার গালামোহর ভাঙিয়া পত্রখানি টানিয়া বাহির করিলেন। দেখিলেন, নীলবর্ণের চিঠির কাগজ, ভিতরে ইংরেজীতে এই কয়টি কথা মাত্র লিখিত।

'১৮৫৮ সালের ১৭ই জুলাই আবদুল গফুর নিহত হইয়াছে।

১৮৫৯ সালের ১৭ই জুলাই কাপ্তেন থরনটন্‌কে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। পাপের প্রায়শ্চিত্তের

আর এক বৎসর মাত্র বিলম্ব।'

পত্রের নিচে একটা স্বাক্ষর, অতি অস্পষ্ট স্বাক্ষর। তাহা কাহার হস্তাক্ষর, কাপ্তেন সাহেব বহু চেষ্টাতেওতাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না।

কাপ্তেন থরন্‌টন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পত্রবাহী পদাতিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে এই পত্র আনিয়াছে?'

'আবদুল গফুর, একজন মুসলমান সিপাহী।' ভগ্নস্বরে পদাতিক এই উত্তর দিল।

'অসম্ভব! আবদুল গফুরের প্রাণদণ্ড হইয়াছে।'

'হাঁ খোদাবন্দ, যাহাদের গুলিতে আবদুল গফুরের প্রাণ বাহির হইয়াছে, আমি তাহাদের মধ্যে একজন। তাহার প্রাণদণ্ডের পর যখন তাহার মৃতদেহ পর্বতগুহায় নিক্ষিপ্ত হয়, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু আমি আমার চক্ষুকে অবিশ্বাস করিতে পারি না। আবদুল গফুর এই কেল্লার ভিতর আসিয়া স্বহস্তে আমাকে এই পত্র দিয়া গিয়াছে।'

কাপ্তেন থরনটন্ কুসংস্কারান্ধ লোক ছিলেন না। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন, পদাতিকের নিশ্চয়ই কোনরকম চক্ষের দোষ ঘটিয়াছে। তথাপি একটা অজ্ঞাত ভয়ে ক্ষণকালের জন্য তাঁহার হৃদয় বিকম্পিত হইল। সংক্ষিপ্ত ও সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত ভাষায় লিখিত পত্রখানি প্রেতলোকের এক অপরিজ্ঞাত রহস্যময় ইঙ্গিতের ন্যায় তাঁহার বোধ হইল। কিন্তু তিনি ইংরেজ গবরমেন্টের একজন সাহসী কাপ্তেন, স্বহস্তে অনেক সিপাহী বধ করিয়াছেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই এই অপ্রীতিকর পত্রের কথা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইলেন।

৪

কাপ্তেন থরন্‌টনের স্ত্রী বিবি থরন্‌টন্ তখন আগ্রায় ছিলেন। ১৬ই আগস্ট রাত্রে কাপ্তেন সাহেব বেরেলী হইতে স্ত্রীকে দেখিবার জন্য আগ্রায় আসিলেন। স্ত্রীর নিকট হইতে এক জরুরী পত্র পাইয়া হঠাৎ তাঁহাকে আগ্রায় চলিয়া আসিতে হয়। ১৭ আগস্ট প্রভাতে কাপ্তেন সাহেব দুগ্ধফেননিভ শয্যায় সুখসুপ্তিমগ্ন ছিলেন। পূর্বদিনের পথশ্রমে তাঁহার শয্যাত্যাগে কিছু বিলম্ব হইল। বেলা প্রায় আটটার সময় তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া মশারির বাহিরে আসিতেই, বিবি থরন্‌টন্ তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিলেন। পত্রখানি সেই পূর্বের পত্রের মত নীল লেফাফায় আঁটা। পত্রখানি দেখিয়াই সহসা কাপ্তেনের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। কম্পিত হস্তে মেমসাহেবের নিকট হইতে পত্র লইয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে তিনি তাহা খুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, পত্রের ভাষা ও নামস্বাক্ষর অবিকল পূর্বের ন্যায়। প্রভেদের মধ্যে এই পত্রে লেখা আছে, 'পাপের প্রায়শ্চিত্তের আর এগার মাস মাত্র বিলম্ব।'

কাপ্তেন কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া তাঁহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এ পত্র কোথায় পাইলে?'

'সাতটার সময় বাংলোর বারান্দায় বেড়াইতেছিলাম। একটা দীর্ঘদেহ মুসলমান সিপাহী পত্রখানা আমার হাতে দিয়া কোনো কথা না বলিয়া চলিয়া গেল।'

কে এই সিপাহী? সাহেব শয়নের বস্ত্র পরিবর্তন না করিয়াই কক্ষমধ্যে অধীরভাবে পদচারণ করিতে লাগিলেন। বিবি থরন্‌টন্ সহসা স্বামীর এই প্রকার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভিত হইলেন, উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাহার পত্র, কি সংবাদ?'

'কিছু নয়',—বলিয়া কাপ্তেন পত্রখানি শতখণ্ডে ছিন্ন করিয়া বাতায়নপথে কক্ষের বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। এক খণ্ড উড়িয়া তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। সাহেব সেই কাগজ-টুকরা হাতে করিয়া পুনর্বার বাহিরে ফেলিতে যাইবেন, হঠাৎ তাহার উপর দৃষ্টি পড়িল। লেখা আছে,—'এগারো মাস।'

কাপ্তেন সাহেবের হৃদয় চিন্তাভারে প্রপীড়িত হইতে লাগিল। আজ তাঁহার মনে হইল নিশ্চয়ই কোন অতিপ্রাকৃত ঘটনার সহিত এই পত্রের সংস্রব আছে। তিনি বেরেলী হইতে পূর্বরাত্রে হঠাৎ আগ্রায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার বেরেলী ত্যাগের কথা তাঁহার দুই একটি বিশ্বস্ত বন্ধু ও উর্ধতন

কর্মচারী ভিন্ন অন্যের বিদিত ছিল না। তথাপি কে কিরূপে তাঁহার আগ্রা আগমনের সংবাদ পাইয়া এই পত্র পাঠাইল ? ইহা কি কেবল মিথ্যা ভয়প্রদর্শন মাত্র ? কোনক্রমে তাঁহার দুশ্চিন্তা দূর হইল না। এক চিন্তার পর আর এক চিন্তা আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল। তাঁহার ক্ষুধা নিদ্রা দূর হইয়া গেল। হুইস্কির সাহায্যে তিনি এই চিন্তা, এই অজ্ঞাত ভয় নিবারণের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সকল চেষ্টা বৃথা হইল, ঘোর অস্বচ্ছন্দ চিত্তে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল।

এই ঘটনার পর কোন রাজকার্যোপলক্ষে তাঁহাকে দিল্লী যাইতে হইল। ১৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রি নয় ঘটিকার সময় দিল্লীর ইংরেজ-সেনাপতির গৃহে এক প্রকাণ্ড 'ডিনারের' আয়োজন হইয়াছে। কাপ্তেন কর্নেল লেফটেনান্ট মেজর প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোটবড় সকল 'মিলিটারী জিনিয়াস' টেবিল পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়াছেন। মিলিটারী কুললক্ষ্মীগণ দেশের টেলরশপ অন্ধকার করিয়া সুপক্ষ প্রজাপতিবৃন্দের ন্যায় যোদ্ধৃবর্গের পার্শ্বে উপবেশন পূর্বক—"None but the brave deserves the fair"— সুকবি ড্রাইডেনের এই স্মরণীয় উক্তির সারবত্তা প্রমাণ করিতেছেন। ব্রোচ্ ব্রেসলেট নেকলেসের ঔজ্জ্বল্যে প্রদীপ্ত, আলোকে পুলকে উদ্ভাসিত, সুন্দরীগণের রূপজ্যোতি সৌরকর-প্রতিফলিত নির্ঝর-ধারার ন্যায় বিচ্ছুরিত হইতেছে। কাপ্তেন থরন্টন্ একটি সুন্দরী যুবতীর স্বাস্থ্যপানের আকাঙ্ক্ষায় গ্লাসটি তুলিয়াছেন, এমন সময় একজন আরদালি টেবিলের সন্নিকটবর্তী হইয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। পত্রখানি নীল লেফাফার ভিতর গালামোহর করা। পত্রখানি দেখিয়াই সাহেবের হাত হইতে গেলাস পড়িয়া গেল, তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল, সর্বশরীর বাতাহত পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। সহসা তিনি ভয়ানক অসুস্থ বোধ করিতেছেন বলিয়া ডিনার টেবিল পরিত্যাগ পূর্বক অন্য কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে পত্র খুলিতে সাহস হইল না। অনেক চেষ্টার পর পত্র খুলিয়া দেখিলেন, সেই এক কথা। নূতনের মধ্যে তাঁহার পরমায়ুব আরো একমাস হ্রাস হইয়াছে, এহাই লেখা আছে। পরদিন কাপ্তেন সাহেব দিল্লী ত্যাগ করিলেন। তিনি যেখানেই থাকুন, পর পর কয়েক মাস ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইতে লাগিল।

৫

কয়েকমাস পরে একদিন কাপ্তেন সাহেব দেরাদুনের সন্নিকটবর্তী কোন পার্বত্য অরণ্যে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। দিবাবসান কালে আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করিবার সময় তিনি অত্যন্ত শ্রান্তিবশত একটি ক্ষুদ্রকায়া গিরিতরঙ্গিনী-তীরে সংকীর্ণ পার্বত্যপথের উপর বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে একটি মনুষ্যমূর্তি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং অদূরবর্তী গিরিগুহা-প্রান্তে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও ঘনীভূত হয় নাই। কাপ্তেন সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন---সেই নিশ্চল নির্বাক দেহ আবদুল গফুরের।

সেই সায়ংকালে নির্জন গিরিনদীতটে অপরিসর পথের উপর ছয়মাস পূর্বে নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ সজীব দণ্ডায়মান দেখিয়া কাপ্তেন থরন্টন্ নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ভয়ে তাঁহার সর্বাঙ্গ কন্টকিত হইয়া উঠিল, তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু তিনি বীরপুরুষ, কাপুরুষের ন্যায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন না। মুহূর্তমধ্যে তাঁহার কক্ষস্থিত চর্ম-নির্মিত কোষ হইতে একটি রিভলবার আকর্ষণ পূর্বক আগন্তুকের মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলেন। কিন্তু আগন্তুক নিশ্চল। গুলি খাইয়া অক্ষত দেহে সে হা হা করিয়া হাসিয়া যেদিকে পূর্বে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছিল, সেই দিকেই দ্বিতীয় বার তাহার অকম্পিত হস্ত প্রসারিত করিল। তাহার সেই অবজ্ঞাপূর্ণ, জীবনের হর্ষোচ্ছ্বাসবর্জিত, নীরস উচ্চহাস্য সেই মৌন সায়াহ্নের শত গিরিগুহা প্রতিধ্বনিত করিয়া ধীরে ধীরে শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। তাহার নির্নিমেষ চক্ষুর তারকাদ্বয় দীপ্তিমান অগ্নিগোলকের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। সেই অবজ্ঞাব্যঞ্জক, রোষানলপ্রদীপ্ত তীব্র দৃষ্টি মনুষ্যেরও নহে, পশুরও নহে। তাহা উৎপীড়িত, আহত, প্রতিহিংসা-লোলুপ পৈশাচিকতায় পরিপূর্ণ। কাপ্তেন থরন্টন্ চক্ষু অবনত করিলেন। তাহার পর চক্ষু তুলিয়া যখন তাহার দিকে পুনর্বার চাহিলেন, দেখিলেন, কোথাও কেহ নাই, অস্তমান অংশুমালীর

অন্তিম কিরণরেখার ন্যায় তাহা অদৃশ্য হইয়াছে। শব্দহীন, গতিহীন ভাবে সে ছায়ামূর্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল ? ছায়া না কায়া ? কিছুই তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। সেই মূর্তি যে স্থান নির্দেশ করিয়াছিল, কাপ্তেন অবসাদশিথিল পদক্ষেপে অত্যন্ত মন্থরগমনে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। গুহাপ্রান্তে চাহিয়া দেখিলেন নীল লেফাফায় মোড়া একখানা পত্র, পূর্ব পত্রের ন্যায় গালামোহর করা, সেখানে পড়িয়া আছে। লেফাফার উপরে তাঁহারই শিরোনামা ! সাহেবের ললাটে স্থূল ঘর্মবিন্দু সঞ্চিত হইল, বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর হইল। তিনি সেই গুহাপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর পত্রখানি তুলিয়া মোহর ভাঙিয়া সন্ধ্যার মৃদু আলোতে তাহা পাঠ করিলেন। পত্রখানি পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায়ই সংক্ষিপ্ত। পত্রে তাঁহাকে জ্ঞাত করা হইয়াছে, তাঁহার আয়ুঃকাল আর ছয়মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে।

৬

ইহা নিশ্চয়ই যে অনৈসর্গিক ঘটনা, কাপ্তেন সাহেবের অতঃপর সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তাঁহার মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগ শতগুণ সংবর্ধিত হইল। তাঁহার মুখ হাস্যহীন, পাংশুবর্ণ। চক্ষু জ্যোতির্হীন, কোটরগত। দেহের লাবণ্য নাই, মনের দৃঢ়তা নাই, সংকল্পের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। এক একখানি পত্র কেবল যে তাঁহার পরমায়ুহ্রাসের সংবাদ বহন করিয়া যথা নিয়মে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইতে লাগিল, তাহা নহে। প্রত্যেক পত্র তাঁহার দেহের শোণিত শোষণ করিতে লাগিল। ক্রমে তিনি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলেন। কি দিবসে কি নিশীথে কি আলোকে কি অন্ধকারে, কি জাগরণে কি নিদ্রায়, বিধাতার অসংখ্য কঠোর বিধানের ন্যায়, অনির্দেশ্য হস্তলিখিত সেই সংক্ষিপ্ত পত্র সব ক্ষণ তিনি তাঁহার হৃদয়পটে মুদ্রিত দেখিতেন।

বেরেলী ক্যান্টনমেন্টের বাহিরে একদিন কাপ্তেন থরনটন্ অশ্বারোহণে প্রাতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। অন্যমনস্কভাবে অশ্বচালন করিয়া অবশেষে অনেক দূরে একটি সেতুর উপর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটি অনতিদীর্ঘ খালের উপর এই সেতু প্রসারিত।

সংকীর্ণ সেতু। কাপ্তেন সাহেব সেতুর অপর প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। সম্মুখেই দেখিলেন, একটি বৃদ্ধ। বৃদ্ধের নাম—রামহিত তেওয়ারি। মিঃ থরনটন্ রামহিতকে চিনিতেন। তাহার পুত্র পরীক্ষিৎকে বিদ্রোহী সন্দেহে সাহেব তোপের মুখে উড়াইয়া দিয়াছেন, তাঁহার আদেশে তাঁহার অধীনস্থ সিপাহীরা তাহার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে, অবশেষে তাহার একমাত্র অবলম্বন ক্ষুদ্র কটীরে অগ্নিসংযোগ করিয়া তাহা ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়াছে। পৃথিবীতে রামহিত তেওয়ারির আপনার বলিতে আর কেহ নাই, কিছু নাই।

সেই শিরাবহুল জীর্ণ বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া সেই জীবিত কঙ্কাল মিঃ থরনটনের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। পরে সাহেবের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, 'কাপ্তেন সাহেব, চিনিতে পার কি ? আমি তোমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি।'

সাহেব বলিলেন, 'আমার অপেক্ষায় ? আমার কাছে বিদ্রোহীর পিতার কি দরকার থাকিতে পারে ? ভিক্ষুক, পথ ছাড়িয়া দে। নতুবা বুকের উপর আমার অশ্বের ক্ষুর বিদ্ধ হইবে।'

'আমি সে ভয়ে ভীত নহি। ভগবান নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, উৎপীড়কের দমনকর্তা। তোমার দমনের জন্য তাঁহার ন্যায়দণ্ড উত্তোলিত রহিয়াছে। সাহেব, সাবধান !'

কাপ্তেনের দেহের সমস্ত রক্ত তাঁহার মুখে আসিয়া জমা হইল। তিনি বলিলেন, 'নিমকহারাম, আমার অপমানে সাহসী হইতেছিস ?'—সাহেব বন্দুক তুলিয়া রামহিতের মস্তক লক্ষ্য করিলেন।

বৃদ্ধ অচঞ্চল। বস্ত্রাঞ্চল হইতে একখানি পত্র উন্মোচন করিয়া দক্ষিণহস্ত সাহেবের দিকে প্রসারিত করিল। বলিল, 'সাহেব, তুমি দীনদুনিয়ার মালিক হইয়া দাঁড়াইয়াছ। তোমার অপমান করি, আমার এমন কি সাধ্য ? খাপা হইও না। তোমার নামে একখানি পত্র আছে, লও।'

সেই নীল লেফাফা, গালামোহর করা পত্র। সাহেবের হস্ত হইতে বন্দুক খসিয়া পড়িল। বৃদ্ধ রামহিত সেদিকে দৃষ্টিপাতমাত্র না করিয়া পত্রখানি কাপ্তেনের মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল। মিঃ থরনটন্ মন্ত্রৌষধিরুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ক্ষণকাল নিশ্চলভাবে সেখানে

অবস্থান করিলেন। তাঁহার চক্ষুর উপর চরাচর ঘুরিতে লাগিল, প্রভাতের উজ্জ্বল দিবালোক নিবিয়া গেল। দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল। কিন্তু অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বক পত্রখানি খুলিয়া পড়িলেন, সেই ভীষণ দৈববাণী। স্পষ্টাকারে লিখিত আছে—তাঁহার পরমায়ু আব একমাস!

'মেডিক্যাল লিভ' লইয়া সাহেব পরদিন বিলাতযাত্রা করিলেন। এতদিনে তাঁহার প্রতীতি হইয়াছে, একমাস পরেই তাঁহাকে দেহ বিসর্জন করিতে হইবে। দেশত্যাগ করিয়া যদি কোনক্রমে অব্যাহতি লাভ করা যায়।

৭

মিঃ ম্যাকফারসন্ বোম্বের একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। তিনি কাপ্তেন থরন্টনের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কাপ্তেন সাহেব জীর্ণদেহ, উদ্বেগতাড়িত হৃদয় লইয়া বোম্বে নগরে ভগিনীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। স্নেহময়ী ভগিনী দীর্ঘকাল পরে ভ্রাতার দেহ ও মনের অবস্থা দেখিয়া অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'এ অবস্থায় তুমি কোনক্রমেই জাহাজে উঠিতে পাইবে না, আমার এখানে থাকিয়া কিছু সুস্থ হও, পরে দেশে যাইও।'

কাপ্তেন ভগিনীর অনুরোধ ব্যর্থ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'এই রৌদ্রদগ্ধ অভিশপ্ত ভারত-বক্ষে আমাব সমাধি রচনা না করিয়া তুমি ছাড়িবে না। আর একমাসের মধ্যেই আমার জীবনেব অবসান হইবে।'

'এ বিশ্বাস তোমার কেন হইল? তোমার মস্তিষ্ক খারাপ হইয়াছে দেখিতেছি। তুমি সংসারের সকল চিন্তা ছাড়িয়া দাও।'

'চিন্তা আমি ছাড়িয়াছি, কিন্তু সে রাক্ষসী আমাকে ত্যাগ করিবে না। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে সে আমার বক্ষে বসিয়া আমার হৃদয়শোণিত শোষণ করিতেছে—আমি আর সহ্য করিতে পারি না।' —কাপ্তেনের মস্তক সোফার উপর লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

মিঃ থরন্টনের স্ত্রীও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। বিবি ম্যাক্ফারসন্ তাঁহার নিকট প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বিবি থরন্টন্ কিছুই জানিতেন না।

ভ্রাতার সুখশান্তি বিধানের জন্য বিবি ম্যাকফারসন প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলেন। আমোদ ও আনন্দের মধ্যে সর্বদা তাঁহাকে ডুবাইয়া রাখিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আমোদের প্রবৃত্তি কাপ্তেনের হৃদয়পিঞ্জর পরিত্যাগপূর্বক অন্তর্হিত হইয়াছিল। সহস্র চেষ্টাতেও পিঞ্জরের বিহঙ্গম পিঞ্জরে ফিবিয়া আসিল না।

ভগিনীর আগ্রহে কাপ্তেন থরন্টন্ কোন খ্যাতনামা বিলাতী থিয়েটারে একদিন সায়ংকালে অভিনয় দেখিতে গমন করিলেন। সেদিন মহাকবি শেক্সপীয়রের হ্যামলেট নাটকের অভিনয় ছিল।

অভিনয় দেখিতে দেখিতে 'বক্সের' উপর হইতে কাপ্তেন সাহেব আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। আত্মীয়বন্ধুগণ নিকটেই ছিলেন। তাঁহারা যুগপৎ উঠিয়া ব্যস্তভাবে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, কাপ্তেন মূর্ছিত। বহু চেষ্টায় তাঁহার মূর্ছা ভঙ্গ হইল। সাহেব বলিলেন, 'তোমরা হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মা দেখিয়াছ? আমি দেখিয়াছি সে প্রেতাত্মা হ্যামলেটের পিতা নহে, আবদুল গফুরের প্রেতাত্মা।'

বিবি ম্যাক্ফাবসন্ ভ্রাতার মস্তকে পাখা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে কি? আবদুল গফুর কে?'

'একজন সিপাহী। বিনা বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড করিয়াছি।'

কাপ্তেন সাহেবকে তৎক্ষণাৎ গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। ডাক্তার আসিয়া বিবিধ যন্ত্র সংযোগে তাঁহার দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'কাপ্তেনের 'ব্রেন ফিবার' হইয়াছে। অনেক দিনের রোগ—অবস্থা জটিল হইয়া উঠিয়াছে।'

তিন দিন সাহেব শয্যাগত রহিলেন।

চতুর্থ দিন সাহেবের অবস্থা অল্প ভাল বোধ হইল। অপরাহ্নে একখানি ইজিচেয়ারে তিনি বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। বাংলোর সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর। সমুদ্রের দিক হইতে মুক্ত বায়ুপ্রবাহ আসিয়া ললাটের ঘর্মবিন্দু ধীরে ধীরে অপসারিত করিতেছিল।

নীল পরিচ্ছদধারী, নীল-উষ্ণীষশোভিত, নীল-পতাকাধারী একজন মুসলমান সৈনিকপুরুষ সেই বারান্দায় আসিয়া একেবারে সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইল। কাপ্তেন তাহাকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। সৈনিকপুরুষ একখানি নীলবর্ণের পত্র বাহির করিয়া সাহেবের স্থির নিষ্প্রভ চক্ষুর উপর ধরিল। আজ পত্র লেফাফায় আবদ্ধ নহে। খোলা পত্র---অক্ষরগুলি লোহিত কালিতে অঙ্কিত। সাহেব নির্নিমেষ দৃষ্টিতে স্পষ্টাক্ষরে পাঠ করিলেন- -

'আজ ১৮৫৯ সালের ১৭ জুলাই
সূর্যাস্তের সঙ্গে তোমার পরমায়ু শেষ হইল।'

সাহেব চিৎকার করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সে মূর্ছা আর ভঙ্গ হইল না। বিবি ম্যাক্‌ফারসন্ নিকটেই ছিলেন। তিনি ছুটিয়া আসিয়া তীব্রস্বরে সেই মুসলমান সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুই?'

'উৎপীড়িতের প্রতিহিংসক।'

সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

গঙ্গা-যমুনা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেবার পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়া যেখানে বাসা করিয়াছিলাম ঠিক তার সম্মুখে বাদশাহি আমলের একটা বাগিচা ছিল। প্রকাণ্ড বাগান ; পাথবেব প্রাচীরে চারিদিক ঘেরা, তারি মাঝে পাথবে গাঁথা গোল-গম্বুজ তিনটা কবর। বাগানেব স্থানে স্থানে লাল পাথবে বাঁধান হৌজ, তার মাঝে জলের ফোয়ারা ; বড় বড় নিমগাছের তলায় শ্বেত পাথরের চাতাল। স্থানটা জনশূন্য এবং অযত্নে এখন নষ্টশ্রী। বাগিচার খবরদারি করিতে কোম্পানি বাহাদুরের নিযুক্ত একজনমাত্র বৃদ্ধ মালী ছিল এবং তাহারই যত্নে দুইচারিটা ফুলগাছ ও কতকটা সবুজ ঘাস সেই স্থানটাকে মনোরম এবং সকালে সন্ধ্যায় হাওয়া খাইয়া বেড়াইবার মত করিয়া রাখিয়াছিল।

আমার বাসার ত্রিসীমানায় আর জনমানব ছিল না। খবরের কাগজ এবং দুই একখানা চিঠি লেখা ছাড়া হাতে কাজও বড়-একটা ছিল না, সুতরাং সেই বৃদ্ধ মালীর সঙ্গেই বন্ধুতা পাতাইলাম ও সিকি দুয়ানির লোভ দেখাইয়া তাহাকে আমার বাংলা ঘরের এক কোণ দখল করিতে রাজী করিলাম। সন্ধ্যাবেলা ঠিকা চাকর দুইজন কাজ শেষ করিয়া যখন আমায় একলা রাখিয়া চলিয়া যাইত তখন মালী আসিয়া গল্প জুড়িয়া দিত। আমি তাহার মুখে সিপাইবিদ্রোহ, কমিশনার সাহেবের বাঘ শিকার শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম। শীতকালের সন্ধ্যাটা তামাকের ধূম আর গল্পের পর গল্পে বেশ গরম থাকিত।

নিষ্কর্মা মানুষের অনেক রকম বাতিক আসিয়া জোটে ; আমারও তেমনি অনেকগুলা ছোট-খাটো বাতিক দেখা দিল ; তার মধ্যে লেখা বাতিকটা সর্বপ্রধান। আমি প্রথম প্রথম ছোট গল্প এবং খণ্ড কবিতা লিখিয়া মাসিকপত্রে পাঠাইতে লাগিলাম। ছোট করিয়া লেখা যে সহজ নয় এ কাণ্ডজ্ঞান তখন আমার জন্মে নাই। যাই হোক নেশা ক্রমে জমিয়া উঠিল। ডিকিনসনের দোকানে রীতিমত হিসাব খুলিয়া মাসিকপত্রের জন্য আর একটা উপন্যাস আরম্ভ করিয়া দিলাম। উপন্যাসটা যে সেই সাহি-বাগের কবর তিনটার চারিদিক বেড়িয়া বেড়িয়া গজাইয়া উঠিতেছিল তাহা আর বলিতে হইবে

না। কলসের মধ্যে আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মত গল্পটা আমার তিনটি মাত্র পরিচ্ছেদের ভিতরে দিবারাত্রি খাটিয়া বেশ ফেনাইয়া তুলিতেছিলাম।

সেই সময় একদিন বাদলার পরে দারুণ শীত পড়িল,—ঘরে আর বসিয়া থাকিবার যো রহিল না। উপন্যাসটার একটা পরিশিষ্ট সেই সাহি বাগিচার কবরের উপরে বসিয়া লিখিব মনস্থ করিয়া খাতা হাতে বাহির হইলাম।

উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে বরফের মত তীক্ষ্ণ হাওয়া বহিতেছিল। ঘাসের উপরে মেহ্‌দী গাছের বেড়ার গায়ে গায়ে শিশিরের জাল পড়িয়াছে। বেলা আটটা; তখনও সূর্যদেবের দর্শন নাই। বাগিচার সান্‌বাঁধা রাস্তায় চলিতে পা যেন হিম হইয়া গেল। আমি নিঃশব্দে গিয়া বাগিচার মধ্যে বড় কবরটায় আশ্রয় লইলাম। কবর-স্থানের দেওয়ালের একদিকে আনার ফুলের জালি দিয়া বাহিরের আলোক আসিতেছিল, আমি তাহারই কাছে বসিয়া লিখিতে লাগিলাম। দিবসের আহার সঙ্গে লইয়া ঠিকা চাকরদের ছুটি দিয়া আসিয়াছিলাম। সুতরাং বাসায় যে ফিরিতে হইবে তাহা মনেই ছিল না। লেখা শেষ করিয়া যখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম তখন সমাধি-গৃহটা অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে;— চারিদিকের দেওয়ালে নানা বর্ণের প্রস্তরে লেখা বিচিত্র লতাপাতা, কার্নিসের কোলে কোলে পাথরে খোদাই করা আল্লার স্তোত্র স্পষ্ট আর দেখা যায় না। জালির ভিতর দিয়া একটুখানি চন্দ্রালোক কবরের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—ঠিক যেন কে সেখানে বড় বড় রূপার ফুল ছড়াইয়া গিয়াছে।

আমি বাহির হইবার জন্য দ্বারের নিকট আসিয়া দেখিলাম দ্বার বন্ধ। মালী ঠিক নিয়মিত সময়ে বাহির হইতে শিকল টানিয়া চলিয়া গিয়াছে। শীতকালে জলে পড়িলে যেমন হয়, হিম অন্ধকারের ভিতর প্রাণটা আমার তেমনই হাঁফাইয়া উঠিল। পকেট হইতে দেশলাই লইয়া একটা জ্বালাইলাম এবং তাহারই ক্ষীণ আলোকে পথ চিনিয়া যেখানে বসিয়া লিখিতেছিলাম সেইখানে আসিয়া বসিলাম। অন্ধকার কবরে চামচিকা বাদুড় এবং কে জানে আরো কাহাদের সহিত একা প্রাণী রাত কাটাইতে হইবে ভাবিয়া মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

আজ রাত্রিটা জাগিয়া কাটাইবার মতলব করিয়া একটার পর একটা সিগারেট ধরাইতে লাগিলাম। এভাবে কতক্ষণ কাটিয়াছিল বলিতে পারি না। হঠাৎ এক সময়ে একটা ঝনঝন শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠিলাম। প্রথমটা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, ক্রমে সকল কথা মনে আসিল।

মালী খুব প্রাতে আসিয়া কবরের দরজা খুলিয়া দিত, আমি ভাবিলাম সেই বুঝি শিকল খুলিল। তাড়াতাড়ি উঠিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু পারিলাম না—হাতপা যেন অবশ হইয়া গিয়াছিল। ঘোর অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। পকেটে হাতড়াইয়া দেশলাই বাহির করিলাম, আন্দাজে আন্দাজে একটা কাঠি ঘসিলাম—খস্ করিয়া বাক্সের গায়ে শব্দ হইল কিন্তু আলোটা যেরূপ হইল তাহাতে আমি অবাক হইলাম;—দেশলাই কাঠিকে এরূপ ব্যবহার করিতে জন্মে দেখি নাই! কাঠিটার মাথায় অগ্নিশিখা নাই অথচ সমস্ত গৃহটা যেন দিনের মত স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল।

আমি দেখিলাম চারিদিকে শ্বেত পাথরের দেওয়ালে লেখা বিচিত্র বর্ণের লতা, পাতা, ফুল, ফল, মণিমানিক্যের মত ঝক্‌মক্ করিতেছে। দিনের বেলায় কতদিন এই কবরের ভিতর বেড়াইয়া গিয়াছি কিন্তু এত কারুকার্য তো কোনদিন চোখে পড়ে নাই! দেওয়ালগুলো যেন আয়নার মত মসৃণ—কোথাও বিন্দুমাত্র ময়লা ছিল না। বোধ হইল যেন আজ প্রস্তুত করিয়াছে! এক মুহূর্তে আমার চোখের সম্মুখে মোগল শিল্পের সমস্ত গৌরব উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। সামান্য একটা দেশলাই কাঠি যে এরূপ কাণ্ড ঘটাইবে আমি আশা করি নাই। সোনার কাঠির স্পর্শে যেন একটা মায়ারাজ্যের দ্বার খুলিয়া গেছে মনে হইল। বাহিরে বাগিচায় গোলাপ ফুল ফুটিয়াছিল কিনা কে জানে, কিন্তু একটা মৃদু গোলাপী গন্ধ এবং জলের ফোয়ারায় একটা শীতল ঝর্ঝর সংগীত স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম। কেবলি মনে হইতে লাগিল এখনি আমার চোখের সম্মুখ হইতে অতীতের একখানা পর্দা সরিয়া যাইবে। আমি একটা অনাবিষ্কৃত রহস্যের এক অঙ্ক পাঠ করিবার আশায় লোলুপ চিত্তে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। কতক্ষণ এরূপ অবস্থায় কাটাইয়াছিলাম বলিতে পারি না। হঠাৎ এক সময়ে সমস্ত আলোক নিভিয়া গিয়া চারিদিক অন্ধকার হইয়া একটা দারুণ শীত ও সঙ্গে সঙ্গে কম্প হাড়ে হাড়ে বিঁধিতে লাগিল। আমি গায়ের লুইখানা টানিয়া মুড়ি দিলাম এবং যে অভিনয়টি দেখিবার আশা করিতেছিলাম তাহাতে নিরাশ হইয়া নিদ্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। হঠাৎ আমার

খাতাখানার কথা মনে পড়িল—সেটাকে উপাধান করিব বলিয়া। কিন্তু খাতা নাই! অন্ধকারে আশপাশ হাতড়াইয়া দেখিলাম খাতার চিহ্নমাত্র নাই! তখনই একটা দেশলাই জ্বালিয়া খাতার সন্ধানে উঠিলাম। এবার দেশলাইটা আর পূর্বের মত ব্যবহার করিল না—সহজভাবেই জ্বলিতে লাগিলে।

আমি যেখানে বসিয়াছিলাম তাহার এককোণে অনতিগভীর একটা শূন্য কবর ছিল, আমি সেই স্থানটায় ভাল করিয়া খুঁজিবার জন্য আলোক হাতে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। সহসা সেই সময়ে কে যেন পশ্চাৎ হইতে আসিয়া আমাকে স্পর্শ করিল এবং চমৎকার উর্দুতে বলিয়া উঠিল- বাবুজী, এই যে তোমার কেতাব! আমার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল! চিৎকার করিবার শক্তি ছিল না—কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল। যন্ত্রচালিতের মত আমি ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। মাথার ভিতরটা ঝাঁঝাঁ করিতেছিল, চোখে ভাল দেখিতে পাইতেছিলাম না। সম্মুখে দেখিলাম অস্পষ্ট ছায়ার মত মোগলাই পাগড়ি এবং জামাজোড়া পরনে এক পুরুষমূর্তি! সে ধরনের কাপড় এবং শিরস্ত্রাণ এখন চলিত নাই কিন্তু তবু লোকটি যেন চেনাচেনা বোধ হইল। তাহার শ্মশ্রুহীন মুখে এমন একটা কমনীয়তা ও রাজভাব বিদ্যমান ছিল যে, তাহাকে দেখিয়াই আমি বুঝিলাম, ইনি কোন বড় লোক হইবেন।

পশ্চিমে অনেক দিন থাকিয়া আমার মুসলমানি আদব কায়দা ও উর্দুভাষাটায় বিলক্ষণ দখল জন্মিয়াছিল। আমি লোকটিকে রীতিমত সেলাম ও সম্ভাষণ করিয়া খাতাখানির জন্য হাত বাড়াইলাম।

লোকটি একটু হাসিয়া বলিলেন—খাতাতে কী লিখিয়াছেন পড়িয়া শুনাইতে আপত্তি আছে কি?

রাত্রি এখনো অনেক আছে—খাতা শুনাইতে আমার আপত্তি দূরে থাক, শুনাইবার লোক পাইলে বাঁচি, তবু ভদ্রতার খাতিরে বলিলাম—যদি আপনার বিরক্তি না হয়—

'তবে আসুন' বলিয়া লোকটি আমাকে লইয়া সেই সমাধিগৃহের পূর্বদিকের এক অংশে প্রকাণ্ড একখানা শ্বেতপাথরের চৌকির উপরে গিয়া বসিলেন। ধরিয়া ধরিয়া লেখা শুনাইয়া অনেক মানব-আত্মাকে আমি নির্ভয়ে যন্ত্রণা দিয়াছি, এবার প্রেতাত্মার সঙ্গে আলাপটা এই সূত্রে কীরূপে জমিবে সেটি একটা ভাবনার বিষয়। যাহা হউক, গল্প শুরু করিয়া দিলাম এবং যত শীঘ্র পারা যায় শেষটা পরিচ্ছেদ শেষ করিলাম। গল্পের পরিশিষ্টটাও শুনাইয়া দিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু শ্রোতার মুখে উৎসাহের লক্ষণ বড় একটা দেখা গেল না, সুতরাং খাতা বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—গল্পটা আপনার কেমন লাগিল? উত্তর হইল—মন্দ নয়। কিন্তু সাহিবাগের ইতিহাসটা আপনি যেরূপ দিয়াছেন সত্য ইতিহাসটা তাহা অপেক্ষা আরও হৃদয়বিদারক এবং আমিই সেই বিয়োগান্ত নাটকের প্রধান অভিনেতা ছিলাম। তবে বলি শুনুন:

'দিল্লীর রাজ-তক্তের ঠিক নিচেই আমার আসন ছিল। হিন্দুস্থানের বাদশাহি একদিন আমাকেই করিতে হইবে এ কল্পনাও সময়ে সময়ে করিতাম। বাদশাহি প্রথামত এক হিন্দু রাজকুমারীর সহিত আমার প্রথমে বিবাহ হয়। আমি ২১ বৎসরে ছয়-হাজারি শাসনকর্তার পদ ও হিন্দুবেগমকে লইয়া বাংলাদেশে গেলাম। সেইখানে আমাদের নব অনুরাগের মাঝখানে গোপন বিচ্ছেদের প্রথম সঞ্চার। যে মোগলকুমারী আমাদের দুই হৃদয়ের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার রূপের সীমা ছিল না, আর যে রাজসুতাকে আমি আল্লার নাম লইয়া বরণ করিয়াছিলাম, তাঁহার গুণের স্মৃতি প্রেতলোক হইতে আজিও আমায় আকর্ষণ করিয়া আনে। বাংলাদেশে আসিয়া কেবল যে রাজ্যশাসনে ব্যস্ত নই একথা কে জানে কেমন করিয়া দিল্লীতে পৌঁছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই দরিয়াগঞ্জ ও তৎসন্নিহিত ভূখণ্ডের শাসনভার অনতিবিলম্বে লইবার জন্য জরুরী পরোয়ানা আমার নিকট পৌঁছিল। আমি বাধ্য হইয়া বাংলাদেশের বসন্তলীলা অসময়ে এবং অতি অশোভনরূপে অসমাপ্ত রাখিয়া সপরিবারে এই নিমগাছের দেশে চলিয়া আসিলাম। মনটা আমার যে নিমের মতনই তিক্ত হইয়া গিয়াছিল সেটা অধীনস্থ সকলে কিছুদিন ধরিয়া বেশ অনুভব করিতে থাকিল। ভাবিয়াছিলাম শাসনকার্যে আমার অতি মনোযোগ, শীঘ্রই দিল্লী দরবারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে এবং অচিরে পুনরায় আমাকে বাংলাদেশে নির্বাসিনে যাইতে হইবে। কিন্তু যেরূপটা চাহিয়াছিলাম সেরূপটা ঘটিল না। স্থান বদলের তাগিদ না আসিয়া উল্টিয়া বরং দরিয়াগঞ্জে নৌ-সেতুটা ভাল করিয়া বাঁধিয়া গঙ্গা-যমুনার সংগম স্থলে প্রাচীন কেল্লাটাকে সুদৃঢ় ও নিজের বাসোপযোগী করিয়া লইবার জন্য তিন গাড়ি মোহর আসিয়া হাজির হইল। আমি বেশ বুঝিলাম দিল্লী হইতে আমার জন্য সোনার শৃঙ্খল আসিল এবং আমার নিজের

কারাগার নিজেই প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। বাংলাদেশ ছাড়া দুর্দমনীয় সাহাজাদাদিগের জন্য অন্য স্থানও ছিল, সেটা আমি বেশ জানিতাম। সুতরাং সেই তিন গাড়ি মোহরের জন্য দিল্লীতে একটা বিশেষ রকম ধন্যবাদ প্রেরণ করিয়া যতটা সম্ভব প্রফুল্লচিত্তে কাজে লাগিয়া গেলাম। হিন্দুবেগমের অনুরোধে যমুনা তীরে একটা হিন্দুর দেবমন্দির ঘিরিয়া আমি কেল্লা ও আমার মণি মাণিক্যে বিচিত্র অপূর্ব প্রাসাদ গাঁথিয়া তুলিলাম। সেখানে সেই গঙ্গা-যমুনার চিরমিলনের তীরে আমার বিবাহিত জীবনের দ্বিতীয় অঙ্কটা আরম্ভ করিলাম এবং সেটা যে চোখের জলে চিরবিরহের করুণ ক্রন্দনের মাঝখানে শেষ কবিয়াছিলাম তার সাক্ষী এই কবর তিনটি। তারপর আমি ওই দক্ষিণ দিকের কবরটায় আমার হিন্দু বেগমকে বামদিকের ছোট গম্বুজটার নিচে আমাদের চারি বৎসরের স্নেহের ধনকে ফেলিয়া রাখিয়া দিল্লীর রাজতক্তে গিয়া বসিলাম। সেখানে ঐশ্বর্যের নেশা, রূপের লালসা কোনটাই অতৃপ্ত রহিল না। যাহার জন্য বাংলাদেশে নির্বাসিনকামনা করিয়াছিলাম ; সেই মোগলকন্যাকে একদিন সুতীক্ষ্ণ ছুরির বিদ্যুদ্দাম করাল রুধির বর্ষার অভিসার রজনীতে হিন্দুস্থানের অধীশ্বরীরূপে বাদশাহি তক্তে আমার পাশে আনিয়া বসাইলাম। তারপরে অভাবনীয় ভোগ এবং পিতৃদ্রোহী ভ্রাতৃহন্তা, সন্তানগণের হাতে মর্মান্তিক শোক ও যন্ত্রণার মাঝে জীবনের আমার তৃতীয় অঙ্কটা হঠাৎ একদিন শেষ করিলাম। এই যে মাঝের কবরটা দেখিতেছ এটা আমি নিজের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলাম। কিন্তু কে জানে, কেন তাহারা আমাকে এখানে আনিল না। লাহোরের আনারবাগে আমায় নিয়া সেই রূপবতী মোগলকুমারীর পাশে রাখিয়াছে, আর আমার প্রেতাত্মা এই সাহিবাগের শূন্য কবরটায় স্থানলাভ করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গঙ্গা যমুনার চিরমিলনের মাঝে যেমন রেখামাত্র ব্যবধান কিছুতে মুছিবার নয়, আমি তেমনি মোগল সম্রাট আর আমার হিন্দুবেগম যমুনার দুই জনের মাঝে শূন্য কবরের বিচ্ছেদ চিরদিন অপূর্ণ রহিয়া গেছে ! ওই ঘোড়া আসিয়াছে, আমি তবে চলিলাম, আপনি বিশ্রাম করুন।'

আমি কী একটা বলিতে যাইতেছিলাম, হঠাৎ বিজাতীয় ভাষায় Well, good morning শুনিয়া চমকিয়া দেখিলাম ঘোড়ায় চড়িবার সাজ পরিয়া দারাগঞ্জের ডাক্তারসাহেব। ইনি মাঝে মাঝে সকালবেলা অশ্বারোহণে সাহি-বাগিচায় বেড়াইতে আসিতেন।

সর্বনাশিনী

পাঁচকড়ি দে

তুষারমণ্ডিত অভ্রভেদী হিমালয় দেখিবার ইচ্ছা বহুকাল হইতে আমার হৃদয়ে নিতান্তই বলবতী ছিল, তাই আমার চিরসহচর প্রাণের বন্ধু প্রবোধচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া আমি একদিন দার্জিলিং রওনা হইলাম।

আমরা পথে এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিলাম। আমাদের উভয়েরই মত যে, রেলে গেলে হিমালয় প্রকৃতভাবে দেখা হইবে না। রেল যেন উড়িয়া যায়, এরূপ অবস্থায় বেলে গমন করিলে হিমালয়ের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য প্রকৃত উপলব্ধি করা কোন প্রকারেই সম্ভবপর হইবে না। এই জন্য আমরা উভয়েই স্থির করিলাম যে, আমরা শিলিগুড়ি হইতে পদব্রজে দার্জিলিং রওনা হইব।

সকালে শিলিগুড়ি উপস্থিত হইলাম। যতক্ষণ দার্জিলিংএর সুন্দর ক্ষুদ্র গাড়িগুলি দৃষ্টিপথে রহিল, ততক্ষণ স্টেশনে আমরা তাহার বিচিত্রগতি দেখিতে লাগিলাম। তৎপরে দুই কুলির মস্তকে আমাদের দুইজনের দুই ট্রাঙ্ক চড়াইয়া দিয়া নিজ নিজ হাতে ব্যাগ ঝুলাইয়া বাজারের দিকে চলিলাম।

পথেই দুই একটি বাঙালীর সহিত দেখা হইল। আমরা বাজারেই বাসা লইব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই তাহা করিতে দিলেন না। জোর করিয়া তাঁহাদের বাসায় লইয়া গেলেন। আমরা যাঁহার বাড়িতে উঠিলাম, তিনি এখানে শালকাঠের ব্যবসায় করেন।

সেদিন সে রাত্রি আমরা শিলিগুড়িতেই রহিলাম। সকলেই আমাদিগকে বলিলেন, পাহাড়ে হাঁটিয়া যাইতে ভারি কষ্ট হইবে, বরং গরুর গাড়ি করিয়া যান। আমরা পদব্রজে যাওয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম। প্রকাশ্য সদর রাস্তা দিয়া যাইব না, তাহাও স্থির। সে রাস্তায় বহু লোক চলাচল করে, বহু গরুর গাড়ি মাল লইয়া সর্বদাই যাতায়াত করিয়া থাকে, অধিকন্তু তাহারই পার্শ্ব দিয়া রেল গিয়াছে। সুতরাং এ রাস্তায় হিমাচলের গুরুগম্ভীর সৌন্দর্য উপভোগের সুবিধা হইবে না, সুতরাং আমরা সে পথে প্রাণ থাকিতে যাইব না।

যে পথে পাহাড়ীয়াগণ চলা-ফিরা করে, সেই ক্ষুদ্র অপরিসর পথ দিয়া আমরা যাইব। তবে

পাহাড়ের পথ দুর্গম, তাহাতে আমরা পথ চিনি না, সুতরাং আমাদের একজন পথপ্রদর্শক আবশ্যক।

অর্থে কি না হয়? আমাদের নূতন বন্ধুদিগের অনুগ্রহে, আমরা তাহাদের বিশ্বাসী একজন মহাবলবান্ ভুটিয়া পথপ্রদর্শক পাইলাম। সে তাহার তিনজন বিশ্বাসী কুলি সংগ্রহ করিল। পরদিবস অতিপ্রত্যূষে কুলির মস্তকে দ্রব্যাদি দিয়া ভগবানের নাম মনে মনে উচ্চারণ করিয়া আমরা যাত্রা করিলাম।

প্রথমে আমাদের অগ্রে—কোমরে দুই খুক্‌রী, হস্তে এক বৃহৎ লগুড়, ভুটিয়া থম্বিমেনা। তৎপশ্চাতে আমরা দুইজন, তৎপশ্চাতে তিনজন কুলি। আমরা মহানন্দা নদীর পোল পার হইয়া মাটিয়াখোলার হাট উত্তীর্ণ হইলাম, তৎপরে নক্সাবারীর পথ ধরিয়া চলিলাম।

পথে এক কাঁইয়াব দোকান পাইয়া তথায় রন্ধন ও ভোজনকার্য সারিয়া লইলাম। এই দুর্গম জঙ্গলেও মাড়োয়ারী মহাত্মাদিগের অভাব নাই, মধ্যে মধ্যেই দোকান, দোকানে প্রায় সর্বদ্রব্যই ক্রয় কবিতে পারা যায়।

আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া আবার রওনা হইলাম। আমাদের হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য বর্ণন করিবাব এখানে উদ্দেশ্য নহে, নতুবা আমরা এই রূপের শেখর শ্রীযুত হিমালয় মহাশয়েরর রূপ বর্ণন করিবার চেষ্টা পাইতাম। সুতরাং আমরা এ কথার উত্থাপন করিব না।

এই হিমালযে এমন প্রায়ই ঘটে যে কোথাও কিছু নাই অকস্মাৎ কুয়াশা উত্থিত হইয়া চারিদিক আচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় হইয়া যায়। তখন আর কিছুই দেখা যায় না—অতি কষ্টে, অতি সাবধানে পথ অতিক্রম কবিতে হয়।

আমবা যে পথে যাইতেছিলাম, তাহা অতি দুর্গম—একদিকে অতলস্পর্শী খাদ, পড়িলে সহস্রহস্ত নিম্নে আসীন হইতে হয়। একজনের অধিক দুইজনে পাশাপাশি যাইবার উপায় নাই। অনেক সময় হামাগুড়ি দিয়া কষ্টে উঠিতে হয়। অতিকষ্টে কুয়াশার অন্ধকার ঠেলিয়া আমবা পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম।

এদিকে প্রায় সন্ধ্যা হয়—দারুণ প্রবল শীত, তাহার উপর বৃষ্টি। হিমালয়ে এই বৃষ্টি না থাকিলে বোধ হয় ইহাই ইন্দ্রের অমরাবতী ও নন্দনকানন হইত। একটা মাথা রাখিবার স্থান পাইলেই আমরা তথায় আজিকার মত বিশ্রাম করি। নিতান্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কুয়াশার ভিতর দিয়া কোন দিকে যাইতেছি, তাহাও স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। আমাদের পথপ্রদর্শক বলিতেছিল যে, নিকটেই কাঁইয়ার দোকান ও বস্তি আছে। কিন্তু আমরা এক ঘণ্টা কষ্টে চলিয়াও কোন পল্লী পাইলাম না।

হিমালয়েব সন্ধ্যা আমাদের দেশের মত সহজ রকমে হয় না। সন্ধ্যা বলিয়া কোন ব্যাপার এখানে নাই। সহসা না বলিয়া কহিয়া অবাধ্য মেয়ের মত যেন একেবাবে তিমিরবসনা নিশা হিমালয়কে নিজেব কৃষ্ণাঞ্চলে ঢাকিয়া দেয়। আজ ইহা স্বচক্ষে দেখিলাম। অনুভব করিলাম, সহসা চারিদিক ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইল। আর কিছু দেখিবার উপায় নাই।

আমাদের পথপ্রদর্শক উচ্চৈঃস্বরে নানাবিধ শব্দ করিতে করিতে চলিল, আমরা তাহার গলার স্বর অনুসবণ করিয়া হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া চলিলাম। একটু পা পিছলাইলেই গিয়াছি আর কি—ভয়াবহ মৃত্যু। এখন আমরা বুঝিলাম, আমাদের শিলিগুড়ির বন্ধুগণ হিতবাদী বটেন। কিন্তু—মরণকালেতে রোগী যদি ঔষধ না খায়—গতানুশোচনায় আর ফল কি?

সহসা পথপ্রদর্শক দাঁড়াইল, আমরাও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম। তখন বুঝিলাম, সে নিজেই অন্ধকারে পথ হারাইয়াছে—গ্রামের পথে না গিয়া অন্য পথে আসিয়াছে, দুর্গম পাহাড়ের দুর্গমতম স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে—কোনদিকে কোথায় যাইবে, স্থির করিতে পারিতেছে না। সে নিজে এ কথা স্বীকার না করিলেও তাহার গলার স্বরে আমাদের বেশ উপলব্ধি হইতেছিল।

তখন আমাদের হৃদয়ের ভিতর হৃদয় বসিয়া গেল। বুঝিলাম, এই পাহাড়ের দুর্গম জঙ্গল মধ্যেই আজ রাত্রি কাটাইতে হইবে। তাহাতে বড় কিছু যায় আসে না—তবে পতিত হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ না হইলেই এক্ষণে ভগবানের অসীম দয়া।

থম্বিবেনা বলিল, 'ফিবিয়া এই পথে একটু নামিয়া গেলেই একটা বস্তি পাইব।'

অগত্যা তাহাই করা শ্রেয় ভাবিয়া আমরা ফিরিলাম। কিন্তু কয়েক পদ যাইবামাত্র আমি একটা

গড়ানে স্থানে আসিলাম। তাহার পর কি হইল, ঠিক মনে নাই। আমি গড়াইতে গড়াইতে কতদূর চলিলাম, তাহাও মনে নাই। এইমাত্র বুঝিলাম, আমার লম্বা কোট দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বন্ধুবর প্রবোধচন্দ্রও ঠিক আমার গতি অনুকরণ করিয়া আমার অনুসরণ করিতেছে। শব্দে বুঝিলাম, গুণবন্ত খম্বিবেনারও সেইরূপ দশা—গড়াইয়া আসিতেছে।

সহসা কিসে লাগিয়া আমাদের অধঃপতনের গতি বন্ধ হইল। স্পর্শে বুঝিলাম, কি একটা কাষ্ঠনির্মিত দ্রব্যে আমাদের বেগ নিরোধ হইয়াছে। পকেটে দেশলাই ও বাতি ছিল, জ্বালিলাম।

সেই অন্ধকারে দীপালোকেও ভাল দেখা যায় না।

আলোটা উচ্চে তুলিয়া দেখিলাম, সেটা একখানা কাষ্ঠনির্মিত ঘর। আমরা তিনজনই সেই গৃহের কাষ্ঠনির্মিত প্রাচীরপার্শ্বে পতিত। আমরা কষ্টে-সৃষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

যাহা হউক, প্রাণটা যে বাজেখরচ হয় নাই, ইহাই ভাল! সম্ভবতঃ আশ্রয় মিলিবে। এ গৃহে যেই থাকুক না কেন এ অবস্থায় আশ্রয় দিতে কখনও অসম্মত হইবে না। আমরা আলো ধরিয়া ধরিয়া গৃহের দ্বারে আসিলাম। দরজা বন্ধ।

আমি দরজায় করাঘাত করিলাম—কেহ উত্তর দিল না। এবার আমি আরও বেশিরকম শব্দ করিয়া সবলে করাঘাত করিলাম, তবুও কেহ উত্তর দিল না। তখন আমি দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া ফেলিলাম, কড় কড় শব্দ করিয়া দরজা খুলিয়া গেল। ভিতরে বাহির হইতেও অন্ধকার।

আমি আলো লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম—প্রবোধ ও খম্বিবেনা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। কিন্তু তৎপরে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটিল। খম্বিবেনা বিকট চিৎকার করিয়া উঠিল, তৎপরে ছুটিয়া অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল। আমরা উভয়ে বিস্মিত হইয়া তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলাম, কিন্তু অন্ধকার হইতে কেবল একটা ভীতিব্যঞ্জক আর্তরব আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিল, আমরা কেবলমাত্র সেই শব্দের এইমাত্র বুঝিলাম

'শয়তান কা ঔরত।'

প্রবোধ বলিল, বোধ হয় এখানকার লোকের বিশ্বাস, এই বাড়িতে ভূত আছে--পাহাড়ীমাত্রেই ভূত বড় বিশ্বাস করে। যাহাই হউক, খাদে পড়িয়া যে আজ প্রাণটা যায় নাই, এইজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিই। শীতে বুক গুর্ গুর্ করিতেছে। এ আশ্রয়ও ভগবান মিলাইয়া দিয়াছেন। এখন কাঠকুটা সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালা যাক। আলো দেখিলে কুলি দুইটা আর গুণবন্ত খম্বিবেনা প্রাণের দায়ে এখানে আবার ফিরিয়া আসিতে পথ পাইবে না।

আমরা বাহিরে আলো লইয়া কতকগুলা শুষ্ক ডালপালা সংগ্রহ করিলাম, তৎপরে তাহা জ্বালাইয়া গৃহমধ্যে আগুন করিলাম। আগুনে হাত সেঁকিয়া কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলাম। আমাদের ব্যাগে সর্বদাই আমরা কিছু-না-কিছু আহার্য রাখিতাম। প্রবোধ তাহাই বাহির করিয়া প্রবলবেগে ভোজন আরম্ভ করিল। আমি বলিলাম, 'আগে ঘরটা ভাল করিয়া দেখা যাক্।' প্রবোধ বলিল, 'আগে প্রাণে বাঁচলে তো আর সব, ক্ষুধায় প্রাণ যায়। এই পাহাড়ে শীতে আর এই পাহাড়ে রাস্তায় যেন ক্ষুধা হাজার গুণ বাড়িয়া উঠে।' অগত্যা আমরা উভয়ে সেই আগুনের পাশে বসিয়া কিছু আহার করিয়া লইলাম।

আহার শেষ হইলে উভয়ে বাতি লইয়া ঘরটি ভাল করিয়া দেখিতে চলিলাম, একটি ঘর নহে পাশাপাশি দুইটি ঘর। গৃহমধ্যে নানাবিধ তৈজসপত্র পড়িয়া আছে। দেখিলেই বোধ হয়, শেষে যাহারা এই বাড়িতে ছিল, তাহারা যে কারণেই হউক, হঠাৎ এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের অনেক জিনিসপত্র পড়িয়া আছে, লইয়া যাইবার সময় হয় নাই—তাড়াতাড়ি যে চলিয়া গিয়াছে, এই ঘরের অবস্থা দেখিলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

একটা বাক্সও ঘরের কোণে পড়িয়া আছে।—দেখিলাম, ডালা খোলা। তুলিয়া দেখি, তাহার ভিতরে অনেকগুলি নানা তারিখের বাংলা চিঠি রহিয়াছে।

এই দুর্গম স্থানে এই নির্জন বাড়িতে তাহা হইলে পূর্বে কোন বাঙালী বাস করিয়াছিল। কে সে? এত স্থান হইতে এখানে আসিয়াছিল কেন? দারুণ কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া আমরা বাতিটি সেই বাক্সের উপর রাখিয়া পত্রগুলি একে একে পাঠ করিতে লাগিলাম। যখন সর্বশেষ পত্রখানির পাঠ শেষ হইল, তখন নিম্ন হইতে সেই অন্ধকার আলোড়িত করিয়া এক হৃদয়বিদারক উচ্চ আর্তনাদ

উঠিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রিই এই ভয়াবহ শব্দ আমাদের কানে আসিতে লাগিল। ইহা আমাদের বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা না কোন মনুষ্যের আর্তনাদ, তাহা কেবল ভগবান বলিতে পারেন। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমরা সমস্ত রাত্রি সেই গৃহমধ্যে জাগিয়া বসিয়া রহিলাম, ভয়ে চক্ষু মুদিত করিতে সাহস করিলাম না।

যে সকল পত্র আমরা পাঠ করিলাম, তাহার প্রথমখানি এই --

প্রথম পত্র

প্রিয় সুরেশ

কলিকাতার সেই সোরগোল অশান্তির মধ্য হইতে পলাইয়া আসিয়া এই নির্জন পাহাড় মধ্যে এই স্থানে আমি যে কি শান্তি অনুভব করিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। আর লোকালয়ে থাকিব না। লোকালয়ে থাকিলে আর আরাম হইতে পারিব না, এইজন্য এই দুর্গম স্থানে আশ্রয় লইয়াছি। আমার মস্তিষ্ক যেরূপ উষ্ণ হইয়াছিল--তাহা আর নাই, আমি এখন শান্তচিত্তে চিন্তা করিতে পারিতেছি। আর এই স্থানের ন্যায় চিন্তা করিবার স্থান দ্বিতীয় আর কোথায়?

আমার এই বাড়ি পর্বতের মাঝামাঝি স্থাপিত, পশ্চাতে স্তরে স্তরে পর্বতশ্রেণী আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়া গিয়াছে, সম্মুখে একটু আগে একেবারে মহা-খাদ, দুই সহস্র হাত নিম্নে একটি নদী রজতসূত্রের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

এ বাড়িখানিতে দুইটি মাত্র ঘর। ঘর বলিতে চাও, আর যাহা বলিতে চাও, তাহাই ইহাকে বলা যায়। কতকগুলি শালকাঠ জোড়া দিয়া প্রাচীর নির্মিত হইয়াছে---চালও ওই শালকাঠে জোড়া। এখানে শালকাঠের অভাব নাই, চারিদিকেই শালকাঠ—কাটিয়া লইলেই হইল। আমার সঙ্গে চাকর বাকর নাই, চেষ্টা করিয়াও পাই নাই। প্রায় দুই ক্রোশ দূরে একটা ভূটিয়া বস্তি আছে, সেখানে সপ্তাহে একদিন হাট হয়। হাটের দিন সকালে রওনা হইয়া আমার দরকার মত দ্রব্যাদি লইয়া সন্ধ্যার সময় ফিরি।

সময় কাটাইবার জন্য একখানা খুব বড় উপন্যাস লিখিতেছি। বোধ হয়, তাহাতেই আমি জগদ্বিখ্যাত হইব।

আমি একজন লোক পাইয়াছি। রাত্রে সে কিছুতেই এ বাড়িতে থাকিতে চাহে না। তা না থাকুক ক্ষতি নাই। দিনেই সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া চলিয়া যায়, সুতরাং আমার স্ত্রীকে আর পূর্বের ন্যায় খাটিতে হইতেছে না।

এই নির্জন দুর্গম স্থানে থাকিতে সে সম্পূর্ণ নারাজ হইয়াছিল। আমিই বুঝাইয়া রাখিয়াছি, লোকালয়ে থাকিলে আমার রোগ আরাম হইবার আশা নাই। এই কথা বলায় সে সম্মত হইয়াছে।

রাত্রে সে পার্শ্বের ঘরে নিদ্রা যায়—আমি সম্মুখের ঘরে বসিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত সেই প্রকাণ্ড উপন্যাসখানা লিখি।

তোমার মন্মথ।

দ্বিতীয় পত্র

(দ্বিতীয় পত্র কেবল সেই উপন্যাসের কথা এবং সেই উপন্যাসের প্রশংসার ভাগই অধিক।)

তৃতীয় পত্র

প্রিয় সুরেশ

তোমাকে দুইখানা পত্র লিখিয়াছি, এইখানা লইয়া তিনখানা হইবে, কিন্তু কোনখানাই এখনও ডাকে দিতে পারি নাই। ডাকঘর প্রায় দশ ক্রোশ দূরে। পত্র তিনখানা ডাকে দিবার জন্য এখনও কোন লোক সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাহার একটা গুরুতর কারণ আছে। সহজে এ বাড়ির নিকট কেহ আসিতে চাহে না, অধিক পয়সা দিতে চাহিলেও না। আগে ইহার কারণ জানিতে পারি নাই, একদিন এক বৃদ্ধকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেই বৃদ্ধ আমাকে এ রহস্যের বর্ণনা করিল। ব্যাপার এই—

সোহো বলিয়া একটা লোক এই কুটীর নির্মাণ করে। সে ভুটিয়াদিগের মধ্যে একজন কবি বলিয়া গণ্য ছিল। সে নির্জনে বাস করিবার ইচ্ছা করিয়াই এই দুর্গম স্থানে এই কুটীর নির্মাণ করিয়াছিল। এখানে সে নিজের সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে লইয়া বাস করিত।

সুখেই তাহাদের দিন কাটিতেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নিকটস্থ এক ব্যক্তির একটি ভুটিয়া যুবতী সেই নিভৃত নিবাসী কবির প্রেমে পড়িল। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই কুটীরে দুইটি ঘর। যখন গভীর রাত্রে পার্শ্বের গৃহে সোহোর যুবতী স্ত্রী নিদ্রা যাইত, সেই সময়ে এই যুবতী তাহার পার্শ্বে বসিয়া মৃদুমন্দ কণ্ঠে প্রেমালাপ করিত।

একদিন রাত্রে তাহার স্ত্রী সমস্তই জানিতে পারিল, কিন্তু কোন কথা কহিল না।

এই যুবতীকে এই কুটীরে আসিতে হইলে একটা কাঠের সাঁকো পার হইয়া আসিতে হইত। এই সাঁকোর প্রায় পাঁচশত হাত নিম্নে এক ঝরণা বা ঝোরা। প্রবলবেগে সেই ঝরণা দিয়া জল পড়িত বলিয়া ভুটিয়ারা ইহার নাম 'পাগলা ঝোরা' রাখিয়াছে। প্রত্যহ রাত্রে এই ঝরণার উপরের সাঁকো দিয়া সেই যুবতী যাতায়াত করিত।

একদিন সোহো গৃহে না থাকায় তাহার স্ত্রী সুবিধা পাইয়া সেই সাঁকোর কাঠ একদিক্ টাঙ্গি দিয়া কাটিয়া রাখিয়া আসিল। এমন সামান্যমাত্র সাঁকোর কাঠ পাহাড়ে সংলগ্ন রহিল যে, মনুষ্যভার পড়িলেই তাহা নিশ্চিত পতিত হইবে।

তাহাই ঘটিল। সে রাত্রে পূর্বের ন্যায় সোহো প্রণয়িনীর প্রতীক্ষা করিতেছে, সহসা তাহার কর্ণে এক মর্মভেদী আর্তনাদ প্রবেশ করিল। তাহার পরই প্রকাণ্ড কাঠ ও পাথরের পতনের শব্দ আসিল, তাহার প্রণয়িনী পাঁচ শত হস্ত নিম্নে পাগলা ঝোরায় বিসর্জিত হইয়াছে।

কে এ কাজ করিয়াছে, তাহা সোহোর বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ইহার ফলে একদিন সোহো ও তাহার স্ত্রী উভয়েই গভীর খাদে পতিত হইল।

সোহো তাহার স্ত্রীর গলা টিপিয়া তাহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু ভুটিয়া স্ত্রীলোকদিগের দেহে অসীম বল, সোহোর স্ত্রী তাহাকে টানিতে টানিতে খাদের নিকট লইয়া আইসে, তথাপি সোহো তাহার গলা হইতে হাত অপসারিত করিল না। তাহার স্ত্রীর চক্ষু কপালে উঠিল, তাহার জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল, তবুও সে তাহার স্বামীকে ছাড়িল না। উভয়ে দুই সহস্র হাত নিম্নে গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইল।

এতদূর বলিয়া বৃদ্ধ ভুটিয়া বলিল, সেই পর্যন্ত সোহোর প্রণয়িনী সোহোর বাড়িতে প্রেত হইয়া আইসে। ভিতরে আলো দেখিলে সে দরজায় আঘাত করে। তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে না দেয়, এমন সাধ্য কাহারও নাই। অনেকে এই বাড়িতে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, কিন্তু এ বাড়িতে যে বাস করে, তাহারই মৃত্যু হয়।

এই জন্যই এই সোহো-প্রণয়িনীর ভূতের জন্য কেহ সাহস করিয়া এখানে আসে না। আমার দ্রব্যাদি হাট হইতে আমাকেই নিজে আনিতে হয়, এই জন্যই এ পর্যন্ত পত্র ডাকে পাঠাইতে পারি নাই।

তোমার মন্মথ।

চতুর্থ পত্র

প্রিয় সুরেশ

দেশে হইলেও এ কথা আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। বোধ হয় অর্ধঘন্টার মধ্যেই একথা একেবারেই ভুলিয়া যাইতাম। কিন্তু এই নির্জন দুর্গম স্থানে ভূতের কথা সহজে বিস্মৃত হওয়া যায় না।

রাত্রে—অনেক রাত্রি পর্যন্ত—বসিয়া আমার সেই বিরাট উপন্যাসখানা আমি প্রত্যহ লিখিয়া থাকি, কিন্তু বৃদ্ধ ভুটিয়ার নিকট এই কথা শোনা পর্যন্ত রাত্রে আমার লেখা একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তুমি শুনিলে নিশ্চয়ই মনে মনে হাসিবে, কিন্তু সত্য গোপন করাও ঠিক নহে, প্রকৃতই সেই দিন হইতে রাত্রে লিখিতে লিখিতে মধ্যে মধ্যে লেখা বন্ধ করিয়া আমি কান পাতিয়া শুনিতাম, দরজায় কেহ ঘা মারিতেছে কিনা। যথার্থ-ই কি আমার মাথা খারাপ হইয়া যাইতেছে। ইহারই মধ্যে যেন

সোহো প্রণয়িনী আমার স্কন্ধে ভর করিয়াছে ! হাসিও না, এই নির্জন দুর্গম লোকশূন্য স্থানে সকলই সম্ভব। তোমার সেখানে যাহা হাস্যজনক, এখানে তাহা ভীতিপ্রদ।

কাল যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে আমারও যে বুদ্ধিভ্রংশ হইতেছে, মাথা খারাপ হইয়া আসিতেছে, তাহা আমারই নিজের বিশ্বাস হইয়াছে।

সন্ধ্যার সময়ে আমি কুটীরের বাহিরে বেড়াইতেছি। বেড়াইতে বেড়াইতে সেই ভগ্ন সাঁকোর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম। উঁকি মারিয়া সাঁকোটার নিম্নস্থ পাগলা ঝোরা দেখিতেছিলাম, সহসা মাথা তুলিয়া দেখিলাম, দূরে সুন্দর বনফুলে সজ্জিত একটি পাহাড়িয়া যুবতী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

তখন চারিদিক ধীরে ধীরে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। এখানে এ কুটীরের এত নিকটে এ-পর্যন্ত আমি কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষ জনপ্রাণী দেখিতে পাই নাই। এখান হইতে লোকালয় দুই ক্রোশের নিকটে নহে। রাত্রে এই দুর্গম পথ দিয়া কাহারও গমন করা সম্ভব নহে।

তবে তরুণী কে ? এ এখনও এখানে কেন ? আমি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কণ্ঠ পরিষ্কারের অব্যক্ত শব্দ করিলাম, তথাপি সে নড়িল না। আমি ডাকিলাম, তবুও সে নড়িল না। এই দুর্গম পর্বতে আমার গলার শব্দ তাহার নিকট পৌঁছিতেছে না ভাবিয়া, আমি তাহাকে হাত নাড়িয়া ডাকিলাম। তখন সে ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিশিয়া গেল। —আমি গৃহের দিকে ফিরিলাম, আমার শিরায় শিরায় যেন কে বরফের প্রবাহ ছাড়িয়া দিল। কেন আমার এ ভাব হইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে কি মনুষ্য নহে, এই কি সেই সোহো-প্রণয়িনী ?

তোমার মন্মথ।

পঞ্চম পত্র

(পূর্বোক্ত পত্রের এগার দিন পরে লিখিত।)

প্রিয় সুরেশ

যাহা ভাবিয়াছিলাম, ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। সে আসিয়াছে। আমি যেদিন সন্ধ্যাকালে তাহাকে পর্বতমধ্যে দেখিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিয়াছিলাম, সে নিশ্চয়ই একদিন আসিবে।

কাল রাত্রে সে আসিয়াছে। আমরা উভয়ে উভয়ের চোখের দিকে চাহিয়া বহুক্ষণ বসিয়াছিলাম।

তুমি নিশ্চয়ই বলিবে, আমি উন্মত্ত হইয়াছি—আমার রোগ সারে নাই, এখনও সেই জ্বর আছে, তাই সে জ্বরের প্রকোপে বিকৃতমস্তিষ্কে কল্পনায় আমি এই প্রেতাত্মা দেখিতেছি।

তুমি বলিবে কেন। আমি নিজেকেই নিজে এ-কথা অনেকবার বলিয়াছি, এ সকল সত্য ও সে আসিয়াছে। কি সে ? রক্তমাংসের দেহধারিণী নারীমূর্তি অথবা আকাশের প্রাণী—বায়ুমূর্তি—আমার কল্পনার সৃষ্টি ? যাহাই হউক, তাহাতে বড় কিছু আসে যায় না। আমার নিকট ইহা কল্পনা নহে, বায়ু নহে, আকাশ নহে, মিথ্যা নহে। সত্য—অতি সত্য !

গত রাত্রে সে আসিয়াছিল। আমার স্ত্রী পাশের ঘরে নিদ্রিতা, আমি অনেক রাত্রি পর্যন্ত সম্মুখের ঘরে বসিয়া সেই উপন্যাসখানা লিখিতেছিলাম। এই সময়ে সে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রত্যহ রাত্রে আমি ইহার প্রতীক্ষা করিয়াছি—দ্বারে মৃদু করাঘাতের শব্দ শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিয়াছি, ইহার আসার আশায় প্রতিক্ষণে ব্যাকুল হইয়াছি। এখন আমি আমার মনের এ অবস্থা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

আমি সাঁকোর উপর ইহার পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছি, তিনবার দরজায় আঘাত সুস্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছি—তিনবার মাত্র।

ইহাতে আমার কঙ্কালের ভিতর যেন তীক্ষ্ণ তুষারধারা প্রবাহিত হইয়াছে, মস্তিষ্কে একরূপ অব্যক্ত বেদনা অনুভব করিয়াছি, আমি সবলে আমার বুক চাপিয়া ধরিয়াছি, তবুও সেই শব্দ, সেই দ্বারে আঘাত,—তিনবার মাত্র। আমি উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়াছি।

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ধীরে ধীরে গিয়া পার্শ্ববর্তী গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম—দ্বারে শিকল টানিয়া দিলাম। তৎপরে উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আবার সেই শব্দ—সেই

দ্বাবে আঘাত, তিনবাব—তিনবাব মাত্র।

তখন আমি গিয়া বাহিবেব দবজা খুলিয়া দিলাম —অতিশীতল বায়ু প্রবলবেগে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমাব কাগজপত্র কতক উল্টাইয়া, কতক গৃহতলে ছড়াইয়া দিল। বমণী গৃহমধ্যে প্রবেশ কবিল, আমি নিঃশব্দে দরজা বন্ধ কবিয়া দিলাম।

সে তাহাব মস্তক হইতে শাল সবাইয়া স্কন্ধে ফেলিল, কণ্ঠদেশ হইতে একখানা বঙিন রুমাল খুলিয়া পার্শ্বে বাখিল, তাহাব পরে আমাব সম্মুখে আগুনেব কাছে আসিয়া বসিল। আমি দেখিলাম, তাহাব উন্মুক্ত পা দু'খানি তখনও শিশিবসিক্ত বহিয়াছে। আমি তাহাব সম্মুখে বসিলাম, বিস্ফাবিত নয়নে মন্ত্রমুগ্ধেব ন্যায় তাহাব মুখেব দিকে চাহিয়া বহিলাম। সে আমাব দিকে চাহিয়া মৃদু মধুব হাসিল- সে হাসি মধুব, অথচ বিস্ময়কব, যেন ধূর্ততা শঠতা তাহাতে মাখা। সেই হাসিতে আমি আত্মহাবা হইলাম। আমাব হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইল, আমি তাহাকে সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত - সর্বত্যাগী হইতে প্রস্তুত।

সে কথা কহিল না, নড়িলও না। আমি তাহাব কথা শুনিবাব কোন আবশ্যকতা মনে কবিলাম না। সেই বিলোল চোখ, সেই চপল দৃষ্টি, তাহাই যেন আমাব সহিত কত প্রাণেব কথা কহিতে লাগিল। সে আমাব দিকে চাহিয়া আছে, আমি তাহাব দিকে চাহিয়া আছি তাহাব চক্ষু আমাব চক্ষুব সহিত আমাব চক্ষু তাহাব চক্ষুব সহিত পবস্পব সম্মিলিত সে আনন্দ সে সুখ সে যে কি, তাহা বর্ণনা কবিবাব ক্ষমতা আমাব নাই।

জানি না কতক্ষণ এইরূপভাবে বসিয়াছিলাম বলিতে পাবি না। সহসা সে নিজেব বুকেব কাছে একটা হাত তুলিয়া অত্যন্ত মনোযোগেব সহিত কান পাতিয়া কি শুনিতে লাগিল। তখনই পার্শ্বস্থ গৃহ হইতে একটা অতি মৃদু শব্দ কানে আসিল। অমনি সেই অপবিচিতা বামা সত্বব সেই শালখানা তাহাব মাথায় টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তৎপবে অতি দ্রুতপদে দবজা খুলিয়া গৃহ হইতে বাহিব হইয়া গেল যাইবাব সময় দবজা বন্ধ কবিয়া দিয়া গেল।

আমি ভিতবেব ঘবের শিকল খুলিয়া কান পাতিয়া শুনিলাম, কোন শব্দ নাই। তখন আমি ধীবে ধীবে ফিবিয়া আসিয়া বসিলাম। তাহাব পব বোধ হয়, সেই স্থানেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

ঘুম ভাঙিবামাত্র আমাব মনে হইল যে, বমণী বাত্রে রুমালখানি লইয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিল। সে যেখানে বসিয়াছিল, তাহাব চলিয়া যাইবাব পবও আমি তথায় রুমালখানি দেখিযাছিলাম। তাই ঘুম ভাঙিবামাত্র সেখানা লুকাইয়া বাখিব বলিয়া সেই দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, রুমাল তথায় নাই। আমাব স্ত্রী ঘব ঝাঁট দিয়া সমস্ত পবিষ্কাব পবিচ্ছন্ন কবিয়াছে, আমাব চাএব জল গবম কবিতেছে। সে আমাব দিকে দুই এক বাব চাহিল—আমি তাহাকে এমন কবিযা চাহিতে আব কখনও দেখি নাই। কিন্তু সে কোন কথা কহিল না—রুমালেব কথাও কিছু বলিল না।

তাহাতেই আমার মনে হইল যে, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি মাত্র। কাল রাত্রে যাহা সত্য ভাবিয়াছিলাম, তাহা আর কিছু নহে, স্বপ্নমাত্র। কিন্তু অপবাহ্ণে আমি একবাব বাহিব হইতে দেখিলাম, আমাব স্ত্রী সেই রুমালখানি হাতে লইয়া বিশেষ কবিয়া দেখিতেছে। তাহাব মুখ অপর দিকে ছিল, সুতবাং সে আমাকে দেখিতে পাইল না।—আমি স্পষ্ট দেখিলাম, সে বিশেষ লক্ষ্য কবিযা রুমালখানা দেখিতেছে।

আমি কতবার মনে কবিলাম যে, রুমালখানা আমার স্ত্রীরই। কাল রাত্রে যাহা দেখিয়াছি, তাহা সমস্তই আমাব কল্পনা—স্বপ্ন মাত্র। আব তাহা যদি না হয়, তবে কাল বাত্রে যে আসিয়াছিল, সে প্রেতাত্মা নহে—প্রকৃতই কোন স্ত্রীলোক।

কিন্তু মানুষ মানুষে চিনিতে পারে, বুঝিতে পারে। কাল রাত্রে যে আমার সম্মুখে বসিয়াছিল, সে বক্তমাংসেব কোন জীব নহে—ইহা আমি বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম।

সম্ভবত সে কোন স্ত্রীলোক হইতে পারে। এখান হইতে দুই ক্রোশের মধ্যে কোন বস্তি বা লোকালয় নাই। দিনেই এই পার্বত্য পথে চলা-ফেরা বিপজ্জনক—রাত্রে অসম্ভব। কোন্ স্ত্রীলোক অন্ধকাব বাত্রে এই ভয়াবহ কঠিন পর্বত পথে আসিতে সাহস করিবে? তাহাতে ঘোর অন্ধকার, দারুণ শীত—কোন স্ত্রীলোকেব এই দুর্গম স্থানে, এ কুটীবে আগমন একেবাবেই অসম্ভব।

আরও কারণ— কোন্ স্ত্রীলোকের উপস্থিতিতে শিরায় শিরায় অস্থিমজ্জায় গলিত তুষারস্রোত

প্রবাহিত হয় ?

যাহাই হউক, সে যেই হউক, সে যদি একবার আসে, তাহা হইলে তাহার সহিত কথা কহিব। আমি হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিব। তাহা হইলেই দেখিতে পাইব, সে রক্তমাংসের জীব, না বায়ু—কেবল কল্পনা, কেবল শূন্য, একটা ছায়ামাত্র।

তোমার মন্মথ।

ষষ্ঠ পত্র

প্রিয় সুরেশ

এই সকল পত্র কখনও যে তুমি পাইবে, সে আশা আমার নাই। আমি এখান হইতে এ সকল চিঠি তোমাকে পাঠাইব না। তোমার নিকট এ সকল পাগলের পাগলামি, উন্মত্তের প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই বোধ হইবে না। যদি কখনও দেশে ফিরি তাহা হইলে হয়তো কোনদিন-না কোনদিন এই সকল পত্র তোমায় দেখাইতে পারি, তাহাও শীঘ্র নহে। যখন আসিয়া এই সব লইয়া হাস্য বিদ্রূপ করিতে পারিব, কেবল সেই সময়েই তোমায় এ সকল পত্র দেখাইব। এখন আমি এগুলি লিখিতেছি, আমার মনের যাতনায়।এগুলি এইরূপে না লিখিলে হয়তো আমাকে চিৎকার করিয়া মনের যাতনা লাঘব করিতে হইত।

সে প্রত্যহ রাত্রে আসে, সেইরকম আগুনের কাছে বসে, সেইরকম আমার দৃষ্টির সহিত দৃষ্টিবিন্যাস করে—সেই কুহকিনী মৃদুমধুর হাসি হাসে—আমার মস্তিষ্ক ঘোরতররূপে বিচঞ্চল হইয়া উঠে, আমি আত্মহারা হই - আমার অস্তিত্ব যেন তাহার মধ্যে লীন হইয়া যায়।

এখন আমার লেখা সম্পূর্ণ-ই বন্ধ হইয়া গিয়াছে—লিখিবার চেষ্টাও করি না। আমি সাঁকোর উপর তাহার শুভাগমনের পদশব্দ—ঘাসের উপর পদশব্দ—দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ শুনিবার জন্য ব্যাকুলচিত্তে উৎকর্ণ হইয়া থাকি।

সে আসিলে সেই ভাব—আমি আর কথা কহিতে পারি না—আমি আর আমাতে থাকি না —কোন কথাই আর মনে হয় না—সেও কোনকথা কহে না, কেবল সেইরূপভাবে চাহিয়া থাকে, সেইরূপ হাসি হাসে।

প্রত্যহ আমি মনে করি, আজ সে আসিলে আমি নিশ্চয়ই তাহার সহিত কথা কহিব, নিশ্চয়ই তাহাকে স্পর্শ করিব। কিন্তু সে আসিবামাত্র আমি সকলই ভুলিয়া যাই, আমার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায়।

কাল রাত্রে যখন আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম, সেই সময়ে ক্রমে ক্রমে আমার মন তাহার অপরূপ সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তাহার ওষ্ঠ ঈষৎ উন্মুক্ত হইল, সে চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি পার্শ্ববর্তী কক্ষের গবাক্ষের দিকে চাহিলাম, চাহিবামাত্র বোধ হইল, কে জানালা হইতে সহসা মুখ সরাইয়া লইল। এইদিকে নিমেষমধ্যে সে শাল মস্তকে টানিয়া দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমি আলো লইয়া পার্শ্বের গৃহে গেলাম। দেখিলাম, আমার স্ত্রী নিদ্রিতা রহিয়াছে।

তোমার মন্মথ।

সপ্তম পত্র

প্রিয় সুরেশ

রাত্রির জন্য আমি ভীত নহি, দিনের জন্যই ভীত। যে স্ত্রীলোককে আমি আমার স্ত্রী বলিয়া আসিতেছি, তাহাকে আমি প্রাণের সহিত এখন ঘৃণা করি। সে ঘৃণার ইয়ত্তা নাই—সীমা নাই—অন্ত নাই। তাহার যত্ন শ্রদ্ধা সোহাগ সমস্তই এখন বিষবৎ বোধ হয়। কি জানি, কেন তাহার চোখের দিকে চাহিলে আমি শিহরিয়া উঠি।

সে সকলই দেখিয়াছে, সকলই জানিতে পারিয়াছে, আমি ইহা বেশ বুঝিতেছি।—তাহাই কি ?

অথচ সে আমাকে এখনও ভালোবাসে, যত্ন পূর্ববৎ, অনুরাগ পূর্ববৎ—ভক্তি পূর্ববৎ। তথাপি আমার মনে হইতেছে সমস্ত জাল, সমস্ত মিথ্যা, সমস্তই ছলনা, প্রতারণা—আমরা পরস্পরে প্রণয়

ভালোবাসা জানাইতেছি—অথচ সব জাল, সব মিথ্যা, সব ছলনা। আমি জানি, সে সব দেখিয়াছে, সব জানিয়াছে, তাহার চোখ আমাকে ইহা স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে। আমি জানি, সে কেন এই ভীষণ প্রতিহিংসার আয়োজন করিতেছে।

তোমার মন্মথ।

অষ্টম পত্র

প্রিয় সুরেশ

আজ সকালে হাটে যাইব বলিয়া আমি বাহির হইলাম। আমার স্ত্রী দরজায় দাঁড়াইয়া রহিল, ক্রমে আমি তাহার দূরবর্তী হইতে লাগিলাম। পরে একবার চাহিয়া দেখি, দূর হইতে আমার স্ত্রীকে একটি ক্ষুদ্র পুত্তলিকার ন্যায় দেখাইতেছে। অবশেষে পর্বত বেষ্টন করায় আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

তখন আমি উঠিতে উঠিতে পড়িতে পড়িতে মহাবেগে ছুটিয়া অন্য পথ দিয়া গৃহের দিকে আসিতে লাগিলাম। পার্বত্যপথ সহজ নহে, কত উঠিয়া পড়িয়া তবে অন্যদিক দিয়া আমার গৃহের নিকট আসিলাম। তথায় এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের পার্শ্বে লুক্কায়িত থাকিয়া আমার গৃহপ্রতি সতর্কদৃষ্টি রাখিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, আমার স্ত্রী এক টাঙ্গি লইয়া কাঠের সাঁকোর নিকট আসিল। আমি যেখানে ছিলাম, তথা হইতে, সে কি করিতেছে, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই দূর হইতেও আমি তাহার মুখে হাসি লক্ষ্য করিলাম—কিন্তু মনে হইল, সে হাসির ভিতরে প্রতিহিংসার বহ্নি ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে।

সে গৃহে চলিয়া গেলে আমি আবার হাটের দিকে চলিলাম। হাট হইতে সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিলাম, সে আমাকে পূর্বের ন্যায় সমাদরে গৃহে অভ্যর্থনা করিয়া লইল।

আমি যে তাহার ভয়াবহ কার্য দেখিয়াছি, তাহা ঘুণাক্ষরে তাহাকে জানিতে দিলাম না। তাহার শয়তানী কার্য ওইরূপই থাক। সে ভাবিয়াছে, কোন স্ত্রীলোক রাত্রে সাঁকো পার হইয়া আমার সহিত প্রেমালাপ করিতে আসে, তাই সে সাঁকো কাটিয়া রাখিয়া আসিয়াছে। আজ সে আসিলে অতল খাদ-নিম্নে পতিত হইয়া যাইবে।

আমি কিছু বলিলাম না। ইহাতে আজ সপ্রমাণ হইবে যে, প্রত্যহ রাত্রে আমার কাছে যে আসে—সে কে। যদি সে প্রেতাত্মা হয়, তাহা হইলে ভগ্নপ্রায় সেতুতে তাহার কোন অনিষ্ট ঘটিবে না, আর যদি সে প্রকৃতই কোন স্ত্রীলোক হয়, তাহা হইলে—

আমি এ চিন্তা প্রাণ হইতে দূর করিলাম। ভাবিতেও আমার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

যদি প্রকৃতই মানবী হয়, তাহা হইলে কথা না কহিয়া কেবলই আমার দিকে চাহিয়া থাকে কেন? আমিই বা কেন তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি না। কেন তাহার সম্মুখে আমার অস্তিত্ব নষ্ট হইয়া যায়। নিশ্চয়ই মানবী নহে। আমার স্ত্রী তাহার কোন অনিষ্টই করিতে পারিবে না। হতভাগিনী প্রতিহিংসার এই ব্যর্থ চেষ্টায় আরও জ্বলিয়া অস্থির হইবে। —বেশ হইবে।

কিন্তু যদি সে প্রেতলোকবাসিনীই হইবে, তবে আমি তাহার পদশব্দ শুনিতে পাই কেন? কেনই বা তাহার পায়ে স্পষ্ট শিশিরের দাগ দেখিতে পাই—কেনই বা তাহার দ্বারে আঘাত শব্দ শুনিতে পাই? এ সকল তো প্রেতের চিহ্ন নহে।

রাত্রি হইয়াছে, পূর্বের ন্যায় পার্শ্বের ঘরে আমার স্ত্রী ঘুমাইতেছে। আমি একান্তমনে গৃহে বসিয়া উৎকর্ণ হইয়া তাহার পদশব্দের প্রতীক্ষা করিতেছি।

যদি সে প্রেতাত্মা হয়, তাহা হইলে সে পূর্বের ন্যায় আমার কাছে আসিবে, আর যদি সে যথার্থ-ই কোন স্ত্রীলোক হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সাঁকো হইতে পড়িবার সময়ে আর্তনাদ শুনিতে পাইব। অথবা কোন প্রেতলোকের অজানিত কুহকজালে আমাকে ঘেরিয়া ফেলিতেছে! সহসা একি— একি এ প্রেতাত্মার বিদ্রূপ!

আমি শুনিয়াছি—আমি সেই ভয়াবহ আর্তনাদ এইমাত্র শুনিয়াছি, হৃদয়ভেদী—গগনভেদী আর্তনাদ আমি শুনিয়াছি।

আকাশ পাতাল প্রকম্পিত করিয়া, অন্ধকাররাশি আলোড়িত করিয়া সেই ভয়ানক আর্তনাদ সাঁকোর নিকট হইতে উত্থিত হইল, সেই গভীর খাদমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া পর্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সে আর্তনাদের বর্ণনা নাই। সে আর্তনাদ এখনও আমার কর্ণপথ দিয়া আমার শিরায় শিরায় শোণিতের সহিত ছুটিতেছে।

আমি গৃহ হইতে সবেগে বাহির হইলাম। সাঁকোর নিকটে আসিলাম। শুইয়া পড়িয়া হাত বাড়াইয়া দেখিলাম, সাঁকো আর নাই।

নীচের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, ঘোর অন্ধকার—সেই গভীর গহ্বর ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ— কিছু দেখিবার উপায় নাই!

প্রবলবেগে বাতাস বহিতেছে। আমি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া ডাকিলাম। সেই প্রবল বাতাসে আমার উচ্চ প্রবল চিৎকার যেন পৈশাচিক হাস্যকল্লোলের ন্যায় দিগ্বলয় কম্পিত করিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

আমি বুঝিতেছি। এতদিন যে উন্মত্ততা ধীরে ধীরে আমাকে অত্যন্ত কঠিনভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, আর কোন উপায় নাই—চেষ্টা বৃথা—বৃথা—বৃথা—

আমি কতবার মনে মনে বলিতেছি, এ কেবল আমার বিকৃত অসুস্থ পীড়িত মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র—এ আর্তনাদও আমার কল্পনামাত্র।—না—না—না—ওই সেই শব্দ! ওই সেই আর্তনাদ! ওই সেই মর্মভেদী আর্তনাদ!

প্রতিক্ষণে আমার মস্তিষ্কে কে যেন গুরুভার লোহার হাতুড়ি দিয়া নির্দয় আঘাত করিতেছে। আমি বুঝিয়াছি সে আর আমার কাছে আসিবে না।—এই শেষ।

তোমার মন্মথ।

শেষ পত্র

প্রিয় সুরেশ

আমি একটা বড় খামে সমস্ত পত্রগুলি রাখিয়া তোমার ঠিকানা লিখিয়া যাইব। যদি কখনও কেহ এইখানে আসে, তাহা হইলে সে হয়তো তোমাকে এই পত্র পাঠাইয়া দিতে পারে।

আমার লেখাপড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা—আমি আর আমার স্ত্রী—তোমাকে বুঝাইবার জন্য যাহাকে এখনও আমার স্ত্রী বলিতে হইতেছে,—আমরা উভয়ে মুখোমুখি হইয়া বসিয়া থাকি, কেহ কোন কথা কহি না। এ এক অতি আশ্চর্য পরিবর্তন।

যখন কথা কহি, তখন এইরূপভাবে কথা কহি, যেন আমাদের উভয়ের এই প্রথম দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে। যে দুই একটা কথা কহি, তাহাও আমাদের পরস্পর মনের ভাব গোপন করিবার জন্য—আমাদের উভয়ের কেহই আর পূর্বের মত নাই। আমি সর্বদাই তাহার মুখে বিদ্রূপের হাসি দেখিতেছি।—সে ইহা গোপন করিতে চেষ্টা পায়, কিন্তু আমি ইহা দেখিতেছি। তাহার চেষ্টা বৃথা!

প্রত্যহ রাত্রে নির্জনে বসিয়া থাকিতে থাকিতে মনে হয়, যেন সে পূর্বের ন্যায় দ্বারে আঘাত করিতেছে, আমি সত্বর গিয়া দরজা খুলিয়া দিই, কিন্তু কই, কেহ নাই, কেবল অন্ধকার—সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়া গৃহ মধ্যে বাহিরের কতকটা শীতল বাতাস প্রবেশ করে মাত্র—আর কিছুই না।

এই দুর্গম স্থানে বাস করিয়া আমি দানব হইয়াছি। ভালোবাসা ও ঘৃণা দুইই ভয়াবহভাবে আমার হৃদয়ে উদ্বেলিত হইয়া আমার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটাইয়াছে, আমার মস্তকে শত চিতানল জ্বালাইয়া দিয়াছে। আমার লেখাপড়া, শিক্ষা, সদ্‌গুণ,—সমস্ত এই পাহাড়ের বাতাসে যেন আমার হৃদয় হইতে উড়িয়া গিয়াছে! আমি হিংস্র পশু হইয়াছি।

কবে ইহার—এই স্ত্রীলোকের, যে এক সময়ে আমার স্ত্রী ছিল, তাহার কুসুমকোমল কণ্ঠদেশ আমার এই রোগশীর্ণ কঙ্কালসার কঠিন অঙ্গুলি দ্বারা সবলে পেষণ করিব—তাহার চমৎকার চক্ষু ধীরে ধীরে মুদিত হইয়া আসিবে, তাহার ওষ্ঠাধর উন্মুক্ত হইবে—তাহার আরক্ত জিহ্বা লতাইয়া পড়িবে, কবে তাহার গলা ধীরে ধীরে, জোরে জোরে, আরও জোরে টিপিতে থাকিব! দেরি নাই—দেরি নাই—দেরি নাই! তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে পশ্চাতে ঠেলিতে ঠেলিতে এই

কুটীর হইতে লইয়া যাইব—এই বন্ধুর কঠিন পাথরের উপর দিয়া লইয়া যাইব—এই খাদের নিকট আনিব। সে বড় বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছিল বটে। এবার হাসির পালা আমার! হো-হো-হো—

আমি জোর করিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে ঠেলিয়া লইয়া যাইব, ধীরে ধীরে আদর করিয়া—এই খাদের ধারে যখন তাহার পায়ের একটিমাত্র অঙ্গুষ্ঠ পাহাড়ে থাকিবে—সে হেলিয়া পড়িবে তখন আমি তাহার দিকে অবনত হইয়া তাহার আরক্ত অধর চুম্বন করিব।—তাহার পর নিম্নে—নিম্নে—নিম্নে—কুয়াশার মধ্য দিয়া, লতাপাদপগুল্ম ভেদ করিয়া, পশুপক্ষীকে স্তম্ভিত করিয়া—নিম্নে—নিম্নে—গভীরতর নিম্নে—দুইজনে একত্রে যাইব—যাইব—যাইব—যাইব—যতক্ষণ না তাহার সহিত মিলিত হই—'

(এই পত্র অসম্পূর্ণ)

এই শেষ পত্র—এই ভয়াবহ পত্র কয়েকখানি পাঠ করিয়া আমি প্রবোধের মুখের দিকে চাহিলাম, সেও আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি তাহার মুখে যে ভাব দেখিলাম, সে বোধ হয় আমার মুখে তাহাই দেখিল। আমি দেখিলাম, প্রবোধের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আমরা উভয়ে কেহ কাহারও সহিত কথা কহিতে সাহস করিলাম না। উভয়েরই হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতেছিল।

সংসারে এই ভয়াবহ ব্যাপার যে ঘটিতে পারে, তাহা আমাদের বিশ্বাস ছিল না। আমাদের পথপ্রদর্শক থম্বিবেনা 'শয়তান কা ঔরত' বলিয়া যে ভয়ে এ স্থান ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছে, এখন বুঝিলাম, তাহার যথেষ্ট কারণ আছে।

এতদিন ভূতপ্রেতের কথা বিশ্বাস হয় নাই। ভূতপ্রেত হউক বা না হউক, পত্রলেখক মন্মথ এই নিভৃত স্থানে বাস করিয়া ভূতের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া ভয়ঙ্কর উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিল। সেই উন্মত্ততায় হতভাগ্য আপনার স্ত্রীকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে, নিজেও মরিয়াছে। তাহার প্রমাণ এই সকল পত্র।

ভোর হইতে-না-হইতে আমরা সে স্থান হইতে পলাইলাম। রামোচন্দ্র! আর সেখানে এক মিনিট থাকে! বস্তিতে আসিয়া আমাদের দুই কুলি ও থম্বিমেনাকে পাইলাম। আমরা যে সেই গৃহে রাত্রিযাপন করিয়া এখনও জীবিত আছি, ইহা দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমরা দার্জিলিং পৌঁছিয়া পত্রগুলি সমস্ত কমিশনার সাহেবকে দিলাম। শুনিয়াছি, তাঁহার আজ্ঞায় এই ভয়াবহ কুটীরটা একদিন জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে।
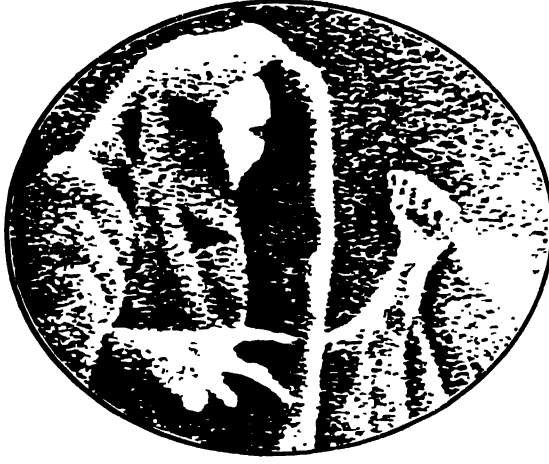
মহেশের মহাযাত্রা

পরশুরাম

কেদার চাটুজ্যে মহাশয় বলিলেন, 'আজকাল তোমরা সামান্য একটু বিদ্যে শিখে নাস্তিক হয়েছ, কিছুই মানতে চাও না। যখন আরও একটু শিখবে তখন বুঝবে যে আত্মা আছেন। ভূত, পেতনী—এঁরাও আছেন। বেম্মদত্যি, কন্ধকাটা—এঁয়ারাও আছেন।'

বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় গল্প চলিতেছিল। তাঁহার শালা নগেন বলিল—'আচ্ছা বিনোদ-দা, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?'

বিনোদ বলিল—'যখন প্রত্যক্ষ দেখব তখন বিশ্বাস করব। তার আগে হাঁ-না কিছুই বলতে পারি না।'

চাটুজ্যে বলিলেন,—'এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ওকালতি কর! বলি, তোমার প্রপিতামহকে প্রত্যক্ষ করেছ? ম্যাকডোনাল্ড, চার্চিল আর বালডুইনকে দেখেছ? তবে তাদের কথা নিয়ে অত মাতামাতি কর কেন?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, হার মানছি চাটুজ্যেমশায়।'

'আপ্তবাক্য মানতে হয়। আরে, প্রত্যক্ষ করা কি যার তার কম্ম? শ্রীভগবান কখনও কখনও তাঁর ভক্তদের বলেন—দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ। সেই দিব্যদৃষ্টি পেলে তবে সব দেখতে পাওয়া যায়।'

নগেন জিজ্ঞাসা করিল,—'আপনি দেখতে পেয়েছেন চাটুজ্যেমশায়?'

'জ্যাঠামি করিসনি। এই কলকাতা শহরে রাস্তায় যারা চলাফেরা করে—কেউ কেরানী, কেউ দোকানী, কেউ মজুর, কেউ আর কিছু—তোমরা ভাব সবাই বুঝি মানুষ। তা মোটেই নয়। তাদের ভেতর সর্বদাই দু-দশটা ভূত পাওয়া যায়। তবে চিনতে পারা দুষ্কর। এই রকম ভূতের পাল্লায় পড়েছিলেন মহেশ মিত্তির।'

'কে তিনি?'

'জান না? আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের মামার শালা। এককালে তিনি কিছু মানতেন না,

কিন্তু শেষ দশায় তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছিল।'

সকলে একবাক্যে বলিলেন—'কি হয়েছিল বলুন না চাটুজ্যেমশায় !'

চাটুজ্যে মহাশয় হুঁকাটি হাতে তুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। মহেশ মিত্তির তখন শ্যামবাজারের শিবচন্দ্র কলেজে প্রফেসরি করতেন। অঙ্কের প্রফেসর, অসাধারণ বিদ্যে, কিন্তু প্রচণ্ড নাস্তিক। ভগবান আত্মা পরলোক কিছুই মানতেন না। এমন কি, স্ত্রী মারা গেলে আর বিবাহ্ পর্যন্ত করেননি। খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না, বলতেন—শুয়োর না খেলে হিঁদুর উন্নতির আশা নেই, ওটা বাদ দিয়ে কোনও জাত বড় হতে পারেনি। মহেশের চালচলনের জন্য আত্মীয়স্বজন তাঁকে একঘরে করেছিল। কিন্তু যতই অনাচার করুন তাঁর স্বভাবটা ছিল অকপট, পারতপক্ষে মিথ্যা কথা কইতেন না। তাঁর পরমবন্ধু ছিলেন হরিনাথ কুণ্ডু, তিনিও ঐ কলেজের প্রফেসর, ফিলসফি পড়াতেন। কিন্তু বন্ধু হলে কি হয়, দুজনে হরদম ঝগড়া হত, কারণ হরিনাথ আর কিছু মানুন না মানুন ভূত মানতেন। তাছাড়া মহেশবাবু অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কেউ তাঁকে হাসতে দেখেনি, আর হরিনাথ ছিলেন আমুদে লোক, কথায় কথায় ঠাট্টা করে বন্ধুকে উদ্ব্যস্ত করতেন। তবু মোটের ওপর তাঁদের পরস্পরের প্রতি খুব একটা টান ছিল।

তখন রাজনীতি চর্চার এত রেওয়াজ ছিল না, আর ভদ্রলোকের ছেলের অন্নচিন্তাও এমন চমৎকারা হয়নি, দু-একটা পাস করতে পারলে যেমন-তেমন চাকরি জুটে যেত। লোকের তাই উঁচুদরের বিষয় আলোচনা করবার সময় ছিল। ছোকরারা চিন্তা করত—বউ ভালবাসে কি বাসে না। যাদের সে সন্দেহ্ মিটে গেছে, তারা মাথা ঘামাত—ভগবান আছেন কি নেই। একদিন কলেজে কাজ ছিল না, অধ্যাপকেরা সকলে মিলে গল্প করছিলেন। গল্পের আরম্ভ যা নিয়েই হ'ক, মহেশ আর হরিনাথ কথাটা টেনে নিয়ে ভূতে আর ভগবানে হাজির করতেন, কারণ এই নিয়ে তর্ক করাই তাঁদের অভ্যাস। এদিনও তাই হয়েছিল।

আলোচনা শুরু হয় ঝি-চাকরের মাইনে নিয়ে। কলেজের পণ্ডিত দীনবন্ধু বাচস্পতিমশায় দুঃখ করছিলেন—'ছোটলোকের লোভ এত বেড়ে গেছে যে আর পেরে ওঠা যায় না।' মহেশবাবু বললেন—'লোভ সকলেরই বেড়েছে, আর বাড়াই উচিত, নইলে মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে কিসে। পণ্ডিতমশায় উত্তর দিলেন—'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।' মহেশবাবু পালটা জবাব দিলেন—'লোভ ত্যাগ করলেও মৃত্যুকে ঠেকানো যায় না।'

তর্কটা তেমন জুতসই হচ্ছে না দেখে হরিনাথবাবু একটু উসকে দেবার জন্য বললেন—'আমাদের মতন লোকের লোভ হওয়া উচিত মৃত্যুর পর। মাইনে তো পাই মোটে পৌনে দু-শ, তাতে ইহলোকের কটা শখই বা মিটবে, তাইতো পরকালের আশায় বসে আছি, আত্মাটা যদি স্বর্গে গিয়ে একটু ফুর্তি করতে পারে।'

দীনবন্ধু পণ্ডিত বললেন—'কে বললে তুমি স্বর্গে যাবে ? আর স্বর্গের তুমি জানই বা কি ?'

'সমস্তই জানি পণ্ডিতমশাই। খাসা জায়গা, না গরম না ঠাণ্ডা। মন্দাকিনী কুলুকুলু বইছে, তার ধারে ধারে পারিজাতের ঝোপ। সবুজ মাঠের মধ্যিখানে কল্পতরু গাছে আঙুর বেদানা আম রসগোল্লা কাটলেট সব রকম ফলে আছে, ছেঁড় আর খাও। জন-কতক ছোকরা-দেবদূত গোলাপী উড়নি গায়ে দিয়ে সুধার বোতল সাজিয়ে বসে রয়েছে, চাইলেই ফটাফট খুলে দেবে। ওই হোথা কুঞ্জবনে ঝাঁকে ঝাঁকে অপ্সরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, দুদণ্ড রসালাপ কর, কেউ কিছু বলবে না। যত খুশি নাচ দেখ, গান শোন। আর কোলোয়াতি চাও তো নারদ মুনির আস্তানায় যাও।'

মহেশবাবু বললেন—'সমস্ত গাঁজা। পরলোক আত্মা ভূত ভগবান কিছুই নেই। ক্ষমতা থাকে প্রমাণ কর।'

তর্ক জমে উঠল। প্রফেসররা কেউ এক পক্ষে কেউ অপর পক্ষে দাঁড়ালেন। পণ্ডিতমশায় দারুণ অবজ্ঞায় ঠোঁট উলটে বসে রইলেন। বৃদ্ধ প্রিনসিপাল যদু সাণ্ডেল রফা করে বললেন—'ভূতের তেমন দরকার দেখি না, কিন্তু আত্মা আর ভগবান বাদ দিলে চলে না।' মহেশ মিত্তির বললেন—'কেউ-উ নেই, আমি দশ মিনিটের মধ্যে প্রমাণ করে দিচ্ছি।' হরিনাথ কুণ্ডু মহা উৎসাহে

বন্ধুর পিঠ চাপড়ে বললেন—‘লেগে যাও।’

তারপর মহেশবাবু ফুলস্কাপ কাগজ আর পেনসিল নিয়ে একটি বিরাট অঙ্ক কষতে লেগে গেলেন। ঈশ্বর আত্মা আর ভূত—এই তিন রাশি নিয়ে অতি জটিল অঙ্ক, তার গতি বোঝে কার সাধ্য। বিস্তর যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে হাতির শুঁড়ের মতন বড় বড় চিহ্ন টেনে অবশেষে সমাধান করলেন—ঈশ্বর=$^{\circ}$, আত্মা=ভূত=$\sqrt{}^{\circ}$।

বাচস্পতি বললেন—‘বদ্ধ উন্মাদ।’

মহেশবাবু বললেন—‘উন্মাদ বললেই হয় না। এ হল গিয়ে দস্তুরমত ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলস। সাধ্য থাকে তো আমার অঙ্কের ভুল বার করুন।’

হরিনাথ বললেন—‘অঙ্ক-টঙ্ক আমার আসে না। বাচস্পতিমশায় যদি ভগবান দেখাবার ভার নেন তো আমি মহেশকে ভূত দেখাতে পারি।’

বাচস্পতি বললেন—‘আমার বয়ে গেছে।’

মহেশবাবু বললেন—‘বেশ তো হরিনাথ, তুমি ভূতই দেখাও না। একটার প্রমাণ পেলে আর সমস্তই মেনে নিতে রাজী আছি।’

হরিনাথবাবু বললেন—‘এই কথা ? আচ্ছা, আসছে হপ্তায় শিব-চতুর্দশী পড়ছে। সেদিন তুমি আমার সঙ্গে রাত বারোটায় মানিকতলায় নতুন খালের ধারে চল, পষ্টাপষ্টি ভূত দেখিয়ে দেব। কিন্তু যদি কোন বিপদ ঘটে তো আমাকে দুষতে পারবে না।’

‘যদি দেখাতে না পার ?’

‘আমার নাক কান কেটে দিও। আর যদি দেখাতে পারি তো তোমার নাক কাটব।’

প্রিনসিপাল যদু সাণ্ডেল বললেন—‘কাটাকাটির দরকার কি, সত্যের নির্ণয় হলেই হল।’

শিব চতুর্দশীর রাতে মহেশ মিত্তির আর হরিনাথ কুণ্ডু মানিকতলায় গেলেন। জায়গাটা তখন বড়ই ভীষণ ছিল, রাস্তায় আলো নেই, দুধারে বাবলা গাছে আরও অন্ধকার করেছে। সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল মাঝে মাঝে প্যাঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে। হোঁচট খেতে খেতে দুজনে নতুন খালের ধারে পৌঁছলেন। বছর-দুই আগে ওখানে প্লেগের হাসপাতাল ছিল, এখনও তার গোটাকতক খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে।

মহেশ মিত্তির অবিশ্বাসী সাহসী লোক, কিন্তু তাঁরও গা ছমছম করতে লাগল। হরিনাথ সারা রাস্তা কেবল ভূতের কথাই কয়েছেন—তারা দেখতে কেমন, মেজাজ কেমন, কি খায়, কি পরে। দেবতারা হচ্ছেন উদার প্রকৃতি দিলদরিয়া, কেউ তাঁদের না মানলেও বড় একটা কেয়ার করেন না। কিন্তু অপদেবতারা পদবীতে খাটো বলে তাঁদের আত্মসম্মানবোধ বড়ই উগ্র, না মানলে ঘাড় ধরে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা আদায় করেন। এই সব কথা।

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ শোনা গেল, যেন কোনও অশরীরী বেরাল তার পলাতকা প্রণয়িনীকে আকুল আহ্বান করছে। একটু পরেই মহেশবাবু রোমাঞ্চিত হয়ে দেখলেন, একটা লম্বা রোগা কুচকুচে কাল মূর্তি দু-হাত তুলে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে একটু দূরে ঐ রকম আরও দুটো।

হরিনাথবাবু থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—‘রাম রাম সীতারাম ! ও মহেশ, দেখছ কি, তুমিও বল না।’

আর একটু হলেই মহেশবাবু রামনাম উচ্চারণ করে ফেলতেন, কিন্তু তাঁর কনশেন্স্ বাধা দিয়ে বললে—‘উহুঁ, একটু সবুর কর, যদি ঘাড় মটকাবার লক্ষণ দেখ তখন না-হয় রামনাম করা যাবে।’

এঁরা একটা পাকুড় গাছের নিচে ছিলেন। হঠাৎ ওপর থেকে খানিকটা কাদাগোলা জল মহেশের মাথায় এসে পড়ল।

তখন সামনের সেই কাল মূর্তিটা নাকী সুরে বললে—‘মহেশবাবু, আপনি নাকি ভূত মানেন না ?’

এ অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বলে থাকেন—আজ্ঞে হাঁ, মানি বই কি। কিন্তু মহেশ মিত্তির বেয়াড়া লোক, হঠাৎ তাঁর কেমন একটা খেয়াল হল, ধাঁ করে এগিয়ে গিয়ে ভূতের কাঁধ খামচে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন—‘কোন্ ক্লাস ?’

ভূত থতমত খেয়ে জবাব দিলে—‘সেকেন্ড ইয়ার সার !’

'রোল নম্বর কত ?'

ভূত করুণ নয়নে হরিনাথের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—'বলি সার ?'

হরিনাথের মুখে রাম রাম ভিন্ন কথা নেই। পিছ্‌নের দুটো ভূত অদৃশ্য হয়ে গেল। পাকুড় গাছে যে ছিল সে টুপ করে নেমে এসে পালিয়ে গেল। তখন বেগতিক দেখে সামনের ভূতটি ঝাঁকুনি দিয়ে মহেশের হাত ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড় মারলে।

মহেশ মিত্তির হরিনাথের পিঠে একটা প্রচণ্ড কিল মেরে বললেন—'জোচ্চোর !'

হরিনাথও পালটা কিল মেরে বললেন—'আহম্মক !'

নিজের নিজের পিঠে হাত বুলতে বুলতে দুই বন্ধু বাড়ি-মুখো হলেন। আসল ভূত যারা আশেপাশে লুকিয়ে ছিল তারা মনে মনে বললেন—আজি রজনীতে হয়নি সময়।

পরদিন কলেজে হুলস্থূল বেধে গেল। সমস্ত ব্যাপার শুনে প্রিনসিপাল ভয়ংকর রাগ করে বললেন—'অত্যন্ত শেমফুল কাণ্ড। দুজন নামজাদা অধ্যাপক, একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে হাতাহাতি ! হরিনাথ তোমার লজ্জা নেই ?'

হরিনাথবাবু ঘাড় চুলকে বললেন—'আজ্ঞে আমার উদ্দেশ্যটা ভালই ছিল। মহেশকে রিফর্ম করবার জন্য যদি একটু ইয়ে করেই থাকি তাতে দোষটা কি—হাজার হোক আমার বন্ধু তো ?'

মহেশবাবু গর্জন করে বললেন—'কে তোমার বন্ধু ?'

প্রিনসিপাল বললেন—'মহেশ তুমি চুপ কর। উদ্দেশ্য যাই হ'ক কলেজের ছেলেদের এর ভেতর জড়ানো একেবারে অমার্জনীয় অপরাধ। হরিনাথ তুমি বাড়ি যাও, তোমায় সাসপেন্ড করলুম। আর মহেশ তোমাকেও সাবধান করে দিচ্ছি—আমার কলেজে ভুতুড়ে তর্ক তুলতে পাবে না।'

মহেশবাবু উত্তর দিলেন—'সে প্রতিশ্রুতি দেওয়া শক্ত। সকল রকম কুসংস্কার দূর করাই আমার জীবনের ব্রত।'

'তবে তোমাকেও সাসপেন্ড করলুম।'

অন্যান্য অধ্যাপকরা চুপ করে সমস্ত শুনছিলেন। তাঁরা প্রিনসিপালের হুকুম শুনে কোনও প্রতিবাদ করলেন না, কারণ সকলেই জানতেন যে তাঁদের কর্তার রাগ বেশিদিন থাকে না।

মহেশবাবু তাঁর বাসায় ফিরে এলেন। হরিনাথের ওপর প্রচণ্ড রাগ—হতভাগা একটা গভীর তত্ত্বের মীমাংসা করতে চায় জুয়োচুরির দ্বারা ! সে আবার ফিলসফি পড়ায় ! এমন অপ্রত্যাশিত আঘাত মহেশ কখনও পাননি।

মানুষের মন যখন নিদারুণ ধাক্কা খায় তখন সে তার ভাব ব্যক্ত করবার জন্য উপায় খোঁজে। কেউ কাঁদে, কেউ তর্জন-গর্জন করে, কেউ কবিতা লেখে। একটা তুচ্ছ কোঁচবকের হত্যাকাণ্ড দেখে মহর্ষি বাল্মীকির মনে যে ঘা লেগেছিল তাই প্রকাশ করবার জন্য তিনি হঠাৎ দু-ছত্র শ্লোক রচনা করে ফেলেন—মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্ ইত্যাদি। তার পর সাতকাণ্ড রামায়ণ লিখে তাঁর ভাবের বোঝা নামাতে পেরেছিলেন। আমাদের মহেশ মিত্তির চিরকাল নীরস অঙ্কশাস্ত্রের চর্চা করে এসেছেন, কাব্যের কিছুই জানতেন না। কিন্তু আজ তাঁরও মনে সহসা একটা কবিতার অঙ্কুর গজগজ করতে লাগল। তিনি আর বেগ সামলাতে পারলেন না, কলেজের পোশাক না ছেড়েই বড় একখানা আল্‌জেব্‌রা খুলে তার প্রথম পাতায় লিখলেন—

হরিনাথ কুণ্ডু,
খাই তার মুণ্ডু।

কবিতাটি লিখে বার বার ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে আদি কবি বাল্মীকির মতন ভাবলেন, হাঁ, উত্তম হয়েছে।

কিন্তু একটা খটকা বাধল। কুণ্ডুর সঙ্গে মণ্ডুর মিল আবহমান কাল থেকে চলে আসছে, এতে মহেশের কৃতিত্ব কোথায় ? কালিদাসই হন, আর রবীন্দ্রনাথই হন, কুণ্ডুর সঙ্গে মুণ্ড মেলাতেই হবে—এ হল প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। মহেশ একটু ভেবে ফের লিখলেন—

কুণ্ড হরিনাথ,
মুণ্ডু করি পাত।

হাঁ, এইবার মৌলিক রচনা বলা যেতে পারে। মহেশের মনটা একটু শান্ত হল। কিন্তু কাব্যসরস্বতী যদি একবার কাঁধে ভর করেন তবে সহজে নামতে চান না। মহেশবাবু লিখতে লাগলেন—

হরিনাথ ওরে,
হবি তুই মরে
নরকের পোকা
অতিশয় বোকা।

উঁহু, নরকই নেই তার আবার পোকা। মহেশবাবু স্থির করলেন—কাব্যে কুসংস্কার নাম দিয়ে তিনি শীঘ্রই একটা প্রবন্ধ রচনা করবেন, তাতে মাইকেল রবীন্দ্রনাথ কাকেও রেহাই দেবেন না। তার পর তাঁর কবিতার শেষের চার লাইন কেটে দিয়ে ফের লিখলেন—

ওরে হরিনাথ,
তোরে করি কাত,
পিঠে মারি চড়—

এমন সময় মহেশের চাকরটা এসে বললে—'বাবু চা হবে কি দিয়ে? দুধ তো ছিঁড়ে গেছে।'

মহেশবাবু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন—'সেলাই করে নে।'

পিঠে মারি চড়,
মুখে গুঁজি খড়।
জ্বেলে দেশলাই
আগুন লাগাই।

কিন্তু আবার এক আপত্তি। হরিনাথকে পুড়িয়ে ফেললে জগতের কোন লাভ হবে না, অনর্থক খানিকটা জান্তব পদার্থ বরবাদ হবে। বরং তার চাইতে—

হরিনাথ ওরে
পোড়াব না তোরে।
নিয়ে যাব ধাপা
দেব মাটি চাপা।
সার হয়ে যাবি।
ঢ্যাঁড়স ফলাবি।

মহেশবাবু আরও অনেক লাইন রচনা করেছিলেন, তা আমার মনে নাই। কবিতা লিখে খানিকটা উচ্ছ্বাস বেরিয়ে যাওয়ায় তাঁর হৃদয়টা বেশ হালকা হল, তিনি কাপড়-চোপড় ছেড়ে ইজি-চেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

তিন দিন যেতে না যেতে প্রিনসিপাল মহেশ আর হরিনাথকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা আবার নিজের নিজের কাজে বহাল হলেন, কিন্তু তাদের বন্ধুত্ব ভেঙে গেল। সহকর্মীরা মিলনের অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনও ফল হল না। হরিনাথ বরং একটু সন্ধির আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু মহেশ একেবারে পাথরের মতন শক্ত হয়ে রইলেন।

কিছুদিন পরে মহেশবাবুর খেয়াল হল—প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে এক তরফা বিচার করাটা ন্যায়সংগত নয়, এর অনুকূল প্রমাণ কে কি দিয়েছেন তাও জানা উচিত। তিনি দেশী বিলাতী বিস্তর বই সংগ্রহ করে পড়তে লাগলেন, কিন্তু তাতে তাঁর অবিশ্বাস আরও প্রবল হল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই নেই, কেবল আছে—অমুক ব্যক্তি কি বলেছেন আর কি দেখেছেন। বাঘের অস্তিত্বে মহেশের সন্দেহ নেই। কারণ জন্তুর বাগানে গেলেই দেখা যায়। ভূত যদি থাকেই তবে খাঁচায় পুরে দেখা না বাপু। তা নয়, শুধু ধাপ্পাবাজি। প্রেততত্ত্ব চর্চা করে মহেশবাবু বেজায় চটে উঠলেন। শেষটায় এমন হল যে ভূতের গুষ্ঠিকে গালাগাল না দিয়ে তিনি জলগ্রহণ করতেন না।

পড়ে পড়ে মহেশের মাথা গরম হয়ে উঠল। রাত্রে ঘুম হয় না, কেবল স্বপ্ন দেখেন ভূতে তাঁকে ভেংচাচ্ছে। এমন স্বপ্ন দেখেন বলে নিজেব উপরও তাঁর রাগ হতে লাগল। ডাক্তার বললে—পড়াশুনা বন্ধ করুন, বিশেষ করে ঐ ভূতুড়ে বইগুলো—যা মানেন না তার চর্চা করেন কেন ? কিন্তু ঐ সব বই পড়া মহেশের এখন একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পড়লেই রাগ হয়, আর সেই রাগেতেই তাঁর সুখ।

অবশেষে মহেশ মিত্তির কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। দিন দিন শরীর ক্ষয়ে যেতে লাগল, কিন্তু রোগটা ঠিক নির্ণয় হল না। সহকর্মীরা প্রায়ই এসে তাঁর খবর নিতেন। হরিনাথও একদিন এসেছিলেন, কিন্তু মহেশ তাঁর মুখদর্শন করলেন না।

সাত-আট মাস কেটে গেল। শীতকাল, রাত দশটা। হরিনাথবাবু শোবার উদ্যোগ করছেন এমন সময় মহেশের চাকর এসে খবর দিলে যে তার বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন, অবস্থা বড় খারাপ। হরিনাথ তখনই হাতিবাগানে মহেশের বাসায় ছুটলেন।

মহেশের আর দেরি নাই, মৃত্যুর ভয়ও নেই। বললেন—'হরিনাথ তোমায় ক্ষমা করলুম। কিন্তু ভেবো না যে আমার মত কিছুমাত্র বদলেছে। এই রইল আমার উইল, তোমাকেই অছি নিযুক্ত করেছি। আমার পৈতৃক দশ হাজার টাকার কাগজ ইউনিভার্সিটিকে দান করেছি, তার সুদ থেকে প্রতি বৎসর একটা পুরস্কার দেওয়া হবে। যে ছাত্র ভূতের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লিখবে সে ঐ পুরস্কার পাবে। আর দেখ—খবরদার, শ্রাদ্ধ-টাদ্ধ করো না। ফুলের মালা চন্দন-কাঠ ঘি এসব দিও না, একদম বাজে খরচ। তবে হাঁ, দু-চার বোতল কেরোসিন ঢালতে পার। দেড় সের গন্ধক আর পাঁচ সের সোরা আনানো আছে, তাও দিতে পার, চটপট কাজ শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা, চললুম তা হলে।'

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। মহেশের আত্মীয়স্বজন কেউ কলকাতায় নেই, থাকলেও বোধ হয় তারা আসত না। বড়দিনের বন্ধ, কলেজের সহকর্মীরা প্রায় সকলেই অন্যত্র গেছে। হরিনাথ মহা বিপদে পড়লেন। মহেশবাবুর চাকরকে বললেন পাড়ার জনকতক লোক ডেকে আনতে।

অনেকক্ষণ পরে দুজন মাতব্বর প্রতিবেশী এলেন। ঘরে ঢুকলেন না, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—'চুপ করে বসে আছেন যে বড় ? সৎকারের ব্যবস্থা কি করলেন ?'

হরিনাথ বললেন, 'আমি একলা মানুষ, আপনাদের ওপরেই ভরসা।'

'ওই বেলাল্লা হতভাগার লাশ আমরা বইব ? ইয়ারকি পেয়েছেন নাকি !' এই কথা বলেই তাঁরা সরে পড়লেন।

হরিনাথের তখন মনে পড়ল, বড় রাস্তার মোড়ে একটা মাটকোঠায় সাইনবোর্ড দেখেছেন—বৈতরণী সমিতি, ভদ্রমহোদয়গণের দিবারাত্র সস্তায় সৎকার। চাকরকে বসিয়ে রেখে তখনই সেই সমিতির খোঁজে গেলেন।

অনেক চেষ্টায় সমিতি থেকে তিনজন লোক যোগাড় হল। পনর টাকা পারিশ্রমিক, আর শীতের ওষুধ বাবদ ন-সিকে। সমস্ত আয়োজন শেষ হলে হরিনাথ আর তাঁর তিন সঙ্গী খাট কাঁধে নিয়ে রাত আড়াইটার সময় নিমতলায় রওনা হলেন।

অমাবস্যার রাত্রি, তার ওপর আবার কুয়াশা। হরিনাথের দল কর্নওয়ালিস স্ট্রীট দিয়ে চললেন। গ্যাসের আলো মিটমিট করছে, পথে জনমানব নেই। কাঁধের বোঝা ক্রমেই ভারী বোধ হতে লাগল, হরিনাথ হাঁপিয়ে পড়লেন। বৈতরণী সমিতির সর্দার ত্রিলোচন পাকড়াশী বুঝিয়ে দিলেন—এমন হয়েই থাকে, মানুষ মরে গেলে তার ওপর জননী বসুন্ধরার টান বাড়ে।

হরিনাথ একলা নয়, তাঁর সঙ্গীরা সকলেই সেই শীতে গলদ্ঘর্ম হয়ে উঠল। খাট নামিয়ে খানিক জিরিয়ে আবার যাত্রা।

কিন্তু মহেশ মিত্তিরের ভার ক্রমশই বাড়ছে, পা আর এগোয় না। পাকড়াশী বললেন—'ঢের ঢের বয়েছি মশাই, কিন্তু এমন জগদ্দল মড়া কখনও কাঁধে করিনি। দেহটা তো শুকনো, লোহা খেতেন বুঝি ? পনেরো টাকায় হবে না মশায়, আরো পাঁচ টাকা চাই।'

হরিনাথ তাতেই রাজী, কিন্তু সকলে এমন কাবু হয়ে পড়েছে যে দু-পা গিয়ে আবার খাট নামাতে হল। হরিনাথ ফুটপাতে এলিয়ে পড়লেন, বৈতরণীর তিন জন হাঁপাতে হাঁপাতে তামাক টানতে লাগল।

ওঠবার উপক্রম করছেন এমন সময় হরিনাথের নজর পড়ল—কুয়াশার ভেতর দিয়ে একটা আবছায়া তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এলে দেখলেন—কাল র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া একটা লোক। লোকটি বললে—'এঃ, আপনারা হাঁপিয়ে পড়েছেন দেখছি। বলেন তো আমি কাঁধ দিই।'

হরিনাথ ভদ্রতার খাতিরে দু-একবার আপত্তি জানালেন কিন্তু শেষটায় রাজী হলেন। লোকটি কোন্ জাত তা আর জিজ্ঞাসা করলেন না, কারণ মহেশ মিত্তির ও বিষয়ে চিরকাল সমদর্শী, এখন তো কথাই নেই। তা ছাড়া যে লোক উপযাচক হয়ে শ্মশানযাত্রার সঙ্গী হয় সে তো বান্ধব বটেই।

ত্রিলোচন পাকড়াশী বললেন,—'কাঁধ দিতে চাও দাও, কিন্তু বখরা পাবে না, তা বলে রাখছি।'

আগন্তুক বললে—'বখরা চাই না।'

এবার হরিনাথকে কাঁধ দিতে হল না, তাঁর জায়গায় নতুন লোকটি দাঁড়াল। আগের চেয়ে যাত্রাটা একটু দ্রুত হল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর পা চলে না, ফের নামিয়ে বিশ্রাম।

পাকড়াশী বললেন—'কুড়ি টাকার কাজ নয় বাবু, এ হল মোষের গাড়ির বোঝা। আরও পাঁচ টাকা চাই।'

এমন সময় আবার একজন পথিক এসে উপস্থিত—ঠিক প্রথম লোকটির মতন কাল র‍্যাপার গায়ে। এও খাট বইতে প্রস্তুত। হরিনাথ দ্বিরুক্তি না করে তার সাহায্য নিলেন। এবার পাকড়াশী রেহাই পেলেন।

খাট চলেছে, আর একটু জোরে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার ক্লান্তি। মহেশের ভার অসহ্য হয়ে উঠেছে, তার দেহে কিছু ঢোকেনি তো? খাট নামিয়ে আবার সবাই দম নিতে লাগল।

কে বলে শহুরে লোক স্বার্থপর? আবার একজন সহায় এসে হাজির, সেই কাল র‍্যাপার গায়ে। হরিনাথের ভাববার অবসর নেই, বললেন, 'চল, চল।'

আবার যাত্রা, আরও একটু জোরে, তারপর ফের খাট নামাতে হল। এই যে, চতুর্থ বাহক এসে হাজির, সেই কাল র‍্যাপার। এরা কি মহেশকে বইবার জন্য এই তিন পহর রাতে পথে বেরিয়েছে। হরিনাথের আশ্চর্য হবার শক্তি নেই, বললেন—'ওঠাও খাট, চল জলদি।'

চারজন অচেনা বাহকের কাঁধে মহেশের খাট চলেছে, পিছনে হরিনাথ। আর বৈতরণী সমিতির তিন জন। এইবার গতি বাড়ছে, খাট হনহন করে চলছে। হরিনাথ আর তাঁর সঙ্গীদের ছুটতে হল।

আরে অত তাড়াতাড়ি কেন, একটু আস্তে চল। কেই বা কথা শোনে! ছুট-ছুট। 'আরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, থাম থাম, বীডন্ স্ট্রীট ছাড়িয়ে গেলে যে। লোকগুলো কি শুনতে পায় না? ওহে পাকড়াশী, থামাও না ওদের?' কোথায় পাকড়াশী? তিনি বিচক্ষণ লোক, ব্যাপারটা বুঝে টাকার মায়া ত্যাগ করে সদলে পালিয়েছেন।

মহেশের খাট তখন তীর বেগে ছুটছে, হরিনাথ পাগলের মতন পিছু পিছু দৌড়চ্ছেন। কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, গোলদিঘি, বউবাজারের মোড়—সব পার হয়ে গেল। কুয়াশা ভেদ করে সামনের সমস্ত পথ ফুটে উঠেছে—এ পথের কি শেষ নেই? রাস্তা কি ওপরে উঠেছে না নিচে নেমেছে? এ কি আলো না অন্ধকার? দূরে ও কি দেখা যাচ্ছে—সমুদ্রের ঢেউ, না চোখের ভুল?

হরিনাথ ছুটতে ছুটতে নিরন্তর চিৎকার করছেন—'থাম, থাম।' ও কি, খাটের ওপর উঠে বসেছে কে? মহেশ? মহেশই তো। কি ভয়ানক! দাঁড়িয়েছে, ছুটন্ত খাটের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিছন ফিরে লেকচারের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে কি বলছে?

দূর দূরান্তর থেকে মহেশের গলার আওয়াজ এল—'হরিনাথ—ও হরিনাথ—ওহে হরিনাথ—'

'কি, কি? এই যে আমি।'

'ও হরিনাথ—আছে, আছে, সব আছে, সব সত্যি—'

মহেশের খাট অগোচর হয়ে এল, তখনও তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে—'আছে আছে—'

হরিনাথ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে ওয়েলেসলি স্ট্রীটের পুলিশ তাঁকে দেখতে পেয়ে মাতাল বলে চালান দিলে। তাঁর স্ত্রী খবর পেয়ে বহু কষ্টে তাঁকে উদ্ধার করেন।

বংশলোচনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—'গয়ায় পিণ্ডি দেওয়া হয়েছিল কি ?'

'শুধু গয়ায়। পিণ্ডিদাদনখাঁএ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন ফল হয়নি, পিণ্ডি ছিটকে ফিরে এল।'

'তার মানে ?'

'মানে—মহেশ নিলেন না, কিংবা তাঁকে নিতে দিলে না।'

'আশ্চর্য !—মহেশ মিত্তিরের টাকাটা ?'

'সেটা ইউনিভার্সিটিতে গচ্ছিত আছে। কিন্তু কাজ কিছুই হয়নি, ভূতের বিপক্ষে প্রবন্ধ লিখতে ছাত্রের সাহস নেই। এখন সেই টাকা সুদে-আসলে প্রায় পঁচিশ হাজার হয়েছে। একবার সেনেটে প্রস্তাব ওঠে টাকাটা প্রত্নবিভাগের জন্য খরচ হ'ক। কিন্তু কোন ছাত্রের ওপর এমন এমন দুপদাপ শব্দ শুরু হল যে সব্বাই ভয়ে পালালেন।' সেই থেকে মহেশফাণ্ডের নাম কেউ করে না।'

বন্দী আত্মার কাহিনী

হেমেন্দ্রকুমার রায়

বিখ্যাত 'স্পিরিচুয়ালিস্ট' অনন্তবাবুর বাড়িতে বসে এক সন্ধ্যায় আলাপ করছিলুম। কথা হচ্ছিল প্রেততত্ত্ব নিয়ে।

আমি ডাক্তার। কিঞ্চিৎ পসারও যে আছে, নিজের মুখে এ-কথা বললে গর্ব করা হবে না।

'আত্মা' বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব যে আদৌ আছে, আমি আজ পর্যন্ত হাতে-নাতে এমন প্রমাণ কখনো পাইনি। জন্ম, মৃত্যু ও দেহগত সমস্ত রহস্য একেবারে আমার নখদর্পণে, এমন অভিমান আমার পুরোমাত্রায় আছে।

কিন্তু অনন্তবাবু আমার সেই অভিমানে আঘাত দিতে চান। তিনি বলেন, জন্ম ও মৃত্যু কথার কথা মাত্র, দেহটা সাময়িক খোলস ছাড়া আর কিছু না, জন্মের আগেও এবং মৃত্যুর পরেও আত্মা বেঁচে থাকে ইত্যাদি।

খুব জোরে তর্ক চালিয়েছি। আমিও বুঝব না, অনন্তবাবুও না বুঝিয়ে ছাড়বেন না। তর্কটা যখন রীতিমত জমে উঠেছে, হঠাৎ রাস্তায় উঠল ভীষণ গোলমাল। সচমকে মুখ ফিরিয়ে আমরা জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখি, পথের ওপাশের ফুটপাথের ওপরে সুরেনবাবুর বাড়ির সামনে মস্ত ভিড়ের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুতপায়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হলুম।

ফুটপাথের ওপরে হাত-পা ছড়িয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছেন সুরেনবাবু নিজেই। তিনি কেবল আমাদের প্রতিবেশীই নন, আমাদের দুজনেরও বিশেষ বন্ধু বটে।

ভিড়ের একজন লোক জিজ্ঞাসার উত্তরে বলল, 'বারান্দার ওপর থেকে উনি পড়ে গিয়েছেন।'

আমরা ধরাধরি করে সুরেনবাবুকে নিয়ে তাঁর বাড়ির ভেতরে ঢুকলুম। তারপর বৈঠকখানার তক্তপোশের ওপরে শুইয়ে রেখে তাঁকে পরীক্ষা করতে লাগলুম।

পরীক্ষার পর বুঝলুম, গতিক সুবিধের নয়। সুরেনবাবুর দেহের ওপরটায় গুরুতর আঘাতের চিহ্ন নেই বটে, কিন্তু তাঁর দেহের ভেতরের অবস্থা ভয়াবহ, এটা বেশ সহজেই আমি অনুমান করতে

পারলুম।

অনন্তবাবুকে বললুম, 'এঁর মৃত্যুর আর দেরি নেই।'

অনন্তবাবু বললেন, 'কি সর্বনাশ, তাহলে উপায় ? সুরেনের স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে সবাই যে হরিদ্বারে তীর্থ করতে গিয়েছে ! বাড়িতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। এখন তাহলে আমরা কি করব ? তাঁদেরও তো প্রয়োজন।'

বললুম, 'আমার পরীক্ষা ভুল হতে পারে। দাঁড়ান, ডাক্তার পি. ঘোষকে ডাকি।'

ডাক্তার পি. ঘোষ হচ্ছেন কলকাতার শ্রেষ্ঠ ডাক্তারদের অন্যতম। ফোনে খবর পেয়েই এসে হাজির হলেন। সুবেনবাবুকে পরীক্ষা করে বললেন, 'কোন আশা নেই। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ইনি মারা যাবেন।'

আমি বললুম, 'অনন্তবাবু, আপনার যদি ঠিকানা জানা থাকে, তবে সুরেনবাবুর স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েদেরকে এক্ষুনি টেলিগ্রামে খবর দিন।'

'ঠিকানাও জানি, টেলিগ্রামও যেন করে দিচ্ছি। কিন্তু আপনারা বলছেন সুরেন এখনি মারা যাবে। হরিদ্বার এখান থেকে একদিনেব পথ নয়, সুরেনের আর কোন আত্মীয়ও নেই। সমস্ত ঝুঁকি আমাদেরই সামলাতে হবে তো ? মৃতদেহ নিয়ে আমরা কি করব ? মিস্টার ঘোষ, দেখুন —আপনাদের চিকিৎসা বিজ্ঞান যদি এঁকে কোনরকমে আর দিন-তিনেক বাঁচিয়ে রাখতে পারে, ভাল হত তাহলে ?'

ডাঃ ঘোষ মাথা নেড়ে বললেন, 'অসম্ভব। এতক্ষণে মৃত্যু ওঁর দেহের ভেতরে প্রবেশ করেছে। এ অসাধ্য সাধন অসম্ভব ! উনি মারা পড়লেন বলে।'

অনন্ত অত্যন্ত উত্তেজিতের মত একবার ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ঘুরে এলেন। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'মৃত্যুর পরেও কি দেহের ভেতরে আত্মার সাড়া পাওয়া অসম্ভব, ডাক্তার ঘোষ ?'

ডাঃ ঘোষ সবিস্ময়ে বললেন, 'আপনি কী বলছেন ?'

আমিও তখন হতভম্বের মত অনন্তবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইলুম।

আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'আপনারা 'হিপ্‌নটিজম্'এর কথা নিশ্চয়ই জানেন ? বাংলায় যাকে বলে সম্মোহন বিদ্যা বা যোগনিদ্রা ?'

আমি বললুম, 'জানি। আর এও জানি যে, 'হিপ্‌নটিজম্'এ আপনার দেশজোড়া খ্যাতি আছে, অনন্তবাবু। কিন্তু তার কথা এখন কেন ?'

'আমি এখনি একবার সুরেনকে সম্মোহন-বিদ্যায় অভিভূত করতে চাই।'

'তাতে ফল কি হবে ? সুরেনবাবু কি মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবেন ?'

'মৃত্যুর' কবল থেকে কোনদিন কোন মানুষই কোন মানুষকে রক্ষা করতে পারে না। তবে যোগনিদ্রার একটা আশ্চর্য মহিমা আছে। তার দ্বারা নিশ্চয়ই একটা কিছু ফল পাওয়া যাবে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। সেটা যে কি, তা অবশ্য আমি বলতে পারছি না, তবে— না, থাক ! আর কথা বাড়াবার সময় নেই। সুরেনের দিকে তাকিয়ে দেখুন, ওর শেষ মুহূর্ত উপস্থিত !'

সুরেনবাবুর মুখ তখন মৃত্যু-যন্ত্রণায় ভীষণ হয়ে উঠেছে, তাঁর দুই বিস্ফারিত চোখের তারা চারিদিকে ঘুরছিল। অনন্তবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সুরেনবাবুর দেহের ওপরে বিশেষ কৌশলে হস্তচালনা করতে লাগলেন।

ডাঃ ঘোষ গম্ভীর মুখে বসে রইলেন। তাঁর চোখে নিদারুণ অবিশ্বাসের ছায়া।

কি আর করি, আমি অবাক হয়ে অনন্তবাবুর কাণ্ড-কারখানা দেখতে লাগলুম।

কয়েক মুহূর্ত পরে তেমনিভাবে হস্তচালনা করতে করতেই অনন্তবাবু দৃঢ়স্বরে বারংবার ডাকতে লাগলেন, 'সুরেন ! ও সুরেন ! সুরেন !'

প্রথমটা সুরেনবাবুর কোনরকম ভাবান্তরই হতে দেখা গেল না। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর চোখের তারা স্থির ও স্বাভাবিক হয়ে এল।

অনন্তবাবু বললেন, 'সুরেন, আমার চোখের দিকে এবার তাকিয়ে দেখ।'

সুরেনবাবুর চোখ অনন্তবাবুর চোখের দিকে ফিরল—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সারা দেহ একবার শিউরে উঠল।

'সুরেন!'

স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব হল, 'কি?'

'তোমার কি কোন কষ্ট হচ্ছে?'

'না।'

'তবে?'

জবাব নেই। আবার তিন-চারবার ডাকাডাকির পর সুরেনবাবু চমকে উঠে বললেন, 'অ্যাঁ?'

'তুমি কি ঘুমোচ্ছ?'

'হ্যাঁ। আর আমায় ডেকো না তোমরা, আমাকে ঘুমোতে ঘুমোতে মরতে দাও।'

'তবে তুমি ঘুমোও। কাল সকালে আমি তোমাকে ডাকব। তোমাকে সাড়া দিতেই হবে।'

'সাড়া দেব। এখন আমি মরছি। আমাকে ঘুমোতে দাও।' সুরেনবাবুর দুই চোখ মুদে গেল।

অনন্তবাবু আমাদের কাছে এসে বললেন, 'আপনাদের মত কি, কিরকম বুঝলেন?'

ডাঃ ঘোষ বললেন, 'আপনি কি ভাবছেন, কাল সকালে ওর সাড়া পাওয়া যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'অসম্ভব! তাহলে তো চিকিৎসা-বিজ্ঞান ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

'বেশ, কাল সকালে এসে দেখবেন।'

'আসব। যদিও জানি অসম্ভব সম্ভব হবে না, তবু আপনি আমার কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছেন। কাল সকালে আমি আবার আসছি।

পরদিনের সকাল। বহুকাল ধরে প্রেততত্ত্ব নিয়ে ক্রমাগত নাড়াচাড়া করে করে গোঁড়ামির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে অনন্তবাবু বিচারশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন, এই কথা বলাবলি করতে করতে ডাঃ ঘোষের সঙ্গে আমি সুরেনবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম। দেখলুম, বৈঠকখানার সমস্ত জানলা বন্ধ করে আধা অন্ধকার ঘরে সুরেনবাবুর দেহের পাশে অনন্তবাবু চুপ করে বসে আছেন। সমস্ত নিথর, নিঝুম!

ডাঃ ঘোষ সুরেনবাবুর দেহ পরীক্ষা করে বললেন, 'দেহ শীতল আর আড়ষ্ট। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্তব্ধ। শ্বাস-প্রশ্বাস নেই। কাল রাত্রেই এঁর মৃত্যু হয়েছে।' ডাক্তার জিগ্যেস করলেন, 'অনন্তবাবু, এখনো কি আপনার সন্দেহ দূর হয়নি?'

অনন্তবাবু উত্তর দিলেন না।

সুরেনবাবুর গায়ের রং রীতিমত হল্‌দেটে হয়ে গেছে। তাঁর দুই চোখ বোজা। মুখ হাঁ করা।

আমি বললুম, 'আর কেন অনন্তবাবু, এবার এঁর সৎকারের ব্যবস্থা করুন।'

'হরিদ্বারে তার করে দিয়েছি! আগে সুরেনের স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েরা আসুক।'

'সে কি! ততক্ষণে ওঁর দেহটার কি অবস্থা হবে, বুঝতে পারছেন, আপনি?'

'দেহের কি অবস্থা হবে বুঝতে পারছি না। তবে সুরেনকে আর একবার ডেকে দেখা দরকার।'

ডাঃ ঘোষ বললেন, 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? আর কাকে ডাকবেন?'

'সুরেনকে। ...সুরেন, সুরেন!'

কোন সাড়া নেই।

ডাঃ ঘোষ বললেন, 'কি আশ্চর্য! মড়া কখনো কথা কয় নাকি আবার?'

'সুরেন, সুরেন! আমি অনন্ত, তোমাকে ডাকছি। সুরেন একবার সাড়া দাও।'

স্তম্ভিত নেত্রে দেখলুম সুরেনবাবুর ফাঁক করা ওষ্ঠাধরের ওপাশে জিভখানা ছটফট করছে যেন!'

'সুরেন, সুরেন!'

সুরেনবাবুর চোয়াল ও ওষ্ঠাধর একটুও নড়ল না, কিন্তু তাঁর হাঁ-করা মুখবিবর থেকে অদ্ভুত বিকৃত স্বরে এই কথাগুলো বেরুল, 'আঃ, আবার কেন? আমার মৃত্যু হয়েছে। আমি এখন ঘুমোচ্ছি।'

সে কী স্বর! মনে হল, সুরেনবাবুর মুখ যেন কথা কইছে না, সে-সুর আসছে যেন বহুদূর

থেকে—যেন গভীর কোন গিরিগুহার অতলতার ভেতর থেকে।

একটা অজানা ভয়ে আমার গা কাঁপতে লাগল। ডাঃ ঘোষ যেন ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন দেয়ালে পিঠ রেখে। তাঁর মুখ চোখ উদ্‌ভ্রান্তের মত।

'সুরেন, তুমি কি এখনো ঘুমিয়ে আছ?'

'না না, আমি ঘুমোচ্ছিলুম বটে! কিন্তু এখন আমার মৃত্যু হয়েছে।'

'সুরেন, আবার তুমি ঘুমিয়ে পড়।...ডাক্তার ঘোষ, আপনার কোন বক্তব্য আছে?'

ডাঃ ঘোষ ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'না।'

সুরেনবাবুর কণ্ঠস্বর কি রকম মনে হল?'

'ভয়ানক! মানুষের গলার ভেতর থেকে যে ওরকম বীভৎস আওয়াজ বেরুতে পারে, এটা ধারণারও অতীত। ও তো কণ্ঠস্বর নয়— যেন একটা অমানুষিক ধ্বনি মাত্র!'

'কিন্তু ও ধ্বনি তো অপর কারো নয়, ও ধ্বনি তো আসছে সুরেনেরই গলার ভেতর থেকে। সুরেনকে আজ আর ব্যস্ত করব না, ও এখন নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়েই থাক। বোধহয় পরশুদিনই সুরেনের স্ত্রী এসে পড়বেন, তখন আর একবার আপনাকে ডাকব, আসবেন তো?'

'নিশ্চয়ই আসব! ডাঃ ঘোষ তাঁর বিস্ময়াবিষ্ট কৌতূহল দমন করে শশব্যস্ত হয়ে বললেন, 'এ যে অজানা নতুন বিজ্ঞানের রহস্য! না এসে থাকতে পারব না।'

আজ অনন্তবাবুর আহ্বানে আবার সুরেনবাবুর বাড়িতে চলেছি আমরা দুজনে। সন্তানদের নিয়ে সুরেনবাবুর স্ত্রী কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। তাঁর নাম হৈমবতী।

ক্রন্দনধ্বনি শুনতে শুনতে সুরেনবাবুর বৈঠকখানার ভেতরে গিয়ে ঢুকলুম। সুরেনবাবুর আড়ষ্ট দেহ ঘিরে বসে আছেন হৈমবতী। তাঁর দুই ছেলে আর এক মেয়ে। সকলের চোখে জল, কণ্ঠে আর্তনাদ।

অনন্তবাবু বসে আছেন মৃতদেহের ডান পাশে। মুদিত নেত্রে তিনি মূর্তির মত স্থির—যেন ধ্যানমগ্ন।

সুরেনবাবুর দেহ যেমনভাবে দেখে গিয়েছিলুম তেমনিভাবেই আছে। হৈমবতী গতকাল এসেছেন। হিসেব করে দেখলুম সুরেনবাবুর মৃত্যুর পর পাঁচদিন কেটে গিয়েছে। একে গ্রীষ্মকাল, তায় এ বছর আবার অতিরিক্ত গরম। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, সুরেনবাবুর গায়ের রং হলদে এবং দেহ মৃত্যু-শীতল ও কাঠ আড়ষ্ট হয়ে গেলেও একটুও পচেনি বা ফুলে ওঠেনি।

অনন্তবাবু চোখ খুলে বললেন, 'এই যে, আপনারা এসেছেন। হৈমবতী বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাহলে সুরেনকে আর একবার জাগাবার চেষ্টা করি?'

আমরা নীরবে ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম। যদিও আমার বুকের ভেতরে জাগল কাঁপন।

মৃতদেহের ওপরে খানিকক্ষণ হস্তচালনা করে অনন্তবাবু ডাকলেন, 'সুরেন! সুরেন! সুরেন!...'

প্রায় দশ বারোবার নাম ধরে ডাকার পর মৃতদেহের আড়ষ্ট হাঁ-করা মুখের ভিতরে জিভখানা হয়ে উঠল আবার সেই রকম ভয়াবহরূপে চঞ্চল।

হৈমবতী স্বামীর বুকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্রন্দনস্বরে বলে উঠলেন, 'ওগো, তাহলে তুমি সত্যিই বেঁচে আছ?'

ছেলে-মেয়েরাও 'বাবা, বাবা' বলে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

অনন্তবাবু বললেন, 'কথা কও সুরেন, কথা কও!'

আবার শোনা গেল সেই বর্ণনাতীত ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর—যা আসছে যেন বাড়ির বাইরে পৃথিবীর অতল পাতালের ভেতর থেকে, 'আঃ, আবার কেন ডাকাডাকি? বলেছি তো, আমি বেঁচে নেই!'

হৈমবতী বললেন, 'ওগো, এই তো তুমি বেঁচে আছ—এই তো তুমি কথা কইছ! একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ। আমরা সবাই এসেছি।'

অনন্তবাবু বললেন, 'হৈম স্থির হও—শান্ত হও। সুরেন এখন আমি ছাড়া আর কারোর কথার জবাব দেবে না। সুরেন, হৈম তোমাকে ডাকছে।'

মৃতদেহ বলল, 'ডেকে লাভ নেই। আমার মৃত্যু হয়েছে।'

'তোমার যদি মৃত্যু হয়ে থাকে, তবে তুমি কথা কইছ কেমন করে ?'

'আমি এখন আমার মৃতদেহের ভেতর বন্দী হয়ে আছি।'

'বন্দী ! কেন ?'

'তুমি যেতে দিচ্ছ না বলে।'

অনন্তবাবু এতক্ষণ সমানে হস্তচালনা করছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি যে তাঁর সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে প্রবলভাবে নিযুক্ত করেছেন, সেটা বোঝা যায় তাঁর চেহারা দেখে। তাঁর কপালের ওপরে শিরাগুলো এবং কণ্ঠের ওপরে মাংসপেশীগুলো দ্বিগুণ ফুলে এবং মুখের রং রাঙা টক্‌টকে হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ তিনি হস্তচালনা বন্ধ করে খানিকক্ষণ নীরবে অত্যন্ত হাঁপাতে লাগলেন। তারপর ফিরে বললেন, 'হৈম, আর কেন ?' তোমার জন্যেই সুরেনকে যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিলুম। এইবার ওর ঘুম ভাঙাই, ওর আত্মাকে মুক্তি দিই, তোমরা মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা কর।'

হৈমবতী এমন তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন যে আমাদের কান যেন ফেটে গেল। তারপর তিনি মাটির ওপরে আছড়ে পড়ে বললেন, 'অনন্তবাবু—অনন্তবাবু, আমাকে দয়া করুন! উনি এ অবস্থাতে থাকলেও আমার সুখ। মনে করব আমি বিধবা হইনি।'

অনন্তবাবুর মুখে ফুটে উঠল এক সঙ্গে ব্যথা, দয়া ও মমতার ভাব। অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'বেশ, বৌমা—তাই হোক। আরো কিছুদিন এইভাবে যাক। তুমি শান্ত হও—সংযত হও। তারপর আমার যা করবার করব—মনে রেখ মা, আমি হচ্ছি তুচ্ছ মানুষ। মৃত্যু হচ্ছে ভগবানের ইচ্ছা, তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলে আমারও সর্বনাশ হবে, আমিও বাঁচব না।'

অনন্তবাবু উঠে দাঁড়ালেন। এতক্ষণ আমরা ছিলুম দুঃস্বপ্নে অভিভূতের মত, অসাড় হয়ে। অনন্তবাবু উঠে দাঁড়াতেই সাড় হল আমাদের।

ডাঃ ঘোষ বললেন, 'আমি আর সহ্য করতে পারছি না—আমার প্রাণ-মন হাঁপিয়ে উঠেছে !'

আমি বললুম, 'আমারও। বাইরে বেরুতে পারলেই বাঁচি !'

অনন্তবাবুও হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'আমারও ওই ইচ্ছা। চলুন, আমরা বাড়ি যাই।'

তারপর কেটে গেছে দু'মাস। সুরেনবাবুর দেহ পড়ে আছে বৈঠকখানার তক্তপোশে। তাতে এখনো পচ ধরেনি।

ইতিমধ্যে এই অদ্ভুত খবর শুনে দলে দলে বাইরের লোক এবং খবরের কাগজের সংবাদদাতারা সুরেনবাবুর বাড়িতে আনাগোনা শুরু করে দিয়েছিল। অনন্তবাবু খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন, বাইরের লোকেরা আর ভেতরে ঢুকতে পায় না। খবরটা রটে গিয়েছিল দিকে দিকে। চারিদিকে বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। কেবল বাঙালী নয়, ইংরেজ এবং আরো নানাজাতীয় লোকও কৌতূহলী হয়ে আবেদন জানাচ্ছেন, সুরেনবাবুর দেহ পরিদর্শনের জন্যে। আবেদনকারীদের মধ্যে ছিল বহু বিখ্যাত নাম।

একদিন অনন্তবাবুর জরুরী আহ্বান এল। তাঁর বাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই শুনলুম সুরেনবাবুর বাড়ির ভেতর থেকে কান্নার আওয়াজ। অনন্তবাবুর বৈঠকখানায় ঢুকে দেখি, একখানা চেয়ারের ওপরে বসে আছেন ডাঃ ঘোষ। অনন্তবাবু ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁর ভাবভঙ্গী ক্রুদ্ধ, বিরক্ত।

আমাকে দেখেই তিনি বললেন, 'কান্না শুনতে পাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ, ব্যাপার কি ?'

'আজ সুরেনের যোগনিদ্রা ভাঙব, তাই ওই কান্না। হৈমবতীর ইচ্ছা, সুরেনের দেহ ওইভাবেই থাকুক। কিন্তু তাও কি সম্ভব ? আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার নিজের স্বাস্থ্য দিনে দিনে ভেঙে পড়ছে—এই অস্বাভাবিক উত্তেজনা আর কতদিন সহ্য হয় ? প্রবল ইচ্ছা-শক্তিরও সীমা আছে।'

'এই জন্যেই আমাকে ডেকেছেন ?'

'আপনাকেও, ডাক্তার ঘোষকেও। আর একটা কি কথা জানেন ? নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে।'

'কেন ?'

'বোধহয় প্রকৃতির আইন ভঙ্গ করছি। ভগবান সুরেনের আত্মাকে যে অদৃশ্য পথে নিয়ে যেতে

চান, আমি হয়েছি তার বাধার মত। এ এক মস্ত অপরাধ, এজন্যে হয়তো আমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। হয়তো একটা প্রাণহীন কুৎসিত দেহের কারাগারে বন্দী হয়ে সুরেনের আত্মাও অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করছে। না, আর নয়। আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছি, এ ব্যাপারের ওপরে আজকেই যবনিকা ফেলে দেব। কারোর মিনতি, কারোর অশ্রু আর আমাকে বাধা দিতে পারবে না। আসুন আপনারা। গোড়া থেকেই যখন সঙ্গে আছেন, তখন শেষ দৃশ্যটাও দেখুন।

শেষ পর্যন্ত হৈমবতীকেও সম্মতি দিতে হল।

অনন্তবাবু অনেক চেষ্টার পর তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই মৃতদেহের মধ্যে সুরেনবাবুর আত্মা বন্দী হয়ে আছে অভিশপ্তের মত, দেহ থেকে বেরুতে না পারলে আত্মার গতি হবে না।

অনন্তবাবু দেহের পাশে বসে হস্তচালনা করতে করতে ডাকলেন, 'সুরেন, সুরেন, সুরেন !'

আমরা রোমাঞ্চিত দেহে, বিস্ফারিত নেত্রে রুদ্ধশ্বাসে মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সাত-আট মিনিট কেটে গেল, দেহ নিঃসাড়, নিস্পন্দ। অনন্তবাবুর কপাল থেকে দরদর ধারে ঘাম ঝরতে লাগল।

'সুরেন, সুরেন ! জাগো, সাড়া দাও। আমি অনন্ত, তোমাকে ডাকছি, সুরেন।'

আরও সাত-আট মিনিট কাটল।

অনন্তবাবু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, 'তবে কি ব্যর্থ হব ? সুরেনের আত্মা কি নেই ? না না, তা তো হতে পারে না। যোগনিদ্রার প্রভাব না থাকলে দেহের অবস্থান হত যে অন্যরকম !....সুরেন, সুরেন, জাগো—তোমার যোগনিদ্রা ভঙ্গ হোক।'

এইবার উন্মুক্ত, দন্তকন্টকিত মুখবিবরের মধ্যে জ্যান্ত হয়ে ছটফট করতে লাগলো জিভখানা।

'সুরেন !'

উত্তরে শোনা গেল এক ভীষণ ও তীক্ষ্ণ আর্তধ্বনি ! সে আর্তনাদ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, মানুষের কান কোনদিন শোনেনি তেমন আর্তনাদ ! ছেলে-মেয়েরা ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল। হৈমবতী মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। আমাদের অবস্থা হয়ে দাঁড়াল শোচনীয় !

'সুরেন, শান্ত হও ভাই, শান্ত হও !'

'শান্ত হব ? তোমরা জানো না, এই দেহের নরকে কি দুঃসহ যন্ত্রণা ! নিশিদিন কাঁদছি আর ছটফট করছি—মৃত্যুর পরেও একি শাস্তি ? আর কেন ? আমাকে এবার মুক্তি দাও—মুক্তি দাও !' আজকের স্বর আরো বিকট ও ভয়াল এবং আসছে যেন আরো—আরো—আরো বেশি দূর থেকে।

অনন্তবাবু বললেন, 'তোমাকে মুক্তি দিলুম, সুরেন। ভেঙে যাক তোমার যোগনিদ্রা।'

পরমুহূর্তে অদ্ভুত একটা শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছন্নের মত দেখলুম, তক্তপোশের ওপর পড়ে রয়েছে সুরেনবাবরু দেহের বদলে একটা নর-কঙ্কাল এবং তার চারিদিক ঘিরে গড়াচ্ছে বিগলিত মাংস-মেদ-মজ্জার তরল, বিবর্ণ ধারা। বিষম পূর্তিগন্ধে ঘরের বাতাস দুর্গন্ধ, বিষাক্ত !

...সভয়ে প্রাণপণে দৌড়ে বাইরে পালিয়ে এলুম।
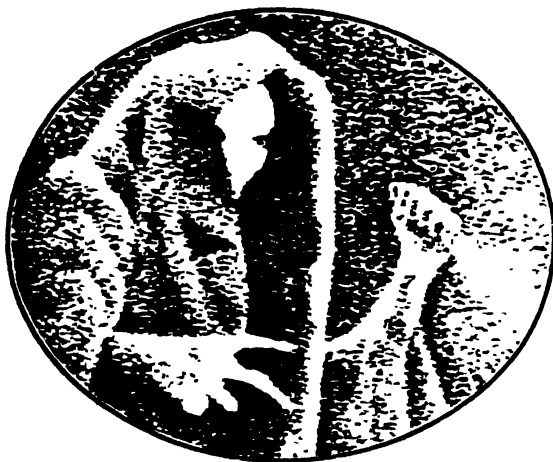
হরতনের গোলাম

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

১

তোমরা অনেক আশ্চর্য ঘটনা কানে শুনেছ, কিন্তু আমি চোখে দেখেছি এক অত্যাশ্চর্য অদ্ভুত ঘটনা। তখন আমার বয়স অল্প—বোধ হয় তেরো-চোদ্দ।

বৃন্দাবন, ডাক-নাম বিনু, ছিল আমার সব-চেয়ে ভালবাসার বন্ধু। এক ক্লাসে পড়তুম, দিনরাত একসঙ্গে থাকতুম, সে ছাড়া আর কারো সঙ্গে খেলতে, কথা-কইতে আমার ভাল লাগত না। আমাদের কাছেই ছিল তাদের বাড়ি।

তখন আমরা নতুন তাস খেলতে শিখেছি। বিনু সেবার একদিনের জন্য মামার বাড়ি গিয়ে বিন্তি খেলা শিখে এসেছিল। এসেই সে আমায় ওই খেলা শিখিয়ে দিলে। দুজনেই নতুন খেলিয়ে, কিন্তু বিনু দু-চার বাজি খেলেই পাকা ওস্তাদ হয়ে উঠল। আমি প্রায় প্রতি হাতেই তার কাছে হারতুম। কোথায়ই বা তাকে জিতেছি? স্কুলের লেখা-পড়ার প্রাইজে, খেলাধূলার প্রাইজে সে বরাবরই আমায় হারিয়ে এসেছে; এমন কি নিমন্ত্রণ খেতে বসেও কোনদিন তাকে জিততে পারিনি; সে বরাবর আমার চেয়ে বেশি পেয়েছে। এক-এক সময় সন্দেহ হত আমার মায়ের স্নেহটিও বুঝি সে আমার চেয়ে বেশি করে জিতে নিলে। কিন্তু এতে আমার দুঃখ ছিল না। কারণ তাকে যে আমি সত্যিই ভালবাসতুম।

রোজ সন্ধ্যার পর স্কুলের পড়া শেষ করে, খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে আমরা দুই বন্ধুতে আমাদের সদর-বাড়ির পশ্চিম কোণে ভাঙা নহবৎখানার নিচের অন্ধকার ঘরটায় লুকিয়ে বসে তাস খেলতুম। এই ঘরটায় পুরাকালে কে থাকত জানি না; এ বাড়ি যখন জম্‌জমাট ছিল, তখন হয়তো কর্তাদের সানাইওয়ালারা এইখানে বসবাস করত। এখন এখানে দিনে-রাতে কারো পায়ের ধুলো পড়ে না—এক চুপি-চুপি আমাদের ছাড়া। এই ঘরটা আমাদের দুই-বন্ধুর ভারি মনের মত ঘর ছিল—এর মধ্যে বাড়ির ভিতরকার তাড়াহুড়ো এসে পৌঁছতে পারত না; আমরা দুজনে পায়রার খোপের মত একটুখানি জায়গায় বেশ নির্জনে নিশ্চিন্তে মুখোমুখি বসে মনের সুখে অবিরাম গল্‌গল্ করতে

পারতুম। আমাদের ছুটির দিনগুলো নির্বিঘ্নে নিবিড় আনন্দে কাটত—এই ঘরখানির কোলে মাথা রেখে শুয়ে। বিনু নিজের হাতে ওই ঘরের একটি কোণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখত। এব কোন আভরণ ছিল না—এর সমস্ত অভাব ও দৈন্যকে আমরা আমাদের অন্তরের আনন্দ দিয়ে ঢেকে রেখেছিলুম। নইলে সেই কঙ্কাল-সার জীর্ণ অন্ধকার কোটরের মধ্যে আমাদের কচি দুটো প্রাণ কিছুতেই তিষ্ঠতে পারত না।

বিনু মামার বাড়ি থেকে এক-জোড়া তাস সংগ্রহ করে এনেছিল, বোধ হয় তার মামাদের আড্ডার পরিত্যক্ত তাস। তাস-জোড়াটা ছিল খুবই পুরোন— ভদ্রসমাজে নিতান্তই অচল। সম্ভবত তাই এত সহজে সে-বেচারা ওস্তাদ খেলোয়াড়দের কড়া হাতের কঠিন চাপড় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বিনুর ছোট্ট নরম হাতখানিতে এসে পড়বার সৌভাগ্য পেয়েছিল। বেচারাকে যে অনেক দিন ধরে অনেক চড়-চাপড় সইতে হয়েছে সে তার চেহারা দেখলেই বোঝা যেত। কিন্তু কোন গুরুতর অপরাধে তার কানগুলো যে এমন নির্দয়ভাবে কাটা গিয়েছিল এবং কেনই বা তাব বুকের উপর আঁচড় টেনে-টেনে এমন ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে তা আমরা বুঝতে পারতুম না। এ তার কোন পাপের শাস্তি !- -কে জানে !

তার এই জীর্ণশীর্ণ চেহারা দেখে আমাদের কেমন মায়া করত ; সেই জন্যে তার উপর জোরজবরদস্তি করতে পারতুম না। একে নিয়ে অতি সন্তর্পণে খেলতুম,—আস্তে-আস্তে তুলতুম, আস্তে-আস্তে ফেলতুম, ভাঁজাতুম খুব আল্‌গা হাতে। খেলা শেষ হয়ে গেলে ধীরে-ধীরে গুছিয়ে একখানি রুমাল মুড়ে তুলে রাখতুম—অতি যত্নে। সত্যি বলছি এই তাসকে এত ভালবাসতুম আমরা যে এর বদলে নতুন ঝকঝকে তাস কিনে আনতে আমাদের লোভটুকু পর্যন্ত হয়নি কোনদিন। এই তাসের ছবি দেখে আমার মনে হত—এরা যেন এককালে এই বাড়িরই মানুষ ছিল, এখন তাস হয়ে গেছে। তোমরা হেসো না ; এর হরতনের গোলামটিকে আমার মনে হত ঠিক যেন বুড়ো ঠাকুর্দার দরোয়ান এ ! এর ফোঁটা-ওয়ালা তাসগুলোও যেন কেমন-এক-রকমের। এক একদিন বিনুর সঙ্গে খেলতে-খেলতে প্রদীপের ঝাপসা আলোয় এর আটা-নওলা-দওলার রঙিন ফুটকিগুলোর দিকে চেয়ে-চেয়ে হঠাৎ আমার চোখ কেমন ধাঁধিয়ে যেত—মনে হত আমি যেন তাদের ওই ফুটকিগুলোব ফাটলের মধ্যে দিয়ে কতদূর চলে গেছি—সে যেন কতকালের আগেকার কোনখানে ! -যারা অনেককাল আগে এখানে ছিল যেন তাদের কাছে ! সেখানে কি দেখতুম, কি শুনতুম মনে নেই কিন্তু সে-সব দেখে শুনে কেমন তন্ময় হয়ে যেতুম। হঠাৎ বিনুর ডাকে আবার ফিরে আসতুম। সে ধমক দিয়ে বলত, 'কি বসে-বসে ভাবচিস ? খ্যাল না !' আমি অমনি তাড়াতাড়ি যা-হোক একখানা তাস ফেলে দিয়ে খেলায় আবার মন দিতুম। কিন্তু বুকটা কেমন ছমছম্ করতে থাকত। মনে হত এ নিশ্চয় যাদু করা তাস !

বিনুকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'এই তাস নিয়ে তোর মামার বাড়িতে কারা খেলত রে বিনু ?' বিনু বলেছিল, 'শুনেছি দাদামশাই খুব পাকা খেলিয়ে ছিলেন ; কেউ নাকি তাঁকে তাস-খেলায় হারাতে পারত না। লোকে হিংসে করে বলত, সে তাঁর খেলার গুণ নয়. তাসের গুণ ! তিনি তাস গুণ করতে জানতেন। বোধ হয় এ তাঁরই আমলের তাস।' বিনুর দাদামশাইকে আমরা চোখে দেখিনি ; তার মামাদেরই দেখতুম খুব বুড়ো ! উঃ, তাহলে না-জানি তিনি কত বুড়ো ! এ সেই আদ্যিকালের-বদ্যি-বুড়োর হাতের গুণ করা তাস ! এ তাস ছুঁতে বুক ছমছম করত, কিন্তু তবু ভালবাসতুম বিনুর-দেওয়া এই তাস-জোড়াটাকে।

এই তাস নিয়ে বিনু গম্ভীর মুখে রোজ আমার সঙ্গে খেলত। তাকে খেলায় জিততে পারতুম না বলে সে প্রায়ই হাসতে হাসতে বলত, 'জানিস মল্লি, এ আমার দাদামশাইয়ের গুণ করা তাস ! এ তাস হাতে থাকলে কেউ আমায় জিততে পারবে না।—তুইও না !'

আমাদের আড্ডা ঘরের দেয়ালে গরুর চোখের মত একটা সরু কুলুঙ্গিতে ছোট্ট একটি তেলের প্রদীপ জ্বলত—আমাদের বসবার কোণটুকু আলো-করে ; বাকি ঘরটা অন্ধকারের আবছায়ায় পড়ে থাকত—কালো চাদর মুড়ি দিয়ে। খেলা জমে উঠত, সঙ্গে সঙ্গে রাতের অন্ধকারও জমে উঠত। একে-একে বাড়ির প্রদীপ সব নিভে যেত, ঘরের পাশে সরু গলির পথটা ক্রমে নির্জন হয়ে আসত। চৌধুরী-বাড়ির দোতলার জানলা থেকে যে এক-ফালি সরু আলো এসে অন্ধকার গলির উপর পড়ত,

ক্রমে সেটুকুও অস্ত যেত ; গলির ফাঁকটা ভরাট হয়ে উঠত—জমাট অন্ধকারে। আর সেই কালো পাথরের মত অন্ধকারের উপর দিয়ে মাঝে-মাঝে শুনতুম কে যেন পায়চারি করছে লাঠি-হাতে খড়ম-পায়ে—খট্-খটাস ! খট্-খটাস্। তার পরেই খুব দূর থেকে একটা খেঁকি কুকুর বুক-ফেটে কাৎরে উঠত—কেঁই-কেঁই ! আর অমনি ঝুলের ঝালর ও মাকড়সার জাল-দিয়ে-ঘেরা আমাদের ঠাকুর্দার আমলের পুরোন ঠাকুরদালানের কাল্‌প্যাঁচা ও চামচিকে-বাদুড়গুলো অন্ধকারের মধ্যে কখনো হুস্-হুস কখনো হিস্ হিস্ শব্দে তাদের বাচ্চাগুলোকে সাবধান করে দিত এবং মাঝে-মাঝে ফট্‌ফট্ করে হাততালির আওয়াজে কাকে যেন আমাদের ঘরের দিকে তাড়িয়ে দিত ! ওই বুঝি সে এল ! এই ভাবতে ভাবতে আমার সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসত। হাতের তাস মাটিতে নামত না ! বিনু ধমক দিয়ে বলত, 'কি করছিস ? খ্যাল্ না !' তার এই ধমকানিতে আমার চট্‌কা ভাঙত। আর সঙ্গে-সঙ্গে চারিদিকের ওই বিশ্রী শব্দগুলোও যেন ভয়ে-ভয়ে চুপ করে যেত। তা যদি না হত তাহলে বোধ হয় ঘর থেকে ছুটে আমি বাবার কাছে পালিয়ে যেতুম, কিছুতেই বিনুর সঙ্গে খেলতুম না।

২

সেদিন খেলা আরম্ভ করতেই হঠাৎ খুব জোরে ঝড়-বৃষ্টি এল। একটা ঝড়ের দমকা আমাদের কোলের তাসগুলোকে উল্টে-পাল্টে ভেস্তে দিয়ে ঘর থেকে খানিকটা ঝুল ও ধুলো উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। বিনু বললে, 'মল্লি, দরজা জানলাগুলো বন্ধ করে দে !' আমি উঠে জানলাগুলো বন্ধ করতে লাগলুম। পশ্চিমের জানলাটায় হাত দিতেই কে যেন সজোরে আমার হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সেক্‌হ্যান্ড করে চলে গেল। আমি তাড়াতাড়ি হাতটা ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে নিলুম– কিছু বুঝতে পারলুম না। বুকটা ধুক্‌ধুক্ করতে লাগল।

খেলতে বসেই সে বাজি জিতলুম। আশ্চর্য কাণ্ড। যা কখনো হয় নি, তাই হল। বিনুও অবাক। সে একটু বেশি করে মন দিয়ে খেলতে বসল। কিন্তু পরের বাজিও জিততে পারলে না। আমার কেমন সন্দেহ হল—এলোমেলো ঝড় এসে তাসের যাদুটা উড়িয়ে নিয়ে গেল নাকি !

আমি ক্রমাগতই জিততে লাগলুম। কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছিল এ জেতায় আমার কোন বাহাদুরি নেই ; প্রতিবারেই এমন তাস আসছিল যে খেললেই পিঠ পাওয়া যায় ; কে যেন ম্যাজিক করে ভাল ভাল তাসগুলো বেছে বেছে আমার হাতে তুলে দিচ্ছে। বিনু বারবার হেরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল, 'আজ আমার পড়তা খারাপ পড়ল দেখছি !' তার এই দীর্ঘশ্বাসটি আমার বুকে গিয়ে বাজল ! আমি চঞ্চল হয়ে উঠলুম। আমার মন কেঁদে বলতে লাগল, 'আমি জিত চাই না, বিনু জিতুক।' আমি ফন্দি করে বিনুকে জিতিয়ে দেবার জন্যে হাঁকুপাঁকু করতে লাগলুম ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আজকের ওই ঝড়ে কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেছে !

বিনু ফেললে হরতনের বিবি, তাকে সেই পিঠটা দেবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি খেললুম গোলাম, কিন্তু পিঠ তোলবার সময় দেখা গেল গোলামটা চেহারা বদলে সাহেব হয়ে গেছে। কাজেই পিঠটা আমাকেই নিতে হল। পরের হাতে আমি খেললুম চিঁড়ের দশ ; আমি জানতুম বিনু এ দশ ফোঁটার লোভ কিছুতেই ছাড়তে পারবে না, সে নিশ্চয় গোলাম দিয়ে পিঠটা নেবে ; বিনু ফেললেও গোলাম, কিন্তু আমার দশখানা হঠাৎ দু ফোঁটা চুরি করে কেমন করে যে আটা হয়ে গেল আমি কিছুতেই বুঝতে পারলুম না। আমি অবাক ; বিনু বাজি হেরে গোঁ হয়ে বসে রইল।

রাগ হলে বিনুর বড় বড় চোখ দুটো আরো বড় হয়ে উঠতে দেখেছি, কিন্তু আজ যেন অস্বাভাবিক রকম বড় হয়েছে বলে মনে হতে লাগল। সে-বারের খেলাতে তার হাতের ফ্রাই ইস্কাবনের দশখানার উপর চিঁড়ের সাতা পাশিয়ে দিতে গিয়ে যখন সেটা রঙের সাতার তুরুপ হয়ে গেল, তখন তার সেই হঠাৎ-বড়-হয়ে-যাওয়া চোখ দুটো কেমন-এক-রকম-ভাবে বিস্ফারিত করে সে আমার দিকে চাইলে যে সে-চাহনিতে আমার সর্বশরীর ঝিম্‌ঝিম্ করে এল।

বিনুকে ভয়ে ভয়ে বললুম,—'ভাই, আর খেলে কাজ নেই। চল যাই।' বিনু সে কথা কানেই তুললে না।

ক্রমে রাত গভীর হয়ে এল। মনে হল বাড়ির সবাই ঘুমিয়েছে ; আমাদের এ ঘরখানারও যেন ঘুম

ধরেছে ;—এর দরজা-জানলা ইট কাঠ ঘুমে ঢুলছে। প্রদীপের আলোটা থেকে-থেকে কেবল হাই তুলছে। কড়িকাঠের খোপে খোপে চড়াই-পাখিগুলো গল্প শেষ করে শুয়ে পড়েছে। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম ! হাতের তাসগুলোর দিকে চেয়ে দেখি সাহেব-বিবিদের চেহারা ঘুমে জড়িয়ে আসছে। ক্রমে মনে হল সমস্ত পৃথিবীটাই যেন ঘুমের ঝোঁকে দুলছে—ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ !

হঠাৎ চট্‌কা ভাঙল চৌধুরী-বাড়ির ঘড়ির শব্দে—ঢং ! সেই শব্দ অন্ধকারের ঘুম ভাঙতে ভাঙতে অনেক দূর চলে গেল।

ও কি ? ও কিসের শব্দ ? কড়িকাঠের কাছে ওই কোণের গর্ত থেকে কে অমন বিশ্রী সুরে নিশ্বাস টানছে হুউউউস্‌সস্!—হুউউস্‌স্ ! আমি চমকে উঠে বিনুকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ও কিসের শব্দ ভাই ?'

বিনু কথা কইলে না ; শুধু তাস থেকে চোখ তুলে কড়িকাঠের দিকে চাইলে, আর আমার মনে হল তার সেই ড্যাবডেবে চাহনিটা চোখ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে কড়িকাঠের অন্ধকার কোণে গিয়ে এঁটে রইল—জ্বলজ্বল করে চেয়ে আমার দিকে। বিনুকে আমি কান্নার সুরে বললুম, 'ভাই, আমার বড় ঘুম পেয়েছে।'

বিনু বললে, 'আচ্ছা, আর দু-হাত খেল।' আমি চমকে উঠলুম—তার গলা শুনে। কি গম্ভীর আওয়াজ ! এ তো বিনুর গলা নয়। কে তার গলার ভিতর থেকে কথা কইলে ?

কোনরকমে এই দু-হাত খেলা এখন শেষ করতে পারলে বাঁচি ! কোনদিকে কান দেবার, কোনদিকে চোখ দেবার আমার আর সাহস হচ্ছিল না। ইচ্ছা হচ্ছিল এই তাস দিয়ে চোখ-কান ঢেকে ফেলি। আমি খুব চোখের কাছে তাস এনে এক-মনে খেলতে লাগলুম।

সে-হাত বিনু খেলেছিল রঙের নওলা। আমার হাতে গোলাম ছিল, কিন্তু পিঠ নেবার ইচ্ছা ছিল না। কি করে লুকোলে বিনু সেটা ধরতে পারবে না ভাবছি, বিনু বলে উঠল সেই রকম বিষম ভারী গলায় ঘর কাঁপিয়ে, 'গোলামটা আছে তো।'

ভয় হল ধরা পড়ে গেছি। বাঁ-হাতের তাসের সারি থেকে চট্ করে হরতনের গোলামটা তুলে নিয়ে হরতনের নওলার উপর ফেলতে গিয়ে দেখি—সামনে নওলা নেই ; বিনুও নেই। অ্যাঁ !

বুকটা ধ্বক্ করে উঠল।

এ-পাশ ও-পাশ চেয়ে দেখি শুধু বিনু নয়, একখানি তাসও নেই।

বোঁ করে মাথাটা ঘুরে গেল। চোখে অন্ধকার দেখলুম। গা-হাত-পা ঝিম্-ঝিম্ করতে লাগল। ঘরের চার কোণ থেকে চারটে বিকট হাসি খিল্‌খিল্ শব্দে ছুটে বেরিয়ে গেল। আর উপরের নহবৎখানা থেকে ঢাক ঢোল কাঁসি বাঁশি সব এক সঙ্গে বেজে উঠল। আমি কাঁপতে-কাঁপতে মাটিতে শুয়ে পড়লুম। মনে হল আমার হাত-পায়ের সমস্ত খিল যেন আলগা হয়ে গেছে—উঠে-হেঁটে পালাবার আর উপায় নেই।

আমার কান্না আসতে লাগল—বিনু—আমার বিনু কোথায় গেল ? উপর থেকে ভাঙা কাঁসিখানা ফাটা আওয়াজে বলতে লাগল, কই না না ! কই না না ! আমি খুব চেঁচিয়ে ডাকলুম, 'বিনু ! বিনু।' কিন্তু আমার গলার স্বর মুখ দিয়ে না বেরিয়ে পেটের ভিতর চলে গেল—ঘুরতে-ঘুরতে, গোঁ-গোঁ-শব্দে !

একবার আশা হল বিনু হয়তো বাইরে গেছে—এখনি আসবে। কিন্তু বাঁ-হাত থেকে ডান হাতে তাসটা নিয়েছি মাত্র—এই এতটুকু সময়ের মধ্যে সে এতবড় ঘর পেরিয়ে বাইরে গেল কেমন করে ? হয়তো আমি অন্ধকারে দেখতে পাইনি। তাই হবে। এই মনে করে দরজার দিকে এগিয়ে গেলুম, কিন্তু গিয়ে দেখি—একি, যেমন খিল বন্ধ করেছিলুম, ঠিক তেমনই আছে।—তবে সে কেমন করে বাইরে গেল ?

হঠাৎ মনে হল বিনু আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে এই ঘরের মধ্যে লুকিয়ে নেই তো !

কিন্তু কোথায় লুকোবে ? ঘর যে ফাঁকা। আসবাবের মধ্যে মাত্র একটা ভাঙা আলমারি। তার পেছনে বড়জোর আঙুল পাঁচেক জায়গা। তার মধ্যে একটা মানুষ থাকতে পারে না। তবু সেখানটা একবার দেখলুম। ঘরের একোণ ওকোণ এধার ওধার প্রদীপ ধরে দেখলুম তন্ন তন্ন করে। কিন্তু সে কোথাও নেই—কোথাও নেই !

কতক্ষণ পড়ে পড়ে কেঁদেছিলুম জানি না। যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম, তখনও কান্নার জলে চোখ আমার ঝাপসা। রাত তখন নিশুতি। চারিদিক নিঝুম। কেউ কোথাও নেই; কেবল আমাদের তিন মহল প্রকাণ্ড বাড়িখানা দেখলুম ভয়ঙ্কর আতঙ্কে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; যেন তাব সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠেছে! চৌধুরীদের চৌতলার চিলের ছাদটা আমাদের দিকে এতখানি গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি হল রে, কি হল? কোথায় গেল?' পশ্চিম কোণের ঢ্যাঙা সুপারি গাছটা কিছু না বলে শুধু ডিঙি-মেরে আকাশের দিকে মুখ-তুলে ইশারায় দেখিয়ে দিলে—আমাদের বাড়ির ঠিক মাথায় একটা মস্ত-বড় কালো পাখি তাসের মত নানা রঙে চিত্র-বিচিত্র-করা ডানা মেলে মেঘের ধার দিয়ে অন্ধকারে ভেসে চলেছে—কাকে ঠোঁটে নিয়ে! তাই দেখে চারিদিক থেকে চাপা গলায় সবাই বলে উঠল, 'আ হা হা!' অমনি আমার বুকের ভিতরটা করে উঠল, 'আহাহা! বিনুকে ওরা ভেলকি বাজিতে উড়িয়ে নিয়ে গেল!'

ভাবতে ভাবতে আমার চোখের সামনে থেকে যেন সব একে একে মুছে আসতে লাগল, পায়ের তলা থেকে পৃথিবীটা ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল; আমি যেন একটা অতল অন্ধকারের মধ্যে ডুবতে লাগলুম—পলে-পলে, তালে-তালে!

তার পর মনে পড়ে! অন্ধকারে চেনা-পথ ধরে বাড়ির ভিতরের দিকে যাচ্ছিলুম; হঠাৎ কানে এল তাস পেটার শব্দ—চটাস্-চটাস্! এত রাত্রে এখানে অন্ধকারে তাস খেলে কে? মুহূর্তের মধ্যে আমার চলা বন্ধ হয়ে গেল; আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম।

বারান্দার পশ্চিম কোণে ঘুরঘুট্টে অন্ধকারের মধ্যে আমাদের খাজনা ঘর। দিনের বেলা এর সামনে দিয়ে যেতে আমাদের গা ছমছম করে, সেজন্য এ-দিকটা আমরা কেউ মাড়াতুম না। আমাদের বিশ্বাস যত রাজ্যের ভূতপ্রেত ওইখানে বাসা বেঁধে মনের সুখে ঘরকন্না করছে। আমরা ওই মহলটা তাদের ছেড়ে দিয়েছিলুম। সেখানে কস্মিনকালে সকাল-সন্ধ্যায় আলো-গঙ্গাজল পড়ত না;—ঝাঁটিও কেউ দিত না। এই খাজনা-ঘর যে কতকালের তা কেউ জানে না;—বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে পুরোন এই জায়গাটা। শোনা যায়, ঠাকুরদাদার যিনি ঠাকুরদাদা ছিলেন, তাঁর আমলে জমিদারির খাজনা এলে এই ঘরে গচ্ছিত রাখা হত—মাটির তলায় একটা চৌখুপির মধ্যে। সরু সুড়ঙ্গের মত এই ঘর; সামনে মোটা-মোটা লোহার গরাদে-দেওয়া খাঁচার মত দরজা—পিতলের শিকল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো। সামনে দাঁড়ালে একটা স্যাঁৎসেঁতে পচা গন্ধ নাকে আসে, আর চোখে পড়ে কালি-ঝুলি-মাখা একটা অন্ধকারের কুণ্ডলী—দিন-রাত ঘূর্ণির মত ঘুরচে!

এই ঘর কতকাল যে খোলা হয়নি তার ঠিক নেই। খোলবার দরকার হয়নি। কারণ বহুদিন হল আমাদের সে জমিদারী নেই; তার খাজনাও আর আসে না। ঠাকুরমার মুখে গল্প শুনেছি, আমার ঠাকুরদাদার যিনি ঠাকুরদাদা ছিলেন তাঁর অগাধ টাকা ছিল—একটা রাজা-রাজড়ার তেমন থাকে না। কিন্তু তিনি ভারি কৃপণ ছিলেন। একটি পয়সাও কাউকে প্রাণ থাকতে দিতে পারতেন না—এমন কি নিজের ছেলে-মেয়েকেও নয়। তিনি কেবল টাকার পর টাকার রাশ জমা করে চলতেন। লোকে টাকা খরচ করে নাম কেনে, তিনি টাকা না খরচ করার বাহাদুরিতে লোকের কাছে খেতাব পেয়েছিলেন! টাকার উপর তাঁর এমন মায়া ছিল যে, পাছে মারা যাবার পর তাঁর টাকা খরচ হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব যখের হাতে সমর্পণ করে যান—যার কাছ থেকে একটি কাণা-কড়িও বার হবার যো নেই!

এই যখের কাহিনী একটা মস্ত-বড় গল্প! কেমন করে একটি সুন্দর নয় বছরের ছেলেকে মেঠাই ও খেলনার লোভ দেখিয়ে তার বাপ-মায়ের কাছ থেকে চুরি করে আনা হয়, কেমন করে তাকে লাল চেলি পরিয়ে, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে, ওই অন্ধকার খাজনা-ঘরের তলায় বন্ধ চৌখুপির মধ্যে—যেখানে কেবল ঘড়া ঘড়া টাকা সাজানো আছে, আর কিছু নেই, আর কেউ নেই—না বাপ, না মা, না আলো, না বাতাস—সেইখানে একলাটি বসিয়ে রেখে, তার পর ওই চৌখুপিতে ঢোকবার পথটা দশ-মণ পাথর দিয়ে চিরদিনের মত বুজিয়ে দেওয়া হয়, সে কথা শুনতে শুনতে আমার চোখে জল আসত—বুক দুর-দুর করত; আর ঠাকুরদাদার সেই পাষণ্ড ঠাকুর্দার উপর রাগ হত। ঠাকুরমা

বলতেন,—'আহা, ওই সুন্দর নয় বছরের ছেলেটি কত কেঁদেছে, বাবা-বাবা করে বুক ফেটে কত চেঁচিয়েছে, তেষ্টায় একফোঁটা জলের জন্য ছটফট করেছে, তবু কেউ তাকে ওই চৌখুপির দরজা খুলে দেয়নি।' শুনে আমার গলা কাঠ হয়ে আসত। তার পর ক্ষিধে-তৃষ্ণায়-ভয়ে কাতরাতে কাতরাতে বেচারা কখন যে হাঁফিয়ে মরে গেছে, সে হয়তো নিজেই বুঝতে পারেনি। এখন সে যখ হয়ে আছে—ওইখানে বসে বসে কেবল টাকার ঘড়া আগলাচ্ছে। কারো সাধ্য নেই যে ওই টাকা সেখান থেকে নিয়ে আসে! আমার ঠাকুরদাদার বাবা নাকি একবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বেশি দূর যেতে হয়নি; মেজের পাথরে একটি মাত্র শাবলের ঘা দিতেই তিনি গোঁ-গোঁ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তিন দিন তাঁর কাঁপুনি ছিল; সাত দিন তাঁর মুখে রা ছিল না। কেন যে এমন হল, কেউ জানে না, তিনি নিজেও কিছু বলেননি; কারো সাহসও হয়নি জিজ্ঞাসা করতে। সেই থেকে ওই ঘরের দিকে আর কেউ যায় না।

মনে হল ওই খাজনা-ঘর থেকেই যেন তাস খেলার শব্দ পেলুম। যদিও ওদিকে যেতে বুক দুরদুর করতে লাগল, কিন্তু বিনুর জন্যে না গিয়ে পারলুম না; যদি সে ওখানে থাকে - যদি সে আমায় দেখতে পেয়ে ছুটে আসে।

বুকটা দু-হাতে চেপে খাজনা-ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। লোহার গরাদে-দেওয়া দরজা দিনের বেলা শিকল-দিয়ে বাঁধা থাকে, কিন্তু এখন দেখলুম খোলা। অন্ধকারে চোখে কিছু দেখা গেল না, কিন্তু কানে শোনা গেল—কারা দুজন যেন দরজার দুইধার থেকে সজোরে ছুটে এসে মাথায়-মাথায় অনবরত ঠোকা-ঠুকি করছে—দুম, দুম, দুম! আমার কেমন মনে হল যেন এইখানকার এই অগাধ সম্পত্তি এই যখের ধন—কে নেবে তাই নিয়ে দুই ভূতেই লড়াই চলেছে। আমি এক মনে এদের লড়াইয়ের তাল শুনছি, হঠাৎ বিনুর মত কার গলা পেলুম। সে বলছে, 'বিবির চেয়ে রঙের গোলাম বড়।' আর একজন কে সরু গলায় বলে উঠল, 'দূর বোকা, তা কখনো হয়? গোলাম হল সাহেব-বিবির চিরকেলে কেনা গোলাম; হলই না হয় সে রঙ মেখেছে!'

গোড়ায়-গোড়ায় আমিও একদিন বিনুকে বলেছিলুম, 'গোলাম কেন বিবির চেয়ে বড় হবে বিনু?' বিনু বলেছিল, 'এইরকম যে নিয়ম।' আজও আবার সেই কথা উঠেছে। এও তাহলে আমাদের মতন নতুন খেলিয়ে দেখছি।

আবার শুনলুম, 'তুই কিচ্ছুই খেলতে পারিস না! মল্লি তোর চেয়ে ঢের ভাল খেলে।' বিনু আমায় ডাকত মল্লি বলে।

মনে হল, আমার যখন নাম করছে, এ তখন নিশ্চয় বিনু! বিনুর গলায় আমার নাম শুনে ওই ঘরের মধ্যে ছুটে যাবার জন্যে আমার প্রাণটা আকুলি বিকুলি করতে লাগল, কিন্তু পারলুম না; ভয় হল, পাছে ওই দুটো পাগলা ভূতের মাথা-ঠোকাঠুকির মধ্যে পড়ে থেঁৎলে যাই! আমি চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম।

হঠাৎ অন্য লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাঁ, হরতনের গোলাম কোথায় গেল? হরতনের গোলাম! ভারি আশ্চর্য!—এই ছিল, এই নেই! চোখের পাতা ফেলতে-না-ফেলতেই উড়ে গেল?'

আমার ভারি হাসি পেল—ওই যাদু-করা তাস এদের সঙ্গেও যাদু খেলছে দেখছি!

বিনু বলে উঠল, 'হরতনের গোলাম?—সে তো মল্লির হাতে।'

আমি নিজের হাতের দিকে চেয়ে দেখি—সত্যই তো, সেই হরতনের গোলাম, যা দিয়ে বিনুর নওলার পিঠ নিতে গিয়েছিলুম, সেখানা আমার হাতেই রয়েছে তো!

অন্য লোকটা বলে উঠল, 'কৈ হ্যায়—মল্লিবাবুকো পাকাড় লে আও!'

সেই শুনে আমি তাড়াতাড়ি হরতনের গোলামখানা খাজনা-ঘরের ভিতর ছুঁড়ে দিয়ে এক-ছুটে নিজের শোবার-ঘরে পালিয়ে এলুম।

ঘরে এসেও ভয়ে বুকটা ধকধক করতে লাগল, এই বুঝি সে এসে আমায়ও জাপ্‌টে ধরে নিয়ে যায় ! আমি পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে মড়ার মত পড়ে রইলুম। খানিকক্ষণ কেউ এল না, তারপর কে একজন খসখস শব্দে বারান্দা দিয়ে চলে গেল—বোধ হয় আমার ঘর চিনতে পারলে না। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরতে যাচ্ছি, এমন সময় কে আবার তড়াক করে লাফিয়ে আমার বিছানায় উঠল—আমি ভয়ে কাঠ ! যে এল, সে খানিক বিছানার এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে আমার গা শুঁকে শুঁকে বেড়াতে লাগল ; তারপর আমার মাথার কাছে এসে মুখ-ঢাকা চাদরখানা ধরে সজোরে টানতে লাগল—মুখ খুলে দেখবে। ওরে বাবারে ! আমি প্রাণপণে চাদরখানা আঁকড়ে রইলুম, কিছুতেই মুখ খুলতে দিলুম না। তারপর সে পায়ের দিকে গেল। তার নিশ্বাসের হাওয়ায় আমার পা-দুখানা ঠাণ্ডা হিম হয়ে এল। আমার পা-ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে না তো ? ভয়ে পা গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করলুম, পারলুম না। খানিকক্ষণ সে চুপ করে রইল, বোধ হয় কি ভাবলে, তারপর আমার পাশে এসে ধুপ করে শুয়ে পড়ল। সর্বনাশ ! এখন করি কি ! কিন্তু ঠিক সেই সময় আমার পুষি-বেড়ালটা ম্যাঁও-শব্দে ডেকে উঠতেই, সে তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে পালিয়ে গেল।

পুষিকে কাছে পেয়ে আমার ভয় অনেক ভেঙে গেল। তখন আবার বিনুর ভাবনা এল—তাহলে সত্যিই কি বিনুকে ওরা ওইখানেই—ওই চৌখুপির মধ্যে নিয়ে গেল ! সেখান থেকে সে পালিয়ে আসবে কি করে ? এই সব ভাবছি, হঠাৎ কে কানের কাছে মুখ এনে খুব চুপি চুপি ডাকলে, 'মল্লি, ভাই মল্লি ! বিনুর কাছে যাবে ? বিনুর কাছে ?'

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলুম—বিনুর কাছে যাবার জন্যে বুকটা লাফিয়ে উঠল, কিন্তু ভারি ভয় হতে লাগল—যদি আর ফিরে আসতে না পারি ?

সে তখন বললে, 'ভয় কি ! চল না ! বিনু তোমার জন্যে বড় কাঁদছে।'

বিনুর কান্নার কথা শুনে আমার বুক ফেটে যেতে লাগল। আমি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলতে লাগলুম, 'ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, বিনুকে এবার ফিরিয়ে এনে দাও—বিনুর জন্যে আমার বড্ড মন কেমন করছে।'

আমার কান্না শুনে সে চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় দেখলুম, একটা মস্ত পাগড়িওয়ালা চেহারা—ঠিক যেন হরতনের গোলাম।

এই হরতনের গোলামটিকে তাসের মধ্যে সবচেয়ে আমি বেশি ভালবাসতুম। আমাদের বাড়িতে যে বুড়ো থুরথুরে দরোয়ান ছিল—ঠাকুরদাদার আমলের, তাকে খুব ছেলেবেলায় দেখেছিলুম, অল্প অল্প তার চেহারা মনে পড়ে ; কিন্তু বেশ মনে আছে রোজ সকালে সে একটি করে রসমুণ্ডি আমায় খাওয়াত। কি মিষ্টি লাগত সে রসমুণ্ডি ! এখনো যেন তার স্বাদ মুখে লেগে আছে। আমার মনে হল, এই হরতনের গোলাম যেন সেই বুড়ো দারোয়ান—এখন তাসের ছবি হয়ে গেছে। সে বোধ হয় আমার কান্না দেখে লাঠি-হাতে বিনুকে খুঁজে আনতে গেল। আবছায়ার মত মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমার পুষি-বেড়ালটা হারিয়ে যেতে, আমার কান্না দেখে, সে এমনি করে একদিন তাকে খুঁজে আনতে বেরিয়েছিল।

কতক্ষণ গেল ; ঘরের ঘড়িটা টকটক শব্দ করতে করতে কতদূর চলে গেল, মনের মধ্যে কত ভাবনা এল-গেল—তবু বিনু এল না। হায়, সে কি আর আসবে ? ওই ভয়ঙ্কর চৌখুপি ঘর—যার সামনে দুটো ভীষণ ভূত মাথা ঠোকাঠুকি করছে অনবরত, সেখান থেকে বিনুকে কে উদ্ধার করে আনবে ? ভাবতে-ভাবতে আমার শরীর এলিয়ে আসতে লাগল, চোখের পাতা জড়িয়ে আসতে লাগল, কপালে যেন কে নরম ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দিলে ; আর অমনি এক নিমিষে মনে হল, আমি যেন একখানা তাসের উপর শুয়ে কোথায় চলেছি—হাওয়ার সঙ্গে ভেসে ভেসে !

তাসখানা ভাসতে ভাসতে এসে আমায় একটা চারিদিক-আঁটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে নামিয়ে দিলে। দেখলুম সেই অন্ধকারে বসে দুজন এক-মনে তাস খেলছে ; বিনু আর একটি ছোট ছেলে—সুন্দর দেখতে, থোকা থোকা কোঁকড়া চুল চাঁদের মত কপালের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক

যেন বিনুর ছোট ভাইটি। বিনু তার সঙ্গে খেলতে লাগল, আমার দিকে একবার চেয়েও দেখলে না। আমার ভারি রাগ হল—হিংসেও হল। এরি মধ্যে এর সঙ্গে এত ভাব! আমি মুখ গোঁ করে রইলুম।

ছেলেটি একবার তাস থেকে মুখ তুলে মিষ্টি সুরে জিজ্ঞাসা করলে, 'এ কে, বিনু?'

বিনু গম্ভীর গলায় বললে, 'ও মল্লি!'

সে বললে, 'বেশ হল; আমরা তিনটি ভাইয়ে কেমন একসঙ্গে এইখানে থাকব!'

আমি রেগে চিৎকার করে উঠলুম, 'না, না—আমি এখানে কিছুতেই থাকব না!'

অমনি হরতনের গোলাম এসে আমায় পিঠে করে তুলে নিলে। বিনু সেটার উপর লাফিয়ে চড়তেই সেখানা ভারী হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। মজা দেখে ছেলেটা খিলখিল করে হেসে উঠল।

বিনু বললে, 'দাঁড়া, আমরা তিন জনেই এক-সঙ্গে যাব।'—বলে সে ছেলেটির কানে কানে কি বললে। ছেলেটি বললে, 'চল, যাই।' কিন্তু উঠে দাঁড়াতে গিয়েই ধুপ করে পড়ে গেল। দিন-রাত এক জায়গায় বসে থেকে থেকে তার পা অসাড় হয়ে গেছে। বিনু তাকে কোলে করে তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তাসগুলোকে কি বললে, তারা ফরফর করে উড়ে এসে পাখির মত ডানা ছড়িয়ে দাঁড়াল। আমরা উড়তে যাচ্ছি, এমন সময় কড়ি-কাঠ থেকে দুটো কালো চামচিকে এসে তাসগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর দুই দল যা যুদ্ধ। আঁচড়া-আঁচড়ি, কামড়া-কামড়ি! আমি ভয়ে ঠক্‌ঠক করে কাঁপতে লাগলুম। চারিদিক থেকে অন্ধকারগুলো ছুটে এসে আমাদের সামনে তালগোল পাকিয়ে পথ আটকে দাঁড়াল! —যেন আমরা পালাতে না পারি! ছেলেটি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, 'বিনু, দেখছিস তো, এরা আমায় যেতে দেবে না! তোরা কেন প্রাণে মরবি? পালা!'

বিনু বললে, 'না ভাই, তোকে ছেড়ে কিছুতেই যাব না।' চামচিকে দুটো তাই শুনে ফ্যাঁস করে উঠল। এমন সময় হরতনের গোলামটা ছুটে গিয়ে একটা চামচিকের পেটে সজোরে এক ঘুষি বসিয়ে দিলে; চামচিকেটা তার ধারালো নখ দিয়ে হরতনের গোলামখানাকে আঁকড়ে ধরে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল, আর সেই ফাঁকে অন্য তাসগুলো আমাকে নিয়ে উড়ে পালাল। বিনু আর সেই ছেলেটি দেখলুম সেই ঝটাপটির মধ্যে হিমসিম খাচ্ছে! আমি তাসের উপর থেকে হাত বাড়িয়ে বিনুকে ডাকতে লাগলুম, 'বিনু, আয় আয়!' বিনু আমার দিকে ফিরেই চাইলে না; ছেলেটাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল। আমার কান্না পেতে লাগল! তাসগুলো উড়তে উড়তে এসে আমাকে বিছানায় ফেলেই উড়ে গেল—বোধ হয় বিনুদের উদ্ধার করতে। তার পর কি হল জানি না!

৫

'মল্লি! মল্লি!'

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলুম! ঝড়ের মত ধাক্কা দিয়ে কে ঘরের মধ্যে ঢুকল। সকালের আলোয় ঘরটা আলো হয়ে উঠল। মনে হল যেন একটা প্রকাণ্ড দুঃস্বপ্ন কেটে গেল। আমি ছুটে গিয়ে দুই হাতে বিনুর গলা জড়িয়ে ধরলুম, 'বিনু, এসেছিস ভাই, এসেছিস?'

সে বললে, 'আসব না তো কি! তুই স্টুপিড্ এত বেলা অবধি ঘুমচ্ছিস কেন?'

আমি বললুম, 'কখন এলি ভাই!'

সে বললে, 'অনেকক্ষণ! তোকে ডেকে ডেকে আমার গলা চিরে গেল। তোর আজ হয়েছে কি? চোখ অমন রাঙা কেন?'

আমার ধাঁধা লাগল। বিনু তো সবই জানে, তবে এমন আশ্চর্য হচ্ছে কেন?

আমি আমতা-আমতা করে বললুম, 'কাল রাত্রে তুই খেলতে-খেলতে হঠাৎ অমন অন্তর্ধান—'

সে বাধা দিয়ে বললে, 'আমি কেন অন্তর্ধান হতে যাব? তুই তো খেলা ফেলে চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলি।'

আমার আরও ধাঁধা লাগল। এ কি ঘুমের ঝোঁকে সবই স্বপ্নের মত দেখলুম! কিন্তু এত যে কাণ্ড, সে সবই স্বপ্ন? ইচ্ছা হচ্ছিল আগাগোড়া সব কথা বিনুকে খুলে বলে হেঁয়ালিটা পরিষ্কার করে নিই, কিন্তু পারলুম না। দিনের আলোয় কথাগুলো এমন অদ্ভুত বোধ হতে লাগল যে বলতে লজ্জা হল। আমার ভূতের ভয়ের জন্য বিনু যা আমায় ঠাট্টা করে!

বিনু বললে, 'কি ভাবছিস ? চল বাইরে যাই।'

আমরা দুই বন্ধুতে আমাদের সেই বাইরের ঘরে গিয়ে দেখি—ঘরময় তাস ছড়ানো—সমস্ত দেহ তাদের ক্ষত-বিক্ষত ! তাদের বুকের উপর যেন মনের আনন্দে ধারালো নখ দিয়ে কেবল আঁচড়ের পর আঁচড় টেনেছে। বেশ বোঝা গেল রাত্রের মধ্যে খুব একটা মারামারি কাণ্ড হয়ে গেছে। আমি সভয়ে বিনুর দিকে চেয়ে বললুম, 'বিনু দেখছিস !'

বিনু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'আমারই জন্যে তাসগুলো গেল !'

'আঁ ! তোমারই জন্যে ? তার মানে ?—সেই চৌখুপি ঘর থেকে তোমাকে উদ্ধার করবার জন্যে ? তা হলে তো সবই ঠিক !'

কিন্তু বিনুর মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারলুম না। একটু ইশারা পাবার আশায় আমি বিনুকে আবার জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি করে এমন হল বিনু !' বিনু কোনো জবাব দিল না, শুধু আঙুল দিয়ে ভাঙা আলমারিটা দেখিয়ে দিলে।

আমি আলমারি খুলতেই একরাশ আরসোলা ফর্‌ফর্‌ করে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল। তারপর ডানা মেলে উড়ে অন্ধকার কোণের একটা গর্ত দিয়ে কোথায় চলে গেল— বোধ হয় মাটির তলা দিয়ে সেই চৌখুপির মধ্যে। আমি হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলুম।

বিনু বললে, 'তাসগুলো কুড়ো !'

আমি তাসগুলো কুড়িয়ে, গুছিয়ে দেখি সবই আছে, কেবল একখানা নেই—সেই হরতনের গোলাম !

তবে ?

এই তো ঠিক মিল্‌ছে ! সেই হরতনের গোলাম—যাকে নিয়ে কাল রাত্রের ওই সমস্ত অদ্ভুত ঘটনার উৎপত্তি—সে নেই কেন। সে গেল কোথা ?

সে কোথায় আছে, আমি জানি। সে আছে সেইখানে—সেই চারিদিক বন্ধ চৌখুপির মধ্যে, যেখানে সেই নয় বছরের সুন্দর ছেলেটি চিরদিন একা অন্ধকারে বসে আছে।

কালকের সব কাণ্ড বিনু নিশ্চয় ভুলে গেছে ; সকালে ঘুম থেকে উঠে তার আর কিছুই মনে নেই। তার যে ঘুম ! এমন তো আমারও এক-একদিন হয়। রাতের ঘটনা স্বপ্ন দেখার মত সকালে সব ভুলে যাই। কাল রাত্রে আমি যদি ঘুমিয়ে পড়তুম, তাহলে আমিও হয়তো সব ভুলে যেতুম ; আজ সকালে উঠে অবাক হয়ে ভাবতুম—তাই তো, হরতনের গোলাম বেচারা গেল কোথায় ?

বদন রায়ের অয়েল পেন্টি

বিশ্বপতি চৌধুরী

ভূত বিশ্বাস করি কি না জিজ্ঞেস করছ? যদি বলি বিশ্বাস করি, তাহলে তোমরা নিশ্চয় আমাকে নেহাতই পাড়াগেঁয়ে ঠাওরাবে। কিন্তু তাই বলে তো আর জলজ্যান্ত মিছে কথাটা বলতে পারি না! বিশেষ করে এই বুড়ো বয়সে!

সুতরাং জিজ্ঞেসই যখন করলে, তখন বলেই ফেলি, ভূত আমি বিশ্বাস করি।

চিরকালই যে বিশ্বাস করতাম, তা নয়। একটা বিশেষ ঘটনার পর থেকে বিশ্বাস করি, এবং বাকি জীবনটা বিশ্বাস করেই চলতে হবে আমাকে।

এখন সেই বিশেষ ঘটনাটা কী, সেই কথাই তোমাদের বলব।

ঘটনাটা ঘটেছিল বহুকাল আগে। বহুকাল বৈকি! ত্রিশ বছর আগেকার ঘটনাকে বহুকালের ঘটনা ছাড়া আর কী বলব বল!

আমার বয়েস তখন উনিশ কি বড়জোর কুড়ি। কলেজে তখন বি.এ. পড়ি।

সেদিন সৌরীনদের বাড়িতে আমাদের মজলিস বসেছিল। 'কথায় কথায় ভূতের প্রসঙ্গ উঠেছিল সেদিন। সৌরীনটা ফস্ করে বলে উঠল, 'ভূত বিশ্বাস করে যারা, আমাব হাতে ক্ষমতা থাকলে আমি তাদের পাগলা গারদে পুরে রাখতুম।'

আমিও যে ভূত বিশ্বাস করতুম তা নয়। কিন্তু সৌরীনটাকে আমি কোনদিনই সহ্য করতে পারতুম না। ওর মধ্যে এমন একটা হামবড়া ভাব ছিল যেটা আমাকে ভিতরে ভিতরে কেমন যেন ধাক্কা দিত। ঠোঁটদুটোকে বেঁকিয়ে, ভুরুদুটোকে কুঁচকে এমন একটা উপর-চাল মেরে ও কথা বলত, যেটা সহ্য করা আমার পক্ষে অনেক সময় অসম্ভব হয়ে উঠত।

আমি নিজে কোনদিনই ভূত বিশ্বাস করতুম না, কিন্তু সৌরীনটাকে দাবাবার জন্যেই ফস্ করে সেদিন বলে ফেললুম, 'আমি ভূত বিশ্বাস করি।'

সঙ্গে সঙ্গে ভবেশ, প্রবোধ, নির্মল আর গুণেনও বলে উঠল, 'আমরাও করি।'

ওরাও ঠিক ওই একই কারণে আমার কথায় সেদিন সায় দিয়েছিল। সৌরীনটার চালিয়াতি ওরাও সব সময় বরদাস্ত করতে পারত না।

এবার চলল তুমুল তর্কযুদ্ধ। সে যুদ্ধে যুক্তি-প্রমাণ যত না ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল গলাবাজির দাপট।

সৌরীনদের বাড়ি থেকে ফিরে সেদিন ঠিক করলুম, রাস্‌কেলটাকে যে করে হোক জব্দ করতে হবে। তারপর বসল পরামর্শ-সভা। অনেক জল্পনা-কল্পনার পর ঠিক হল, ওকে একদিন ভূত দেখাতে হবে।

কিন্তু দেখানো যায় কী করে? প্ল্যান আঁটিতে বসে গেলাম সবাই মিলে।

ভবেশের মাথায় অনেক রকম দুষ্টুবুদ্ধি খেলত। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে হঠাৎ সে বলে উঠল, 'হয়েছে!'

বললুম, 'কী হয়েছে রে?'

চোখ দুটো বুজে ভবেশ বললে, 'রায়েদের বরানগরের বাগানবাড়ি।'

প্রবোধ বললে, 'তার মানে?'

চোখদুটো না খুলেই বিড়বিড় করে ভবেশ বললে, 'ভূতনাথ।'

বিরক্ত হয়ে বললুম, 'কী মাথামুণ্ডু বকছিস তুই!'

সে তেমনিভাবেই বিড়বিড় করে বললে, 'বদন রায়ের অয়েল-পেন্টিং।'

সজোরে একটা ঝাঁকুনি মেরে বললুম, 'সিদ্ধি খেয়েছিস নাকি?'

এইবার চোখদুটো খুলে সোজা হয়ে বসে ভবেশ বললে, 'ব্যস্ত হয়ো না বন্ধু, ব্যস্ত হয়ো না,—খুলে বলছি সব।'

তারপর কতকটা আপন মনেই সে বলতে লাগল, 'রায়েদের বরানগরের বাগানে কোন রকমে সৌরীন রাস্‌কেলটাকে নিয়ে গিয়ে ফেলতে হবে! রায়েদের নন্দর সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে। বাগানটা একদিনের জন্যে চাইলে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে। ওদের বাগানবাড়ির দোতলার হলঘরটার দেয়ালে নন্দর ঠাকুরদা বদন রায়ের একটা প্রকাণ্ড অয়েল-পেন্টিং ছবি আছে। ইয়া লম্বা-চওড়া পুরুষ, ইয়া পাকানো গোঁফ; ইয়া গালপাট্টা; গায়ে কালো রঙের চোগা, তার উপর কল্কাদার সেকেলে শাল...'

তাকে থামিয়ে দিয়ে বললুম, 'তাতে আমাদের কী এল গেল শুনি?'

আমার কথায় একটুও কান না দিয়ে ভবেশ পূর্ববৎ বলে যেতে লাগল: 'আমাদের ভূতনাথের চেহারাটা এইবার একবার চোখ বুজে ভেবে নেওয়া যাক। দিব্যি লম্বা-চওড়া চেহারা। নাকের তলায় পাকানো গোঁফ নেই বটে, কিন্তু নকল গোঁফ সাজওয়ালাদের দোকান থেকে ভাড়া করে এনে যথাস্থানে দিতে কতক্ষণ? গাল দুটোতে নকল গালপাট্টাও অনায়াসে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। চোগা আর শাল নন্দর কাছ থেকে একদিনের জন্যে ধার করলেই হবে। বদন রায় যে চোগা আর শাল গায়ে ছবি আঁকিয়েছিলেন, সেই চোগা আর শাল নন্দদের বাড়িতেই আছে। সুতরাং ওর কাছ থেকে একদিনের জন্যে চাইলেই পাওয়া যাবে।'

সকলেই এবার সোৎসাহে বলে উঠলুম, 'তারপর?'

ভবেশ এতক্ষণ কতকটা নিজের মনেই বলে যাচ্ছিল, এইবার আমাদের দিকে চেয়ে বললে, 'তারপর তোরা কোন উপায়ে সৌরীনটাকে রায়দের ওই বাগানবাড়িতে নিয়ে ফেলবি। দোতলার হলঘরটায় বসবে তোদের মজলিস। বদন রায়ের অয়েল-পেন্টিংটার তারিফ করবি তোরা সকলে, যাতে করে সৌরীনের নজর পড়ে ছবিটার দিকে। ছবিটা নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ আলোচনা চালাবি তোরা, যাতে করে ছবিটার দিকে ওকে বার-বার চাইতে হয়, এবং তার ফলে ছবিটার খুঁটিনাটিগুলো ওর মনের মধ্যে বেশ করে গেঁথে যায়। ওদিকে ভূতনাথটা আগে থাকতেই বাগানবাড়ির তেতলার ছাতের চিল-কুঠুরিটায় সেজেগুজে তৈরি হয়ে থাকবে। ওখানে একটা বড় দেখে আয়না রাখা হবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ও নকল গোঁফ আর গালপাট্টা স্পিরিট-গাম দিয়ে বেশ করে যথাস্থানে জুড়ে দিয়ে শাল আর চোগা গায়ে দিয়ে স্বর্গীয় বদন রায় সেজে রেডি হয়ে বসে থাকবে।

'আমরা এদিকে দোতলার হলঘরটায় হল্লা করতে থাকব। তারপর যেই একটু রাত হবে, স্বর্গীয়

বদন রায়ের ভৌতিক সংস্করণটি তেতলার চিল-কুঠুরি থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে হলঘরের সামনের চলনটাতে ঘটঘট করে জুতোর শব্দ করে গদাই-লস্করি চালে পায়চারি করতে থাকবে।'

'ব্যাপার দেখবার জন্যে তোরা তখন হলঘর থেকে সৌরীনকে নিয়ে বেরিয়ে আসবি। তারপর যা হবে, তা বোধ হয়...'

তার কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম, 'থ্রি চীয়ার্স ফর ভবেশদা—হিপ্ হিপ্ হুররে !'

জয়ধ্বনির পালা শেষ হতেই প্রবোধের দিকে চেয়ে ভবেশ বললে, 'মনে আছে, তুই কথা দিয়েছিলি, বিয়ের পর একদিন আলাদা করে আমাদের ফীস্ট দিবি ! ফীস্টটা রায়দের বাগানবাড়িতে হলে কেমন হয় ? খাওয়াও হবে, ভূত দেখাও হবে। অর্থাৎ আহার এবং ওষুধ দুই একসঙ্গে হবে। আহারটা হবে আমাদের, আর ওষুধটা গিলবে সৌরীন রাস্কেল !'

সকলে একসঙ্গে বলে উঠলুম, 'চমৎকার হবে !'

এক মাস পরের ঘটনা। রায়দের বরানগরের বাগানবাড়িতে জড়ো হয়েছি সবাই। প্রবোধ তার বিয়ের ফীস্টটা এইখানেই দেবার ব্যবস্থা করেছে। এইখানেই আজ খাওয়া দাওয়া করে রাত কাটাব সবাই।

ভূতনাথ আগে থাকতে তেতলার চিল-কুঠুরিটায় আস্তানা গেড়েছে। সব মজুত। নকল গোঁফ, নকল গালপাট্টা, চোগা, শাল সবই জোগাড় হয়েছে। চিল-কুঠুরির দেয়ালে বড় দেখে একটা আয়না ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই কোথাও। ভূতনাথের উপর আমাদের সকলের অখণ্ড বিশ্বাস। এসব কাজে তার উপর যথেষ্ট নির্ভর করা যায়। শখের যাত্রার দলে নারদ মুনি থেকে শুরু করে জল্লাদ পর্যন্ত অনেক কিছুই সেজেছে হতভাগা। সুতরাং ওর মেক-আপ সম্বন্ধে আমরা সবাই নিশ্চিন্ত।

বিকেলটা বাগানে বেড়িয়ে কাটানো গেল। বেড়াবার মতই বাগান।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। রান্নার হাঙ্গামা করা হয়নি। কলকাতা থেকে খাবার দাবার সবই কিনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। চা-টা কেবল স্থানীয় একটা দোকান থেকে আনিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

খাওয়া দাওয়া চুকতে রাত প্রায় নটা বেজে গেল। তারপর কিছুক্ষণ চলল গান বাজনা আর হৈ-হুল্লোড়। বাগানবাড়ির দোতলার হলঘরটায় বসেছিল আমাদের মজলিস।

রাত ক্রমেই বেড়ে চলেছে। দেয়ালে টাঙানো ঘড়িটায় ঢং ঢং করে এগারোটা বেজে গেল। গ্রীষ্মকাল, হলঘরের জানলাগুলো সব খোলা ছিল। বাইরে যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার। খোলা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল কেবল বড বড় আমগাছগুলোর ঝাঁকড়া মাথা, এক-একটা যেন মূর্তিমান জমাট অন্ধকার !

হঠাৎ প্রবোধ বলে উঠল, 'ওটা কার অয়েল-পেন্টিং বলতে পারিস কেউ ?'

ভবেশ বললে, 'এই বাগানবাড়িব বর্তমান মালিক গোকুল রায়ের জ্যাঠামশাই স্বর্গীয় বদন রায়ের ছবি ওটা।'

নির্মল বললে, 'লোকটা কিরকম লম্বা-চওড়া ছিল দেখেছিস !'

গুণেন বললে, 'গোঁফজোড়া তারিফ করবার মতন !'

প্রবোধ বললে, 'মা-দুগ্‌গার অসুরের মতন গালপাট্টার বাহার দেখেছিস !'

আমি বললুম, 'যাই বল ভাই, মরদের মতন চেহারা বলতে হবে !'

সৌরীন ঠোঁটটাকে বেঁকিয়ে শুধু বললে, 'জঙলি !'

এরপর বদন রায়ের অয়েল পেন্টিংটার উপর অনেক কিছু মন্তব্য চলতে লাগল। কেউ বললে, বদন রায়ের গায়ের ওই শালটার দাম হাজার টাকার কম নয়। কেউ বললে গায়ের ওই চোগাটা সাটিনের, কেউ বললে ভেলভেটের, কেউ বললে না আমার মনে হয় বনাতের।

ভবেশ বললে, 'ওঃ, চোখদুটো কিরকম জ্বলজ্বল করছে ! চোখের চাউনি দেখলেই বোঝা যায়, লোকটা খুব বুদ্ধিমান ছিল !'

একটা অবজ্ঞার হাসি হেসে ঠোঁটটাকে আগের মতই বেঁকিয়ে সৌরীন বললে, 'মুখ-চোখের ভাব দেখে আমার কিন্তু মনে হয় লোকটা একটা আস্ত ইডিয়ট ছিল !'

ঠিক সেই সময় গুণেন বলে উঠল : 'বাইরের চলনে ও কিসের শব্দ ?'

বাইরে তখন সত্যিই একটা খট্‌খট্‌ শব্দ হচ্ছিল। ভারী জুতো পরে কেউ পায়চারি করে বেড়ালে যেরকম শব্দ হয়, ঠিক সেই রকম শব্দ। শব্দটা যেন চলে-চলে বেড়াচ্ছে।'

ভবেশ চেঁচিয়ে উঠল, 'কে ?—কে ওখানে ?'

কোন উত্তর নেই।

গুণেন বললে, 'একবার বেরিয়ে দেখলেই তো সব গোল চুকে যায় !'

চাপা কণ্ঠে ভবেশ বললে, 'কাজ নেই বেরিয়ে !'

ঠোঁটটাকে বেঁকিয়ে সৌরীন বললে, 'যত সব মেয়েমানুষ !'

কথাটা শেষ করেই সে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল এবং এক নিমেষে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে চলনের সুইচটা টেনে দিলে। দেখতে দেখতে বাইরের চলনটা আলোকিত হয়ে উঠল।

পরক্ষণেই একটা ভারী জিনিস পড়ার আওয়াজ শোনা গেল।

সকলে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম। সৌরীন তখন চলনের একধারে মেঝের উপর পড়ে গাঁ গাঁ করছে।

ওদিকে বদন রায়ের ভৌতিক সংস্করণটি লম্বা চলনটায় তখনও গদাইলস্করি চালে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

বলিহারি মেক-আপ ! অয়েল পেন্টিং-এর বদন রায় সহসা যেন শরীর ধারণ করে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। -একেবারে হুবহু সেই চেহারা ! ভূতনাথটার কেরামতি আছে বলতে হবে !

কিন্তু ওদিকে মন দেবার সময় নেই তখন। সৌরীনকে নিয়ে আমরা তখন রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়েছি।

ধরাধবি করে তাকে হলঘরে এনে ফরাশের উপর শুইয়ে দেওয়া হল। মাথার উপরকার ইলেকট্রিক ফ্যানটা পুরোদমে চালিয়ে দিয়ে মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দেওয়া হতে লাগল।

বাইরের চলনে তখন পায়চারির শব্দ থেমে গেছে।

প্রায় দশ মিনিট পর সৌরীন চোখ চাইলে। বুঝলুম, এতক্ষণে জ্ঞান ফিরে এসেছে।

এতটা বাড়াবাড়ি হবে ভাবতে পারি নি আমরা। সৌরীনটার অবস্থা দেখে তখন সত্যি দয়া হচ্ছিল।

ফ্যালফ্যাল করে চারিদিক পানে একবার চেয়ে সৌরীন আবার চোখ বুজলে। তারপর ক্লান্ত হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভবেশ বললে, 'যাক, এতক্ষণে ফাঁড়া কাটল। আর ভয় নেই। ঘণ্টাখানেক ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এতক্ষণ ভূতনাথের কথা ভুলেই গিয়েছিলুম। সৌরীনটা একটু সুস্থ হতেই তার কথা মনে পড়ে গেল। সত্যিই বাহাদুরি আছে ওর !

ছুটলুম চিল-কুঠুরির দিকে ওকে কন্‌গ্র্যাচুলেট করতে। কিন্তু সেখানে গিয়ে যা দেখলুম, তাতে আমার চক্ষু কপালে ঠেলে উঠল ! দেখি, চিল-কুঠুরির মেঝের উপর ভূতনাথের অচৈতন্য দেহটা পড়ে রয়েছে।

ঘরের এক কোণে একটা কুঁজো ছিল। তাড়াতাড়ি কুঁজো থেকে জল নিয়ে তার মুখে-চোখে জোরে-জোরে ঝাপটা দিতে লাগলুম।

অনেকক্ষণ পর ভূতনাথ চোখ মেললে। ইতিমধ্যে নির্মল আর ভবেশও এসে পড়েছিল। সবাই মিলে ধরাধরি করে তাকে দোতলায় নামিয়ে এনে হলঘরের পাশের একটা ছোট খালি ঘরে শুইয়ে দিলুম।

আশ্চর্য ব্যাপার ! নকল গোঁফ, গালপাট্টা সবই তাজা রয়েছে। তাতে কেউ হাত দেয়নি। ব্যবহার করলে ওতে স্পিরিট গাম লেগে থাকত। শাল, চোগা প্রভৃতি একটা সুটকেসে পরিপাটিভাবে ভাঁজ

করা অবস্থায় সাজানো রয়েছে। হস্তক্ষেপের কোন চিহ্ন বা লক্ষণ সেখানে নেই।

এ কী করে সম্ভব হতে পারে? একটু আগে কে তবে বদন রায় সেজে আমাদের চোখের সামনে পায়চারি করে বেড়ালো? কে সে?

বুকটা আমাদের দুর-দুর করে উঠল।

পরদিন ভূতনাথ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে তার মুখ থেকে ব্যাপারটা যা শুনেছিলুম তা এইরূপ :

রাত পৌনে এগারোটার সময় সে অর্থাৎ ভূতনাথ টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বেলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজগোজের ব্যবস্থা করছিল, এমন সময় হঠাৎ আয়নায় কার ছায়া পড়ল। আয়না থেকে চোখ ফিরিয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে সে যা দেখলে, তাতে তার সমস্ত শরীরের রক্তচলাচল হঠাৎ যেন বন্ধ হয়ে গেল! সে দেখলে, তার সামনে সশরীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে অয়েল পেন্টিং-এর সেই বদন রায়! সেই গোঁফ, সেই গালপাট্টা, সেই জ্বলজ্বলে বড় বড় চোখ··· !

তারপর কী হয়েছিল সে জানে না। কেবল জ্ঞান হারাবার পূর্বমুহূর্তে সে একজোড়া ভারী জুতোর অস্পষ্ট খট্‌খট্ আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। আওয়াজটা তেতলার সিঁড়ি বেয়ে যেন নিচে নেমে যাচ্ছে!

এর বেশি সে আর কিছু বলতে পারে নি।

অবাঞ্ছিত উপদ্রব
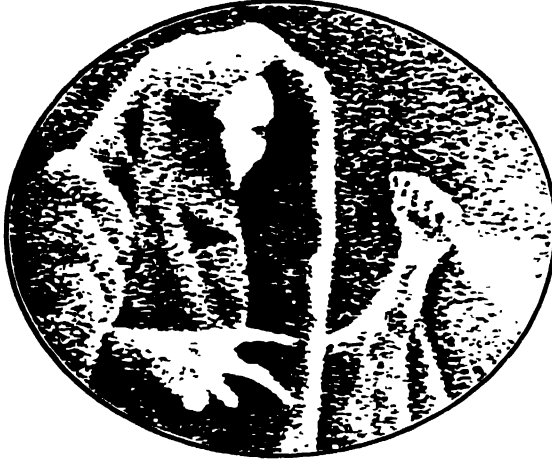
প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁ সাহেব ছিলেন বিখ্যাত সরোদবাদক। তিনি জীবনের শেষ কয়েকটা বছর এই কলকাতা শহরেই কাটিয়েছিলেন। সে সময় শহরের ধনী-নির্ধন অনেকেই তাঁর সাকরেদ হয়ে বাজনা শিখতেন। খাঁ সাহেব শুধু উঁচু দরের বাজিয়ে ছিলেন না, তিনি একজন উঁচু দরের মজলিসী লোকও ছিলেন। তাঁর গল্প এক সময়ে শহরে প্রবাদের মত রাষ্ট্র ছিল। পরলোকগত স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী লেডি প্রতিমা চৌধুরানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সঙ্গীত সঙ্ঘের' অধ্যক্ষ ছিলেন করমতুল্লা খাঁ সাহেব।

আগেই বলেছি, ওস্তাদজী খুবই মজলিসী লোক ছিলেন। যার ফলে আমরা তাঁর জনকতক শিষ্য সেই ভোর থেকে আরম্ভ করে বেলা নটা সাড়ে নটা অবধি আর রাত্রি নটা থেকে রাত্রি বারোটা-একটা অবধি সেখানে আড্ডা জমাতুম। দেশ-বিদেশের আরও অনেক নামজাদা বাজিয়ে-গাইয়ে আসতেন সেখানে—গান-বাজনার জলসা যেদিন হত, সেদিন আর আড্ডা ভাঙবার সময়ের ঠিক থাকত না, সন্ধে থেকে ভোর হয়ে যাওয়াও এমন কিছু বড় ব্যাপার ছিল না।

গ্রীষ্মের ও পূজার সময় সঙ্ঘের লম্বা ছুটি থাকত এবং সে সময় খাঁ সাহেব নিজের দেশে যেতেন। তাঁর বাড়ির মহিলারা কেউ সেখানে থাকতেন না। তাঁদের দেখাশোনা করবার জন্যে বছরে অন্তত এই দুবার দেশে না গেলে তাঁর চলত না। তিনি থাকতেন ভাড়াটে-বাড়িতে এবং প্রতিবারই দেশে যাবার সময় বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে যেতেন এবং ফিরে এসে আবার বাড়ি ভাড়া করে সেখানে গিয়ে উঠতেন। যতদিন না বাড়ি পাওয়া যেত, ততদিন হয় মধু রায়ের লেনে কালী পালের বাড়ি বা কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে গজেন ঘোষের বাড়িতে থাকতেন আর আমরা সবাই ছুটোছুটি করতুম বাড়ির তল্লাসে।

খাঁ সাহেবের পছন্দমত বাড়ি চাই। খোলা-মেলা আলো-হাওয়া পাওয়া যায় এমন বাড়ি হলে তাঁর চলবে না। চারদিক বেশ বন্ধ থাকবে, অন্য কোন বাড়ি থেকে কিছু দেখা যাবে না, অর্থাৎ তাঁর

ভাষায় বাড়িখানি একেবারে 'সিন্দুকের' মত হওয়া চাই। এখনকার লোকেরা হয়তো বিশ্বাস করতেই চাইবেন না, কিন্তু সেকালে সব সময়ে সব রকমের বাড়িই ভাড়া পাওয়া যেত।

এই রকম একটা সময়ে খাঁ সাহেব দেশ থেকে ফিরে এসেছেন, শিষ্য-সম্প্রদায় বাড়ির খোঁজে ব্যস্ত, কিন্তু সেবার আর মনের মত বাড়ি জুটছে না। শেষকালে বেশ কিছুকাল খোঁজাখুঁজির পর একখানা বাড়ি পাওয়া গেল। বাড়িখানা মানিকতলা স্ট্রীটে ছাতুবাবুর বাজার ছাড়িয়ে গিয়ে যে কালীমন্দির আছে তার একটু আগে একটা গলির মধ্যে। তখন কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ তৈরি করছেন। এই বাড়িখানাও রাস্তায় পড়েছিল—বাড়িখানার সামনে-পেছনে, ডাইনে-বাঁয়ে সব ভাড়া বাড়ি। কোনটা একেবারে ভেঙে ফেলা হয়েছে, কোনটা আস্তে আস্তে ভাঙা হচ্ছে। মাস পাঁচ-ছয় বাদে এখানাও ভাঙা হবে। অন্তত মাস পাঁচ-ছয়ও থাকা যাবে এই মনে করে খাঁ সাহেব বাড়িটা পছন্দ করলেন এবং দিন-দুয়েকের মধ্যেই জিনিসপত্র এনে এখানে উঠলেন।

আমরা আগের মতন সকাল-সন্ধ্যায় সেখানে জুটতে লাগলুম। রাত্রে অনেকখানি অন্ধকার গলি পার হয়ে তবে বাড়িতে ঢুকতে হত। এইখানে গ্যাস কিংবা অন্য কোন আলো জ্বলত না। তার ওপরে দুপাশে সব ভাঙা বাড়ি থাকায় গলি পার হবার সময় অনেকেরই গা ছমছম করত।

একদিন, তখন রাত্রি প্রায় আটটা হবে, খাঁ সাহেবের একটি শিষ্য ওই গলিটা পার হচ্ছেন, এমন সময় ভদ্রলোকের কানের পাশ দিয়ে একটি বড় ডাব বেরিয়ে গিয়ে সামনে পড়ল। আমরা অনেকেই তখন ওপরে বসেছিলুম। ভদ্রলোকটি আমাদের একথা বলামাত্র আমরা আলো ও লোকজন নিয়ে নিচে গেলুম। দেখলুম ডাবটা তখন পড়ে রয়েছে—সেটি মাথায় লাগলে তাঁকে আর উঠতে হত না। নিশ্চয় কোন বদমাইশ লোকের কাজ মনে করে তো তখনকার মতন আমরা চলে গেলুম।

পরের দিন সকালে এসে শুনলুম যে কাল সারারাত্রি মহা হাঙ্গামা গিয়েছে! কি ব্যাপার! শোনা গেল, রাত্রি এগারোটার সময় স্নানের ঘরে কল খোলার শব্দ পেয়ে নিচে গিয়ে কল বন্ধ করে আসা হয়। সে সময় কলকাতা শহরের অনেক জায়গায় সারা রাত কলে জল থাকত। যা হোক, ওপরে আসবার পরই আবার জল পড়ার শব্দ শুনতে পাওয়া যায় এবং আবার তারা নিচে গিয়ে কল বন্ধ করে আসে। এইরকম বার কয়েক হতেই তারা দু-তিন জন মিলে নিচে গিয়ে কল বন্ধ করে স্নানের ঘরের সামনেই বসে থাকে, কিন্তু একটুক্ষণ পরেই আবার কে কল খুলে দিতেই ভয়ে তারা ওপরে উঠে আসে এবং সারারাত্রি ধরে জল পড়ে।

দোতলায় একটা বড় হলঘর ছিল। এই ঘরে খাঁ সাহেব থাকতেন, তা ছাড়া বাজনার আসর ইত্যাদি এই ঘরেই করবার বন্দোবস্ত হত। সেদিন রাত্রে এই ঘরে বসে আমরা কাল রাত্রের সেই কল খোলা ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা করছি এমন সময় ওপর থেকে ঝুপঝুপ করে পুষ্পবৃষ্টির মতন আমাদের মাথার ওপরে খানিকটা আস্তাকুঁড়ের ময়লা পড়ল। আমরা তো অবাক! এ-রকম চাষাড়ে রসিকতার চলন সেখানে ছিল না, কাজেই উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একাজ কেউ করেনি। যা হোক, সে জায়গাটা পরিষ্কার করে আবার বসা গেল, কিন্তু বসতে না বসতেই আবার সেই ময়লার বৃষ্টি—যত সব তরকারির খোসা!

ব্যাপার দেখে খাঁ সাহেব তো নানারকম মন্ত্র-তন্ত্র আওড়াতে লাগলেন। ঝাড়ফুঁকও চলতে লাগল। সেদিনকার মত আমরা সরে পড়লুম। পরের দিন এসে শুনি সারা রাত সেইরকম কল খোলা চলেছে এবং রাত্রে আরও দু-একবার ময়লাও পড়েছে। খাঁ সাহেবের দেশের বাড়িতে অনেকগুলি ছেলে মানুষ হচ্ছিল, এবারে তাদের মধ্যে দু-একজনকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন। এদের মধ্যে একজন বললে, সিঁড়িতে একজন দাড়িওয়ালা অপরিচিত বৃদ্ধ দাঁড়িয়েছিলেন, আমি কাছে যেতেই তিনি যে কোথায় মিলিয়ে গেলেন তা বুঝতে পারলুম না।

এ ছোকরা ছিল খুবই ওস্তাদ। সমস্ত ব্যাপারটার ওপর একটু রং দেবার জন্যই কথাটা সে বানিয়ে বলেছিল। কিন্তু যাই হোক, শূন্য থেকে আমাদের ওপরে ময়লা পড়া সমানে চলতে লাগল। ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিয়ে ওপর দিকে চেয়ে বসে থেকে দেখেছি হঠাৎ শূন্য থেকে খানিকটা ময়লা ঝুরঝুর করে পড়ল—ফাঁকা জায়গায় নয়, লোকের ওপরে। এদিকে খাঁ সাহেব পাঁচ ওক্ত নেমাজ পড়তে লাগলেন, বাড়িতে কোন প্রকার অনাচার যাতে না হয় সেদিকে কড়া নজর রাখলেন। ঘরের মধ্যে সর্বক্ষণ গুগ্‌গুল জ্বলতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না—সন্ধের পর লোকজন আসরে

বসলেই ময়লা পড়া সমানে চলতে লাগল।

ব্যাপার দেখে আড্ডাধারীরা সরে পড়তে আরম্ভ করলে। অনেক বাইরের লোকও কৌতূহল পরবশ হয়ে আসতে লাগল। আমাদের অমন শান্তির নীড় বাজারের হট্টগোলে পরিপূর্ণ হল। খাঁ সাহেবের এক বন্ধু ছিলেন, তাঁর কাবুলে বাড়ি। সকলে তাঁকে সৈয়দ সাহেব বলে ডাকতেন। ভদ্রলোক উর্দু বলতে পারতেন না, ফার্শিতে কথা বলতেন, কিন্তু উর্দু বুঝতে পারতেন। খাঁ সাহেবও ফার্শি বলতে পারতেন না, তবে বুঝতে পারতেন। এই সৈয়দ সাহেব ধার্মিক লোক ছিলেন, আর ঝাড়ফুঁক ও তন্ত্রমন্ত্রেও ছিলেন ওস্তাদ। হালে পানি না পেয়ে এই সৈয়দ সাহেবের শরণাগত হওয়া গেল শেষকালে। সৈয়দ সাহেব এসে সব শুনে কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়ে থেকে বললেন, কোন ভয় নেই। এ হচ্ছে একরকম বদমাইশ ভূতের কাজ। দাঁড়াও, ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি।

সৈয়দ সাহেব আট-দশ'টা কাগজে কি সব মন্ত্র লিখে দেওয়ালের জায়গায় জায়গায় মেরে দিলেন। ঘরে খুব গুগ্‌গুল জ্বালানো হল। তিনি নেমাজ ও সেই সঙ্গে আরও কি কি সব পড়ে বলে গেলেন—ব্যস। ভূত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দুদিন পরে আমায় খবর দিও। ঠিক হল সেদিন সন্ধের পরে ভূতের কল্যাণার্থে বিশেষ জলসা হবে। যারা আড্ডায় আসা বন্ধ করেছিল, তাদের কাছে ও আরও অনেকের কাছে বিশেষ নিমন্ত্রণ পাঠানো হল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় জলসায় অনেকেই এসে উপস্থিত হলেন। সৈয়দ সাহেব দেওয়ালের যে যে জায়গায় তাগা মেরে দিয়েছিলেন, আমরা সেই জায়গাগুলোতে দেওয়ালে গা-সাঁট্রা হয়ে বসলুম। সন্ধ্যা উৎরে গেল। খাঁ সাহেবরা সকলে নেমাজ সেরে এসে আসরস্থ হলেন। সকলের মুখেই ভূতের গল্প—যার যা অভিজ্ঞতা ও শোনা কথা বলতে লাগলেন। রাত্রি আটটা অবধি কোন অত্যাচার— ময়লা পড়া অথবা কল খোলা হল না দেখে খাঁ সাহেব সাজ মেলাতে আরম্ভ করলেন। সেদিন সঙ্গত করেছিলেন বিখ্যাত তবলা-বাদক দর্শন সিং—আজ তাঁরা উভয়েই প্রেতলোকে।

প্রায় নটা নাগাদ খাঁ সাহেব বাজনা শুরু করলেন। বেশ জমিয়ে দরবারী আলাপ করে গৎ শুরু করেছেন—শ্রোতৃবৃন্দ চারদিক থেকে বাঃ, বহুত আচ্ছা প্রভৃতি প্রশংসাসূচক আওয়াজ ছাড়ছেন দেখে অন্তরীক্ষে ভূত মশায় আর সংযম রক্ষা করতে পারলেন না। খাঁ সাহেব ও দর্শন সিং-এর মাথার ওপর বারবার ধরে খানিকটা পুষ্পবৃষ্টি হয়ে গেল—বাদামের খোলা, প্যাঁজ ও আলুর খোসা এবং তৎসহ যথোচিত ছাই কাদা ইত্যাদি—একবার নয়, দু-তিনবার। খাঁ সাহেব বাজনা থামিয়ে সরোদটি নামিয়ে রেখে ওপর দিকে চেয়ে বললেন, তোবা! তোবা!—তারপর একটু থেমে বললেন, কুছু রূপিয়া পয়সা ফেঁকো বাবা!

ওদিকে ব্যাপার দেখে শ্রোতৃবৃন্দ আস্তে আস্তে হাল্‌কা হতে লাগলেন, কিন্তু তাঁরাও বঞ্চিত হলেন না। তাঁদের ওপরেও কয়েকবার পুষ্পবৃষ্টি হয়ে গেল।

পরের দিন ভোর না হতে সৈয়দ সাহেবকে ডেকে আনা হল। সব শুনে তিনি বললেন, এই হিন্দুপাড়ায় আমি মনে করেছিলুম এ সব হিন্দু ভূতের কাজ, কিন্তু এখন দেখছি তা নয়! কারণ আমি যে মন্ত্র ঝেড়েছি, হিন্দু-ভূত তা কিছুতেই সহ্য করতে পারত না। এ হচ্ছে জিন—একেও আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি, তবে কিছুদিন সময় লাগবে।

খাঁ সাহেব কিন্তু আর সময় দিলেন না। তিনি সেইদিনই জিনিসপত্র নিয়ে এক সাক্‌রেদের বাড়ি গিয়ে উঠলেন। শিষ্য সম্প্রদায় আবার ছুটোছুটি শুরু করলে নতুন বাড়ির তল্লাসে।

রাজাবাহাদুরের রঙ্গমঞ্চ

ফণীন্দ্রনাথ পাল

১

কলিকাতার ক্রোশ দশেক দক্ষিণে আমার শ্বশুরবাড়ি। গ্রামটি বড় এবং প্রাচীন। এককালে খুবই বর্ধিষ্ণু ছিল। তাহার প্রমাণস্বরূপ বহু বড় বড় অট্টালিকা গ্রামের বুকের উপর আজও জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। তাহার অধিকাংশই বহুদিন ধরিয়া পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল, সম্প্রতি কতকগুলি বাড়িতে আবার আলো জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কলিকাতা-উন্নতিকামী মহারথীদের তাড়া খাইয়া বোধ করি অনেকেই গ্রামের পরিত্যক্ত বাসভবনে আসিয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে এবং অত্যন্ত অনিচ্ছা সহকারে নিরুপায় হইয়াই সেখানে পাকাপাকি ভাবেই থাকিবার ব্যবস্থায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। তাহা ছাড়া গ্রামটি একটি নদীর উপর। ছোট নদী। বর্ষায় ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিলেও চৈত্র-বৈশাখে শীর্ণ হইয়া যায়; স্থানে স্থানে লোক হাঁটিয়াও পার হয়, কিন্তু নৌকা চলাচলের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায় না, তাই ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা বুঝিয়া অনেক নূতন লোকও গ্রামে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলে পূর্বশ্রী ফিরিয়া না পাইলেও কতকটা শ্রী তাহার ফিরিয়া গিয়াছে।

আমার শ্বশুর মহাশয়ের বাড়িটি দীর্ঘ বিশ বৎসর এমনই পরিত্যক্ত। তিনি সুদূর রাওলপিণ্ডি অঞ্চলে চাকুরি করিতেন—পাঁচ বৎসর অন্তর দিন দুই তিনের জন্য বাড়িতে আসিয়া বাস করিয়া যাইতেন। প্রতি সন্ধ্যায় যাহাতে ভিটায় বাতি পড়ে, সেই জন্য এক দরিদ্র প্রতিবেশীকে তিনি একতলায় দুইটি ঘরে থাকিতে দিয়াছিলেন এবং বাড়ি মেরামতের জন্য তাহাকে মাসে মাসে কিছু পাঠাইয়াও দিতেন। কিন্তু বাড়ি আসিয়া লোকের মুখে শুনিতেন, প্রতিদিন দূরের কথা প্রতি সপ্তাহে দুইটি ঘর ছাড়া অন্য কোন ঘরে বড় আলো পড়ে না, এবং মেরামতের জন্য প্রেরিত টাকার পনেরো আনা তিন পয়সা প্রতিবেশীটি নিজ তহবিল-ভুক্ত করেন এবং বাড়িটিকে বাকি এক পয়সায় কোন রকমে খাড়া করিয়া রাখেন। তবুও বলিবার উপায় নাই। থাক্ সে কথা।

পঁচিশ বৎসর চাকুরি পূর্ণ হইতেই শ্বশুর মহাশয় পেনসন লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। মাস দুই সেখানে থাকিয়া গ্রামের বাড়িটিকে নিজের তত্ত্বাবধানে মেরামত করিয়া দীর্ঘকাল পরে সেই পরিত্যক্ত

পল্লীভবনে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। পূজার ছুটিটা সেখানে অতিবাহিত করিবার জন্য আমি নিমন্ত্রিত হইলাম। সে গ্রামে ইতিপূর্বে আমি কোনদিন যাই নাই। গ্রামটি দেখিয়া আমার ভারি আনন্দ হইল।

এখানে আসিবার দিন প্রত্যূষে নিচে একটা গোলমালের শব্দ আমার কানে যাইতেই আমার ঘুমটা হঠাৎ ভাঙিয়া গেল। আমার স্ত্রী মনোরমা ইতিপূর্বেই শয্যা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। একবার শূন্য শয্যার দিকে চাহিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া দেখিলাম সেই প্রতিবেশীটি ও অবনীর মধ্যে খুব চিৎকার করিয়া বচসা চলিতেছে।

অবনী আমার জ্যেষ্ঠ শ্যালক, সে আর আমি প্রায় সমবয়সী। আমরা দুইজনই এম-এ পড়ি।

আমার দিকে চাহিয়া অবনী কহিল, 'পাড়াগেঁয়ে লোকের আক্কেলটা একবার দেখ। ওঠবার নামটি নেই, চিরটা কাল বাড়িটি তো উনিইভোগকরে আসছেন—'

মধ্যপথে বাধা দিয়া প্রতিবেশী শ্লেষের সহিত বলিয়া উঠিল, 'দু পাতা ইংরিজী পড়ে ভারি লম্বা লম্বা কথা হয়েছে—বুঝগে গিয়ে তোর বাপের সঙ্গে—সে জানে, আমায় খোসামোদ করে না রাখলে এ বাড়ির একখানা ইটও থাকত না। এখন কাজ ফুরিয়েছে কিনা, তাই আমি পাজি। যাব তোদের এ আস্তাকুঁড় থেকে আজই উঠে যাব। তবে বলে রাখছি কেমন করে এ বাড়ি তোবা ভোগ করিস তাও দেখব! এখন তাড়াচ্ছিস, পরে আবার এখানে এনে রাখবার জন্যে গুষ্টিবর্গকে নিয়ে আমার পায়ে ধরতে হবে। ওপর তলায় এই যে আরামে ঘুমোচ্ছিস, এটা কার দয়ায়? এই শর্মার! ব্রহ্মদত্যিটাকে আগলে আছি কিনা তাই কিছু বলে না, আজি তো আমি যাচ্ছি, গেলেই টের পাবি! এ গ্রামের মধ্যে গুণী আর কে আছে যে সেই ব্রহ্মদত্যিকে ঠেকিয়ে রাখবে। না হলে তোর বাবা এমনই দাতাকর্ণ কিনা যে শুধু শুধু আমায় দুটো ঘর ছেড়ে দিয়েছিল। কি দুর্দশা হয় তোদের তাও আমি দেখব, যাচ্ছি তো!'

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া অবনী কহিল, 'ফন্দিটা মন্দ বের কর নি! কিন্তু ব্রহ্মদৈত্য তাড়াবার মন্ত্র তোমার চেয়ে আমরাও বড় কম জানি না। এখন তুমি দয়া করে ঘাড় থেকে নামলে যে আমরা রেহাই পাই। উঠছি উঠছি করে দু মাস কাটিয়ে দিলে, ওঠার নাম পর্যন্ত নেই! এখন ভালয় ভালয় উঠবে, না অন্য ব্যবস্থা করতে হবে?'

প্রতিবেশী চিৎকার করিয়া কহিল, 'তুই কি বাড়ির গুমোর দেখাচ্ছিস—দুখানা ভাঙা ইটের তো বাড়ি; জানিস আমি ইচ্ছে করলে এমন বাড়িতে থাকতে পারি, তোদের সমস্ত বাড়িখানা এক করলেও তার একটি ঘরের সমান হয় না! রাজবাহাদুর কত সাধ্য সাধনা করেন, তোর বাবার জন্যেই থাকিনি—বেচারা ধরে পড়ল। এই তো যাচ্ছি, গিয়ে দেখে আসিস্ একবার বাড়িটা, চোখ ঠিকরে যাবে। আমিও এসে দেখে যাব ব্রহ্মদৈত্য—'

অবনী কি বলিতে যাইতেছিল, আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ দরজার আড়াল হইতে তাহাকে ডাকিলেন। অবনী তৎক্ষণাৎ কলহ বন্ধ করিয়া তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়া কহিল, 'কেন ডাকছ মা—যেমন করে হোক ওকে আজ তাড়াবই।'

জননী কহিলেন, 'ঝগড়া-ঝাটি কর না বাবা, উনি আসুন, এসে যা ভাল হয় করবেন।'

অবনী হাসিয়া কহিল, 'ব্রহ্মদৈত্যের ভয় পেলে নাকি মা? ওর চালাকি আর বুঝতে পারলে না। এমনি তো আর থাকা চলে না, তাই মনে করেছে এই রকম ভয় দেখালে আর কেউ তাকে কিছু বলবে না, সে বেশ কায়েমী হয়ে বাড়ি দখল করে থাকবে।'

জননী কহিলেন, 'না বাবা, ভয় পাওয়ার কথা হচ্ছে না। আমাদের এখানে বাড়ি হলেও আমরা এখন নতুন লোক হয়ে পড়েছি—কাজ কি পাড়াপড়শীর সঙ্গে ঝগড়া করে। উনি বেড়িয়ে ফিরে এসে যা হোক ব্যবস্থা করবেন।'

অবনী হাসিয়া উত্তর দিল, 'বেশ, তাই হবে মা।'

আমরা দুইজনে উপরে চলিয়া গেলাম। আমি কহিলাম, 'হ্যাঁ, লোকটা ধূর্ত বটে। মার মনে ভয় জাগিয়ে তুলেছে। না, ওকে আর তাড়াতে পাচ্ছ না।'

অবনী কহিল, 'ওকে তাড়াতেই হবে। ওরকম লোকের সঙ্গে এক বাড়িতে কিছুতেই থাকা যেতে পারে না। আমরা যদি দু মাসের জন্যে বাড়িতে আসতুম, সে আলাদা কথা। তা ছাড়া কিরকম অসুবিধে হচ্ছে দেখছ তো!'

আমি হাসিয়া কহিলাম, 'ওকে তাড়ালে ব্রহ্মদৈত্য ঘাড়ে চেপে বসবে যে!'

অবনী হাসিয়া কহিল, 'তার ওষুধেরও ব্যবস্থা করা যাবে।'

শ্বশ্রু ঠাকুরাণী পরদিনই কিন্তু শান্তিস্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিলেন, তিনি বলিলেন, 'ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করতে গেলে, সব জিনিস অমন হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

ইহারই দিন তিনেক পরে প্রতিবেশীটি তাহার নিজের বাড়িতেই উঠিয়া গেল, রাজাবাহাদুরের বাড়িতে নয়। তাহার জীর্ণ বাড়িটির মেরামতের খরচা অবশ্য সে জননীর নিকট হইতে আদায় করিয়া লইল। কিন্তু নিজের বাড়ি বসিয়া চিৎকার করিয়া ভয় দেখাইতেও ছাড়িল না।

প্রতিবেশীটি চলিয়া যাইবার পর দিন হইতে বাড়ির মেয়েরা বড় গোলযোগ আরম্ভ করিল। সন্ধ্যারাত্রিতে হঠাৎ কোন শব্দ হইলে মেয়েরা সব ছুটিয়া আসিয়া জননীর চারিধারে গিয়া জড়ো হইত এবং ভীতিব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিত। তখনই সন্ধান লইয়া জানা হইত, একটা শৃগাল কিংবা গোসাপ পাঁচিলের পাশ দিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া পত্নী মনোরমা দুই কম্পিত বাহু দিয়া আমায় জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিত, 'এই শোন, ছাদের ওপর পায়ের শব্দ!' সঙ্গে সঙ্গে আমারও মনে হইত, সত্যই যেন কে ছাদের উপর পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে। বুকের ভিতরটা হঠাৎ কি জানি কেন মুহূর্তের জন্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিত, কিন্তু কান খাড়া করিয়া থাকিলে আর কিছু শুনিতে পাইতাম না। তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম ইহা সহসা নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির শ্রবণেন্দ্রিয়-বিকার মাত্র। এমনই ভাবে দিন চারেক চলিল। তারপর একদিন মনোরমার কম্পিত হস্তের ধাক্কায় সহসা জাগিয়া উঠিয়া বসিয়া ছাদের উপর মানুষের পায়ের শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। মনোরমার সমস্ত দেহ তখন ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, আমার দেহ না কাঁপিলেও আমি ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। কিন্তু মুহূর্তমধ্যে মনকে বশে আনিয়া মনোরমার হাত ধরিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইলাম এবং জননীর নিকট তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া ছাদের সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইলাম।

এমন সময় অবনী দ্বার খুলিয়া তাহার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া হাসিয়া কহিল, 'কি হে, অত ছুটোছুটি করছ কেন? ছাদের ওপর পায়ের শব্দ শুনে বুঝি? তুমিও দেখছি মেয়েমানুষ হয়ে গেলে! কিন্তু ও ব্রহ্মদৈত্যের পায়ের শব্দ নয়, ও ভামের ছোটার শব্দ, দেখবে এস আমার সঙ্গে।' আমরা দুইজনে ছাদে গিয়া উঠিলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেখিয়া কি একটা জানোয়ার সশব্দে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। সেদিনকার মত মনোরমার ও অন্যান্য মেয়েদের ভয় ভাঙিল বটে, কিন্তু ব্রহ্মদৈত্যের অতর্কিত আবির্ভাবের ভীতি তাহাদের অন্তর হইতে কিছুতেই দূর করা গেল না।

এমনই ভাবে দিন চলিতে লাগিল: অবনী আর আমি দিনের বেলায় এবং রাত্রে নিত্য নূতন সাজে সজ্জিত হইয়া কণ্ঠস্বর নানারকম বিকৃত করিয়া ব্রহ্মদৈত্যের অভিনয় করিয়া তাহাদের ভয় দেখাইয়া পরম কৌতুক অনুভব করিতে লাগিলাম। তাহাদের বুঝাইয়া দিলাম, এই যে সমস্ত ভূতের গল্প শোন, তাহার কতক এই রকম সাজানো ভূতের অভিনয় আর কতক জীবজন্তুর, কতক বা গাছপালার নড়াচড়ার ব্যাপার! এমনই ভাবে তাহাদের মন হইতে একটু একটু করিয়া ভয়ও দূর হইয়া গেল।

২

সেদিন অবনী আর আমি বেড়াইতে বেড়াইতে গ্রামের অপর এক প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন অপরাহ্ণ। সেখানে একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা আমরা দেখিতে পাইলাম। তাহার প্রকাণ্ড জীর্ণ অবস্থা দেখিয়া মনে হইল বাড়িটি এককালে রাজভোগ্য প্রাসাদের মধ্যে পরিগণিত হইলেও অধুনা জনশূন্য, পরিত্যক্ত। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নাই, গভীর নিস্তব্ধতা যেন সমস্ত বাড়িখানিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। কিন্তু মোড় ঘুরিয়া প্রকাণ্ড ফটকের সম্মুখে আসিতেই আমাদের সে ভুল ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম ফটকে এক সশস্ত্র প্রহরী বন্দুক হস্তে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে! সে এত বৃদ্ধ যে কোমরটা তাহার বাঁকিয়া গিয়াছে। সাজ-পোশাকও তদধিক জীর্ণ, তবে এককালে যে বিশেষ জমকালো ছিল, শতছিন্ন পাগড়ি জামা ও পায়জামা সংযুক্ত জরির টুক্‌রাগুলো তাহা সপ্রমাণ করিয়া

দিতেছে। আমাদের দেখিয়া প্রহরী বন্দুকটা শক্ত করিয়া ধরিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সিপাইজী এ বাড়ি কার ? কেউ থাকে না কি এ বাড়িতে ?'

প্রহরী বিস্মিত দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বেশ পরিষ্কার বাংলায় কহিল, 'আপনারা কোন্ দেশের লোক বাবু যে রাজাবাহাদুরকে চেনেন না ?'

রাজাবাহাদুর ! আমরা একজন আর একজনের মুখের দিকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলাম। এমন প্রাসাদ, এমন প্রহরী, রাজাবাহাদুরটি কেমন তাহা জানিবার জন্য ভারি কৌতূহল হইল। প্রহরীকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, 'আমরা বিদেশী লোক, এখানে বেড়াতে এসেছি। এ কোন্ রাজাবাহাদুর তা তো আমরা জানি না। তুমি যদি মেহেরবানী করে তার পরিচয় দিয়ে দাও।'

সিপাইজী বোধ করি এইবার খুশি হইল, কহিল, 'রাজা গোবর্ধন বাহাদুর।'

অবনীকে চুপি চুপি কহিলাম, 'রাজাবাহাদুরের চেহারাটা একবার দেখে আসা যাক। কি বল হে ?'

অবনী কহিল, 'বেশ তো, চল না।' তারপর একটু থামিয়া হাসিয়া আবার কহিল, 'সেপাই সাহেবের হুকুম নাও।'

প্রহরীর দিকে চাহিয়া বলিলাম, 'সিপাইজী আমাদের একবার রাজদর্শন করিয়ে দাও।'

'কি !' বলিয়া প্রহরী বন্দুকটিকে শক্ত করিয়া ধরিয়া কুব্জ দেহ কিঞ্চিৎ সোজা করিয়া কাঁধের উপর রাখিয়া তাহার কোটরগত চক্ষুর জ্বলন্ত দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপিত করিল।

তাহার রকম দেখিয়া আমার ভারি হাসি পাইল। কোনরকমে হাসি চাপিয়া কহিলাম, 'রাগ করছ কেন সিপাইজী, রাজদর্শন করবার জন্য তোমার হুকুমই তো চেয়েছি।'

বুঝিলাম সিপাইজীর রাগ কতকটা শান্ত হইল। সে কহিল, 'আপনাদের তো সাহস কম নয় যে আপনারা রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে চান ! আর অমন কথা মুখে আনবেন না। এখনই চলে যান, এখানে আব আপনারা দাঁড়াবেন না, কেউ দেখলে, অনর্থ ঘটবে, পাহারা দেওয়া আমার কাজ, গল্প করা নয়।' এই বলিয়াই প্রহরী অন্যদিকে মুখ করিয়া পায়চাবি করিতে লাগিল।

অবনীকে কহিলাম, 'রাজদর্শন-লাভের সৌভাগ্য যখন হল না, চল শুধু বাড়িটাই প্রদক্ষিণ করে দেখা যাক।'

অবনী কহিল, 'তাই চল।' পথ চলিতে চলিতে সে কহিল, 'বাড়ি ফিরে বাবার কাছে রাজাবাহাদুরের পরিচয়টা একবার নিতে হবে। ভেতরে কিছু ব্যাপার আছে নিশ্চয়।'

আমি কহিলাম, 'আমারও তাই মনে হয়।'

অল্প খানিকদূর যাইতে আর একটি বাড়ির উপর দৃষ্টি পড়িতেই হাসিয়া উঠিয়া বলিলাম, 'ওহে, তোমাদের গ্রামে থিয়েটারও আছে দেখছি।'

অবনী কহিল, 'আছে না, ছিল বল। দেখছ না বাড়ির অবস্থা, অনেক জায়গার বালিচুন তো খসেই পড়েছে,দুই একখানা ইটও খসতে আরম্ভ করছে।'

আমরা তখন রঙ্গমঞ্চের ঠিক সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। সত্যই বাড়িটির অবস্থা শোচনীয়। সুবৃহৎ ফটকটি মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন, ভিতর হইতে লৌহ-শিকল দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। তবুও এককালে ইহা যে কারুকার্য-বিশিষ্ট সুদৃশ্য হর্ম্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল, তাহার সমস্ত প্রমাণ এখনও বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। এখনও সে পূর্ব গৌরবের কিঞ্চিৎমাত্রও বজায় রাখিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

অবনী কহিল, 'এ বাড়িও দেখছি রাজাবাহাদুরের ছাড়া আর কারু নয়।'

রঙ্গমঞ্চের পাশ দিয়া একটা রাস্তা ছিল। আমরা তখন সেই রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছিলাম। রঙ্গমঞ্চের পিছনের ফটকে এক সশস্ত্র প্রহরীকে দেখিয়া হঠাৎ আমরা দাঁড়াইয়া পড়িলাম। চুপি চুপি অবনীকে কহিলাম, 'ওহে, সিপাই যে,—সেই রকম ছেঁড়া পোশাক-পরা ! তুমি ঠিকই ধরেছ এ রাজাবাহাদুরেরই কীর্তি। কিন্তু ব্যাপার কি বল দেখি—এখানে সিপাই পাহারা ?'

অবনী কহিল, 'দেখছি রহস্য যে ক্রমে জটিল হয়ে আসছে !'

আমি বলিলাম, 'তা যা বলেছ।'

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। পাখিরা আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটাছুটি করিতেছে—দূরাগত

শঙ্খধ্বনিও কানে আসিয়া বাজিতেছে। আমরা পিছনের ফটকের দিকে দুই এক পা অগ্রসর হইতেই দেখিলাম, সিপাইজী ক্ষিপ্রহস্তে তাহার তল্পিতল্পা বাঁধিতেছে। আমি বলিলাম, 'কি সিপাইজী, তোমার ছুটি হয়ে গেল নাকি ?'

সিপাইজী বোধ করি এতক্ষণ আমাদের দেখিতে পায় নাই। আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিয়া আমার দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিল। ক্ষণকাল পরে ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'সন্ধে হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন না ? এদিকে কি করতে এসেছেন, এখনও দাঁড়িয়ে আছেন, পালান পালান।'

আমরা পরস্পরের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিলাম।

বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে প্রহরী আবার কহিল, 'আপনারা তবু দাঁড়িয়ে রইলেন। পালান পালান, না হলে এখনই বিপদে পড়বেন। সন্ধে হলে এ পথে আর কেউ হাঁটে না।'

আমি বলিলাম, 'সিপাইজী এ সব কি বলছ ! এখানে কি বাঘের ভয় আছে নাকি ?'

সিপাইজীর দুই ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে কহিল, 'বাঘ নয়, বাঘের বাবা আছে। মনে করেছ তোমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছি ! দেখতে পাচ্ছ না হাতে টোটা-ভরা বন্দুক রয়েছে—এর এক গুলিতে পাঁচটা বাঘ কাত হয়ে পড়ে, কিন্তু পাঁচশ গুলি মারলে ওঁর কিছু হয় না। রাম রাম !' বলিতে বলিতে সে বন্দুক কাঁধের উপর ফেলিয়া দ্রুতপদে আমাদের অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে।

অল্পক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইবার পর অবনী হাসিয়া কহিল, 'এখানে তা হলে আর এক ব্রহ্মদৈত্য বাস করে দেখছি।'

আমিও হাসিয়া কহিলাম, 'ব্রহ্মদৈত্য কি আর কোন দৈত্য তা তুমি জানলে কি করে ? তবে বেশ বোঝা যাচ্ছে, যা হোক কিছু একটা গুরুতর ব্যাপার আছে। এ ভাঙা বাড়িতে সিপাই-পাহারা, তা আবার সামনের ফটকে নয় পিছনের ফটকে !'

অবনী কহিল, 'বোধ হয় কোন লুকোন বিদ্যাধরী আছে তাই এদিকে যাতে কেউ না আসে, সেইজন্যে এরকম ভয় দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজই গিয়ে সন্ধান নিতে হচ্ছে। চল, ফেরা যাক। পাড়াগাঁ, সাপখোপের ভয় তো আছে, সন্ধে হবে জানলে টর্চটা সঙ্গে করে আনতুম।'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'হ্যাঁ, তাই চল। কিন্তু তুমি রাত্রে সাপের নাম করলে ?'

অবনীও হাসিয়া কহিল, 'আমাকে কি মেয়েমানুষ পেলে না কি হে, এখন চল।'

উভয়ে চলিতে আরম্ভ করিলাম, তখন অন্ধকার সমস্ত গ্রামটিকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। ভগ্নপ্রায় বঙ্গালয়টি অন্ধকারের গায়ে তখন একটা অস্পষ্ট ছায়ার মত দেখাইতেছিল। আমরা দ্রুতপদে বঙ্গালয়টি অতিক্রম করিয়া রাজবাড়ির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। একবার বাড়ির দিকে চাহিলাম, কোথায় বাড়ি ! একখণ্ড জমাট অন্ধকারের বুকের উপর মাত্র একটা ক্ষীণ আলোকরশ্মি দৃষ্টিপথে পতিত হইল। আমরা নিঃশব্দে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অল্প খানিকদূর যাইতেই লোকের বসতির ভিতর আসিয়া পৌঁছিলাম। কেমন যেন একটু স্বস্তি বোধ করিলাম।

৩

গৃহে পৌঁছাইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া জলযোগ সারিয়া আমরা শ্বশুর মহাশয়ের নিকট গিয়া বসিলাম। একথা সেকথার পর অবনী রাজাবাহাদুরের কথা পাড়িল। উত্তরে শুনিলাম, রাজাবাহাদুর অতি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। এখন তিনি কপর্দকশূন্য, তবুও তিনি গ্রামের কোন লোকের সহিত কথা বলিতে ঘৃণা বোধ করেন। কেহ দেখা করিতে গেলে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেন। তিনি একাকী ওই প্রকাণ্ড বাড়ির মধ্যে বাস করেন। আপনার বলিতে তাঁহার আর কেহ নাই। বেশিদিনের কথা নয়, পঁচিশ বৎসর পূর্বেও তাঁহার প্রাসাদ লোকজনে পূর্ণ ছিল, সেখানে জাঁকজমকেরও অন্ত ছিল না। তাঁহার মত অত্যাচারী দুর্দান্ত লম্পট নৃশংস মদগর্বিত জমিদার খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তারপর বৎসর পাঁচেকের মধ্যে একে একে তিনি স্ত্রী-পুত্র সব হারাইলেন। এবং দেনদারে বিষয়সম্পত্তি সমস্তই নিলাম করিয়া লইল। এখন নিজস্ব বলিতে ওই বাড়িটি এবং সামান্য কিছু ভূ-সম্পত্তি। তাহাতেই কোনরকমে তাঁহার দিন গুজরান হয়। বাড়িতে একটি সরকার এবং দুইটি

বন্দুকধারী বরকন্দাজ আছে। যে প্রতিবেশীটি আমার শ্বশুর-গৃহ দখল করিয়া এতদিন বসবাস করিতেছিল, তিনিই এই রাজাবাহাদুরের সরকার। দশ টাকা মাহিনা পান। সেই রাজপ্রাসাদের এক কোণে থাকিবার প্রার্থনা জানাইতে গিয়া তিনি রাজাবাহাদুরের নিকট একদিন এমনই ধমক খাইয়াছিলেন যে আর কখনও সে কথা মুখেও আনেন নাই। রাজাবাহাদুরের একটি থিয়েটারের দল ছিল। তিনি কলিকাতা হইতে মোটা মাহিনা দিয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রী নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রতি সপ্তাহে খুব ধূমধাম করিয়া অভিনয় হইত। উজ্জ্বল আলোকমালায় সুশোভিত হইয়া রঙ্গমঞ্চটি লোকে লোকারণ্য হইয়া যাইত।

অবনী প্রশ্ন করিল, 'থিয়েটারের পিছনের ছোট ফটকে দেখলুম একজন বন্দুক ঘাড়ে করে পাহারা দিচ্ছে। এর কারণ তো কিছু বুঝলুম না ?'

শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, 'ও রাজাবাহাদুরের এক অদ্ভুত খেয়াল। তবে সন্ধের পর আর কোন পাহারা সেখানে থাকে না—ভূতের ভয়ে নাকি কেউ থাকতে চায় না। হাজার কাজ থাকলেও গ্রামের কোন লোকই সন্ধের পর ও পথ মাড়ায় না, বলে নাকি ওই বাড়ির মধ্যে থেকে অনেক রকম শব্দ শুনতে পাওয়া যায়! একদিন কে একজন স্পষ্ট শুনে এসেছে, ভিতরে মানুষের গলায় কে একজন কাতরাচ্ছে!'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'গ্রামের লোকেরা খুব ভীতু তো। একবার খোঁজ করে দেখলেই বুঝতে পারবে ও সব কিছু নয়। তা হলেই তো লোকের এই মিথ্যা ভয় ভেঙে যায়।'

শ্বশুর মহাশয় কহিলেন, 'তা যায়, কিন্তু লোকে ও রকম কষ্ট স্বীকার করতে চায় না।'

আমি বলিলাম, 'আমার ভারি ইচ্ছে হচ্ছে গ্রামের লোকের এই মিথ্যে ভয় ভাঙিয়ে দিই।'

শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, 'কি দরকার। ও পথে লোক বড় কেউ চলে না, যাবার কোন দরকারও হয় না। যখন কারু কোন ক্ষতি হচ্ছে না, তখন কাজ কি পোড়ো বাড়ির মধ্যে গিয়ে। ভূতটুত ওসব আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু সাপ-খোপ, জন্তু-জানোয়ার তারা যে সেখানে আছে আর তারাই যে ওই রকম শব্দ করে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।'

আর কিছু বলিলাম না বটে, কিন্তু সেই পরিত্যক্ত রঙ্গমঞ্চের রহস্যটা জানিবার জন্য মনটা যেন চঞ্চল হইয়া রহিল। অবনীর সহিত নিভৃতে কথা বলিয়া দেখিলাম, তাহারও মন সেই দিকে টানিতেছে। অবশেষে আমরা গোপনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম, কালই সন্ধ্যার পর আমরা দুই জনে সেখানে যাইব।

প্রত্যুষে অবনীকে বলিলাম, 'চল না, এখনই একবার থিয়েটারের ওদিকে বেড়িয়ে আসি। পারি তো একবার ভিতরটাও দেখে আসব। তারপর রাত্রে যাওয়া যাবে।'

অবনী উৎসাহভরে বলিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই চল। পথঘাটটাও একবার ভাল করে দেখে আসি। আজ রাত্রে সেখানে নিশ্চয়ই যাব।'

আমরা দুইজনে তখনই বাহির হইয়া পড়িলাম। সমস্ত পথটা আমরা একরূপ নিঃশব্দে অতিবাহিত করিলাম। রাজবাড়ির সম্মুখে আসিয়া দেখিলাম ফটক ভিতর হইতে বন্ধ। আমরা রঙ্গমঞ্চের দিকে অগ্রসর হইলাম, রঙ্গমঞ্চটি তেমনই নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে, আশেপাশে কোথাও জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। কিন্তু পিছনের ফটকের কাছে গিয়া আমরা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। কল্যকার সেই প্রহরী বন্দুকহস্তে সেখানে পাহারা দিতেছে।

আমাদের পদশব্দ শুনিয়া সে বন্দুকটি সোজা করিয়া ধরিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিল। তারপর রুক্ষ স্বরে সে কহিল, 'তোমরাই না কাল সন্ধের সময় এখানে এসেছিলে ? আজ ভোর হতে না হতেই আবার এসে হাজির হয়েছ! কি মতলবে এখানে ঘুরছ ?'

প্রহরীর এই অভদ্রোচিত কথা শুনিয়া আমার ভারি রাগ হইল, আমি তাহাকে কড়া কড়া জবাব দিতে যাইতেছিলাম, অবনী আমায় ইশারায় নিষেধ করিল।

অবনী কহিল, 'দেখ সিপাইজী, আমরা বিদেশী লোক, এ গ্রামে বেড়াতে এসেছি। শুনলুম দেখবার মধ্যে এই রাজবাড়ি আর থিয়েটারটি আছে। কাল সন্ধ্যা হয়ে গেলে ভাল করে দেখতে পাইনি, তাই আজ দেখতে এসেছি।'

বোধ করি এ কথায়ও প্রহরীর মন ভিজিল না। সে কহিল, 'বেশ, দেখা তো হয়েছে। এখন

চলে যাও।'

অবনী কহিল, 'দেখা আর হয়েছে কই! খালি বাইরেটা দেখলুম, ভিতব তো দেখা হল না। তুমি যদি মেহেরবানি করে ভিতরটা একবার দেখিয়ে দাও।'

প্রহরী গর্জন করিয়া উঠিল, 'খবরদার! খবরদার! এর ভিতর ঢোকবার চেষ্টা করবে তো গুলি করব। এখান থেকে চলে যাও বলছি।' সঙ্গে সঙ্গে সে বন্দুক বাগাইয়া ধরিল।

আমরা বেগতিক বুঝিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম। কিন্তু মনটা আমাদের সেইখানেই পড়িয়া রহিল। পথে যাইতে যাইতে আমরা স্থির করিলাম গ্রামের লোকের নিকট হইতে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু নূতন কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। সকলের মুখেই সেই এক কথা শুনিলাম, ওই বাড়িতে ভূতের উপদ্রব হয়, সন্ধ্যার পব কেহ ও পথ দিয়া চলাফেরা করে না। এমন কি সন্ধ্যা হইবার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকধারী বরকন্দাজও তল্পিতল্পা গুটাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান কবে. সাবাবাত্রির মধ্যে আব সেদিকে আসে না।

৪

সেদিন আমরা দুইজনেই ভাল কবিয়া আহার করিতে পারিলাম না। সাবা দিনটা যেন কেমন উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের মধ্যে কাটিল। বাড়িতে কাহাকেও কিছু বলিলাম না। বেলা পড়িতেই আমরা দুইটা মোটা লাঠি এবং একটা টর্চ লইয়া বাড়ির বাহির হইয়া পড়িলাম। তখনও সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিবার কিছু বিলম্ব ছিল, তাই আমরা কিছুক্ষণ গ্রামের এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

হঠাৎ রণজিতের সহিত দেখা হইয়া গেল। রণজিৎ আমার বিশেষ বন্ধু। আমারই সমবয়সী এবং সহপাঠী। আমাকে দেখিয়া সে আশ্চর্য হইয়া বলিয়া উঠিল, 'কি হে, রমেশ যে! এখানে?'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'তুমি এখানে?'

রণজিৎ কহিল, 'আমার যে এখানে মামাবাড়ি।'

আমি বলিলাম, 'আমার যে শ্বশুরবাড়ি! ইনিই আমার বড় সম্বন্ধী। বুঝলে অবনী, রণজিৎ আমার অনেকদিনের বন্ধু, বি-এ পাশ করে এখন পশ্চিমে চাকুরি কবছে।' উভয়ের সহিত পরিচয় হইয়া গেল।

রণজিৎ কহিল, 'বেড়াতে বেরিয়েছ বুঝি?'

'বেড়াতে বৈকি।' আমি একবার অবনীর দিকে চাহিয়া বলিলাম, 'একেও সঙ্গে নি, কি বল অবনী, দলে ভারী হওয়া যাবে?'

অবনী বলিল, 'বেশ তো, চলুন না রণজিৎবাবু আমাদের সঙ্গে?'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'কিন্তু আমরা কোথায় যাচ্ছি তা তো তোমায় এখনও বলা হয়নি। ভয় পাবে না তো? আমরা আজ ভূত দেখতে যাচ্ছি।'

রণজিৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, 'তাই নাকি! কোথায় হে? অনেকদিন থেকে ভূতের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হবার ইচ্ছে আমার রয়েছে, অনেকবার অনেক জায়গায় গেছিও কিন্তু অদৃষ্টে সাক্ষাৎলাভ ঘটে নি। এখন তোমার দৌলতে যদি হয়ে যায়! হ্যাঁ হে, সেই থিয়েটারে ভূত দেখতে যাচ্ছ না কি?'

আমি বলিলাম, 'তাহলে তুমিও সে খবর জান দেখছি—'

রণজিৎ বলিল, 'তা আর জানি না, মামাবাড়ি কতবার এসেছি—সে বাড়িটাও আমি ঘুরে গেছি। সবাইয়ের মুখে শুনি বটে সেখানে ভূত আছে। আসি আর চলে যাই, তাই আর ভূত দেখবার সুবিধা হয়ে ওঠে নি। বেশ হল, চল যাওয়া যাক।'

সন্ধ্যা তখন ধীরে ধীরে ধরণীর উপর নামিতে আরম্ভ করিয়াছে, আমরা তিনজনে রাজবাড়ির অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। যখন আমরা রাজবাড়ির সম্মুখে গিয়া পৌঁছিলাম তখন গভীর অন্ধকারে পথঘাট বাড়িঘর গাছপালা সব প্রায় একাকার হইয়া গিয়াছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে আমরা অতি

সন্তর্পণে রঙ্গমঞ্চের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিলাম। টর্চ জ্বালিলে পাছে কেহ দেখিতে পায় সেই জন্য তাহা জ্বালা হইল না। এমনি ভাবে অন্ধকার ভেদ করিয়া আমরা পিছনের ফটকের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলাম। চাহিয়া দেখিলাম প্রহরীটি নাই।

চুপি চুপি বলিলাম, 'বাঁচা গেল। ভূতের ভয়ে আর কেউ এদিকে আসবে না।'

অবনী কহিল, 'এখন কি করবে হে রমেশ, ভিতরে ঢুকবে না বাইরে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখবে?'

আমি বলিলাম, 'এখানে খানিকটা দাঁড়িয়ে দেখা যাক না কান্নাটান্না কিছু শুনতে পাওয়া যায় কিনা। শব্দ পেলেই তিনজনে ঢুকে পড়া যাবে।'

তাহাই স্থির হইল, অবনী টর্চটা জ্বালিয়া ফেলিল। আমরা তিনজনে বাহিরে দাঁড়াইয়া গল্প করিতে লাগিলাম। এমনিভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক অতিবাহিত হইয়া গেল, ভিতরে ও বাহিরে কোথাও কোন সাড়া শব্দ ছিল না। সমস্ত যেন নিঝুম নিস্তব্ধ। এমন সময় হঠাৎ আমাদের চমকিত করিয়া রঙ্গমঞ্চের ভিতর হইতে শব্দ উত্থিত হইল—ঘড় ঘড় ঘড়! মরিচাধরা কপিকলের সাহায্যে কি যেন একটা টানিয়া তোলা হইতেছে।

ব্যাপার কি! আমরা এ উহার মুখের দিকে চাহিলাম।

অবনী কহিল, 'ওই শোন, ঝপ্ করে আবার শব্দ হল! সেটাকে ওপরে তুলেই দড়িটা ছেড়ে দিয়েছে। চল আর দেরি করা নয়, এখনই ভিতরে ঢুকে পড়া যাক। এমনি করেই বদমায়েশেরা লোককে ভয় দেখায়। বেটাদের হাতে হাতে ধরতে হবে।'

আবার শব্দ হইল—ঘড় ঘড় ঘড়!

আমি হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম। বলিলাম, 'আবার তুলছে, যেমন করে হোক ভিতরে ঢুকতে হবে। ভাঙো ফাটক।' সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়া গিয়া আমি ফটকের উপর সজোরে পদাঘাত করিলাম। খোলা ফটকটি উন্মুক্ত হইয়া গেল, পড়িতে পড়িতে কোনরকমে সোজা হইয়া দাঁড়াইতেই আবার সেই কি-একটা পড়ার শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমি অধিকতর উত্তেজিত হইয়া প্রবেশদ্বারের অনুসন্ধানে ছুটিলাম।

অবনী টর্চটা উঁচু করিয়া ধরিল। ঠিক সম্মুখেই দেখিলাম প্রবেশদ্বার, ধাক্কা দিতেই তাহা খুলিয়া গেল। এইবার সেই ঘড় ঘড় শব্দটা যেন আরও স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, মনে হইল যেন আরও জোরে জোরে তাহারা সেটাকে টানিয়া তুলিতেছে। ফটক খোলার শব্দ, দ্বার খোলার শব্দ কিছুই কি তাদের কানে যায় নাই? তাহারা কি এমনই স্থির-নিশ্চয় হইয়া আছে যে ভূতের ভয়ে কেহ এদিকে আসিবে না, দূর হইতে পলাইয়া যাইবে? না তাহারা আমাদের আগমন জানিতে পারিয়া ভয় দেখাইবার জন্যই জোরে শব্দ করিতেছে? তাহারা তো কম ধড়িবাজ নহে। আমরাও দলে তিনজন আছি, হাতে হাতে ধরিয়া তাদের চালাকি ভাঙিয়া দিব।

প্রবেশদ্বারটি রঙ্গমঞ্চের এক পাশে, আমরা ক্ষণবিলম্ব না করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ঝপ করিয়া কি একটা ফেলার শব্দ হইল। আমরা ঘুরিয়া একেবারে ড্রপসিনের ঠিক সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম বহুকালের অব্যবহৃত ড্রপসিনটা পড়িয়া আছে, কিন্তু জোরে জোরে কাঁপিতেছে।

আমি চাপা গলায় বলিলাম, 'ওরা আমাদের দেখতে পেয়ে নিশ্চয়ই স্টেজের ভিতর কোথাও লুকিয়ে পড়েছে। বেগতিক দেখলে পালাবে। এখনই ওদের ধরে ফেলতে হবে।'

আবার শব্দ উত্থিত হইল, ঘড় ঘড় ঘড়! টর্চের উজ্জ্বল আলোকে সবিস্ময়ে দেখিলাম সেই শতচ্ছিন্ন ড্রপসিনটা ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার ছিন্ন অংশগুলি শূন্যের উপর ফরফর করিয়া উড়িতেছে।

ক্রোধে আমার সর্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। কী, এতদূর স্পর্ধা! আমাদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেছে না! অবনীর দিকে চাহিয়া বলিলাম, 'তুমি টর্চ ধরে এখানে দাঁড়িয়ে থাক, আমরা দুজনে ওপরে উঠে বেটাদের ধরছি। এস তো রণজিৎ।'

আমি একলাফে স্টেজের উপর গিয়া উঠিলাম। রণজিৎও আমার অনুসরণ করিল। টর্চের উজ্জ্বল আলোকে স্টেজের ভিতরটা বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। আমরা দুইজনে বিভিন্ন উইংসের দিকে ছুটিয়া গেলাম। এদিক ওদিক চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিলাম কিন্তু কাহাকেও দেখিতে

পাইলাম না। অল্পক্ষণ পরে উভয়ে পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, ড্রপসিনটা ঘড় ঘড় শব্দ করিতে করিতে স্টেজের মাথার কাছে গিয়া উঠিয়াছে।

রণজিৎ শুষ্কমুখে কহিল, 'তাই তো হে ! কাউকে তো দেখতে পেলাম না, অথচ ড্রপটাও উঠছে ! ব্যাপার কি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

আমি উত্তেজিতভাবে বলিলাম, 'ড্রপটা তো আপনি উঠতে পারে না, নিশ্চয়ই লোক আছে। আর এও আমি বলছি, তারা স্টেজের নিচে লুকিয়ে বসে কপিকলের দড়ি টানছে। এস তো একবার দেখি, যাবে কোথা।'

সহসা ড্রপটা আমাদের দুইজনকে অবনীর দৃষ্টিপথের অন্তরাল করিয়া ঝপ্ করিয়া শব্দ করিয়া নিচে পড়িয়া গেল। অন্ধকার যেন অকস্মাৎ আমাদের গ্রাস করিয়া ফেলিল। কেমন যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। সমস্ত দেহটা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মুহূর্ত পরে ড্রপসিনের ছিন্নাংশ দিয়া টর্চের আলো ভিতরে প্রবেশ করিল। আমিও নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইলাম। চিৎকার করিয়া বলিলাম, 'দেখলে অবনী শয়তানী, ড্রপটা কি করে আমাদের মুখের ওপর ফেলে দিলে। স্টেজের নিচে বসে মনে করছে অন্ধকারে আমরা দেখতে পাব না, ওদের যা ইচ্ছে তাই করবে। তা হচ্ছে না, ওদের ধরতেই হবে।'

এমন সময় ঠিক পিছন দিকে হঠাৎ যেন ঘুঙুরের শব্দ শুনিতে পাইলাম। মনে হইল কে যেন ঘুঙুর পায়ে দিয়া নাচিতেছে। মুখ ফিরাইলাম, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তাই তো, এ কি হইল ! ওই যে কে যেন আমার চারিদিকে মণ্ডলাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইতে লাগিলাম কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। ড্রপসিনটা যে ইতিমধ্যে কখন আবার উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা লক্ষ্য করি নাই। ভিতরে টর্চের উজ্জ্বল আলো পড়িতেই চাহিয়া দেখিলাম, ড্রপটা অনেকখানি উপরে উঠিয়াছে। নাচও খুব জোরে চলিয়াছে। যেন স্পষ্ট অনুভব করিলাম কোন এক নৃত্যকুশলা নটী লীলায়িত ভঙ্গিতে মধুর ছন্দে আত্মহারা হইয়া নাচিতেছে। সে নৃত্যের যেন বিরাম নাই। কিছুক্ষণের জন্য আমিও কেমন যেন আত্মহারা হইয়া গেলাম। ইতিমধ্যে ড্রপটা উপরে উঠিয়া আবার ঝপ্ করিয়া নিচে পড়িয়া গিয়া সমস্ত স্থানটি যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তখন আমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। ঘুঙুরের শব্দও আর শুনিতে পাইলাম না। এতক্ষণে আমার অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইল। তবে কি জনশ্রুতিই সত্য ? কিন্তু বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল না। ভ্রম, ভ্রম ! এতক্ষণ রণজিতের দিকে চাহিবারও অবকাশ ছিল না, এইবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, 'রণজিৎ, তুমিও কি ঘুঙুরের শব্দ শুনেছ ?'

রণজিৎ কম্পিতকণ্ঠে কহিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনেছি, খুব স্পষ্ট, কিন্তু কাউকে দেখতে পাই নি। রমেশ, কি করে এখান থেকে বেরুবে ?'

দেখিলাম রণজিৎ অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে। তাই তো ! ভাবিতে লাগিলাম, দুইজনে একই ভ্রমে পতিত হওয়া কি সম্ভব ? অবনীকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলাম, 'তুমিও শুনেছ অবনী, ঘুঙুরের শব্দ ?'

ড্রপটা তখন অবনীকে আড়াল করিয়া পড়িয়াছিল, কাজেই কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছিলাম না। বাহির হইতে সে টানিয়া টানিয়া উত্তর দিল, 'শুনেছি রমেশ—শুনেছি। বেশ বুঝতে পারলুম একটি মেয়ে ঘুঙুর পায়ে দিয়ে নাচছে, কিন্তু তার চেহারা তো দেখতে পেলুম না।'

তাই তো ! তিনজনেই নাচের শব্দ শুনিয়াছি, কিন্তু কে নাচিতেছিল তাহা তো দেখিতে পাই নাই। আমার সারা দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। একি অদ্ভুত ব্যাপার ! ড্রপসিনটা ঘড় ঘড় শব্দ করিয়া উঠিতেছে, আবার ঝপ্ করিয়া শব্দ করিয়া নিচে পড়িতেছে, স্টেজের উপর ঘুঙুর পায়ে নাচ চলিতেছে, অথচ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না ! মনে হইল ছুটিয়া পলাইয়া যাই। রণজিৎকে ডাকিয়া বলিলাম, 'রণজিৎ, এখানে থেকে কাজ নেই, চল বেরিয়ে পড়ি।'

রণজিৎ ভগ্নকণ্ঠে কহিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই চল, আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।'

কোনরকমে ড্রপটার পাশ দিয়া স্টেজের উপর হইতে উভয়ে নিচে লাফাইয়া পড়িলাম। দেখিলাম অবনীর হাতে টর্চটা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে, এখনই বুঝি হাত হইতে পড়িয়া যায়। আমি তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিলাম, 'শিগ্‌গির বেরিয়ে পড়।'

কিন্তু বাহিরে যাওয়া আর হইল না। এক মনুষ্যমূর্তিকে সহসা আমাদের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আমরা তিনজনেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম। একেবারে নিকটে আসিতেই দেখিলাম, লোকটির মুখ দীর্ঘ শ্বেত-শ্মশ্রুগুম্ফ-মণ্ডিত এবং কেশপাশ একেবারে শুভ্র উচ্ছৃঙ্খল, গলায় মোটা সোনার হার এবং গায়ে বহুমূল্য হাঁসিয়াদার শালের চোগা। দুই হাত অঞ্জলি-বদ্ধ, চোখের দৃষ্টি বিভ্রান্ত। মনে হইল সে যেন আমাদের দেখিতে পায় নাই। আপন মনে কাতরকণ্ঠে সে বলিতে লাগিল, 'আর যে পারি না। আর কতদিন এমনই ভাবে আমায় এখানে আকর্ষণ করে আনবে ! আমাকে মরতেও দেবে না, মেরেও ফেলবে না। আবার ড্রপ তুলছ, আবার নাচ ! থামাও থামাও ! আমার এক একখানা পাঁজর যে খসে যাচ্ছে।'

তাই তো, ওই যে ড্রপটা তেমনই ঘড় ঘড় শব্দ করিয়া আবার উপরে উঠিতেছে। ওই যে সেই অদৃশ্য নৃত্য আবার আরম্ভ হইয়াছে ! ওই যে সেই কায়াহীন নর্তকীর ঘুঙুরের শব্দ শোনা যাইতেছে ! সেই বৃদ্ধ এতক্ষণ স্টেজের নিচে দাড়াইয়াছিল, কে যেন তাহাকে জোর করিয়া স্টেজের উপর টানিয়া তুলিয়া লইল। সে দুই হাত জোড় করিয়া জানু পাতিয়া সেই জীর্ণ মেজের উপর বসিয়া পড়িল এবং কাতরকণ্ঠে কাহার নিকট যেন করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিল, আর তাহাকে ঘিরিয়া ঘুঙুরের শব্দের তালে তালে সেই অদৃশ্য নর্তকী উন্মত্ত হইয়া নাচিতে লাগিল ! হঠাৎ বৃদ্ধ যেন মরিয়ার মত চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'ধরা দেব, ফাঁসি যাব। খুন করেছি স্বীকার করব, দেখিয়ে দেব। তোমার দুজনের জীর্ণ কঙ্কাল এখান থেকে টেনে বের করে সবাইকে দেখিয়ে দেব। আর পারি না। একটা দিন রেহাই নেই, রোজ টেনে এনে এমনই করে দগ্ধে মারবে। উঃ কি অসহ্য যন্ত্রণা ! ক্ষমা নেই ক্ষমা নেই !' বলিতে বলিতে বৃদ্ধ ধড়াস্ করিয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। কে যেন তাড়াতাড়ি ড্রপটা ফেলিয়া দিল। নাচের শব্দও থামিয়া গেল।

আমার সমস্ত দেহ কাঁটা দিয়া উঠিয়াছিল, বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা ক্রমাগত আছাড় খাইতেছিল, চোখের দৃষ্টি ক্রমে ঝাপসা হইয়া আসিতেছিল, নিশ্বাস যেন আর ফেলিতে পারিতেছিলাম না।

এমন সময়ে বাহিরে কাহার পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে আসিয়া প্রবেশ করিল। আমার অবশ দেহে যেন কথঞ্চিৎ বলসঞ্চার হইল। আমি কোনরকমে সোজা হইয়া দাঁড়াইলাম।

'ওই যে ভিতরে আলো দেখা যাচ্ছে, ওরা ওখানেই আছে।'

এ কি ! এ যে শ্বশুর মহাশয়ের কণ্ঠস্বর। আমার বুকের স্পন্দনও অনেকটা কমিয়া আসিল। এতক্ষণ পরে আমি একবার অবনী ও রণজিতের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। তাহাদের মুখ যেন মড়ার ন্যায় রক্তশূন্য। আমাদের কাহারও মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

দেখিতে দেখিতে শ্বশুর মহাশয় তাঁহার পুরাতন ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভৃত্যের হাতে একটি লণ্ঠন ছিল। আমাদের বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'ছিঃ, তোমাদের কাল মানা করলুম, তবু তোমরা এখানে এসেছ ! বেরিয়ে এস।'

আমরা নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিয়া রঙ্গমঞ্চ হইতে বাহির হইলাম। এতক্ষণে যেন নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম !

সে রাত্রি একেবারেই ঘুমাইতে পারিলাম না। ঘুমাইবার আশায় যেমনই চক্ষু বুজিয়াছি, অমনই কয়েক-ঘণ্টা-পূর্বের সেই ভয়াবহ দৃশ্য চোখের সম্মুখে জ্বলজ্বল করিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে। যখন ভোরের আলো কক্ষের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল, তখন ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুম ভাঙিয়া যখন উঠিলাম, তখন বেলা নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। অবনীর তখনও ঘুম ভাঙে নাই।

শ্বশুর মহাশয়ের সহিত দেখা হইতেই তিনি অত্যন্ত গম্ভীরমুখে বলিলেন, 'এইমাত্র শুনলুম খানিকক্ষণ আগে ওই ভাঙা স্টেজের ওপর রাজাবাহাদুরকে মৃতাবস্থায় পাওয়া গেছে।'

আমি চমকিয়া উঠিলাম। ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, 'রাজাবাহাদুরের কি খুব লম্বা দাড়ি ছিল, আর এক মাথা সাদা চুল ?'

শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, 'হ্যাঁ, কেন বল দেখি ?'

গভীর বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আমি বলিলাম, 'অ্যাঁ, ওই রাজাবাহাদুর ! ওই রকম চেহারারই এক বুড়োকে কাল আমরা স্টেজের ওপর টেনে তুলতে দেখেছি। আপনার সঙ্গে যখন

আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসি সে লোকটা তখন ওই স্টেজের উপরই পড়েছিল।'

শ্বশুর মহাশয় শুষ্কমুখে বলিলেন, 'ও কথা আর কেউ যেন না শুনতে পায়। পাড়াগাঁ জায়গা, এখনই হয়ত বিপদে ফেলে দেবে। তুমি হাতমুখ ধুয়ে এস। ব্যাপারটা কি হয়েছে, আমায় সব ভেঙে বল।'

বোমাইবুরুর জঙ্গলে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জঙ্গলের বিভিন্ন অংশ সার্ভে হইতেছিল। কাছারি হইতে তিন ক্রোশ দূরে বোমাইবুরুর জঙ্গলে আমাদের এক আমীন রামচন্দ্র সিং এই উপলক্ষে কিছুদিন ধরিয়া আছে। সকালে খবর পাওয়া গেল রামচন্দ্র সিং হঠাৎ আজ দিন দুই-তিন হইল পাগল হইয়া গিয়াছে।

শুনিয়া তখনই লোকজন লইয়া সেখানে গিয়া পৌঁছিলাম। বোমাইবুরুর জঙ্গল খুব নিবিড় নয়, খুব ফাঁকা উঁচু-নিচু প্রান্তরে মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ, ডাল হইতে সরু দড়ির মত লতা ঝুলিতেছে, যেন জাহাজের উঁচু মাস্তুলের সঙ্গে দড়াদড়ি বাঁধা। বোমাইবুরুর জঙ্গল সম্পূর্ণরূপে লোকবসতিশূন্য।

গাছপালার নিবিড়তা হইতে দূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে কাশে-ছাওয়া ছোট্ট দুখানা কুঁড়ে। একখানা একটু বড়, এখানাতে রামচন্দ্র আমীন থাকে, পাশের ছোটখানায় তার পেয়াদা আসরফি টিণ্ডেল থাকে। রামচন্দ্র নিজের কাঠের মাচার উপর চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল। আমাদের দেখিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হয়েছে রামচন্দ্র ? কেমন আছ ?

রামচন্দ্র হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু আসরফি টিণ্ডেল সে কথার উত্তর দিল। বলিল, 'বাবু, একটা বড় আশ্চর্য কথা। আপনি শুনলে বিশ্বাস করবেন না। আমি নিজেই কাছারিতে গিয়ে খবর দিতাম, কিন্তু আমীনবাবুকে ফেলে যাই বা কি করে ? ব্যাপারটা এই, আজ ক'দিন থেকে আমীনবাবু বলছেন একটা কুকুর এসে রাত্রে তাঁকে বড় বিরক্ত করে। আমি শুই এই ছোট ঘরে, আমীনবাবু শুয়ে থাকেন এখানে। দু-তিনদিন এই রকম গেল। রোজই ইনি বলেন—আরে কোত্থেকে একটা সাদা কুকুর আসে রাত্রে। মাচার ওপর বিছানা পেতে শুই, কুকুরটা এসে মাচার নিচে কেঁউ কেঁউ করে, গায়ে ঘেঁষ দিতে আসে। শুনি, বড় একটা গা করি নে। আজ চারদিন আগে উনি অনেক রাত্রে বললেন—আসরফি, শিগগির এস বেরিয়ে, কুকুরটা এসেছে। আমি তার লেজ চেপে ধরে রেখেছি। লাঠি নিয়ে এস।

আমি ঘুম ভেঙে উঠে লাঠি-আলো নিয়ে ছুটে যেতে দেখি—বললে বিশ্বাস করবেন না হুজুর,

কিন্তু হুজুরের সামনে মিথ্যে বলব এমন সাহস আমার নেই—একটি মেয়ে ঘরের ভিতর থেকে বার হয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। আমি প্রথমটা থতমত খেয়ে গেলাম। তার পর ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি আমীনবাবু বিছানা হাতড়ে দেশলাই খুঁজছেন। উনি বললেন—কুকুরটা দেখলে ?

আমি বললাম—কুকুর কই বাবু, একটা কে মেয়ে তো বার হয়ে গেল।

উনি বললেন—উল্লুক, আমার সঙ্গে বেয়াদবি ? মেয়েমানুষ কে আসবে এই জঙ্গলে দুপুব রাতে ? আমি কুকুরটার লেজ চেপে ধরেছিলাম, এমন কি তার লম্বা কান আমার গায়ে ঠেকেছে। মাচার নিচে ঢুকে কেঁউ কেঁউ করছিল। নেশা করতে শুরু করেছ বুঝি ? রিপোর্ট করে দেব সদরে।

পরদিন রাত্রে আমি সজাগ হয়ে ছিলাম অনেক রাত পর্যন্ত। যেই একটু ঘুমিয়েছি অমনি আমীনবাবু ডাকলেন। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে আমার ঘরের দোর পর্যন্ত গিয়েছি, এমন সময় দেখি একটি মেয়ে ওঁর ঘরের উত্তর দিকের বেড়ার গা বেয়ে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে। তখনই হুজুর আমি নিজে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। অতটুকু সময়ের মধ্যে লুকোবে কোথায়, যাবেই বা কত দূর ? বিশেষ করে আমরা জঙ্গল জরীপ করি, অন্ধি-সন্ধি সব আমাদের জানা। কত খুঁজলাম বাবু, কোথাও তার চিহ্নটি পাওয়া গেল না। শেষে আমার কেমন সন্দেহ হল, মাটিতে আলো ধরে দেখি কোথাও পায়েব দাগ নেই, আমার নাগরা জুতোর দাগ ছাড়া।

আমীনবাবুকে আমি একথা বললাম না আর সেদিন। একা দুটি প্রাণী থাকি এই ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে হুজুব। ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আর বোমাইবুরু জঙ্গলের একটু দুর্নামও শোনা ছিল। ঠাকুরদাদার মুখে শুনেছি, বোমাইবুরু পাহাড়ের উপর ওই যে বটগাছটা দেখছেন দূরে—একবার তিনি পূর্ণিয়া থেকে কলাই বিক্রির টাকা নিয়ে জ্যোৎস্না রাত্রে ঘোড়ায় করে জঙ্গলের পথে ফিবছিলেন ; ওই বটতলায় এসে দেখেন একদল অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে হাত ধরাধরি করে জ্যোৎস্নার মধ্যে নাচছে। এদেশে বলে ওদের 'ডামাবাণু'—এক ধরনের জিনপরী, নির্জন জঙ্গলেব মধ্যে থাকে। মানুষকে বেঘোরে পেলে মেবেও ফেলে।

হুজুর, পরদিন রাত্রে আমি নিজে আমীনবাবুর তাঁবুতে শুয়ে জেগে রইলাম সারাবাত। সাবারাত জেগে জরীপের থাকবন্দীর হিসেব কষতে লাগলাম। বোধ হয় শেষ রাতের দিকে একটু তন্দ্রা এসে থাকবে—হঠাৎ কাছেই একটা কিসের শব্দ শুনে মুখ তুলে চাইলাম—দেখি আমীন সাহেব ঘুমুচ্ছেন ওঁর খাটে, আর খাটের নিচে কি-একটা ঢুকেছে। মাথা নিচু করে খাটেব নিচে দেখতে গিয়েই চমকে উঠলাম। আধ-আলো আধ-অন্ধকারে প্রথমটা মনে হল একটি মেয়ে যেন গুটি-সুটি মেরে খাটের তলায় বসে আমার দিকে হাসিমুখে চেয়ে আছে—স্পষ্ট দেখলাম, হুজুর, আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি। এমন কি, তার মাথায় বেশ কালো চুলের গোছা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখেছি। লণ্ঠনটা ছিল যেখানটাতে বসে হিসেব কষছিলাম সেখানে—হাত ছ' সাত দূরে। আরও ভাল করে দেখব বলে লণ্ঠনটা যেমন আনতে গিয়েছি, কি একটা প্রাণী ছুটে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে পালাতে গেল—দোরের কাছে লণ্ঠনের আলোটা বাঁকা ভাবে পড়েছিল, সেই আলোতে দেখলাম একটা বড় কুকুর, কিন্তু তার আগাগোড়া সাদা, হুজুর, কালোর চিহ্ন কোথাও নেই তার গায়ে।

আমীন সাহেব জেগে বললেন—কি, কি ? বললাম—ও কিছু নয়, একটা শেয়াল কি কুকর ঘরে ঢুকেছিল। আমীন সাহেব বললেন—কুকুর ? কিরকম কুকুর ? বললাম—সাদা কুকুর। আমীন সাহেব যেন একটা নিরাশার সুরে বললেন—সাদা ঠিক দেখেছ ? না কালো ? বললাম—না, সাদাই হুজুর।

আমি একটু বিস্মিত যে না হয়েছিলাম এমন নয়—সাদা না হয়ে কালো হলেই বা আমীনবাবুর কি সুবিধা হবে তাতে বুঝলাম না। উনি ঘুমিয়ে পড়লেন—কিন্তু আমার যে কেমন একটা ভয় ও অস্বস্তি বোধ হল, কিছুতেই চোখের পাতা বোজাতে পারলাম না। খুব সকালে উঠে খাটের নিচেটা একবার কি মনে করে ভাল করে খুঁজতে গিয়ে সেখানে একগাছা কালো চুল পেলাম। এই সে চুলও রেখেছি, হুজুর। মেয়েমানুষের মাথার চুল। কোথা থেকে এল এ চুল ? দিব্যি কালো কুচকুচে নরম চুল। কুকুর—বিশেষত সাদা কুকুরের গায়ে এত বড়, নরম কালো চুল হয় না। এ হল গত রবিবার অর্থাৎ আজ তিন দিনের কথা। এই তিন দিন থেকে আমীন সাহেব তো এক রকম উন্মাদ হয়েই উঠেছেন। আমার ভয় করছে হুজুর—এবার আমার পালা কিনা তাই ভাবছি।'

গল্পটা বেশ আষাঢ়ে-গোছের বটে। সে চুলগাছি হাতে করিয়া দেখিয়াও কিছু বুঝিতে পারিলাম না। মেয়েমানুষের মাথার চুল, সে-বিষয়ে আমারও কোন সন্দেহ রহিল না। আসরফি টিণ্ডেল ছোকরা মানুষ, সে যে নেশা-ভাঙ করে না, একথা সকলেই একবাক্যে বলিল।

জনমানবশূন্য প্রান্তর ও বনঝোপের মধ্যে একমাত্র তাঁবু এই আমীনের নিকটতম লোকালয় হইতেছে লবটুলিয়া—ছয় মাইল দূরে। মেয়েমানুষই বা কোথা হইতে আসিতে পারে অত গভীর রাত্রে—বিশেষ যখন এই সব নির্জন বনপ্রান্তরে বাঘ ও বুনোশুয়োরের ভয়ে সন্ধ্যার পরে আর লোকে পথ চলে না?

যদি আসরফি টিণ্ডেলের কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লই, তবে ব্যাপারটা খুব রহস্যময়। অথবা এই পাণ্ডববর্জিত দেশে, এই জনহীন বনজঙ্গল ও ধু ধু প্রান্তরের মধ্যে বিংশ শতাব্দী তো প্রবেশের পথ খুঁজিয়া পায়ই নাই—উনবিংশ শতাব্দীও পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অতীত যুগের রহস্যময় অন্ধকারে এখনও এসব অঞ্চল আচ্ছন্ন—এখানে সবই সম্ভব।

সেখানকার তাঁবু উঠাইয়া রামচন্দ্র আমীন ও আসরফি টিণ্ডেলকে সদর কাছারিতে লইয়া আসিলাম। রামন্দ্রের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল, ক্রমশ সে ঘোর উন্মাদ হইয়া উঠিল। সারারাত্রি চিৎকার করে, বকে, গান গায়। ডাক্তার আনিয়া দেখাইলাম, কিছুতেই কিছু হইল না, অবশেষে তাহার এক দাদা আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল।

এই ঘটনার একটা উপসংহার আছে, যদিও তাহা ঘটিয়াছিল বর্ত্তমান ঘটনার সাত-আট মাস পরে, তবুও এখানেই তাহা বলিয়া রাখি।

এ ঘটনার ছ-মাস পরে চৈত্র-মাসের দিকে দুটি লোক কাছারিতে আমার সঙ্গে দেখা করিল। একজন বৃদ্ধ, বয়স ষাট-পঁয়ষট্টির কম নয়; অন্যটি তার ছেলে, বয়স কুড়ি-বাইশ। তাদের বাড়ি বালিয়া জেলায়, আমাদের এখানে আসিয়াছে চরি-মহাল ইজারা লইতে অর্থাৎ আমাদের জঙ্গলে খাজনা দিয়া তাহারা গরু-মহিষ চরাইবে।

অন্য সব চরি-মহাল তখন বিলি হইয়া গিয়াছে, বোমাইবুরুর জঙ্গলটা তখনও খালি পড়িয়া ছিল, সেইটাই বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। বৃদ্ধ ছেলেকে সঙ্গে লইয়া একদিন মহাল দেখিয়াও আসিল। খুব খুশি, বলিল, খুব বড় বড় ঘাস হুজুর, বহুৎ আচ্ছা জঙ্গল। হুজুরের মেহেরবানি না হলে অমন জঙ্গল মিলত না।

রামচন্দ্র ও আসরফি টিণ্ডেলের কথা তখন আমার মনে ছিল না, থাকিলেও বৃদ্ধের নিকট তাহা হয়তো বলিতাম না। কারণ, ভয় পাইয়া সে ভাগিয়া গেলে জমিদারের লোকসান। স্থানীয় লোকেরা কেহই ও জঙ্গল লইতে ঘেঁষে না, রামচন্দ্র আমীনের সেই ব্যাপারের পরে।

মাসখানেক পরে বৈশাখের গোড়ায় একদিন বৃদ্ধ লোকটি কাছারিতে আসিয়া হাজির, মহা রাগত ভাব, তার পিছনে সেই ছেলেটি কাঁচুমাচু ভাবে দাঁড়াইয়া।

বলিলাম—কি ব্যাপার?

বৃদ্ধ রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—এই বাঁদরটাকে নিয়ে এলাম হুজুরের কাছে দরবার করতে। ওকে আপনি পা থেকে খুলে পঁচিশ জুতো মারুন, ও জব্দ হয়ে যাক্।

—কি, হয়েছে কি?

—হুজুরের কাছে বলতে লজ্জা করে। এই বাঁদর, এখানে এসে পর্যন্ত বিগড়ে যাচ্ছে। আমি সাত-আট দিন প্রায়ই লক্ষ্য করছি—লজ্জা করে বলতে হুজুর—প্রায়ই মেয়েমানুষ ঘর থেকে বার হয়ে যায়। একটা মাত্র খুপরি হাত-আষ্টেক লম্বা, ঘাসে ছাওয়া, ও আর আমি দুজনে শুই। আমার চোখে ধুলো দিতে পারাও সোজা কথা নয়। দু-দিন যখন দেখলাম তখন ওকে জিগ্যেস করলাম, ও একেবারে গাছ থেকে পড়ল হুজুর। বলে—কই, আমি তো কিছুই জানি নে! আরও দু-দিন যখন দেখলাম, তখন একদিন দিলাম আচ্ছা করে ওকে মার। চোখের সামনে বিগড়ে যাবে ছেলে? কিন্তু তার পরেও যখন দেখলাম, এই পরশু রাত্রেই হুজুর—তখন ওকে আমি হুজুরের দরবারে নিয়ে এসেছি, হুজুর শাসন করে দিন।

হঠাৎ রামচন্দ্র আমীনের ব্যাপারটা মনে পড়িয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলাম—কত রাত্রে দেখেছ?

—প্রায়ই শেষরাত্রের দিকে হুজুর। এই রাতের দু-এক ঘড়ি বাকি থাকতে।

—ঠিক দেখেছ, মেয়েমানুষ ?

—হুজুর, আমার চোখের তেজ এখনও তত কম হয়নি। জরুর মেয়েমানুষ, বয়সেও কম, কোনদিন পরনে সাদা ধোয়া শাড়ি, কোনদিন বা লাল, কোনদিন কালো। একদিন মেয়েমানুষটা বেরিয়ে যেতেই আমি পেছন পেছন গেলাম। কাশের জঙ্গলের মধ্যে কোথায় পালিয়ে গেল, টের পেলাম না। ফিরে এসে দেখি, ছেলে আমার যেন খুব ঘুমের ভান করে পড়ে রয়েছে, ডাকতেই ধড়মড় করে ঠেলে উঠল, যেন সদ্য ঘুম ভেঙে উঠল। এ রোগের ওষুধ কাছারি ভিন্ন হবে না বুঝলাম, তাই হুজুরের কাছে—

ছেলেটিকে আড়ালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—এ সব কি শুনছি তোমার নামে ?

ছেলেটি আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আমার কথা বিশ্বাস করুন হুজুর। আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানি না। সমস্ত দিন জঙ্গলে মহিষ চরিয়ে বেড়াই—রাতে মড়ার মত ঘুমুই, ভোর হলে তবে ঘুম ভাঙে। ঘরে আগুন লাগলেও আমার হুঁশ থাকে না।

বলিলাম—তুমি কোনদিন কিছু ঘরে ঢুকতে দেখনি ?

—না, হুজুর। আমার ঘুমুলে হুঁশ থাকে না।

এ-বিষয়ে আর কোন কথা হইল না। বৃদ্ধ খুব খুশি হইল, ভাবিল আমি আড়ালে লইয়া গিয়া ছেলেকে খুব শাসন করিয়া দিয়াছি। দিন-পনের পরে একদিন ছেলেটি আমার কাছে আসিল। বলিল—হুজুর, একটা কথা আছে। সেবার যখন আমি বাবার সঙ্গে কাছারিতে এসেছিলাম, তখন আপনি ও-কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন কেন যে আমি কোনও কিছু ঘরে ঢুকতে দেখেছি কি না ?

—কেন বল তো ?

—হুজুর, আমার ঘুম আজকাল খুব সজাগ হয়েছে—বাবা ওই রকম করেন বলে আমার মনে কেমন একটা ভয়ের দরুণই হোক বা যার দরুণই হোক। তাই ক-দিন থেকে দেখছি, রাত্রে একটা সাদা কুকুর কোথা থেকে আসে—অনেক রাত্রে আসে, ঘুম ভেঙে এক-একদিন দেখি সেটা বিছানার কাছেই কোথায় ছিল—আমি জেগে উঠলেই পালায়, সে কেমন বুঝতে পারে যে, এইবার আমি জেগেছি। এরকম তো ক-দিন দেখলাম—কিন্তু কাল রাতে হুজুর, একটা ব্যাপার ঘটেছে। বাপজী জানে না—আপনাকেই চুপি চুপি বলতে এলাম। কাল অনেক রাতে ঘুম ভেঙে দেখি, কুকুরটা ঘরে কখন ঢুকেছিল দেখিনি—আস্তে আস্তে ঘর থেকে বার হয়ে যাচ্ছে। সেদিকের কাশের বেড়ায় জানলার মাপে কাটা ফাঁক। কুকুর বেরিয়ে যাওয়ার পরে—বোধ হয় পলক ফেলতে যতটা দেরি হয়, তার পরেই আমার সামনের জানলা দিয়ে দেখি একটি মেয়েমানুষ জানলার পাশ দিয়ে ঘরের পেছনের জঙ্গলের দিকে চলে গেল। আমি তখুনি বাইরে ছুটে গেলাম—কোথাও কিছু না। বাবাকেও জানাইনি, বুড়োমানুষ ঘুমুচ্ছে। ব্যাপারটা কি হুজুর বুঝতে পারছিনে।

আমি তাহাকে আশ্বাস দিলাম—ও কিছু নয়, চোখের ভুল। বলিলাম যদি তাহাদের ওখানে থাকিতে ভয় করে, তাহারা কাছারিতে আসিয়া শুইতে পারে। ছেলেটি নিজের সাহসহীনতায় বোধ করি কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু আমার অস্বস্তি দূর হইল না, ভাবিলাম এইবার কিছু শুনিলে কাছারি হইতে দুইজন সিপাহী পাঠাইব রাত্রে ওদের কাছে শুইবার জন্য।

তখনও বুঝিতে পারি নাই জিনিসটা কত সঙ্গীন। দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল অতি অকস্মাৎ এবং অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে।

দিন-তিনেক পরে।

সকালে সবে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়াছি, খবর পাইলাম কাল রাত্রে বোমাইবুরু জঙ্গলে বৃদ্ধ ইজারাদারের ছেলেটি মারা গিয়াছে। ঘোড়ায় চড়িয়া আমরা তখনই রওনা হইলাম। গিয়া দেখি তাহারা যে ঘরটাতে থাকিত তাহারই পিছনে কাশ ও বনঝাউ-জঙ্গলে ছেলেটির মৃতদেহ তখনও পড়িয়া আছে। মুখে তাহার ভীষণ ভয় ও আতঙ্কের চিহ্ন—কি একটা বিভীষিকা দেখিয়া আঁৎকাইয়া যেন মারা গিয়াছে। বৃদ্ধের মুখে শুনিলাম, শেষ রাত্রির দিকে উঠিয়া ছেলেকে সে বিছানায় না দেখিয়া তখনই লণ্ঠন ধরিয়া খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে—কিন্তু ভোরের পূর্বে তাহার মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। মনে হয়, সে হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া কোন-কিছুর অনুসরণ করিয়া বনের মধ্যে ঢোকে—কারণ, মৃতদেহের কাছেই একটা মোটা লাঠি ও লণ্ঠন পড়িয়া ছিল, কিসের অনুসরণ করিয়া

সে বনের মধ্যে রাত্রে একা আসিয়াছিল তাহা বলা শক্ত। কারণ, নরম বালিমাটির উপর ছেলেটির পায়ের দাগ ছাড়া অন্য কোনও পায়ের দাগ নাই—না মানুষ, না জানোয়ারের। মৃতদেহেও কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন ছিল না। বোমাইবুরু জঙ্গলের এই রহস্যময় ব্যাপারের কোন মীমাংসাই হয় নাই, পুলিশ আসিয়া কিছু করিতে না-পারিয়া ফিরিয়া গেল, লোকজনের মনে এমন একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করিল ঘটনাটি যে, সন্ধ্যার বহু পূর্ব হইতে ও অঞ্চলে আর কেহ যায় না। দিনকতক তো এমন হইল যে, কাছারিতে একলা নিজের ঘরটিতে শুইয়া বাহিরের ধপধপে সাদা, ছায়াহীন, উদাস, নির্জন জ্যোৎস্নারাত্রির দিকে চাহিয়া কেমন একটা অজানা আতঙ্কে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত, মনে হইত কলিকাতায় পালাই, এ-সব জায়গা ভাল নয়, এর জ্যোৎস্নাভরা নৈশপ্রকৃতি রূপকথার রাক্ষসী রাণীর মত, তোমাকে ভুলাইয়া বেঘোরে লইয়া গিয়া মারিয়া ফেলিবে। যেন এ-সব স্থান মানুষের বাসভূমি নয় বটে, কিন্তু ভিন্ন লোকের রহস্যময়, অশরীরী প্রাণীদের রাজ্য, বহুকাল ধরিয়া তাহারাই বসবাস করিয়া আসিতেছিল, আজ হঠাৎ তাহাদের সেই গোপন রাজ্যে মানুষের অনধিকার প্রবেশ তাহারা পছন্দ করে নাই, সুযোগ পাইলেই প্রতিহিংসা লইতে ছাড়িবে না।

ম্যমির জীবন্ত হাত

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

সকাল থেকে সেদিন কাজের আর বিরাম ছিল না ; যখন বিশ্রাম পেলাম, রাত তখন বারোটা। যেখানে আমার আস্তানা ছিল, সে জায়গাটার চারধারে দশ ক্রোশের মধ্যে কোন লোকালয় নেই, গাছপালাও বড় একটা দেখা যায় না, কেবল শুষ্ক পাষাণ ও তার এধারে-ওধারে অতি প্রাচীন সমাধিগুলি নীরবে পড়ে আছে। এইসব কারণে জায়গাটা স্বভাবতই নির্জন ও নিস্তব্ধ। দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যার পর থেকে তার নীরবতা যেন গুরুভার পাষাণের মত বুকের উপর চেপে বসে। রাত যত বাড়ে, মনে হয়, এখানে মাটির নিচে যারা ঘুমিয়ে আছে তারা জেগে উঠে রাত্রির মত অতি চুপে চুপে পা ফেলে এবং বাতাসের মত লঘু ও স্বচ্ছ দেহে এদিক-ওদিক চলা-ফেরা করছে।

আমার কাজ ছিল সমাধির নিচের শুষ্ক ও প্রাণহীন মৃতদেহগুলি নিয়ে। এক-এক রাতে মনে হত, কে যেন আমার পিঠের উপর দিয়ে ঝুঁকে বা সামনে দাঁড়িয়ে আমার রচনাটা খুব কৌতূহলের সঙ্গে পাঠ করছে। কখনো কখনো সচকিত হয়ে মাথা তুলে এদিক-ওদিক তাকিয়েছি। কিন্তু কিছুই দেখতে পাই নি।

সেজন্যে ভাবতাম, ওটা মনের ভুল। রাতদিন মৃতের সম্বন্ধে চিন্তা করছি, মৃতেব নানারকম সামগ্রী নাড়া-চাড়া করি ; আমার চারধারেই যে সমাধি। এ অবস্থায় প্রেত বা ছায়া অথবা ওই ধরনের কিছু যে দেখব কিংবা অনুভব করব, এতে আর বিচিত্র কী !

যাই হোক. কাজ সেরে আমি আস্তানা থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। পরদিন আমাদের দেশে যেতে হবে, সেজন্যে আমার সঙ্গী জিনিসপত্র গোছাতে ব্যস্ত। আমাদের বৃদ্ধ আরব অনুচরটি তখন কোথায় জানি না।

আমি আস্তানার বাইরে দাঁড়িয়ে একটা চুরুট ধরিয়ে চারধারে তাকিয়ে দেখলাম। কিন্তু সেই ঘন অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়ল না ; কেবল কিছু দূর থেকে নাইলের অস্পষ্ট কলধ্বনি ও চারধারের অশ্রান্ত ঝিল্লিরব একসঙ্গে মিশে একটি অদ্ভুত সুরের সৃষ্টি করে আমার কানে বাজতে লাগল এবং

মনকেও স্পর্শ করতে লাগল। আমি স্তব্ধ হয়ে সেই শব্দের দিকে কান পেতে রইলাম।

সম্ভবত ক্ষণিকের জন্যে তন্ময় হয়ে থাকব। হঠাৎ দেখি, আমার একেবারে সমুখে একটি ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে।

আমি সচকিত হয়ে এক পা পিছিয়ে যেতেই আমারও বিস্ময়ের ঘোর কাটল, সেই মূর্তিও কথা বলে উঠল। সে অতি মৃদু কণ্ঠে বললে, 'আমার সঙ্গে আসুন।'

তার সুরে, কথায় ও ভাব-ভঙ্গিতে এমন একটা গাম্ভীর্য ছিল যে, সে আমাদের অনুচর হলেও তা উপেক্ষা করতে পারলাম না ; কেবল বললাম, 'কোথায় ?'

সে হাত বাড়িয়ে পুব দিকটা দেখিয়ে দিলে। আমি নীরবে তাকে অনুসরণ করে চললাম।

দুজনে চলেছি। আমাদের পথের এদিকে-ওদিকে ভগ্ন সমাধিস্তম্ভগুলো পড়ে আছে। মাঝে-মাঝে পায়ে বাধা পাই, কোন সমাধিস্তম্ভ-চূড়ায় বা আর কোথাও বসে হঠাৎ দুটি-একটি পেচক ডেকে ওঠে, মাথার উপর দিয়ে বাতাসকে পাখার আঘাতে বিক্ষুব্ধ করে কখনো কখনো বাদুড় উড়ে যায়। সেই ঘন অন্ধকার, সেই আচম্বিত শব্দ, সেই জনবিরল সমাধি-প্রান্তর ও বৃদ্ধ অনুচরটির রহস্যপূর্ণ ব্যবহার আমাকে ক্রমে যেন অভিভূত করে ফেলতে লাগল। আমার মনে হতে লাগল, আমি কোন অভূতপূর্ব ঘটনা বা কোন রহস্যের সম্মুখীন হতে চলেছি।

তার সঙ্গে কতক্ষণ যে চলেছি, তা ঠিক করে বলা সম্ভব নয়। তবে দূরত্বের অনুমানে বুঝলাম, আমার আস্তানা থেকে প্রায় এক মাইল পার হয়ে এসেছি। এর মধ্যে অবশ্য আমরা দুজনে কেউ কারো সঙ্গে একটি কথাও বলি নি।

এক জায়গায় এসে আমার অনুচরটি হঠাৎ দাঁড়াল। তারপর বললে, 'অপেক্ষা করুন।'

আমার চোখে অন্ধকাব এতক্ষণে সয়ে এসেছিল। তার উপর তিথি অনুসারে আর-একটু পরেই চাঁদ উঠবে। পুব আকাশের কোল একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তার ফলে জায়গাটার একটা অস্পষ্ট ছবি আমার চোখে ফুটল। মনে পড়ল, এর আগে এখানে দিনের বেলায় একবার এসেছিলামও। দেখলাম, আমার সমুখে সেই জীর্ণ স্ফীংক্স্ ; তার নিচে প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাটা সুড়ঙ্গ ও খাদ।

অনুচরটি সেখানে আমাকে রেখে সেই খাদের মধ্যে নেমে গেল।

আমি দাঁড়িয়ে আছি। দূর শৈলশিখরে ধীরে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠল। তার ম্লান আলো সেই নিস্তব্ধ নির্জন জায়গা, সমাধিগুলি ও স্ফীংক্স্টাকে এমন একটি রূপ দান কবলে যে আমার মনে হতে লাগল, চারধার থেকে কারা যেন ঘুম থেকে ধীরে জেগে উঠছে। চিন্তাটা মনে উঠতেই আমার শরীরের মধ্য দিয়ে কেমন একটু শিহরণ বয়ে গেল।

ঠিক তখনই পিছনে পায়ের শব্দে ফিরে দেখি, আমাদের অনুচরটি ফিরে আসছে। তার হাতে যেন একটি কি।

সে কাছে আসতেই দেখি, জিনিসটা কাপড়ে জড়ানো। সাধারণত 'ম্যমি'গুলি যে ধরনের কাপড়ে জড়ানো থাকে এ কাপড়খানাও সেই ধরনের। আমার কৌতূহলের সীমা থাকল না।

সেও কোন কথা না বলে, কাল-বিলম্ব না করে জিনিসটার উপরের জড়ানো কাপড়টা খুলে ফেললে। ততক্ষণে চাঁদ আর একটু উপরে উঠেছে।

জিনিসটার কাপড়খানা সে সম্পূর্ণ খুলে দিতেই আমার কৌতূহল চরম বিস্ময়ে পরিণত হল। দেখলাম, সেটা একখানি হাত !

হাতখানার গঠন এবং সুন্দর ও সরু আঙুলগুলি দেখে বুঝলাম, সেটি কোন নারীর। তার কোথাও এতটুকু বিকৃতি ঘটেনি। তার নখগুলি চমৎকার করে কাটা ; প্রত্যেক নখের উপর যে খুব পাতলা সোনালি পাত মোড়া রয়েছে, সেগুলি পর্যন্ত জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে। দেখে মনে হতে লাগল, হাতখানা এই মুহূর্তে কোন সুন্দরী নারীর দেহ থেকে কেটে আনা হয়েছে। তার ক্ষতস্থান থেকে যে দুটি হাড় বেরিয়ে আছে, চাঁদের আলো পড়ে সে দুটি আরও সাদা দেখাচ্ছে। ততক্ষণে চাঁদের আলো আরও উজ্জ্বল ও নির্মল হয়ে উঠেছিল। অনুচরটি হাতখানা আমার আর-একটু কাছে আনতে দেখলাম, তার তর্জনীতে একটি উজ্জ্বল সোনার আংটি ; তার উপর প্রাচীন ইজিপ্টের কয়েকটি সাঙ্কেতিক অক্ষর খোদাই করা।

আমার বৃদ্ধ অনুচরটির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার চেহারায় কেমন একটা পরিবর্তন

এসেছে। তাকে আমরা আরব বলে জানতাম। কিন্তু এখন তার মুখ-চোখের আরবীয় গঠনের পাশে আর একটি অন্য ভাব ফুটে উঠে সে ভাবটিকে ম্লান করে দিয়েছে। সে পরম স্নেহভরে সেই হাতখানি দু-হাতে তুলে ধরে বলল, 'এখানা ফারাও আখ্‌নাটেনের সপ্তম কন্যার দক্ষিণ হাত।

'আখ্‌নাটেন তাঁর পূর্বপুরুষদের ধর্মত্যাগ করে এক নূতন ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন। সে ধর্ম ছিল, সূর্যের উপাসনা। তাঁর মৃত্যুর পর টুটেনখামেন ফারাও হন। তিনি আখ্‌নাটেন যে ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন তা দেশ থেকে দূর করে দেশের যা পুরাতন ধর্ম তা আবার প্রতিষ্ঠা করেন। তার ফলে ইজিপ্টের পুরোহিত সম্প্রদায় আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে, থিবিস নগরের মন্দিরের পুরোহিতগণ আবার অবাধে ইজিপ্টের সর্বত্র প্রভুত্ব করতে থাকে।

'কিন্তু ফারাও আখ্‌নাটেনের সপ্তম কন্যা মাকিটাটেন তাঁর পিতৃ-ধর্ম তখনও ত্যাগ করেননি। সে ধর্মের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ছিল বড গভীর। রাজকুমারী পিতার মৃত্যুর পর একদল সৈন্য সংগ্রহ করে থিবিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু প্রথম যুদ্ধেই তিনি নিহত হন।

'থিবিসের মন্দিরের পুরোহিতগণ তখন রাজকুমারী যে হাতে তাদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করেছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁর মৃতদেহ থেকে সেই দক্ষিণ হাতখানি মণিবন্ধের একটু উপরে তরবারি দিয়ে ছিন্ন করে এবং কয়েকটি বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে হাতখানিকে 'ম্যমি' করে এই মন্দিরটিতে রেখে দেয়। এই নৃশংস কাজ করবার উদ্দেশ্য এই ছিল, যাতে আর কেউ রাজকুমারীর মত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা না করে, তাহলে তাদেরও দশা হবে রাজকুমারীর মত। থিবিসের এই মন্দিরটাই ছিল তখন প্রধান। এখানা সেই।' বলে বৃদ্ধ পরম স্নেহের সঙ্গে হাতখানা একটু দোলালে।

তারপর আবার বললে, 'এই কাহিনী আমি শুনেছি আমার পিতার মুখে ; তিনি শুনেছিলেন তাঁর পিতার কাছে। এইভাবে কাহিনীটি পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। আমার পূর্বপুরুষেরা থিবিসের এইসব মন্দিরে পৌরোহিত্য করতেন। এই হাতখানি যে কোথায় লুকোনো ছিল তাঁরা ছাড়া আর কেউ তা জানত না। আমার পিতা আমাকে এর গোপন সন্ধান দিয়ে গেছেন। তোমার কাছে আমি নানাভাবে ঋণী। তাই আজ আমি সেই হাতখানা তোমায় উপহার দিচ্ছি।'

আমি বললাম, 'কিন্তু হাতখানা আমায় না দিয়ে কোন জাদুঘরে তোমার দেওয়া উচিত। তারা সযত্নে এটাকে রক্ষা করবে।'

সে কঠোর স্বরে বললে, 'তা হতে পারে না। এই হাতের উপর যে অভিসম্পাত আছে, তা আজও পূর্ণ হয়নি। আর সেই অভিসম্পাতটি পূরণ করবার জন্যে ভাগ্য তোমাকেই নির্বাচিত করেছে।'

আমি চমকে উঠলাম ; বললাম, 'অসম্ভব ! আমার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ কী ? আমি তো বিদেশী।'

সে একটু হেসে বললে, 'বন্ধু, নিয়তির চলা-ফেরা বড় বিচিত্র। আমি যা বলছি, তা সত্য। রাজকুমারী মাকিটাটেনের দেহটা 'ম্যমিতে' পরিণত করে তাঁর পিতা আখ্‌নাটেনের ম্যমির কাছে রাখা হয়েছে। সেটা এখন শান্তিতেই আছে। কিন্তু তাঁর দক্ষিণ হাতখানার উপর যে অভিসম্পাত আছে, তা আজও পূর্ণ হয়নি। সেজন্যে এটার শান্তি নেই। এটা তোমার সঙ্গে পৃথিবীর নগরে নগরে ঘুরে বেড়াবে, লক্ষ-লক্ষ লোকের চোখের সমুখে প্রদর্শিত হবে। হাতখানার উপব যে অভিসম্পাত আছে, তা পূর্ণ হবে তোমার দ্বারাই। নিয়তির এই বিধান।'

'অসম্ভব !'

'পৃথিবীতে "অসম্ভব" বলে কিছু নেই। তুমিও কোথাও শান্তিতে বাস করতে পারবে না। আজ থেকে এক বছর পরে তোমার ভ্রমণ শুরু হবে। আর আজ থেকেই ত্রিশ বৎসর পরে এক মহাযুদ্ধের শেষ ভাগে রাজকুমারী মাকিটাটেনের ভগ্নীপতি ফারাও টুটেনখামেনের সমাধি আর ম্যমি যে সময় আবিষ্কৃত হবে, ঠিক তার পূর্বেই রাজকুমারীব আত্মা এসে তোমার কাছ থেকে তাঁর দক্ষিণ হাতখানা উদ্ধারের চেষ্টা করবে। হাতখানাও তখন হয়ে উঠবে জীবন্ত। যতকাল তোমার কাছে থাকবে, ততকাল তোমার কোন বিপদ-আপদের ভয় থাকবে না। তুমি এখানা সযত্নে রক্ষা করবে, তাহলে এই হাতও তোমাকে সকল বিপদে রক্ষা করবে। আমার কাছে শপথ কর যে, হাতখানা তুমি সব সময়ে খুব সাবধানে রাখবে!' বলতে বলতে বৃদ্ধের চোখমুখের ভাব, গলার স্বর, দেহের ভঙ্গি সম্পূর্ণ বদলে গেল।

আমার তখন মনে হতে লাগল, একজন ইজিপ্টীয় পুরোহিত সেই অতি প্রাচীন জীর্ণ মন্দিরের

ধ্বংসাবশেষের উপর দাঁড়িয়ে আমাকে কঠোর স্বরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে আজ্ঞা দিচ্ছে। সেই নিস্তব্ধ নির্জন সমাধি-প্রান্তরে, শান্ত বাতাসে, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে তার সেই মূর্তির সম্মুখে আমি ক্রমে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমার ইচ্ছাশক্তি মনের মাঝে মিলিয়ে গেল। বোধ হতে লাগল, আমি তার আজ্ঞাবহ ভৃত্য। আমার মাথা আপনা হতেই তার সম্মুখে নত হয়ে পড়ল।

সে বললে, 'কেবল ওইটুকু প্রতিজ্ঞাই যথেষ্ট নয়। এই আমরা দুজনে আমেনের জীর্ণ, ভগ্ন মন্দিরতলে দাঁড়িয়ে আছি। এখানে নতজানু হয়ে বসে আকাশের দিকে তোমার দক্ষিণ হাত তুলে সকলের যিনি ঈশ্বর, তাঁকে সাক্ষ্য করে শপথ কর যে তোমার কথা তুমি পালন করবে।'

তার অনুজ্ঞা উপেক্ষা করবার শক্তি আমার তখন ছিল না ; আমি যথাযথ তা পালন করলাম। তারপর আমি উঠে দাঁড়াতেই সে আমার হাতে রাজকুমারীর ছিন্ন হাতখানি ধীরে রেখে দিলে।

অতঃপর দুজনে পূর্বের পথ ধরে আস্তানায় ফিরে এলাম। আমার মন এক অভূতপূর্ব ভাবে ভরে গেল।

দেখলাম, আমার সঙ্গী তখনও তেমনি ব্যস্ত আছেন। আমি যে কাপড়ে জড়ানো একটা কিছু নিয়ে কুটীরে ঢুকলাম, সেদিকে তাঁর খেয়ালই হল না। আমিও তাঁকে হাতখানির বিষয় কোন কথা বলা আবশ্যক বলে মনে করলাম না। হাতখানিকে আর-একখানা কাপড়ে ভাল করে জড়িয়ে আমার বালিশের নিচে রেখে তাতে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু অন্য দিনের মত আমায় সে রাতে কিছুক্ষণ জেগে থাকতে হল না। শোবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার চোখে তন্দ্রা নেমে এল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন যথাসময়ে আমরা জিনিসপত্র নিয়ে আস্তানা ছেড়ে চলে এলাম। আমাদের বৃদ্ধ অনুচরটিও স্টিমারঘাট অবধি আমাদের সঙ্গে এল।

আমি যখন স্টিমারে উঠছি, তখন সে একবার তীক্ষ্ণ চোখে আমার চোখের দিকে তাকাল। আমার মনে হল, সেই দৃষ্টির অর্থ, 'তোমার শপথ পালন করো।'

যাই হোক আমাদের স্টিমার যথাসময়ে থিবিস ছেড়ে নাইল দিয়ে সুদূর উত্তরে সমুদ্রের দিকে চলতে আরম্ভ করলে।

সেই সময়ে ফিরে দেখলাম, আমাদের বৃদ্ধ অনুচরটি ঘাটের একধারে স্থির হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন ছায়ামূর্তি। ক্রমে সেই ছায়া থিবিসের বিলীয়মান তীরভূমির সঙ্গে আমার চোখের সম্মুখ থেকে চিরকালের জন্য মিলিয়ে গেল।

তারপর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কেটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে আমি পৃথিবীর নগরে নগরে ভ্রমণ করেছি, কত লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আমি হাতখানাকে কখনও আমার কাছছাড়া করিনি। সকলেই রাজকুমারী মাকিটাটেনের সেই হাতখানিকে আমার বসবার ঘরে আমার পাশে দেখে গেছে ও তার চমকপ্রদ কাহিনীটি মনোযোগ দিয়ে শুনেছে।

হাতখানিও এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমাকে যে কত বিপদ-আপদে রক্ষা করেছে, তা বলতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড পুঁথি হয়ে যাবে।

একবার এক চোর আমার ঘরে ঢুকে এক জায়গায় লুকিয়ে থাকে। তার মতলব, রাত যখন গভীর হবে, তখন সে আমার মূল্যবান যা কিছু চুরি করে পালাবে।

সে রাতে তার কাজ হাসিল করবার সুযোগেরও অভাব হল না। ঘর অন্ধকার হল, রাতও গভীর হয়ে এল। সে আমার সোনার ঘড়িটা সংগ্রহ করে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে টেবিলের উপর থেকে টাকার থলিটা নিতে গিয়েই তার হাতখানা রাজকুমারীর হাতের উপর পড়ল।

তৎক্ষণাৎ সে ভয়ে আঁতকে উঠে সব ফেলে প্রাণ-ভয়ে ঘর থেকে পালিয়ে গেল।

আর একবার এক হোটেলে থাকবার সময় হঠাৎ সেখানে আগুন লাগে। অন্য সকলের সঙ্গে আমিও প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ছুটে পালাতে পালাতে মনে পড়ল, রাজকুমারীর হাতখানা আনা হয়নি, সেটা টেবিলে লাল মখমলের গদির উপর রয়েছে। না আনলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

কথাটা মনে হওয়া মাত্র আমি ঘরের দিকে ফিরলাম। ঘরে এসে হাতখানা নিয়ে আবার ছুটতে ছুটতে লিফ্‌টের কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ভয়ঙ্কর একটা শব্দ হল। তাকিয়ে দেখি, লিফ্‌টটা পুড়ে ছিঁড়ে নিচে পড়ে গেল। তার ফলে অনেকগুলি লোক জখম হল ও প্রাণ হারাল।

এরপর এক রাতে স্বয়ং রাজকুমারী এলেন, তাঁর ওই হাতখানি নিতে।

তখন ইউরোপের মহাযুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমি ইউরোপের যে নগরে সে সময় বাস করছি, মনস্থ করলাম সেখানেই জীবনের শেষ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে বাস করব। কিন্তু থিবিসের জীর্ণ ভগ্ন মন্দির-তলে দাঁড়িয়ে আমার বৃদ্ধ অনুচরটি যে ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিল, তা তখনও পূর্ণ হয়নি বলেই বোধহয় আমার সঙ্কল্প সফল হল না। আমি নগরটি ছেড়ে যেতে বাধ্য হলাম।

যাবার সমস্ত আয়োজন করছি। কতক জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি, কতক তখনও আছে। সেগুলোর মধ্যে রাজকুমারীর হাতখানিও একটি।

সত্য কথা বলতে কি, হাতখানি নিয়ে আমি কিছু বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম। কয়েক দিন থেকে লক্ষ্য করছিলাম, যে হাত এতকাল লোহার মত শক্ত ও অসাড় ছিল, তা বেশ কোমল হয়েছে। তার সরু সরু আঙুলগুলোকে সহজেই এধারে-ওধারে সঞ্চালন করা যায়। তারপর ক্রমে সমস্ত হাতখানার আকৃতিও সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে সেখানা হয়ে উঠল জীবন্ত মানুষের হাতের মত।

সেখানার দিকে হঠাৎ তাকিয়ে সময়ে সময়ে আমি নিজেই চমকে উঠি। মনে হয় টেবিলের উপর লাল মখমলের গদিতে একটি সুন্দরী নারীর দক্ষিণ হাতখানি কেটে রাখা হয়েছে।

একদিন সকালে উঠে রাজকুমারীর হাতের দিকে তাকিয়ে আমার বিস্ময়ের সীমা থাকল না। দেখলাম, হাতখানার আঙুলের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ফোঁটা-ফোঁটা তাজা রক্ত। প্রত্যেকটি আঙুলের আগা দিয়েও রক্ত বার হচ্ছে।

এমন অলৌকিক ঘটনা আমি জীবনে কখনও দেখিনি। ভয়ে আমার মন ভরে গেল। তবুও মনকে শান্ত করবার জন্যে ভাবলাম, ওই লাল, তরল ও ঘন জিনিসটা রক্ত না হতেও পারে।

কিন্তু একজন রাসায়নিক যখন তার কয়েক বিন্দুকে নানারকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে পরীক্ষা করে বললেন জিনিসটা মানুষের রক্ত ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম! তিন হাজার বছরের পুরাতন একখানি শুষ্ক কঠিন 'ম্যমি' হাত সহসা জীবন্ত হয়ে উঠল!

রক্তাক্ত হাতখানার দৃশ্য আমাকে এমন পীড়া দিতে লাগল যে রাসায়নিককে বললাম, ওই হাতখানার রক্ত পড়া কি কোন রকমে বন্ধ করতে পারেন না? ওটা কি আবার আগের মত শক্ত হতে পারে না? যে রকমেই হোক ওটাকে আগের অবস্থায় পরিণত করুন। চোখের সম্মুখে এ দৃশ্য বড় অসহ্য!'

তিনি বললেন, 'তরল গালা ও পিচের মধ্যে ডুবিয়ে দিলে হাতখানা আবার আগের মত শক্ত ও অসাড় হওয়া সম্ভব এবং ওর রক্ত পড়াও নিশ্চয় বন্ধ হয়ে যাবে। এ ছাড়া আর কোন উপায় তো আমার জানা নেই।'

আমি তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে বললাম, 'অনুগ্রহ করে এই মুহূর্তেই ওটা নিয়ে যান।'

রাসায়নিক হাতখানা নিয়ে চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে হাতখানা আমায় দিয়ে বললেন, 'দেখুন, এটা আগের মতই শক্ত ও অসাড় হয়ে গেছে, রক্ত পড়াও বন্ধ হয়েছে। কিন্তু ম্যমির হাত দিয়ে কী করে যে রক্ত পড়তে পারে, আমি তো কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না। এ ব্যাপারটা নিতান্ত অভাবনীয়।'

এই কথাটা আমিও মনে মনে ভাবছিলাম; কাজেই তাঁর প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল না। আমি রাজকুমারীর হাতখানা হাতে নিয়ে দেখি, তার কোন জায়গা দিয়েই আর রক্ত পড়ছে না।

আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হাতখানা যথাস্থানে, সেই লাল মখমলের গদির উপর রেখে দিলাম।

সারা দিন গেল; সন্ধ্যা নামে নামে। এর মধ্যে আমি এমন একটু সময় করতে পারিনি যে হাতখানার দিকে একবার মনোযোগ দিই। অবশ্য তার দরকারও ছিল না। কেননা গালা ও পিচের কঠিন ঘন আবরণের নিচে হাতখানা আগের মতই অসাড় হয়ে আছে বলে আমি নিশ্চিন্ত।

সেই সময় কাজের পাকে একবার আমার বসবার ঘরের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ হাতখানার দিকে আমার চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম।

আমার পা দুটো আপনা থেকেই গতিহীন হয়ে গেল, হৃৎপিণ্ডটা ভয়ানক দুলতে লাগল। যে হাতকে আমি অসাড় ও কঠিন ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলাম, আবার তার গ্রন্থি ও আঙুলের আগা দিয়ে পিচ

এবং গালার আবরণ ভেদ করে তাজা রক্ত বেরিয়ে আসছে ! ঘরখানা ততক্ষণে ঘনায়মান সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায় একটু কালো হয়ে উঠেছে, কোণে কোণে অন্ধকার জমা হচ্ছে। আমি অনুভব করলাম, সন্ধ্যার সেই ম্লান ছায়ায় আরও একটি ছায়া যেন কায়া মিলিয়ে বড় নিঃশব্দে ভেসে বেড়াচ্ছে।

সাহসী বলে আমার খ্যাতি ছিল। কিন্তু সেদিন অন্তত কয়েক মুহূর্তের জন্যেও আমার মন গভীর শঙ্কায় ভরে উঠল।

সৌভাগ্যবশত আমি একেবারে চেতনা হারাই নি। পরক্ষণেই আত্মসম্বরণ করে, মনে প্রচুর সাহস এনে হাতখানার কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম, আগেরও চেয়েও সেটা কোমল হয়ে এসেছে, যেন ধীরে গলে যাচ্ছে। বুঝলাম, আমার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ।

মনে পড়ল, ত্রিশ বৎসর পূর্বে নাইলের তটভূমিতে সেই স্তব্ধ জ্যোৎস্না রাতে থিবিস নগরে আমেনের জীর্ণ মন্দিরে দাঁড়িয়ে আমার বৃদ্ধ অনুচরটির কথা—'আজ থেকে ত্রিশ বৎসর পরে একদিন।'

সেই ক্ষণটি আজই এল কি ? কালসাগরের তিন হাজার বৎসরের দুস্তর ব্যবধান পার হয়ে রাজকুমারী জীবনের পরপার থেকে আজই তাঁর শুষ্ক দক্ষিণ হাতখানি নিতে এলেন ?

কিন্তু আমি হিসেব করে দেখলাম, ভবিষ্যদ্বাণী পূরণের তখনও একটি দিন বিলম্ব। এদিকে আমিও আর সময় নষ্ট করতে পারি না। নগরে তখন পূর্ণ অরাজকতা। আমার জিনিসপত্র যা ছিল সেইদিনই সব গুছিয়ে নিলাম। তবে, হাতখানার অবস্থা দেখে, সেটা আর সঙ্গে নেওয়া হবে না ভেবে স্থির করলাম, কালই আগুনে ওটাকে পুড়িয়ে ফেলব। কথাটা ভাবতেই আমার মনের কোণে একটু ব্যথা বেজে উঠল। ওই হাতখানি যে আমার জীবনের এক অংশের একটি পাশ এতকাল ধরে রেখেছিল। তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে ? কিন্তু তা ছাড়া উপায়ই বা কী ? আবার ভাবলাম ওটাকে যদি সমাধিস্থ করি ? কিন্তু তারই বা সুযোগ কোথায় !

আমি আর হাতখানার প্রতি মনোযোগ দিলাম না ; নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কিন্তু সে রাতে আবার এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

রাত তখন গভীর ; প্রায় সারা নগরী ঘুমে অচেতন। কেবল দূর থেকে মাঝে মাঝে বিদ্রোহী সৈন্যদের উন্মত্ত উল্লাস, সঙ্গীত ও দুটি একটি বন্দুকের আওয়াজ ভেসে আসছে। সেই সময় চারজন সশস্ত্র দস্যু আমার ঘরে হানা দিল। ঘরে ঢুকে প্রথমেই তাদের চোখ পড়ল রাজকুমারীর আঙুলের সোনার আংটিটির উপর।

দস্যুসর্দার তৎক্ষণাৎ রাজকুমারীর হাতখানি মখমলের গদির উপর থেকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিলে। কিন্তু পরক্ষণেই দেখলে, তার হাত রক্তাক্ত হয়ে গেছে। সে সভয়ে চিৎকার করে হাতখানা টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে ঘর থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল।

পরদিন আমার আরও জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিলাম। বাকি রইল কেবল রাজকুমারীর হাতখানি কয়েকটা কাঠের খালি বাক্স ও আমার একটা বড় পোর্টম্যান্টো।

যথারীতি দিন শেষ হয়ে নগরীর প্রাসাদ-শ্রেণীর মাথায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। আর একটু পরেই সে-অন্ধকার দূর করে উঠল চাঁদ।

আমার হাতে তখন আর কোন কাজ নেই। মন বিষণ্ণ। কাল থেকে আর এই গৃহ ও ওই হাতের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ থাকবে না।

আমি বার বার হাতখানিকে দেখতে লাগলাম। রক্তে সেখানা ভেসে যাচ্ছে। মনে হতে লাগল থিবিসের বিশাল প্রান্তরে নাইলের তীরভূমিতে রাজকুমারীর মৃতদেহটি যেন পড়ে আছে। আর, তাঁর দক্ষিণ হাতখানি সদ্য কেটে এনে ওইখানে রাখা হয়েছে।

ক্রমে রাত গভীর হতে লাগল। ঘরের চিমনিতে সন্ধ্যা থেকেই আগুন জ্বলছিল। আমি তাতে আরও কাঠ দিয়ে প্রখর ও প্রদীপ্ত করে দিলাম, যাতে রাজকুমারীর হাতখানি নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

আকাশে তখন জ্যোৎস্নার বন্যা এসেছে ; নগরীর চোখেও তন্দ্রা নেমেছে। আমার ঘরে সন্ধ্যা থেকেই কোন আলো জ্বালিনি। খোলা জানলা-পথে জ্যোৎস্না এসে শূন্য ও নিস্তব্ধ ঘরখানির মেঝেয় ঘুমিয়ে আছে। এই আলোছায়ায় আমি একা দাঁড়িয়ে।

আমার বাড়ির গেটে খিলানের উপর একটা সুগন্ধ ফুলের লতা লতিয়ে উঠেছিল। গাছটি তখন সাদা ফুলে ফুলে ভরা। জ্যোৎস্নায় সেগুলো আরও সাদা, সুন্দর ও স্বপ্নময় বলে মনে হচ্ছে। হঠাৎ আমার মন নীল সিন্ধুপারে সুদূর ইজিপ্টের দিকে ছুটে গেল। চোখের সামনে ছায়ার মত ভেসে উঠল বিশাল নাইল, তার তীরভূমিতে পামশ্রেণী, দূরে আকাশের গায়ে পিরামিড, তার উপর নির্মেঘ নীল আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ। সব যেন নির্মল জ্যোৎস্নায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

হঠাৎ দূরে গীর্জার ঘড়িতে ঢং-ঢং-শব্দে রাত্রি বারোটা বাজল। সেই শব্দে আমারও চমক ভাঙল।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দার দরজায় খিল আটকে, আমার ঘরেরও দরজাটা বেশ করে এঁটে বন্ধ করে দিলাম। ওক কাঠের ভারী দরজা ; কাপে কাপে বসে গেল।

চিমনির চুল্লিতে তখন খুব তেজে আগুন জ্বলছে। আমি সেটা আরও উসকে দিয়ে টেবিলের কাছে সরে এসে রাজকুমারীর কোমল ও রক্তাক্ত হাতখানি দুহাতে তুলে নিলাম। সেই সময় হাতখানির স্পর্শে আমার সারা শরীরের মধ্য দিয়ে কেমন একটা শিহরণ বয়ে গেল। সেইসঙ্গে মনে পড়ল, আজই রাতে রাজকুমারী হাতখানি আমার কাছ থেকে নিতে আসবেন।

আমার মন আরও বিষণ্ণ উঠল। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে হাতখানিকে প্রদীপ্ত চুল্লির ঠিক মাঝখানে ফেলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে চারধার থেকে খর জিহ্বা মেলে শত শত অগ্নি-শিখা তাকে ঘিরে ধরে দগ্ধ করতে লাগল। যে সুগন্ধি আরক মাখিয়ে হাতখানি ম্যমি করা ছিল, অগ্নিস্পর্শে তার সুন্দর বাসে ঘরখানি ভরে গেল।

আমি স্থির দৃষ্টিতে চুল্লির দিকে তাকিয়ে রইলাম। নিস্তব্ধ নির্জন ঘর। কেবল চুল্লি থেকে একটু একটু শব্দ হচ্ছে। ক্রমে হাতখানাকে নিঃশেষে জীর্ণ করে অগ্নিশিখাগুলি সাপের মত ফণা নত করে রক্তোজ্জ্বল অঙ্গাররাশির উপর দিয়ে লতিয়ে এক-এক দিকে যেন মিলিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে কেবল তপ্ত ও গাঢ় রক্তবর্ণ উজ্জ্বল অঙ্গাররাশি ছাড়া চুল্লিতে আর কিছু দেখা গেল না। আমি নিশ্বাস ফেলে চেয়ার থেকে উঠতেই বাইরের দরজায় প্রচণ্ড আঘাতের শব্দ শুনে স্থির হয়ে দাঁড়ালাম।

প্রথমে মনে হল, প্রবল বাতাস দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পারলাম। সে সময় কোথাও এতটুকু বাতাস ছিল না ; সব শান্ত ও তন্দ্রাচ্ছন্ন। বোধ হল, কে যেন বারান্দার ভারী দরজাটা প্রচণ্ড ধাক্কায় খুলে ফেললে! তারপরেই দেখলাম, আমার ঘরের অর্গলবদ্ধ দরজাটাও হঠাৎ এক ধাক্কায় সশব্দে খুলে গেল।

ভাবলাম দস্যুদল ঘরে ঢুকছে। কিন্তু তাকিয়ে দেখলাম, সেখানে জনপ্রাণী নেই, কেবল খানিকটা চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে এসে অনেকখানি জায়গা আলোকিত করে তুলল।

এই দৃশ্যে ভয়ে আমার হাত-পা অসাড় হয়ে এল। সেখান থেকে একেবারে গেট অবধি পরিষ্কার দেখা যেতে লাগল। আমার এই দৃষ্টিসীমার মধ্যে কেবল গেটের খিলানের উপর জ্যোৎস্নাঢালা পুষ্পিত লতাটি ছাড়া আর কিছু নেই।

হঠাৎ দেখলাম, সেখানে যেন স্বচ্ছ বাতাসের একটি ক্ষীণ ছায়া একটু একটু করে কায়া নিচ্ছে, যেন কোন অশরীরী ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ক্রমে সেটি সেখান থেকে আমার ঘরের বারান্দার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল এবং সেইসঙ্গে তার কায়া আরও স্থূল হয়ে উঠতে লাগল। শেষে সেটা যখন আমার ঘরের অন্ধকারে এসে পৌঁছল তখন দেখলাম, একটি সুন্দরী নারীমূর্তি। তার মাথা থেকে কটিদেশ অবধি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চলার বেগে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি একটু একটু দুলছে। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মূর্তিটি আরও এগিয়ে এল। তার উজ্জ্বল ও আয়ত চোখদুটি এবার আরও উজ্জ্বল হয়ে দুটি স্থির নক্ষত্রের মত জ্বলছে ; তাঁর সারা মুখে ও দেহ-ভঙ্গিমায় রাজকীয় ভাব পরিস্ফুট। আমার বোধ হতে লাগল, আমি যেন তিন হাজার বৎসর আগে ইজিপ্টের এক রাজকুমারীর সম্মুখে অতি সম্ভ্রমভরে দাঁড়িয়ে আছি।

রাজকুমারী ঘরখানা পার হয়ে আমার পাশ দিয়ে চুল্লিটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। এবার দেখলাম, তাঁর মাথায় উজ্জ্বল সোনার মুকুট চুলের উপর দিয়ে কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে, তার মধ্যখানে কপালে একটি উদ্যত-ফণা সোনার সাপ, আর তাঁর কটিদেশ ঘিরে উজ্জ্বল রত্নাভরণ ঝলমল

করছে।

রাজকুমারী মরাল গতিতে চুল্লির কাছে গিয়ে নত হয়ে সেই উজ্জ্বল অঙ্গাররাশির মধ্য থেকে কি যেন দুহাতে তুলে নিলেন। তারপরই আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ, চোখদুটি ও দেহখানি যেন পরম উল্লাসে দুলে উঠল। তাঁর সে উজ্জ্বল দৃষ্টি, সেই চোখদুটি আজও আমার চিত্তাকাশে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সেই সময়ে তাঁর ক্ষীণ অধরদুটি কি যেন বলতে গিয়ে একবার মৃদু কম্পিত হল। সে কথা আমার কানে পৌঁছল না বটে, কিন্তু তার মর্ম আমার অন্তর স্পর্শ করলে। বুঝলাম তিনি এই হতভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন ; আমারও মাথা আপনা হতেই সম্ভ্রমে নত হয়ে এল।

তারপর রাজকুমারী হাত দুখানি ধীরে লীলায়িত ভঙ্গিতে তাঁর মাথার উপর তুলে আমার দিকে অতি ধীরে মাথা নুইয়ে আবার গর্বিতভাবে সোজা হয়ে উঠে একটু একটু করে দরজার দিকে পিছিয়ে যেতে লাগলেন।

আমিও যন্ত্রচালিতের মত ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গে চললাম।

ক্রমে সেই ছায়ামূর্তি ঘর থেকে বার হয়ে বারান্দা দিয়ে খোলা চাঁদের আলোয় ফুলের মৃদুগন্ধ-ভরা শান্ত বাতাসে ভাসতে ভাসতে খিলানের কাছে পৌঁছল। এই সময়ের মধ্যে তাঁর দেহ একটু ক্ষীণ হয়ে এসেছিল ; তখন আরও ক্ষীণ হয়ে ধীরে বাতাসে মিলিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু চোখদুটি তখনও তেমনি উজ্জ্বল।

ক্রমে তাঁর সারা দেহ অদৃশ্যলোকে লীন হয়ে গেল, বাতাসে ভেসে রইল কেবল নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল চোখ দুটি। শেষে সে-দুটিও ম্লান হয়ে রাতের আকাশে মিলিয়ে গেল, আমার চোখের সামনে ফুটে রইল কেবল সাদা স্বপ্নালস ফুলগুলি, আর মনের মধ্যে সেই জ্যোৎস্না রাতের বিচিত্র স্মৃতিখানি।
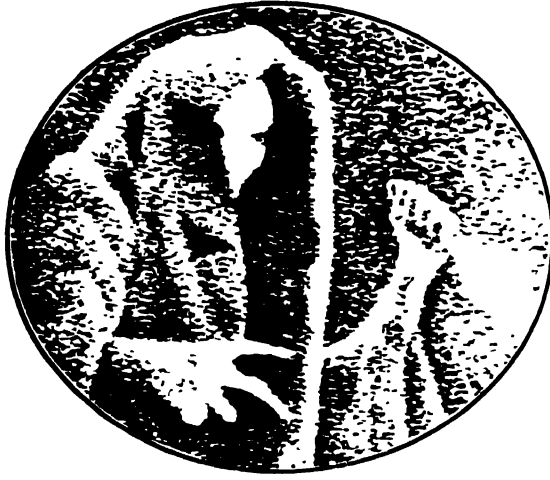
ভুলোর ছলনা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভুলো কে জানো ? ভুলো মানুষ নয়। ভুলো কুকুরও নয়। ভুলো মানে ভ্রান্তি—যা ভোলায় : মিথ্যে ভুলে ভোলায়। আমাদের দেশে বলে—ভুলো হল একরকম ভূত। ব্রহ্মদৈত্য, মামদো, শাঁখচুন্নী, গোদানা, গলায়-দড়ের মত এও এক রকমের ভূত ! নিশির নাম অনেকে জানে—ভুলো অনেকটা নিশির মত। কিন্তু নিশি ডাকে ভোরবেলা কি মাঝরাত্রে, ভুলোর খেলা সব সময়েই। তবে ঠিক সন্ধ্যার পর থেকে একটু অন্ধকার হলে ভুলোর খেলা জমে ভাল। নিশি, ভূত বা প্রেতিনীর সঙ্গে মিল এর অনেকটা। তফাত—নিশি ডাকে ঘুমের মধ্যে আর ভুলোর খেলা জাগ্রত মানুষের সঙ্গে।

হয়তো কেউ সন্ধেবেলা যাচ্ছে মাঠের মধ্যে দিয়ে রাস্তা ধরে, ভাবছে কোন বন্ধুর কথা কি আপন জনের কথা, হঠাৎ একসময় সে বন্ধু তার সামনে এসে দাঁড়াল, বলল—এই যে রে !

সে বললে—তুই ? আরে তোর কথাই ভাবছিলাম যে !

—হ্যাঁ রে, তাই তো এলাম। এখন আয়, আমার সঙ্গে আয়।

মানুষটার মনেও হবে না যে বন্ধু হঠাৎ কোত্থেকে এল। হয়তো তখন আসল বন্ধু দশ বিশ মাইল কি একশো মাইল দূরে রয়েছে, সে কথা লোকটি জানে, তবুও তার মনে সেই প্রশ্নই জাগবে না। ভুলোর মায়া। সে বিগলিত হয়ে যাবে তাকে দেখে ; এবং মুহূর্তে মন্ত্রমুগ্ধের মত তার পিছনে পিছনে চলবে। ভুলো চলবে পথ ছেড়ে অপথে বিপথে, খানাখন্দ কাঁটা খোঁচা ভরা জায়গার উপর দিয়ে, মায়ায় ভোলা মানুষটার মনে সে কথা উঠবে না, জিজ্ঞাসাও করবে না যে এদিক দিয়ে কোথায় চলছিস ভাই। মনে তখন ঘোর লেগেছে তার, সে চলবে মুখ বন্ধ করে।

তারপর ? তারপর মানুষটার দেহ হয়তো পাওয়া যাবে কোন খানাখন্দের মধ্যে ; নয়তো কোন নদীর দহে। নয়তো কোন উঁচু জায়গার নিচে একটা পাথরে মাথা ছেঁচে পড়ে থাকবে।

লোকটা ভুলো-ভূতের সঙ্গী হয়ে গেল এরপর থেকে।

তার বাসা হল যে জায়গায় সে মরেছে সেই জায়গায় আর ভুলো ফিরে গেল আপন জায়গায়।

রাত্রে দুজনে মাঠের মধ্যে খুঁজে বেড়াতে লাগল আর কাকে সঙ্গী করা যায়। আর না হয় তো রাত্রে মাঠের মধ্যে নাচতে গাইতে লাগল—

হায় কি মজা হায় রে—
ভুলের খেলা মজার খেলা খেলবি যদি আয় রে।
ফুস মন্তর ভুল ভুলিয়া—যাবি রে সব দুখ ভুলিয়া—

এমনি ধরনের গান। গানটা অবশ্য আমি আন্দাজ করে লিখলাম। কারণ কী গান যে তারা গায় সে আমি কানে তো শুনি নি। তবে হ্যাঁ, ভুলো-ভূতে লোককে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এ আমি দেখেছি। আরে বাপ্‌, সে কী কাণ্ড! ভুলোয় ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—একশো লোক ভুলোলাগা লোকটাকে ধরবার জন্যে ছুটেছে; কিন্তু তাকে কিছুতে ধরতে পারছে না! ভুলো দেখছে লোকে দেখেছে তার কাণ্ড, ছুটে আসছে ওকে ধরে জোর করে আটকাবার জন্যে, লোকটা সোজা ছুটলে ধরে ফেলবে, সুতরাং ভুলো ভূত তখন এঁকেবেঁকে ছুটতে লাগল—সোজা চলছে, হঠাৎ ডাইনে বেঁকল, তারপর আবার বাঁয়ে, তারপর আবার বাঁয়ে— তারপর বাঁয়ে, কখনও বা একেবারে উলটো মুখে; আর তার পিছনে ভুলোলাগা মানুষটা ঠিক সেই পথে তেমনি করে এঁকেবেঁকে ছুটতে লাগল। ফলে যারা পিছন থেকে ধরতে আসছে তারা কিছুতেই তাকে ধরতে পারছে না। অবশেষে ভুলো-ভূত একটা গাছে মিলিয়ে গেল -কি সামনে নদী পড়ল তো তার মধ্যে ডুবল। পিছনের ভুলোলাগা লোকটাও গাছে ধাক্কা খেয়ে মরল, নয়তো নদীতেই ভুলোর সঙ্গে ডুবল।

কখনও কখনও লোকে ধরে ফেলে, কিন্তু তাতেও বিপদ, লোকটা তখন সব ভুলে গেছে। মা-বাপ স্ত্রী সব। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এ আমি চোখে দেখেছি। ভুলোলাগা লোকটাকে বহুকষ্টে ধরেছি। তারই কথা বলছি তোমাদের।

একেবারে হুবহু সত্য, আগাগোড়া। বানানো নয়। সেইজন্যে এ কাহিনীব মধ্যে যে 'আমি' বলে লিখছে সে আমিই -- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাড়ি লাভপুর।

ঘটনাটা অনেক দিনের। বলি শোন।

ইংরেজী ১৯২৯ সাল। আমি তখন লাভপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। সেকালে ইউনিয়ন বোর্ড ছিল; এখন উঠে গিয়ে পঞ্চায়েত হয়েছে।

পাঁচ-সাত কি ন'দশ খানা গ্রাম নিয়ে ইউনিয়ন বোর্ড। লোকের উপর ট্যাক্স কবে, সেই ট্যাক্স আদায় করে চৌকিদারদের মাইনে দেয় আর যা বাড়তি থাকে তা থেকে করে কিছু গ্রাম্য রাস্তা-ঘাট, কিছু পানীয় জলের জন্যে কুয়ো। আর দেশে তখন প্রচণ্ড ম্যালেরিয়া—তার জন্যে সরকারের কাছ থেকে পাওনা সিনকোনা ট্যাবলেট বিতরণ করে। ডোবায় কেরোসিন দেয় মশার ডিম মারবার জন্যে।

তখন আমি সাহিত্যিক নই। তখন দেশের কাজ করি, কংগ্রেস করি, বাসনা দেশেব সেবা কবব। দেশ স্বাধীন করব। তার সুবিধের জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হয়েছি। কিছু কাজ তো করা যায় এ থেকে! আমার বয়স তখন একত্রিশ বছর। রাস্তাঘাট করাই; তার সঙ্গে এই ম্যালেরিয়া নিবারণের কাজটা নিয়েছি। মশা মারতে হবে। অ্যানোফিলিস মশা দূর হলেই ম্যালেরিয়া যাবে। কারণ মাছি যেমন কলেরার বীজ ছড়িয়ে বেড়ায় তেমনি অ্যানোফিলিস-ই ম্যালেরিয়ার বিষ ঢুকিয়ে দেয় মানুষের দেহের রক্তে।

সে সময় গুরুসদয় দত্ত ছিলেন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট। মশা মারবার জন্যে তিনি একটা নতুন সহজ পন্থা আবিষ্কার করেছেন তখন।

আগে জঙ্গল সাফ করে, ডোবায় কেরোসিন দিয়ে মশা মারবার উপায় আমাদের জানা ছিল। কিন্তু সে প্রায় কামান দেগে মশা মারার মত ব্যাপার। গ্রাম অঞ্চলে কত জঙ্গল পরিষ্কার করবে। কত খানা ডোবায় কেরোসিন দেবে। সে খরচের টাকা কোথায়?

দত্ত সাহেব পথ বের করেছেন—সহজ পথ, কামান না, বন্দুক না, লাঠি না। মশাও তোমাকে মারতে হবে না; তুমি টোপা 'ঢুঁরুলি' বা পানা নির্মুল করে ফেল, তাহলে অ্যানোসিলিস ঝাঁকবন্দী থাকলেও ওদের কামড়ে ম্যালেরিয়া হবে না। ওই টোপা পানার রস খেয়েই অ্যানোফিলিস মশার ভিতর ম্যালেরিয়া জন্মায়, তখন সে কামড়ালে ম্যালেরিয়া হয়।

ধর, মাতালের উপদ্রব হয়েছে ! মাতালেরা দাঙ্গা করছে। নিত্য চেঁচামেচি করছে, গালাগাল করছে মাতাল অনেক। সুতরাং মাতাল তুমি কত ধরবে কত বাঁধবে ? তার থেকে তুমি যদি মদের দোকানই তুলে দাও, তবে মাতাল আর কেউ হবে না। লোকগুলো তো আর মদ না খেলে মাতলামি করতে পারবে না !

মদের দোকান তোলা যায় না। কিন্তু মশার বিষ শেষ কবতে টোপা ভুঁরুলি বা পানা নিশ্চয় শেষ করা যায়। খরচও এতে অনেক কম। সুতরাং ইউনিয়ন বোর্ডে বোর্ডে হুকুম এল—টোপাপানা বা ভুঁরুলি তুলে ফেল।

দত্ত সাহেব নিজে উৎসাহী হয়ে দলবল জুটিয়ে পুকুরের ডোবায় নেমে টোপাপানা পরিষ্কার করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে কাজ শুরু করেছিলেন। টোপাপানা তুলে তার চারপাশে খড়কুটো দিয়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিতেন। তার চারপাশে তাঁর দলের লোকেরা ঘুরত এবং গান করত—

মশার মাসী, সর্বনাশী ; আয় দোব তোর গলায় ফাঁসি—

ছিঁড়ব রে তোর ঘেরাটোপ—পোড়াব তোর দাঁড়ি গোঁফ।

আরও বড় গান। সব ঠিক মনে নেই। যাই হোক, টোপাপানা মশাদের দাঁড়িগোঁফওয়ালা মাসী—সেই সর্বনাশী মাসীকে নির্মূলের ব্যবস্থা করা ছিল তখন ইউনিয়ন বোর্ডের কাজ।

প্রথম একদফা অনেক লোক লাগিয়ে গ্রামের যে সব পুকুরে টোপাপানা ছিল—তা সব তুলে দিয়ে পুড়িয়ে ব্যবস্থা করা হল যে নিয়মিত ভাবে দুজন করে লোক কাজ করবে প্রতি গ্রামে যাদের কাজ হবে পুকুরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখা আর একটা দুটো যেমন দেখা যাবে অমনি তুলে ফেলা।

লাভপুরের এই কাজের জন্যে দুজন বাউড়ী জোয়ানকে রাখা হয়েছিল। নিতাই এবং পাঁড়ে। নিতাইয়ের নাম তোমাদের শোনা নাম কিন্তু পাঁড়ের নাম 'পাঁড়ে' অর্থাৎ পাণ্ডে কেন তার অর্থ বলব কি আমিও ঠিক জানি না। পাঁড়ে বাউড়ী। অর্থাৎ দস্তুর মত নাম। পাঁড়ে আজ বেঁচে নেই কিন্তু নিতো আজো আছে। বুড়ো হয়েছে। এরা দুজনে ছিল বন্ধু। খুব কড়া খাটুনি তারা খাটতে নারাজ ছিল ; চাষ করত না, কারুর ঘরে 'মান্দেরি'ও করত না। হালকা কাজ খুঁজে বেড়াত। এবং তার জন্যে মজুরি তারা কম হলেও আপত্তি করত না। এই গ্রাম ঘুরে এখানে ওখানে ভুঁরুলি বা টোপাখানা খুঁজে তুলে ফেলার কাজটা তারা খুশি হয়ে নিয়েছিল। সকালে উঠে—তামাক টামাক খেয়ে দুজনে বের হত ; বিড়ি টানত এবং ভুঁরুলি দেখলে তুলে ফেলে গাছতলায় জিরিয়ে নিত, গান গাইত। খাবার বেলা অর্থাৎ বারোটা বাজতে বাজতে চক্কর দেওয়া শেষ করে দেখাবার জন্যে কিছু ভুঁরুলি গামছায় বেঁধে নিয়ে বাড়ি ফিরত। জল খেয়ে বটতলার ছায়ায় ঘুম এবং আড্ডা। বিকেলে চারটের পর স্নান করে টেড়ি কেটে কিছু মদ খেয়ে আসত ইউনিয়ন বোর্ড আপিসে। ভুঁরুলিগুলো দেখিয়ে ফেলে দিত গর্তে, মাটি চাপা দিত—তারপর ইউনিয়ন বোর্ডের খাতায় বুড়ো আঙুলের ছাপ দিয়ে প্রত্যেকে ছ-আনা পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে মদের দোকানে গিয়ে আনা দুই-তিনের পচাই মদ খেয়ে টলতে টলতে বাড়ি ফিরত। আমি তখন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসে থাকতাম। পয়সাকড়ি দিয়ে সকলকে বিদায় করে আমিও ফিরতাম বাড়ি। বন্ধুরা বসে আছেন তখন আসর জমিয়ে, তাস খেলছেন।

এরই মধ্যে একদিন—১৯২৯ সালের শ্রাবণ মাসের শেষ। তার আগে একটা কথা বলার দরকার। সেটা এই যে, বাঙলা দেশে ১৯২৯ সালে খুব ভাল বর্ষা হয়েছিল ; শ্রাবণের তৃতীয় সপ্তাহ আসতে আসতে শেষ হয়ে গেছে। মাঠ সবুজ ধানে ভরে উঠেছে। আষাঢ়ে পোঁতা জমিতে ধান বেশ বড় হয়েছে ; তা প্রায় উঁচুতে হাঁটুর সমান এবং ঝাড়ে-গোছেও বেশ মোটা হয়েছে। পুকুর ডোবা নালা নদী জলে টইটুম্বুর। আমাদের গ্রামের গায়ে দক্ষিণে পূর্বে-পশ্চিমে লম্বা রেললাইন, তার দক্ষিণে মাইলখানেক বিস্তৃত ধানের ক্ষেতের ওপারে কুয়ে নদী। কুয়ে তখন ভরাভর্তি।

সেদিন বিকেলে সাড়ে চারটের সময় বোর্ডে গেলাম। দেখলাম নিতো বা নিতাই এসে বসে আছে—পাঁড়ে আসেনি। নিতোকে বলেছে—তু চল এগিয়ে, আমি যাচ্ছি ! তু কিন্তুক আগে ভাগে নিয়ে যেন চলে আসিস না। দুজনে পয়সা নিয়ে মদের দোকানে ফিরব।

সাড়ে চারটা থেকে পাঁচটা, পাঁচটা থেকে ছটা পর্যন্ত আমরা অর্থাৎ সেক্রেটারি এবং আমি বোর্ডের কাজকর্ম সারলাম—অপেক্ষা কেবল পাঁড়ের, সে এলে নিতোর এবং তার টিপ নিয়ে পয়সা দিয়ে বাড়ি

ফিরব।

ছ-টার সময় বললাম—কই রে, পাঁড়ে এল কই!

নিতো মদ খানিকটা খেয়েছিল—তার ঝোঁকে এবং চুপচাপ বসে থাকায় ঝিমুনিতে সে মধ্যে মধ্যে ঢুলছিল। আমার কথায় সজাগ হয়ে উঠে চোখ কচলে বললে--তাই তো মশায়, কই এল। সে নিশ্চয় আসবে বলেছে।

খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল সে।—তাই তো!

কিন্তু আমরা বসে থাকি কত? সন্ধে হয়ে আসছে। সেক্রেটারি বাড়ি যাবার জন্যে উসখুস করছে, আমার মনও টানছে তাসের আড্ডায়। তবুও আরও মিনিট দশেক বসে থেকে বললাম—তাহলে টিপ ছাপ দিয়ে তোর পয়সা নিয়ে যা। পাঁড়ের পয়সা বাকি রইল, কাল নেবে।

তাই নিয়েই সে যেন চিন্তিত মনে উঠে গেল। বিড়বিড় করতে করতে গেল—শালার কাজ দেখ দিকি। শালা বদমাশ কোথাকার!

কথাটা আমার কানে এল। আমরা বোর্ড থেকে বেরিয়ে এলাম, দেখলাম নিতো পশ্চিম মুখে চলেছে। যাবার কথা তার পুব মুখে। বুঝলাম, পশ্চিম মুখে একটু এগিয়ে গিয়ে সে রেললাইন ধরবে। পুব মুখে ফিরে সোজা এসে উঠবে তাদের পাড়ায়। তাদের পাড়াটা আমার বাড়ির দক্ষিণ-পূর্বে, একেবারে লাগাও। স্টেশনের গায়ে।

বাড়ি ফিরলাম— তখন অন্ধকার হয়েছে। আমার বৈঠকখানায় তখন আলো জেলে তাসুড়ে বন্ধুরা বসে গেছেন। আমিও পাশে বসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই থ্রি হার্টস, থ্রি নো-ট্রামসের ডাকের নেশা জমে উঠল।

হঠাৎ নেশাটা যেন একটা ঠোক্কর খেয়ে ভেঙে গেল। ঠিক দক্ষিণ দিকে একটা গোলমাল উঠল।

—গোলমাল? কিসের গোলমাল। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে আগুনের ভয় থাকে কিন্তু এটা বর্ষাকাল এবং সেবারকার মত ভরাভর্তি জমজমাট বর্ষাকাল। আগুন লাগার তো কথা নয়। কান বাজিয়ে শুনলাম।

বহু লোকের একটা আক্ষেপ এবং শঙ্কাপূর্ণ একটা 'গেল রে—গেল রে' শব্দ!

ঠাওর করতে পারল না—কী গেল! গেল বা যাচ্ছে—যেন টেনে ছিড়ে কিছু চলে যাচ্ছে বা কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে!

কোলাহলটা নিকটে—ওই রেললাইনের ধারে। আমার বৈঠকখানা থেকে ধীরে সুস্থে পাঁচ-ছ মিনিটের পথ। দৌড়ে গেলে তিন-চার মিনিট লাগে।

আমরা কেউ বসে থাকতে পারলাম না ওই গেল গেল শব্দ শুনে। সকলে ছুটেই বেরিয়ে এলাম। এবং মিনিট দুয়ের মধ্যে গ্রামপ্রান্তে এসে নজরে পড়ল রেললাইনেব উপরে অনেক লোক। তারা দাঁড়িয়ে ওই 'গেল রে—গেল রে' বলে একরকম হাহাকারই করছে। লাইনের ওপারে মাঠে দেখলাম গোটা দুই লণ্ঠনের আলো যেন ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। একবার এদিক একবার ওদিক, কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে! আলেয়ার মত।

লাইনে এসে উঠে দেখলাম বাউড়ীপাড়ার মেয়েপুরুষেরা সারিবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে ওই হায় হায় করছে। কতকগুলি পুরুষ চেঁচাচ্ছে—গেল রে। গেল রে। ওই রে!—কতকগুলি ভদ্রলোকও তখন এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা বলছেন—ওই! ওই! না?

—কী হয়েছে?—জিজ্ঞাসা করলাম সামনে যাকে পেলাম।

সে আমাকে চিনে কেঁদে উঠে বললে—ও গো বাবু গো, নিতোকে ভুলোতে নিয়ে গেল গো। নিতোকে ভুলোতে নিয়ে গেল।

ভুলোতে নিয়ে গেল—কথাটা চট করে বুঝিনি। বললাম, নিতোকে ভুলোয় নিয়ে গেল কি?

সে বললে—হ্যাঁ বাবু, ওই দেখ মাঠে মাঠে ছুটছে গো, আর চেঁচাচ্ছে--দাঁড়া রে দাঁড়া রে—পাঁড়ে রে দাঁড়া রে!

বিরক্ত হয়ে বললাম—মানে কী?

—ও গো ভুলো ভূত, পাঁড়ে সেজে এসে ওই দেখ মাঠে মাঠে ওকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে, কেউ

ধরতে পারছে না। নিয়ে গিয়ে নদীতে ডুবিয়ে মারবে গো ; ছামুতে নদী দুকুল পাথার আঃ আঃ ভরা জোয়ান গো– আঃ আঃ।

––পাঁড়ে কোথায় ?

– সি ওই দেখ, ওইখানে রইচে গো। ভয়ে ডবে সিও কাঁপছে। নিতো মলে সে যে ওকে লেবে গো।

অর্ধেক বুঝলাম, অর্ধেক বুঝলাম না ! তবু মাঠে নেমে পড়লাম। আমার সঙ্গে জন দুই সঙ্গী সামনে ওই বিস্তীর্ণ এক মাইল স্কোয়ার জলে টইটুম্বুর ধানভরা ক্ষেতের মধ্যে। প্রায় দুশো গজ দূরে তখন আলোগুলো ইতস্তত ছুটোছুটি করছে- এদিক ওদিক সেদিক কখনও সোজা কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে। জল ও ধান-ভরতি জমির আলের উপর দিয়ে আলো হাতে যেতে গেলে এমনিই হবে। আর এতক্ষণ অন্ধকারে থেকে অন্ধকার অভ্যস্ত চোখে দেখলাম কালো কালো মানুষ অন্তত ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির অন্ধকারে প্রেতযোনির মত ছুটোছুটি করছে। এবং তার খানিকটা আগে চিৎকার হচ্ছে, তারস্বরে আর্তকণ্ঠে ব্যাকুল হয়ে কেউ প্রাণ ফাটিয়ে ডাকছে দাঁ ডা রে, দাঁ ড়া রে - পাঁ ড়ে-রে, দাঁড়া রে, ও রে দাঁড়া রে !

কণ্ঠস্বর নিতোর তা চিনতাম। কিন্তু কাকে বলছে ? পাঁড়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে কাঁপছে ভয়ে। কিন্তু নিতো যাকে ডাকছে সে যে তার সামনে তাতে তো সন্দেহ নেই। সে যেন নিতোর চেয়েও জোরে ছুটে চলেছে সামনে এঁকে বেঁকে -কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে কখনও সোজা। যেন সে হাওয়ায় উড়ছে। নিতো দুই হাত বাড়িয়ে তাকে ধরবার জন্যে ছুটছে ছুটছে। যেন সে হারিয়ে যাবে, যেন সে পালিয়ে যাবে। নিতো আর তার কখনও নাগাল পাবে না।

পিছনের লোকেরা বহু জনে একসঙ্গে ডাকছে, নিতো ! নিতো থাম থাম ! কিন্তু নিতো বধির হয়ে গেছে। সে শুনতে পাচ্ছে না। তার ভ্রূক্ষেপ নেই, সে যেন সমস্ত পিছনটা চিরদিনের মত ফেলে চলে যাচ্ছে।

কে যেন টর্চ ফেললে। টর্চের আলোটা নিতোর চিৎকার লক্ষ্য করে ছুটে গিয়ে পড়ল, দেখলাম দু হাত বাড়িয়ে নিতো ছুটছে ; আশ্চর্য সে হাত বাড়ানো। এবং আশ্চর্য সে তার ছোটা। ঊর্ধ্বশ্বাসেই শুধু নয়, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যের মত ছুটছে। জল এবং ধান ভরা মাঠ ভেঙে ছুটছে। কখনও বাঁয়ে কখনও ডাইনে কখনও সোজা। কখনও কখনও পড়ছে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠে আবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে। একবার দাঁড়ায় না। আরও আশ্চর্য এই যে, পিছনের অনুসরণকারীরা যখন কাছে এসে পড়ছে তখন হঠাৎ আরেক দিকে বেঁকে সে ছুটে যাচ্ছে মাঠের মধ্যে দিয়ে জল ভেঙে কাদা ভেঙে। অনুসরণকারীরাও প্রাণপণে ছুটছে—কিন্তু জলে ধানের মধ্যে নামতে পারছে না তারা। তারা আইলে আইলে ছুটছে। ঘুর হচ্ছে। ততক্ষণে নিতো আরও এগিয়ে যাচ্ছে। পিছনের আলোর ছটার প্রতিও তার দৃষ্টি ফিরছে না। মানুষটা যেন উন্মাদ, মানুষটা যেন দানবের মত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে -প্রাণের ব্যাকুলতায় ব্যগ্রতায় ব্যগ্রতায়।

—পাঁ-ড়ে-রে—পাঁ-ড়ে-রে—দাঁ-ড়া রে—দাঁড়া রে !

চলছে কিন্তু ঠিক পুব-দক্ষিণ মুখে। নদীর দহের দিকে। রেললাইন সোজা পূর্বমুখে এসে একটা বাঁকে দক্ষিণমুখে মোড় নিয়ে নদীর উপর ব্রিজ বেঁধে পার হয়ে চলে গেছে। তার পাশেই প্রকাণ্ড দহ সেই মুখে চলেছে।

মুহূর্তে মুহূর্তে দূরে চলে যাচ্ছে—নিতোর সামনে ভুলো পাঁড়ের চেহারা ধরে হাওয়ায় ভর দিয়ে ডেকে নিয়ে চলেছে। আয়—আয়—আয়।

আমরা কেউ দেখতে পাই বা না পাই, নিতো তাকে দেখছে। ওই চলছে নিতো—ওই—ওই !

আলোগুলো কাছে গেল। এইবার ওকে ধরবে।

কিন্তু মুহূর্তে নিতোর কণ্ঠ উলটোমুখী হয়ে ছুটে চলল –। যাঃ—আলো অনেক পিছনে পড়ে গেল দেখতে দেখতে। নিতো ছুটেছে পুলের দিকে। পুলের ওপাশে দহ। আর পুলের মুখটা বড় বড় পাথর দিয়ে ঢেকে তারের জাল দিয়ে বেঁধে অন্তত দোতলা বাড়ির সমান উঁচু এবং লাইনের মুখটা লোহার স্পাইক দিয়ে মানুষ জন্তু জানোয়ারের পক্ষে অনধিগম্য করে রেখেছে। যেন কেউ লাইন ধরে ব্রিজের উপর দিয়ে নদী পার না হতে পারে।

দহে পড়লেও মরবে নিতো ডুবে। পুলে উঠলে হয় জালে পা বেঁধে পাথরে আছাড় খেয়ে পড়ে মরবে। নয় উপরে উঠে ওই স্পাইকে গেঁথে যাবে।

নিয়ে গেল নিয়ে গেল—ভুলো তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

তখন আমি রেললাইনের দক্ষিণে প্রায় সিকি মাইল মাঠ ভেঙে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় দাঁড়িয়ে। এবং নিতো তখন আরও সিকি মাইলের বেশি দক্ষিণে নদীর দিকে ক্রমশ ঢালু এবং জলা ধানভরা ক্ষেতের মধ্যে উন্মাদের মত ছুটোছুটি করে মিনিটে মিনিটে আরও দক্ষিণে নদীর কিনারার দিকে চলেছে।

শুনতে পাচ্ছি,—দাঁড়া রে—দাঁড়া রে—দাঁড়া রে।

ক্রমশ কণ্ঠস্বর দূরবর্তী হচ্ছে। এরপর নদীগর্ভে, নয়তো ওই ব্রিজের মুখে দোতলা সমান উঁচু বাঁধে উঠে আছড়ে পড়বে। ওই ভুলো-- সে তাকে নৃশংসভাবে ডুবিয়ে অথবা পাথরে আছড়ে মেরে নিঃশব্দে হাসবে!

মনে পড়ছিল এখানকার গল্প। চলিত গল্প এই যে, বহুকাল পূর্বে এই মাঠে একজন পাষণ্ড বন্ধুর ছদ্মবেশে একজনকে ভুলিয়ে নিয়ে এসে মাঠের মধ্যে হত্যা করেছিল। তখন থেকে সেই খুন হওয়া মানুষটি এখানে ভুলো-ভূত হয়ে আছে। সুযোগ পেলেই আত্মীয় বা বন্ধুর বেশ ধরে অন্যমনস্ক মানুষকে এমনি ভাবে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলতে চেষ্টা করে। মনে পড়ল আমাদের গ্রামের সুধীরবাবুকে ঠিক এমনি সন্ধেবেলা তাঁর দাদা সেজে এসে ডেকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অন্য মানুষের চোখে পড়েছিল—তাই রক্ষা পেয়েছিলেন ; তারা তাঁকে ধরে ফেলেছিল। তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। তারপর অবশ্য জ্ঞান হয়ে সুস্থ মানুষ হয়েছিলেন। কিন্তু কেউ না দেখলে হয়তো তাঁরও বিপদ ঘটত।

আরও অনেক ঘটনা। ঠিক ওই রেললাইনে একটা মাইলপোস্ট যেখানে পোঁতা আছে ওইখানেই নাকি এই ভুলোর আত্মা ঘুরে বেড়ায়। ওইখানেই নাকি তাকে মেরেছিল বিশ্বাসঘাতকতা করে।

ভাবছি—এমন সময় একজনকে পেলাম। সে শশী ডোম। আমাদের ওখানকার বিখ্যাত চোর। লম্বা ছিপছিপে মানুষ। শশী চুরির জন্যে জেল খেটেছে অনেকবার কিন্তু কেউ কখনও তাকে ধরতে পারেনি। তিন হাত সামনে থেকে ছুটলে মিনিটে তিন হাত ব্যবধান সাত হাত হয়ে যায় এবং পাঁচ মিনিটে সেটা বেড়ে পঁচিশ হাত এবং তারপরই সে মিলিয়ে যায়। এমন তার গতিবেগ। এমন সে দৌড়ুতে পারে।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তাটা রেললাইনের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে চলে গেছে এবং নদীর ব্রিজের ঠিক মুখটায় একটা অন্যটাকে কেটে চলে গেছে। মনে হল, শশী যদি সেই দৌড় দৌড়ে যায় তাহলে নিতোর আগেই হয়তো ব্রিজের মুখটা আগলাতে পারে। নিতোকে যদি ভুলো নদীতে নিয়ে গিয়ে ফেলে তবে হাত নেই, কিন্তু যদি ব্রিজের বাঁধে তুলে পাথরে আছড়াতে চায় তবে হয়তো শশী তাকে রক্ষা করতে পারবে। নিতোকে ধরে ফেলতে পারবে।

শশীকে বললাম– শশী একবার চেষ্টা করতে পারিস। তুই একবার সেই দৌড় দে না বাবা। গিয়ে দাঁড়া ব্রিজের উপর।

শশী বললে—যদি নদীতে যায়—

বললাম—তা হলে হাত নেই। তবু দেখ!

শশী ছুটল এবং শ্রাবণ মাসের মেঘাচ্ছন্ন কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির মধ্যে মিনিট দু তিনের মধ্যে মিলিয়ে গেল। ছুটবার সময় শশীর হাঁটুতে মটমট শব্দ হত। সে শব্দটাও শুনতে পেলাম না।

পিছন পিছন আমি এবং আরও দু-তিন জন ছুটলাম। তখন আমার ফুটবল খেলা অভ্যেস ছিল। দৌড়ুতে আমিও পারতাম। বয়সও তখন তিরিশ-একত্রিশ।

ওদিকে মাঠের মধ্যে শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রিতে জলো মাঠের মধ্যে কয়েকটা আলো ছুটোছুটি করছে, দিশাহারার মত ছুটছে, কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে কখনও সোজা ; আর তার সামনে এক বুক ফাটানো ডাক—দাঁড়া রে! দাঁড়া রে! দাঁড়া রে! পাঁড়ে রে!

সম্মুখে তার ছুটেছে পাঁড়ের ছদ্মবেশী প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রেত ভুলো-ভূত। তাকে আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না, দেখছে শুধু ওই ভুলোর ছলনায় মোহগ্রস্ত নিতো। দু হাত বাড়িয়ে সে

ছুটছে—তাকে ধরবে, তাকে ধরবে ! 'পাঁড়ে ভাই !' তার কাছে স্থান বিলুপ্ত কাল বিলুপ্ত সব বিলুপ্ত। এতগুলো আলো সে দেখতে পাচ্ছে না। এত ডাক সে শুনতে পাচ্ছে না। পায়ের তলায় কাঁটা বিঁধছে, সে বুঝতে পারছে না। ভুলো ছলনায় তাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছে। সে হাঁফাচ্ছে, হৃৎপিণ্ড ফেটে পড়তে চাইছে, স্থির চোখদুটো হয়তো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে—তবু তার থামবার উপায় নেই। মুহূর্তে মুহূর্তে তার বন্ধুকে ধরবার ব্যগ্রতা উদ্দাম থেকে উদ্দামতর হয়ে উঠছে। পরম বন্ধুর ছদ্মবেশী প্রেত নিঃশব্দ হাসি হেসে বলছে—আয় আয় আয় ! ওই নদীতে পাথারে ঝাঁপ খাব দুজনে। কিংবা আয় না ওই পুলের বাঁধের উপর দুজনে জাপটাজাপটি করে পড়ব পাথরের উপর। তারপর দুজনে বসে—হি—হি কত মজা করব।

ছুটছিলাম আর ভাবছিলাম। পাকা রাস্তাটা রেললাইনের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম দিকে বেঁকল পুব মুখ থেকে দক্ষিণ মুখে, সামনে দেড় শ' গজ দূরে লাইন আর রাস্তা একসঙ্গে মিশেছে। এরপর রাস্তাটা চলে গেছে রেললাইন ক্রস করে পুব দিকে। যদি ওইখানে শশী গিয়ে

ভাবনাটা সম্পূর্ণ হল না। অন্ধকার চিরে শশীর ডাক শুনলাম, ধ রে ছি।

ধরেছে ! শশী ধরেছে ! আঃ !—আমরা আরও জোরে ছুটলাম। গিয়ে দেখলাম মানুষের কাছে ভুলো হয় হেরেছে নয় নিতোকে নিয়ে খানিকটা নিষ্ঠুর আমোদ করে বা এতগুলা মানুষের ব্যগ্রতা দেখে নদীতে না ডুবিয়ে ওই পুলের বাঁধের উপর তুলে শশীর হাতে তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

আমরা যেতে যেতে যে আলোগুলো নিতোর পিছনে এতক্ষণ ব্যর্থ ছোটাছুটি করেছে তারা এসে গেল। স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়াল।

আমরা পৌঁছে দেখলাম, শশী নিতোকে ধরেছে। দশ বারোটা আলো চারদিকে তাকে ঘিরে রয়েছে। সর্বাঙ্গ জল কাদায় ভরা, তার সঙ্গে রক্তের চিহ্ন - নিতো বসে আছে পাথরের মূর্তির মত। তার চোখ দুটো স্থির, জবাফুলের মত রাঙা। হাপরের মত হাঁপাচ্ছে। দৃষ্টি বিহ্বল ; এবং নির্বাক। বোবা ! লোকে ডাকছে—নিতো ! নিতো ! সে বোবা। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে।

দেখতে দেখতে এল তার বাবা তার দাদা তার মা, স্ত্রী।

তারা ডাকলে—নিতো বাবা ! নিতো !

ভাই ডাকলে—নিতো রে, নিতো !

স্ত্রী ডাকলে—ও গো ! ওগো !

কিন্তু নিতো বোবা, নিতো কালা। সে বসে আছে সেই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। কাউকে সে চিনতে পারছে না। এবার এল সত্যকারের পাঁড়ে। নিতো রে নিতো !

নিতো তাকেও চিনলে না। সে সব ভুলে গিয়েছে।

নিতোর জ্ঞান-চেতনা ফিরল অদ্ভুত ভাবে। তাকে ধরে নিয়ে আসা হল বাড়িতে। নির্বাক বিহ্বল নিতো যন্ত্রের পুতুলের মত এল। আমি ডাক্তার দেখাবার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু তাদের বাড়ির দোরে এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে সে ভয়ার্ত চিৎকার করে পড়ে গেল। কিছুক্ষণ পর চোখে মুখে জল সিঞ্চনের ফলে তার জ্ঞান ফিরল।

তার মা ডাকলে—নিতো।

এবার নিতো সাড়া দিলে—অ্যাঁ। তারপরে বলে- পাঁড়ে ? পাঁড়ে কোথায় ?

পাঁড়ে সামনে এসে বললে—এই যে ! আমি তো ঘরেই রইছি রে। তু এমন করে ছুটছিলি ক্যানে ?

কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে দেখে বলে—তাহলে সে কে ? অবিকল তোর মত ! বলেই শিউরে উঠে চোখ বুজল !

অনেকক্ষণ পর বললে—বাবুর কাছে পয়সা নিয়ে আমি গেলাম পানু সহিসের বাড়ি। মনে করলাম তু সেখানে গিয়ে জমে গিয়েছিস। তা দেখলাম সেখানে তু যাস নাই। তখন দু-ঢোক মদ খেয়ে রেললাইন ধরে আসছি। মুখ আঁধার হয়েছে, তোর কথাই ভাবছি এমন সময় ওই মাইলের কাছে পাথরের ওপরে দেখলাম তু বসে রইছিস। আমি বললাম—পাঁড়ে। তা সে ঠিক তু—সে এসে আমাকে বললে—শালা মজার, ভারি মজার—আয় !

বললাম—কোথা ?

তা আমাকে লাথি মেরে বললে—আয় ক্যানে শালা। ভারি মজা হবে। বলে, লাইন থেকে ঝাঁপিয়ে নেমে ছুটতে লাগল। আমি বললাম, দাঁড়া দাঁড়া। তা সে হিহি করে হেসে—বললে, আয় শালা আয়।—কী ছুট ছুটল। আমিও ছুটলাম। দাঁড়া রে দাঁড়া রে।

থামলো নিতো। বললে—এক গেলাস জল খাব।

তার বাবা বললে—বাবা ভুলোতে ধরেছিল বাবা! খুব বেঁচেছিস রে। ওই নিমচের জোলের ভুলো!

নিতো শিউরে উঠল।

পণ্ডিতেরা শুনে বলেন—ভুলো তো ভূত নয়। প্রেতও নয়। ভুলো ভুল। নিতোরই মনের ভুল। মদের নেশার মধ্যে শুধু পাঁড়ের কথা ভাবতে ভাবতে আসছিল; তার মন থেকে বেরিয়ে এসেছিল পাঁড়ের একটা কল্পনায় গড়া ছবি। সে যত তাকে ধরবার জন্যে ছুটেছে তত ছবিটাও ছুটেছে। ক্রমে উন্মত্তের মত নিতো ছুটেছে। ভুলে গেছে সব কিছু।

আমিও ভেবেছি। যুক্তি তাইই বলে। মনের কল্পনা। যা একাগ্র মনে ভাবে মানুষ, তা ঘুমের ঘোরে নেশার ঘোরে, এমনকি চিন্তা যদি খুব গভীর হয় তবে এই ভাবেই মানুষ ভুল দেখে। ভুল শোনে। এ ভুল মনই করায়।

তোমরা যেন বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে এই ভাবে পথ হেঁটো না একলা অন্ধকারে। বাহ্যজ্ঞান হারিয়ো না।

এ কথার পরেও কিন্তু আমার এই নিমচের জোলের ভুলো-প্রেত সম্পর্কে সংশয় যায়নি। মনে পড়ে এই মাঠে ওই জায়গাতেই অনেক মানুষ এমনি ভুল করেছে। এই ঘটনার বছরখানেক পরে আমি দেখেছিলাম একজনকে। এমনি করেই মাইল খানেক পথ হেঁটেছিলাম। সে অন্য কাহিনী। এবং কে যেন বলে মানুষের হিংসা মানুষের পাপ নির্দোষ মানুষকে হত্যা করে। প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রেত করেছে—সে যুগান্ত ধরে এমনি করেই সুযোগ পেলে ভুলিয়ে নিয়ে ছুটবে—নদীর দিকে, পাথরের দিকে, পুকুরের গভীর জলের দিকে আর অট্ট হেসে বলবে—আয়-আয়-আয়—হি-হি-হি—আয়! কেমন মজা দেখ।

প্রেতে ও মানুষে

তুষারকান্তি ঘোষ

সে আজ অনেক কালের কথা। তখন বাংলার পল্লী অঞ্চল সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং শহর অঞ্চলের এত উন্নতি হয়নি। তখন লোকের অভাব অভিযোগ কম ছিল, কারণ জিনিসপত্র ছিল খুব সস্তা। বাঙালী চাকরির জন্য পাগল হয়ে শহরে ছুটে আসত না। গ্রামের নদী, পুষ্করিণী ও শস্যক্ষেত্র গ্রামবাসীদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করত। গ্রামের জমিদার ও অবস্থাপন্ন লোকেরা তখন গ্রামেই থাকতেন। পরিবার সকল একান্নবর্তী ছিল এবং পুরুষেরা কেউ কেউ রোজগারের জন্য বিদেশে গেলেও বাকি সকলে গ্রামেই থাকতেন। সে সময় বাংলার জনসংখ্যা অনেক কম ছিল, সেই জন্য জমি পতিত ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। গ্রামের আশ পাশ নির্জন থাকাতে লোকের মন ডাকাত ও ভূত-প্রেতের ভয়ে আচ্ছন্ন ছিল। তখন গঙ্গা ময়রার মত ভূতের রোজারা বহু রোজগার করতেন। শিকড়-বাকড়ে লোকের বিশ্বাস ছিল ; অবশ্য তাদের গুণও ছিল যথেষ্ট।

সেই কালে, আমাদের যশোর জেলার কোন এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বাস করতেন। গ্রামের নাম ছিল কল্যাণপুর আর দেবেনবাবু ছিলেন সেই গ্রামের জমিদার। তার দু' মহলা চক-মিলান বাড়ি ছিল। বাইরের মহলে ছিল জমিদারবাবুর বৈঠকখানা, নায়েব গোমস্তাদের দপ্তর এবং বাইরের কোন অতিথি এলে তাদের থাকবার ঘর। বাইরের মহলের পর উঠোন, তার পরেই অন্দর-বাড়ি। বাইরের উঠোনের রক থেকে অন্দরমহলে যাবার একটি গলিপথ ছিল। অর্থাৎ বাইরের উঠোনের অন্দরের দিকের রক থেকে সেই গলিপথ দিয়ে অন্দরের উঠোনের রকে যাওয়া যেত। অন্দর-বাড়ির মস্ত উঠোন। সেই দিকেই রান্না-বাড়ি, ভাঁড়ার ঘর, দাসীদের থাকবার ঘর ছিল। অন্দরের দোতলায় দেবেনবাবুর পরিবারবর্গ বাস করতেন।

কল্যাণপুরের দশ মাইল উত্তরে উষা গ্রামে দেবেনবাবুর জমিদারী ছিল। এই গ্রামে নায়েব তসিলদার ছিলেন রামচন্দ্র পাল। তাঁর একটি মাত্র ছেলে নবেন বা নরু। সে সেই বৎসর এনট্রান্স পরীক্ষা দেবে। টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে নরেন রামবাবুকে বললে, 'বাবা, আমাদের বাড়িতে মোটে

দুটি ঘর। আমার পড়াশুনোর বড় অসুবিধা হচ্ছে। ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার আগে এই দুটো মাস আমি যদি অন্য কোন স্থানে থেকে পড়তে পারতুম, তাহলে আমি পাশ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারতুম।'

রামবাবু কথাটা বুঝলেন কিন্তু হঠাৎ কোন উপায় স্থির করতে পারলেন না। উষা গ্রাম ছিল খুব ছোট। গ্রামটির তিন দিকে জঙ্গল ও একদিকে ছিল প্রকাণ্ড মাঠ। যদিও এই গ্রামে কয়েক ঘর মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাস ছিল, কারো এমন বড় বাড়ি ছিল না যেখানে একটি খালি ঘর পাওয়া যায়। এই বিষয়ে চিন্তা করতে করতে জমিদার মশায়ের কথা রামবাবুর মনে পড়ল। দেবেনবাবু ছিলেন অত্যন্ত ভদ্রলোক ও দয়ালু। রামবাবু নিশ্চিত জানতেন যে তাঁর ছেলেকে দু' মাসের জন্যে স্থান দিতে জমিদারবাবু কখনও আপত্তি করবেন না। তিনি তাঁর ছেলে নরুকে বললেন, 'বাবা, আমি তোমার থাকবার স্থান স্থির করেছি। আমি আজই কল্যাণপুরে গিয়ে বাবু মশাইকে অনুরোধ করব তিনি যেন তোমাকে পরীক্ষার দুটো মাস তাঁর বাড়িতে রাখেন। কিন্তু বাবা, একটা কথা বলি। সেই বাড়িতে বাবু মশাইয়ের পরিবারবর্গ বাস করেন। হয়তো তাঁরা তোমার সঙ্গে মেলা-মেশা করবেন। তুমিও তাঁদের সঙ্গে খুব সাবধানে কথাবার্তা বলবে। তোমার আঠার বছর বয়স হয়েছে, তোমাকে বেশি কিছু বলা বাহুল্য। দেখো বাবা, কেউ যেন আমার নরুর নিন্দে না করে।'

নরু বলল, 'বাবা তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমাদের মনিব বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে কিরূপভাবে ব্যবহার করতে হয় তা আমি জানি। তাছাড়া আমি তো দিনরাত লেখাপড়া নিয়েই থাকব। তোমার ভয় নেই, কেউ তোমার ছেলের নিন্দে করবে না।'

রামবাবু যা ভেবেছিলেন, তাই হল। জমিদারবাবু অতি আনন্দের সঙ্গে নরেনকে তাঁর বাড়িতে রাখতে রাজী হলেন। নরেন যে ঘরটি পেলে তার দরজার সামনেই রক, তারপরেই উঠোন এবং উঠোনের অপর দিকে অন্দরমহলে যাবার রক, যেখান থেকে অন্দরের উঠোনে যাবার শুঁড়ি-পথটি আরম্ভ হয়েছে। নরেন এই ঘরে থেকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। সে অন্দরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করত এবং অতি শীঘ্রই জমিদার গৃহিণী ও তাঁর কন্যাদের স্নেহ আকর্ষণ করে নিল। নরেন ছিল শান্তশিষ্ট ও বিনয়ী। সেই জন্যে সে সকলকার স্নেহ-ভালবাসা আকর্ষণ করতে পারত। জমিদার গৃহিণী ও কন্যারা নরেনের সঙ্গে আপনজনের মত ব্যবহার করতেন। এইভাবে নরেন কল্যাণপুরে জমিদার বাড়িতে অধিষ্ঠিত হল। নরেন তার লেখাপড়ার একটি প্রণালী স্থির করে, দিন-রাতে ক'ঘণ্টা কি বিষয়ে পাঠ করবে তা ঠিক করে নিল। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরও সে ঘণ্টা-দুই লেখাপড়া করত। রাত ঠিক বারটা বাজলে লেখাপড়া বন্ধ করে তার ঘরের বাইরে রকে বসে হাত-মুখ ধুতো এবং ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ত।

এইভাবে দিন যায়। একদিন রাতে ঠিক বারটার সময় রকে বসে, হাত-মুখে জল দিয়ে নরেন যখন উঠে দাঁড়াল, উঠোনের অপর দিকে, অন্দরে যাবার রকের দিকে তার নজর পড়ল। নরেন দেখলে যে সেখানে উনিশ-কুড়ি বছরের একটি সুশ্রী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নরেন তাকে চিনতে পারলে না। সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল।

পরদিন রাত্রে নরেন পড়ছে আর ভাবছে কে সে মেয়েটি ? অত রাত্রে রকে দাঁড়িয়ে কি করছিল ? আজও সে আসবে না কি ? নরেন পড়ে, আর মধ্যে মধ্যে মেয়েটির কথা ভাবে। এই দোনামনা করতে করতে রাত বারটা বাজল। নরেন বাইরে হাত-মুখ ধুতে গিয়ে প্রথমেই ওদিকের রকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। দেখলে, ঠিক সেইখানে সে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। নরেন লজ্জা পেল, কিন্তু অদম্য কৌতূহল বশত মেয়েটির দিকে চেয়ে রইল। মেয়েটিও নরেনকে একদৃষ্টে দেখছিল। ক্রমে মেয়েটি আস্তে আস্তে নরেনের দিকে এগুতে লাগল—যেন নরেনকে কি বলবে। ক্রমে মেয়েটি উঠোনে নেমে ধীরে ধীরে নরেনের দিকে আসতে লাগল। কিন্তু নরেন আর অপেক্ষা করলে না। তার বুক ধড়ফড় করছিল। সে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

কি বলতে চায় ! দেখি, আজও যদি আসে তো তার পরিচয় নেবার চেষ্টা করব।' নরেন সারাদিন এইসব কথা ভাবল, কিছুতেই মেয়েটিকে মন থেকে সরাতে পারলে না। সেদিন একটুও পড়াতে মন বসাতে পারলে না।

রাত বারটা। নরেন ঘরের বাইরে গিয়ে দেখলে যে, মেয়েটি আজ রক থেকে নেমে উঠোনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। নরেনকে দেখেই মেয়েটি তার কাছে অগ্রসর হয়ে এল। আজ আর নরেন তাকে ফেরাতে পারলে না। মেয়েটি নরেনকে অতি মিষ্টি স্বরে বললে, 'তোমাকে আমার বড় ভাল লেগেছে, তাই একটু গল্প করতে এলুম। চল তোমার ঘরে গিয়ে বসি।'

মেয়েটির চোখে কি ছিল জানি না, নরেন যেন মন্ত্রমুগ্ধ কিংবা মোহগ্রস্তের মত হয়ে পড়ল। কেমন এক অবর্ণনীয় ভাব অনুভব করলে। সেটা আনন্দ, ভয়, মোহ না সুখ ? নরেনের মন এবং দেহ দুই-ই যেন আর স্ববশে রইল না। সে মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে তার ঘরে প্রবেশ করলে।

নরেন বললে, 'তুমি কে ?'

মেয়েটি বললে, 'আমি মালতী। তুমি আমায় চেন না ! আজ ক'দিন তোমায় দেখছি। তোমায় বড় ভাল লেগেছে, তাই তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এলুম। তুমি রাগ করনি তো ?'

নরেন—'আচ্ছা, তুমি এত রাত্রে আস কেন ?'

মেয়েটি—'ঠিক রাত বারটার সময় আমার আসবার সুযোগ হয়। অন্য সময়ে আমি চেষ্টা করলেও আসতে পারি না। এই সব জিনিস একদিন আমি তোমাকে ভাল করে বুঝিয়ে বলব। আমি রোজ ঠিক রাত বারটার সময় আসব ও দুটোর সময় চলে যাব। তোমার কোন ভয় নেই। আমি তোমার কোন অনিষ্ট করব না। আমার পরিচয় জানতে চেও না। আমি তোমার বন্ধু এই কি যথেষ্ট পরিচয় নয় ?'

নরেনের তখন স্বাভাবিক অবস্থা ছিল না। তা নইলে হয়তো সে মেয়েটির পুরো পরিচয় জানবার জন্য পীড়াপীড়ি করত। কিন্তু সে তা করলে না। সে মেয়েটির সাথে গল্প করতে লাগল। তার মনে অনির্বচনীয় আনন্দ, যেন কেমন মোহগ্রস্ত ভাব। নরেনের একবারও মনে হল না যে, এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। এক অপরিচিতা মেয়ে ঠিক রাত বারটার সময়ে আসে, এক মিনিট আগে কি পরে আসতে পারে না—এর মানে কি ?—তার আত্মীয়-স্বজনই বা কোথায় ?—এসব কোন কথা নরেনের মনে উদয় হল না। সে কেবল তার সঙ্গে কথাবার্তার আনন্দে ডুবে রইল।

রাত দুটো বাজতেই মেয়েটি উঠে বললে, 'আজ যাই, কাল ঠিক বারটায় আসব।' বলে মেয়েটি ঘরের বাইরে চলে গেল। নরেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাইরে গিয়ে আর মেয়েটিকে দেখতে পেলে না। সারা উঠোন খাঁ খাঁ করছে আর রকে কোন জন-মনিষ্যি নেই।

পরদিন আবার ঠিক রাত বারটার সময় মালতীর আগমন হল, পড়া সেরে ঘরের বাইরে যেতেই দরজার কাছে মালতীকে সে দেখতে পেলে। তার পরে দুজনে ঘরের ভিতরে এসে গল্প গুজব আরম্ভ করলে।

এইরূপে দিন কাটছে, নরেনের লেখাপড়া চুলোয় গেছে। নরেন সর্বক্ষণ মেয়েটির কথা ভাবে—এমনই তার আকর্ষণ। সে সারাদিন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে—কখন রাত বারটা বাজবে। মেয়েটির সঙ্গ উন্মাদকর এবং রাত বারটা থেকে দুটো পর্যন্ত এই দু' ঘণ্টা সুখ স্বপ্নের মত কেটে যায়। কখনো কখনো নরেন ভাবে যে, কে এই মেয়েটি, কোথায় থাকে, কার মেয়ে, কেন সে রাত্রি বারটার সময় আসে, কেন দুটোর পরেই চলে যায়—কিছুই বুঝতে পারে না। তাকে জিজ্ঞাসা করলে মালতী কেবল হাসে, বলে, 'আমার পরিচয় নিয়ে কি হবে ? কেন, আমাকে কি পছন্দ কর না ? তুমি প্রায়ই জিজ্ঞাসা কর--কেনই বা আমি বারটার সময় আসি ও দুটোর সময় চলে যাই। তার কারণটা আজ তোমায় বলি। রাত বারটা থেকে দুটো পর্যন্ত যে ক্ষণ, কেবল সেই সময়টাই আমি তোমার কাছে আসতে পারি। আমার এমন ক্ষমতা নেই যে বারটার আগে আসি কিংবা দুটোর পরেও থাকি।'

দিন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে একথা তার মনে বদ্ধমূল হল যে মালতীর সঙ্গ তার পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। কিন্তু কি করা যায়? কি করে এর হাত থেকে উদ্ধার পাবে? নরেন বেশ বুঝতে পেরেছে যে তার পক্ষে অসম্ভব এবং এভাবে আর দিন-কতক চললে তার শরীর একেবারে ভেঙে পড়বে। নরেন উপায় ঠাওরাতে লাগল যে কি করে মালতীর আসা বন্ধ করা যায়। সে ভাবলে যে, 'মালতী যখন বলছে যে রাত বারটা থেকে দুটো পর্যন্ত তার আসবার সময়, আমি কেন সেই সময়টা দরজা বন্ধ করে ঘরের ভেতর শুয়ে থাকি না? সে দরজা বন্ধ দেখে বুঝতে পারবে যে আমি হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছি।' নরেন প্রতিজ্ঞা করলে যে সেই রাত্রেই সে ওইরূপ করবে।

সেইদিন রাত্রে রাত এগারটার সময় নরেন দরজা বন্ধ করে তার বিছানায় শুয়ে পড়ল। সে ঘুমোবার চেষ্টা করলে, কিন্তু ঘুম কিছুতেই এল না। যখন জমিদার বাড়ির ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারটা বাজছে তখন ঘরের মধ্যে খস্‌খস্ করে কেমন একটা শব্দ হল। নরেন এতক্ষণ চোখ বুজে পড়েছিল। খসখস্ শব্দ শুনে নরেন চোখ মেলে দেখলে যে মালতী ঘরের ভিতর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। যদিও এই ব্যাপারে নরেন হতভম্ব হয়ে গেল, কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, সে মালতীকে দেখে আবার মোহাবিষ্ট হল এবং তাড়াতাড়ি উঠে বসে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালে।

মালতী হাসিমুখে বললে, 'আজ যে বড় দরজা বন্ধ করে রেখেছ? ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি?'

নরেন বললে, 'না না, শরীরটা খারাপ বোধ হওয়াতে বিছানায় শুয়েছিলুম, মতলব ছিল বারটা বাজলেই বাইরে যাব। কিন্তু তুমি ঘরের ভেতরে এলে কি করে।'

মালতী হাসতে হাসতে বললে, 'আমি এক ম্যাজিক জানি, দরজা বন্ধ থাকলেও কি করে ঘরের ভেতর আসতে পারা যায়, সে কথা তোমাকে একদিন আমি বুঝিয়ে দেব।'

সে রাত্রে মালতী চলে গেলে নরেন এক লহমাও ঘুমোতে পারলে না। সে কেবলই ভাবে যে মালতী কি করে ঘরের দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ভিতরে আসতে পারলে! যেটা এতদিন তার মনে উঁকি ঝুঁকি মারছিল এখন সেই ধারণা বদ্ধমূল হল। মালতী যে মানুষ নয়, কোন মৃত স্ত্রীলোক এই ধারণা তার মনের উপর চেপে বসল। কিন্তু আত্মা তো অশরীরী, সে দেহ ধারণ করে কি করে। ক্রমে নরেনের মনে পড়ল যে মালতী বারবার বলছে যে, কেবল রাত বারটা থেকে দুটো পর্যন্ত সে নরেনের কাছে আসতে পারে। নরেন ভাবলে, হয়তো কেবল এই সময়টুকুর জন্যই সে স্থূল দেহ ধারণ করতে পারে। নরেনের এ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না এবং কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলে না। তবে এটা সে স্থির বুঝলে যে এইভাবে আর কিছুদিন চললে—পাশ করা দূরে থাকুক—তার প্রাণ সংশয় হবে।

এর দু-চার দিনের ভিতরই নরেন কঙ্কালসার হয়ে পড়ল। ভয় ও প্রেতসঙ্গ তার শরীর আর মনকে দগ্ধ করে দিলে। দিন-রাত তার খাওয়া নেই, ঘুম নেই—কেবল রাত্রে ওই দু'ঘণ্টা সে ভুলে থাকে, এমনি মালতীর আকর্ষণ আর এমনি নরেনের মোহ।

বাড়ির সকলে দেখলে যে, নরেন শুকিয়ে যাচ্ছে। একদিন গৃহিণী অনুযোগ করলেন যে, সে যেন রাত জেগে বেশি পড়াশুনা না করে। তার পুষ্টিকর খাবারেরও বন্দোবস্ত করলেন। কিন্তু কোন ফল হল না। তখন গৃহিণী একদিন জমিদারবাবুকে নরেনের শারীরিক অবস্থার কথা জানালেন।

দেবেনবাবু নরেনকে ডেকে পাঠালেন ও তাকে বহু প্রশ্ন করলেন। নরেন প্রথমটা লুকোতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে শেষটা নরেন সেই মেয়েটির কথা বলে ফেললে। একটি ভদ্রলোকের মেয়ে রাত্রে ঘরে আসে শুনে জমিদারবাবু চমকে উঠলেন ও বার বার সে মেয়েটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। নরেন বললে, 'আমি অনেক জিজ্ঞাসা করেছি, কোন পরিচয় দেয় না।'

জমিদার— 'তুমি তাকে ঘরে ডেকে আন কেন?'

নরেন—'আমি ডাকি না, সে আপনি আসে।'

জমিদার—'তুমি দরজা বন্ধ করে থাক না কেন? তুমি তো বলছ যে, সে রাত বারটার আগে আসতে পারে না। তুমি তার আগেই দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়ো না কেন?'

নরেন—'আমি দরজা বন্ধ করে দেখেছি। দরজা বন্ধ থাকলেও সে ঘরে আসে।'

জমিদারবাবু অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন, 'তুমি কি গাঁজাখুরি কথা বলছ? দরজা বন্ধ থাকলে সে আসবে কেমন করে?'

নরেন -'তা জানি না। বোধ হয় তার কোন অমানুষিক ক্ষমতা আছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। সে খালি হাসে আর বলে, 'একদিন বুঝতে পারবে।'

নরেনের কথা শুনে দেবেনবাবু বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন না এর রহস্যটা কি। তিনি নরেনকে ভালভাবে জানতেন যে সে সত্যবাদী ও সৎ। বিশেষত তাঁর সামনে সে কখনই মিথ্যা কথা বলবে না। তিনি নরেনকে বললেন 'তুমি আমাকে এই ব্যাপারটা দেখাতে পার?'

নরেন 'নিশ্চয় পারি। আপনি রাত বারটার কিছু আগে থাকতে আমার পাশের ঘরটায় লুকিয়ে থাকবেন, তাহলে সবই দেখতে শুনতে পাবেন।'

দেবেনবাবু তখনই নরেনের ঘরে গেলেন ও দরজা, জানলা সব তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে বুঝলেন যে, দরজা বন্ধ থাকলে বাইরে থেকে সে ঘরে আসা একেবারে অসম্ভব। এই ঘরের পাশেই একটি ছোট ঘর ছিল এবং এই দুই ঘরের মধ্যে একটা ছোট্টা জানলা ছিল। দেবেনবাবু ভেবে দেখলেন যে, ওই জানলাটা খুলে যদি কেউ আলো নিবিয়ে ওই ছোট ঘরটায় লুকিয়ে থাকে, তাহলে নরেনের ঘরের সব ব্যাপারই সে লক্ষ্য করতে পারবে। দেবেনবাবু মনে মনে এই প্ল্যান স্থির করে রাত্রির জন্য অপেক্ষা করলেন।

রাত বারটার কিছু আগে দেবেনবাবু সেই ছোট ঘরটায় গিয়ে ছোট জানলাটার আড়ালে লুকিয়ে রইলেন, কিন্তু নরেনের ঘরের ভিতর খর দৃষ্টি রাখলেন। নরেন দরজা বন্ধ করে শুলে তিনি দরজাটির দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন যাতে তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে মেয়েটি ঘরের ভিতর না আসতে পারে।

দেবেনবাবু এইভাবে চেয়ে আছেন আর নরেনের ঘরে আলো জ্বলছে। ঠিক বারটার সময় তাঁর চোখে কেমন ধাঁধা লাগল। তিনি মুহূর্তের জন্য চোখ বুজলেন। তখনই চোখ চেয়ে দেখলেন যে একটি সুন্দরী মেয়ে নরেনের ঘরের ভিতর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কিসে কি হল তিনি ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারলেন না। তারপর মালতী ও নরেন যখন কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলে দেবেনবাবু চুপিসাড়ে সে ঘর থেকে চলে গেলেন। মালতী যে প্রেতিনী সে বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ রইল না।

পরদিন প্রত্যূষেই দেবেনবাবু নরেনের বাবাকে এক জরুরী পত্র লিখে ঘোড়সোয়ার দিয়ে ঊষা গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন। সেই পত্রে তিনি লিখলেন, 'তুমি এখনই এসে নরুকে তোমার গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, নইলে তার প্রাণ সংশয়।' আর নরেনকেও ডেকে বললেন যে, তার বাপকে আনতে লোক গিয়েছে। তিনি এলেই যেন তার সঙ্গে নরেন গ্রামে ফিরে যায়। নরেন খুব রাজী, কারণ রাত্রের ওই দু'ঘণ্টা ছাড়া নরেন স্ববশে সাধারণ মানুষের মতই থাকত। সে বুঝলে এর হাত থেকে বাঁচতে গেলে তার পালানই মঙ্গল।

সেই দিনই নরেনের বাবা এলেন। নরেনের শরীরের অবস্থা দেখে এবং সব কথা শুনে ভয়ে দুঃখে তিনি পাগলের মত হয়ে পড়লেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে জমিদারবাবুকে বললেন যে তিনি সেই দিনই নরুকে নিয়ে যাচ্ছেন। দেবেনবাবু বললেন, 'শুধু নিয়ে গেলে হবে না। একজন ভাল রোজাকে দিয়ে নরুকে দেখাও। ওকে পেতনীটা যেভাবে পেয়েছে তাতে ছাড়ান সহজ নয়।'

রামবাবু বললেন যে তিনি তাই করবেন। সেই দিনই তাঁরা ঊষা গ্রামে ফিরে গেলেন।

নরেনের মা সব কথা শুনে কেঁদে সারা। তিনি বললেন, 'পরীক্ষা মাথায় থাকুক, ছেলের প্রাণ বাঁচান আগে দরকার।' নরেনও এত দূর চলে এসে আর বাবা মাকে নিকটে পেয়ে মনে অনেকটা বল পেলে। সে ভাবলে পেতনীটাকে আর এত দূর আসতে হবে না। সে সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে তার ঘরে শুতে গেল।

কিন্তু ঘুম আর আসে না। ক্রমেই রাত হচ্ছে আর নরেন ভাবছে সে কি এখানেও আসবে নাকি। এইভাবে রাত বারটা বাজল আর সঙ্গে সঙ্গে নরেন দেখল যে, মালতী ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে। নরেন ভয় পেলে, কিন্তু সেই অদম্য মোহ। সে উঠে মালতীকে সম্ভাষণ করলে।

মালতী– 'তুমি যে এখানে চলে এলে? তুমি কি ভাবছ?'

নরেন—'আমি ভাবছি তুমি কি করে এখানে এলে? আমার শরীর খারাপ হয়েছে বলে বাবা আমাকে নিয়ে এসেছেন।'

মালতী—'তুমি সত্যি বলছ ? তোমাকে আমার কাছ থেকে ছাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে না তো ? সে কিন্তু কেউ পারবে না, তা যত চেষ্টাই না কর। তুমি কি এতদিনেও বুঝতে পারনি যে আমি কে ? তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে। আমি কখনও তোমার অনিষ্ট করব না। কিন্তু তুমি যেখানে যাবে আমিও যাব। তুমি যতদিন বেঁচে থাকবে এইভাবে আমি আসব। তোমার মৃত্যুর পর আমরা চিরকাল একসঙ্গে থাকব।

মালতীর কথা শুনে নরেনের বুক কেঁপে উঠল। যদিও সে আগেই বুঝেছিল যে মালতী মানুষ নয়, কিন্তু এমন খোলাখুলিভাবে সেকথা এর আগে কোনদিন হয়নি। যখন মালতী বললে যে, 'কেউ তোমাকে আমার কাছে থেকে ছাড়াতে পারবে না।' তখন ভয়ে নরেনের সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে এল। সে যদিও অন্যদিনের মত হাসিখুশির ভান করলে, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে তার মুখ শুকিয়ে উঠতে লাগল।

দুটোর সময় মালতী চলে গেলেই নরেন পাগলের মত ছুটে গিয়ে তার বাবা-মার শোবার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। তাঁরা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এসে সব কথা শুনলেন ও হাহাকার করে কাঁদতে লাগলেন। সে রাত্রে আর কেউ ঘুমোতে গেলেন না।

পরদিন সকালেই রামবাবু প্রতিবেশীদের ডেকে এনে সব কথা বললেন। তাঁরা বললেন, যত শীঘ্র পারা যায় একজন ভাল রোজাকে ডাকান হোক। আর যতদিন না রোজা আসে ততদিন নরু তার বাবা-মার মধ্যিখানে শোবে। একজন এ সংবাদ দিলেন যে, সাত ক্রোশ দূরে একজন সত্যিকার ভাল রোজা থাকে। তার ভূতপ্রেত সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, আর সে অনেক দরকারী শিকড়-বাকড়েরও সন্ধান রাখে। সেইদিনই সেই রোজাকে আনতে লোক পাঠানো হল, আর তাকে বলে দেওয়া হল যাতে তার পরদিনই সে রোজাকে নিয়ে আসে। রোজা যা চাইবে তাই তাকে দেওয়া হবে—একথাও তাকে বলে দেওয়া হল।

সেদিন রাত্রে নরেন বাবা-মার সঙ্গে একঘরে শুলো। দু'পাশে বাবা-মা, আর নরেন শুয়েছে মধ্যে, একই বিছানায়। তিনজনই জেগে আছেন, আতঙ্কে ও দুশ্চিন্তায় কেউই ঘুমোতে পারছেন না। এইভাবে রাত বারটা বাজল।

নরেন চোখ বুজে শুয়েছিল। হঠাৎ নরেন অনুভব করলে কে যেন তাকে ঠেলছে। নরেন চমকে চোখ মেলে দেখলে যে মালতী মাথার কাছে বসে আছে। নরেন চুপি চুপি বললে, 'তুমি কি করছ, বাবা-মা জানতে পারবেন যে।'

মালতী স্বাভাবিক সুরে বললে, 'তোমার সে ভয় নেই, ওঁরা কিছু জানতে পারবেন না।'

নরেন উঠে দেখলে যে তার বাবা-মা মড়ার মত পড়ে আছেন। তারা তখন পাশের ঘরে গেল। একথা বলাই বাহুল্য যে, মালতীই রামবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে অজ্ঞান করে রেখেছিল।

পরদিন সব কথা শুনে নরেনের বাবা-মা পাগলের মত বুক চাপড়াতে লাগলেন। নরেনও বুঝলে যে আর তার নিস্তার নেই। আতঙ্কে ও দুশ্চিন্তায় তার শরীরের আর কিছু নেই। দেহ কঙ্কাল-সার সব সময় বুক ধড়ফড় করে, মাথা ঘোরে। বহুকষ্টে হাঁটে, এমন কি বসে থাকতেও কষ্ট হয়, সব সময় শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। সে ভাবছে এ অবস্থার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল। গ্রামের লোকেরাও দুঃখিত। সকলের শেষ আশা সেই রোজা। যদি সে কিছু করতে পারে।

সেদিন বিকেলে রোজার আগমন হল। সে ধীরভাবে আগাগোড়া সব কথা শুনলে আর নরেনের শরীরের অবস্থাও দেখলে। রোজা বললে যে সে একবার সমস্ত ব্যাপারটা নির্জনে ভেবে দেখবে যে এর কোন উপায় আছে কি না। সে স্পষ্টই বললে যে মেয়েটা যেভাবে নরেনকে গ্রাস করে বসে আছে তাতে তাকে ছাড়ান খুব শক্ত। এই বলে রোজা এক নির্জন গাছতলায় গিয়ে বসল। ঘণ্টা দুই বাদে রোজা ফিরে এসে বললে যে সে একটা উপায় বার করেছে, সেটা কিন্তু খুব বিপজ্জনক উপায়। সে রামবাবুকে তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং প্রবীণ প্রতিবেশীদের ডেকে আনতে বললে। রোজা তাঁদের সামনে তার কথা বলবে এবং যদি সকলের মত হয় তাহলে নরেনের ব্যাপারের ভার নেবে।

রোজার কথামত তখনই আত্মীয়-স্বজনদের এবং প্রতিবেশীদের ডাকা হল। তাঁরা সকলেই রামবাবুর হিতৈষী এবং নরুর মিষ্ট স্বভাবের জন্য তাকে ভালবাসেন। তাঁরা সকলেই রোজাকে বিশেষ অনুরোধ জানালেন যে, যে উপায়েই হোক নরুকে যেন এই ভীষণ বিপদ থেকে রক্ষা করা হয়।

রোজা তাঁদের বললে, 'আপনারা নরেনবাবুর অবস্থা তো দেখছেন। এইভাবে চললে একমাসের

মধ্যে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত। কেবল একটি মাত্র উপায় আছে যাতে এঁকে বাঁচান যায়, কিন্তু সেই উপায়ের আর একটি দিক আছে— সেটাও আপনারা ভেবে দেখুন ! আমার মতলব যদি সফল হয় তাহলে চিরকালের জন্য নরেনবাবু প্রেতিনীর হাত থেকে উদ্ধার পাবেন। কিন্তু যদি অকৃতকার্য হই তাহলে এখনি ওঁর প্রাণ যাবে। এখন আপনাদের ভেবে দেখতে হবে যে আপনারা একমাসের মধ্যে নরেনবাবুর নিশ্চিত মৃত্যু চান অথবা তাঁকে চিরতরে বিপদমুক্ত করতে চান, যদিও এতে আজই ওঁর প্রাণ যেতে পারে। আপনারা বেশ করে ভেবে জবাব দিন।'

রামবাবুর স্ত্রী দরজার আড়ালে বসে শুনছিলেন, তিনি কেঁদে উঠলেন ও অস্ফুটস্বরে বললেন, 'বাপ রে, যাতে আজই আমার ছেলের প্রাণ যেতে পারে তাতে আমি কখনই মত দেব না।'

রামবাবুও দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেছেন, কিন্তু তিনি পুরুষ মানুষ, তিনি রোজার কথাটি ভাল করে বিবেচনা করে দেখতে লাগলেন। একজন বৃদ্ধ প্রতিবেশী রোজাকে অনুরোধ করলেন, সে যাতে তার সমস্ত মতলবটা ভেঙে বলে।

রোজা বললে, 'আমি বলব না, আমি কাউকে কিছু জানতে দেব না, আমি শুধু নরেনবাবুকে যা যা করতে হবে বুঝিয়ে দেব, তবে এ সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক ব্যাপারও কিছু আছে তা কিন্তু আপনাদেব করে দিতে হবে।'

এরূপ জীবন-মরণের কথায় বাপ-মার মতি স্থির করা খুব শক্ত, তাঁরা একবার এদিক ভাবেন, একবার ওদিক ভাবেন। প্রতিবেশীরা তখন তাঁদের বোঝাতে লাগলেন। 'তোমরা কি চাও না যে নরেন সুস্থ শরীরে সুস্থ মনে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকে ? দিনকতকের মধ্যে ওর প্রাণ তো যাবেই, এরূপ জীবন্মৃত অবস্থায় দিনকতক বেশি বেঁচে থেকে লাভ কি ? আমাদের মত হচ্ছে রোজার কথামত চলা। যখন আর কোন উপায় নেই তখন এই উপায়ই নিতে হবে।' যদিও কথাটা তাঁরা বুঝলেন তবুও মা-বাপের মন, রামবাবু আর তার স্ত্রী দোনামোনা করতে লাগলেন। যে কাজে আজই ছেলের মৃত্যু হতে পারে কেমন করে তাঁরা তাতে মত দেন ? কিন্তু নরেনই এ সমস্যার সমাধান করে দিলে। নরেন বললে যে তার বর্তমান অবস্থায় সে একদিনও বেঁচে থাকতে চায় না। সে রোজাকে পরিষ্কার বললে, 'আপনি আমাকে বাঁচাতে পারেন ভাল, নয়তো আজই আমার জীবন শেষ করে দিন, আমি এ নরক-যন্ত্রণা আর একটা দিনও সহ্য করতে পাচ্ছি না।'

নরেনের বাবা-মা কাঁদতে লাগলেন আর আত্মীয়-স্বজনরা বোঝাতে লাগলেন। শেষে, সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল যে, রোজার উপরে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া হোক।

রোজা বললে, 'আজ সন্ধে হয়ে গেছে, আজ আর কিছু হবে না, আর একটা রাত্রি নরেনবাবু এইভাবেই থাকুন, কাল আমি এ ব্যাপারে হেস্তনেস্ত করব। তবে এখানে হবে না। যেখানে নরেনবাবুর সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল সেখানে যেতে হবে।'

শেষকালে স্থির হল যে, রোজা ও নরেন রামবাবুর সঙ্গে পরদিন সকালে কল্যাণপুরে জমিদার বাড়িতে যাবে।

সে রাত্রে মালতী নরেনকে বললে, 'তোমায় আগেও বলেছি এখনও বলছি যে কেউ তোমাকে আমার হাতে থেকে কেড়ে নিতে পারবে না, আমি কখনও তোমার কোন অনিষ্ট করব না, তুমি আগে যেখানে ছিলে সেখানে ফিরেও যাও, আমার এখানে আসতে কিছু কষ্ট হয়।'

নরেন তাকে বললে, 'তাই হবে। কালই আমি কল্যাণপুরে ফিরে যাব।'

পরদিন কল্যাণপুরের জমিদার বাড়িতে রামবাবু, নরেন ও রোজা উপস্থিত হল। রোজা দেবেনবাবুকে বিষয়টা বুঝিয়ে দিলে এবং বললে, 'আপনাকে কিছু সাহায্য করতে হবে।'

দেবেনবাবুর খুব আগ্রহের সঙ্গে সব কথা শুনলেন আর বললেন, 'তুমি যা চাও করব। নরু আমার ছেলের বাড়া। তাছাড়া মনুষ্যত্বের দিক দিয়েও এই পৈশাচিক ব্যাপারের যাতে অবসান হয় তাতে আমি সর্বপ্রকার সাহায্য করতে বাধ্য।'

রোজা—'আপনাকে বেশি কিছু করতে হবে না, আপনি শুধু নরেনের ঘরটি খুব ভাল করে সাজিয়ে দিন। ঘরটি ঝেড়ে মুছে তক্তপোশ সরিয়ে সেখানে একটি খাট পেতে দিন। আর ঘরটি আর বিছানাটি নানা রকম ফুল ও মালায় সজ্জিত করুন, সব বন্দোবস্ত সন্ধের মধ্যে শেষ করতে হবে।'

জমিদার—'এতে আর কষ্টটা কি, সন্ধের মধ্যেই সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।'

রাত দশটার সময় রোজা নরেনকে নিয়ে সেই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে। সেখানে রোজা নরেনকে তার মতলবটা ভেঙে বললে আর খুব ভাল করে নরেনকে বুঝিয়ে দিলে, তাকে কি করতে হবে আর কি বলতে হবে। শেষকালে রোজা বললে, 'আপনার জীবন এখন আপনার হাতে, ভূতনাথ মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করি যে, তিনি আপনার বুকে বল দিন।'

রাত্রি বারটার কিছু আগে রোজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঠিক রাত বারটায় মালতীর আগমন হল, নরেন খুব আগ্রহের সঙ্গে তাকে আহ্বান করলে এবং সাজান খাটে বসতে বললে।

মালতী—'আজ একি ব্যাপার ? এমন খাট, এত ফুলের মালা, এ কাজ জন্যে।'

নরেন—'কেন, তোমার জন্যে আর তার পুরস্কারও তো পেলুম।'

মালতী—'কেন, কখনও যা করনি তা আজ করেছ। এর আগে তো কখনও তুমি দু'বার আসনি।'

মালতী—'দু'বার মানে কি ? আমি আবার কখন এলুম ?'

নরেন—'তুমি এর মধ্যে ভুলে গেলে ? তুমি রাত সাড়ে দশটার সময় এলে আর বললে যে, তুমি ফুল নিয়ে সাজান ঘর দেখে আজ আগেই এসেছ, আমার সঙ্গে ফুল নিয়ে মালা নিয়ে কত কাড়াকাড়ি করলে, এই দেখ বিছানাতে ছেঁড়া মালা ছেঁড়া ফুল পড়ে রয়েছে। এই তো মাত্র পনের মিনিট হল তুমি গিয়েছ, এর মধ্যে সব ভুলে গেলে, না আমার সঙ্গে তামাসা করছ ?'

নরেনের কথা শুনতে শুনতে মালতীর হাসি মিলিয়ে গেল, মুখ হল অসম্ভব গম্ভীর আর চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরোতে লাগল।

মালতী—'তুমি তো আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করছ না ? তুমি আমার গা ছুঁয়ে বল তো আমি আজ রাত্রে আবার এসেছিলুম ?'

নরেন তখনই তাই করলে। মালতী আর কোন কথা না বলে এক মনে ভাবতে লাগল। মালতীর মুখের সৌন্দর্য গেছে মিলিয়ে, মুখ রাগে কালো হয়ে গেছে আর থমথম করছে। কিছুক্ষণ পরে মালতী নরেনকে বললে যে, এর আগে সে আসেনি, আর কেউ তার মত সেজে এসেছিল। নরেন যেন কত দুঃখ আর ভয় পেয়েছে এইভাবে বললে, 'যদি তাই হয়ে থাকে, তবে তুমি তার হাত থেকে আমাকে বাঁচাও, আমার তোমাকেই ভাল লাগে আর তোমারই বন্ধুত্ব কামনা করি। যদি আর কেউ এভাবে আসে তাহলে আমি আর বাঁচব না, যে করে হোক তুমি আমাকে এই ঘোর বিপদ থেকে বাঁচাও।'

মালতী কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে বললে, 'এর এক উপায় আছে, কিন্তু তা কি তুমি পারবে ? আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারবে কি ? আমি কে তা তো জানো, এই গভীর রাত্রে আমার সঙ্গে তুমি এক জায়গায় যেতে পার ?'

নরেন বুঝলে যে এতক্ষণে তার জীবনের সবচেয়ে সঙ্কটময় মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে, তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল এবং বুকের মধ্যে কেমন করতে লাগল। সে কষ্টে হেসে বললে, 'তোমার সঙ্গে যাব তাতে ভয়টা কি ? কিন্তু তুমি কি করতে চাও আমাকে বুঝিয়ে বল।'

মালতী—'এখান থেকে দু' মাইল দূরে উত্তর দিকে যে জঙ্গলটি আছে সেখানে তোমায় নিয়ে যাব। সেখানে এক জায়গায় এক রকমের লতা আছে সেই লতার শিকড় তোমাকে আনতে হবে।'

নরেন—'তা তুমি কেন নিজেই নিয়ে এস না, তুমি তো সব জায়গায় যেতে পার, বাইরে কী ভীষণ মেঘ করেছে দেখ, তুমি তো জান, আমার হাঁটতে বেশ কষ্ট হয়।'

মালতী—'আমি যদি আনতে পারতুম তাহলে কি তোমাকে কষ্ট দি। আমি সে লতা গাছের কাছেও যেতে পারি না। তোমাকেই সে শিকড় আনতে হবে। সেই শিকড় দিনরাত তোমায় হাতে বেঁধে রাখতে হবে। ঠিক রাত বারটায় সময় সেই শিকড় খুলে অন্য ঘরে তফাত করে রেখে আসবে, আর রাত দুটোর সময় আমি চলে গেলে আবার পরে থাকবে, তাহলে কেউ আর তোমার কাছে আসতে পারবে না।'

নরেন আর কিছু বললে না এবং তারা দুজন ঘর থেকে উঠোনে নামল, ক্রমে উঠোনের বাইরে

এসে গ্রামের উত্তর দিকে যেতে লাগল। আকাশ গভীর মেঘাচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, পল্লী-পথ জনহীন, নরেনের সঙ্গী কেবল মালতী। সে মানুষ নয়, নরেন জানে। শুধু তাই নয়, নরেন দুর্বল বলে মালতী তার হাত ধরে আছে। মালতী তাকে বললে, 'এখন তুমি বেশি পরিশ্রম করো না, তুমি আমার কাঁধে ভর দিয়ে চল, মনে রেখ, আসবার সময় আমি তোমার কাছে থাকতে পারব না, তোমাকে নিজেই আসতে হবে।'

এইভাবে তারা দুজনে যাচ্ছে, গ্রাম্যপথ ছেড়ে তারা ধানক্ষেতের দিকে গেল এবং সরু আলের উপর দিয়ে যেতে লাগল, গভীর অন্ধকারে মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের আলোতে নরেন পথ দেখতে পাচ্ছে, অন্য সময়ে সম্পূর্ণ মালতীর উপর নির্ভর। ক্রমে তারা নদীর ধারে পৌঁছল, সামনেই শ্মশান, যার নাম কালাপেড়ের দেয়াড়। কটি তেঁতুল গাছ দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। নির্জন স্থান! নরেনের বুক সবলে স্পন্দিত হতে লাগল, কিন্তু রোজার কথা তখন তার কানে বাজছে, 'নরেনবাবু, আপনার জীবন আপনার হাতে, ভূতনাথকে স্মরণ করবেন, কোন ভয় নেই।'

এইবার জঙ্গল আরম্ভ হল, এখন আর পথ নেই, প্রেতিনী যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে মানুষ সেদিকে যাচ্ছে। একটু পরে ডানদিকে একটি বড় অশ্বত্থ গাছ দেখা গেল। মালতী নরেনকে ছেড়ে দিয়ে বললে, 'ওই গাছটার ওপারে আগাছার জঙ্গল আছে। সেখানে গোটাকতক লতানে গাছ আছে, তারই একটা শিকড়সুদ্ধ তুলে নিয়ে এস, তোমাকে একলাই যেতে হবে।'

প্রেতিনীর নির্দেশমত নরেন অগ্রসর হয়ে গেল এবং সেখানে কয়েকটি লতানে গাছ দেখতে পেল। মূলসুদ্ধ একটি লতানে গাছ তুলে এনে নরেন পূর্বস্থানে ফিরে এল, কিন্তু মালতীকে সে-স্থানে দেখতে পেলে না। সে ভয়কম্পিত স্বরে ডাকল, 'মালতী··· !'

প্রায় পঞ্চাশ হাত দূর থেকে মালতী জবাব দিলে, 'আমি এখানে আছি। এখন তো মেঘ খানিকটা কেটে গেছে এবং অল্প চাঁদের আলো ফুটেছে, আমার সাদা কাপড় তো তুমি দেখতে পাচ্ছ, আমি এগিয়ে যাচ্ছি, তুমি পেছনে পেছনে এস।'

নরেন দ্রুতপদে মালতীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললে, 'আগে তুমি শিকড়টি দেখ তো যে ঠিক জিনিসটি এনেছি কিনা।'

মালতী সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক জিনিসই এনেছ, তুমি আমার অত কাছে এস না।'

মালতী এগিয়ে যাচ্ছে আর পঞ্চাশ হাত পিছু পিছু নরেন আসছে। আবার সেই নদীর ধার—সেই কালাপেড়ের দেয়াড়। সেই ধানক্ষেত, আর সরু আলের রাস্তা। আবছা আলোতে নরেন মালতীকে দেখতে পাচ্ছে। ক্রমে গ্রাম্যপথে এসে পৌঁছল এবং অবশেষে বাড়ি।

মালতী চেঁচিয়ে বললে, 'তুমি শিকড়টা অন্য ঘরে রেখে এস, এখনও দু'টা বাজতে আধ ঘণ্টা দেরি আছে।'

নরেনের রোজার কথা মনে হল। পরিত্রাণের উপায় পেলে তা এক মুহূর্তের জন্য ত্যাগ করবে না, তাই নরেন মালতীকে বললে, 'আজ আমি বড় ক্লান্ত, আজ যাও, কাল তুমি এস।'

মালতী বললে, 'বেশ, তাই হোক্। এখনই শিকড়টি হাতে বেঁধে ফেল, কাল রাত বারটার সময় আবার খুলে রেখ।'

নরেন বাড়িতে পৌঁছেই জমিদারবাবুর বৈঠকখানা ঘরে গেল। সেখানে রোজা, দেবেনবাবু ও তার বাবা গভীর দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে বসেছিলেন। নরেনকে দেখতে পেয়ে তাঁরা আনন্দে কলরব করে উঠলেন। রোজা জিজ্ঞাসা করলে, 'ওষুধ পেয়েছেন? কি জিনিস পেলেন দেখি।'

নরেন শিকড়সুদ্ধ লতাটি রোজাকে দিলে আর মালতী তাকে যা যা বলে দিয়েছিল তাও বললে।

রোজা বললে, 'আর ভয় নেই, জয় ভগবান!'

সেই রাত্রেই এক বালার ভিতরে সেই শিকড় রেখে নরেনের বাহুতে মোক্ষম করে বেঁধে দেওয়া হল। সে এমন বজ্র বাঁধন যে নরেন নিজে হাজার চেষ্টা করলেও অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে সে বালা খুলতে পারবে না। এ বালা রোজাই সঙ্গে এনেছিল এবং এর গঠনও একটু বিশেষ রকমের।

নরেনকে বালা পরিয়ে রোজা বললে, 'এখন দিনকতক রাত্রে ও রোজ আসবে এবং অনুনয়, বিনয়, এমন কি ভয় প্রদর্শনও করবে। কিন্তু এই বালাই আপনার 'ইষ্টকবচ'। সে যাই বলুক আর যাই

করুক, আপনি প্রাণান্তেও এই বালা খোলবার চেষ্টা করবেন না।'

রোজা যা বলেছিল তাই হল। নরেন পরদিন রাত্রে দরজা বন্ধ করে ঘরে শুয়েছে আর মালতী ঘরের বাইরে থেকে শিকড়টি খুলে ফেলবার জন্য অনুনয়-বিনয় করছে। আজ আর সে বন্ধ দরজার ভিতর দিয়ে ঘরে আসতে পারলে না। নরেন মালতীর কথার কোন জবাব দিলে না। প্রথম দু'তিন রাত্রি অনুনয়-বিনয় ও পরে ভয় প্রদর্শন, 'আমার কথা না শুনলে, আমি তোমার প্রাণ নেব, কেউ তোমায় বাঁচাতে পারবে না।'

কিন্তু নরেন নিরুত্তর। এই উপদ্রব আট-দশ দিন চলেছিল, তার পরে মালতী আসেনি। নরেন তার বাবার সঙ্গে গ্রামে ফিরে গেল এবং মা-বাবার আদর-যত্নে অতি শীঘ্রই তার পূর্ব স্বাস্থ্য ও মনের বল ফিরে পেল। নরেনের আনন্দ, মা-বাবার আনন্দ, আত্মীয়-স্বজনের আনন্দ, প্রতিবেশীর আনন্দ, জমিদারবাবু ও তাঁর পরিবারবর্গের আনন্দ, আর সবচেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে রোজার। শুধু সে যে একটি অমূল্য জীবন রক্ষা করেছে তাই নয়, সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছে। শুধু তাই নয়, জমিদারবাবু তার কোঁচড় টাকায় ভরে দিয়েছিলেন। *

* এই গল্প আমি খুব ছোটবেলায় শুনেছিলাম। —লেখক
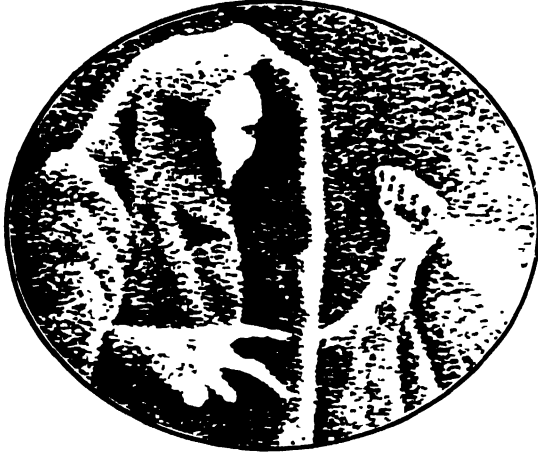
দেহান্তর

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বরদা বলিল, 'যারা প্রেতযোনিতে বিশ্বাস করে না তাদের জোর করে বিশ্বাস করাতে যাওয়া উচিত নয়, আমি কখনো সে চেষ্টা করি না। কেবল একবার—'

নিদাঘকাল সমুপস্থিত। মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন, এই সময় সূর্য প্রচণ্ড হয় এবং চন্দ্র হয় স্পৃহনীয়। সূর্যের প্রচণ্ডতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হয় না; পরন্তু চন্দ্রের স্পৃহনীয়তা যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে আমরা ক্লাবের কয়েকজন সভ্য সন্ধ্যার পর ক্লাবের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে শতরঞ্চি পাতিয়া বসিয়াছিলাম। পূর্বাকাশে বেশ একটি নধর চাঁদ গাছপালা ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়াছে; তাহার আলোয় পরস্পর মুখ দেখিতে কষ্ট হয় না। অধিকাংশ সভ্যই ঊর্ধ্বদেহিক আবরণ মোচন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

ক্লাবের ভৃত্যকে ভাঙের সরবৎ তৈয়ার করিবার ফরমাশ দেওয়া হইয়াছিল। চন্দ্র যতই স্পৃহনীয় হোক, সেই সঙ্গে বরফ-শীতল সরবৎ পেটে পড়িলে শরীর আরও সহজে স্নিগ্ধ হয়। আমরা সতৃষ্ণভাবে সরবতের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

এইরূপ পরিবেশের মধ্যে বরদা যখন বলিল, 'যারা প্রেতযোনিতে বিশ্বাস করে না—' ইত্যাদি, তখন আমরা শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। ছুঁচের মত সূক্ষ্মাগ্র এই প্রস্তাবনাটি যে অচিরাৎ ফাল হইয়া গল্পের আকারে দেখা দিবে, তাহাতে কারও সন্দেহ রহিল না। ভূতের গল্প শোনার পক্ষে গ্রীষ্মের চাঁদিনী রাত্রি অনুকূল নয়, এজন্য শীতের সন্ধ্যা কিংবা বর্ষার রাত্রি প্রশস্ত। কিন্তু বরদা যখন ভণিতা করিয়াছে, তখন আর নিস্তার নাই।

ভাগ্যক্রমে এই সময় সরবৎ আসিয়া পড়িল। আমরা প্রত্যেকে হৃষ্টচিত্তে একটি করিয়া ঠাণ্ডা গেলাস তুলিয়া লইলাম। পৃথ্বী গেলাসের কানায় একটি ক্ষুদ্র চুমুক দিয়া বলিল, 'আঃ! দুনিয়াটা যদি মন্ত্রবলে এই সরবতের মত ঠাণ্ডা হয়ে যেত—'

বরদা বলিল, 'দুনিয়া বলতে তুমি কি বোঝ? এই ভারতবর্ষেই এমন জায়গা আছে, যেখানে এখন

বরফ পড়ছে। গত বছর এই সময় আমি পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলুম, দেখলুম দিব্যি শীত—'

প্রশ্ন করিলাম, 'পাহাড়ে ? কোন পাহাড়ে ?'

বরদা বলিল, 'মনে কর মসুরী কিংবা নৈনিতাল। নাম বলব না, তবে সৌখিন হাওয়া বদলানোব জায়গা নয়। আমাব বড় কুটুম্ব সেখানে বদলি হয়েছেন, তাঁর নিমন্ত্রণে মাসখানেক গিয়ে ছিলুম। সেখানে একটা ঘটনা ঘটেছিল—'

অমূল্য সন্দিগ্ধভাবে বলিল, 'ঘটনা না হয় ঘটেছিল, কিন্তু পাহাড়ের নাম বলতে লজ্জা কিসের ?'

বরদা বলিল, 'লজ্জা নেই। যে গল্প তোমাদের শোনাতে যাচ্ছি তার পাত্রপাত্রী সবাই জীবিত, তাই একটু ঢাকাঢুকি দিয়ে বলতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে এমন উৎকট ব্যাপার ঘটে যায়—যা হোক, গল্পটা বলি শোন।'—

হিল্ স্টেশনে যাঁরা বাস করেন তাঁদের চালচলন একটু বিলিতি ঘেঁষা হয়ে পড়ে। পুরুষেরা সচরাচর কোট-প্যান্ট পরেন। মেয়েরা অবশ্য শাড়ি ছাড়েননি, কিন্তু হাবভাব ঠিক দিশী বলা চলে না। টেবিলে বসে স্ত্রী-পুরুষের এক সঙ্গে খাওয়া, ডিনারের পর দু'এক পেগ হুইস্কি বা পোর্ট—এসব সামাজিক ব্যবহারের অঙ্গ হয়ে গেছে। দোষ দেওয়া যায় না—শীতের রাজ্যে শীতের নিয়ম মেনে চলাই ভাল।

শ্যালকের চিঠি পেয়ে আমি তো গিয়ে পৌঁছলুম। দু'চার দিন থাকতে না থাকতেই গায়ে বেশ গত্তি লাগল। আমার শ্যালকটি দারুন মাংসাশী, বাড়িতে রোজ মুর্গি মাটনের শ্রাদ্ধ চলেছে। তাব ওপব পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো। ঘন্টায় ঘন্টায় ক্ষিদে পায়। জায়গাটা সত্যিই চমৎকার ; যেমন জল-হাওয়া, তেমনি তার প্রাকৃতিক দৃশ্য।

কয়েকটি নতুন বন্ধু জুটে গেল। এখানে দশ-বারো ঘর বাঙালী আছেন, সকলেই ভারি মিশুক নতুন লোক পেলে খুব খুশি হন। একটি ছোকরার সঙ্গে আলাপ হল, তার নাম প্রমথ রায়। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ, যেমন মিষ্টি চেহারা তেমনি নরম স্বভাব। ভাল সরকারী চাকরি করে ; মনটা অতি আধুনিক হলেও উগ্র নয়। প্রায় রোজই বিকেলবেলা টেনিস খেলে ফেরবার পথে আমাদেব বাসায় ঢুঁ মারত। ছোকরা অবিবাহিত ; একলা থাকে। তাই আমাদের সঙ্গে খানিক গল্পগুজব করে দু' এক পেয়ালা চা কিংবা কক্‌টেল সেবন করে সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরত।

একদিন কথায় কথায় আমার শ্যালক প্রেতযোনির কথা তুললেন ; বললেন, 'ওহে প্রমথ, তোমরা তো ভূতপ্রেত কিছুই মানো না। আমাদের বরদা একজন পাকা ভূতজ্ঞানী ব্যক্তি। ভূতেব প্রমাণ যদি চাও, ওর কাছে পাবে।'

প্রমথ হেসে উঠল ; বলল, 'আপনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি হয়ে এইসব বিশ্বাস করেন ?'

কথাটা সে হালকা ভাবে বললেও গায়ে লাগল ; বললুম, 'শিক্ষিত লোকেবা এমন অনেক জিনিস বিশ্বাস করেন যা বিশ্বাস করতে অশিক্ষিত লোক লজ্জা পাবে।'

'যথা ?'

'যথা—ফ্রয়েডিয়ান সাইকো আনালিসিস কিংবা প্যাব্‌লভের বিহেভিয়ারিজম।'

প্রমথ হাসতে লাগল। সে বুদ্ধিমান ছেলে তাই এঁড়ে তর্ক করল না। ভূতের কথা ওইখানেই চাপা পড়ল।

আমার পাহাড়ে আসার পর দু'হপ্তা কেটে গেল। দিব্যি আরামে আছি ; ওজন বেড়ে যাচ্ছে। মনে চিন্তা নেই, গায়ে ঘাম নেই, বিছানায় ছারপোকা নেই ; খাওয়া ঘুমোনো আর ঘুরে বেড়ানো এই তিন কাজে দিবারাত্রি কোথা দিয়ে কেটে যায় বুঝতে পারি না। জীবনে এরকম সুসময় ক্বচিৎ এসে পড়ে ; কিন্তু বেশি দিন থাকে না।

প্রমথ একদিন আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ করল। আমি আর শ্যালক যথাসময়ে তার বাসায় উপস্থিত হলুম। আর কেউ নিমন্ত্রিত হয়নি জানতুম ; কিন্তু গিয়ে দেখি একটি তরুণী রয়েছেন। এঁকে আগে কখনো দেখিনি। সুন্দরী তন্বী দীর্ঘাঙ্গী, মুখে একটু বিষাদের ছায়া। সাজসজ্জায় প্রসাধনে বর্ণবাহুল্য নেই, কিন্তু যত্ন আছে। চেহারা দেখে বয়স কুড়ি একুশ মনে হয়, হয়তো দু'এক বছর বেশি হতে পারে।

শ্যালক খুব আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে সম্ভাষণ করলেন, 'এই যে, মিসেস দাস, কি সৌভাগ্য ! আপনার

সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, উনি ধরে নিয়ে এলেন।'

প্রমথ তখন মহিলাটির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিল। ইশারায় বুঝলুম, মিসেস দাস বিধবা। শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে 'হর জটা' নামে একটি উঁচু গিরিশিখর আছে ; খুব ছোট জায়গা, মাত্র দশ বারোটি বাংলো আছে। সেইখানে মিসেস দাস থাকেন। হর জটা থেকে শহরের পথ সুগম নয়, মাঝে একটা উপত্যকা পড়ে ; তাই সেখানে যাঁরা থাকেন তাঁরা মাঝে মাঝে শহরে এসে আবশ্যক মত কেনাকাটা করে নিয়ে যান।

চা কেক সহযোগে গল্প চলতে লাগল। লক্ষ্য করলুম মিসেস দাস একদিকে যেমন সম্পূর্ণরূপে আধুনিকা অন্যদিকে তেমনি শান্ত আর সংযত। তাঁর সুন্দর চেহারার একটা প্রবল আকর্ষণ আছে, অথচ তাঁর সঙ্গে খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা করাও চলে না। তিনি অত্যন্ত সহজভাবে সকলের সঙ্গে হাসিঠাট্টায় যোগ দিতে পারেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে প্রগলভতা করবার সাহস কারুর নেই। তাঁর সুকুমারত্বই যেন বর্ম।

প্রমথকেও সেই সঙ্গে লক্ষ্য করলুম। এতদিন বুঝতে পারিনি যে, তার জীবনে প্রেমঘটিত কোন জটিলতা আছে ; এখন দেখলুম বেচারা একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে। কম্পাসের কাঁটা অন্য সময় ঠিক থাকে ; কিন্তু চুম্বকের কাছে এলে একেবারে অধীর অসংবৃত হয়ে পড়ে , প্রমথর অবস্থাও সেই রকম। তার প্রতিটি কথা, প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করে দিচ্ছে যে, ওই মেয়েটিকে সে ভালবাসে ; লোক লজ্জার খাতিরেও মনের অবস্থা লুকোবার ক্ষমতা তার নেই।

অথচ মিসেস দাস বিধবা, হোন প্রগতিশীলা আধুনিকা তবু হিন্দু বিধবা।

মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠলুম। পাহাড়ের হিমেল হাওয়ায় এই যে বিচিত্র রোমান্স অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে, এর পরিণতি কোথায় ?

চায়ের পর্ব শেষ হতেই মিসেস দাস উঠে পড়লেন, দিনের আলো থাকতে থাকতে তাকে হর জটায় ফিরতে হবে। তিনি আমাদের তিনজনকে দৃষ্টির আমন্ত্রণে টেনে নিয়ে বললেন, 'একদিন হর জটায় আসুন না। একটু নিরিবিলি এই যা, নইলে খুব সুন্দর জায়গা। এমন সূর্যোদয় পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা যায় না। আসবেন।'

আমরা গলার মধ্যে ধন্যবাদসূচক আওয়াজ করলুম। তিনি চলে গেলেন। তারপর আরও কিছুক্ষণ বসে আমরাও উঠলুম। অতিথি সৎকারের যথোচিত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রমথ ক্রমাগত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে দেখে তাকে আর কষ্ট দিতে ইচ্ছে হল না।

বাড়ি ফেরার পথে শ্যালককে জিজ্ঞেস করলুম, 'কি হে, ব্যাপার কি ? ভেতরে কিছু কথা আছে নাকি ?'

শ্যালক আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন, 'তুমিও লক্ষ্য করেছ দেখছি। আমি গুজব শুনেছিলুম, আজ চোখে দেখলুম। প্রমথ সাবিত্রীকে বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপে উঠেছে।'

'ওঁর নাম বুঝি সাবিত্রী ? তা উনি কি বলেন ?'

'যতদূর শুনেছি, সাবিত্রীর মত নেই।'

'মত নেই কেন ? হিন্দু সংস্কার ? না অন্য কিছু ?'

'তা ভাই ঠিক বলতে পারি না। কতকটা সংস্কার হতে পারে, আবার কতকটা মৃত স্বামীর প্রতি ভালবাসাও হতে পারে।'

জিজ্ঞেস করলুম, 'স্বামী কতদিন মারা গেছেন ?'

শ্যালক বললেন, 'তা প্রায় বছর দুই হতে চলল। ভদ্রলোক রেলের বড় ইঞ্জিনিয়র ছিলেন ; হঠাৎ রেলে কাটা পড়লেন।'

'তোমার সঙ্গে পরিচয় ছিল ?'

'সামান্য। খুব রাশভারী জবরদস্ত লোক, বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ বছর হয়েছিল। মাত্র বছর খানেক সাবিত্রীকে বিয়ে করেছিলেন।'

'মিসেস দাস হর-জটায় থাকেন কেন ?'

'বাড়িটা দাসের ছিল, সাবিত্রী উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। তাছাড়া দাস 'অন্ ডিউটি' মারা গিয়েছিলেন তাই রেলওয়ে থেকে তাঁর বিধবা একটা মাসহারা পায়। তাইতেই চলে।'

'সাবিত্রী কেমন মেয়ে তোমার মনে হয় ?'

'খুব ভাল ; অমন মেয়ে দেখা যায় না। এই বয়সে একলা থাকে, কিন্তু কেউ কখনো ওর নামে একটা কথা বলতে পারেনি।'

'বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তোমার মতামত কি ?'

'এরকম ক্ষেত্রে হওয়াই ভাল। সারা জীবন অতীতের পানে চেয়ে কাটিয়ে দেওয়ার কোন মানে হয় না। ছেলেপুলে থাকলেও বা কথা ছিল। কিন্তু সাবিত্রী বোধ হয় বিয়ে করবে না।'

এই ঘটনার পর আরও দিন দশেক কেটে গেল। প্রমথ আর আসেনি। আমরা তার মনের কথা আঁচ করেছি বলেই বোধ হয় সে আমাদের এড়িয়ে যাচ্ছে।

আমারও স্বর্গ হতে বিদায় নেবার সময় হল। আমি পাততাড়ি গুটোচ্ছি এমন সময় একদিন প্রমথ এল। একটু লজ্জা লজ্জা ভাব। দু'চার কথার পর বলল, 'মিসেস দাস চিঠি লিখে আমাদের তিনজনকে হর-জটায় নেমন্তন্ন করেছেন, সূর্যোদয় দেখবার জন্যে। যাবেন ?'

আমার কোনই আপত্তি ছিল না। কিন্তু শ্যালক আপত্তি তুললেন, 'সূর্যোদয় দেখতে হলে তার আগের রাত্রে গিয়ে হর-জটায় থাকতে হয়, কিংবা রাত্রি দুটোর সময় এখান থেকে বেরুতে হয়। সে কি সুবিধে হবে ?'

প্রমথ পকেট থেকে চিঠি বার করে বলল, 'তাঁর চিঠি পড়ে দেখুন, অসুবিধে বোধ হয় হবে না।'

চিঠিতে লেখা ছিল—

প্রীতি নমস্কারান্তে নিবেদন, প্রমথবাবু, দেখছি আমার সেদিনের নিমন্ত্রণ আপনারা মুখের কথা মনে করেছেন। আমি কিন্তু সত্যিই আপনাদের তিনজনকে নিমন্ত্রণ করেছিলুম। আসুন না। রাত্রে আমার বাড়িতে থেকে সকালে সূর্যোদয় দেখবেন। কষ্ট হবে না ; আমার বাড়িতে তিনজন অতিথিকে স্থান দেবার মত জায়গা আছে।

কবে আসবেন জানাবেন। কিংবা না জানিয়ে যদি এসে উপস্থিত হন তাহলেও খুশি হব। আশা করি ভাল আছেন।

নিবেদিকা—সাবিত্রী দাস

এর পর আর শ্যালকের আপত্তি রইল না। প্রমথ উৎসাহিত হয়ে বলল, 'আজ শনিবার আছে, চলুন না আজই যাওয়া যাক। পাঁচটার সময় বেরুলে সন্ধের আগেই পৌঁছুনো যাবে।'

তাই ঠিক করে বেরিয়ে পড়া গেল।

হর-জটা শিখরটি উপত্যকা থেকে দেখা যায়, সত্যি হর-জটা নাম সার্থক। যেন ধ্যানমগ্ন মহাদেবের জটা পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরে উঠেছে ; তার খাঁজে খাঁজে সাদা বাংলোগুলি ধুতুরা ফুলের মত ফুটে আছে। অপূর্ব দৃশ্য। কিন্তু সেখানে পৌঁছুবার রাস্তাটি অপূর্ব নয় ; তিন মাইল পথ হাঁটতে পাক্কা আড়াই ঘণ্টা লাগল।

আমরা যখন মিসেস দাসের বাংলোর সামনে গিয়ে হাজির হলুম তখন দিনের আলো ফুরিয়ে এসেছে ; তবু হর-জটার কুটিল কুণ্ডলীতে সূর্যাস্তের আবীর লেগে আছে। মিসেস দাস বাড়ির সামনের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে ছিলেন, উৎফুল্ল কলকাকলি দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। আমাদের দেখে তাঁর এই অকৃত্রিম আনন্দ বড় ভাল লাগল।

শোনা যায়, আসন্ন দুর্ঘটনা সামনে কালো ছায়া ফেলে তার আগমনবার্তা জানিয়ে দেয়। কিন্তু আশ্চর্য, সেদিন দুর্ঘটনার বিন্দুমাত্র পূর্বাভাস পাইনি। সেই পার্বত্য সন্ধ্যার গৈরিক আলো—মনে হয়েছিল, এ আলো নয়, অপরূপ এক দৈবী প্রসন্নতা। তার আড়ালে যে লেশমাত্র অশুভ লুকিয়ে থাকতে পারে তা কল্পনা করাও যায় না। আমার বোধ হয় প্রমথও কিছু আভাস পায়নি।

মিসেস দাস আমাদের বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলেন। গরম জলে মুখ-হাত ধুয়ে ড্রয়িং রুমে এসে দেখি চা তৈরি। বাড়িতে পুরুষ চাকর নেই ; দু'টি পাহাড়ী মেয়েমানুষ কাজকর্ম রান্নাবান্না করে এবং রাত্রে থাকে।

হর-জটায় এখনো বিদ্যুৎবাতি এসে পৌঁছয়নি। কেরোসিন ল্যাম্পের মোলায়েম আলোয় চা খেতে বসলুম। মিসেস দাস চাকরানিদের সাহায্যে আমাদের পরিচর্যা করতে লাগলেন।

ড্রয়িং রুমের দেয়ালে একটা এনলার্জ করা ফটোগ্রাফ টাঙানো ছিল। দূর থেকে ভাল করে

দেখতে পাচ্ছিলুম না ; চা খাওয়া শেষ হলে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। ইনিই অকাল-মৃত মিস্টার দাস সন্দেহ নেই। ভাল করে দেখলুম। চেহারা সুন্দর বলা চলে না, কিন্তু একটা দৃঢ়তা আছে ; চওড়া চিবুকের মাঝখানে খাঁজ, চোখের দৃষ্টি একটু কড়া। ফটো তোলবার সময় ঠোঁটের কোণে যে হাসি আনার নিয়ম আছে সেটি অবশ্য রয়েছে, কিন্তু হাসি দিয়ে চরিত্রের দৃঢ় বলিষ্ঠতা ঢাকা পড়েনি।

মনে মনে এই মুখখানার সঙ্গে প্রমথর নরম মিষ্টি মুখের তুলনা করছি এমন সময় পাশে মৃদুকণ্ঠেব আওয়াজ হল, 'আমার স্বামী।'

দেখলুম মিসেস দাস আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তারপর প্রমথও এসে দাঁড়াল। মিসেস দাস কিছুক্ষণ ফটোর দিকে তাকিয়ে থেকে চকিতে প্রমথর পানে চাইলেন। তাঁর মুখখানি শান্ত, মুখ দেখে মনের কথা ধরা যায় না ; তবু সন্দেহ হল তিনিও আমারই মত ফটোর সঙ্গে প্রমথর মুখ তুলনা করলেন।

আমরা আবার ফিরে এসে বসলুম।

মেয়েমানুষের মন বোঝা সহজ নয় ; বিশেষত মিসেস দাসের মত মেয়েব মন। কবি বলেছেন, রমণীর মন সহস্র বর্ষের সখ্য সাধনার ধন। আমি ভাবতে লাগলাম, ইনি প্রমথকে বিয়ে কবতে অস্বীকার করছেন একথা নিশ্চয় সত্যি, কিন্তু প্রমথ সম্বন্ধে তাঁর মনে কি কোন দুর্বলতা নেই ? এই যে আজ তিনি আমার মতন একজন অপরিচিত লোককে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন এটা কি শুধুই লৌকিক সহৃদয়তা ? না এর অন্তরালে একজন বিশেষ ব্যক্তিকে কাছে পাবার অভিপ্রায় লুকিয়ে ছিল ?

প্রমথর অবস্থা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। সেদিন যেমন দেখেছিলুম আজও ঠিক তাই। চুম্বকাবিষ্ট কম্পাসের কাঁটা, অন্য কোন দিকেই তাঁর লক্ষ্য নেই।

ক্রমে রাত্রি হল। উত্তর দিক থেকে একটা খুব ঠাণ্ডা হাওয়া উঠে মাথার ওপব দিয়ে সাঁই সাঁই শব্দে বইতে লাগল।

রান্নাবান্না হতে স্বভাবতই একটু দেরি হল। আমরা রাত্রির খাওয়া শেষ কবে যখন উঠলুম তখন প্রায় এগারোটা বাজে। মিসেস দাস বললেন, 'আপনারা শুয়ে পড়ুন গিয়ে। সকাল সাড়ে তিনটের আগে কিন্তু উঠতে হবে, নইলে সূর্যোদয়ের সব সৌন্দর্য দেখতে পাবেন না।'

ভাবনা হল, এখন শুতে গেলে সাড়ে তিনটের সময় ঘুম ভাঙবে কি ? যদি না ভাঙে আজকের অভিযানটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। জিজ্ঞেস করলুম, 'অ্যালার্ম ঘড়ি আছে কি ?'

মিসেস দাস বললেন, 'না। কিন্তু সেজন্য ভাববেন না ; আমি ঠিক সময়ে আপনাদের তুলে দেব।'

শ্যালক বললেন, 'কিন্তু আপনার ঘুম যে ভাঙবে তার ঠিক কি ?'

মিসেস দাস একটু হেসে বললেন, 'আমি ঘুমোব না, এই ক'ঘণ্টা বই পড়ে কাটিয়ে দেব। আমার অভ্যেস আছে।'

অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম। আমরা ঘুমোব আর ভদ্রমহিলা সারারাত জেগে থাকবেন ?

হঠাৎ প্রমথ তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'তাহলে আমিও জেগে থাকি।' আমাদের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনারা শুয়ে পড়ুন।'

আমার মন কিন্তু এ প্রস্তাবে সায় দিল না। আমরা দুজন বয়স্ক ব্যক্তি ঘুমোব, আর এই দুটি যুবক-যুবতী সারারাত্রি একত্র থাকবে—

শ্যালক সমস্যা ভঞ্জন করে দিয়ে বললেন, 'তবে আমরা সকলেই জেগে থাকি না কেন ? আমার আবার নতুন জায়গায় সহজে ঘুম আসে না ; এমনিতেই হয়তো চোখ চেয়ে রাত কেটে যাবে।'

আমি বললাম, 'আমারও ঠিক তাই।'

মিসেস দাস আপত্তি করলেন, কিন্তু আমরা শুনলুম না। ড্রয়িং রুমে বেশ জুৎ করে বসা গেল। চার ঘণ্টা দেখতে দেখতে কেটে যাবে। শ্যালক প্রস্তাব করলেন, তাস খেলা যাক ; কিন্তু বাড়িতে তাস ছিল না বলে তা আর হল না।

প্রথমে খুব উৎসাহের সঙ্গে আরম্ভ হয়ে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে গল্প চলেছে। মিসেস দাস একটি হেলান দেওয়া চেয়ারে শুয়েছেন ; শ্যালক সোফায় লম্বা হয়ে সিগার টানছেন ; আমিও একটা গদি মোড়া চেয়ারে গুটিসুটি হয়ে বেশ আরাম অনুভব করছি ; কেবল প্রমথ অস্থিরভাবে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে,

এটা ওটা নাড়ছে, আলোটা কখনো কমিয়ে দিচ্ছে কখনো বাড়িয়ে দিচ্ছে—

মিসেস দাসের শান্ত চোখ তাকে অনুসরণ করছে।

বারোটা বাজল।

শ্যালক উঠে বসলেন, সিগারের দগ্ধ প্রান্তটুকু অ্যাশট্রের ওপর রেখে বললেন, 'আচ্ছা মিসেস দাস, আপনি এই বাড়িতে একলা থাকেন, আপনার ভয় করে না?'

মিসেস দাস একটু ভুরু তুলে তাকালেন, 'ভয়? কিসের ভয়?'

বাড়িব মাথার ওপর ঠাণ্ডা বাতাসটা সাঁই সাঁই শব্দ করে চলেছে; আমি একটা হাই চাপা দিয়ে বললুম, 'মনে করুন ভূতের ভয়।'

প্রমথ মিস্টাব দাসের ফটোগ্রাফের সামনে দাঁড়িয়ে বিরাগ-ভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিল, আমাব কথা শুনে চকিতে ফিরে চাইল; তারপর আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়াল। বিদ্রূপ করে বলল, 'ভূতের ভয়! সে আবার কি? ভূত বলে কিছু আছে নাকি? বরদাবাবুর যত কুসংস্কার।'

মিসেস দাসকে জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনারও কি তাই মত?'

তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'পরজন্ম আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু ভূত—কি জানি—'

প্রমথ জোর গলায় বলে উঠল, 'ভূত নেই। ভূত শব্দের যে অর্থই ধর, ভূত থাকতে পারে না। আছে শুধু বর্তমান আব ভবিষ্যৎ। এই কি যথেষ্ট নয়?'

তার মুখের পানে তাকালুম; মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। প্রমথ নরম স্বভাবের মানুষ, তাকে এত বিচলিত কখনো দেখিনি। যেন সাবিত্রীকে একটা কথা বলবার জন্যে তার প্রাণে প্রবল আবেগ উপস্থিত হয়েছে, অথচ আমাদের সামনে বলতে পারছে না।

শ্যালকও ব্যাপারটা বুঝেছিলেন; তিনি বললেন, 'বর্তমান আর ভবিষ্যৎ যদি থাকে তবে ভূতও থাকতে বাধ্য। আমাদের সকলেরই অতীত জীবন আছে—সেইটেই ভূত। তোমারও ভূত আছে প্রমথ, তাকে এড়ানো সহজ নয়। তবে মরা মানুষের সঙ্গে আমাদের তফাত এই যে, মরা মানুষের সবটাই ভূত; আমাদের কিছুটা বর্তমান আর ভবিষ্যৎ আছে।'

শ্যালক যে ভূত কথাটার দু'রকম অর্থ নিয়ে লোফালুফি করছেন, প্রমথ তা বুঝল না; তার তখন রোখ চেপে গেছে। সে হাত নেড়ে বলল, 'ও সব হেঁয়ালি আমি বুঝি না। মৃত্যুর পর আত্মা যে বেঁচে থাকে তা প্রমাণ করতে পারেন?'

শ্যালক হেসে বললেন, 'আমি কিছুই প্রমাণ করতে পারি না। প্রেতযোনি সম্বন্ধে বরদা খবর রাখে, ওকে জিজ্ঞেস কর।'

আমি বললুম, 'দেখুন প্রমথবাবু, যে লোক জেগে ঘুমোয় তাকে জাগানো যায় না; আপনিও যদি বিশ্বাস করবেন না বলে বদ্ধপরিকর হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে বিশ্বাস করানো কারুর সাধ্য নয়! তবে এইটুকু বলতে পারি, অনেক বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিভাবান লোক প্রেতযোনিতে বিশ্বাস করেছেন। যথা—উইলিয়াম ক্রুক্‌স্, অলিভার লজ, কোনন ডয়েল—'

প্রমথ মুখ শক্ত করে বলল, 'আমি বিশ্বাস করি না। যদি প্রমাণ করতে পারেন তো প্রমাণ করুন, নইলে কেবল কতকগুলো বিলিতী নাম আউড়ে আমাকে কাবু করতে পারবেন না।'

একটু রাগ হল। বললুম, 'বেশ। বিশ্বাস করা না-করা আপনার ইচ্ছে। কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? মিসেস দাস, আসুন, প্ল্যাঞ্চেট করা যাক।'

তিনি একটু শঙ্কিত হয়ে বললেন, 'প্ল্যাঞ্চেট। ভূত নামাবেন?'

বললুম, 'প্রমথবাবুর অবিশ্বাস ভাঙবার আর তো কোন উপায় দেখি না। তবে আপনার যদি ভয় করে তাহলে কাজ নেই।'

তিনি বললেন, 'না, ভয় করবে না।' চকিতে একবার প্রমথর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ তো, করুন না। আর কিছু না হোক সময় তো কাটবে। কি চাই বলুন।'

বললুম, 'বেশি কিছু নয়, শুধু একটা তেপায়া টেবিল হলেই চলবে।'

ছোট একটা তেপায়া টেবিল ঘরেই ছিল। আমি তখন দু'চার কথায় প্ল্যাঞ্চেটের প্রক্রিয়া বুঝিয়ে দিলুম। তারপর আলোটা কমিয়ে দিয়ে চারজনে টেবিল ঘিরে বসা গেল।

শ্যালক প্রশ্ন করলেন, 'কাকে ডাকা হবে?'

আমি বললুম, 'যাকে ইচ্ছে ডাকা যেতে পারে। তবে এমন লোক হওয়া চাই যাকে আমরা সবাই চিনি। অন্তত যার চেহারা আমাদের সকলের জানা আছে।'

আমরা যেখানে বসেছিলুম তার অল্প দূরেই মিস্টার দাসের ছবি দেয়ালে টাঙান ছিল। প্রমথ বসেছিল ছবির দিকে পিঠ করে, আর মিসেস দাস ছিলেন তার সুমুখে। মিসেস দাস ছবির পানে চোখ তুললেন ; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখও সেই দিকে ফিরল। অল্প আলোতে ছবিটা সমস্ত দেখা যাচ্ছে না, কেবল মুখখানা স্পষ্ট হয়ে আছে।

মিসেস দাস ছবি থেকে চোখ নামিয়ে আমার পানে চাইলেন। তাঁর চোখের প্রশ্ন বুঝে আমি বললুম, 'হ্যাঁ, ওঁকেই ডাকা যাক। আমি যদিও ওঁকে দেখিনি তবু ছবিতেই কাজ চলবে। সকলে চোখ বুজে মনে মনে ওঁর কথা ভাবুন।'

আঙুলে আঙুলে ঠেকিয়ে টেবিলের ওপর হাত রাখা হল। তারপর আমরা চোখ বুজে মিস্টার দাসের ধ্যান শুরু করে দিলুম।

প্ল্যাঞ্চেটের টেবিলে যখন প্রেতযোনির আবির্ভাব হয় তখন টেবিলটা নড়তে থাকে : মনে হয় টেবিলের মরা কাঠে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে, তার ভেতর দিয়ে একটা স্পন্দন বইতে থাকে। আমরা প্রায় দশ মিনিট বসে রইলুম, কিন্তু টেবিল নড়ল না, তার মধ্যে জীবন সঞ্চার হল না। তখন চোখ খুলে আর সকলের পানে তাকালুম।

প্রমথকে দেখেই বুঝলুম প্রেতের আবির্ভাব হয়েছে, টেবিলের ওপর নয়, মানুষের ওপর। এমন মাঝে মাঝে হয়, তার মুখটা বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে, ঠোঁট দুটো নড়ছে ; মুখের চেহারা কেমন যেন বদলে গেছে।

প্রেতের উদ্দেশে প্রশ্ন করলুম, 'কেউ এসেছেন কি ?'

প্রমথ আস্তে আস্তে মুখ তুলল ; তারপর টকটকে রাঙা চোখ খুলে মিসেস দাসের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

আমি হাত বাড়িয়ে আলোটা উজ্জ্বল করে দিলুম। এতক্ষণে প্রমথর মুখ ভাল করে দেখা গেল। তার মুখ দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলুম। কঠিন হিংস্র মুখ—ক্রূর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। চোখের দৃষ্টি প্রমথর দৃষ্টি নয়, যেন তার চোখের ভিতর দিয়ে অন্য একজন উঁকি মারছে।

মিসেস দাস সম্মোহিতের মত তার পানে চেয়ে ছিলেন। হঠাৎ প্রমথ উগ্র কণ্ঠে বলে উঠল, 'সাবিত্রী !'

তার গলার আওয়াজ পর্যন্ত বদলে গেছে। মিসেস দাসের চোখ বিস্ফারিত হতে লাগল ; তাঁর ঠোঁট দুটি খুলে গেল। তারপর তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'অ্যাঁ ! তুমি, তুমি !' এই বলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

তারপর যা কাণ্ড বাধল তা বর্ণনা করা যায় না। প্রমথ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ; তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে। আমি তাকে ধরতে গেলুম, কিন্তু আমার সাধ্য কি তাকে ধরে রাখি। তার গায়ে অসুরের শক্তি। আমাকে এক ঝটকায় দূরে সরিয়ে দিয়ে সে সাবিত্রীর অজ্ঞান দেহটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাকে দু হাতে ঝাঁকানি দিতে দিতে গজরাতে লাগল, 'তুমি আবার বিয়ে করতে চাও ? দেব না—দেব না—তুমি আমার—'

ভেবে দ্যাখো, প্রমথর মুখ দিয়ে এই কথাগুলো বেরুচ্ছে ! কিন্তু আমাদের তখন ভাববার সময় নেই ; আমি আর শ্যালক দুজনে মিলে টেনে প্রমথকে আলাদা করলুম। ইতিমধ্যে পাহাড়ী চাকরানি দুটো চেঁচামেচি শুনে এসে পড়েছিল ; তারা সাবিত্রীকে তুলে নিয়ে কৌচের ওপর শুইয়ে দিল। আমরা প্রমথকে টেনে নিয়ে চললুম স্নান ঘরের দিকে ; সেখানে তাকে মেঝেয় ফেলে মাথায় বালতি বালতি জল ঢালতে লাগলুম আর চিৎকার করে বলতে লাগলুম, 'আপনি চলে যান—চলে যান-–'

'না, যাব না—সাবিত্রীকে বিয়ে করতে দেব না—' দাঁত ঘষে ঘষে প্রমথ বলতে লাগল। আমরা জল ঢালতে লাগলুম। ক্রমে তার গলার আওয়াজ জড়িয়ে এল ; হাত-পা ছোঁড়াও বন্ধ হল।

আধঘণ্টা পরে দুজনে মিলে তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গিয়ে একটা বিছানায় শুইয়ে দিলুম। তখন তার গায়ে আর শক্তি নেই, তবু বিজবিজ করে বকছে, 'দেব না—দেব না—'

শ্যালককে তার কাছে বসিয়ে ড্রয়িং রুমে গেলুম। দেখি মিসেস দাসের জ্ঞান হয়েছে। আমাকে

দেখে তিনি ভয়ার্ত কণ্ঠে কেঁদে উঠলেন, 'এ কী হ্ল ! বরদাবাবু, এ কী হ্ল ?'

মেয়েদের মনের অন্তরতম কথা যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন তাদের লজ্জা আর ভয়ের অন্ত থাকে না, কান্নাই তখন তাদের একমাত্র আবরণ। আমি মিসেস দাসের পাশে বসে তাঁকে যথাসাধ্য ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করলুম। তারপর চাকরানিদের বললুম, 'এক পেয়ালা কড়া চা শিগগির তৈরি করে নিয়ে এস।'

সেদিন সূর্যোদয় দেখা মাথায় উঠল। দুই ঘরে দুটি রুগীর পরিচর্যা করতেই বেলা সাতটা বেজে গেল।

যা হোক, মিসেস দাস তো সামলে উঠলেন, কিন্তু প্রমথ সেই বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, কিছুতেই তার ঘুম ভাঙে না। জোর করেও ঘুম ভাঙাতে সাহস হল না, আবার হয়তো বিদঘুটে কাণ্ড আরম্ভ করে দেবে। এদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের আজ ফিরে যেতেই হবে, নইলে অনেক হাঙ্গামা।

বেলা একটা পর্যন্ত যখন প্রমথর ঘুম ভাঙল না, তখন আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলুম। ভাগ্যক্রমে একজন বৃদ্ধ ডাক্তার হর-জটায় বাস করেন, তাঁকে ডাকা হল। তিনি পরীক্ষা করে বললেন, 'বুকে একটু ঠাণ্ডা বসেছে, বিশেষ কিছু নয় ; কিন্তু আজ এঁর বিছানা থেকে ওঠা চলবে না।'

আমরা কাতর চক্ষে মিসেস দাসের পানে চাইলুম। তিনি এতক্ষণে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছেন, বললেন, 'প্রমথবাবু আজ এখানেই থাকুন। আপনারা যদি নিতান্তই না থাকতে পারেন—'

শ্যালক অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'দেখুন, যাওয়া খুবই দরকার, কিন্তু আমরা না থাকলে আপনার যদি কোন লজ্জার কারণ হয়—'

মিসেস দাস বললেন, 'সেজন্যে ভাববেন না।'

বৃদ্ধ ডাক্তার আমাদের কথা শুনছিলেন, তিনি বলে উঠলেন, 'ভাবনার কি আছে ; আমি তো কাছেই থাকি, আমি না হয় রাত্রে এসে সাবিত্রী মা'র বাড়িতে থাকব ; দরকার হলে আমার স্ত্রী এসে থাকতে পারেন। আপনারা ফিরে যান।'

বৃদ্ধ ডাক্তারটি মরমী লোক ; অযথা প্রশ্ন করেন না। আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লুম। প্রমথ সম্বন্ধে চিন্তার কারণ নেই ; ঘুম ভাঙলেই সে সহজ মানুষ হয়ে পড়বে।

বেরুবার সময় মিসেস দাস আমাদের একটু আড়ালে বললেন, 'কাল রাত্রির ঘটনা নিয়ে কোন আলোচনা না হলেই ভাল হয়।'

আমরা আশ্বাস দিলুম, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

তারপর হর-জটা থেকে নেমে এলুম।

পরদিন সন্ধের সময় খবর পেলুম প্রমথ ফিরে এসেছে। কিন্তু সে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল না।

এদিকে আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে, দু'এক দিনের মধ্যে বেরুতে হবে। ভাবলুম, যাই, আমিই প্রমথর সঙ্গে দেখা করে আসি। এইসব ব্যাপারের পর তার হয়তো আসতে সঙ্কোচ হচ্ছে।

পরদিন সকালবেলা বেড়িয়ে ফেরার পথে তার বাসায় গেলুম। সদর দরজা বন্ধ। কড়া নাড়তেই প্রমথ এসে দোর খুলে দাঁড়াল। তার চেহারায় কী একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন হয়েছে। সে কটমট করে কিছুক্ষণ আমার পানে চেয়ে রইল, তারপর দড়াম্ করে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলে।

প্রমথর সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা। তার পরদিনই পাহাড় থেকে নেমে এলুম।

এই পর্যন্ত বলিয়া বরদা থামিল। ইতিমধ্যে চাঁদ অনেকখানি উপরে উঠিয়াছে। ভাঙের নেশার জন্যই হোক বা বরদার গল্প শুনিয়াই হোক, বাতাস বেশ ঠাণ্ডা লাগিতেছে।

পৃথ্বী প্রশ্ন করিল, 'তোমার গল্প এইখানেই শেষ ? না আর কিছু আছে ?'

বরদা একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'আর একটু আছে। মাসখানেক পরে শ্যালকের কাছ থেকে এক চিঠি পেলুম। তিনি এক আশ্চর্য খবর দিয়েছেন ; সাবিত্রীর সঙ্গে প্রমথর সিভিল ম্যারেজ হয়ে গেছে। আমার ধারণা হয়েছিল, যে ব্যাপার ঘটেছে, তারপর তাদের বিয়ে অসম্ভব। প্রমথ যে শেষকালে আমার সঙ্গে অমন রূঢ় ব্যবহার করেছিল, সেটাও আমি তার ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া মনে

করেছিলুম। কিন্তু দেখলুম, আমার হিসেব আগাগোড়াই ভুল।

'শ্যালক আর একটি খবর দিয়েছেন, সেটি আরও অদ্ভুত। এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রমথর চেহারা নাকি অনেকখানি বদলে গেছে ; সকলেই বলছে, তার চেহারা ক্রমশ গতাসু মিস্টার দাসের মতন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমন কি তার চিবুকের মাঝখানে একটা খাঁজ দেখা দিয়েছে—'

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়া বরদা বলিল, 'এতক্ষণ আমি সরলভাবে ঘটনাটি বলে গেছি, নিজের টীকা-টিপ্পনী কিছু দিইনি। এখন তোমরাই এর টীকা-টিপ্পনী কর—এটা কি, মিস্টার দাসের প্রেতাত্মা কি প্রমথকে তার দেহ থেকে উৎখাত করে নিজে কায়েমী হয়ে বসেছেন এবং নিজের বিধবাকে আবার বিয়ে করেছেন ? কিংবা—আর কি হতে পারে ?'

আমরা কেহই উত্তর দিলাম না। বরদা তখন কতকটা নিজ মনেই বলিল, 'যদি তাই হয় তাহলে প্রমথর আত্মাটার কী হল ? কোথায় গেল সে ?'

অকস্মাৎ আকাশে একটা দীর্ঘ আর্ত কর্কশ চিৎকারধ্বনি হইল। আমরা চমকিয়া উর্ধ্বে চাহিলাম ; দেখিলাম, বাদুরের মতো একটা পাখি চাঁদের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে—কালো ত্রিকোণ পাখা মেলিয়া পাখিটা ক্রমে দূরে চলিয়া গেল।

কণ্টকিত দেহে আমরা চাহিয়া রহিলাম।

রিক্‌শাওয়ালা

সজনীকান্ত দাস

সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়াছে। সকাল হইতেই থাকিয়া থাকিয়া ঝুপ ঝুপ করিযা বৃষ্টি নামিয়া জনসঙ্কুল শহরের দৈনন্দিন কাজে ব্যাঘাত জন্মাইতেছিল। পথিকেরা আকাশের খামখেয়ালিপনায় বিরক্ত হইতেছিল ; পথ চলিতে চলিতে বৃষ্টি নামে ; কোন বাড়ির গাড়িবারান্দায় আশ্রয় লইয়া তাহারা কোন রকমে একটু মাথা বাঁচাইয়া লয় ; বৃষ্টি ধরিয়া আসে। ভরসা করিয়া গাড়িবারান্দার আশ্রয় ছাড়িয়া তাহারা যেমনই একটু অগ্রসর হয় অমনই আবার একপশলা বৃষ্টি শুরু হয়।

সমস্ত দিন মেঘ করিয়া ছিল, একটানা না হইলেও বৃষ্টির বিরাম ছিল না। তবুও কেমন একটা গুমোট গরমের ভ্যাপসানিতে কলিকাতার সিক্তসন্ধ্যা থমথম করিতেছিল। এমন দিনে সাধারণত কেহ ঘরের বাহির হয় না। নেহাত প্রয়োজনে ছোট ভাই বিনোদকে সঙ্গে লইয়া স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরিয়া কুমারটুলী অভিমুখে চলিতেছিলাম। তখন বৃষ্টি একটু ধরিয়া আসিয়াছে। শীকরভারাক্রান্ত বায়ুস্তর ভেদ করিয়া গঙ্গার ওপারের কারখানাগুলির আলো মাতালের চোখের মত ঘোলাটে দেখাইতেছিল, ল্যাম্প-পোস্ট ও টেলিগ্রাফ পোস্টগুলির গায়ে কিংবা টেলিগ্রাফের তারে তারে সঞ্চিত জলের উপর গ্যাসের আলো পড়িয়া চকচক করিতেছে। পথে লোকজন বা যানবাহনাদির বিশেষ বালাই ছিল না, ক্বচিৎ কদাচিৎ একআধখানা ট্যাক্সি কিংবা ছ্যাকরা গাড়ি উর্ধ্বশ্বাসে কাদা ছিটাইয়া ছুটিতেছিল ; দূরে একখানা রিক্‌শা ঠুনঠুন ঘণ্টা বাজাইয়া মন্থরগতিতে চলিয়াছে—পিছনের আলোটি চোখের সম্মুখে একটি লাল রেখা টানিয়া দিতেছে।

বৃষ্টির ভয়ে দ্রুত চলিতে লাগিলাম। নিমতলা পার হইতেই বেশ সমারোহসহকারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। একটি গাছতলা আশ্রয় করিয়া কোন রকমে মাথা রক্ষা করিতেছি। দেখি, সেই রিক্‌শাওয়ালা বিশেষ শ্রান্তভাবে সেখানে উপস্থিত হইয়া হাঁপাইতে লাগিল। রিক্‌শাখানা খালি। রিক্‌শাওয়ালা সম্ভবত বহুদূরের সওয়ারী লইয়া তাহাকে গন্তব্য স্থলে পৌঁছাইয়া ফিরিতেছে।

বৃষ্টি থামিবার গতিক দেখিলাম না। তবু ভাল, একখানা রিক্‌শা পাওয়া গেল। এই সামান্য

পথটুকু—কয় পয়সাই বা দিতে হইবে! পরিশ্রান্ত রিক্‌শাওয়ালা ততক্ষণে মুখ মাথা মুছিয়া সুস্থ হইয়াছে। কষাকষি করিয়া দুই আনা ভাড়া স্থির হইল। বিনুকে উঠাইয়া দিয়া নিজে উঠিতে যাইতেছি, রিক্‌শাওয়ালা বলিল, হুজুর, দুজনকে পারব না।

বলিলাম, সে কি রে, এই রোগা রোগা দুজন লোক, আর কতটুকুই বা রাস্তা!

আজ্ঞে না হুজুর, পারব না।

একটু আশ্চর্য হইলেও চটিয়া গেলাম। বলিলাম, দুনিয়াসুদ্ধ রিক্‌শাওয়ালা দুজন তিনজন লোক নেয়। তুই ব্যাটা নিবি না কেন? অমন ষাঁড়ের মত শরীর তোর—

শকেগা নেহি বাবু। — বলিয়া সে সেই বৃষ্টির মধ্যেই বৃক্ষতল ছাড়িয়া গাড়ি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। অমন শক্ত-সমর্থ লোকের ব্যাকুলতাপূর্ণ 'শকেগা নেহি' শুনিয়া মনটা নরম হইল। তাহার দৃষ্টিতে এমন একটা অদ্ভুত শঙ্কা ও কাতরতা মাখানো ছিল যে, আমার মন অস্বস্তিতে ভরিয়া গেল।

বৃষ্টি আর গাছের পাতার আচ্ছাদন মানিল না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিলাম। রিকশাওয়ালা তখন কিছুদূর চলিয়া গিয়াছে। হাঁকিয়া বলিলাম, দশ পয়সা দিব। সে একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিল এবং পরমুহূর্তেই গাড়ি লইয়া দৌড়াইতে শুরু করিল।

বহুদূর হইতে রিক্‌শাখানার ঠুনঠুন আওয়াজ কানে আসিতে লাগিল। পিছনের লাল আলোটি তখনও বর্ষাস্নাত অন্ধকার পথে একটি গতিশীল সিঁদুরটিপের মত দেখাইতেছিল।

সিক্তদেহে পথে নামিয়া পড়িলাম। সেদিন শ্রাবণ নিশীথিনীর গাঢ় তমিস্রা ভেদ করিয়া একটি কঠোর মুখের মলিন বেদনাকাতর দৃষ্টি আমার মনে ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগিতে লাগিল।

কিছুদিন পরের কথা। এলফিন্‌স্টোন পিক্‌চার প্যালেসে ছবি দেখিয়া একটি পরিচিত লোকের অপেক্ষায় হগ সাহেবের বাজারের কোণে দাঁড়াইয়াছিলাম। হঠাৎ এক রিকশাওয়ালার সহিত দুই বিপুলকায় মাড়োয়ারীর বিশুদ্ধ হিন্দিতে বচসা হইতেছে শুনিতে পাইলাম। মাড়োয়ারীযুগলের গলা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য একটু ঔৎসুক্য হইল। কাছে গিয়াই দেখি, স্ট্র্যান্ড রোডের সেই রিক্‌শাওয়ালা। বচসার কারণ -সে দুইজনকে লইতে পারিবে না। ওই দুইটি বিপুলকায় বস্তাকে একসঙ্গে গাড়িতে উঠিতে দিতে যে কোনও রিকশাওয়ালার আপত্তি হইতে পারিত এবং তাহাতে আশ্চর্য হইবার বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু পূর্বের কথা স্মরণ করিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। সেই লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। মাড়োয়ারী দুইজন অন্য যানের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল। রিক্‌শাওয়ালাকে পরীক্ষা করিবার কৌতূহল হইল। তাহার সহিত ভাড়া স্থির করিয়া তাহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া বলিলাম, আমার আর একজন সঙ্গী আছে। করুণ ভাবে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে আমাকে অন্য গাড়ি দেখিতে অনুরোধ করিল—দুইজনকে সে লইতে পারিবে না। আমি এতদূর বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইলাম যে, বন্ধুর অপেক্ষা না করিয়াই রিক্‌শাতে চড়িয়া বসিলাম।

সেদিনও আকাশ ব্যাপিয়া মেঘ করিয়া আসিতেছিল; ঘন ঘন মেঘগর্জন ও বিদ্যুৎচমকে কলিকাতার চঞ্চল আকাশ স্তব্ধ হইয়া আসিয়াছিল। আসন্ন দুর্যোগের আশঙ্কায় রাস্তায় লোক-চলাচল অনেকটা কম। রিক্‌শাওয়ালাকে তাড়া দিলাম, অবিলম্বে বৃষ্টি নামিবে, শীঘ্র বাড়ি পৌঁছানো চাই। জোরে টানিতে গিয়া রিক্‌শাওয়ালা গলদ্‌ঘর্ম হইয়া উঠিল; অবাক হইলাম। আমার মত ক্ষীণকায় পুরুষকে টানিতে এতটা পরিশ্রম হইবার কথা নয়। আগের দিনের মত একটা অজানা অস্বস্তিকর অনুভূতি মনে জাগিতে লাগিল। অমন বিপুলকায় একটা লোক আমার মত একটি সামান্য বোঝাকে টানিতে পারিতেছে না, ইহার কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। একটা অস্পষ্ট অলৌকিক ভয় মনকে পীড়া দিতে লাগল।

বেচারার দুরবস্থা দেখিয়া মায়া হইল। শুধু বোঝা টানার পরিশ্রম ছাড়াও অন্য কোনও যন্ত্রণা তাহার হইতেছিল, তাহারও আভাস পাইতেছিলাম। নানা কল্পনা করিয়া কোনও কিনারা করিতে পারিলাম না। তাহাকে যথেচ্ছ রিক্‌শা টানিতে বলিয়া একটা সিগারেট ধরাইলাম। কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার যথেষ্ট ঔৎসুক্য হওয়া সত্ত্বেও চুপ করিয়া কি ভাবে কথাটা পাড়িব ভাবিতে লাগিলাম।

হঠাৎ চড়বড় করিয়া বৃষ্টি নামিল। রিক্‌শাওয়ালা চকিত হইয়া উঠিল। একটা বাড়ির

গাড়িবারান্দার ধারে আসিয়া তাহাকে থামিতে বলিলাম। দুজনে গাড়িবারান্দার নিচে আসিয়া মাথা মুছিয়া বৃষ্টি থামিবার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

রিক্‌শাওয়ালাকে একটা সিগারেট দিলাম। সে বিনীত সেলাম করিয়া সিগারেট লইয়া ফুটপাথের উপর উবু হইয়া বসিয়া সেটিকে ধরাইল। আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনের অদম্য কৌতূহল আমাকে ভিতর হইতে ঠেলা দিতে লাগিল, কিন্তু পাছে বেফাঁস কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলি—এই ভয় হইতে লাগিল। তাহার নাম কি, কোথায় থাকে, তাহার কে আছে, এগুলি বেশ সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম। তাহার নাম মকবুল, হাতিবাগানের বস্তিতে থাকে, এক বৃদ্ধা ফুফু ছাড়া তাহার কেহ নাই ; শিশু অবস্থা হইতেই সে পিতৃমাতৃহীন—ফুফুর হাতেই মানুষ হইয়াছে। বিবাহ হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করাতে সে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বাবু, যে বোঝা তাহাকে নিরন্তর টানিয়া বেড়াইতে হইতেছে, তাহা লইয়াই সে অস্থির—ইহার উপর জরুর বোঝা বহিতে সে অক্ষম। বলিলাম, বুড়ী ফুফু ছাড়া তাহার কেহ নাই, অথচ অহরহ বোঝা বহিতে হইতেছে, ইহার অর্থ তো বুঝিলাম না। মকবুল চুপ করিয়া রহিল। আমি তাহাকে চিন্তা করিবার অবসর না দিবার জন্য বলিলাম, একটা বিষয়ে আমার ভারি কৌতূহল আছে। কিছুকাল আগে নিমতলাঘাটের কাছে তাহাকে দেখিয়াছিলাম, আজও দেখিলাম ; দুই দিনই সে একজনের অধিক সওয়ারী লইতে অস্বীকার করিয়াছে অথচ সে দুর্বল নয়। ইহার নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। যদি বিশেষ আপত্তি না থাকে তাহা হইলে—

মকবুল চমকিয়া উঠিল। তাহার মুখ অস্বাভাবিক রকম বিবর্ণ হইয়া গেল। হাত দিয়া মাথার রগ টিপিতে টিপিতে সে বলিল, বাবু, সে বড় ভয়ানক কথা। যে কথা মনে হইলেই সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, তাহার বুকের তাজা রক্ত হিম হইয়া যায়, মুখে সে-কথা সে প্রকাশ করিবে কেমন করিয়া ?

বলিতে বলিতে সে সভয়ে রিক্‌শাখানির দিকে চাহিল। কি যেন একটা ভয়াবহ কিছু দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সে উন্মত্তের মত ছুটিয়া গিয়া তেরপলের পর্দা দিয়া রিক্‌শাখানি মুড়িয়া ফেলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া হতাশভাবে বসিয়া পড়িল। তখনও ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ-ঝলকে কি যেন একটা অনন্ত রহস্যের ক্ষণিক আভাস মাত্র পাইতেছিলাম , জলভারাক্রান্ত বাতাস কলিকাতার পাষাণ-প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া একটা একটানা উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করিতেছিল। রাস্তায় জনমানবের চিহ্ন ছিল না।

তাহাকে আর একটা সিগারেট দিয়া আমি তাহার কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলাম। কি যেন একটা অজানা ভয়ে আমার মনও পীড়িত হইতে লাগিল। ব্যাপারটা আগাগোড়া এমন অস্বাভাবিক—মাঝে মাঝে সমস্তটা স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতেছিলাম ; কিন্তু সম্মুখে উপবিষ্ট রিক্‌শাওয়ালাব অস্বাভাবিক-দীপ্তি-সম্পন্ন চোখ দুইটি আমার মনে এক অলৌকিক ভয় জাগাইতেছিল—আমি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম।

কিন্তু এভাবে বসিয়া থাকা চলে না, বাড়ি যাইতে হইবে। এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে বিস্তারিত না জানিয়াও যাওয়া যায় না। বলিলাম, মকবুল, এসব কথা ভাবিতে যদি তোমার কষ্ট হয়, কিছু বলিবাব প্রয়োজন নাই—বৃষ্টি অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে—এখন যাওয়া যাইতে পারে।

সজোরে আমার পা দুইটি চাপিয়া ধরিয়া অধীরভাবে সে বলিয়া উঠিল, আর একটু দাঁড়ান বাবু। যে-কথা তিন বছর ধরিয়া বলিবার জন্য আমি ব্যাকুল, অথচ কাহাকেও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না, আজ আমাকে বলিতে দিন ; এ যন্ত্রণা আর সহিতে পারিতেছি না।

নিবিড় সহানুভূতিতে চিত্ত ভরিয়া গেল। ভুলিয়া গেলাম, আমি মকবুল অপেক্ষা সামাজিক হিসাবে শ্রেষ্ঠ লোক ; তাহার সহিত এভাবে কলিকাতার রাস্তার ফুটপাথে দাঁড়াইয়া আলাপ করাটা আমার পক্ষে হীনতাসূচক। সেই ব্যথাক্লিষ্ট মানুষটির গোপন কথা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম।

মকবুল অতি ধীরে ধীরে থামিয়া থামিয়া হিন্দিমিশ্রিত বাংলায় যাহা বলিল এবং যাহা বলিল না—সবটুকু মিলাইয়া যাহা বুঝিলাম, তাহাই ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতেছি। মকবুল বলিল, বাবু, আমি আপনাকে ব্যাপারটা ঠিক বুঝাইতে পারিব কি না জানি না। ঘটনাটা এমন অসম্ভব আর এমনই ভয়াবহ যে, বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু খোদার কসম বাবু, আমি একটিও মিথ্যা বলিব না। আমি

আজ তিন বৎসর ধরিয়া এই গাড়িতে এক মৃতদেহের বোঝা টানিয়া বেড়াইতেছি। একজনের অধিক লোককে গাড়িতে তুলিয়া টানিতে পারিব কেমন করিয়া ? আর একজন যে নিরন্তর আমার গাড়িতে বসিয়া আছে ! তাহার নড়িবার শক্তি নাই। আমি তাহাকে বহন করিয়া লইয়া ফিরিতেছি। ইহার হাত হইতে আমার নিস্তার নাই। মৃতদেহ পচিয়া ভারী হইয়া গিয়াছে ; আমি অহরহ দুর্গন্ধে অস্থির হইতেছি। মৃতদেহের ভার টানিয়া টানিয়া আমার সবল দেহ জীর্ণ হইয়া আসিল—এই অদৃশ্য শবদেহের ভারে আমি জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছি, আমি আর বাঁচিব না বাবু।

মনে হইল, উপকথা শুনিতেছি ; মনে হইল, কলিকাতার আবেষ্টনী ধোঁয়া হইয়া কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে—জনশূন্য মরুভূমির মাঝখানে আমরা দুইজনে পড়িয়া আছি। এক অদ্ভুত অনুভূতিতে আমার সমস্ত চেতনা বিলুপ্তপ্রায় হইল। আমি স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম—

তিন বছর আগেকার কথা। সেদিন প্রবল বর্ষণে কলিকাতা শহর জলধারার আবরণে বিলুপ্ত হইয়াছিল। রাত্রি নয়টা দশটার সময় আমি এই গাড়িখানা লইয়া হাওড়া স্টেশনে সওয়ারীর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। সেখানে দুই-চারখান মাত্র গাড়ি ছিল, লোকের ভিড় ছিল না বলিলেই হয়—অমন দিনে সাধারণত কুকুর-বিড়ালেরাও বাড়ির বাহির হয় না ! কিন্তু অভাব যাহাদিগকে পীড়া দেয়, তাহারা কুকুর-বিড়ালেরও অধম। আমি বিবাহ করিবার লোভে অর্থ সঞ্চয় করিতেছিলাম। বহিঃপ্রকৃতির সহস্র বাধাও আমার সঙ্গিনীপিয়াসী মনকে দমাইতে পারে নাই। বিবাহ করিবার কি অদম্য স্পৃহা আমার ছিল বাবু, তাহা আপনাকে বুঝাইতে পারিব না—নহিলে অমন দিনে মানুষে ঘরের বাহির হয় না। আজ বিবাহ করিবার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি আমার নাই ; প্রতি মুহূর্তেই আমার শরীরের রক্ত জল হইয়া আসিতেছে ; আমি আর বেশিদিন বাঁচিলে পাগল হইয়া যাইব। শুধু ফুফুর মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি ! সে আমার এই অবস্থার কথা জানিতে পারিলে কষ্ট পাইবে।

মকবুল আবার চুপ করিল। যাহা শুনিতেছিলাম, তাহা পরিষ্কার ধারণা করিবার মত শক্তি আমার ছিল না। জলের ঝাপটা লাগিয়া সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল ; অন্ধকার আকাশে তীব্র বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতে লাগিল। —কলিকাতার ঘরবাড়ি লেপিয়া মুছিয়া গিয়াছে ; আকাশের নিচে গ্যাসের স্তিমিত আলোকে আমরা দুইটি প্রাণী এক অজানিত রহস্যলোকের দ্বার উন্মোচন করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছি—

—সওয়ারী জুটিল দুইজন। প্রচুর ভাড়া চাহিলাম, তাহারা তাহাতেই স্বীকৃত হইল। দুইজনের কেহই প্রকৃতিস্থ ছিল না—একজন নেশায় একেবারে চুর হইয়া ছিল, অন্যজনের তখনও হুঁশ ছিল। এই ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যেই বাগবাজার পর্যন্ত যাইতে হইবে।

সওয়ারী দুইজন ভিতরে বসিল। আমি ভাল করিয়া পর্দা মুড়িয়া দিলাম।

গঙ্গার ধারে ধারে সোজা উত্তর দিকে চলিতে লাগিলাম ; দোকানপাট সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একটা পানের দোকানে এক উড়িয়া বামুন সুর করিয়া কি পড়িতেছিল, রাস্তায় এখানে-ওখানে দুই-একজন লোক চলিতেছিল, গাড়িঘোড়া একেবারেই ছিল না। আমি নির্বিঘ্নে পথের মাঝখান দিয়া রিক্শা টানিয়া লইয়া চলিলাম। কুমারটুলীর কাছাকাছি গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আর কতদূর যাইতে হইবে ? উত্তর পাইলাম, সিধা চালাও।

আমার সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছিল। পরিশ্রমে আর ক্লান্তিতে চোখ ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছিল। মনে হইতেছিল, আর টানিতে পারিব না। এমন সময়ে পর্দা ঠেলিয়া এক বাবু আমার হাতে পয়সা দিয়া এক বাক্স সিগারেট আনিতে বলিলেন। একটা গাছতলায় গাড়ি রাখিয়া সিগারেট আনিতে গেলাম। কাছাকাছি দোকান ছিল না। এদিক-ওদিক ঘুরিয়া একটি বিড়ির দোকানের সন্ধান পাইলাম। সিগারেট কিনিয়া ফিরিয়া আসিয়া হাঁকিয়া বাবুদের সিগারেটের বাক্সটা লইতে বলিলাম। কেহ উত্তর দিল না। ভাবিলাম, মাতাল বাবুরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তেরপলের পর্দা তুলিয়া সিগারেট দিতে গিয়া এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া মূর্ছিতপ্রায় হইলাম। বাবু, সেই মুহূর্ত হইতে আমার জীবনের সমস্ত শান্তি অন্তর্হিত হইয়াছে ; কাহার পাপের বোঝা মাথায় লইয়া আমি আজ তিন বৎসর কাল, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ফিরিতেছি জানি না। আর কতকাল এ যন্ত্রণা সহিতে হইবে খোদাতালাই বলিতে পারেন।

সামান্য আলো আসিতেছিল ; দূরে গ্যাস-পোস্ট। গাছের তলে বেশ একটু অন্ধকার, বৃষ্টির বিরাম ছিল না। পর্দা তুলিয়া সেই অস্পষ্ট আলোকে দেখিলাম, গাড়িতে একজন মাত্র লোক—মুখ বাঁধা,

বুক দিয়া দরদর ধারে রক্ত পড়িতেছে, সর্বাঙ্গ রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে। প্রাণ আছে বলিয়া মনে হইল না ! কেমন করিয়া কি হইল প্রথমটা কিছু ঠাহর করিতে পারিলাম না, বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিলাম। ধীরে ধীরে চেতনা ফিরিয়া আসিল। মনে বিষম ভয় হইতে লাগিল। চোখের সম্মুখে ফাঁসিকাষ্ঠের ভয়াবহ দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। সমস্ত দোষটা আমার ঘাড়ে যে চাপিবে তাহাতে সন্দেহ নাই—আমার কথা কে বিশ্বাস করিবে ?

বুঝিলাম, অন্য লোকটি মুখ বাঁধিয়া ছোরার আঘাতে এই লোকটিকে হত্যা করিয়া পলাইয়াছে। তাহাকে ধরিবার কোনও উপায় নাই, তাহার চেহারাটাও মনে আসিল না।

লোকটা নিশ্চয়ই মরিয়া গিয়াছে। গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম, তখনও গরম। ভাবিলাম, কোনও হাসপাতালে লইয়া যাই, চিৎকার করিয়া লোক জড়ো করি, কিন্তু সাহস হইল না। তাজা খুন দেখিয়া ভয়ে আমি তখন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য—আত্মরক্ষা করার কথাটাই আমার প্রথমে মনে হইল। সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া মৃত বা মরণাপন্ন দেহটি সেই বৃক্ষতলে ফেলিয়া রাখিয়া গাড়ি লইয়া উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ান করিলাম।

কেমন করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম, কেমন করিয়া সেই রাত্রিতেই গাড়িখানি ধুইয়া মুছিয়া আস্তাবলে রাখিলাম, আমার কিছুই স্মরণ নাই। তারপরে সাত আট দিন ধরিয়া আমি দারুণ জ্বরে বেহুঁশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। ফুফুর মুখে শুনিয়াছি, সে কয়দিন আমি খুন রক্ত ফাঁসি ইত্যাদি নানা ভুল বকিয়াছিলাম।

সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবার পরও গাড়ি লইয়া বাহির হইতে সাহস হইতেছিল না, গাড়িখানির দিকে নজর দিতেও ভরসা পাইতেছিলাম না। কিন্তু পেট তো চালাইতে হইবে। আবার একদিন সকালে মনের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়া গাড়িখানি বাহির করিতে গেলাম। গাড়িতে হাত দেওয়ামাত্র মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। রক্তের চিহ্নমাত্র ছিল না, তবু যেন রক্ত দেখিতে পাইলাম। মনের দুর্বলতা জোর করিয়া উড়াইয়া দিয়া গাড়ি লইয়া বাহির হইলাম। সওয়ারী জুটিল। মাঝে মাঝে গা ছমছম করিতেছিল বটে, কিন্তু দিনের আলোয় লোকের ভিড়ে সে ভাব বেশিক্ষণ মনে থাকিতে পায় নাই। থাকিয়া থাকিয়া মনে হইতেছিল, অন্যায় করিয়াছি—হয়তো লোকটা বাঁচিতে পারিত। বিপদের ভয় না করিয়া যদি তৎক্ষণাৎ কোনও হাসপাতালে তাহাকে লইয়া যাইতাম হয়তো সে বাঁচিয়া উঠিত। লোকটা যদি মরিয়াই থাকে, নিজেকে তাহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে ভাবটাও কাটাইয়া উঠিলাম। কে জানে, পরের দিকে নজর দিতে গিয়া হয়তো মহা ফ্যাসাদে পড়িয়া যাইতাম ! বাঁচিবার নসীব থাকিলে সে এমনই বাঁচিবে ! এইভাবে নানা মানসিক দ্বন্দ্বে প্রথম দিনটা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

সমস্ত রাত্রি কেমন যেন একটা অস্বস্তিতে কাটিল ; ঘুমাইতে পারিলাম না। ভয় হইল, আবার বুঝি জ্বর হইবে। সেই রক্তাক্ত-দেহ মুখ-বাঁধা লোকটিকে যেন চারিদিকে দেখিতে লাগিলাম। মাথা গরম হইয়াছে ভাবিয়া চোখেমুখে জল দিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম, ঘুমও আসিল। কিন্তু ভোরবেলায় আবার একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভীষণ ভয়ে ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া আমার কানে কানে বলিয়া গেল—তুই আমাকে খুন করিয়াছিস ! আমি আল্লা নাম স্মরণ করিয়া উঠিয়া বসিলাম।

সেদিন গাড়ি লইয়া বাহির হইতে যাইব—মনে হইল কে যেন আমার পিছু লইয়াছে, পিছনের পথের উপর যেন রক্তের দাগ দেখিলাম। হায় আল্লা ! এ কি হইল ! কাহার পাপের বোঝা কাহার ঘাড়ে চাপাইলে তুমি ! আমি যেখানে যাই, সেখানেই যেন কোনও অদৃশ্য কেহ আমার পিছু লইতে লাগিল। ভাবিলাম, আমি কি পাগল হইয়া গেলাম !

বুঝিলাম, আমাকে ভূতে পাইয়াছে। ওঝার কাছে গেলাম, সে অনেক ঝাড়ফুঁক করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—সে আমার পিছু ছাড়িল না।

মকবুল চুপ করিয়া গামছা দিয়া কপালের ঘাম মুছিল। আমার কাছে একটা সিগারেট লইয়া সেটা ধরাইয়া আবার বলিতে লাগিল—

দুই-একদিন পরে সন্ধ্যার সময় হেদুয়ার মোড়ে দাঁড়াইয়া ছিলাম, এমন সময়ে বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টি হইতে বাঁচাইবার জন্য গাড়িখানা তেরপল মুড়ি দিতে যাইতেছি, দেখি পিছনে পিছনে কে যেন

আসিতেছে! ফিরিয়া তাকাইলাম, কেহ নাই। তাড়াতাড়ি গাড়িখানা ঢাকিয়া বাড়ি ফিরিবার ইচ্ছা হইল। গাড়ির ছপ্পর হইতে পর্দাখানা ফেলিতে যাইব, দেখি গাড়ির ভিতরে সে বসিয়া—মুখ বাঁধা, বুক দিয়া রক্ত গড়াইতেছে! ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া পর্দা ফেলিয়া দিয়া মূর্ছিতের মত সেখানে বসিয়া পড়িলাম।

আমার এই অদ্ভুত যন্ত্রণার কথা আপনাকে কেমন করিয়া জানাইব বাবু? আপনি কি বুঝিতে পারিবেন? গাড়ির ভিতর রক্তাক্ত কলেবরে সে নিশ্চয়ই বসিয়া আছে। সেই হইতে আজ পর্যন্ত ওই গাড়িতেই বসিয়া থাকে সে; আমার পিছনে আর তাহাকে দেখি না—সে নিশ্চিন্ত হইয়া গাড়ির ভিতরেই থাকে, আমি তাহাকে টানিয়া লইয়া বেড়াই।

মকবুল চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ ওই ভাবে থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল—

বাবু, সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত ওই মড়ার বোঝা আমি টানিয়া ফিরিতেছি। একজনের অধিক সওয়ারী তাই আর টানিতে পারি না। মড়া পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে—আমাকে তাহাই সঙ্গে করিয়া ফিরিতে হইতেছে। অথচ আল্লার দোহাই বাবু, ওই লোকটার মৃত্যুতে জ্ঞানতঃ আমার কোনও অপরাধ নাই।

আমি ওই নিরক্ষর লোকটিকে কি সান্ত্বনা দিব! চুপ করিয়া রহিলাম।

—বাবু, বোঝা সব সময়েই বহিতে হয়, কিন্তু বর্ষারাত্রি ছাড়া অন্য সময়ে ওই মৃতদেহ আমি দেখিতে পাই না। দেখিয়া দেখিয়া বোঝা টানিয়া টানিয়া অনেকটা সহিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজিও মাঝে মাঝে ভয় পাইয়া উঠি। ভিতরে ভিতরে আমার শরীর জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে; এই দুর্বিষহ যন্ত্রণা আমি আর বেশিদিন সহ্য করিতে পারিব না।

এই গাড়িখানি ছাড়িয়া দিবার সামর্থ্য আমার নাই বাবু—এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে ইহার সহিত জুড়িয়া দিয়াছে, আমি তাহার কাছে সম্পূর্ণ শক্তিহীন। আজ তিন বৎসর ধরিয়া আমার এই ভীষণ কর্তব্য আরম্ভ হইয়াছে; কবে শেষ হইবে খোদাতালাই জানেন!

মকবুল উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, বৃষ্টি ধরিয়া আসিয়াছে বাবু, আপনি গাড়িতে বসুন। আমি পরদিন তাহাকে আমার সহিত দেখা করিতে বলিব কি না ভাবিতে ভাবিতে গাড়ির নিকট গেলাম। মকবুল মুখ ফিরাইয়া কম্পিত হস্তে পর্দাখানি তুলিয়া ধরিল। আমি ভিতরে বসিতেই সে পর্দাখানি ফেলিয়া দিয়া গাড়ি টানিতে শুরু করিল।

পর্দা-ফেলা অন্ধকার রিক্‌শাখানির ভিতর বসিতেই আমার গা ছমছম করিতে লাগিল। আমিও যেন আমার অত্যন্ত গা ঘেঁষিয়া এক অদৃশ্য রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখিতে পাইলাম; একটা পচা দুর্গন্ধও নাকে আসিতে লাগিল। সভয়ে পর্দা তুলিয়া ফেলিয়া মকবুলকে রিক্‌শা থামাইতে বলিয়া বলিলাম, আমার বাড়ি বেশি দূর নয়, আমি হাঁটিয়াই যাইতে পারিব। রিক্‌শাখানির ভিতরে চাহিবার আর সাহস হইল না।

মকবুল বুঝিল। একটু শীর্ণ হাসি হাসিয়া গাড়িখানি তুলিয়া ধরিয়া মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল। আমি সেখানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। রিক্‌শাখানির দিকে চাহিবার সামর্থ্য পর্যন্ত আমার হইল না। বহুক্ষণ পর্যন্ত রিক্‌শাখানির ঠুনঠুন আওয়াজ কানে আসিতে লাগিল। সে-রাত্রে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিলাম না।

কে তুমি ?

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গ্রাম আমি কখনও দেখিনি। শহরেই জন্ম, শহরেই বড় হয়েছি। শহরেই কেটেছে এই পঁচিশটি বসন্ত।

আমার এক বন্ধু জুটেছে চাকরি করতে গিয়ে। বন্ধুর নাম সুজিত। বীরভূম জেলায় কোন একটি গ্রামে তার বাড়ি। বাড়ির অবস্থা মন্দ নয়। হঠাৎ একদিন সুজিত আমাকে বললে, যাবি আমাদের বাড়ি ? গ্রাম কখনও দেখিসনি বলছিস, দেখে আসবি।

সামনে চারদিন ছুটি। বললাম, যাব।

সুজিতদের গ্রামে এসেছি। রেল-স্টেশন থেকে বহুদূরে—কতক গরুর গাড়িতে, কতক বা পায়ে হেঁটে যেতে হয়। দুই বন্ধুতে বেড়াতে বেড়াতে তাই গেলাম।

গ্রামখানি চমৎকার। ঢেউ-খেলানো মাটি, চারিদিকে ধানের মাঠ। দক্ষিণে একটি জঙ্গল। শাল তাল তমাল গাছের সারি। মনে হয় প্রতিটি গাছ যেন যত্ন করে পোঁতা। একে এরা জঙ্গল কেন বলে বুঝতে পারি না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মাটির ওপর শ্রেণীবদ্ধ গাছের ছায়ানিবিড় তপোবনের মত স্নিগ্ধ শ্যাম জায়গাটি আমার এত ভাল লাগল যে সহজে সেখান থেকে আসতে মন চাইল না।

সুজিতের বাড়িখানা পুরোন। আগেকার দিনের তৈরি দোতলা বাড়ি—কিছু ভেঙেছে, কিছু বা মেরামত করা হয়েছে।

দোতলার একটি ঘরে আমার শোবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। দক্ষিণ দিকের জানলাটি খুললে দেখা যায়—পাশেই একখানি মাটির বাড়ি ! পোড়ো বাড়ি বলেই মনে হয়। লোকজন কেউ বাস করে না। উঠোনে একটি আমের গাছ। গাছে তখন অজস্র মুকুল ধরেছিল। আমের মুকুলের গন্ধে আমার ঘরখানা যেন ভরে আছে।

রাত্রি তখন কত ঠিক মনে নেই। সেদিন কার ডাকে যেন ঘুম ভেঙে গেল : শুনছেন ? শুনছেন ?

স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর।

জানলার পথে তাকিয়ে দেখলাম, সেই পোড়ো বাড়িটার উঠোনে আম গাছটির তলায় তন্বী এক তরুণী দাঁড়িয়ে। জ্যোৎস্নার আলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে এসে পড়েছিল মেয়েটির সর্বাঙ্গে। মেয়েটি সুন্দরী বলেই মনে হল। জিজ্ঞাসা করলাম, কি বলছেন?

মেয়েটি বললে, আমার মা কোথায় বলতে পারেন?

বললাম, আমি নতুন এসেছি এ-গ্রামে। আমি কিছু জানি না।

আর কিছু বললে না মেয়েটি।

মনে হল যেন সে চলে গেল। আলোছায়া ঘেরা সেই গাছের তলায় তাকে আর দেখতে পেলাম না। কোন্ দিক দিয়ে কোথায় গেল বুঝতে পারলাম না।

ঘটনাটা আমি ভুলতে পারছিলাম না। পরের দিন সকালে বললাম সুজিতকে।

সুজিত বললে, ও জানলাটা আর খুলো না। বন্ধ করে দিয়ো।

কেন বল দেখি? মেয়েটা কি—

সুজিত বললে, না, না, সে-রকম কিছু নয়। কাজ কি বাবা পরের মেয়ের সঙ্গে.....দুদিনের জন্যে এসেছিস্—

বুঝলাম। সেই ভাল।

সেদিন রাত্রে জানলাটা বন্ধ করেই আমি শুয়েছিলাম।

কিন্তু সেদিন আবার। আবার সেই কণ্ঠস্বর। আবার সেই ডাক : শুনছেন? শুনছেন?

জানলার কপাটটা ঠেলছে বলে মনে হল।

বাধ্য হয়ে জানলাটা খুলে ফেললাম।

কিন্তু এ-কী? সেই সুন্দর মুখখানি জানলার শিকগুলোর ঠিক পেছনে। মেয়েটি মনে হল যেন জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? জানলার পেছনে তো কিছুই নেই! মেয়েটি তাহলে দাঁড়িয়ে আছে কিসেব উপর?

এই কথা ভাবতেই টপ করে মাথাটা আমার ঘুরে গেল।

বললাম, আমি জানি না—কাল তো বলেছি আপনাকে!

আমার কপালে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। আমি কাঁপছি ঠক্‌ঠক্ করে। জানলাটা বন্ধও করতে পারছি না, চিৎকার করে ডাকতেও পারছি না সুজিতকে।

আমার অবস্থা দেখেই বোধ হয় খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটি! সুন্দর সাজান দাঁতের সারি। উজ্জ্বল দুটি টানা টানা চোখ।

মেয়েটি বললে, আমি তো কোন কথাই আপনাকে জিজ্ঞেস করিনি! আমি জানি আপনি নতুন এসেছেন। ক'দিন থাকবেন?

খুব খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে জানলাটা বন্ধ করবার জন্যে হাত বাড়িয়ে ছিলাম বোধহয়। কিন্তু জানলাটা বন্ধ করবার অবসর আমি পেলাম না। তার আগেই মেয়েটি এসে দাঁড়াল একেবারে আমার সুমুখে—ঘরের ভিতর।

আবার তার সেই হাসি!

তারপর কি হয়েছে আমার আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান যখন ফিরে এল—দেখি, আমি শুয়ে আছি সুজিতের ঘরে। সুজিতের ছোট বোন দাঁড়িয়ে আমার মাথায় হাওয়া করছে। মাথার চুলগুলো ভিজে। মাথায় বোধকরি জল ঢালা হয়েছে।

সুজিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, হাসছিস যে? কী হয়েছিল রে?

সুজিত বললে, কিরকম ভীতু রে তুই। ও-রকম করে চেঁচিয়ে উঠেছিলি কেন?

কেন তা আমি কেমন করে বলি! বললাম, তারপর?

সুজিত বললে, তোর চিৎকার শুনে ছুটে গেলাম। ভাগ্যিস দোরে খিল বন্ধ করিসনি। নইলে কি যে হত কে জানে।

খুব হয়েছে আমার গ্রাম দেখা।

পরের দিনই বললাম, আমি কলকাতায় যাব।

সুজিতকেও আসতে হল আমার সঙ্গে।

গ্রামে থাকতে সুজিত আমাকে কোন কথাই বলেনি। কোন রহস্যই ভাঙেনি।

ট্রেনে আসতে আসতে সুজিত বললে, বেচারা সুবী! ওকে আমরা দেখেছি সবাই। কিন্তু আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। আমরা গ্রাহ্য করি নে।

মেয়েটা আসে। তার মার খবর জানতে চায়। বলে, তার মা কোথায় তোমরা বল।

আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না। খুলে বল্ সব কথা।

সুজিত বলল, তাহলে শোন্!

সংসারে দুটি মাত্র মানুষ। মা আর মেয়ে।

মার বয়স হয়েছে। মেয়ের বয়স এই সবে আঠারো-উনিশ, কিন্তু দুজনেই বিধবা।

ঝগড়া-ঝাঁটি তাদের চব্বিশ ঘন্টা লেগেই থাকে! মেয়েটাই দিবারাত্রি খিটিমিটি করে; মার সঙ্গে ঝগডা করবার ছুতো খুঁজে বেড়ায়। আবার অবাক কাণ্ড—খুব খানিকটা ঝগড়া করে নিজেই শেষে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে।

মা বলে, তুই একটা কিছু না করে আর ছাড়বিনে দেখছি! মাথার একপিঠ চুল এলিয়ে এই ভর্তি দুপুরবেলা কাঁদতে বসলি যে? আয়, চুলগুলো বেঁধে দিই।

এই বলে চুলগুলো বেঁধে দেবার জন্যেই মা হয়তো তার কাছে এগিয়ে যায়, কিন্তু মেয়ে তখন রেগে একেবারে টং। চুলে হাত দিতে সে কিছুতেই দেবে না। বলে, যাও, যাও, খুব হয়েছে। তোমাকে আ—

মার চোখ দুটি তখন জলে ভরে আসে।

আঁচলে চোখ মুছে বলে, থাক তবে, কাঁদ ওইখানে বসে! বলে ধীরে ধীরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে গিয়ে এর বাড়ি খানিকক্ষণ বসে, ওর বাড়ি খানিকক্ষণ বসে, কথা কইবার মত কাউকে যদি কাছে পায় তো বলে, ওই বয়েস আর ওই রূপ নিয়ে বিধবা হল মা, মেয়েটার মুখের পানে আর তাকাতে পারছিনে।

প্রতিবেশিনী হয়তো আশ্বাস দেয়। বলে, ভেব না মা, গা-সওয়া হয়ে যাবে।

মা কিন্তু তার নিজের কথাই বলতে থাকে। বলে—আমার কি মনে হয় জানিস বাছা, মনে হয়—এই নিয়ে সুবী হয়তো দিবারাত্রি ভাবে। ভেবে আর যখন কূল-কিনারা পায় না, তখন হয়তো ও অমনি করে হয় কাঁদতে বসে, নয়তো ঝগড়া করবার জন্যে খুনসুড়ি করে বেড়ায়।

প্রতিবেশিনী মেয়েটি এবার নীরবে শুধু ঘাড় নেড়ে কথাটা সমর্থন করে। সুবীর মা তার মুখের পানে তাকিয়ে বলে, বুঝতে সবই পারি বাছা, কিন্তু মা হয়ে আমি যে আর—

বলতে বলতে ঠোঁট দুটি তার থরথর করে কাঁপতে থাকে, চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে আসে।

সে চোখের জল আর কিছুতেই থামতে চায় না। আঁচল দিয়ে মোছে আর তৎক্ষণাৎ কানায়-কানায় ভরে ওঠে।

মার সে কান্না বুঝি বিধাতারও সহ্য হল না। তাই সে কান্নার পালা হঠাৎ একদিন চুকে গেল। বিধাতা চুকিয়ে দিলেন, কি সুবী নিজেই চোকালে কে জানে!

সেদিন দুপুরে মা ও মেয়ে দুজনেই খেতে বসেছে। ভাত চিবোতে গিয়ে কটাং করে সুবী তার দাঁতে একটা কাঁকর চিবিয়ে ফেললে। হাতের গ্রাসটা তৎক্ষণাৎ সে থালার ওপর ছিটকে ফেলে দিয়ে বলে উঠল—না, আর পারি নে বাবা! কেন, চালগুলো বেছে নিতে পারোনি?

মা বললে, চাল আর কত বাছব বাছা! ভাতে কাঁকর পাথর দু-একটা অমন থাকে। তাই বলে তোর মতন এমন বিটকেল কেউ করে না—খা।

মেয়ে আর না খেয়ে হাত গুটিয়ে বসে রইল দেখে মার মনে মনে সত্যিই এবার একটুখানি রাগ হল। বললে, এমন তিরিক্ষে মেজাজ তোর কেন হল সুবী? কই, আগে তো এমন ছিল না!

সুবীর মুখখানা ভারী হয়ে উঠল।

তাই না দেখে মা আবার বললে, এতই যদি নবাবের মেয়ে হয়ে থাকিস তো চালগুলো কাল থেকে তুই নিজের হাতে বেছে দিস।

তাই দেব। বলে থালাটাকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সুবী উঠে দাঁড়াল।

সর্বনাশ! বিধবা মেয়ে, একবারের বেশি খেতে নেই! মা চট করে বাঁ-হাত বাড়িয়ে আঁচলটা চেপে ধরে বলে উঠল, বোস্, চারটি খেয়ে নে! কেউ দেখেনি, তাতে দোষ নেই, নে বোস!

ঝাঁকুনি দিয়ে সুবী আঁচলটা ছাড়িয়ে নিলে। বললে, না, আর খাব না।

সারাদিন খেতে যে আর পাবি নে হতভাগী, উপোস দিয়ে মরবি?

মরণ হলে তো বাঁচি! মরণ যে হয় না ছাই!

তাই মর তুই! আমারও হাড়টা জুড়ায় তাহলে।

বিড়বিড় করে কি যেন বলতে বলতে সুবী আঁচাতে চলে গেল।

মা-ই বা আর কেমন করে খায়! থালাটা সরিয়ে দিয়ে মা-ও উঠে দাঁড়াল।

খিড়কির পুকুর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে সুবী দেখলে, এঁটো থালা তেমনি পড়ে আছে, আর ঘটির জলে উঠোনে হাত ধুয়ে মা তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

মা তার সেদিন যেখানে সেখানে কেঁদে কেঁদে সারা হল। না মা, রইল ওই দস্যি মেয়ে আমার বাড়িতে, আমায় দেখছি অন্য কোন দেশে গিয়ে পালাতে হল।

প্রতিবেশিনী মেয়েরা কেউ বা সান্ত্বনা দেয়, আবার কেউ বা বলে, কি জানি মা, তোমাদের ঝগড়ার কিছু বুঝি নে আমরা!

মায়ের চোখ দিয়ে জল আসে। বলে, বুঝতে কী ছাই আমিই পারি বাছা! ও যে কেন অমন করছে মা, তা কে জানে!

মা আবার সে-বাড়ি থেকে উঠে আর এক বাড়িতে গিয়ে বসে। সেখানেও সেই কান্না আর ওই এক কথা। —আজ আর আমি বাড়ি ঢুকছি নে। দেখি ও আমায় খুঁজতে আসে কিনা!

এমনি করে এ-বাড়ি সে-বাড়ি করতে করতে সূর্য ডুবল। রোজ ঠিক এমনি সময় পুকুর থেকে এক কলসী করে খাবার জল তাকে আনতে হয়। পাড়ার মেয়েরা সব কলসী কাঁখে নিয়ে পুকুরে যাচ্ছিল, করালীর মা বললে, চল, না হয় আমার একটা কলসী নিয়েই চল আজকে।

সুবীর মা বললে, না বাছা, থাক, আজ আর যাব না। মজাটা একবার বুঝুক।

মজা বোঝাবার জন্যে সে রইল বটে, কিন্তু দেখতে দেখতে চারদিক আঁধার করে এল, ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলল, তবু সুবী তাকে ডাকতে এল না।

মার মন ঘর ছেড়ে এমন করে কতক্ষণই বা বাইরে থাকে। তুলসীতলায় এখনও হয়তো সন্ধে পড়ল না—এতক্ষণ হয়তো সে তার নিজের লণ্ঠনটি জ্বেলে নিয়ে রামায়ণ পড়তে বসে গেছে—মা তার মরল না বাঁচল বয়ে গেছে তার দেখতে!

সরু একটা গলির অপর প্রান্তে একেবারে একটেরে তাদের সেই ছোট মাটির ঘরখানি—চারিদিকে মাটির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সদর দরজা পেরিয়েই বাঁ-হাতে উঠোনের এক পাশে বহুদিনের প্রাচীন একটা আমের গাছ—অজস্র ডালপালা বিস্তার করে জায়গাটাকে অন্ধকার করে রেখেছে। তাহলেও ঘরে যদি আলো জ্বলে তো বাইরে থেকেই টের পাওয়া যায়। কিন্তু আলো জ্বলা দূরে থাক, সুবীর মা সদর দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখে, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ।

হেঁকে বললে, সুবী দরজা খোল্!—কাজ দ্যাখ দেখি মেয়ের! ঘরে ঢুকতে না দেবার মতলব!

ভেতর থেকে সুবী সাড়া আর কিছুতেই দেয় না, দরজাও খোলে না।

কাছেই তারাপদদের বাড়ি। তারাপদ তখন সবেমাত্র গোয়ালে গাই-গরুগুলিকে খেতে দিয়ে ঘরে এসে বসেছে, এমন সময় সুবীর মা এসে বললে, আয় তো বাবা, সুবীকে একবার আচ্ছা করে ধমক দিবি! সদর দরজায় খিল দিয়ে বসে আছে, আমায় ঢুকতে দেবে না।

তারাপদ হেসে বললে, ঝগড়া হয়েছে বুঝি? বলেই লণ্ঠনটি হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দরজায় বারকতক জোরে জোরে ধাক্কা দিয়ে বললে, খোল বলছি সুবী, নইলে কিছু বাকি রাখব না।

দরজা তবু খুলল না।

লণ্ঠনটা হাত থেকে নামিয়ে তারাপদ বললে, তুমি দাঁড়াও মাসি, পাঁচিল টপকে দরজাটা খুলে

দিই।

খাটো মাটির প্রাচীর। উঠতে বিশেষ বেগ পেতে হল না।

কিন্তু ঝুপ করে ওপাশে নেমেই সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে কি যেন দেখে সে আমগাছের তলা থেকে সহসা বিকৃত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, মাসি ! মাসি !

বাইরে থেকে সুবীর মা বললে, কি বাবা ?

কিন্তু জবাব দেবার অবসর তখন আর নেই। দড়াম করে দরজাটা খুলে ফেলেই তারাপদ কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল। তাড়াতাড়ি লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে সে আমগাছের তলায় গিয়ে দেখে—সর্বনাশ !

সুবীর মা তো অস্ফুট কণ্ঠে বিকট একটা চিৎকার করে সেখানেই আছাড় খেয়ে পড়ল—

আর স্তম্ভিত নির্বাক তারাপদ কম্পিত হস্তে লণ্ঠনের আলোটা তুলে ধরে দেখল—আমগাছের একটা ডালের গায় মোটা একটা দড়ির ফাঁসে লটকে সুবী আত্মহত্যা করেছে ! পায়ের নিচে দড়ির ভাঙা খাটিয়াটা উলটে পড়ে আছে। টকটকে ফরসা রঙ যেন দুধে আলতায় গোলা, পিঠের ওপর ঢেউ খেলানো কালো একপিঠ চুল, কিন্তু মুখের চেহারা দেখলে আর সে-সুবী বলে চেনবার উপায় নেই। দাঁতের ফাঁকে খানিকটা জিভ বেরিয়ে গেছে, চোখ দুটো বড় বড়, গায়ের কাপড়-চোপড় বেসামাল অবস্থায় মাটিতে লুটোচ্ছে ! হতভাগী মরবার আগে বাঁচবার জন্যে চেষ্টা করেছিল কিনা তাই-বা কে জানে।

ব্যস ! সমস্ত গ্রাম একেবারে ঠাণ্ডা !

গ্রামদেশে আত্মহত্যা এমন কিছু নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা নয়, দু'দশ বছর পরে কদাচিৎ কোনও গ্রামে দৈবাৎ যদি বা এক-আধটা এমন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে যায় তো কিছু বলবার থাকে না।

এখন এ মৃতদেহ নিয়ে কি করা যায়—এই হল গ্রামের লোকের ভাবনা। আত্মীয়-স্বজন কেউ কোথাও তাদের আছে কিনা কে জানে। সুবীর মা তো সেই যে মাটিতে উপুড় হয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে, সেই থেকে আর ওঠেনি।

শিব মন্দিরের পাশে গ্রামের একটা রাস্তার ধারে সেই রাত্রেই মজলিস বসল। অনেক কথা-কাটাকাটির পর শেষে এই ঠিক হল যে, কী জানি বাবা, আত্মহত্যার মড়া শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে আসবার পর কেউ যদি পুলিশে খবর দিয়ে দেয় যে সে আত্মহত্যা করেনি, কেউ তাকে মেরে ফেলে দিয়ে গাছে অমনি টাঙিয়ে রেখেছিল—তখন ?...তার চেয়ে আগে থেকেই পুলিশে খবর দেওয়া হোক।

গ্রাম থেকে তিন ক্রোশ দূরে থানা। কিন্তু সুবীর দুর্ভাগ্য, চৌকিদার ফিরে এসে খবর দিলে—দারোগা সাহেব ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছেন, জমাদার সাহেব আসবেন কাল সকালে। বলেছেন, দাঁড়া আমি দেখাচ্ছি মজা, গলায় দড়ি দিয়ে মরা আমি বের করছি।

গ্রামের লোক তো ভয়ে অস্থির !

দুগু ভট্‌চায্ বললে, কেন, তখনই তো বলেছিলাম দাদা, পুলিশে খবর দিয়ে কাজ নেই ; দিই জ্বালিয়ে।

লোকনাথ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল। ব্যাটা বলে কি হে ! তারপর ? তারপর ঠেলাটি কে সামলাতো ?

দুগু বললে, ঠেলা আবার কিসের ?

হরিপদ তাকে বুঝিয়ে দিলে যে, কেউ যদি বলত যে, না, ও গলায় দড়ি দিয়ে মরেনি, দুগু ভট্‌চাযের সঙ্গে দিনের বেলা ঝগড়াঝাঁটি না কি সব যেন হয়েছিল—

দুগু ভট্‌চায্ কালা মানুষ, কানে ভাল শুনতে পায় না। এদের আগেকার মন্তব্য সে কিছুই শোনেনি। হরিপদর মুখে তার নাম শুনে সে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল, খবরদার বলছি হরিপদ, মিছে কথা বলিস নে। আমার সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি কিছু হয়নি।

সবাই তখন মুচকি মুচকি হাসছে।

হরিপদর সঙ্গে হাতাহাতি হবার যোগাড়। অনেক কষ্টে ভট্‌চায্‌কে থামান গেল। কিন্তু পরদিন সকালেও থানা থেকে জমাদার সাহেব এলেন না।

গ্রামে মানুষ মরেছে, বাসি-মড়া তো হলই, তার ওপর আত্মহত্যার মড়া। ঠাকুর দেবতার

শিলা-বিগ্রহের নিত্য সেবা যাদের বাড়িতে আছে তারা তো ভেবেই অস্থির। বাড়ি থেকে মৃতদেহটাকে বের না করা পর্যন্ত ঠাকুর দেবতার পুজো হবে না এবং পুজো যারা করবে, পুজো না হলে তাদের জলগ্রহণ করার উপায় নেই।

লোকনাথের বাড়ি প্রত্যহ শালগ্রাম শিলার ভোগ হয়। সকালে উঠেই ভিন্ন-গ্রামে সে একটা প্রায়শ্চিত্ত করাতে গিয়েছিল, প্রায় বারোটার সময় তেতেপুড়ে ফিরে এসেই শুনলে পুলিশও আসেনি এবং মড়া তখনও উঠোনেই পড়ে আছে। মড়া দেখতে যারা গিয়েছিল, সকাল থেকে সুবীর মা নাকি তাদের প্রত্যেককেই কেঁদে কেটে হাতে পায়ে ধরে মড়াটাকে একটুখানি বের করে দেবার জন্যে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু কেউ তা শোনে নি।

লোকনাথের তখন পিপাসায় কণ্ঠরোধ হয়ে এসেছে। ভেবেছিল, বাড়ি গিয়ে শালগ্রামের পুজোটা করে দিয়ে জল খাবে। কিন্তু তাও যখন হল না, তখন সে নিজেই হনহন করে বেরিয়ে গেল।

আপাদমস্তক ঢাকা-দেওয়া সুবীর মৃতদেহ আগলে—দেখা গেল মা তার আমগাছের তলায় একাকিনী চুপ করে বসে আছে। চোখে জল নেই, মুখখানি শুকনো—কেঁদে কেঁদে সে যেন হয়রান হয়ে গেছে।

দরজার বাইরে থেকে লোকনাথ চেঁচিয়ে উঠল, বলি ও ঠাকরুণ, মেয়ে তো না হয় সাত কুল উজ্জ্বল করে দিয়ে মলো, তাই বলে কি ও হারামজাদীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও মরতে হবে নাকি? মড়া বের না করলে যে ঠাকুরের ভোগ হয় না।

মুখ তুলে একবার চাইতেই সুবীর মার চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে এল। কথা সে কিছুই বলতে পারলে না, গলা তখন তার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

লোকনাথ ভাবলে—বুঝি মাগী এইবার হয়তো তাকেই অনুরোধ করে বসবে, রাগের মাথায় অতটা সে এখানে আসবার আগে ভাবেনি, তাই সে তৎক্ষণাৎ ঘোঁতঘোঁত করতে করতে সেখান থেকে চলে গেল।

জমাদার সাহেব এলেন সন্ধ্যার সময়। পিলপিল করে লোকজন তাঁর পিছু পিছু ঢুকল সুবীদের বাড়ি।

কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখে, আমগাছের তলায় সেই ভাঙা খাটিয়াটি মাত্র পড়ে আছে, সুবীর মৃতদেহও নেই, সুবীর মাও নেই।

কোথায় গেল তারা? বাগদীদের একটি ছোঁড়া আঙুল বাড়িয়ে দূরের একটা পুকুর দেখিয়ে বললে, উ-ইখানে বসে রয়েছে দেখলাম।

কিন্তু কখন যে সেখানে গেছে কেউ তা জানে না। লোকনাথ চলে যাবার পর সুবীর মা নিতান্ত নিরুপায় হয়ে নিজেই একবার মৃতদেহটা তার কাঁধে করে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভারী সে মৃতদেহ কাঁধে তোলা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। তখন সে সুবীর মাথার দিকটা দু হাত ধরে টেনে টেনে তাকে বাড়ির বার করে এবং অমনি করেই একটু একটু করে দূরের ওই পুকুরটার ধারে নিয়ে গিয়ে ফেলে। আরও দূরে নিয়ে হয়তো সে যেত, কিন্তু পুকুরের চারিপাড়ে শুধু শত শত কাঁকর আর পাথরের কুচি, একেই সুবীর রাঙা টুকটুকে পা দুখানি পথের ধুলোয় ম্লান হয়ে গেছে, তার ওপর মা হয়ে ওই শক্ত কাঁকর-পাথরের ওপর দিয়ে মেয়েকে তার হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায়ই বা কেমন করে? তাই সে ওখানেই চুপটি করে বসে আছে।

জমাদার সাহেব ভেবেছিলেন যা, এসে দেখলেন ঠিক তার উলটো। ভেবেছিলেন অবস্থাপন্ন লোকের বিধবা মেয়ে, আত্মহত্যা করেছে, 'মর্গে' চালান দেবার নামে বেশ একটু ধমকা-ধমকি করলেই কিছু বেরিয়ে আসবে। জমাদার সাহেবের স্ত্রী নাকি অন্তঃসত্ত্বা, বাড়িতে এ মাসে মোটা রকমের টাকা পাঠান তাঁর একান্ত প্রয়োজন। সারা-রাস্তা তিনি তাই ভাবতে ভাবতে এসেছেন—আত্মহত্যা করে মানুষ মরেছে, তার দরুণ টাকা ঘুষ নিয়ে তিনি বাড়িতে পাঠাবেন, আর সেই টাকা খরচ হবে তার সন্তানের জন্মোৎসবে!—তা হোক, পুলিশে কাজ করে অতসব ভাবতে গেলে চলে না!

কিন্তু সাহেবের দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না, কিছু না নিয়েই তাঁকে ফিরতে হল। মৃতদেহ সৎকার করবার হুকুম দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

শীতকালের রাত। মৃতদেহ সৎকারের পর স্নান করতে হবে। তার ওপর রাত্রে আর বাড়ি

ফিরতে নেই। শ্মশানেই রাত কাটাতে হয়। সুতরাং কেউ আর বাড়ি থেকে সহজে বেরোতে চায় না!

গামছা কাঁধে লোকনাথ এসে দাঁড়াল।

দুগু ভট্চায্ লাফিয়ে উঠল—ব্যস্, কাউকে চাইনে। একজন সঙ্গী পেলে আমি একাই পুড়িয়ে ফেলতে পারি!

লোকনাথ ঘাড় নেড়ে বললে, উঁহু ভেবে দেখলাম, পোড়ান চলবে না।

সকলেই তার মুখের পানে তাকিয়ে আর কি বলে শোনবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে রইল। —বাঁচালে বাবা! শীতকালের রাত—

লোকনাথ বললে, একে গলায় দড়ি, তায় বাসি মড়া, অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত না করলে ওর মুখাগ্নি চলবে না, আর মুখাগ্নি না করে অগ্নি-ক্রিয়া করতে দোষ আছে। তা ছাড়া যারা ওকে নিয়ে যাবে তাদেরও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে!

কে যেন বলে উঠল—তাহলে দরকার নেই বাপু!

ভুবন তার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে মহা উৎসাহে গামছা কাঁধে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, লোকনাথের কথা শুনে মা তার দরজা থেকে ডাকলে, ওরে ও ভুবন! তাহলে চলে আয় বাবা! শুনছিস তো!

লোকনাথ বললে, শাস্ত্রে বলছে—গলরজ্জু বৃক্ষশাখায়াং ত্রিসন্ধ্যাং কালেং যদি মৃত্তিকায়াং প্রোথিতঞ্চ অগ্নিক্রিয়া নৈবচ নৈবচ।—এর পরেও যদি কেউ যেতে চায় তো যাক—আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে আমার বিবেচনায় গ্রামের দুজন বাউরী-বাগদী নিয়ে ওকে পুঁতে ফেলাই উচিত।

এমন সময় বিকট একটা চিৎকারের শব্দে সবাই যেন চমকে উঠল। গ্রামের বাইরে থেকে চিৎকার! মনে হল যেন স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর!

হঠাৎ খেয়াল হল সুবীকে আগলে সুবীর মা সেই পুকুরের ধারে একাকী এই অন্ধকারে এখনও চুপ করে বসে আছে। সেই তারই গলার আওয়াজ!

ব্যাপারটা দুগু ভট্চায্ ভাল বুঝতে পারেনি, হাঁ করে এর ওর মুখের পানে তাকিয়ে বললে, কী?

কে একজন জোরে জোরে তাকে বুঝিয়ে বললে, সুবীর মা চেঁচাচ্ছে।

এই কালা খ্যাপা মানুষটির কোথায় গিয়ে যে বাজল কে জানে, সর্বাগ্রে সে উঠে দাঁড়াল এবং আর কাউকে কোনও কথা না জিজ্ঞেস করে একাই সে সেইদিক পানে চলে গেল।

খানিক পরে, তার দেখাদেখি জন দশ-বারো গ্রামের ছোকরা—প্রত্যেকেই হাতে একটা করে লণ্ঠন নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখে, পুকুরের পাড় থেকে খানিক দূরে একটা মাঠের ওপর দুগু ভট্চায্ দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে আর তার পায়ের কাছে সুবীর মৃতদেহ অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় পড়ে আছে।

ব্যাপার কি?

দুগু ভট্চায্ বললে, এক পাল শেয়াল এসেছিল আর দুটো বড় বড় গো-বাঘ!

বাপ রে বাপ! ব্যাটারা ছাড়তে কি চায়! ওই দেখ না, পায়ের কাছটা কেমন কুরে খুবলে নিয়েছে।

দেখা গেল, সুবীর বাঁ পায়ের আঙুলগুলো এক রকম নেই বললেই হয়। তাছাড়া সর্বাঙ্গে তীক্ষ্ণ দাঁতের চিহ্ন।

মা তার তখনও একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিজের পরিধেয় বস্ত্রটা সামলাচ্ছে। কারণ ওরই সঙ্গে প্রথমে কাড়াকাড়ি শুরু হয়। এবং জন্তু জানোয়ারের মুখ থেকে কন্যার মৃতদেহটাকে বাঁচাতে গিয়ে পরনের কাপড়খানা তার একেবারে শতছিন্ন হয়ে গেছে।

লোকনাথও সেইখানে দাঁড়িয়ে। বললে, তাহলে ওই ব্যবস্থাই হোক। দুগু যখন মড়াটা ছুঁয়েছে তখন ও-ই যাক শ্মশানে, সঙ্গে আরও জন কতক বাউরী-বাগদী নিক, নিয়ে বেশ ভাল করে পুঁতে দিয়ে আসুক। অগ্নিক্রিয়া যখন হবেই না, তখন পোঁতা ছাড়া আর উপায় কী! কিন্তু শোন ভট্চায্, যেন শেয়াল কুকুরে টেনে না বের করতে পারে।

শেষ পর্যন্ত তাই হল।

মা তার একটি প্রতিবাদও করলে না।

দু একদিন পরেই দেখা গেল গ্রামের খেঁকী কুকুরের দল কিসের যেন একটা মহোৎসবে লেগে গেছে। খাওয়া-খাওয়ি মারামারি করে তারা ক্রমাগত গ্রামের চতুর্দিকে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে।

নিবারণ বললে, মেষের পুকুরের পাশে সুবীর আস্ত একখানা হাত নিয়ে কয়েকটা কুকুরকে কামড়া-কামড়ি ছেঁড়া-ছেঁড়ি করতে সে দেখে এল। তোমাদের বিশ্বাস না হয় তো তোমরাও স্বচক্ষে দেখে আসতে পার।

তারপর শুধু হাত নয়, সেই দিনই গ্রামের ছেলে ছোকরার দল আবিষ্কার করলে যে, সুবীর মৃতদেহ শেয়ালে গো-বাঘায় মাটি থেকে টেনে তো তুলেইছে, সেই সঙ্গে হাত-পা আর পাঁজরগুলো শ্মশান থেকে মুখে করে সমস্ত গ্রামময় ছড়িয়ে চলেছে।

কুকুর দেখলেই ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলো বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে যায় সুবীর হাড় দেখবার জন্যে। কিন্তু ফিরে তারা আর বাড়ি ঢুকতে পায় না।

মায়েরা সব হাঁ হাঁ করে চেঁচিয়ে ওঠে—খবরদার বলছি, ঘরে ঢুকিস নে। মরা মান্ষের হাড় না কী ছুঁয়ে এলি—যা পুকরে একটা ডুব দিয়ে আয় গে।

কাউকে বা ডুব দিতে হয়, কেউ বা মাথায় জল ঢালে, আবার কাউকে বা মাথায় একটুখানি গঙ্গাজল ছিটিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হয় যে আর কখনও সে সুবীর হাড় দেখতে যাবে না।

গ্রামের মধ্যে বয়স্ক যারা তাদের মজলিসে এই নিয়ে কথা ওঠে। বলে, সর্বনাশ হল দেখছি। এবার ঘরে ভূত নাচবে!

নিবারণ বললে, ওই শালা দুগু ভট্‌চায্‌কে যে এত করে বলে দেওয়া হল—ভাল করে পুঁতিস যাতে শেয়াল-কুকুরে না তুলতে পারে, তা শালা দিয়ে এসেছে হয়তো এমনি নাম-নাম পুঁতে, তা না হলে এমন হয় কখনও!

দুগু ভট্‌চায্‌ বললে, মাইরি বলছি, আমি একবুক গর্ত খুঁড়ে তবে পুঁতে ছিলাম। বিশ্বাস না হয় তো বল—আমি ঠাকুর ঘরে হাত দিয়ে বলতে পারি।

কিন্তু সে কথা কেউ বিশ্বাস করে না। বলে, গ্রামের মধ্যে ভূতের ভয় যদি হয় তো শালা বুঝতেই পারবি, তোকে সুদ্ধ খণ্ড খণ্ড করে কেটে আমরা সুবীর সঙ্গী করে দেব।

ভট্‌চায্‌ কালা মানুষ, শুনতে পায় না তাই রক্ষে, নইলে তৎক্ষণাৎ একটা ফৌজদারি বেঁধে যেত।

সেদিন থেকে এমন হল যে সন্ধে হলে আর কেউ বাড়ি থেকে বেরোতে পারে না। অপমৃত্যুতে মরা মানুষের হাড় পাঁজরা যখন গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, তখন তার প্রেতাত্মাই বা গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে না কেন?

নবীন বললে, মাইরি বলছি, আমি কাল স্বচক্ষে দেখেছি—সুবীদের বাড়ির পাশ দিয়ে সন্ধেবেলায় বেরিয়ে যাচ্ছিলাম—আমগাছটা ঝরঝর করে নড়ে উঠল। গা-টা শিউরে উঠতেই 'রাম রাম' বলতে বলতে এগিয়ে গেলাম। রাম নাম করেছিলাম বলে ছুঁতে আমায় পারলে না, কিন্তু পেছনের পুকুরটার জলে মনে হল কে যেন ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এই না শুনে গ্রামের গিরিশ চৌকিদার তো রাত্রিবেলা এ পাড়ায় হাঁক দেওয়া একদম ছেড়েই দিলে। আবালবৃদ্ধবণিতা ভূতের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। অন্ধকারে কুকুর বেড়াল দেখলেও লোকে আচমকা চেঁচিয়ে উঠতে লাগল।

সুবীর মা তো সেইদিন থেকে অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়, যে আমগাছে দড়ি বেঁধে মেয়ে তার মরেছিল, গভীর রাত্রে সেই আমগাছটির তলায় চুপটি করে বসে থাকে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলে, কোথায় মা, তার চিহ্নও কোনদিন দেখতে পাই নে; বলেই সে কাঁদতে থাকে।

লোকে তা বিশ্বাস করে না। ভাবে, মাগী বুঝি মিথ্যা কথা বলছে।

লোকনাথ তাই সেদিন দুপুরে তাকে ডেকে বললে, ওগো শোন! তুমি দিব্যি আরামে দিন কাটাচ্ছ, এদিকে তোমার মেয়ের দায়ে আমাদের গ্রামে টেঁকা ভার হয়ে উঠল দেখছি। তার চেয়ে শোন বাপু, ভাল চাও তো গয়ায় গিয়ে মেয়ের নামে একটা পিণ্ডি দিয়ে এস।

গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার ইচ্ছে সুবীর মার ছিল না, তবু তাকে জোর করে সবাই মিলে বলে কয়ে গয়ায় পাঠিয়ে দিল। বেচারা একাকিনী কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল গয়ায়। মেয়ের নামে দুর্নাম রটবে

তাই-বা সে সহ্য করবে কেমন করে। অথচ সে নিজে যদি তাকে একটিবার দেখতে পেত ! মায়ের মন—যে মেয়ে রাগ করে চলে গেছে তাকেই সে একটিবার শুধু চোখে দেখতে চায়। শ্মশানের যে জায়গাটায় সুবীকে পোঁতা হয়েছিল, সুবীর মা সেইখানে বসে কাঁদতে লাগল। ভাবলে—না, সে গয়ায় যাবে না। ভূত হয়েও যদি মেয়েটা একবার দেখা দেয়। গয়ায় পিণ্ডি দিলে সে আশাও হয়তো আর থাকবে না ! রাত্রিটা আজ সে এই শ্মশানেই কাটিয়ে দেবে। ভূত হয়েও যদি সে আসে তো একবার জিজ্ঞেস করবে, হতভাগী রাগ করে তুই কেন গেলি !

সারারাত সুবীর মা সেই অন্ধকারে শ্মশানের মাঝে বসে রইল। এদিকে গ্রামের লোক জানে সে গয়ায় গেছে।

দিন দুই পরেই গ্রামের মধ্যে আবার এক হুলস্থূল ব্যাপার !

থানা থেকে পুলিশ এসেছে। গ্রামের জনকতক ভারিক্কী মাতব্বর লোককে তারা থানায় নিয়ে যাবে। কি জন্যে নিয়ে যাবে জিজ্ঞেস করলে বলে না। বলে শুধু সেখানে গিয়ে একটা বস্তু সনাক্ত করতে হবে !

জ্বালাতন !

এই গ্রামের ওপরেই যত অত্যাচার রে বাবা !

লোকনাথ বললে, সুবীর মা ফিরে আসুক, এলেই দেখবি সব হাঙ্গামা চুকে যাবে।

কিন্তু গ্রামের লোক থানায় গিয়ে দেখে, কাঠের একটা বাক্সের মধ্যে সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা কি একটা জিনিস। ইন্সপেক্টরবাবু বললেন, দেখুন দেখি চিনতে পারেন কিনা ? বলে যেই ঢাকা খুলেছে, আব চক্ষু স্থির !

সবাই দেখলে রেলের লাইনে কাটা তাল-গোল-পাকানো একটা মৃতদেহ, মুখখানা কিন্তু তখনো পর্যন্ত দেখলে চেনা যায়—সুবীর মা ছাড়া আর কেউ নয়। মানুষ বাস করা দূরে থাক, সন্ধের অন্ধকারে ও পথ দিয়ে কেউ আর সহজে যেতে চায় না, যেতে হলে এখনও গা ছম্‌ছম্‌ করে। প্রথম বৎসর ঘরের চাল গেল উড়ে, দ্বিতীয় বৎসর কাঠামোটাও গেল ভেঙে—আজকাল খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে শুধু ওর চারপাই মাটির দেওয়াল। যে আমগাছে সুবী মরেছিল, গাছটা এখনও ঠিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। বছরের পর বছর ঠিক সময়ে তার শুকনো পাতা ঝরে, কচি পাতা গজায়, মুকুলের গন্ধে চারদিক আমোদিত হয়ে ওঠে, শেষে থলো থলো আম ধরে। কিন্তু গ্রামের মধ্যে এত যে ডানপিটে ছেলে—তা কেউ আর সাহস করে ও আমগাছটাব তলা দিয়ে পেরোয় না—ও আমও কেউ খায় না—গাছের আম গাছেই পাকে।

আবার সময় হলে ঠিক মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি যায় !

'—সাথে সাথে ঘুরবে'

প্রমথনাথ বিশী

অল্প দিনের মধ্যে পর পর কয়েকটি মৃত্যুতে আমাদের বাড়িতে একটি অনৈসর্গিক আবহাওয়াব সৃষ্টি হইল।

প্রথমে মারা গেল বাড়ির একটি ছোট ছেলে, খেলা করিবার সময় ছাদ হইতে পড়িয়া। সেই ঘটনায় বালকের মাতা এমন অভিভূত হইয়া পড়িল যে, সে শয্যাগ্রহণ করিল। সেই শয্যা আর সে ছাড়িল না। মৃত্যু আসিয়া শোকাতুরার সকল যন্ত্রণার অবসান কবিয়া দিল। এই দুটি মৃত্যুর মধ্যে দেড় মাস কালেরও ব্যবধান নয়। তৃতীয় মৃত্যুটি আরও আকস্মিক। তখন বর্ষাকাল। বিদ্যুতেব তাবে কোথায় কি ত্রুটি হইয়াছিল, কেহ জানিত না। বাড়ির একটি বয়স্ক বালক সুইচ টিপিতে গিয়া প্রাণ হারাইল। সেই ঘরটিতে অপর কেহ ছিল না, কেহ তাহাকে সাহায্য করিবার অবকাশও পাইল না। চতুর্থ বা শেষ মৃত্যুটি ঘটিল বাড়ির একটি চাকরের। অনেক দিনের পুরোন চাকর, আমাদের পরিবারের স্বাঙ্গীভূতপ্রায় হইয়া গিয়াছে। রাতের বেলায় সুস্থ শরীরে সে শুইয়াছিল, ভোরবেলায় দেখা গেল তাহার দেহ প্রাণহীন। ডাক্তার আসিল, পরীক্ষা করিয়া বলিল, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। আমরা বলিলাম, লোকটির তো হার্টফেল করিয়া মরিবার বয়স হয় নাই। ডাক্তার বলিল, আর সবেরই বয়স আছে, মরিবার বয়স নাই। অভিজ্ঞ ডাক্তার ছাড়া এমন আর কে বলিতে পাবিত।

তিন-চার মাসের মধ্যে এই চারিটি মৃত্যু বাড়িতে ঘটিল। পরিবারের বালকবালিকা হইতে বয়স্কগণ অবধি সকলেই ভাঙিয়া পড়িল। কিন্তু শোক যতই তীব্র ও ব্যাপক হোক না কেন, সংসার তাহার প্রাত্যহিক দাবী ছাড়ে না, সেই দাবী মিটাইবার জন্য আমাকে বাধ্য হইয়া শক্ত থাকিতে হইল। শোক করিবার অবকাশ আমার ছিল না।

সংসারে প্রাত্যহিক কাজকর্ম নিতান্ত অভ্যাসের তাগিদেই আপনার চিহ্নিত পথে চলিতে লাগিল। সকাল হয়, চাকর বাজারে যায়, যথাসময়ে আহারের ডাক পড়ে, অফিসগামীরা অফিসে

যায়। —এইভাবে সবই চলিতেছে, কিন্তু কাহারও মনে আনন্দ নাই, জীবনে উৎসাহ নাই, এমন কি সবাই যেন স্বল্পভাষী হইয়া পড়িয়াছে। কেহ অপরের মুখের দিকে ভাল করিয়া তাকাইতে সাহস করে না, কি জানি দুই দৃষ্টির ঠোকাঠুকিতে সুপ্ত শোকের আগুন যদি জ্বলিয়া ওঠে।

আরও একটা ভীষণতর সম্ভাবনা ছিল। এবার কার পালা ?— এই আশঙ্কা প্রত্যেকের মনেই গুপ্ত ছিল। হঠাৎ যদি চোখে চোখে ঠেকিয়া প্রশ্নরূপে ঝলকিয়া ওঠে, তাই সকলে পরস্পরের চোখ এড়াইয়া চলিত। আর এতবড় বাড়িটা কেমন যেন অদ্ভুতরকম নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। লোকে যে কথাবার্তা বলিত না, কিম্বা বিশেষ করিয়া ধীরপদেই চলিত এমন বলি না, কিন্তু কণ্ঠস্বর ও পদশব্দ মনে হইত যেন অনেকটা দূর হইতে আসিতেছে, মনে হইত সিঁড়ির উপর কে যেন অদৃশ্য গদি পাতিয়া রাখিয়াছে—নতুবা ওঠানামার শব্দ এত ক্ষীণ কেন।

এই সময় একদিন একজন পশ্চিমা চাকর নিযুক্ত হইল। হঠাৎ রাত্রিবেলা তাহার আর্তস্বর শুনিয়া সকলে নিচের তলায় ছুটিয়া গেলাম, কি ব্যাপার! দেখিলাম যে লোকটা জাগিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। 'কি হয়েছে রে ?' সে কেবল একটি কথা বলিল, 'দেও।' এই বলিয়া সে জানালার বাহিরের বকুলগাছটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। দেখিলাম যে, বাহিরের দিকে অন্ধকারের মধ্যে বকুলগাছটা একটা সুবৃহৎ তোড়া-বাঁধা অন্ধকারের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে দেও অর্থাৎ ভূতটুত কিছু নয়, হঠাৎ ওই গাছটা দেখিয়া ভয় পাইয়া গিয়াছে। সে বুঝিতে চায় না। সে বলে দেও একটা নয়, দুইটা। একটা লেড়কা, আর একটা আওরৎ জানলার দিকে মুখ করিয়া ওই গাছটার তলায় দাঁড়াইয়াছিল।

আমি বলিলাম—তাহারা দেও নয়, সত্যকার মানুষ।

সে মানিবে কেন ? পাছে আরও কিছু বলিয়া ফেলে, তাই প্রসঙ্গ চাপা দিয়া তাহাকে উপরতলায় লইয়া গিয়া আমার ঘরের বারান্দায় শুইতে বলিলাম। ভোরবেলা উঠিয়া সে একটা পশ্চিমা ধরনের সেলাম করিয়া বিদায় হইয়া গেল। বলিল যে, এ বাড়িতে দেও আছে।

এই ঘটনায় সকলের মনের শোকের সহিত ভয়ের যোগ হইল। আমি সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করি যে বেটার পলাইবার ইচ্ছা ছিল, তাই ভূতের একটা অবতারণা করিল। কিন্তু মুশকিল এই যে, কেহ আমার সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক অবধি করে না, করিলে আমার যুক্তির স্বপক্ষে দু-চার কথা বলিবার অবকাশ পাইতাম। আমার কথা শুনিয়া সকলে চুপ করিয়া থাকে। বেশ বুঝিতে পারি, সকলেই মনের ভিতরে শোক ও ভয়কে একশয্যায় সযত্নে লালন করিতেছে। আমি বুঝিলাম, সকলের মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ হইবার মুখে, অতঃপর দৈহিক স্বাস্থ্যও ভাঙিয়া পড়িবে। তখন আমি একদিন প্রস্তাব করিলাম যে, কিছুদিনের জন্য সকলে একবার শিমুলতলা ঘুরিয়া আসিলে কেমন হয়। কেহ উৎসাহ প্রকাশ না করিলেও আপত্তি করিল না। শিমুলতলায় আমাদের একটি বাড়ি ছিল। কয়েকদিন পরে আমি সকলকে লইয়া গিয়া শিমুলতলায় রাখিয়া আসিলাম। কলিকাতার বাড়িতে আমি একা থাকিলাম, আর থাকিল একটা নূতন চাকর। সে পূর্বেতিহাসের কিছুই জানিত না।

শিমুলতলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি অসুখে পড়িলাম। অসুখ এমন কিছু নয়। প্রথমটা কিছুদিন সর্দিজ্বর বা ইনফ্লুয়েঞ্জা বলিয়া চালাইলাম। কিন্তু আট দশ দিন পরেও শয্যাত্যাগ করিতে সমর্থ না হইলে ডাক্তারকে কল দিলাম।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, কোন বিশেষ রোগের লক্ষণ মিলিতেছে না, 'নার্ভাস শক' বলিয়া মনে হইতেছে। নার্ভাস শক ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, দেহের স্নায়ুপুঞ্জের উপর দিয়া অনেক ঝড়ঝাপটা গিয়াছে, তাই তাহারা সাময়িকভাবে বিকল হইবার লক্ষণ দেখাইতেছে। তারপরে উৎসাহ দিয়া বলিলেন, কোন ভয় নাই—কিছুদিন শুইয়া থাকুন, সব সারিয়া যাইবে। ডাক্তার বিদায় হইলে ভাবিলাম, ডাক্তারের কথা মিথ্যা নয়, এ কয় মাস আমাকে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে। মৃত্যুশোকে আর সকলে যখন কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, আমার বিশ্রামের সময় ছিল না, এমন কি একটু নিরিবিলি বসিয়া একবার যে অশ্রুপাত করিব, সে অবসরটুকুও পাই নাই। বুঝিলাম যে ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষোভ জমিয়া উঠিতেছিল, তখন প্রকাশের সময় ছিল না, এখন অবসর পাইয়া স্নায়ুপুঞ্জ এলাইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তারে বলিয়াছে, কোন ঔষধের প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ এ রোগের কোন ঔষধ নাই, শুইয়া থাকাই একমাত্র চিকিৎসা। তাই শুইয়া থাকিলাম, অবশ্য উঠিবার শক্তি ছিল না —ইচ্ছাও বড়

ছিল না।

সারাদিন একাকী শুইয়া থাকি, সারাদিন এবং সারারাত। চাকরটা নিয়মিত সময়ে আসিয়া খাদ্য ও পথ্য দিয়া যায়, অন্য সময়ে তাহার বড় দেখা পাই না, তবে পদশব্দে ও গার্হস্থ্য কাজের টুকটাক আওয়াজে বুঝিতে পারি যে, লোকটা নিচের তলাতেই আছে। আমাদের বাড়িটা নিতান্ত ছোট নয়, তিনতলা, চকমিলানো ধরনের সেকেলের বাড়ি। ক্ষুদ্র বৃহৎ মাঝারি অনেকগুলি কক্ষ বাড়িটিতে। এখন দু-তিনটি ছাড়া সব তালাবন্ধ, সকলে থাকিবার সময়েও সবগুলি খুলিবার প্রয়োজন হয় না।

দোতলার একটি প্রশস্ত কক্ষে এক দিকে আমার শয্যা। শুইয়া থাকিলে বাহিরের পথের লোক চলাচলের কতক চোখে পড়ে, রাত্রিবেলায় গ্যাসের আলো কতক ঘরে আসিয়া ঢোকে আর বসন্ত ও বর্ষাকালে যথাক্রমে দক্ষিণ ও পুবের জানালা দিয়া হু-হু করিয়া বাতাস প্রবেশ করে। আমি অনেকগুলি বালিশ মাথায় দিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া পড়িয়া থাকি। ক্লান্তি যতই বাড়ে—একটি করিয়া বালিশ সরাইয়া ফেলি, শেষ একটি বালিশ যখন অবশিষ্ট থাকে, তখন বিছানার উপর গড়াইতে থাকি, - গড়াইতে গড়াইতে কখন ঘুমাইয়া পড়ি। এইভাবে রাত্রি কাটিয়া যায়। আর দিন? দিনের বেলায় জাগিয়া ভাবিয়া এবং লঘু ধরনের বই পড়িতে চেষ্টা করিয়া কাটাই, পথের আনাগোনা দেখি আর জানালা দিয়া বকুলগাছটার পাতায় আলোর চিকিমিকি দেখি ও পাখিগুলোর কিচিমিচি শুনি। মাঝে মাঝে চাকরটা আসিয়া পথ্য খাদ্য ও ডাকের চিঠি দিয়া যায়।

সেদিনটার কথা কিম্বা আরও সঠিকভাবে বলা উচিত---সে রাতটার কথা, কখনও কি ভুলিতে পারিব? আজ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছি বলিয়া সকল কথাই বলিতে পারিতেছি। সে দিনের অভিজ্ঞতাকে এখন অপরের অভিজ্ঞতা বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু কখনও ভাবি নাই, 'তাহার' হাত হইতে মুক্তি পাইব। অনেকে আমার অভিজ্ঞতা শুনিয়া বলিয়াছে, ওটা নার্ভাস শকের প্রতিক্রিয়া, আসলে কিছুই নয়।

নার্ভাস শক। ডাক্তার এই যে কথাটা বলিয়াছিল, লোকে তাহার বেশি আর অগ্রসর হইতে চায় না। কিন্তু আমি তো জানি, আমার অভিজ্ঞতায়, 'তাহার' প্রভাব কতখানি সত্য- -কত মর্মান্তিকভাবে সত্য। লোকে যখন নার্ভাস শক বলিয়া ব্যাপারটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে, আমি তর্ক করি না, চুপ করিয়া থাকি কিম্বা বড় দুঃখে হাসি আর ভাবি—একজনের অভিজ্ঞতা অপর একজনকে বুঝানো কত কষ্ট।

সেই প্রথম রাত্রির অভিজ্ঞতাকে 'তাহার' আবির্ভাবের সূত্রপাত বলিয়া তখন বুঝিতে পারি নাই, আদ্যন্ত ইতিহাস মিলাইয়া লইয়া আজ বুঝিতেছি এবং তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার পরেও শিহরিয়া উঠিতেছি, ভাবিতেছি মৃত্যুর কত নিকটেই না গিয়া পড়িয়াছিলাম!

সেদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গিয়া জানালার দিকে নজর পড়িবামাত্র বুকের রক্ত একবারের জন্য ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিয়া যেন জমিয়া কঠিন হইয়া গেল। দেখিলাম জানালার ঠিক বাহিরেই অতিকায় একটি মস্তক। ভাবিলাম, স্বপ্ন দেখিতেছি, কিন্তু চোখে হাত দিয়া বুঝিলাম চোখের পাতা খোলা। গায়ে চিমটি কাটিয়া দেখিলাম—লাগিতেছে। সন্দেহমাত্র আর রহিল না যে আমি জাগ্রত। ভয়ে চিৎকার করিতে চেষ্টা করিলাম—স্বর বাহির হইল না। ঘরের আলো জ্বালিবার ইচ্ছা হইল---কিন্তু উঠিতে পারিলাম না—এ যেন অপরের শরীর। কালো প্রকাণ্ড মস্তক! নাক চোখ মুখগুলা দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু মস্তক যে তাহাতে সন্দেহ নাই। ওদিকে চাহিয়া থাকা কঠিন, না থাকা আরও কঠিন। সেই শীতের রাত্রে কপালে ঘাম গড়াইতে লাগিল। এই অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যখন বন্ধ হইবার মুখে—ঠিক সেই সময়ে একখানা মোটর গাড়ি পথ দিয়া চলিয়া গেল। তাহার বাতি হইতে এক ঝলক আলো মুণ্ডটার উপরে পড়িল। মুণ্ড কোথায়? সেই ঝাঁকড়া বকুলগাছটা যে! আবার বুকের রক্ত ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া নিয়মিত হইল। মনে মনে হাসিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তখনই মনে পড়িল যে, এ কেমন ভ্রান্তি। যে বকুলগাছটাকে অন্তত ত্রিশ বৎসর দেখিতেছি, তাহাকে কেন হঠাৎ অতিকায় মস্তক বলিয়া মনে হইল। তখনই আবার ডাক্তারের কথা মনে পড়িল—নার্ভাস শক। পুস্তকে পড়িয়াছি বটে যে, নার্ভাস শকের ফলে কত সম্ভব বস্তুকে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। যাই হোক, গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, জল খাইবার জন্য উঠিলাম। টেবিলের উপরে এক গ্লাস জল ঢাকা থাকে। ঢাকা খুলিয়া দেখিলাম গেলাস শূন্য। জল খাইল কে? আমিই কি আগে আর একবার

উঠিয়া জল পান করিয়াছি ? কই, মনে তো পড়ে না। চাকরটার উপরে রাগ হইল, ব্যাটা ফাঁকি দিতে শুরু করিয়াছে। জল পান আর হইল না, ঘরে আর জল ছিল না। শুইয়া পড়িলাম এবং ঘুম আসিতে বিলম্ব হইল না।

আমার অভিজ্ঞতা শুনিয়া অনেকে শুধাইয়াছে—কিছু দেখিয়াছ কি ? স্বীকার করিতে হয় যে, কিছু বা কাহাকেও দেখি নাই। লোকে হাসে, তাহাদের নার্ভাস শকের থিওরিটা আরও পাকা হয়। কিন্তু তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছি, কিছু না দেখার চেয়ে কিছু দেখা অনেক ভাল। শরীরীর সহিত বোঝাপড়া চলে—কিন্তু অশরীরীর সহিত তেমন হইবার নয় বলিয়াই তাহা ভয়ঙ্কর। এখন হইতে আমার অজ্ঞাত, অজ্ঞেয় শত্রুকে 'অশরীরী' বলিয়া উল্লেখ করিব।

পরদিন রাত্রে আবার ঘুম ভাঙিয়া গেল—দেওয়াল ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলাম রাত্রি দেড়টা। তখনই বুকেব মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, সেই কালো মাথাটা নাই তো ? আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম বকুলগাছটার পাতাগুলি বাতাসে কাঁপিতেছে। স্বস্তি বোধ করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভীরুতার প্রতি একপ্রকাব ধিক্কার বোধ হইল। তৃষ্ণা পাইয়াছিল—জল পান করিবার জন্য উঠিলাম, গেলাসেব ঢাকনা তুলিয়া দেখিলাম গেলাস শূন্য। কাল বকুলগাছটাকে কালো মাথা কল্পনা করিবার ফলে মনে হইয়াছিল যে, অশরীরী জল পান করিয়া গিয়াছে। আজ ভয়ের সেই পরিপ্রেক্ষিত ছিল না, মনে হইল চাকরটাই ফাঁকি দিয়াছে। শাসন করিয়া দিবার অজুহাতে (আসল কথা নিজের ভয়টাকে অন্তঃসারশূন্য প্রমাণ করিবার আশায়) অত রাত্রেই ডাকাডাকি করিয়া চাকরটাকে জাগাইলাম। সে আসিয়া শপথ করিয়া বলিল যে, গেলাসে জল দিয়া একটা পিরিচ দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া গিয়াছে। আমি যখন জল খাইতে যাই, তখন সেই গেলাস পিরিচে ঢাকাই ছিল বটে। আমার ভুল হইয়াছে স্বীকার করিয়া তাহাকে বিদায় দিলাম। বিছানায় আসিয়া শুইলাম, কিন্তু চিন্তা নূতন সূত্র অবলম্বন করিযা চলিতে আরম্ভ করিল। জল খাইল কে। আমিই ঘুমের ঘোরে উঠিয়া জল পান করিয়াছি—এমন অসম্ভব না হইলেও বর্তমান ক্ষেত্রে সম্ভব মনে হইল না। ঘুমাইয়া পড়িবার আগে সঙ্কল্প কবিলাম, কাল হইতে ঘুমাইবার আগে প্রচুর জলপান করিয়া লইব, যাহাতে মাঝরাতে জাগিয়া উঠিয়া এরূপ অদ্ভুত সমস্যায় না পড়িতে হয়।

দিনের বেলা আর পাঁচটা চিন্তায় এসব বিষয় মনে পড়িত না। কিম্বা মনে পড়িলেও হাস্যকরভাবে তুচ্ছ বোধ হইত। সেদিন শুইবার আগে প্রচুর জল খাইয়া লইলাম। রাতে আর জাগিতে হইল না। ভোরবেলা চাকরে চা আনিল। আগের দিন তাড়া খাইয়াছিল, আজ ঘরে ঢুকিয়াই গেলাসটার দিকে তাকাইল, আমিও তাকাইলাম—গেলাস খালি। যে পিরিচখানা দিয়া সে জল ঢাকিত, সেখানা পাশে পড়িয়া আছে, গেলাস একখানা বই দিয়া ঢাকা। বইখানা দূর হইতে দেখিয়াই বুঝিলাম—Poe-র Mystery and Imagination -এর গল্প। চমকিয়া উঠিলাম—এই বই তো নিচের লাইব্রেরি ঘরে ছিল—এখানে আনিল কে। আর গেলাসই বা খালি করিল কে। চাকরকে আর কি বলিব ? নিজের চিন্তাসূত্রে কেবল নিজেই জড়িত হইতে লাগিলাম।

ক্রমে আমার প্রত্যয় জন্মিল যে, রাতের বেলায় কেহ আমার ঘরে ঢোকে। প্রকৃতিস্থ থাকিলে সহজেই বুঝিতে পারিতাম—এমন হওয়া সম্ভব নয়, কারণ আমি স্বহস্তে ঘরের দরজা বন্ধ করি এবং ভোরবেলা উঠিয়া স্বহস্তে বন্ধ দরজা খুলি। কিন্তু এসব বিষয় বুঝিবার মত আমার মনের অবস্থা ছিল না। আমার একটি পিস্তল ছিল, বাক্সের মধ্যে থাকিত, এতদিন পরে সেটা বাহির করিয়া বালিশের তলায় রাখিলাম।

একবার মনে হইত নির্জন বাড়ির নিঃসঙ্গতা পরিহার করিয়া লোকজনের সঙ্গে মিশিলে হয়তো অশরীরীর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু শরীর এত দুর্বল যে, অন্যত্র যাইবার শক্তি ছিল না। তা ছাড়া আমি মিশুক প্রকৃতির লোক ছিলাম না বলিয়া আমার বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা স্বল্প। যে কয়েকজন আছে, সবাই কাজের লোক, কে আসিয়া সারাদিন আমার সঙ্গে গল্প করিবে। কাজেই সারাদিন একাকী থাকা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ক্রমে অশরীরীর প্রভাব দিনের বেলাতেও অনুভব করিতে আরম্ভ করিলাম। মনে হইত, পাশের ঘরে কে যেন ফিস্‌ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছে—কিম্বা খুব মৃদু পদসঞ্চারে চলাফেরা করিতেছে। নিশ্চয় জানিতাম কেহ নাই, তবু একবার দেখিয়া আসিতাম। রেলের এঞ্জিন বাষ্প ছাড়িলে যেমন একপ্রকার ঝঞ্জনা শব্দ হয়, কানের ভিতর সেই রকম

শব্দ শুনিতে পাইতাম। আরও একটা ব্যাপার। মনে হইল সহসা আমার শ্রবণশক্তি যেন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। স্বরগ্রামের মাঝখানের অংশটুকুই সাধারণ কর্ণ ধরিতে পারে, খুব নিচু বা খুব উঁচুর দিক শুনিতে পায় না। আমার শ্রবণশক্তির সীমানা যেন অনন্তবিস্তৃত হইয়াছে। আমি যেন কলিকাতার বাড়িটিতে বসিয়াই পাড়ার দূরবর্তী বাড়িগুলিতে কে কি বলিতেছে তাহারও অনেক কথা শুনিতাম। একদিন শিমুলতলার পত্র পাইলাম। তাহার লিখিয়াছে যে, সকলে একদিন ডাকবাংলায় আশ্রয় লইয়া খিচুড়ি রাঁধিয়া খাইয়া আসিয়াছে। উত্তরে লিখিলাম যে, এ আমার অগোচর নয়। আরও লিখিলাম যে, ডাকবাংলার হাতার মধ্যে একটা গাছের ওপরে ঘুঘু ডাকিতেছিল, তোমরা শুনিয়াছিলে কি ? সকলে আমার উত্তরকে কবিত্ব মনে করিয়া লিখিল, ঘুঘুর ডাক যদি স্বকর্ণে শুনিতে চাও, তবে এখানে চলিয়া এসো না কেন ?

ঘুঘুর ডাক শুনিবার জন্য নয়, সে তো কলিকাতায় বসিয়াই আমি শুনিতে পারি, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে গিয়া পড়িলে অশরীরীর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে, এই আশায় চাকরের উপর বাড়ি জিম্মা রাখিয়া আমি শিমুলতলায় রওনা হইয়া গেলুম। সকলে আমার শরীরের অবস্থা দেখিয়া বলিয়া উঠিল, এ কী, দুই মাসে যে ছয় মাসের রোগী বনিয়া গিয়াছ—ব্যাপার কি ?

কেহ বলিল, শরীর অর্ধেক হইয়াছে।

কেহ বলিল, মুখ ফ্যাকাসে হইয়াছে।

কেহ বলিল, কতকাল চুল কাটো নাই।

কেহ বা বলিল, কেবল চোখ দুইটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল।

সকলে সমস্বরে বলিল, এখানে কিছুদিন থাকো, সব সারিয়া যাইবে।

শিমুলতলায় একটা পাহাড়ের চূড়ায় আমাদের বাড়ি। বাড়ির বারান্দায় বসিলে মনে হয়, থিয়েটারের গ্যালারির উচ্চতম সীটে উপবিষ্ট।—সম্মুখে পাহাড় গড়াইয়া নামিয়াছে, গায়ে গায়ে ছোটবড় বাড়ি, বাগানে বাগানে শীতের মরসুমি ফুল। নিম্নে উপত্যকা, ধানের মাঠ, তখন ধানকাটা হইয়া গিয়াছে। এক দিকে শীর্ণ নদী। এখানে ওখানে দেহাতি লোকের ছোট ছোট গ্রাম। উপত্যকার শেষে বন, বনের মাথার উপর দিয়া দিগন্ত ঘেরিয়া অর্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়—মাথায় শাল ও বাঁশের ঘন বন। সারাদিন বারান্দায় বসিয়া থিয়েটারের দর্শকের মত এই দৃশ্য দেখিতাম। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে মূর্তিমান চঞ্চলতার মত রেলগাড়ি মাঝে মাঝে বেগে চলিয়া যাইত—গাছের ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইতাম। এখানে আসিয়া আর একটি আবিষ্কার করিলাম। একদিন সকালে আমরা তিনজনে দূরপাল্লার ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। অনেক দূর গিয়া চায়ের তৃষ্ণা পাইল। একটা থলিতে স্টোভ চা চিনি কেটলি প্রভৃতি ছিল। কেবল দুধের অভাব। মাঠের মধ্যে দুধ পাইবার আশা নাই দেখিয়া যখন নিবৃত্ত হইতে যাইতেছি, আমি বলিয়া উঠিলাম,—ওই দেখ, দূরে মাঠের মধ্যে গোটা কয়েক গরু ও রাখাল দেখা যাইতেছে—ওখানে গেলে দুধ মিলিতে পারে।

সকলে ভাল করিয়া দেখিল, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না।

আমি বলিলাম, তোমরা কেন দেখিতে পাইতেছ না। ওই তো স্পষ্ট।

তাহারা বলিল,—চায়ের তৃষ্ণায় মরিতেছি, এখন ঠাট্টা ভাল লাগে না।

আর একজন বলিল, লোকে মাঠের মধ্যে মৃগতৃষ্ণিকা দেখে, তুমি যে গো-তৃষ্ণিকা দেখিতে লাগিলে !

তৃতীয়জন বলিল, তুমি কি চোখে দূরবীন লাগাইয়াছ নাকি !

আমি বলিলাম, অবিশ্বাসে কাজ কি। আমাদের তো যাইতেই হইবে—চল ওই দিকেই যাই না।

সকলে নির্দিষ্ট দিকে চলিলাম। প্রায় এক ক্রোশ পথ চলিবার পরে সত্যই সকলে সেই গরুর পাল দেখিতে পাইল।

আমার সঙ্গীদের একজন বলিল, কী আশ্চর্য ! তুমি এক ক্রোশ দূর হইতে দেখিলে কিরূপে ? তাই তোমার চোখ এমন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল।

আর একজন বলিল, আন্দাজে ঢিল লাগিয়াছে। মাঠে গরু চরিবে এ আর বিচিত্র কি।

আর একজন বলিল, এমন অস্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি কিন্তু ভাল লক্ষণ নয়।

সেই প্রথম আমি আবিষ্কার করিলাম যে, শ্রবণশক্তির মত আমার দৃষ্টির সীমাও অনেক বাড়িয়া

গিয়াছে।

এখানে আসিয়া অশরীরীর প্রভাব সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলি নাই।

বলিব আর কি, বলিবার আছেই বা কি, আর বলিলেই বা লোকে বিশ্বাস করিবে কেন। ভাবিতাম, অশরীরী এমন করিয়া আমায় কান ও চোখের সীমানা বাড়াইয়া দিতেছে কেন? অশরীরীর প্রভাবের সহিত যে এই শক্তিবৃদ্ধি জড়িত সে বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র ছিল না।

এখানে কাহারও কোন কাজকর্ম ছিল না। বাড়ির টানা বারান্দায় বসিয়া সকলে তাসপাশা খেলিত ও হল্লা করিত। আমি তাহাদের সঙ্গ এড়াইয়া পাহাড়ের উপরে একটি ছাল-ওঠা অর্জুন গাছের তলায় গিয়া বসিতাম। এখানে বসিলে দিগন্তের পাহাড়ের অর্ধচন্দ্র ও অরণ্যরেখা দেখিতে পাইতাম। উপত্যকার সমস্ত দৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট দেখিতাম। বনের সমস্ত গাছপালা স্পষ্ট দেখিতে পাই কিনা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা হইল। বনটার দিকে ভাল করিয়া তাকাইলাম। কি আশ্চর্য, আমার চোখে বন আর গাছপালার ঘনীভূত সমষ্টি নয়। প্রত্যেকটি গাছ, তাহার শাখা প্রশাখা পত্রপল্লব স্বতন্ত্রভাবে যেন দেখিতে পাইতেছি। নিজের শক্তিতে নিজেই ভীত হইলাম। যেন চোখ দুটি ও কান দুটি কোন এক যাদুকরের—আমি হতবুদ্ধি দর্শক মাত্র।

রাতের বেলার উপসর্গ আরও বিচিত্র। বুঝিলাম অশরীরী ক্রমেই আমাব বুদ্ধিকে মোহগ্রস্ত করিয়া ফেলিবে, অবশেষে শেষ গ্রাসে দেহটাকে হয়তো আত্মসাৎ করিয়া বায়ুরূপ বায়ুতে মিলিয়া যাইবে। রাতের বেলাতেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাসপাশা ও গানবাজনা চলিত বলিয়া স্বতন্ত্র একটি ঘরে আমার শুইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সে ঘরে আর কেহ থাকিত না।

এই ঘরটির একটি দেয়ালে বিহারের পূর্বতন এক ইংরেজ গভর্নরের একখানি ছবি টাঙানো ছিল। একসময়ে শখ করিয়া টাঙানো হইয়াছিল, এখন খুলিয়া ফেলিলেও চলিত, কিন্তু নিতান্ত অবহেলাতেই খোলা হয় নাই। আমার ইচ্ছা হইল, ছবিখানি খুলিয়া ফেলি, কিন্তু ততখানি উদ্যম হইল না। একবার ভাবিলাম খুলিয়া না ফেলিয়া ঘুরাইয়া দিই। গভর্নর বিমুখ হইয়া বিরাজ করিতে থাকুন, তাহাও হইয়া উঠিল না। রাত্রে ঘুমাইলাম, কোন বিঘ্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভোর বেলা উঠিয়া ছবিখানার দিকে চাহিতেই দেখিলাম সেখানা ঘুরানো অবস্থায় আছে। চমকিয়া উঠিলাম, একাজ করিল কে? আমার মনের বাসনা জানিল কে? ঘরেই বা ঢুকিল কে? ঘরের দরজা তো এখনো বন্ধ। আমিই স্বপ্নে উঠিয়া একাজ করিয়াছি? বিশ্বাস হইল না। প্রত্যয় হইল যে, এ সেই অশরীরীর কাজ। ছবিখানা সোজা করিয়া দিলাম, কিন্তু ব্যাপারটা কাহাকেও আর বলিলাম না। বলিলেও কেহ বিশ্বাস করিত না, ভাবিত—আমি একপ্রকার নূতন ধাপ্পা দিতেছি। আমি সারাদিন আর সকলের হইতে দূরে সেই অর্জুন গাছটার তলায় বসিয়া কাটাইতাম। মন্দ লাগিত না—মানুষের সঙ্গ আমার বিষাক্ত লাগিত।

এই সময়ে আর একটি নতুন ভাব আমাকে পাইয়া বসিল। আমার মরিতে ইচ্ছা করিত, জীবনের আসক্তি আমাকে একেবারে ত্যাগ করিল। আমার কেবলই মনে হইত, এই যে আমার চক্ষুকর্ণের শক্তির বৃদ্ধি, মৃত্যুর পরে মানুষ যে অসীম শক্তি পাইতে পারে, এ কেবল তাহারই পূর্বাভাস। ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই পিস্তলটার কথা মনে পড়িয়া যাইত, সেটাকে হাতছাড়া করি নাই, সঙ্গে আনিয়াছি। আরও একটা কারণে মরিতে ইচ্ছা করিত। মনে হইত—একমাত্র এই উপায়েই অশরীরীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারি, মনে হইত—নিজেও অশরীরী হইয়া একবার শত্রুটার সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া না লই কেন।

রাত্রিবেলা ঘরের মধ্যে কাহার পদশব্দে ঘুম ভাঙিয়া যাইত। বিদ্যুতের টর্চবাতি টিপিতাম, কেহ কোথাও নাই। হঠাৎ চোখে পড়িত, দেয়ালের ছবিখানাকে কে যেন ঘুরাইয়া রাখিয়াছে।

এমনি রাতের পর রাত, দিনের পর দিন চলিতে লাগিল। একদিন অত্যন্ত তুচ্ছ কারণে বাড়ির সকলের সহিত আমার ঝগড়া হইয়া গেল। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, দোষটা সম্পূর্ণই আমার। আমি সেদিন সন্ধ্যার ট্রেনে চুনার রওনা হইলাম। গাড়িতে উঠিবার সময়ে স্পষ্ট বুঝিলাম অশরীরী আমার সঙ্গ ছাড়ে নাই, সেই গাড়িতেই সে উঠিল।

কামরাটিতে আর একজন মাত্র ছিল। একটি বার্থে তাহার শয্যা দেখিতে পাইলাম, কিন্তু লোকটি কোথায়। স্নানের ঘরে আলো দেখিয়া বুঝিলাম, আমার সহযাত্রী সেখানে। আমি একাকী আমার

বার্থে বসিয়া রহিলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুম আসাতে শুইয়া পড়িলাম। যখন নিদ্রা ভাঙিল মোকামা জংশন ছাড়াইয়াছি। পাশের বেঞ্চিতে সহযাত্রীর শয্যা দেখিতে পাইলাম, কিন্তু লোকটি কোথায়? ভাবিলাম, এখনো কি স্নানের ঘরেই আছে? তাহাই সম্ভব—আলো জ্বলিতেছে। ভাবিলাম, লোকটা দীর্ঘকাল সেখানে কি করিতেছে। দরজায় কান পাতিয়া শুনিলাম যে, ভিতরে কে যেন গুন্‌গুন্ করিয়া গান করিতেছে, আর দরজায় ঘষা কাঁচের উপরে একটা অস্পষ্ট ছায়ার মতও দেখিতে পাইলাম। বুঝিলাম, মানুষ ভিতরে আছে এবং সে আমার সহযাত্রী ছাড়া কার কেহ নয়। কিন্তু লোকটা এতক্ষণ ধরিয়া কি করিতেছে? কৌতূহল বাড়িল। দরজায় টোকা মারিলাম, ভিতরে কে—বলিয়া চিৎকার করিলাম, কিন্তু ভিতর হইতে কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না। অবশেষে বিরক্ত হইয়া দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করিলাম। দরজার ভিতর দিকের ছিটকিনি খট্ করিয়া খুলিয়া গেল, কিন্তু দরজা খুলিল না। মনে হইল কে যেন ভিতর হইতে প্রাণপণ বলে দরজা ঠেলিয়া আছে। দরজা খুলিয়া কোন লোককে বিব্রত করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। একবার সাড়া দিলেই আমি নিরস্ত হইতাম। কিন্তু সাড়া না পাওয়াতে এবং দরজার প্রতিরোধ বৃদ্ধি পাওয়াতে আমার রোখ চড়িয়া গেল। আমি দরজা ঠেলিতে লাগিলাম, অবশেষে সেই উদ্যমে কপালে ঘাম দেখা দিল।

এমন সময়ে ছোট একটা স্টেশনে গাড়ি থামিল। একজন যাত্রী উঠিল। সে আমাকে তদবস্থায় দেখিয়া বলিল, কি, খুলতে পারছেন না?

এই বলিয়া সে দরজায় হাত দিতেই অনায়াসে খুলিয়া গেল। ভিতরে না আছে লোক, না আছে আলো। আমি বিদ্যুতের টর্চ লইয়া ভিতরে ঢুকিলাম, কোন লোক যে আজ সারাদিনের মধ্যে ঢুকিয়াছিল তাহার চিহ্ন অবধি নাই। তখনই মনে হইল একি সেই অশরীরীর কাণ্ড? ওই শয্যার মালিক কি সেই অশরীরী? আমি ফিরিয়া আসিয়া ভদ্রলোকটির সঙ্গে গল্প করিয়া রাত কাটাইয়া দিলাম, কিন্তু বুকের ভিতরের কাঁপুনি কিছুতেই থামিল না। চুনারে নামিবার সময় অবধি বিছানার মালিকের দেখা পাইলাম না।

চুনার পৌঁছিতে বেলা দশটা বাজিয়া গেল। স্টেশনে নামিয়া একজন ওই-দেশীয় লোকের সহিত আলাপ করিয়া লইলাম। তাহার কাছে সন্ধান লইয়া একখানা এক্কা গাড়িতে চড়িয়া গঙ্গার ধারে একটি প্রকাণ্ড পুরাতন অট্টালিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে একজন কেয়ারটেকার দারোয়ান ছিল। তাহাকে শুধাইলাম, এ বাড়িতে থাকিতে পারা যাইবে কিনা এবং কিরূপ ভাড়া লাগিবে।

দারোয়ানজী বলিল, আপনার যতদিন খুশি থাকুন, খুশি হইয়া যাহা দিবেন তাহাই যথেষ্ট।

আহারের ব্যবস্থার কি করা যাইবে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, 'বর্তন উর্তন' তাহার কাছেই পাওয়া যাইবে আর রসুই করিবার জন্য একটা লোকও সে ঠিক করিয়া দিতে পারে। 'লেকিন মছলি উছলি' চলিবে না। আমি ধন্যবাদ দিয়া তাহার সাহায্য গ্রহণ করিলাম এবং জানাইয়া দিলাম যে মছলি খাইবার ইচ্ছা আমার নাই। তখন দরোয়ানজী সোৎসাহে তাহার প্রতিশ্রুতি পালনে লাগিয়া গেল।

বাড়িটি প্রকাণ্ড ও পুরাতন, আগেই বলিয়াছি। আধুনিক কৃপণ কল্পনার যুগে এত বড় অনাবশ্যকের আকাশ-ভরা বাড়ি কেহ তৈয়ারি করে না। বাড়ির ঠিক সমুখেই গঙ্গা। এখন বসন্তকালে বাড়ির কাছে অনেকটা চর পড়িয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া নদীর বিস্তৃতি অল্প নয়। গঙ্গার উপরেই প্রশস্ত টানা বারান্দা। আমার ব্যবহারের জন্য দুটি ঘর পাইলাম, একটি বসিবার অপরটি শুইবার। ঘরে পুরু গদিওয়ালা খানকতক চেয়ার ও টেবিল। আর শয়নঘরে একখানা মস্ত পালঙ্ক, পাশে একটা চেয়ার, টেবিল, আলনা। আর আছে ঘরের দেয়ালে মানুষপ্রমাণ পিতলের ফ্রেমে বাঁধানো একখানা আয়না।

আহার শেষ করিতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। সন্ধ্যা পর্যন্ত বারান্দায় বসিয়া কাটাইয়া দিলাম। রাত্রে অল্প কিছু আহার করিয়া শুইয়া পড়িলাম। অনেকদিন পরে এই আমার বিঘ্নহীন সুনিদ্রা হইল। ভোরবেলা উঠিয়া মনে আনন্দ অনুভব করিলাম, ভাবিলাম—তবে বোধ হয় অশরীরীর হাত হইতে বাঁচিয়া গেলাম। আজ তিনচার মাসের মধ্যে নির্বিঘ্ন নিদ্রার আরাম আমি পাই নাই, শরীর ভাঙিয়া পড়িবার মত, মৃত্যু-ইচ্ছার সেটাও একটা কারণ। যেটুকু ঘুম আমার হইত, তাহা যেন ওই অশরীরীর নেপথ্যবিধানের সুবিধার জন্যই হইত। নিদ্রার অবসরে হয় গেলাসের জল ফুরাইত, নয় ছবিখানি ঘুরিয়া যাইত। ঘুম এবং ঘুম না হওয়া দুই-ই আমার পক্ষে সমান আতঙ্কের কারণ হইয়া

দাঁড়াইয়াছিল। গত রাত্রের নিশ্চিন্ত ঘুমে তাই প্রফুল্ল বোধ করিলাম।

ভিখু নামে এক ছোকরা ভৃত্যকে দারোয়ানজী ঠিক করিয়া দিয়াছিল। সে কাজকর্ম সব জানে। চা জলখাবার ডাল ভাত তরকারি রুটি পুরি যাহা প্রয়োজন সমস্ত সময় মত করিয়া আনিত। ঘর ঝাড়ু দিত, বিছানা পাতিয়া দিত। কোন বিষয়ে আমার ভাবিবার আবশ্যক ছিল না। আমি সারাদিন বসিয়া গড়াইয়া বেড়াইয়া কাটাইয়া দিতাম।

চুনার প্রবাসের দ্বিতীয় দিন বিকালে আমি গঙ্গার তীর বরাবর বেড়াইতে বাহির হইলাম। অনেক দূর গিয়া প্রাচীন বয়সের ঝাউগাছেঘেরা একটি সমাধিস্থান দেখিতে পাইলাম। অনেকগুলি মুসলমানের কবর। কবরগুলি এখনো সুরক্ষিত। পাশেই ছোট একখানা খাপরার ঘরে একজন বৃদ্ধ মুসলমান বাস করে। তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিলাম যে, এই কবরগুলি রক্ষা ও মেরামত করিবার জন্য ছোট একটি জায়গীর আছে—সে তার মালিক বা জিম্মাদার। তাহার মুখেই শুনিলাম যে, বহুকাল আগে এখানে হুমায়ূন বাদশার সঙ্গে শেরশাহের জবর লড়াই হইয়াছিল। অনেক মোগল-পাঠান মরিয়াছিল। হুমায়ূন বাদশাহী লাভ করিবার পরে এখানকার কবরগুলির খবরদারির জন্য জায়গীর দান করেন। সেই জায়গীরের ধারা আজিও অক্ষুণ্ণ আছে।

ইতিহাসে শেরশাহ্‌ ও হুমায়ূনের লড়াইয়ের কথা পড়িয়াছি বটে। আর ওই যে অদূরে গিরিচূড়ায় চুনার-গড় তাহাও সুবিদিত। গিরিচূড়াবলম্বী সেই গড়ের ছায়াতে চিরনিদ্রিত এই কবরগুলির উপরে প্রাচীনকাল যেন সযত্নে অঞ্চল বিছাইয়া দিয়াছে। স্থানটি যেমন নির্জন, তেমনি মনোরম। সমুখে গঙ্গা, পিছনে স্তম্ভিত চুনার-গড়—আর চারিদিকে শ্মশানের ধূমের মত ধূসর ঝাউ গাছ, ইতিহাসের দীর্ঘ নিশ্বাস যেন তাহাদের শাখায় শাখায় নিরন্তর শ্বসিত হইতেছে। স্থানটি আমার মনকে বড়ই টানিল, আমি সেখানে বসিলাম। কতক্ষণ এরকম বসিয়াছিলাম জানি না—যখন হুঁশ হইল, দেখিলাম গঙ্গার ওপারে তৃতীয়াব অস্তমান চন্দ্রকলা গাছের আড়াল দিয়া হুমায়ূনের গুপ্তচরের মত এপারের পরিপ্রেক্ষিতকে লক্ষ্য করিতেছে। আমি উঠিয়া বাসার দিকে রওনা হইলাম। সমুদ্রের জোয়ারের গর্জনের মত ওই ঝাউয়ের একটানা হু-হু শব্দ কান ভরিয়া লইয়া রওনা হইলাম।

পরদিন বিকালে বেড়াইতে বাহির হইবার সময়ে আমার নূতন জুতাজোড়া পাইলাম না, সন্দেহ হইল—এ ভিখুর কাজ। তাহাকে ডাকিলাম, শুনিলাম সে বাজারে গিয়াছে। অগত্যা আর একজোড়া জুতা পরিয়া বাহির হইলাম। সেই ঝাউ-ঘেরা গোরস্থানে গিয়া পৌঁছিলাম। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া এক জায়গায় বসিলাম। এমন সময়ে গোরস্থানের রক্ষক সেই বৃদ্ধ মুসলমান আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। শুধাইলাম, খবর কি। সে বলিল, বাবুজী, কাল অনেক রাত্রে দুই বাবু এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই কেহ বোধ হয় একজোড়া জুতা ফেলিয়া গিয়াছেন।

তারপরে নিবেদন করিল আমি যেন খোঁজ করিয়া জুতাজোড়া মালিককে দিই। আমি তাহাকে জুতা আনিতে বলিলাম। লোকটা জুতা আনিলে আমি চমকিয়া উঠিলাম—একি! এ যে আমার জুতা!

আমার বিস্ময় তাহার কাছে প্রকাশ না করিয়া বলিলাম, কি রকম লোক, আর-একবার বল তো।

সে বলিল, বাবুজী, আমি অন্ধকার রাত্রে দূর হইতে দেখিয়াছি—কি রকম লোক কেমন করিয়া বলিব? তবে দুইজন লোক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তাহার কথায় আমার বিস্ময় বাড়িয়া ত্রাসে পরিণত হইল। আমি খোঁজ করিয়া মালিককে দিব জানাইয়া জুতাজোড়া একটা কাগজে মুড়িয়া লইয়া আসিলাম।

বাসায় আসিয়া ভাবিলাম এ কেমন হইল? আমিই কি রাত্রে সেখানে গিয়াছিলাম? স্বপ্নে বা নিশিতে পাইলে লোকে এমন বেড়াইয়া থাকে শুনিয়াছি। তবে কি আমারও সেই রোগ হইল! কিন্তু সঙ্গের দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে? সেই অশরীরী নয় তো? তবে কি সেই অজ্ঞেয় সত্তা অশরীরী নয়? নতুবা কবররক্ষক তাহাকে দেখিল কিভাবে? অজ্ঞাতসারে ঘুমের ঘোরে আমি কি তাহার ভ্রমণসঙ্গী হইয়া উঠিয়াছি নাকি? এই কথা মনে হইবামাত্র সেই নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে গা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল—দেহের প্রত্যেকটি লোম খাড়া হইয়া উঠিল। সঙ্কল্প হইল আজ হইতে রাত্রে আর ঘুমাইলে চলিবে না। স্থির করিলাম দিনের বেলা ঘুমাইয়া লইয়া রাতটা জাগিয়া কাটাইব।

রাত্রিটা জাগিবার সঙ্কল্প করিলাম। হঠাৎ বোধ হয় একবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, দরজায়

করাঘাতের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। কে?—বলিয়া চিৎকার করিলাম—আর কোন সাড়া নাই। আবার জাগিবার চেষ্টা চলিল—বোধ করি একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল—আবার দরজা নাড়ার শব্দ।

বুঝিলাম এ সেই অশরীরীর ক্রিয়া। বুঝিলাম অশরীরী আজও তাহার ভ্রমণসঙ্গীর সন্ধানে আসিয়াছে। কাজেই এবারে আর সাড়া দিলাম না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। এমনিভাবে ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া রাতটা কাটিয়া গেল।

তারপরে প্রতি রাত্রে এমনিধারা চলিতে লাগিল। জাগরণে ও তন্দ্রায় আমার চোখে মল্লযুদ্ধ চলিতে থাকে—যেমনি একটু তন্দ্রা আসে, অমনি দরজা নাড়ার শব্দ, নতুবা বাহিরে পদধ্বনি শুনিতে পাই। একদিন হঠাৎ পিঠের উপরে কাহার তপ্ত নিশ্বাস অনুভব করিয়া ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিলাম। ঘর নির্জন, কেহ কোথাও নাই।

কয়েকদিন এমনি চলিলে আমার শরীর আরও ভাঙিয়া পড়িল। ভাবিলাম এ রকম চলিতে থাকিলে এই বিদেশেই মরিতে হইবে। আমার কেমন যেন ধারণা হইয়া গিয়াছিল এ যাত্রা আমাকে মরিতেই হইবে।—ভাবিলাম মরিতেই হয় তো কলিকাতা ফিরিয়া মরিব—বিদেশে বিভুঁয়ে মরিব কেন। এতক্ষণ বারান্দায় বসিয়াছিলাম, এবারে কি একটা কাজে ঘরে ঢুকিতেই মনে হইল আয়নার মধ্যে যেন কাহার ছায়া। আবার তাকাইলাম—শূন্য আয়না ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, ঘরের মধ্যে কেহ কোথাও নাই।

একবার মনে হইল আমার ছায়া—পরক্ষণেই বুঝিলাম আমার ছায়া হইতেই পারে না, কারণ আমি যেখানে দাঁড়াইয়া সেখানকার ছায়া আয়নায় পৌঁছায় না। তবে এ কী দেখিলাম! আমার বিশ্বাস জন্মিল যে আমি কোন দুর্জ্ঞেয় সত্তার ষড়যন্ত্রের শিকার।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বেড়াইয়া সবে ঘরে ঢুকিয়াছি, দেখিলাম, স্পষ্ট দেখিলাম, মনে হওয়া বা অনুমান করা নয় যে, আয়নার উপরে ছায়া। শুধু এক বিদ্যুৎঝলকের জন্য, শুধু জলে দাগ কাটার মত, কিন্তু সত্যই যে দেখিলাম তাহাতে সন্দেহ নাই। তখনি মনে পড়িল—ঘর তো অন্ধকার, এখনো আলো জ্বালানো হয় নাই, তবে ছায়া পড়িবে কি উপায়ে? বিদ্যুতের টর্চ টিপিলাম। শূন্য ঘর। ঘরের সেই সুবৃহৎ শূন্যতাকে একটা বিরাট হাঁ-র মত মনে হইল।

অবশেষে কিভাবে আমার ত্রাস যে রোখে পরিণত হইল সে প্রশ্নের উত্তর দিবার সাধ্য আমার নাই। তবে আমার ধারণা এই যে, কোন একটা মনোভাব চরমে পৌঁছিলে তাহা অপর একটা মনোভাবে পরিণত হয়। মানুষের মনের সব ভাবগুলার মধ্যে গোপন চলাচলের একটা পথ আছে বলিয়াই এমন বোধ করি সম্ভব হয়।

আমার মাথায় রোখ চাপিয়া গেল যে, মরিতেই যখন হইবে, মরিতেই যখন বসিয়াছি, অশরীরীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া মরিব, আর কিছু না পারি তাহাকে শিকারের আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া মরিব। মৃত্যু যখন আমার আসন্ন, মনে হইল—এইভাবে মরিলেই আমার মরা সার্থক হইবে। আমি স্থির করিলাম যে আর দুই এক রাত্রি অশরীরীর রহস্য উদ্‌ঘাটনের শেষ চেষ্টা করিব। পারি তো উত্তম, না পারি তো নিজের প্রাণ নিজের হাতে লইব, অশরীরীর শিকারে পরিণত হইব না। এখন হইতে গুলিভরা পিস্তলটা সর্বদা পকেটে রাখিতে লাগিলাম।

সেদিন রাত্রি আমার জীবনের শেষ রাত্রি হইবে যখন ভাবিয়াছিলাম তখন কে জানিত যে, সেই রাত্রিই আমার মোহমুক্তির রাত্রি হইবে?

অনেক রাত্রি পর্যন্ত বারান্দায় বসিয়াছিলাম—বলা বাহুল্য—একাকী। রাত্রি ঘন অন্ধকার। দূরাগত ঝাউগাছের হু হু শব্দ পরলোকের তীরভূমি হইতে বাহিত দীর্ঘনিশ্বাসের মত শ্রুত হইতেছিল। সমুখে গঙ্গা—সেখানে অন্ধকার কিছু ফিকা, নতুবা বুঝিবার আর কোন উপায় নাই। বসিয়া বসিয়া একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, এমন সময় মনে হইল, ঘরের মধ্যে কে যেন শিস্ দিতেছে। দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম—আজ আমার মনে আর ভয় ছিল না। অশরীরীকে গুলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করা সম্ভব হইলে অবশ্যই করিতাম, কিন্তু মনের ওই অবস্থাতেও বুঝিয়াছিলাম যে, তাহা সম্ভব নয়, তাই নিজেই মরিব। অশরীরীর উপস্থিতিতে নিজের হাতেই মরিব, তাহার শিকার ফস্‌কাইয়া যাইবে, সে হতাশ হইবে। সে কি আনন্দ! ওই এক আনন্দই তখন জীবনে অবশিষ্ট ছিল। উৎকট উল্লাসে হাসিয়া উঠিলাম। অনেক দিন হাসি নাই, এত উচ্চস্বরে কখনো হাসি নাই। নিজের হাসিতে নিজে

চমকিয়া উঠিলাম। হঠাৎ সেই ছায়া, ঈষদালোকিত কক্ষের আয়নার উপরে সেই ছায়া—শুধু এক পলকের জন্য। পিস্তল বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। দরজাটা খোলা ছিল, বন্ধ করিয়া আসিলাম। তখন আমার মুখ দরজার দিকে। আমার ঠিক পিছনে দেয়ালের গায়ে আয়না। পিছনে সেই শিস্ দিবার শব্দ। পিছন ফিরিবামাত্র ছায়াশরীরী অশরীরী। মনে হইল সে যেন আর আয়নার উপরে নাই। আমার দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। কি করিতেছি ভাবিয়া দেখিবার আগেই পিস্তল তুলিয়া নিজের মাথা লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িলাম, কেবল তড়িদ্‌বেগে মনে হইল, আমার ঠিক পিছনে সে যখন রহিয়াছে, সেও মরিবে। এক গুলিতে শিকার ও শিকারীর দুজনেরই জীবনাবসান!

বোধ হয় হাত একটু কাঁপিয়া গিয়াছিল। শূন্যঘরে পিস্তলের শব্দ মাথা কুটিতে লাগিল। পিছন হইতে একটা নিদারুণ নিষ্ঠুর হাসির খন্‌খন্ শুষ্ক আওয়াজ কানে আসিল, মনে হইল অশরীরী আমার ব্যর্থ চেষ্টাকে ধিক্কার দিয়া হাসিতেছে। চারিদিকে বারুদের গন্ধ। ঘরের মেজে কাঁপিতেছে, ছাদ ঘুরিতেছে, সমস্ত অন্ধকার।

পরদিন যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম আমি শয্যার উপরে শায়িত, ভিখু মাথায় বাতাসা করিতেছে। পায়ের কাছে দারোয়ানজী গম্ভীরমুখে দণ্ডায়মান। শিমুলতলার ঠিকানায় একটা তার করিতে বলিয়া আবার আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙিল দেখিলাম যে, আমার পরিবারের জন তিনেক কাছে বসিয়া আছে। তাহাদের বলিলাম আজই আমাকে এখান হইতে লইয়া চল।

পরদিন প্রাতে শিমুলতলায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

এই ঘটনার পরে পাঁচসাত বৎসর অতীত হইয়াছে। এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক। অশরীরীর স্মৃতি আমার মনে ফিকা হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সত্য করিয়া বলি, এই রহস্যের উত্তর আজও পাই নাই। ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করিয়া সেই পুরাতন উত্তরই পাইয়াছি - নার্ভাস শক। মনস্তাত্ত্বিকদের জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইয়াছি—সমস্ত ব্যাপারটাই একটা সাবজেকটিভ রিঅ্যাকশন। বন্ধুরা বলে আমি ধাপ্পা দিতেছি। কিন্তু আমি জানি, মর্মান্তিকভাবে জানি, সমস্তই নিদারুণ সত্য। কেমন করিয়া না জানি অশরীরীর মোহময় খোলসের মধ্যে আমি ঢুকিয়া পড়িয়াছিলাম। সেই রাত্রের পিস্তলের গুলি সেই মোহ ভেদ করিয়া দিয়া আমাকে বাঁচাইয়া দিয়াছিল। অশরীরী নিজের ব্যর্থতায় আত্মধিক্কারের অট্টহাস্য করিয়া সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। বন্ধুরা বলে, ওসব তোমার কবিত্ব। যাহাকে ধিক্কারের অট্টহাস্য বলিতেছ, বস্তুত তাহা পিস্তলের গুলি লাগিয়া সেই বৃহৎ আয়নাখানা ভাঙিবার শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি বুঝাইতে পারি না, চুপ করিয়া থাকি।

লাল চুল

মনোজ বসু

ছ'মাস ধরিয়া বিয়ের দিন সাব্যস্ত হয় না। তারপর দিন ঠিক হইল তো গোল বাধিল জায়গা লইয়া। মোটে তখন দিন পনেরো বাকি, হঠাৎ নীলমাধবের চিঠি আসিল—কাজিডাঙা অবধি যাওয়া কিছুতেই হইতে পারে না, তাঁহারা বড়জোর খুলনায় আসিয়া শুভকর্ম করিয়া যাইতে পারেন।

বিয়ের ঘটক শীতলচন্দ্র বিশ্বাস ; চিঠি লইয়া সেই আসিয়াছিল। ভিড় সরিয়া গেলে আসল কারণটা সে শেষকালে ব্যক্ত করিল। প্রতিপক্ষ চৌধুরীদের সীমানা কাজিডাঙার ক্রোশ তিনেকের মধ্যে। বলা তো যায় না, তিন ক্রোশ দূর হইতে কয়েক শত লাঠিও যদি আচমকা বিয়ের নিমন্ত্রণে চলিয়া আসে! তাহারা বরাসন হইতে বর তুলিয়া রাত্রির অন্ধকারে গাঙ পাড়ি দিয়া বসিলে অজ পাড়াগাঁয়ে জলজঙ্গলের মধ্যে কেবল নিজেদের হাত কামড়ান ছাড়া আর কিছু থাকিবে না।

পাত্র জমিদারের ছেলে ; জমিদারের ছেলে ওই একটি মাত্র। অতএব এই ছ'মাস ধরিয়া যে জমিদার-বাড়িতে শুভকর্মের গুরুতর আয়োজন চলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই আয়োজনের সত্যকার চেহারাটা সহসা উপলব্ধি করিয়া আনন্দে মেয়ের বাপের হৃদকম্প উপস্থিত হইল। অথচ মিনুর মা আড় হইয়া পড়িলেন।—ওই তেইশে মেয়ের বিয়ে আমি দেবই—বারবার এইরকম গোছগাছ করে শেষকালে যে—না হয় তুমি সেই বি-এ ফেল ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করে ফেল......

কিন্তু অতবড় ঘর ও বরের লোভ ছাড়া সোজা কথা নয়। শেষ পর্যন্ত আবশ্যকও হইল না। শহরের প্রান্ত সীমায় ভৈরব নদীর ধারে সেরেস্তাদারবাবুর এক নূতন বাড়ি তুলিতেছিলেন। বাড়িটা তিনি কয়েকদিনের জন্যে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন। সামনের ফাঁকা জমির ইট কাঠ সরাইয়া সেখানে সামিয়ানা খাটাইয়া বরযাত্র বসিবার জায়গা হইল। পিছনে খাওয়ার জায়গা। যদি দৈবাৎ বৃষ্টি চাপিয়া পড়ে তাহা হইলে দোতলার দরদালানে সত্তর আশিজন করিয়া বসাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

বিকালে পাঁচখানা গরুর গাড়ি বোঝাই আরও অনেক আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়া পড়িল। লগ্ন সাড়ে

আটটায়।

রানী বলিল, মাসিমা, হিরণের বিয়ের বেলায় আপনি বড় অন্যায় করেছিলেন। সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে আপনি যে জামাই নিয়ে খাওয়াতে বসবেন—সে হবে না কিন্তু—

মিনুর মা হাসিলেন।

না, সে হবে না, মাসিমা। আমরা সমস্ত রাত বাসর জাগব, কোন কথা শুনব না, বলে দিচ্ছি। নয় তো বলুন, এক্ষুনি ফের গাড়িতে গিয়ে উঠে বসি।

রসুই ঘরের দিকে হঠাৎ তুমুল গণ্ডগোল। বেড়ার ওপর কে জ্বলন্ত কাঠ ঠেক দিয়া রাখিয়াছিল, একটা অগ্নিকাণ্ড হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। সকলের বিশ্বাস, কাজটা বামুন ঠাকুরের ; তাই রাগ করিয়া কে তার গাঁজার কলিকা ভাঙিয়া দিয়াছে। পৈতা হাতে বারম্বার ব্রাহ্মণ সন্তান দিব্য করিতেছিল— বিনা অপরাধে তাহার গুরুদণ্ড হইয়া গেল, অগ্নিকাণ্ডে কলিকার দোষ নাই। তিনদিনের মধ্যে সে কলিকা একেবারে হাতে লয় নাই।

বেলা ডুবিয়া যাইতে শীতল ঘটক আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল, খবর কি ? খবর কি ?

শীতল কহিল, খবর ভাল। বর, বরযাত্রী সব ওদের বাসাবাড়ি পৌঁছে গেছেন। জজবাবুর বড় মোটর এনে সাজান হচ্ছে। ঘন্টাখানেকের মধ্যে এসে পড়বেন।

তারপর হাসিয়া গলা খাটো করিয়া কহিতে লাগিল, একশ' বরকন্দাজ গাঙের ঘাট আগলাচ্ছে। কি জানি, কিছু বলা যায় না। আমাদের কর্তাবাবু একবিন্দু খুঁত রেখে কাজ করেন না।

মোটরের আওয়াজ উঠিতেই ধুপধাপ করিয়া আটদশটা মেয়ে ছুটিল তেতলার ছাতে। সকলের পিছন হইতে নিরু বলিল, যাওয়া ভাই, অনর্থক। ছাত থেকে কিচ্ছু দেখা যাবে না। তার চেয়ে গোলকুঠরির জানলা দিয়ে—

কৌতূহল চোখমুখ দিয়া যেন ছিটকাইয়া পড়িতেছে ; ঠাট্টাতামাসা—ছুটাছুটি—মাঝে মাঝে হাসির তরঙ্গ ; তার মধ্যে যুক্তি বিবেচনার কথা কে শুনিবে ?

রানী সকলের আগেভাগে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আঙুল দিয়া দেখাইল, ওই, ওই—বর—দেখ—

মরবি যে এক্ষুনি পড়ে—ছাতের এখনো আলসে হয়নি দেখেছিস ? বলিয়া আর একটি মেয়ে রানীকে পিছে ঠেলিয়া নিজে আগে আসিল। যেন সে মোটেই পড়িতে পারে না। জিজ্ঞাসা করিল, কই ? ও রানী, বর দেখলি কোন দিকে।

গলায় ফুলের মালা—ওই যে। দেখতে পাও না—তুমি যেন কি রকম সেজদি !

সেজদি বলিল—মালা না তোর মুণ্ডু। ও যে এক বুড়ো—সাদা চাদর কাঁধে। থুত্থুরে মাগো, তিন কালের বুড়ো—ও বরের ঠাকুরদাদা। বর এতক্ষণে কোনকালে আসনে গিয়ে বসেছে—

ছাতের উপর হইতে বরাসন নজর চলে না, দেখা যায় কেবল সামিয়ানা। নিরু বলিল, বলেছি তো অনর্থক। তার চেয়ে নিচে গোলকুঠরির জানলা দিয়ে দেখিগে চল।

চল, চল—

অন্ধকারে নদী মৃদুতম গানের সুর তুলিয়া বহিয়া যাইতেছে। ওপারেও যেন কিসের উৎসব—অনেকগুলো আলো, ঢাকের বাজনা...। সহসা এক ঝলক স্নিগ্ধ বাতাস উহাদের রঙিন শাড়ি, কেশ-বেশের সুগন্ধ উচ্ছল কলহাস্যের টুকরাগুলি উড়াইয়া ছড়াইয়া বহিয়া গেল।

ঘুমিয়ে কে রে ? মিনু ? ওমা মাগো, যার বিয়ে তার মনে নেই ; পালিয়ে এসে চিলে কোঠায় ঘুমোনো হচ্ছে !

রানী হাত ধরিয়া নাড়া দিতে মিনু একবার চাহিয়া চোখ বুজিল।

নিরু বলিল, আহা, সারাদিন না খেয়ে নেতিয়ে পড়েছে। ঘুমোক না একটু—আমরা নিচে যাই—

সেজদি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, গিন্নীপনা রাখ দিকি। আমরাও না খেয়ে ছিলাম একদিন। ঘুমোনোর দফা শেষ আজকের দিন থেকে। কি বলিস রে রানী !

বিশেষ করিয়া রানীকেই জিজ্ঞাসা করিবার একটা অর্থ আছে। কথাটা গোপনীয়, কেবল সেজদি আড়ি দিতে গিয়া দৈবাৎ জানিয়া ফেলিয়াছিল। রানী মুখ টিপিয়া হাসিল। দুই হাতে ঘুমন্ত মিনুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুমো খাইয়া বলিতে লাগিল, মিনু ভাই, জাগো—আজকে ঘুমোতে আছে ? উঠে

বর দেখবে এস। তারপর মিনুর এলো চুলে হাত পড়িতে যেন শিহরিয়া উঠিল, দেখেছ? সন্ধ্যাবেলায় আবার নেয়ে মরেছে হতভাগী। শুয়ে শুয়ে চুল শুকনো হচ্ছে। ভিজে চুল নিয়ে এখন উপায়? এই রাশ বাঁধতে কি সময় লাগবে কম? নিচে উলুধ্বনি উঠিল। পিসিমা, নন্দরাণী, শুভা ওদের সব গলা।

চল—চল—

চুল বাঁধতে হবে--ওঠ মিনু, শিগগির উঠে আয়। —বলিয়া মিনুর এলোচুল ধরিয়া জোরে একটান দিয়া রানী ছুটিয়া দলে মিশিল। সিঁড়িতে আবার সমবেত পদধ্বনি।

ধড়মড় করিয়া মিনু উঠিয়া বসিল। তখন রানীরা নামিয়া গিয়াছে, ছাতে কেহ নাই। ঘুমচোখে ভাবিল এটা যেন তাদের কাজিডাঙার বাড়ির দক্ষিণের চাতাল। আকাশ ভরিয়া তারা উঠিয়াছে; ছাতে ঝাপসা ঝাপসা আলো, ওদিকে ভয়ানক গণ্ডগোল উঠিতেছে।...সব কথা মিনুর মনে পড়িল—আজ তার বিয়ে, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সকলে ডাকাডাকি লাগাইয়াছে...। হঠাৎ নিচের দিকে কোথায় দপ করিয়া সুতীব্র আলো জ্বলিয়া অনেকখানি রশ্মি আসিয়া পড়িল ছাতের উপর। তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া সিঁড়ি ভাবিয়া যেই সে পা নামাইয়া দিয়াছে—

চারিদিকে তুমুল হৈ হৈ পড়িয়া গেল। আসর ভাঙিয়া সকলে ছুটিল। হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান চলিতেছিল, পায়ের আঘাতে আঘাতে সেটা যে কোথায় চলিয়া গেল তার ঠিকানা রহিল না। একেবারে একতলার বারান্দায় পড়িয়া মিনু নিশ্চেতন। —জ্বল, জ্বল...মোটর আনো, ভিড় করবেন না মশাই, সরুন—ফাঁক করে দিন...আহা-হা কি কর, মোটরে তোল শিগগির। গামছা কাঁধে কোন দিকে হইতে কন্যার বাপ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন।

জজবাবুর সেই মোটরে চড়িয়া মিনু হাসপাতালে চলিল। বড় রাস্তায় রশি দুই পথ গিয়া মোটর ফিরিয়া আসিল, আর যাইতে হইল না।

রসুন-চৌকি থামিয়া গিয়াছে। দরজার পুবদিকে ছোট লাল চাদরের নিচে চারিটা কলাগাছ পুঁতিয়া বিয়ের জায়গা হইয়াছিল। সেইখানে শব নামাইয়া রাখা হইল। কাঁচা হলুদের মত গায়ের রঙ, তার উপর নূতন গহনা পরিয়া যেন রাজরাজেশ্বরী হইয়া শুইয়া আছে। কনে-চন্দন আঁকা শুভ্র কপাল ফাটিয়া চাপ চাপ জমা রক্ত লেপিয়া রহিয়াছে, নাক ও গালের পাশে রক্ত গড়াইয়াছে—মেঘের মত খোলা চুলের রাশি এখানে সেখানে রক্তের ছোপে ডগমগে লাল।

ভিতরে-বাহিরে নিদারুণ স্তব্ধতা—বাড়িতে যেন একটা লোক নাই। শবের মাথার উপরে একটি খরজ্যোতি গ্যাস জ্বালিতেছে। বাড়ির মধ্যে স্তব্ধতা চিরিয়া হঠাৎ একবার আর্তনাদ আসিল—ওমা, ও মাগো আমার—ও আমার লক্ষ্মীমানিক রাজরানী মা—

নীলমাধব সকলের দিকে চাহিয়া ধমক দিয়া উঠিলেন, হাত পা গুটিয়ে বসে আছ যে—

বরশয্যার প্রকাণ্ড মেহাগ্নি-পালিশ খাট কজনে টানিয়া নামাইয়া আনিল।

এতক্ষণ বেণুধরকে লক্ষ্য হয় নাই। এইবার ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া শবের পায়ের কাছে খাটের বাজুতে ভর দিয়া সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। হাতের মধ্যে কাজললতা তেমনি ধরা আছে। কাচের মত স্বচ্ছ অচঞ্চল আধ-নিমীলিত দুটি দৃষ্টি, মৃতার সেই স্তিমিত চোখ দুটির দিকে নিষ্পলক চাহিয়া চাহিয়া বেণুধর দাঁড়াইয়া রহিল।

বাপ ঝুঁকিয়া পড়িয়া পাগলের মত আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, একবার ভাল করে চা দিকি...চোখ তুলে চা—ও খুকী...

নীলমাধব ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তিনি থামিলেন না, সজল চোখে বারবার বলিতে লাগিলেন, ও বেয়াই, বিনি দোষে মাকে আমার কত গালমন্দ দিয়েছি—কোন সম্বন্ধ এগুতে চায় না, তার সমস্ত অপরাধ দিনরাত মা ঘাড় পেতে নিয়েছে, একবার মুখ তুলে একটা কথাও কয়নি। ও খুকী, আর বকব না—চোখ তুলে চা' একবার—

ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। নীলমাধব ক্রুদ্ধকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে তোমরা? আটটা বেজে গেছে, রওনা হও।

সাড়ে আটটায় লগ্ন ছিল—বেণুধরের বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল, যেন শুভ লগ্নে তাহাদের

শুভদৃষ্টি হইতেছে, লজ্জানত বালিকা চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছে না, বাপ তাই মেয়েকে সাহস দিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।...ফুল ও দেবদারু-পাতা দিয়া গেট হইয়াছিল, সমস্ত ফুল ছিঁড়িয়া আনিয়া সকলে শবের উপর ঢালিয়া দিল। বেণুধর গলার মালা ছিঁড়িয়া সেই ফুলের গাদায় ছুড়িয়া দ্রুতবেগে ভিড়ের মধ্য দিয়া পালাইয়া গেল।

ছুটিতে ছুটিতে রাস্তা অবধি আসিল ; সর্বাঙ্গ দিয়া ঘামের ধারা বহিতেছে, পা টলিতেছে, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে। মোটরের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উন্মত্তের মত সে বলিয়া উঠিল—চালাও এক্ষুনি—

গাড়ি চলিতে লাগিলে হুঁশ হইল, তখনো আগাগোড়া তাহার বরের সাজ, একবোঝা কোট কামিজ, তার উপর সৌখীন ফুলকাটা চাদর—বিয়ের উপলক্ষে পছন্দ করিয়া সমস্ত কেনা। একটা একটা করিয়া খুলিয়া পাশে সমস্ত স্তূপাকার করিতে লাগিল। তবু কি অসহ্য গরম। বেণুর মনে হইল, সর্বদেহ ফুলিয়া ফাটিয়া এবার বুঝি ঘামের বদলে রক্ত বাহির হইবে। ক্রমাগত বলিতে লাগিল, চালাও—খুব জোরে চালাও গাড়ি—

সোফার জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় ?

যেখানে খুশি। ফাঁকায়—গ্রামের দিকে—

তীর বেগে গাড়ি ছুটিল। চোখ বুজিয়া চেতনাহীনের মত বেণুধর পড়িয়া রহিল।

সুমুখ-আঁধার রাত্রি, তার উপর মেঘ করিয়া আরও আঁধার জমিয়াছে। জনবিরল পথের উপর মিটমিটে কেরোসিনের আলো যেন প্রেতপুরীর পাহারাদার। একবার চোখ চাহিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া বেণুধর শিহরিয়া উঠিল, এমন নিবিড় অন্ধকার সে জীবনে দেখে নাই। দুধারের বাড়িগুলির দরজা-জানলা বন্ধ, ছোট শহর ইতিমধ্যেই নিশুতি হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে আম কাঁঠালের বড় বড় বাগিচা।...সহসা কোথায় কোন দিক দিয়া উচ্ছল হাসির শব্দ ভাসিয়া আসিল, অতি মৃদু অস্পষ্ট কৌতুক-চঞ্চল অনেকগুলো কণ্ঠস্বর—বউ দেখিয়ে যাও, বউ দেখিয়ে যাও গো—

আশপাশের সারি সারি ঘুমন্ত বাড়িগুলির ছাদের উপর, আমবাগিচার এখানে সেখানে, ল্যাম্পপোস্টের আবছায়ে নানা বয়সের কত মেয়ে কৌতূহল-ভরা চোখে ভিড় করিয়া বউ দেখিতে দাঁড়াইয়া আছে।

তারপর গাড়ির মধ্যে দৃষ্টি ফিরাইয়া এক পলকে যেন তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। বধূ তাহার পাশে রহিয়াছে, সত্যই একটা বউ মানুষ ঘোমটার মধ্যে জড়সড় হইয়া মাথা নোয়াইয়া একেবারে গদির সঙ্গে মিশিয়া বসিয়া আছে, গায়ে ছোঁয়া লাগিলে যেন সে লজ্জায় মরিয়া যাইবে। তারপর খেয়াল হইল, সে তার পরিত্যক্ত জামা-চাদরের বোঝা, মানবী নয়। এই গাড়িতেই মেয়েটিকে হাসপাতালে লইয়া চলিয়াছিল ; সে বসিয়া নাই, তার দেহের দু-এক ফোঁটা রক্ত হয়তো গাড়ির গদিতে লাগিয়া থাকিতে পারে।

শহর ছাড়িয়া নদীর ধারে ধারে গাড়ি ক্রমে মাঠের মধ্যে আসিল। হেডলাইট জ্বালিয়া গাড়ি ছুটিতেছে ; চারিদিকে নিঃশব্দতাকে পিষিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া খোয়া-তোলা রাস্তার উপর চাকার পেষণে কর্কশ সুকরুণ আর্তনাদ উঠিতেছে। একটি পল্লীকিশোরীর এইদিনকার সকল সাধ-বাসনা বেণুধরের বুকের মধ্যে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। চাকার সামনে সে যেন বুক পাতিয়া দিয়াছে। বাহিরে ঘন তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি—জনশূন্য মাঠ—কোনদিকে আলোর কণিকা নাই। সৃষ্টির আদি যুগের অন্ধকারলিপ্ত নীহারিকামণ্ডলীর মধ্য দিয়া বেণুধর যেন বিদ্যুতের গতিতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, আর পাশে পাশে পাল্লা দিয়া ছুটিয়া মরিতেছে নিঃশব্দচারিণী মৃতরূপা তার বধূ। লাল বেনারসীতে রূপের রাশি মুড়িয়া লজ্জায় ভাঙিয়া শতখান হইয়া এখানে এক কোণে তার বসিবার স্থান ছিল. কিন্তু একটি মুহূর্তের ঘটনার পরে এখন তার স্থান হইয়াছে সীমাহীন আশ্রয়হীন বিপুল শূন্যতায়—রাত্রির অন্ধকার মথিত করিয়া বাতাসের বেগে ফরফর শব্দে তার পরনের কালো কাপড় উড়ে, পায়ের আঘাতে জোনাকি ছিটকাইয়া যায়, গতির বেগে সামনে ঝুঁকিয়া-পড়া ঘন চুল ভরা মাথাটি—মাথার চারিপাশ দিয়া রক্তের ধারা গড়াইয়া গড়াইয়া বৃষ্টি বহিয়া যায়, এলো চুল উড়ে—দিগন্তব্যাপী ডগমগে লাল চুল।

দুই হাতে মাথা টিপিয়া চোখ বুজিয়া বেণুধর পড়িয়া রহিল। গাড়ি চলিতে লাগিল। খানিক পরে পথের ধারে এক বটতলায় থামিয়া হাটুরে চালার মধ্যে বাঁশের মাচায় অনেকক্ষণ মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া

থাকিয়া অবশেষে মন কিছু শান্ত হইলে বাসাবাড়িতে ফিরিয়া আসিল।

নীলমাধব প্রভৃতি অনেকক্ষণ আসিয়াছেন। রবযাত্রীর অনেকে মেল ট্রেন ধরিতে সোজা স্টেশনে গিয়াছে। কেবল কয়েকজন মাত্র—যাহারা খুব নিকট আত্মীয় বৈঠকখানার পাশের ঘরে বালিশ কাঁথা পুঁটুলি বই যা হয় একটা কিছু মাথায় দিয়া যে যার মত শুইয়া পড়িয়াছেন। অনেক রাত্রি। হেরিকেনের আলো মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। আলোর সামনে ঠিক মুখোমুখি নির্বাক নিস্তব্ধ গম্ভীর মুখে বসিয়া নীলমাধব ও শীতল ঘটক।

বেণুকে দেখিয়া নীলমাধব উঠিয়া আসিলেন। বলিলেন, কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লে—মোটর নিয়ে গিয়েছ শুনে ভাবলাম, বাসাতেই এসেছ। এখানে এসে দেখি তাও নয়। ভারি ব্যস্ত হয়েছিলাম। জজ বাববু বাড়িতে বিজয় গিয়ে বসে আছে এখনো।

বেণুধর বলিল, বড্ড মাথা ধরল, ফাঁকায় তাই খানিকটে ঘুরে এলাম—

বলে যাওয়া উচিত ছিল—। বলিয়া নীলমাধব চুপ করিলেন।

ছেলে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া পুনরায় বলিলেন, তোমার খাওয়া হয়নি। দক্ষিণের কোঠায় খাবার-ঢাকা আছে, বিছানা করা আছে, খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়—রাত জাগবার দরকার নেই।

ঘরে গিয়া নীলমাধবের ভয়ে ঢাকা খুলিয়া খাবার খানিকটা সে নাড়াচাড়া করিল ; মুখে তুলিতে পারিল না।

দালানের পিছনে কোথায় কি ফুল ফুটিয়াছে, একটা উগ্র মিষ্টগন্ধের আমেজ। মিটমিটে আলোয় রহস্যাচ্ছন্ন আধ-অন্ধকারে চারিদিক চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল, ঘর ভরিয়া কে একজন বসিয়া আছে, তাহাকে ধরিবার জো নাই—অথচ তাহার স্নিগ্ধ লাবণ্য বন্যার মত ঘর ছাপাইয়া যাইতেছে ; কোণের দিকে দলিল-পত্র ভরা সেকেলে বড় ছাপবাক্সের আবডালে নিবিড় কালো বড় বড় চোখদুটি অভুক্ত খাবারের দিকে বেদনাহত ভাবে চাহিয়া নীরব দৃষ্টিতে তাহাকে সাধাসাধি করিতেছে। আলো নিভাইতেই সেই দেহাতীত ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্য অকস্মাৎ বেণুধরকে কঠিন ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিল।...

বাহিরের বৈঠকখানায় কথাবার্তা আরম্ভ হইল। শীতল ঘটক নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, পোড়াকপালী আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল।

তারপর চুপ। অনেকক্ষণ আর কথা নাই।

শীতল আবার বলিতে লাগিল, বুদ্ধি শ্রী ছিল মেয়েটার। মনে আছে কর্তাবাবু, সেই পাকা দেখা দেখতে গিয়ে আপনি বললেন, আমার মা নেই, একজন মাকে খুঁজতে এসেছি। আপনার কথা শুনে মেয়েটি কেমন হেসে ঘাড় নিচু করে রইল—

নীলমাধব গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, থামো শীতল !

একেবারেই কথা বন্ধ হইল, দুজনে চুপচাপ। আলো জ্বলিতে লাগিল। আর ঘরের মধ্যে বেণুধরের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল ; জীবনকালের মধ্যে কোনদিন যাহাকে দেখে নাই, মৃত্যুপথবর্তিনী সেই কিশোরী মেয়ের ছোট ছোট আশা আকাঙ্ক্ষাগুলি হঠাৎ যেন মাঠ বাড়ি বাগিচা ও এত রাস্তা পার হইয়া জানালা গলিয়া অন্ধকার ঘরখানির মধ্যে তাহার পদতলে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে লাগিল।

তারপর কখন বেণু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ; জানালা খোলা, শেষরাতে পূর্বদিগন্তে চাঁদ উঠিয়া ঘর জ্যোৎস্নায় প্লাবিত করিয়া দিয়াছে, দিগন্তবিসারী ভৈরব শান্ত জ্যোৎস্নার সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছে। হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, কি একটা ভারি অন্যায় হইয়া যাইতেছে...হঠাৎ বড় ঘুম আসিয়া পড়িয়াছিল...কে আসিয়া কতবার ডাকাডাকি করিয়া বেড়াইতেছে। ঘুমের আলস্য তখনও বেণুধরের সর্বাঙ্গে জড়াইয়া আছে ; তাহার তন্দ্রা-বিবশ মনের কল্পনা ভাসিয়া চলিল—

ঠক্-ঠক্-ঠক্—

খিল-আঁটা কাঠের কপাটের ওপাশে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি এখনো যে ক্ষীণ আঘাত করিতেছে বেণুধর তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পায়।

হাতের চুড়িগুলি গোছার দিকে টানিয়া আনা, চুড়ি বাজিতেছে না। শেষ প্রহর অবধি জাগিয়া জাগিয়া তাহার শ্রান্ত দেহ আর বশ মানে না। চোখের কোণে কান্না জমিয়াছে। একটু আবদারের

কথা কহিলে, একবার নাম ধরিয়া ডাকিলে এখনি কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিবে। ফিসফিস করিয়া বধূ বলিতেছে, দুয়ার খুলে দাও গো, পায়ে পড়ি—

উঠিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনার দরকার ; কিন্তু মনে যতই তাড়া, দেহ আর উঠিয়া গিয়া কিছুতেই কষ্টটুকু স্বীকার করিতে রাজী নয়। বেণুধর দেখিতে লাগিল, বাতাস লাগিয়া গাছের উপবের লতা যেমন পড়িয়া যায়, ঝুপ করিয়া তেমনি দোর গোড়ায় বধূ পড়িয়া গেল। সমস্ত পিঠ ঢাকিয়া পা অবধি তাহাব নিবিড় তিমিরাবৃত চুলের রাশি এলাইয়া পড়িতেছে—বেণুধর দেখিতে লাগিল।

ক্রমে ফর্সা হইয়া আসে। আম বাগানের ডালে ডালে সদ্য ঘুম ভাঙা পাখির কলবর...ও ঘর হইতে কে কাশিয়া কাশিয়া উঠিতেছে...। দিনের আলোর সঙ্গে মানুষের গতিবিধি স্পষ্ট ও প্রখর হইতে লাগিল। বেণুধর উঠিয়া পড়িল।

সকালেব দিকে সুবিধা মত একটা ট্রেন আছে। অথচ নীলমাধব নিশ্চিন্তে পরম গম্ভীরভাবে গড়গড়া টানিতেছিলেন।

বেণু গিয়া কহিল, সাতটা বাজে—

বিনাবাক্যে নীলমাধব দু'টা টাকা বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন, চা-টা তোমরা দোকান থেকে খেয়ে নাও—

বাড়ি যাওয়া হবে না ?

না—। বলিয়া তিনি গড়গড়ার নল রাখিয়া কি কাজে বাহিরে যাইবার উদ্যোগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বেণুধব ব্যাকুল কণ্ঠে পিছন হইতে প্রশ্ন করিল, কবে যাওয়া হবে ? এখানে কতদিন থাকতে হবে আমাদেব ?

মুখ ফিরাইয়া নীলমাধব ছেলের মুখের দিকে চাহিলেন। সে মুখে কি ছিল, তিনিই জানেন—ক্ষণকাল মুখ দিয়া তাঁহার কথা সরিল না। শেষে আস্তে আস্তে বলিলেন, শীতল ঘটক ফিবে না এলে সে তো বলা যাচ্ছে না।

অনতি পরেই বৃত্তান্ত জানিতে বাকি রহিল না। শীতল ঘটক গিয়াছে তাহিরপুরে। গ্রামটা নদীব আব পারে ক্রোশ খানেকের মধ্যেই। ওখানে কিছুদিন একটা কথাবার্তা চলিয়াছিল। খুব বনিয়াদী গৃহস্থ ঘবেব মেয়ে ; কিন্তু ইদানীং কৌলিন্যটুকু ছাড়া সে পক্ষের বিশেষ কিছু সম্বল নাই। অতএব নীলমাধব নিজেই পিছাইয়া আসিয়াছিলেন।

বিজয়কে আড়ালে ডাকিয়া সকল আক্রোশ বেণু তাহারই উপর মিটাইল। কহিল, কশাই তোমবা সব :

অথচ সে একেবারেই নিবপরাধ। কিন্তু সে-তর্ক না করিয়া বিজয় সান্ত্বনা দিয়া কহিল, ভয় নেই ভাই, ও কিছু হবে না। ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে, সে কি হয় কখনো ? কাকার যেমন কাণ্ড—

একটু পরেই দেখা গেল, ঘটক হাসিমুখে হনহন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। সামনে পাইয়া সুসংবাদটা তাহাদিগকেই সর্বাগ্রে দিল, পাকাপাকি করে এলাম ছোটবাবু—

তবু বিজয় বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল, পাকাপাকি করে এলে কি রকম ? এই ঘন্টা দুই তিন আগে বেরুলে—কোন খবরাখবর দেওয়া নেই। এর মধ্যে ঠিক হয়ে গেল ?

শীতল সগর্বে নিজের অস্থিসার বুকের উপর একটি থাবা মারিয়া কহিল, এর নাম শীতল ঘটক, বুঝলেন বিজয়বাবু, চল্লিশ বছরের পেশা এই আমার। কিছুতেই রাজী হয় না—হেনো তেনো কত কি আপত্তি। ফুসমন্ত্রে সমস্ত জল কবে দিয়ে এলাম।—বলিয়া শূন্যে মুখ তুলিয়া ফুৎকাব দিয়া মন্ত্রটাব স্বরূপ বুঝাইয়া দিল।

বেণুধব কহিল, আমি বিয়ে করব না।

শীতল অবাক হইয়া গেল। সে কেবল অপর দিকের কথাটাই ভাবিয়া রাখিয়াছিল। একবাব ভাবিল, বেণুধর পরিহাস করিতেছে। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া এদিক ওদিক বার দুই ঘাড় নাড়িয়া সন্দিগ্ধ সুরে বলিতে লাগিল, তাই কখনো হয় ছোটবাবু, লক্ষ্মী ঠাকরুণের মত মেয়ে..ছবি নিয়ে এসেছি, মিলিয়ে দেখুন—কালকের ও মেয়ে এর দাসী বাঁদির যুগ্যি ছিল না।

বেণুধর কঠোর সুরে বলিয়া উঠিল, কিন্তু আমি যা বলার বলে দিয়েছি শীতল, তুমি বাবাকে আমাব

হয়ে বলো—

বলিয়া আর উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

ক্ষণপরে তাহার ডাক পড়িল।

নীলমাধব বলিলেন, শুনলাম, বিয়েতে তুমি অনিচ্ছুক ?

বেণু মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নীলমাধব বলিতে লাগিলেন, তাহলে আমায় আত্মহত্যা করতে বল ?

কোন প্রকারে মরিয়া হইয়া বেণুধর বলিয়া উঠিল, কালকের সর্বনেশে কাণ্ডে আমার মন কিরকম হয়ে গেছে বাবা, আমি পাগল হয়ে যাব। আর কিছু দিন সময় দিন আমায়—। বলিতে বলিতে তাহার স্বর কাঁপিতে লাগিল। একমুহূর্ত সামলাইয়া লইয়া বলিল, মরা মানুষ আমার পিছু নিয়েছে—

ভ্রূ বাঁকাইয়া নীলমাধব ছেলের দিকে চাহিলেন। একটুখানি নরম হইয়া বলিতে লাগিলেন, আর এদিকের সর্বনাশটা ভাব একবার। বাড়িশুদ্ধ কুটুম্ব গিসগিস করছে, সতের গ্রাম নেমন্তন্ন। বউ দেখবে বলে সব হাঁ করে বসে আছে। যেমন তেমন ব্যাপার নয়, এত বড় জেদাজেদীর বিয়ে —আর চৌধুরীদের সেজকর্তা আসবেন—

অপমানের ছবিগুলি চকিতে নীলমাধবের মনের মধ্যে খেলিয়া গেল। চৌধুরীদের সেজকর্তা অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি, তিলার্ধ দেরি না করিয়া জপের মালা হাতে লইয়াই খড়ম খটখট করিতে করিতে সমবেদনা জানাইতে আসিবেন— আসিয়া নিতান্ত নিরীহ মুখে উচ্চ কণ্ঠে এক হাট লোকের মধ্যে বৃদ্ধ অতি গোপনে জিজ্ঞাসা করিবেন, বলি ও নীলমাধব, আসল কথাটা বল দিকি, বিয়ে এবারও ভাঙল —মেয়ে কি তারা অন্য জায়গায় বিয়ে দেবে ?....

ভাবিতে ভাবিতে নীলমাধব ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, না বেণুধর, বউ না নিয়ে বাড়ি ফেরা হবে না। পরশুর আগে দিন নেই। তুমি সময় চাচ্ছিলে—বেশ তো, মাঝে এই দুটো দিন থাকল। এর মধ্যে নিশ্চয় মন ভাল হয়ে যাবে।...

বারোয়ারির মাঠে যাত্রা বসিয়াছে। বিকাল হইতে গাওনা শুরু। বেণুধর সমবয়সী জন দুই তিনকে পাকড়াইয়া বলিল, চল, যাই।

বিজয় বলিল, আমার যাওয়া হবে না তো। বিস্তর জিনিষপত্তর বাঁধাছাঁদা করতে হবে। রাত্রে ফিরে যাচ্ছি।

কেন ?

গ্রামে গিয়ে খবর দিতে হবে বউভাতের তারিখ দুটোদিন পিছিয়ে গেল। কাকা বললেন, তুমি যাও বিজয়।

গাড়ি সেই কোন-রাতে—আমরা থাকব বড়জোর এক ঘন্টা কি দেড় ঘন্টা—চল, চল—। বেণুধর ছাড়িল না। সকলকে ধরিয়া লইয়া গেল।

পথের মধ্যে বিজয়কে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, বিয়ে পরশু দিন ঠিক হল ?

হ্যাঁ-

পরশু রাত্রে ?

তাছাড়া কি—

চুপ করিয়া খানিক কি ভাবিয়া বেণুধর করুণ ভাবে হাসিয়া উঠিল। বলিল, রাত্রি আসছে, আর আমার ভয় হচ্ছে। তুমি বিশ্বাস করবে না বিজয়, অপঘাতে মরা মেয়েটা কাল সমস্ত রাত আমায় জ্বালাতন করেছে—

আবার একটু স্তব্ধ থাকিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল, মরা ব্যাপারটা আর আমি বিশ্বাস করছিনে—এত সাধ আহ্লাদ ভালবাসা পলক ফেলতে না ফেলতে উড়িয়ে পুরিয়ে চলে যাবে—সে কি হতে পারে ? মিছে কথা। এ আমার অনুমানের কথা নয় বিজয়, কাল থেকে স্পষ্ট করে জেনেছি।

বিজয় ব্যাকুল হইয়া বলিল, তুমি এসব কথা আর বলো না ভাই, আমাদেরও শুনলে ভয় করে।

ভয় করে ? তবে বলব না।—বলিয়া বেণু টিপি টিপি হাসিতে লাগিল। বলিল, কিন্তু যাই বল,

এই শহরে পড়ে থাকা আমাদের উচিত হয়নি—দূরে পালানো উচিত ছিল। এই আধক্রোশের মধ্যেই কাণ্ডটা ঘটল।

যাত্রা দেখিয়া বেণু অতিরিক্ত রকম খুশি হইল। ফিরিবার পথে কথায় কথায় এমন হাসি রহস্য—যেন সে মাটি দিয়া পথ চলিতেছে না। তখন সন্ধ্যা গড়াইয়া গিয়াছে। পথের উপর অজস্র কামিনী ফুল ফুটিয়াছে। ডালপালাসুদ্ধ তাহার অনেক ডাল ভাঙিয়া লইল। বলিল, খাসা গন্ধ! বিছানায় ছড়িয়ে দেব।

একজন ঠাট্টা করিয়া বলিল, ফুলশয্যার দেরি আছে হে—

কোথায়?—বলিয়া বেণু প্রচুর হাসিতে লাগিল। বলিল, এ পক্ষের দিন রয়েছে তো কাল। আর তাহিরপুরেরটার—ও বিজয়, তোমাদের নতুন সম্বন্ধের ফুলশয্যার দিন করেছে কবে?

বিজয় রীতিমত রাগিয়া উঠিল, ফের ওই কথা? এ পক্ষ—ও পক্ষ—বিয়ে তোমার কটা হয়েছে শুনি?

আপাতত একটা; কাল যেটা হয়ে গেল—আর একটার আশায় আছি। বিজয়ের কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকি দিয়া বেণু বলিতে লাগিল, ও বিজয়, ভয় পেলে নাকি? ভয় নেই, আজ সে আসবে না। আজকে কালরাত্রি—বউয়ের দেখা করবার নিয়ম নেই।

খাওয়া দাওয়ার পর বেশ প্রফুল্ল ভাবে বেণুধর শুইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুম আসে না। আলো নিভাইয়া দিল; কিছুতে ঘুম আসে না। পাশে কোন বাড়িতে ঘন্টার পর ঘন্টা ঘড়ি বাজিয়া যাইতেছে। চারিদিক নিশুতি। অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুমের সাধনা করিয়া কাহার উপর বড় রাগ হইতে লাগিল। রাগ করিয়া গায়ের কম্বল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কাহাকে শুনাইয়া জোরে জোরে পায়চারি করিতে লাগিল। খণ্ড চাঁদ ক্রমশ আম বাগানের মাথায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।... আবার সে ঘরে ঢুকিল! বিছানার পাশে গিয়া মনে হইল, ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কে যেন কোথায় পালাইয়া গেল। বাতাসে বাগিচার গাছপালা খসখস করিতেছে। বেণুধর ভাবিতে লাগিল, নতুন কোরা কাপড় পরিয়া খসখস করিতে করিতে এক অদৃশ্যচারিণী বনপথে বাতাসে বাতাসে দ্রুতবেগে মিলাইয়া গেল।

পরদিন তাহিরপুরের পাত্রীপক্ষ আশীর্বাদ করিতে আসিলেন। হাসিমুখেই আংটি সে হাত পাতিয়া লইল। মনে মনে বাপের বহুদর্শিতার কথা ভাবিল। নীলমাধব সত্যই বলিয়াছিলেন, এই দুটোদিন সময়ের মধ্যেই তাহার মন আশ্চর্যরকম ভাল হইয়া উঠিয়াছে। চুরি করিয়া এক ফাঁকে বাপের ঘর হইতে পাত্রীর ছবিটা দেখিয়া আসিল। মেয়ে সুন্দরী বটে। প্রতিমার মত নিখুঁত নিটোল গড়ন।

সেদিন একখানা বই পড়িতে পড়িতে অনেক রাত হইয়া গেল। শিয়রে তেপায়ার উপর ভাবী বধূর ছবিখানি। ম্লান দীপালোকিত চুনকাম-খসা উঁচু দেয়াল, গম্বুজের মত খিলান করা সেকেলে ছাত, তাহারই মধ্যে মিলনোৎকণ্ঠিত নায়ক-নায়িকার সুখ-দুঃখের সহগামী হইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে বই পড়িতে লাগিল...একবার কি রকমে মুখ ফিরাইয়া বেণুধর স্তম্ভিত হইয়া গেল, স্পষ্ট দেখিতে পাইল, একেবারে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ—তাহার মধ্যে দিয়া হাত গলাইয়া চাঁপার কলির মত পাঁচটি আঙুল লীলায়িত ভঙ্গিতে হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। ভাল করিয়া তাকাইতেই বাহিরের নিকষ কালো অন্ধকারে হাত ডুবিয়া গেল। সে উঠিয়া জানালায় আসিল। আর কিছুই নাই, নৈশ বাতাসে লতাপাতা দুলিতেছে। সজোরে সে জানালার খিল আঁটিয়া দিল।

আলোর জোর বাড়াইয়া দিয়া বেণুধর পাশ ফিরিয়া শুইল। চটা-ওঠা দেয়ালের ওপর কালের দেবতা কত কি নক্সা আঁকিয়া গিয়াছে। উল্টা-করা তালের গাছ....একটা মুখের আধখানা....ঝুঁটিওয়ালা অদ্ভুত আকারের জানোয়ার আর একটা কিসের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া আছে...ঝুল কালি ও মাকড়সা জালের বন্দীশালায় কালো কালো শিকের আড়ালে কত লোক আটক হইয়া রহিয়াছে....

চোখ বুজিয়া দেখিতে লাগিল—

অনেক দূরে মাঠের ওপারে কালো কাপড় মুড়ি দেওয়া সারি সারি মানুষ চলিয়াছে—পিঁপড়ার মত মানুষের অনন্ত শ্রেণী। লোকালয়ের সীমানায় আসিয়া কে-একজন হাত উঁচু করিয়া কি বলিল। মুহূর্তকাল সব স্থির। আবার কি সংকেত হইল। অমনি দল ভাঙিয়া নানাজনে নানাদিকে পথ-বিপথ ঝোপ জঙ্গল আনাচ কানাচ না মানিয়া ছুটিতে ছুটিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এই রাত্রে আঙিনার ধূলায় কোথায় এক পরম দুঃখিনী এলাইয়া এলাইয়া পড়িয়া থাকিয়া থাকিয়া

দাপাদাপি করিতেছে—

ওমা—মাগো আমার—ও আমার লক্ষ্মীমানিক রাজরানী মা—

অন্ধকারের আবছায়ে ছোট ছোট ঘুলঘুলির পাশে তন্বী কিশোরীটি নিশ্বাস বন্ধ করিয়া আড়ি পাতিয়া বসিয়া আছে। শিয়রে নূতন বধূ চুপটি করিয়া বাসর জাগে। বর বুঝি ঘুমাইল।...

বেণুধর উঠিয়া বসিয়া পরম স্নেহে স্মিতমুখে শিয়রে তেপায়ার উপরের ছবিখানির দিকে তাকাইল। কাল সারা রাত্রি তাহারা জাগিয়া কাটাইবে।

রুদ্ধ জানালায় সহসা মৃদু মৃদু করাঘাত শুনিয়া বেণুধর চমকিয়া উঠিল। শুনিতে পাইল, ভয়ার্ত চাপা গলায় ডাকিয়া ডাকিয়া কে যেন কি বলিতেছে। একটি অসহায় প্রীতিমতী বালিকা বাপ-মা ও চেনা জানা সকল আত্মীয় পরিজন ছাড়িয়া আসিয়া ওই জানালার বাহিরে পাগল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আজ বেণুধর তিলার্ধ দেরি করিল না ; দুয়ার খুলিয়া দেখে, ইতিমধ্যে বাতাস বাড়িয়া ঝড় বহিতে শুরু হইয়াছে। সন সন করিয়া ঝড় দালানের গায়ে পাক খাইয়া যাইতেছে।

এসো—

উঁহু—

এসো—

না।

বাতাসে দড়াম করিয়া দরজা বন্ধ হইয়া গেল। বেণুধর নির্নিরীক্ষে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য পলায়নপরার পিছনে পিছনে ছুটিল। ঝোড়ো হাওয়ায় কথা না ফুটিতে কথা উড়াইয়া লইয়া যায় ; তবু সে যুক্ত করে বারম্বার এক অভিমানিনীর উদ্দেশে কহিতে লাগিল, মিছে কথা, আমি বিয়ে করব না ; আমি যাব না কাল। তুমি এসো—ফিরে এসো—

নিশীথ রাত্রি। মেঘভরা আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। ভৈরবের বুকেও যেন প্রলয়ের জোয়ার লাগিয়াছে। ডাক ছাড়িয়া কূল ছাপাইয়া জল ছুটিয়াছে। বেণুধর নদীর কূলে কূলে ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিল। মৃত্যু ও জীবনের সীমারেখা এই পরম মুহূর্তে প্রলয় তরঙ্গে লেপিয়া মুছিয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে এই ক্ষণ প্রতিদিন আসিয়া থাকে। দিনের অবসানে সন্ধ্যা—তারপর রাত্রি—। পলে পলে রাত্রির বক্ষস্পন্দন বাড়ে—তারপর অনেক—অনেকক্ষণ পরে মধ্য আকাশ হইতে একটি নক্ষত্র বিদ্যুৎগতিতে খসিয়া পড়ে, ঝনঝন করিয়া মৃত্যুপুরীর সিংহদ্বার খুলিয়া যায়, পৃথিবীর মানুষের শিয়রে ওপারের লোক দলে দলে আসিয়া বসে, ভালবাসে, আদর করে, স্বপ্নের মধ্য দিয়া কত কথা কহিয়া যায়—

আজ স্বপ্নলোকের মধ্যে নয়, জাগ্রত দুই চক্ষু দিয়া মৃত্যুলোক-বাসিনীকে সে দেখিতে পাইয়াছে। দুটি হাত নিবিড় করিয়া ধরিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিবে। দিগন্তব্যাপী মেঘবরণ চুলের উপর ডগমগে লাল কয়েকটি রক্তবিন্দু প্রায়ান্ধকারের মধ্যে আলেয়ার মত বেণুধরকে দূর হইতে দূরে ছুটাইয়া লইয়া চলিল।

বদনবাবুর বাড়ি

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

মদনপুরের বদনবাবু নিজের শক্তিতে তিসির ব্যবসা করে লক্ষাধিক টাকা রোজগার করেন। কুঁড়ে ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় তিনি জন্মেছিলেন। সেই লোক কী করে অত বড় বাড়ি, অত বিষয় সম্পত্তি করেছিলেন সে এক আশ্চর্যের ব্যাপার। বিশেষ করে তাঁর তিসির গোলাবাড়ি দেখলে তাক লেগে যায়। একটা প্রকাণ্ড বড় খামারে সার সার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলা। এক-একটা গোলায় আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার টাকার তিসি। এমন গোলা পঞ্চাশটা।

ছেলেবেলায় বদনবাবু লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি। কোন রকমে ভাঙা ভাঙা মোটা মোটা অক্ষরে হিসেবের খাতা লিখতে পারতেন। তাও বড় একটা লিখতে হত না। এজন্যে একজন মুহুরি ছিল। বদনবাবু লোহার সিন্দুকের পাশে একটা ফরাশের উপরে বসে খবরদারি করতেন। এককালে নিজে মাথায় করে তিসি বয়ে এনেছেন। এখন আর তা করতে হয় না। খালি একটা বেনিয়ান গায়ে দিয়ে আর একখানা মোটা ক্যাটকেঁটে আট হাত ধুতি পরে সব দেখাশুনো করেন। তাঁর একমাত্র ছেলে মহেন্দ্র বড় হয়েছে। সে-ই সব করে।

কিন্তু মহেন্দ্রের উপর বদনবাবুর মনে মনে আস্থা নেই। তার চোখে সোনার চশমা। মাথায় টেরি। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি। হাতে সোনার রিস্টওয়াচ। পরনে সদ্য-ধোয়া দেশী ধুতি। গায়ে কোথায় তিসির ধুলো লাগবে এই ভয়েই সর্বদা সশঙ্কিত। আগে যেখানে দোকানে পনের জন লোক খাটত, সেখানে সে আরও দশজন বাড়িয়েছে। কাজেই শুধু বসে বসে হুকুম করলেই তার কাজ শেষ হয়। বদনবাবু ছেলের এই বাবুগিরি মনে মনে অপছন্দ করেন। কিন্তু পুত্রস্নেহে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। কেবল এতদিনের এত কষ্টের গড়া ব্যবসা দু-দিনে নষ্ট হয়ে যাবে এই ভয়ে যতদিন পারেন প্রত্যহ একবার ঠুক-ঠুক করে আড়তে গিয়ে বসেন।

কিন্তু তাও বেশি দিন পারলেন না। একদিনের ওলাওঠা জ্বরে বদনবাবুর স্ত্রী মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বদনবাবু কেমন যেন হয়ে গেলেন। কান্নাকাটি করলেন না, হৈ হৈ করলেন না, কেবল কথা

বন্ধ করে চুপ করে বসে রইলেন। তার পরে শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে গেলে হাজার খানেক টাকা নিয়ে চলে গেলেন কাশী। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ালেন কিছুকাল। তারপর আবার কাশীতে বসলেন। সেখানে একটা বাড়ি কিনে স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন। দেশে ফিরলেন প্রায় পাঁচ বৎসর পরে।

তখন আর সে বদনবাবু নন।

মাথায় বড় বড় চুল। সাদা সাদা দাড়ি নাভি পর্যন্ত ঝুলছে, পরনে রক্তাম্বর, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক। মুখে সর্বদা কালী কালী শব্দ। বৈষ্ণব বদনবাবু শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন। সেই বিনীত, শান্ত প্রকৃতি আর নেই, কারণ-বারি পানে চোখ সর্বদা রক্তবর্ণ। কণ্ঠস্বরে একটা ভীষণতা এসেছে। এখন লোকে তাঁর কাছে যেতেই ভয় করে। বদনবাবু তেতলার ঘরে নিরিবিলি থাকেন, আর ধ্যানধারণা করেন। পুত্র-বধূ নাতি-নাতনী কারও সঙ্গে বড়-একটা কথা বলেন না।

এমনি করে দিন পনের কাটানোর পর একদিন মহেন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন। এ কদিন তার সঙ্গে একটা কথাও হয়নি। মহেন্দ্রও বাবার রক্তচক্ষু আর রুক্ষ মেজাজ দেখে কাছে আসতে সাহস করেনি। ভয়ে ভয়ে এসে প্রণাম করে মেঝেতে এক পাশে চুপ করে বসল। একটা বাঘের চামড়ার উপর আসন করে বদনবাবু বসে ছিলেন। মহেন্দ্রকে দেখে একটু নড়ে বসতেই রুদ্রাক্ষের মালা খট খট শব্দ করে উঠল।

একটুক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে পুত্রের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বদনবাবু বললেন, 'পরশু গুরুদেব আসবেন।'

মহেন্দ্র ভয়ে-ভয়ে শুধ বললে, 'ও।'

'পাশের ঘরে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দাও।'

'যে আজ্ঞে।'

'আর পরশু সন্ধেয় দশ হাজার টাকা চাই।'

'বেশ!'

'পুজোর দালান কি মেরামত করতে হবে?'

এবারে মহেন্দ্র জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বাবার দিকে চাইলে। অস্ফুট কণ্ঠে বললে, 'না।'

'মালাকারকে বলে দাও আগামী অমাবস্যায় ছিন্নমস্তার পুজো হবে। প্রতিমা গড়ে দিতে হবে।'

শুনে মহেন্দ্র মুখ হাঁ করে চেয়ে রইল। ছিন্নমস্তার পুজো! সে ভীষণ, তান্ত্রিক পুজো, গৃহস্থ কখনও সে পুজো করতে সাহস করে না, তাতে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়।

মহেন্দ্র অস্পষ্ট স্বরে শুধু একবার বললে, 'ছিন্নমস্তার!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ছিন্নমস্তার। তুমি এখন যাও; ভয় নেই, গুরুদেব নিজে আসবেন। পুজোও তিনি করবেন।'

বলে, বোধ হয় সাধনার জন্যে চোখ বন্ধ করলেন।

মহেন্দ্র আর কিছু বলতে সাহস না করে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল।

গুরুদেব নিজে অবশ্য এসেছিলেন। পুজোও তিনিই করেছিলেন। অমাবস্যার অন্ধকার নিশুতি রাত্রে সে এক ভীষণ ব্যাপার। কিন্তু 'ভয় নেই' এ ভরসা বেশিদিন রইল না। গুরুদেব আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিলেন, পুজো নির্বিঘ্নে সমাধা হয়েছে। মা হাসিমুখে পুজো গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি বিদায় নেবার দিন-পনের পরে মহেন্দ্রর বড় ছেলেটি বসন্তে আক্রান্ত হল এবং তিনদিন অশেষ কষ্টভোগের পর মারা গেল। তারপরে একসঙ্গে তার স্ত্রী আর মেজ ছেলে পড়ল। বহু চেষ্টা করেও তাদের বাঁচানো গেল না। তারপর মহেন্দ্র নিজে আর তার শেষ সন্তান কোলের মেয়েটি ওই একই রোগে মারা গেল।

বদনবাবু নিঃশব্দে ধীরভাব তাঁর বংশের শেষ প্রদীপটিও নিবে যেতে দেখলেন। নিজে সকলের পিছু-পিছু শ্মশানে গেলেন, শ্মশান থেকে ফিরে এলেন। লোকে তাঁর মুখ দেখে ভাবলে, মানুষ এমন পাথরও হয়!

বাড়ির চাকর বাকর সব ইতিপূর্বেই বেগতিক দেখে পালিয়েছিল। কেবল একটি বুড়ো চাকর তখনও পর্যন্ত মমতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি, সে-ই ছিল। বদনবাবু বাড়িতে আলো জ্বালতে দিলেন

না। চাকরটাকে তাঁর ঘরে ডাকলেন। অন্ধকারে তার হাতে কি কতকগুলো কাগজ দিয়ে বললেন, 'তোমাকে যা দিলাম, তাতে দু-পুরুষ বসে খেতে পারবে, এবারে তোমার ছুটি।'

বুড়ো চাকর হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললে। কিন্তু বদনবাবু গম্ভীর কণ্ঠে তাকে এমন ধমক দিলেন যে সে পালাতে পথ পেল না। যাবার সময়ে সে বদনবাবুর লোহার সিন্দুক বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেল।

সে ভাবল, বাবুর মন খারাপ। হয়তো আবার কাশী কিংবা অন্য কোন তীর্থে চলে যাবেন। তাই তাকে বিদায় দিলেন। হয়তো সেই রাত্রেই যাবেন, কিংবা পরের দিন সকালে।

এই ভেবে পরের দিন সকালে বড়বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে গেল। গিয়ে দেখে সদর দরজা বাইরে যেমন করে ভেজিয়ে রেখে এসেছিল তেমনি আছে। কেবল বোধহয় ঝড়ে আর-একটু ফাঁক হয়ে গেছে। তার ভরসা হল বদনবাবু এখনও তাহলে যাননি। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে দেখে অন্দরের দরজাও ভেজানো। বুড়ো সটান তেতলার ঘরে গিয়ে উঠল। আস্তে করে দরজায় একটু ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল। ভিতরে যেয়ে তার বুকের স্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম।

বদনবাবু কড়িকাঠে ঝুলছেন!

তাঁর চোখ কপালে উঠেছে, জিভ বেরিয়ে এসেছে! তিনি রাত্রেই আত্মহত্যা করেছেন!

বুড়োর চিৎকারে পাড়ার লোক জড়ো হল। পাশেই থানা, পুলিশও এল। তারা লাশ নামিয়ে নিয়ে থানায় চলে গেল। এবং বাড়ির মালিক কে, স্থির না হওয়ায় বাড়ির প্রত্যেকটি ঘর এবং আড়ত তালাবন্ধ করে সীলমোহর করে গেল। পাড়ার লোকে বলাবলি করতে লাগল, 'এ ছিন্নমস্তার পুজোর ফল। মায়েব পুজোয় নিশ্চয়ই কোন বিঘ্ন ঘটেছে। বাবাঃ, ছিন্নমস্তার পুজো চারটিখানি কথা নয়! একটুখানি ত্রুটি ঘটেছে কি বংশলোপ! আমরা তখনই বলেছিলাম!'

বাড়ি ওইরকমই রইল। বদনবাবুর উত্তরাধিকারীত্ব নিয়ে লম্বা মামলা বেধে গেল। সে মামলা একবার নিচের কোর্ট থেকে জজ কোর্ট, সেখান থেকে হাইকোর্টে যায়, আবার সেখান থেকে নিচের কোর্টে ফিরে আসে। তাঁতের মাকুর মত এমনিধারা সে ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

ইত্যবসরে একটা কাণ্ড হল।

বাড়িটার উপর পাড়ার গুটিকয়েক বিখ্যাত চোরের চোখ পড়ল। বদনবাবুর ধনশালীতা কারও অবিদিত নেই। তাঁর টাকার প্রত্যেকটি পয়সা লোহার সিন্দুকে থাকত। মফস্বলে ব্যাঙ্কে টাকা রাখার প্রথা নেই। তারই থেকে হাজার-দুয়েক টাকা বুড়ো চাকরটা পেয়ে গেছে। বাকিটা ওরা পেলে আর ভবিষ্যতের ভাবনা কয়েক পুরুষের মধ্যেও ভাবতে হবে না।

এই না ভেবে একদিন রাত্রে ছ-জন চোর বদনবাবুর বাড়ি হানা দিলে। দু-জন রইল বাইরে ঘাঁটি আগলে, আর চারজন পাঁচিল টপকে ভিতরে গেল। ভয় তো কিছুই নেই। ভিতরে জনমানবের চিহ্ন নেই। যে ঘরে লোহার সিন্দুক সে ঘর চোরদের বিশেষ জানা। কিন্তু সে ঘরে ঢোকা যায় কী করে? পুলিশ এসে সব ঘর তালা-বন্ধ করে সীলমোহর করে দিয়ে গেছে। কী উপায় করা যায় এই ভেবে একজন অন্ধকারে দরজায় হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ, কী আশ্চর্য, দরজা গেল খুলে। ঢোক, ঢোক, দুজন তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। আর দুজন ছুটল পাশের ঘরে। যে ঘরে মহেন্দ্র থাকত। সেই ঘরে আছে মহেন্দ্রের স্ত্রীর রাশি-রাশি গহনা। সে ঘরেও ঠিক তাই হল। হাত দেওয়া-মাত্র দ্বার খুলে গেল। দুজন ঢুকল তার মধ্যে। ঘরের মধ্যে ঢুকে ওরা মোমবাতি জ্বালল, পাছে কেউ দেখতে পায় বলে এতক্ষণে আলো জ্বালতে সাহস হল। বন্ধ ঘরে কোন ভয়ই নেই।

লোহার সিন্দুকে হাত দিতে সিন্দুক খুলে গেল। ও ঘরেও তাই। এ ঘরে লোহার সিন্দুকে টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি, আনি, পয়সা, আধলা থরে থরে সাজানো। একদিকে থাকে-থাকে নোট। ও ঘরে রাশি-রাশি সোনার আর জড়োয়ার গহনা যেন অনেকদিন পরে বাতির আলো দেখে হেসে উঠল। চোরেদের সে দৃশ্য দেখে আর চোখের পলক পড়ে না। তারা দু-হাতে যা ওঠে তোলে, আর আঁচল বোঝাই করে। ভারে আঁচল ছিঁড়ে পড়ে আর কি! অনেকক্ষণ পরে তারা কাজ সেরে যখন বার হতে যাবে, দেখে দরজা বন্ধ।

দরজা বন্ধ ! আশ্চর্য !

ওরা এদিকে টানে, ওদিকে টানে, প্রাণপণে টানে, কিছুতেই কিছু না। দরজা কিছুতেই খোলে না।

এদিকে বাইরে যারা ঘাঁটি আগলে আছে তারা অপেক্ষা করছে তো করছেই। সঙ্গীরা আর কিছুতেই ফেরে না। একটা বাজে, দুটো বাজে, তিনটে বাজে...পাখিরা এক আধটা ঘুম ভেঙে হঠাৎ ডেকে ওঠে...শেয়াল শেষ প্রহরের ডাক ডেকে গেল...কিন্তু সঙ্গীরা আর ফেরে না। অথচ ধীরে ধীরে পুর্বদিকে আলো জাগছে, আর অপেক্ষা করাও চলে না। ওদের কেমন ভয় হল, সঙ্গীর মমতার চেয়ে প্রাণের মমতা বেশি। ওরা আরও একটু অপেক্ষা করে অবশেষে চুপিচুপি সরে পড়ল। ওদের বরাতে যা হবার তাই হোক।

কিন্তু সঙ্গীরা আর ফিরলই না।

চোরের পরিজনের ফুক্‌রে কাঁদার শক্তি নেই। দিনকয়েক তারা চেপে রইল। রোজ ভাবে আজ ফিবরে, আজ ফিরবে। অবশেষে ব্যাপারটা আর বেশিদিন গোপন রইল না। পাঁচ কান হতে হতে পুলিশের কানে পৌঁছল। পুলিশ এসে পাঁচিল টপ্‌কে বাড়ির ভিতর গিয়ে দেখে যেমন তালা, সীলমোহর তেমনি আছে। বাইরের চোর ঘরে ঢুকবে কী করে ! তারা বিশ্বাসই করল না। তবে, পুলিশ সাহেবকে এই গুজবের কথাটা জানাল।

পুলিশ সাহেব দিনকয়েক পরে চাবি নিয়ে সদলবলে এসে উপস্থিত হলেন। বিশ্বাস তাঁরও হল না। তবু তালা খুলে দেখেন, ঠিক, এ-ঘরে দুটো, ও-ঘরে দুটো কঙ্কাল পড়ে রয়েছে বটে। তিনি তো অবাক ! কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয় ! ব্যাপারটা হয়তো ভৌতিক।

ভৌতিক ব্যাপারে পুলিশ সাহেবের আগ্রহ অপরিসীম। তিনি স্থির করলেন, কয়েকটা রাত্রি এখানে কাটিয়ে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত দেখে যেতে হচ্ছে। সন্ধের পরে বাড়ির বাইরে, ভিতরে, প্রত্যেক গলিতে গলিতে সশস্ত্র পাহারা রাখলেন। আর নিজে দুটো গুলি-ভরা রিভলভার নিয়ে বসে রইলেন—লোহার সিন্দুকের ঘরে। সঙ্গে রইল বাঘা-বাঘা দুটো বিলিতি কুকুর।

বারোটা বাজল।

কোথাও জনমানবের সাড়া শব্দ নেই। বাইরে ফুটফুট করছে চাঁদের আলো। গাছের নিচে ঝোপে অন্ধকার জমে জমে আছে। কোথাও পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ে যেন মাটিতে আলপনা কাটছে। হাওয়ায় পাতা নড়ছে শিরশির করে। চাঁদনি রাত্রি, তবু বাইরেটা থমথম করছে। ভিতরে একটা দেওয়ালগিরি জ্বলছে।

সাড়ে বারোটা...একটা...

হঠাৎ হু-হু একটি দমকা হাওয়া এসে দপ করে দেওয়ালগিরি নিবিয়ে দিলে। সে তো হাওয়া নয়, কে যেন হা-হা করে সেই আধো-অন্ধকারে হেসে উঠল।

সাহেব দুটো রিভলভার দু-হাতে ধরে সতর্ক হয়ে বসে রইলেন।

আলো জ্বালার প্রয়োজন হল না। খোলা জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে ঘর আলো করে দিলে। তখনও মৃদু মৃদু বাতাস বইছে, যেন বাইরে কার কাপড়ের খসখসানি, আর কিছু নয়। আরও আধ ঘণ্টা এমনি কাটল।

হঠাৎ ঘরের যে প্রান্তে সাহেব রিভলভার নিয়ে বসে ছিলেন, তার অপর প্রান্তে বারান্দার দিকের জানলাটা খরখর করে নড়ে উঠল। দুটো কুকুরই ঘেউ-ঘেউ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটি শুভ্রবসনাবৃত মূর্তি ওই জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। সাহেব গুলি ছুঁড়লেন, কুকুর দুটো তেড়ে গেল। মূর্তি অন্য জানলার ফাঁক দিয়ে নির্বিঘ্নে বেরিয়ে গেল, একটা কুকুরও সঙ্গে সঙ্গে তার পিছু পিছু জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। অথচ গরাদের ফাঁক তিন আঙুলের বেশি নয়। তার মধ্যে অত বড় একটা কুকুর যে কী করে অনায়াসে গলে যেতে পারে তা মানুষের কল্পনার অতীত।

সাহেবের কপালে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। কণ্ঠ শুষ্ক। সাহেব বোতল থেকে মদ ঢেলে এক নিশ্বাসে ঢকঢক করে সবটা খেয়ে ফেললেন। আর তাঁর সঙ্গের কুকুরটির আর্তনাদে ঘর যেন ফেটে যাবার উপক্রম। অথচ আশ্চর্য এই যে, এত কাণ্ডেও বাইরের সশস্ত্র সিপাইদের কেউ

এসে জুটল না। তাদের যেন এ শব্দ কানে পৌঁছয়নি।

সাহেব এবার স্থির হয়ে বসলেন। এবার যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়। দেওয়ালগিরিটাও জ্বাললেন। সিপাইদের কাকেও ইচ্ছা করেই ডাকলেন না। পাছে তারা ভাবে সাহেব ভয় পেয়েছেন।

কিন্তু আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আধঘন্টার উপর কেটে গেল। শিকারী যেমন শিকারের জন্য ছটফট করে, সাহেবও তেমনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। অবশেষে হতাশ হয়ে রিভলভার নামিয়ে বোতল বের করে আর একটু মদ ঢেলে খেতে যাবেন, এমন সময়ে জানলাটা আবার খরখর করে উঠল।

সাহেব তাড়াতাড়ি বোতল নামিয়ে রিভলবার তুলে নিলেন। কে যেন হুড়মুড় করে আলোর উপর পড়ে আলো নিবিয়ে দিলে। কুকুরটা চিৎকার করে যেন কাকে ধরতে জানলার দিকে ছুটে গেল। সাহেব উপরি-উপরি গুলি ছুঁড়লেন। ফল কী যে হল কিছু বোঝা গেল না। কেবল দূর থেকে যেন সাহেবের প্রিয় কুকুরটির ক্ষীণ আর্তনাদ কানে ভেসে এল।

ধোঁয়ার অন্ধকার ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। জানলার ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। সাহেব বিস্ফারিত নেত্রে দেখলেন, ঘরে জনপ্রাণী নেই, মূর্তি না, কুকুর না, কেউ না। শুধু ঘরের দেয়ালগুলো থর থর করে কাঁপছে।

তারপর মেঝের উপরকার চাঁদের আলো ক্ষীণতর হতে হতে ধীরে ধীরে মিলিয়ে...কি যেন একখানা কালো যবনিকা চাঁদকে দিলে ঢেকে...চরাচর ব্যাপ্ত করে একটা জমাট অন্ধকার সাহেবের চারিদিকে ঢেউয়ের মত দুলতে দুলতে ফিরে এল...

তারপর আর কিছু মনে নেই...

পরদিন সকালে সিপাইরা এসে দেখল, সাহেব মেঝের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর দুই পাশে দুটো রিভলভার পড়ে রয়েছে। কুকুর দুটোও নেই। আর দেওয়ালের এখানে ওখানে গুলির দাগ। অথচ আশ্চর্য এই যে, ওরা বাইরে থেকে গুলির আওয়াজ কিংবা অন্য কোন শব্দ শুনতে পায়নি। কিন্তু গুলি যে ছোড়া হয়েছে সে বিষয়েও কোন ভুল নেই। দেওয়ালে গুলির চিহ্ন আছে, রিভলভারেও গুলি কম। আর কুকুর দুটোই বা গেল কোথায়?

বহু কষ্টে তারা সাহেবের চৈতন্য সম্পাদন করলে। সমস্ত বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও জনপ্রাণীর চিহ্ন মিলল না। কেবল জানলার নিচে যে বাগান, সেই বাগানে কুকুর দুটো মরে পড়ে আছে। মানুষ যেমন করে গামছা নিংড়োয়, তেমনি করে তাদের যেন কে নিংড়ে দিয়েছে। তাতে আর রক্ত বলতে কিছু নেই।

এই কাণ্ড ঘটেছিল আজ থেকে অনেক কাল আগে। এ কাণ্ডের কর্তা কে, কী করেই বা ঘটল, তার অর্থ আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। লোকে ভৌতিক বলে এক কথায় এর মীমাংসা করে দিয়েছে। কিন্তু যারা ভূতে বিশ্বাস করে না, তারা কী করে এ সমস্যার সমাধান করবে জানি না।

বদনবাবুর বাড়ি আজ শ্রীহীন, ভগ্নদশা। তার দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। কড়িকাঠ খসে ঝুলছে। স্থানে স্থানে ইটের স্তূপ হয়েছে। মাঝে মাঝে আগাছার জঙ্গল। যারা এই বাড়ির উত্তরাধিকারীত্ব নিয়ে মামলা করছিল, সাহেবের কাণ্ডের পর তারা আর কেউ এ সম্পত্তির মালিক হতে রাজী হয়নি। এ বাড়ি এখন বেওয়ারিস অবস্থায় পড়ে। সন্ধের পর আর কেউ বাড়ির ধার দিয়ে যায় না। বাড়ির একখানা ইট কেউ ছোঁয় না। এখন অবশ্য আর কিছু দেখা যায় না বটে কিন্তু কেউ কেউ বলেন, অমাবস্যার নিশুতি রাত্রে বাড়ির চারিদিকে কে কেঁদে কেঁদে বেড়ায়। কে কাঁদে কেউ জানে না।

রাত বারোটা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আমি তখন মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দিতে পোস্টেড। যে দোতলা বাড়িটাতে আছি, সেটা আমাদের দুজনের পক্ষে বেশ বড়। উপরে-নিচে অনেকগুলি ঘরই ফাঁকা। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে বাঁহাতি পুবের ঘরটা আমার লেখাপড়া করবার, আর লম্বা-চওড়া বড় একটা বারান্দা পেরিয়ে পশ্চিমের ঘরটা শোবার। দক্ষিণের বারান্দায় ক'খানা চেয়ার ফেলা।

নির্ঝঞ্ঝাট নিরিবিলি বাড়ি। চারদিক গাছগাছালিতে ঢাকা। ইলেকট্রিক নেই। লণ্ঠনের টিমিটিমি।

তখন ঘটনাচক্রে পরলোকের চর্চার মধ্যে গিয়ে পড়েছি। বিকেলে কোর্ট থেকে আর কোথাও যাই না। টেবল নিয়ে বসে পড়ি দুজনে।

ঠিক প্ল্যানচেট নয়, বলা যেতে পারে টেবল-টার্নিং—স্বয়ং-লেখন। এমনিতে ক'পাতা জবানবন্দি লিখতে হাত বেঁকে বসে, আর এ দিস্তের পর দিস্তে ওড়াচ্ছি, ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নেই। এমন বোধ হয় কিছু লেখা আসে, যা অচেতন মনেরও বাইরে! হয়তো তারই জন্যে।

টেবলটাই বেশি আশ্চর্য করে। একটা ছোট চারপেয়ে টাইপরাইটার টেবল। এমনিতে বেশ ভারীই, কিন্তু যখন হাতের থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়, এঁকে-বেঁকে চলে আপনা থেকে, দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খায়, তখন মনে হয় না এ শুধু আমাদের মনের জোরে হচ্ছে।

কত কে যে আসে। মানে লেখা হয়ে আসে। আমি অমুক, আমি তমুক। চেনার থেকে অচেনাই বেশি। আমি রেণু, আমি চুনী, আমি তারাপ্রসন্ন। আমি মহেশ্বরপাশার বিভূতি ঘোষ, মালদার নিরঞ্জন ব্যানার্জি, আমি তোমার সঙ্গে পড়তাম নোয়াখালি জিলা স্কুলের মহম্মদ সোলেমান।

কিছুই প্রমাণ হয় না। কত জায়গায় চিঠি লিখে খোঁজ নিয়েছি, মেলেনি। লোক নয়, ঠিকানা নয়, বিবরণ নয়। সবই ধোঁয়া।

তবু কী জানি কেন, আবার বসি। কখনো-কখনো দুপুর রাত পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। কখনো কখনো

তারও বেশি। মনে হয়, কী যেন আছে। আকাশে শব্দ ঠিক আছে, আমি কাঠের বাক্স হয়ে আছি বলেই ধরতে পারছি না। রেডিও সেট হয়ে উঠতে পারলেই ঠিক বেজে উঠব।

আমি সম্প্রতি অসম্পূর্ণ বলেই, আমি সম্প্রতি অসমর্থ।

ঢাকা গেণ্ডেরিয়ায় বিজয়কৃষ্ণের কাছে রামকৃষ্ণ গিয়েছিলেন আর বিজয়কৃষ্ণ গা টিপে টিপে দেখেছিলেন সত্যিই রামকৃষ্ণ। কিন্তু আসলে রামকৃষ্ণ তো যাননি। তেমন আধারই তেমন বস্তুকে আকর্ষণ করতে পারে।

আমি পারি না, আমি জানি না বলেও তো কিছু অপ্রমাণ হবার নয়।

সেদিন যেন অন্যরকম শুনলাম।

বসতেই লেখা হল : 'সেই কখন থেকে বসে আছি।'

'কে তুমি?'

একটি মেয়ের নাম লেখা হল। আত্মীয় নয় যদিও, চিনলাম। কে না চেনে। একটি সুগায়িকা কুমারী মেয়ে। কোকিলকণ্ঠী।

'তা তুমি আমাদের চিনলে কী করে?'

'বিকেলে গ্রামোফোনে আমার একটা রেকর্ড বাজালেন, তাই শুনে এসেছি।' লেখা হল : 'নিজের গান শুনতে এত ভাল লাগল। যদি আবার বাজান।'

এতেও কিছু প্রমাণ হয় না।

১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী।

বিকেলে যথারীতি বসেছি টেবলে, শোবার ঘরে। যেমন আসেন, আমাদের হিতৈষী আত্মীয়েরা সঙ্গীসাথী নিয়ে এসেছেন। নাম-আদি লেখা হবার পর লেখা এল : 'আমরা আজ বেশিক্ষণ থাকতে পারব না, আমাদের ছেড়ে দাও।'

এরকম তো হয় না কোনদিন। তাই বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম : 'কেন, এত তাড়া কিসের?'

লেখা হল : 'আমাদের এখানে এইমাত্র একজন মহাপুরুষ এসেছেন! তাঁকে দেখবার জন্যে সবাই চলেছে, আমরাও যাব। আমাদের ছেড়ে দাও।'

ছেড়ে দিলাম : টেবল শান্ত হল।

রাত্রে আমার সহকর্মী এসে বললে, 'রেডিওতে খবর এসেছে, মহাত্মা গান্ধীকে আজ বিকেলে গুলি করে খুন করা হয়েছে।'

তবে এই মহাপুরুষকে দেখবার জন্যেই কি ওখানে অত সোরগোল?

এতেও কি কিছু প্রমাণ হয়?

একটা লেখা শেষ হতে না হতেই আরেকটা লেখা—মনে হত একাধিক স্পিরিট এসে হৈ-চৈ করছে। পরস্পর ঠেলাঠেলি করছে!

'আমি এই নতুন এলাম, আমারটা আগে শুনুন—'

'আমি কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি—'

ধমক দিয়ে উঠলাম : 'তোমরা কেউ এসেছ বিশ্বাস করি না। কাজে প্রমাণ দিতে পার?'

'ছোটখাটো কাজ দিলে হয়তো পারি।'

'আমার পড়ার ঘরে তাকের থেকে কটা বই টেনে মেঝেতে ফেলে দিতে পার?'

পড়ার ঘরের জানালার পাল্লায় জোর শব্দ হল।

হাওয়া উঠছে বুঝি। জানালাটা বোধ হয় বন্ধ করিনি। টর্চ নিয়ে গেলাম তাড়াতাড়ি। দেখি কটা বই মেঝেতে পড়ে আছে।

বুক কাঁপতে লাগল। কিন্তু প্রমাণ হয়েছে বলে মানলাম না। বললাম 'হাওয়ার কাণ্ড।'

ফিরে টেবলে এসে বসতেই হিতৈষী আত্মার দল ধমকে উঠল : 'খবরদার, এসব ম্যাজিক দেখতে চেও না। অনেক নিম্নস্তরের স্পিরিট আসে। সদ্য মৃতেরা নিম্নস্তরেই বেশি ঘোরাফেরা করে। নিম্নস্তরের স্পিরিটদের মধ্যে অনেকে মিথ্যাবাদী, প্রতারক। নানা বিভ্রান্তি ঘটিয়ে ক্ষতি করতে

পারে। ওদের প্রশ্রয় দিও না।'

'কিন্তু সদাত্মা পাব কোথায়?'

লেখা এল : 'রাত বারোটার পর বসে! তখনই মহাপুরুষেরা অবতরণ করেন।'

'শুধু অবতরণে কী হবে? চোখ যে শরীরায়ন দেখতে চায়? যাকে বলে মেটিরিয়্যালাইজেশন।'

তারপরই এল নমিতা চক্রবর্তী।

ইস্টারের ছুটিতে কলকাতা যাচ্ছি, যাবার মুখে বসলাম একদিন। চিনি না, জানি না, ডাকিনি, খুঁজিনি, হঠাৎ লেখা এল : 'আমি নমিতা চক্রবর্তী।'

'কী করতে?'

'বি. এ পড়তাম।'

'ঠিকানা?'

স্পষ্ট ঠিকানা দিল। লিখল, 'আমি গত রবিবার মারা গেছি! আপনি আমার মাকে বলুন যেন অত কান্নাকাটি না করেন। মার কান্না দেখলে আমার খুব কষ্ট হয়। আর বলবেন—'

আর কোন স্পিরিট এসে বোধহয় নমিতাকে সরিয়ে দিল।

সৌভাগ্যক্রমে ঠিকানাটা আমাদের কলকাতার বাড়ির কাছে। ভাবলাম খোঁজ নিয়ে দেখি। হয়তো দেখব আমারই 'রিসিভিং' ভুল হয়েছে। 'আজমীব গিয়া'-কে 'আজ মর গিয়া' লিখেছি।

নির্দিষ্ট রাস্তায় নির্দিষ্ট নম্বরের বাড়ি পেলাম।

'এই বাড়িতে নমিতা চক্রবর্তী বলে কেউ থাকে?' রাস্তার দরজার কাছে দাঁড়ানো ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম।

'থাকত। গত রবিবার মারা গেছে।'

'মারা গেছে?'

কেন, কী দরকার আর কোন কথাই যেন উঠতে পারে না এর পর। আস্তে আস্তে সরে পড়লাম।

নমিতার মার সঙ্গে দেখা করলে হত। কিন্তু দেখা করলেই অনেক ঝামেলার মধ্যে পড়ে যেতাম। মার কান্না আরো বাড়ত।

স্ত্রীকে বললাম, 'এর পরেও প্রমাণ চাই? একটি ঠিকানাই বা কেন মিলবে?'

কান্দিতে ফিরে এসেছি। শুক্ল পক্ষ।

যথারীতি রাত বারোটায় পড়ার ঘর থেকে উঠেছি। লণ্ঠন দিয়ে বারান্দায় বেরুবার মুখে দাঁড়িয়েছি দরজায়। দেখি একটা দক্ষিণমুখো চেয়ার পুবমুখো করা, আর তাতে একটি তরুণী বসে। জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছে দরজার দিকে।

আমাকে দেখা মাত্রই তরুণীটি উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে পুবমুখো চেয়ার আবার দক্ষিণমুখো হয়ে গেল।

তরুণীটিকে আর দেখা গেল না।

শোবার ঘরে এসে স্ত্রীকে জাগালাম। বললাম, 'টেবলে এখন একবার বসতে হয়।'

বসলাম। পেন্সিল স্ত্রীর হাতে চালান করে দিলাম।

'আমি এসেছিলাম।' লেখা পড়ল।

'কে?'

'আমি সেই নমিতা চক্রবর্তী।'

'এসেছিলে মানে এখনও আসোনি?'

'তখন মূর্তি ধরে এসেছিলাম, এখন—'

চারদিকে তাকালাম। কিছু দেখা গেল না। লেখা হল : 'মাকে আমার কথা বলেননি কেন? আমার আরও কথা আছে। বারোটার আগে বসবেন।'

বললাম, 'আমরা আসানসোলে বদলি হয়ে যাচ্ছি। সেখানে এস।'

'আচ্ছা—'

'পৃষ্ঠার বাকি অংশে একটা লম্বা দাগ দিয়ে চলে গেল নমিতা।

পরের বার কলকাতা যেতে কিছু দেরি হল। নমিতাদের বাড়ির সামনে দিয়ে দু-তিনবার হেঁটে গিয়েছি। ইচ্ছে হয়েছে ওর ফটোটা দেখে আসি। কিন্তু কী জানি, যদি দেখা মূর্তির সঙ্গে মিলে যায়, যদি প্রমাণ অকাট্য হয়ে ওঠে, সেই ভয়ে যাইনি। মন্দ কী, সবই একটা সংশয়ের ধার ঘেঁষে রহস্যময় হয়ে থাক না।

নমিতার মা নিশ্চয়ই এতদিনে সামলে উঠেছেন।

আর তারপরেই তো আসানসোল।

হাতির দাঁতের কাজ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

এ-কাহিনীর যেমন খুশি মানে অবশ্য করা যেতে পারে। প্রতিদিনের সাধারণ বাস্তব ঘটনার সীমা যেখানে শেষ হয়ে আজগুবির কিনারায় গিয়ে পড়েছে, সেইখানে এ কাহিনীর জন্ম। নিজেদের মনের পাল্লা যেদিকে যেমন ঝুঁকবে, সেই হিসেবেই এ-গল্পের রূপ বদলে যেতে পাবে। শুধু ঘটনাগুলো আমি তাই নিরপেক্ষভাবে এখানে বলে যাব।

ব্যাপারটার আরম্ভ যেভাবে হয়েছিল, তা স্মরণ করলে এখনো আমি কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করি। সেই অন্ধকার বাদলার রাত! থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু আকাশের অসহ্য গুমোট আর কাটতে চাইছে না। মোগলসরাই স্টেশনের থার্ড ক্লাসের—ওয়েটিংরুম ঠিক নয়, টিনের চাল দেওয়া বিশাল শেডের তলায়—একেবারে একলা, রাত দুটোয় একটি ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি, আর আকাশের মেঘের ডাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চাবিধারে ইঞ্জিনেব শান্টিং, মালগাড়ির পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা ও বিশাল জংশন স্টেশনের অসংখ্য অস্বাভাবিক অদ্ভুত আওয়াজ শুনছি। বিশাল টিনের শেডের মাঝখানে মিট্‌মিট্ করে যে একটিমাত্র তেলের আলো জ্বলছে, তাতে সামনের অন্ধকার একটু তরল হয়েছে মাত্র ; শেডের কোণে কোণে সে আলো একেবারেই পৌঁছোয়নি।

শেডটি শুধ যাত্রীদের অপেক্ষা করার নয়, মাল রাখবারও জায়গা! একধারে টিনের চাল পর্যন্ত বড় বড় কিসের বস্তা স্তূপাকার করে সাজানো। আমি ওজন করবার যন্ত্রটার ওপর বসেছিলাম, সেখানে পরের পর সাজানো পিপের পাহাড় অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। আর একপাশে কেরোসিন কাঠের একগাদা বাক্স ভালভাবে ঠাহর করে দেখলে চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে বাইরের উজ্জ্বল বিদ্যুৎ চমকে সমস্ত শেড আলোকিত না হয়ে উঠলে অবশ্য এ-সমস্ত আমি লক্ষ্য করতাম কিনা সন্দেহ! বিদ্যুতের আলো মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবার সমস্ত শেড আবো অন্ধকাব হয়ে উঠছে যেন। কেমন একটা অস্বস্তিকর অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে, ঘোরালো অন্ধকারে জায়গাটা লাগছে রহস্যময়।

সখ করে অবশ্য এ জায়গায় আসিনি। স্টেশনের কোন ওয়েটিংরুমে জায়গা না পেয়েই বাধ্য হয়ে এখানে আসতে হয়েছে। সেকেন্ড ক্লাস ওয়েটিংরুমের সব ক'টা আসনই ভর্তি, ইন্টার ক্লাসের জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে কে একজন যাত্রী হঠাৎ ভয়ঙ্কর অসুস্থ হয়ে পড়ায় ভয়ানক গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। মাত্র ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করলেই গাড়ি পাওয়া যাবে জেনে শেষে এইখানেই আশ্রয় নিয়েছি।

কিন্তু শেডের তলায় আর কোন যাত্রী না দেখে প্রথমটা একটু আশ্চর্যই হয়েছিলাম। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা কি আজকাল আর ট্রেনে চাপে না! তবে রাত এখন অনেক ; যাত্রী যা দু-একজন আছে, বৃষ্টি সত্ত্বেও স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই হয়তো কোনরকমে আশ্রয় নিয়েছে, এমনও হতে পারে।

নির্জন শেডের ছমছমে অন্ধকারে বসে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছিল, আমারও প্ল্যাটফর্মে কোনরকম একটা আশ্রয় খোঁজাই ভাল ছিল। হাত-ঘড়িটার উজ্জ্বল ডায়ালের দিকে চেয়ে দেখলাম, সবে একটা বেজেছে। আরো একঘণ্টা এই শেডের তলায় কাটাতে হবে জেনে মনটা বিশেষ প্রসন্ন হয়ে উঠল না।

ভয়কাতুরে আমি মোটেই নয়, অতবড় জংশন স্টেশনের যাত্রীনিবাসে বসে ভয় পাওয়ার কোন কথাও নয়, তবু আবছা অন্ধকারে চারিধারে স্তূপাকার মালের মাঝখানে বসে থাকতে থাকতে অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

বাইরের শান্টিং প্রভৃতির শব্দ ও মেঘের ডাকের ফাঁকে ফাঁকে ঘরের এক কোণ থেকে কেঠো পোকায় কাঠ কুরে ফুটো করবার একঘেয়ে শব্দ শোনা যাচ্ছে। একবার একটা শব্দে চমকে চেয়ে দেখলাম, প্রকাণ্ড একটা ইঁদুর বস্তাগুলোর ওপর থেকে দ্রুতবেগে নেমে অন্ধকারের কোণে চলে গেল। কিন্তু সে সব অস্বস্তির কারণ হিসাবে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

পনেরো মিনিট আরো এইভাবে কেটে যাওয়ার পর কিন্তু সত্যই অস্বস্তিটা যেন অত্যন্ত বেড়ে গেছে মনে হল। বড় রেল স্টেশনের শব্দের কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই, হঠাৎ মাঝে মাঝে সব একেবারে থেমে যায়, তারপর আবার শুরু হয় অতর্কিতে। এখন যেন শব্দের বিশৃঙ্খলার মধ্যে সেই রকম একটা ফাঁক পড়েছে, আকাশে মেঘের ডাক নেই, কেঠো পোকাটাও যেন ক্লান্ত হয়ে থেমে পড়েছে, অসাধারণ একটা নিস্তব্ধতা।

সে নিস্তব্ধতা আমার পেছন দিকে খুব কাছাকাছি আচমকা একটা প্রচণ্ড ফোঁস-ফোঁসানির শব্দে ভেঙে গেল। এটা যে নিকটের কোন লাইনের ইঞ্জিনের স্টীম ছাড়ার আওয়াজ তা বুঝেও চমকে ফিরে না তাকিয়ে পারলাম না এবং সেই মুহূর্তে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

বিচার করে দেখলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠার এমন কোন হেতুই অবশ্য ছিল না ; কিন্তু যে-ঘরে এতক্ষণ নিজেকে একা বলে জেনে এসেছি, সেখানে আচম্বিতে ঠিক নিজের পিছনেই অপরিচিত সাদা একটি মূর্তিকে বসে থাকতে দেখলে প্রথমটা একটু বিচলিত হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক বোধ হয় নয়। আশ্চর্যের কথা এই যে, লোকটা আমার ঠিক পিছনে ওজন করবার যন্ত্রের উপরে এসে বসলেও কখন যে এসে ঢুকেছে, টেরও পাইনি। এখনো লোকটা পাথরের মূর্তির মতই নিশ্চল, এতটুকু সাড়া-শব্দও নেই!

আবছা আলোয় অনেকক্ষণ ধরে লোকটাকে নজর করে দেখলাম। দুটো হাঁটুর উপর ভর দিয়ে মাথা নিচু করে সে বসে আছে, পাশে একটা ছোট বোঁচকা। পোশাক ও মুখের যেটুকু অংশ দেখা যাচ্ছে, তাতেই তাকে সাধারণ দরিদ্র শ্রেণীর একজন চীনেম্যান বলেই সহজে বোঝা যায়।

বুঝে একটু বোকাই হলাম। এ-রকম নির্জন জায়গায় একজন সঙ্গী পেলে খুশি হওয়ারই কথা। দুটো আলাপ করে বাঁচা যায়, কিন্তু চীনেম্যানের সঙ্গে কী আলাপ করব? বাধ্য হয়ে তাই আবার মুখ ফিরিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। চীনেম্যানও আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকার বলেই মনে হল। শেডের তলায় আর কেউ আছে বলে তার যেন খেয়ালই নেই।

মিনিট পাঁচেক এইভাবে কাটবার পর আর একবার কৌতূহলভরে তার দিকে ফিরে তাকিয়েছি, এমন সময় বাইরে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। মাত্র এক সেকেণ্ডের সেই উজ্জ্বল আলোই আমার পক্ষে যথেষ্ট। চীনেম্যান মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে একবার আধ-বোজা চোখ তুলে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল, কিন্তু আমি তখন যা দেখবার, তা দেখতে পেয়েছি। লোকটার গালের বাঁ-ধারে

একটা লম্বা কাটা দাগ আর বাঁ ভুরুর কোণ থেকে কানের ধার অবধি টাট্‌কা ও জমাট রক্তের সঙ্গে মিশে সেটা দগদগে ঘা হয়ে আছে।

হঠাৎ ভয়ঙ্করভাবে চমকে ওঠায় আমার মুখ থেকে অস্ফুট একটা শব্দ নিজেব অজান্তেই বেরিয়ে গেছিল, কিন্তু চীনেম্যানের তাতে ভ্রূক্ষেপও দেখা গেল না। হাঁটুর উপর ভর দিয়ে আগেকার মত নিঃশব্দে, নিশ্চল-নিস্পন্দভাবেই সে বসে রইল, মুখের অতবড় কাটাটাও যেন তার কিছুই নয়।

এবারে রীতিমত অস্থির হয়ে উঠলাম। এ-রকম অদ্ভুত সঙ্গীর সঙ্গে এই নির্জনে বসে থাকার মত মনের জোর সত্যিই হারিয়েছি।

বাইরে বৃষ্টি আবার জোরে পড়তে শুরু করেছে, তা সত্ত্বেও উঠে প্ল্যাটফর্মেই চলে যাব, ঠিক করলাম। সঙ্গে ছোট সুটকেশটা তুলে নিয়ে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় বাইরে অনেক লোকের গোলমাল শোনা গেল। গোলমালটা এই দিকেই আসছে। দেখতে দেখতে কয়েকটা টর্চের আলো শেডের ভিতর এসে পড়ল, তার পরেই কয়েকজন রেলওয়ে পুলিশ ও কর্মচারীর আবির্ভাব ঘটল।

টর্চের উজ্জ্বল আলো আমার দিকে ফেলে হিন্দুস্থানী দারোগা সাহেব একটু যেন বিস্মিতভাবেই এগিয়ে এলেন।

'আপনি—আপনি কতক্ষণ আছেন এখানে ?'

অবাক হয়ে বললাম, 'তা প্রায় দেড় ঘণ্টা।'

'দেড় ঘণ্টা ! আপনি কি একলাই আছেন ?'

'একলা ? না....'

আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই দারোগা সাহেব উৎসুকভাবে বললেন, 'আর কে ছিল এখানে ? চীনেম্যান, একজন চীনেম্যানকে দেখেছেন ?'

পিছনে আঙুল দেখিয়ে বললাম, 'ওইতো।' কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে তাকিয়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম ! কোথায় সে চীনেম্যান !

দারোগাবাবু আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করে কৌতূহলভরে বললেন, 'আপনার পেছনেই ছিল নাকি ?'

'এই তো কয়েক সেকেণ্ড আগেই দেখেছি। মুখের বাঁ দিকে একটা কাটার দাগ।'

পুলিশেরা সবাই মুখ-চাওয়াচাওয়ি করছিল। দারোগাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক দেখেছেন ; কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড আগে কি বলছেন ? সে বেরিয়ে যায়নি এখান থেকে ?'

'আমার জ্ঞানত তো নয় !'

শেডের মধ্যে স্তূপাকার মালের পিছনে কোন জায়গায় চীনেম্যান লুকিয়ে থাকতে পারে মনে করে পুলিশ তারপর তন্ন-তন্ন করে খোঁজার আর কিছু বাকি রাখল না, কিন্তু কোন চিহ্নই তার পাওয়া গেল না। কেমন করে যে সে এক সেকেণ্ডের মধ্যেই এমন অন্তর্হিত হয়েছে, কে জানে !

হয়রাণ হয়ে পুলিশ শেষ পর্যন্ত খোঁজা বন্ধ করে শেড ছেড়ে চলে গেল। আগাগোড়া এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে আমি তখন স্তম্ভিত হয়ে আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে আছি।

পুলিশের লোক চলে যাওয়ার পর হঠাৎ খেয়াল হল, এ শেডের ভিতর একলা থাকা মোটেই আর নিরাপদ নয়। লোকটার কোন পরিচয় অবশ্য দারোগার কাছে পাইনি, কিন্তু মুখে অত বড় একটা ক্ষত নিয়ে নেহাত কোন সাধু-পুরুষ যে পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে না, এটুকু বুঝতে পেরেছি। তা ছাড়া তার এই শেড থেকে অন্তর্হিত হওয়ার ব্যাপারটার কোন ব্যাখ্যাই যে পাওয়া যায় না।

কথাটা মনে হতেই সমস্ত শরীরটা শিউরে উঠল একবার। না, আর এখানে এক মুহূর্তও নয়। সুটকেশটা নিচে নামিয়ে রেখেছিলাম। সেটা তুলতে গিয়ে মেঝের উপর কী একটা জিনিস পড়ে রয়েছে বলে মনে হল। জিনিসটা তুলে আলোর নিচের নিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখে বেশ অবাক হলাম।

হাতির দাঁতের খোদাই করা অপরূপ এক মূর্তি ! এ-সব জিনিসের সঙ্গে যেটুকু পরিচয় আমাদের আছে, তাতেই বুঝলাম, কোন উঁচুদরের চীনে কারিগর ছাড়া এমন জিনিস কেউ গড়তে পারে না। মাত্র এক বিঘত পরিমাণ মূর্তিটির সমস্ত অঙ্গ, মায় চোখের ভুরু পর্যন্ত অপরূপ কৌশলে খোদাই

করা। হাতির দাঁতে তৈরি সাধারণ চীনেমূর্তির কাল্পনিক দৈত্য-দানবের রূপ এটিতে নেই। সাধারণ একজন চীনে মজুর শ্রেণীর লোক পিঠে ঝোলা বেঁধে একটু নুয়ে পড়ে দাঁড়িয়ে আছে। অদ্ভুত শুধু সেই ক্ষুদে মূর্তির চোখের চাহনি, আর মুখের সূক্ষ্ম বিদ্রূপের রেখা-ফোটানোর কায়দা।

মূর্তিটা যে চীনেম্যানই তাড়াতাড়িতে ফেলে গেছে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি এখন করি কি ? যেখানের জিনিস সেইখানেই রেখে যাব, না জমা দেবো পুলিশের জিম্মায় !

শেষ পর্যন্ত কিন্তু লোভই জয়ী হল। এমন অপরূপ শিল্পকৌশলের নির্দশন চুরি করতেও বুঝি সত্যিকার সমঝদারের বাধে না। আমি তো ঠিক চুরিও করছি না।

মূর্তিটা সুটকেশে ভরে আমি শেড থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

কিন্তু সে মূর্তি আমি বাড়িতে নিয়ে আসতে পারিনি। পথেই সে মূর্তি আমার হাত থেকে খোয়া গেছে। কেমনভাবে আমি তা হারালাম, সেই কথা এবার বলি।

রাত্তির দুটোর ট্রেন আধ ঘন্টা লেট করে যখন স্টেশনে এসে পৌঁছাল, তখন বৃষ্টি মুষলধারে পড়তে আরম্ভ করেছে। সেই বৃষ্টির ভিতর ভাল কামরা খোঁজ করবার উৎসাহ আর ছিল না। সামনে যে কামরা পেলাম, তাইতেই উঠে কিন্তু খুশি হয়ে গেলাম। কামরাটি একেবারে খালি। একটা বাঙ্ক দখল করে শুয়ে পড়লে এরপরে যত লোকই উঠুক না কেন, বাকি রাতটা ঘুমের ব্যাঘাত আর হবে না।

ঘুমোবার আয়োজন করবার আগে কিন্তু আর একবার মূর্তিটি বের করে দেখবার কৌতূহল জয় করতে পারলাম না। ট্রেনের জোরালো আলোয় তার কারুকার্য আরো ভাল করে দেখবার সুবিধা হবে বলে সুটকেশটা খুলে ফেললাম, কিন্তু কোথায় মূর্তি ! সব জিনিসের উপরে যে সেটিকে রেখেছিলাম, সে-কথা স্পষ্ট আমার মনে আছে। সুটকেশটি যে-রকম জিনিসে ঠাসা, তাতে নড়াচড়া বা ওলোট-পালোট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও নেই।

তবুও সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য উপরের কাপড়-চোপড়গুলো এক-এক করে তুলে ফেললাম। দেখলাম, সে মূর্তিটা আছে ঠিক, কিন্তু এভাবে সিল্কের রুমালটায় জড়িয়ে সেটাকে সুটকেশের তলায় রেখেছি বলে কোন মতেই স্মরণ করতে পারলাম না। অবশ্য তখন মাথার অবস্থা আমার খুব ভাল ছিল না। হয়তো বিমূঢ়তার মধ্যে এইভাবেই রেখে থাকব মনে করে সিল্কের রুমাল খুলে সেটা বের করলাম।

ট্রেনের জোরালো আলোয় তার অপূর্ব কারুকার্য সত্যই আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। কিন্তু একটা খুঁতও সেই সঙ্গে দেখতে পেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। শেডের ম্লান আলোয় এ খুঁতটুকু ধরা পড়েনি। চীনেম্যানের হাত থেকে অসাবধানে মেঝেয় পড়বার সময়েই বোধহয় মূর্তিটির মুখের বাঁ-ধারে একটু চিড় খেয়ে গেছে। সামান্য একটু সূক্ষ্ম দাগ মাত্র, কিন্তু এমন মূল্যবান জিনিসের এইটুকু খুঁত থাকলে মনও ক্ষুণ্ণ হয়।

সযত্নে মূর্তিটিকে আবার সিল্কের রুমালে জড়িয়ে সুটকেশের ভিতর তুলে রাখলাম। তারপর সুটকেশটি মাথার কাছে রেখে পুলিশের ফেরারী আসামী সাধারণ একজন চীনেম্যানের হাতে এমন দামী জিনিস কেমন করে এসে পড়েছিল, ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না।

ঘুমের ভিতরে অস্পষ্টভাবে সেই চীনেম্যানকেই যেন স্বপ্ন দেখছিলাম, আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে অজানা ভাষায় সে যেন কি বলে আমায় শাসাচ্ছে ! হঠাৎ আমার মাথাটা ধরে সজোরে সে ঝাঁকুনি দিল। ঘুমটা সহসা ভেঙে গেল।

সভয়ে চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি, চীনেম্যান নয়, একজন ভদ্রলোক আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে জাগাচ্ছেন।

বিমূঢ়ভাবে উঠে পড়লাম। ট্রেন একটা স্টেশনে এসে থেমেছে, বাইরে কুলি ও যাত্রীদের হাঁক-ডাক শোনা যাচ্ছে।

এতক্ষণে ভদ্রলোকের কথায় আমার কান গেল 'কি রকম ঘুমোচ্ছেন, মশাই। ট্রেনে এমন অসাবধানে ঘুমোয় !'

'কেন, কি হয়েছে ?'

'কি হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন না ?'

দেখতে আমি সেই মুহূর্তেই পেলাম। আমার সুটকেশ খোলা ! কাপড়-চোপড় জিনিসপত্র তছনছ হয়ে কিছু বাঙ্কের উপরে, কিছু কামরার মেঝেয় পড়ে আছে।

'টাকাকড়ি ছিল নিশ্চয়, দেখুন কি গেছে ?'

টাকাকড়ি নয়, কি যে গেছে, আমি সুটকেশের ওই অবস্থা দেখামাত্র বুঝেছি। তবু দুরাশা করে সমস্ত কামরায় ছড়ানো জিনিসপত্র ও সুটকেশ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম। না, সে মূর্তিটা ছাড়া আর সব জিনিসই ঠিক আছে।

ভদ্রলোক আমার মুখ দেখে সহানুভূতির স্বরে বললেন, 'খুব বেশি কিছু ছিল বুঝি ? স্টেশন-মাস্টারকে খবর দিন এক্ষুনি।'

তারপর একটু থেমে কি ভেবে বললেন, 'ঠিক হয়েছে ; ট্রেন প্ল্যাটফর্মে থামবার আগেই একজন চীনেম্যান এই কামরাটা থেকেই নেমে গেছে বলে মনে পড়ছে এবার।'

'চীনেম্যান !'

'হ্যাঁ, পিঠে একটা বোঁচকা সমেত। তখন খেয়াল করিনি। তারপর কামরায় ঢুকেই দেখলাম, আপনার সুটকেশের এই দশা। ইশ ! তখন যদি আমার বুদ্ধি হত ! যাই হোক—পুলিশে খবর দিন এইবেলা, স্টেশন-মাস্টারকে বলে।'

কিন্তু আমি সিল্কের রুমালটা হাতে নিয়ে বিমূঢ় হয়ে বসেই রইলাম।

রুমালটার একধারে সামান্য একটুখানি রক্তের দাগ।

ন্যাপা

লীলা মজুমদার

অস্বাভাবিক মানুষ ও অস্বাভাবিক ঘটনা যে হরদম চোখে পড়ে এ বিষয় তো কোন সন্দেহ নেই-ই, এমনকি এমন বহু ঘটনার কথাও শোনা যায় যাকে যুক্তি দিয়ে বিচাব করতে গেলে অসম্ভব বলে মনে হতে পারে। কিন্তু কে না জানে যে সে সব ঘটনাও হামেশাই ঘটে থাকে।

হামেশাই ঘটে থাকে বলছি বটে, তবে সব সময় নিজেদের জীবনে ঘটে না, তাই চাক্ষুষ প্রমাণ দিতে পারে এমন সাক্ষী খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু যাদের কথা অবিশ্বাস করা যায় না, এ রকম বহু লোকের নিজেদের জীবনে না হোক, তাদের নিকট আত্মীয়স্বজনদের কিংবা অন্তরঙ্গ বন্ধুদের জীবনে সেসব ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকতে শোনা যায়।

যেমন ধরুন আমার মার সই মিস গাঙ্গুলীর কথা। বিয়ে-থা করেননি, নামকরা খ্রীশ্চান বাড়ির মেয়ে, নামটা অবিশ্যি পালটে দিয়েছি, নইলে সবাই চিনে ফেলবেন শেষটা—ভবানীপুবের দিকে একটা মেয়েদের হোস্টেল চালান। আমার মামাবাড়ির পুরোন চাকর বনমালীও সেখানে বহু বছব কাজ করছে। সব জানাশোনা লোকের ব্যাপার, বুঝতেই পারছেন, এঁরা কেউই সেরকম একটা বানিয়ে মিথ্যে কথা বলবার মানুষও নন, অথচ ঘটনাটা শুনে কী বলবেন তা ভেবে পাবেন না।

সারাদিন বনমালী ন্যাপাকে আগলিয়েছে, এখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, আর ভাল লাগছে না। মানুষের ভাইবোন কেন হয়? ন্যাপাটা পাজির একশেষ, আর কেউ হলে বনমালী তার সঙ্গে কথাটি বলত না, অথচ মায়ের পেটের ভাই বলে যেই না জেল থেকে ছাড়া পেল, অমনি বনমালীও তাকে নিয়ে গিয়ে রান্না ঘরে ঢোকাতে বাধ্য হল।

'ওর জুড়ি রাঁধুনে সারাটা পৃথিবী ঘুরে আর একটা খুঁজে পাবেন না দিদি, নিদেন একটা ট্রায়েল দিন তো।'

কথাটা মিথ্যেও নয়। একবেলা ন্যাপার রান্না খেয়েই দিদিমণিদের মুখে তাব প্রশংসা আর ধবে না। আর ন্যাপাকে পায় কে!

তবু কাজটা ভাল হয়নি। ন্যাপার মনে কী আছে কে জানে! দুষ্টবুদ্ধি জাগতেই বা কতক্ষণ? বাড়ির ভিতরে তো বনমালী আর বাইরের ফটকে দরোয়ান ছাড়া আর একটা ব্যাটাছেলে নেই। সারাদিন দিদিরা ইস্কুলে পড়ায়, বাড়ি-ঘর খাঁ-খাঁ করে, জিনিসপত্র এধারে ওধারে ছড়ানো পড়ে থাকে। ন্যাপার যা স্বভাব, বনমালীর মনে শান্তি নেই। অথচ মায়ের পেটের ভাইটাকে সে-ই যদি আশ্রয় না দেয় তো আর কে দেবে?

যাক, তবু যতক্ষণ রান্নাঘরে কাজে মেতে থাকে ততক্ষণ রক্ষা। বাস্তবিক রাঁধে খাসা। ছেলেবেলা থেকে ওর হাতে জাদু আছে, বেশ ভাল মাইনেতে সাহেব-বাড়িতে করে খেতে পারত, অথচ তবু যে কেন দুর্বুদ্ধি জাগে কে জানে! যাকগে, এখন রাতের খাবার জন্য টেবিলটা লাগাতে হবে, এসব ভেবে তো কোন লাভ নেই।

দরজার কোণা থেকে বনমালী লক্ষ্য করে দেখল, মোড়ের বাড়ির বুড়ি মাসিমা এসেছেন। সবাই মিলে টেবিল ঘিরে বসেছেন। কথাও কানে আসছে। মাসিমা একবার কথা বলতে শুরু করলে আর রক্ষা নেই, কিন্তু শুনতে বেশ মজাও লাগে।

'হ্যাঁ, একদম চেঁছেপুঁছে সব নিয়ে এলাম ব্যাঙ্ক থেকে। আমাকে সন্দেহ করে এত বড় আস্পর্ধা! খাঁটি উনিশশী, প্রত্যেকটি জিনিস আমার বাবা আমার মার জন্য গড়িয়ে দিয়েছিলেন। মা মরবার সময় সমান দুই ভাগ করে আমার হাতে দিলেন। একটা ভাগ আমার, একটা ভাগ ভাদুর বউয়ের জন্যে। সে একেবারে চুলচেরা ভাগ ভাই। জোড়া ভেঙে ভেঙে একটা বালা আমাকে একটা ওকে; একটা ইয়ারিং আমাকে, একটা ওকে। যেমন দুটি রুমালে বেঁধে দিয়েছিলেন, তেমনি ব্যাঙ্কে তুলে দিয়েছিলাম, এই দশ বছরে একবারও খুলিনি। ওরাও মফস্বলে ঘুরেছে, সাহস করে কিছু নেয়নি। এখন এখানে এসে বসেছে, অমনি বউ কিনা আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। আজ ভাবি রেগে গেছি, এই পুঁটুলিসুদ্ধ ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেব।'

উমাদিদি কিছু বলবার আগেই কম বয়সের মণিদিদি বলে উঠলেন, 'কই মাসিমা, দেখি, দেখি কি রকম গয়না!'

মাসিমাও তাই চান, দুই পুঁটুলি খুলে টেবিলের উপর ঢেলে দিলেন। কালোপানা কাঠের উপর ছোট ছোট দুটি সোনার ঢিবির মত জ্বলজ্বল করতে লাগল। বনমালীর চোখ ঝলসে গেল। এত গয়না যে ওই থানকাপড়-পরা বুড়ি মাসিমার থাকতে পারে, এটা বনমালীর ধারণা ছিল না। ইস, লাল নীল সাদা সবুজ পাথর বসানো একেবারে ভাল ভাল সোনা গো। ওর দাম কত হাজার টাকা হবে কে জানে? এর ছোটপানা একটা বেচলেই বনমালীর মার ইনজেকশনগুলোর দাম উঠে যাবে। বুড়ি মাসিমা তো আচ্ছা, এই রাজার ধনরত্ন তুলে রেখে দিয়ে মিলের থানকাপড় আর রবারের চটি পরে বেড়ায়, বুড়ো বয়স অবধি ইস্কুলে সেলাই শেখায়। একটা ভাল জিনিস কোনদিন কেনে না, খায় না।

দিদিমণিরা জিনিসগুলোর উপর ঝুঁকে পড়ে নেড়ে চেড়ে দেখছে, এক-একটার উপর আলো পড়ে আর অমনি ঝিলমিলিয়ে ওঠে। বনমালীর চোখ জ্বালা করে। ভয়ে-ভয়ে একবার পিছন ফিরে দেখে, ভাগ্যিস্, ন্যাপা রান্নাঘরে ব্যস্ত আছে। বনমালীর বুক ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। আঃ বাঁচা গেল, মাসিমা আবার ওগুলোকে পুঁটুলি বেঁধে ফেলছেন।

মণিদিদির হাতে তখনও লাল পাথর বসানো মালাটা রয়েছে।

'আপনার কী সাহস মাসিমা! এত সব দেখে আমাদেরই চুরি করে নিতে ইচ্ছে করবে, আর আপনি ওই ব্যাগ নিয়ে সন্ধেবেলা এতটা পথ একা হেঁটে বাড়ি গিয়ে, তবে লোহার সিন্দুকে তুলবেন! ভয়ডর নেই আপনার প্রাণে?'

মাসিমাও অমনি পুঁটুলি বাঁধা বন্ধ করে একগাল হেসে বললেন, 'আরে, আমার বাবার জ্বালায় কি আমাদের ভয়টয় পাবার জো ছিল! জানিস তো বাবা মস্ত বড় উকিল ছিলেন, রাশি রাশি টাকা রোজগারও করতেন, দুই হাতে খরচও করতেন। সোনাদানায় রুপোর বাসনে আর তার চেয়েও দামী কাট-কাঁচের ফুলদানি আর ঝাড়লণ্ঠনে বাড়ি বোঝাই ছিল। এক-একটা বিলিতি ছবিরই কত দাম ছিল। তার কিছুই নেই অবশ্যি এখন, রিটায়ার করে বাবা বিদেশ ঘুরে বেরিয়ে সব উড়িয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছিলেন, শুধু মার গায়ের গয়নাগুলো ছাড়া। তা, হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম, ভয় পাব

কী, এই দৈত্যের মতো দুটো কুকুর ছিল যে আমাদের। সারাদিন বাঁধা থাকত, সারা রাত ছাড়া থাকত। একটার রঙ ছিল হলদে, আর কালো পোড়া হাঁড়ির মত এই প্রকাণ্ড মুখ, তার নাম ছিল রোলো। হাঁউমাঁউ করে তেড়ে এলে তাই দেখে ভয়ে প্রাণ উড়ে যেত। কিন্তু আসলে কিছু বলত না। শুধু ধারালো ছুঁচলো দাঁত দিয়ে কুটকুট করে জামার সব বোতাম কেটে ফেলে দিত। সে এক মজার ব্যাপার! অন্যটার নাম ছিল কিম্। কী সুন্দর সে দেখতে ছিল, সে আর কী বলব! এই লম্বা চকচকে লাল লোম সারা গায়ে, মখমলের মত চোখ, ঝালরের মত ল্যাজ। মুখে কিচ্ছু বলত না। নিঃশব্দে ছুটে এসে এক লাফে টুঁটি কামড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করত। বাড়ির লোকদের কিছু বলত না। পাঁচ-সাতশো টাকার জন্য এখানে কত চুরি-ডাকাতি খুন-খারাবির কথা শোনা যেত, আর আমাদের বাড়িতে হাত বাড়ালেই হাজার টাকার আসবাবে হাত ঠেকে যেত, অথচ ওই দুই কুকুরের জন্য কুটোটা কখনও চুরি যেত না। আরে তোরা কী বলিস, গোছা-গোছা জড়োয়া চুড়ি হাতে দিয়ে মার সঙ্গে তোদের এই বাড়িতেই চায়ের নেমন্তন্ন খেয়ে কত রাত করে বাড়ি ফিরেছি। সঙ্গে ওই দুটো কুকুর থাকতে শুধু আমাদের কাছাকাছি কেন, এই ফুটপাথ দিয়ে লোক চলেনি। এখানে তখন স্যার গিরীন্দ্র থাকতেন। কত নাম করা লোকের যাওয়া-আসা ছিল এ-বাড়িতে, কী সুন্দর সাজানো-গোছানো ছিল। কী ভালই যে বাসতাম আমরা ওই কুকুর দুটোকে—'

কানের কাছে একটা ফোঁস শব্দ শুনে বনমালী চমকিয়ে উঠল। ন্যাপার চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম জ্বলজ্বল করছে। 'যা ভাগ, তোর কাজকম্ম নেই নাকি?'

ন্যাপা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'কারও অত সোনাদানা থাকা উচিত না, কারও না।'

'ন্যাপা তোর পায়ে পড়ি। আবার কিছু পাকিয়ে বসিস না। এই সবেমাত্র ছাড়া পেয়েছিস, বুড়ো মাকে আর জ্বালাসনি বলছি, ও ন্যাপা শোন্ বলছি।'

কিন্তু ন্যাপা ততক্ষণে হাওয়া।

মাসিমা পুঁটুলি দুটোকে ততক্ষণে বেঁধে-ছেঁদে, হাতে ঝোলানো কালো কাপড়ের থলির মধ্যে পুরে, ছাতাটা হাতে নিয়ে উঠে পড়েছেন। থলিটাকে তুলে ধরে বললেন, 'তোরাই বল্, কার বাবার সাধ্যি বুঝবে এই থলির মধ্যে আবার সাত রাজার ধন থাকতে পারে! আর ভয়ের কথা মনেও আনিস না, চল্লিশ বছর আগে, কুকুর দুটো মরে গেছে, কিন্তু ভয়টা আমাদের তখন থেকেই ঘুচে গেছে। তবে শরীরটা আজকাল বড় সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, এই যা। কুকুর দুটোর জন্য মাঝে মাঝে বড় মন-কেমন করে।'

মাসিমা চটি পায়ে দিয়ে বিদায় নেন, দিদিমণিরাও নিজেদের মধ্যে গয়নার বিষয় বলাবলি করতে উঠে পড়েন।

এতক্ষণ পরে বনমালী টেবিল লাগায়। তার মন ভাল নেই। ভয়ে প্রাণ উড়ে যাবার যোগাড়। রান্নাঘরে ন্যাপা নেই। খাবারদাবারগুলো উনুনের পাশে গাদাগাদি করে গরমে রাখা।

কোনমতে সে সব টেবিলে পৌঁছে দিয়ে, বনমালী উমাদিদিকে বলল, 'আর আমি পারছি না দিদি, বড্ড শরীর খারাপ লাগছে।' বলে ঊর্ধ্বশ্বাসে খিড়কিদোরের দিকে ছুটল।

বেশি দূরে যেতে হল না। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ন্যাপা এসে গায়ের উপর আছড়িয়ে পড়ল। সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে, মুখে গলায় রক্তের ছোপ, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। ধড়াস করে খিড়কি-দোর বন্ধ করে বনমালী বলল, 'ন্যাপা, আবার কী সর্বনাশ করে এলি রে, বল্ শিগগির?'

দেয়ালে ভর দিয়ে বিবর্ণ মুখে ন্যাপা বলল, 'মাইরি বলছি, কারও অনিষ্ট করিনি। আমার পিছন পিছন কাউকে আসতে দেখলে দাদা?'

'কই, না তো, কে আবার আসবে?'

রান্নাঘরের রকের উপর বসে পড়ে ন্যাপা বলল, 'কী জানি! মনে ভাবলাম ওর গোটা দুত্তিন হাতিয়ে নিলেই আমাদের এ-জন্মের ভাবনা-চিন্তা ঘুচে যাবে। মোড়ের মাথায় গিয়ে ওই অন্ধকার জায়গাটায় লুকিয়ে থাকি, উনি পার হয়ে গেলে পর, পিছন থেকে মাথায় এক বাড়ি দিয়ে—অমন করে তাকাচ্ছ কেন, কাউকে কোনদিন প্রাণে মেরেছি বলতে পার? মারিনি, কিছু করিনি। উনিও পার হয়ে গেছেন, আমিও যেই লাঠি তুলেছি, অমনি কোথা থেকে সে যে কী বিকট দুটো কুকুর এসে

আমাকে আক্রমণ করল সে আর কী বলব দাদা ! এই প্রকাণ্ড কালো পোড়া হাঁড়ির মত মুখ, বুকের উপর বাঘের মত থাবা তুলে লাফিয়ে উঠে পট-পট করে জামার সব কটা বোতাম দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিল গো ! অন্যটা দেখতে কী সুন্দর, লাল লাল লম্বা লম্বা লোম, আগুনের ভাঁটার মত চোখ করে আমার গলাটা ছিঁড়ে নিতে চেষ্টা করছিল। ওইখানেই লাঠি ফেলে দিয়ে কোনরকমে পালিয়ে বেঁচেছি। উঃ ! কোত্থেকে যে এল বুঝলাম না। তারপর দৌড়তে দৌড়তে একবার ফিরে দেখি ওনার সঙ্গে সঙ্গে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ঘরের দাওয়ায় গিয়ে উঠল। আশ্চর্যের বিষয়, এত কাণ্ড ঘটে গেল, বুড়ি একবার ফিরেও দেখল না।

বনমালীর হাত-পা কাঁপছিল, মুখে কথা সরল না। কোন মতে ন্যাপাকে ধরে তুলল, 'ন্যাপা, প্রতিজ্ঞা কর্, অমন কাজ আর করবি নে। কী বাঁচা বেঁচেছিস রে ন্যাপা ! জানিস্, আমি নিজের কানে শুনলাম মাসিমা বলছেন, ওই কুকুর দুটো ওনাদের বড় আদরের ছিল, চল্লিশ বছর হল মরে গেছে। ও কি, ও ন্যাপা, আবার বসে পড়লি যে !'

মরণের পরেও

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মৃত্যু-পথযাত্রিনীকে কে আর কটু কথা বলতে চায় ? তবু যে অমরেশের মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে গেল, সে অনেক দুঃখেই।

আজ ছ'মাস শুয়ে আছে সুহাসিনী, কঠিন রোগ—কিন্তু তাতেও কি স্বভাবের এতটুকু পরিবর্তন হয়েছে ? বিয়ের পর এই দীর্ঘ আটটা বছর অমরেশের কেটেছে যেন একটানা একটা দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে। একটু বেশি বয়সেই বিয়ে করেছিল অমরেশ, সে বয়সে রোম্যান্সের লোভে মানুষ ততটা বিয়ে করে না, যতটা করে গৃহে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং একটু সেবার লোভে। তবু ফুলশয্যার রাত্রে নবোঢ়া বধূর সঙ্গে প্রথম পরিচয়—মন কিছু স্বপ্ন দেখেছিল বৈকি! কিন্তু সে স্বপ্ন ভাঙতেও বেশি দেরি হয়নি। সামান্য দু'একটা কথার পরই—অপরিচয়ের অন্তরাল দূর হওয়ামাত্র সুহাসিনী জানতে চেয়েছিল যে বিবাহের আগে অমরেশ কী পরিমাণ প্রেম করে বেড়িয়েছিল, আর কতগুলি মেয়ের সঙ্গে।

সেই সূত্রপাত—কিন্তু শেষ নয়।

প্রশ্নটার উত্তর পেয়ে সুহাসিনীর তৃপ্তি হয়নি—অর্থাৎ সংশয় যায়নি। অমরেশও ডাগর মেয়ে বিয়ে করেছিল—এ প্রশ্ন, এ সংশয় তার মনেও জাগতে পারে, সে কথাটা কিন্তু সুহাসিনী একবারও ভাবেনি। যেন তা অসম্ভব, সুহাসিনী সমস্ত সংশয়ের ঊর্ধ্বে—সিজারের পত্নীর মত। অথচ তারপর থেকে একদিনও অমরেশকে সে শান্তি দেয়নি। 'ওদিকে চেয়েছিলে কেন, ওদের বাড়ির সেই ধিঙ্গি অসভ্য মেয়েটা বুঝি জানলায় ছিল ?...অতই বা ঠাকুরঝির বাড়ি যাওয়া কেন ? ওর ননদ বুড়ীকে দেখে বুঝি আর আশ মেটে না ?...এতক্ষণ কোথায় ছিলে ? অফিসে তো তোমাদের ছুটি হয় পাঁচটায়—তুমি নটা পর্যন্ত অফিসে ছিলে ? কাকে বোকা বোঝাও বল তো ? আমি যেন কিছু বুঝি না !...আজ আবার এত দেরি কেন ? আজ তো অফিস নেই ? বায়স্কোপে গিয়েছিলে ? তা তো যাবেই। আমাকে নিয়ে যেতেই তোমার সময় নষ্ট হয় !...কী বললে ? বন্ধুরা জোর করে ধরে নিয়ে

গিয়েছিল ? কে বন্ধু ? সমর সেন নিশ্চয় ? বেবিটা সঙ্গে ছিল তো ? আর বলতে হবে না। সেইজন্যে এত দেরি। সাড়ে আটটায় শো ভাঙে, বাড়ি ফিরলে রাত সাড়ে নটায়। তারপর ? কতগুলি টাকা বেবির পিছনে খরচ হল ?...বাজারে গিয়েছ সেই কখন ? একঘন্টা ধরে বাজার ? না অমনি যাবার পথে আরতিদের বাড়ি চা খেয়ে যাওয়া হল ?' ইত্যাদি। সহস্র প্রশ্নের মধ্যে কয়েকটি তুলে দেওয়া হল। বেশি বলার প্রয়োজন নেই—পাঠকদের অনেকেরই এসব প্রশ্নের সঙ্গে পরিচয় আছে, নিজের 'মনের মাধুরী' মিশায়ে বাকিগুলো তৈরি করে নেবেন।

তবে শুধু যদি প্রশ্ন হত তো অত ভাববার ছিল না। ঝি চার মাসের বেশি রাখবার উপায় নেই। যেমন করেই হোক তাকে তাড়াবে সুহাসিনী। তা কে জানে যুবতী, কে জানে প্রৌঢ়া। ঘরের জানলা খোলা প্রায় বন্ধ করতে হয়েছিল, সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল—এই ভেবে। আর প্রতিবাদ করা বৃথা—মান-অভিমান কান্নাকাটি উপবাস—এসব অস্ত্র সুহাসিনীর তৃণে যেন যোগানো। সুতরাং সব আশাই অমরেশ বিসর্জন দিয়েছিল। অশান্তির ভয়ে তার মানসিক অবস্থা এমন হয়েছিল যে বাস করবার মত একটা কুয়া পেলেও সে বেঁচে যেত !

তারপর এই অসুখ : এ আরও অসহ্য। কোন কাজ নেই, শুয়ে শুয়ে শুধু স্বামীকে সন্দেহ করা ছাড়া। সেবা করার জন্যে যে কোন আত্মীয়াকেই আনায়, তার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসে সুহাসিনী। পথ্য না খাওয়া, ওযুধ না খাওয়া—এ তো অমোঘ অস্ত্র। শুধু পাগল হয়ে যেতে বাকি ছিল অমরেশের। ইদানীং সে সমস্ত মনে-প্রাণে প্রতীক্ষা করত স্ত্রীর মৃত্যুর—যদিও প্রার্থনা করতে তার সংস্কারে বাধত। মনের কাছে সে কিছুতেই স্বীকার করতে চাইত না যে সে স্ত্রীর মৃত্যুই চাইছে।

সবচেয়ে মজা এই—ওর এ মনোভাব সুহাসিনীও জানত। প্রায়ই বলত, 'ওগো আর দেরি নেই—আমি মলে যে তোমার শান্তি হয় তা আমিও জানি। আর ক'টা দিন ? হয়ে এল। এতদিন পারলে আর ক'টা দিন ধৈর্য ধরে থাকো... আমার শেষ হয়ে এসেছে—'

আবার পরক্ষণেই হয়তো বলত, 'আমার তো হয়ে এসেছে। যাই—তারপর যত খুশি মজা লুটো। তখন তো আর বলতে আসব না। এই ক'টা দিন আর সহ্য হচ্ছে না। এত তাড়া !' সেদিনও কথাটা উঠেছিল এই প্রসঙ্গেই। কেউ নেই সেবা করার, অমরেশেরও আর অফিস কামাই করা সম্ভব নয়—সে প্রস্তাব করেছিল একটা নার্স রাখার। সুহাসিনী যেন জ্বলে উঠেছিল একেবারে—'হ্যাঁ—তার কম আর নেশা জমবে কেন। আমি এ ঘরে পড়ে পড়ে শুষব আর উনি পাশের ঘরে নার্সকে নিয়ে ফুর্তি করবেন !...আর হয়তো বড় জোর মাসখানেক আছি, তাও তোমার সহ্য হচ্ছে না ? দগ্ধে দগ্ধে না মারলে আর চলছে না বুঝি ? উঃ, কী পিশাচ তুমি, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে একটু মায়া হয় না ?...মরবার পর যা করবে তুমি তা তো বুঝতেই পারছি—শেষ ক'টা দিন একটু শান্তিতে থাকতে দাও !'

এতটা বলার পরিশ্রমেই তার শ্বাস আটকে আসছিল। কোনমতে দম নিয়ে বলেছিল, 'তবে তাও বলে রাখছি, মনে করো না যে আমি মরে তোমাকে অব্যাহতি দেব। সারা জীবন জ্বালিয়েছ, মরে তার শোধ তুলব। আবার জন্মাব, তোমার কাছে-কাছেই জন্মাব—ছায়ার মত লেগে থাকব সঙ্গে—যা খুশি তাই করবে, তা করতে দেব না কিছুতেই !'

অতখানি স্বার্থত্যাগের পর এতটা অকৃতজ্ঞতা পেলে কার মাথার ঠিক থাকে ? অমরেশও সামলাতে পারেনি—বলে ফেলেছিল, 'মরবার পর যদি জন্মাও তো মানুষ হয়ে আর জন্মাবে না—এটা ঠিক। কুকুর বেড়াল হয়েই জন্মাবে। কিংবা যে খল তুমি, সাপ হওয়াই বেশি সম্ভব !'

অদ্ভুত একটা দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে সুহাসিনী বলেছিল, 'বেশ তো, তাই না হয় জন্মাব। কিন্তু তাতেই কি রেহাই পাবে ভেবেছ ? দেখে নিও !'

কিন্তু এসব তো কথার কথা। মনে করে রাখবার কথাও নয়, কেউ মনে রাখেওনি।

কথাটা বলার দিন-আষ্টেকের মধ্যেই সুহাসিনীর মৃত্যু হয়েছিল। স্বস্তির নিশ্বাস, মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল অমরেশ ঠিকই—তবু একটু দুঃখও হয়েছিল স্ত্রীর জন্য। বেচারী !...ও-ই কি অশান্তি কম পেলে ! চির-জীবন যে ঈর্ষার আগুন অমরেশকে ঘিরে ছিল তা কি ওকেও দগ্ধ করেনি ? জীবনে শান্তি যে কেমন তা তো অনুভবই করতে পারলে না কখনও। আর এই অসময়ে—যে স্বামীকে সে

এক দণ্ডও চোখের আড়ালে রেখে স্বস্তি পেত না—তাকেই চিরকালের মত ত্যাগ করে চলে যেতে হল !

আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবরা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার বিয়ের প্রস্তাবটা এনেছিলেন। সত্যিই—এমন কিছু বয়স হয়নি। চল্লিশ-একচল্লিশ বছরে আজকাল অনেকেই প্রথম বিয়ে করে। ঘরেও তো লোক চাই একটা—শুধু চাকর-বাকরের ভরসায় কিছু এখন থেকে থাকা যায় না। বলতে গেলে সারা জীবনটাই তো পড়ে রইল !

কিন্তু অমরেশ কারুর কোন কথাই শোনেনি। বাবা, আবার ! অনেক কষ্টে রেহাই পেয়েছে সে—মুক্তির আনন্দে সে যেন পাগল হয়ে উঠেছে। শুধু যখন খুশি এবং যত খুশি বাইরে ঘোরা, আর যত রাত্রে ইচ্ছা বাড়ি ফেরার মধ্যে যে এত আনন্দ আছে, কে জানত ! একবারেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে তার—আর দরকার নেই, ধন্যবাদ ! খাওয়া-দাওয়া ? তার জন্য হোটেল আছে। অসুখ-বিসুখ ? হাসপাতালের অভাব কি ? না হয় পেভ্‌মেন্ট তো কেউ ঘোচায়নি ? মরবার পরের কথা সে ভাবে না—যেখানে মরবে তারাই গন্ধ হবার ভয়ে যেমন করে হোক লাশ সরাবার ব্যবস্থা করবে।

তবে এ তো প্রথম আনন্দের উন্মত্ততা ! এ কেউ বিশ্বাস করেনি। শুধু এইটে বুঝেছিল যে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করেত হবে।

বছর খানেক পরে পূজার সময় বেশি ছুটি নিয়ে রাজগীরে গেল অমরেশ। সেখানে ঠিক ওর পাশের বাংলোতে যিনি ভাড়া ছিলেন সেই শুভ্রাংশুবাবুর সঙ্গে হঠাৎ খুব ভাব জমে গেল। ওরা একসঙ্গে কুণ্ডে স্নান করতে যায়—অত ভোরে এবং অত রাত্রে আর কেউ যেতে চায় না। দুজনের রুচির সঙ্গে দুজনের মিল হওয়াতে ক্রমে অন্তরঙ্গতা বেড়ে গেল। শুভ্রাংশুবাবুর চব্বিশ পঁচিশ বছরের অনূঢ়া ভগ্নীটির সঙ্গেও পরিচয় হতে যে বিলম্ব হল না তা বলাই বাহুল্য। এবং সেই ভগ্নীটি, রুচিরা তার নাম—শিগগিরই আবিষ্কার করল যে একটি বাচ্চা চাকরের ওপর অমরেশের গৃহস্থালীর ভার। সে রান্না করে অখাদ্য, চা করে জলের মত এবং কোন কাজটাই ভাল করে করতে পারে না।

ফলে প্রত্যহই একটা দুটো ব্যঞ্জন ও-বাংলো থেকে এ-বাংলোতে এসে পৌঁছতে লাগল। সকালে দুপুরে বিকেলে এবং সন্ধ্যায়—চায়ের কাপ নিয়ে রুচিরা নিজেই আসত। একদিন দুদিন ছাড়া ও-বাংলোতেই আহারের নিমন্ত্রণ হতে লাগল এবং কয়েকদিন পর থেকেই অমরেশ দেখল যে, ওর ঘরকন্না ও শয্যার বিশৃঙ্খলা ঘুচে গেছে। কে যেন ওর অনুপস্থিতিতে এসে তার মায়া-হস্ত বুলিয়ে সব কিছু সুন্দর করে গুছিয়ে রেখে যায়।

ঋষিরা একেই বোধ হয় মহামায়ার ফাঁদ বলেছেন। অমরেশের অত তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সে আবার রুচিরাকে নিয়ে গৃহস্থালী পাতবার কথাটা ভাবতে লাগল। সুবিধাও হয়ে গেল খানিকটা। কথাটা ওপক্ষ থেকেই প্রথম উঠল। শুভ্রাংশু একদিন বলেই ফেলল কথাটা, 'এমন করে আর কতদিন চলবে অমরেশবাবু, আর একবার সংসার পাতুন। দেখুন, বলেন তো—আমরা তো আপনাদেরই পাল্‌টি ঘর, রুচিরাও কিছু খারাপ মেয়ে নয়। লেখাপড়াও কিছু জানে, গৃহস্থালীর কাজ—যেটা আপনার বেশি দরকার, সেটার সার্টিফিকেট ওকে বোধ হয় আপনিই দিতে পারবেন—'

অমরেশ আর না বলতে পারলে না। বলল, 'সে আপনি ভেবে দেখুন। আগে আপনার ভগ্নীর মত নিন—আমার মত প্রৌঢ়কে—অবশ্যি একটা বাড়িও আছে কলকাতায়, মোটা মাইনের চাকরিও করি—তবু আমাকে ওর পছন্দ হবে কি ?'

'বিলক্ষণ ' ওই কি আর কচি খুকি ?'

কথাটা রাত্রে কুণ্ড থেকে ফেরবার পথে হয়েছিল। অন্ধকার নির্জন রাস্তা তার মনে মোহ বিস্তার করেছিল রুচিরার চিন্তাকে ঘিরে। অমরেশ লঘু মনেই বাসায় ফিরল। ঘরে ফিরে দেখলে শয্যাটি পরিপাটি সাজানো। কাপড়-জামা গুছিয়ে কিছু বাক্সয়, কিছু আনলায় তোলা হয়েছে। আলোটি পরিষ্কার ঝকঝক করছে। তৃপ্তি ও কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল। তিক্ত অভিজ্ঞতার আশঙ্কা চলে গেল বহুদূরে। রাত্রে খাওয়ার আগে ও-বাড়ি থেকে মাংস এবং মিষ্টান্ন এসে পৌঁছাতে আরও ভাল লাগল। এমনি জীবন-সঙ্গিনীই তো মানুষের কাম্য—অমরেশও তো তাই চেয়েছিল।

খেতে বসে সবে এক গাল মাত্র রুটি মাংসের ঝোলে ডুবিয়ে মুখে পুরেছে অমরেশ—তার স্বাদ ও গন্ধ সমস্ত অনুভূতিকে অধিকতর লালায়িত করে তুলেছে মাত্র, এমন সময়ে অকস্মাৎ একটা প্রকাণ্ড বন-বেড়াল ও-পাশের জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ল, একেবারে মাংসর বাটিটার ওপর। বাটিটা উল্টে মাংসও যেমন পড়ে গেল, আবার লাফিয়ে ফেরবার পথে মিষ্টান্নের প্লেট্‌টাও ভেঙে খানখান হয়ে গেল ওর পায়ের আঘাতে।

হৈ-হৈ করে উঠল ওর চাকর রাজু, অমরেশ নিজেও। কিন্তু ততক্ষণে অনিষ্ট যা হবার তা হয়েই গেছে। চোখের নিমেষে যেন ঘটে গেল ঘটনাটা। রুচিরা আর তার বৌদিও ছুটে এল ও-বাড়ি থেকে। অমরেশের কোন নিষেধ না শুনে ওরা নতুন করে খাবার এনে দিল—ব্যাপারটা তখনকার মত মিটেই গেল। রাজু বলল, 'বাপ রে, বেড়ালটা যেন বাঘের মত, দেখেছেন বাবু? দেখলে ভয় করে।'

রুচিরা বললে, 'আজ ক'দিনই দেখছি আমাদের বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরছে। অবশ্য আমাদের অনেক লোক থাকে বলে ঘরে ঢুকতে সাহস পায়নি। কী সাহস দেখেছেন? পাত থেকে খেতে চায়—বেড়ালের এমন সাহস তো কখনও দেখিনি!'

রাত্রে শুয়ে কথাটা ভাবতে ভাবতেই অমরেশ ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ কী একটা শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গেল। কৃষ্ণপক্ষের শেষ রাত্রির জ্যোৎস্না ঘরে এসে পড়েছে, তার অস্পষ্ট আলোতে অমরেশ দেখল সেই বেড়ালটা ওরই বিছানায় এসে বসেছে এবং ওর দিকে চেয়ে গলায় অদ্ভুত একটা শব্দ করে গর্জন করছে। ঝগড়া করার সময় যেমন শব্দ বার হয় ওদের গলায়—তেমনি।

দৃশ্যটা এমন অচিন্তিতপূর্ব, এমন অবাস্তব যে দেখামাত্র ভয়ে চিৎকার করে উঠল অমরেশ। সেই চিৎকারেই বোধ হয় ভয় পেয়ে বেড়ালটা পালাল। রাজু ঘুম ভেঙে লাফিয়ে উঠল, 'কী—কী বাবু, কী হয়েছে?'

কিন্তু সে উত্তর অমরেশকে আর দিতে হল না—তার আগেই পাশের বাড়িতে নারী কণ্ঠের একটা আর্ত চিৎকার! এরা ছুটে গিয়ে শুনলে, সেই বেড়ালটাই ঘুমের মধ্যে রুচিরাকে আঁচড়ে দিয়ে গেছে।

কোন্ এক মৃত্যু-পথযাত্রিনীর অদ্ভুত অন্তিম দৃষ্টি ভেসে উঠল অমরেশের মানসপটে। কপাল ঘামে ভরে গেল। হাত দিয়ে সে ঘাম মুছতে গিয়ে দেখল হাত কাঁপছে থরথর করে।

অমরেশ আর একদিনও রাজগীরে রইল না। শুভ্রাংশুকে জানাল, জরুরী কাজ পড়েছে একটা—টেলিগ্রাম এসেছে। ওকে যেতেই হবে। এই সকাল এগারোটার গাড়িতেই।

শুভ্রাংশু ব্যাকুল হয়ে বললে, 'কিন্তু এমন অকস্মাৎ—এমনভাবে—অনেক কথা রয়ে গেল যে অমরেশবাবু। এধারের—'

'গিয়েই চিঠি দেব আপনাকে। বিচলিত হবেন না। আবার হয়তো ঘুরে আসতে পারি। কিন্তু আজ আমার মন বড় বিক্ষিপ্ত। আজ আর কিছু বলতে পারছি না। মাপ করবেন।'

শুভ্রাংশু আর কিছু বলল না। শুধু তার স্ত্রী বললে, 'আচ্ছা, টেলিগ্রাম এল কখন? ভদ্রলোক বেড়ালের ভয়েই পালাচ্ছেন নাকি?'

রুচিরা রাগ করে বলল, 'বৌদি যেন কি! আমরা কি সবাই পথের দিকে চেয়ে বসে আছি যে কখন কার টেলিগ্রাম আসছে খবর রাখব?'

বৌদি মুখ টিপে হেসে বললেন, 'তা বটে ভাই—আমারই অন্যায় হয়েছে।'

ট্রেন যায় একেবারে ওদের বাংলোর সামনে দিয়ে। অমরেশ খুব নিরুৎসাহ বিষণ্ণমুখে রুমাল নাড়ল, রুচিরার ছল-ছল চোখ দূর থেকেও ওর দৃষ্টি এড়ায়নি। ট্রেনখানা চলে যেতে অপাঙ্গে ভগ্নীর মুখের দিকে চেয়ে শুভ্রাংশু বলল, 'নাও, এ আবার এক ফ্যাসাদ বাধল দেখছি!'

কিন্তু কলকাতায় ফিরল না অমরেশ। গভীর রাত্রেই মধুপুরে নেমে পড়ল। কালীপুর টাউনে ওর এক বন্ধুর বাড়ি আছে। বহুবার অমরেশ এসে থেকে গেছে, মালী ওকে ভাল করেই চেনে—থাকবার অসুবিধা হবে না।

তাই বলে অত রাত্রে তো আর সেখানে যাওয়া যায় না। অবশিষ্ট রাতটুকু এখানেই কাটাতে

হবে।

প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে মালগুলো জড়ো করে রেখে তাইতে ঠেস্ দিয়ে রাজু ঘুমোতে লাগল, অমরেশের চোখে কিন্তু ঘুম এল না। সে সেই নিস্তব্ধ প্ল্যাটফর্মেই পায়চারি করতে লাগল।

কত ট্রেন এল, কত ট্রেন গেল। যখন ট্রেন আসে যাত্রীদের গোলমাল, কুলীদের বিবাদ, ভেণ্ডারদের উচ্চকণ্ঠ—সবটা মিলে যে কোলাহল হয়, স্টেশনে যে প্রাণলক্ষণ জাগে তাতে খানিকটা অন্যমনস্ক হয় অমরেশ, আবার স্টেশনের আলো স্তিমিত হয়ে আসে এক সময়ে—কোলাহল যায় স্তব্ধ হয়ে, ওব মনও ফিরে আসে নিজের দুর্ভাগ্যে।

কথাটা ভাবছে অমরেশ। সারাদিন ধরেই ভাবছে।

এ কী হল ওর! শুধু কি ওর ভাগ্যেই যত অঘটন ঘটে। আট বৎসরের বিবাহিত জীবনে একদিনের জন্যও শান্তি দেয়নি সুহাসিনী, মরবার পরও নিষ্কৃতি দেবে না? এ কী বিদ্বেষ তার, কী অসম্ভব ঈর্ষা!

কিন্তু পূর্ব দিগন্তে উষার স্বর্ণাভাস জাগার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মনের মধ্যে আশ্বাস পায় একটা। চিন্তাটা সেই শেষ রাত্রিতে প্রথম মাথায় এসেছিল—আর ওকে ত্যাগ করেনি। এতক্ষণ ধরে যা কিছু ভেবেছে, চিন্তাটাকে মনে মনে মেনে নিয়েই ভেবেছে। কিন্তু এখন এই প্রত্যূষে একটা সংশয়ও ক্রমে দেখা দিল—সবটাই কাকতালীয় নয় তো? ওটা হয়তো সাধারণ বেড়াল একটা, বুনো বেড়াল। অমবেশেব উত্তপ্ত কল্পনাই তাকে সুহাসিনীব স্মৃতির সঙ্গে জড়িত করেছে!

না—কাজটা অন্যায় হয়ে গেছে।

সামান্য একটা বুনো বেড়ালের ভয়ে চলে এল সে। এই আধুনিক যুগের সভ্য মানুষ!

পায়চারি থামিয়ে জোর করে যেন নিজের মনে বল আনে অমরেশ। রাজুকে ডাকে, 'এই রাজু ওঠ্, দ্যাখ দিকি, একটা একা কিংবা রিক্সা! চল্ এবার বাড়ি যাই!'

কালীপুর টাউনে যখন পৌঁছল, তখন বেশ ফরসা হয়ে গেছে। মালী ওকে দেখে খুশি হয়েই সেলাম করলে, ফটক খুলে তাড়াতাড়ি মালটালগুলো নামিয়ে নিলে।

'বাবু সেই ঘরে থাকবেন তো? পুবদিকের ঘরটায়? ওইটে তো আপনার ভারি পছন্দ!'

'হ্যাঁ, বাপু, ওই ঘবটাই আমাকে খুলে দাও।'

বাগানে শিউলি ফুল ফুটে আছে অজস্র। তার সঙ্গে এখনও জড়িয়ে আছে অসংখ্য রজনীগন্ধার সুবাসের স্মৃতি। হিমেল ভোরাই হাওয়ার সঙ্গে সেই মিষ্টি গন্ধ মিশে রাত্রি-জাগরণ ক্লান্ত চিন্তাক্লিষ্ট অমরেশের সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল।

'আঃ।' আপনাব মনেই বলে উঠল ও।

মালী কোমর থেকে চাবির গোছাটা হাতে করে এগিয়ে যায় দোর খুলতে। পিছনেই অমবেশ, তার পিছনে বিছানা ও সুটকেশ নিয়ে রাজু। ঘরটা বন্ধ আছে...দোর জানলা সব বন্ধ। বোধহয় দীর্ঘকাল ধরেই বন্ধ রয়েছে এমনি, দোর জানলা খুলে দেবার পর খানিকটা বাইরের বাতাস ঢোকবার আগে আর ওর মধ্যে যাওয়া যাবে না...মনে মনে ভাবে অমরেশ। কিন্তু হঠাৎ ওর চমক ভেঙে যায় মালীর আতঙ্ক-কন্টকিত অস্ফুট আর্তনাদে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে প্রশ্ন করে, 'কী হল শিউভরোসা?'

সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে আসে খানিকটা।

ও কি?

ওরও গলা থেকে একটা আর্তস্বর বেরোয়। ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড কালো কুকুর...ঈষৎ শীর্ণ হয়তো, জিভ বার করে হাঁপাচ্ছে এবং কেমন এক রকম জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে ওদের দিকে চেয়ে আছে!

খানিকটা চেয়ে থাকার পর ওদের পাশ কাটিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল কুকুরটা।

মালীর চোখ দুটো বিস্ফারিত, ভয়ে হাত-পা কাঁপছে!

'কোথা থেকে এল বাবু কুকুরটা? দোর-জানলা সব বন্ধ!'

অমরেশেরও বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে এসেছিল। কিন্তু তবু সে কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বলল, ওই যে—নর্দমা।'

খোলা নর্দমা একটা আছে ঠিকই—তবে তার মধ্যে দিয়ে অতবড় কুকুর আসা কি সম্ভব? মালী সংশয় প্রকাশ করে।

'কবে খুলেছিলে ঘরটা শেষ ? সেই সময় হয়তো ঢুকে বসেছিল।'

'খুলেছিলুম ? সে তো মাসখানেক আগে। তবে হ্যাঁ—পরশু দু'খানা কাগজের দরকার হয়েছিল তাই একবার খুলেছিলুম। ওই যে তাকের ওপর পুরোন খবরের কাগজগুলো আছে, সেই আপনি যখন ছিলেন সেই সময় থেকে কাগজগুলো পড়ে আছে ওখানে। কিন্তু সে তো এক মিনিট বাবু !'

'সেই সময়ই কখন ঢুকে পড়েছে হয়তো, আর বেরোতে পারেনি।'

'কিংবা নর্দমা দিয়েই ঢুকেছে। ঢোকে ওরা এক রকম করে—বেরোতে পারে না আর।' বিজ্ঞভাবে বলে রাজু।

দুপুরে ক্লান্ত চোখ বুজে আসে, তবু ভাল করে ঘুম হয় না। রুচিরার ছলছল দুটি চোখের স্মৃতি, তার সঙ্গে আলো-আঁধারিতে একটা বন-বেড়ালের প্রকাণ্ড রুষ্ট মুখ, সুহাসিনীর ঈর্ষাকুটিল ভ্রূ-ভঙ্গি—সবটা যেন স্বপ্নের মধ্যেও তালগোল পাকায়।

অবশেষে বিকেলবেলা বাগানে বসে চা খেতে খেতে মন স্থির করে ফেলে অমরেশ।

ভাগ্যের সঙ্গে লড়েই দেখবে সে। সে তো কোন পাপ করেনি কোনদিন, তবে এ শাস্তি কেন তার ? কেন সহ্য করবে সে এ পীড়ন ? বিনা দোষে চরম কোন দণ্ড নিশ্চয়ই বিধাতা তাকে দেবেন না !

সে তখনই বসে শুভ্রাংশুকে একটা চিঠি লিখে দিলে, যদি কোন আপত্তি না থাকে, এবং রুচিরার মত হয় তো—এ বিবাহ সে সৌভাগ্য বলেই মনে করবে। আগামী অগ্রহায়ণেই তাহলে হতে পারবে শুভ কাজ। এখন এই কার্তিক মাসের কটা দিন অমরেশ মধুপুরে থাকবে। কলকাতার ঠিকানাও লিখে দিলে সে।

চিঠিখানা খামে এঁটে রাজুকে স্টেশনে পাঠিয়ে দিলে ওখানের ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসতে। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে একখানা বিলিতি নভেলে মন দিলে।

দিন তিনেক পরেই শুভ্রাংশুর চিঠি এল।

'আপনার পত্র পেয়ে সত্যি খুশি হলুম, কিন্তু এধারে এক বিভ্রাট। রাজগীরে থাকা আর হল না। কাল সন্ধেবেলা বেড়িয়ে ফিরছি, হঠাৎ অন্ধকারে রুচিরা বোধহয় ঘুমন্ত একটা কুকুরের গায়ে পা দেয়। সে উঠেই ওকে কামড়ে দিয়েছে। এখানে তো একটিই মাত্র ডাক্তার, তিনি অবশ্য যা করবার সবই করেছেন কিন্তু তবু মনে হয় কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ইঞ্জেকশন্‌গুলো সেরে ফেলাই ভালো। কারণ কুকুরটার আর কোন হদিস পাইনি। ক্ষ্যাপা কিনা কে জানে ? মনে করছি কাল এখান থেকে বাস এ গিয়ে টুয়েল্‌ভ্ ডাউন ধরব। কলকাতায় গিয়ে দেখা হবে। আপনি কবে আসবেন ?'

দৃষ্টি কঠিন হয়ে এল অমরেশের। ভয় হচ্ছে ঠিকই—অজ্ঞাত একটা আতঙ্ক। মনে হচ্ছে যে তার এই দুর্ভাগ্যের সঙ্গে রুচিরাকে জড়ানো হয়তো ঠিক হচ্ছে না। বিনা দোষে তার যদি কোন ক্ষতি হয়—সত্যি-সত্যিই ? আবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হচ্ছে সে-ও তো বিনা দোষেই সইছে এত নির্যাতন। তবে সে কেন রুচিরার জন্য চিন্তা করবে ? স্বার্থপরই হবে সে। এত দুঃখের পর এতখানি সৌভাগ্যের সুযোগ যদি বা এসেছে হাতের কাছে এগিয়ে—কোনমতেই তাকে সে ছাড়বে না। প্রাণ পণ করেই লড়বে অদৃষ্টের সঙ্গে—প্রয়োজন হলে প্রাণ রাখবে তার এবং রুচিরার—দুজনেরই প্রাণ। ক্ষতি কি ?

গভীর রাত্রে টুয়েল্‌ভ্ ডাউন মধুপুরে এল। তবু ওদের খুঁজে বার করতে কষ্ট হল না। কোন অজ্ঞাত কারণে রুচিরার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল এখানে এসেই—মুখ বাড়িয়ে সে অন্ধকার মধুপুর শহরের দিকে চেয়েছিল।

অমরেশ আসাতে বাকি সকলেও জেগে উঠল। বৌদি হেসে বললেন, 'এত রাত্রে স্টেশনে এসেছেন ঠাকুরঝিকে দেখতে ! একেই বলে টান।'

অপ্রতিভ হয়ে অমরেশ কতকগুলো জবাবদিহি করতে গেল...ফলে আরও অপ্রস্তুত হতে হল। রুচিরাও হয়ে উঠল লাল। তবে সকলেই যে খুশি হল তাতে সন্দেহ নেই।

শুভ্রাংশু বললে, 'উঠে পড়ুন না—একসঙ্গেই যাওয়া যাক।'

'না—না, মালপত্র রয়েছে—তাছাড়া বাচ্চা চাকর, ভয় পাবে।'

গাড়ি চলে গেল। ছাড়ার আগে ওর ভেতরেই এক ফাঁকে রুচিরা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, অমরেশ সেই দুর্লভ হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে ধরে চাপ দিয়েছে একটু। মনটা ভারি খুশি আছে। শিস দিতে দিতে ফিরল অমরেশ।

রিক্সা থেকে নেমে মালীকে ডাকতেই সে দোর খুলে দিল। রাজুকে ডেকে দিলে সে-ই। বালতিতে জল রাখা ছিল, বেশ করে হাত-পা ধুয়ে মুখে ঘাড়ে জল দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল অমরেশ। রাজু আবার ঘুমিয়ে পড়েছে, হ্যারিকেন জ্বলছে মিটমিট করে—খুব কমানো, তাতে আলোর একটা আভাস মাত্র পাওয়া যায়। রাজুর জন্যই এ আলোটা সারারাত জ্বলে, ওরও কেমন একটা ভয় হয়েছে, একেবারে অন্ধকারে মেঝেতে শুতে ভরসা করে না।

মাথা মুখ তোয়ালেতে মুছতে মুছতে বিছানায় এসে বসল অমরেশ। আর মাত্র ঘণ্টা-দুই রাত আছে। এখন শুলে ঘুম আসতে আসতেই ভোর হয়ে যাবে। শোবে ? না বই পড়বে। মনটা বহুদিন পরে বড় প্রফুল্ল...খুশির একটা জোয়ার এসেছে মনে। সেজন্য ঘুমের ইচ্ছা খুব নেই। রাত্রি জাগরণের কোন অবসাদও টের পাচ্ছে না।

কথাটা ভাবতে ভাবতেই চোখটা পড়েছে ওর মাথার বালিশের দিকে।

আবছায়া আলো...তবু, তবু মনে হচ্ছে বালিশের খাঁজের ছায়াটা যেন একটু বেশি গাঢ় নয় ?

মুহূর্ত-মধ্যে সমস্ত চৈতন্য তীক্ষ্ণ, সজাগ হয়ে উঠল ওর। চমকে উঠল না, চেঁচামেচি করল না। নিঃশব্দেই ভাল করে তাকিয়ে দেখল। তারপর আলোটা বাড়িয়ে লণ্ঠনটা এনে ধরল। হ্যাঁ—ওই তো ! বালিশের খাঁজে ছায়ার সঙ্গে মিলিয়ে রয়েছে কালো রঙের সরু লিকলিকে একটি সাপ।

অসহ্য ক্রোধে অমরেশ যেন দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে উঠল নিমেষের মধ্যে। সে ক্রোধ তার অদৃষ্টের ওপর, সে ক্রোধ সুহাসিনীর ওপর—

এদিক ওদিক চাইতেই নজরে পড়ল মোটা একটা বাঁশের লাঠি কোণে ঠেসানো রয়েছে। সে আস্তে আস্তে গিয়ে সেই লাঠিটা তুলে নিল।

সাপটাও ততক্ষণে সজাগ হয়ে উঠেছে।

লাঠি নিয়ে অমরেশ কাছে আসতেই বিছানা থেকে সড়াৎ করে লাফিয়ে নিচে পড়েছে সে। নিচেই বেচারী রাজু শুয়ে আছে। কিন্তু অমরেশ কার্যক্ষেত্রে যথেষ্ট ক্ষিপ্র হতে পারে—এখনও। সে যেন বিদ্যুৎ বেগেই লাঠিটা বসিয়ে দিল সাপের মাথায়।

ছোট সরু সাপ...লাঠিটাও বেশ মোটা।

সাপের মাথাটা থেঁতলে চ্যাপটা হয়ে গেছে। মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছে সে, সমস্ত দেহটা অসহায় ভাবে বেঁকে চুরে উঠছে বারবার।

রাজু লাঠির শব্দে জেগে উঠে ওই দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠেছে। মালী এসেছে ছুটে। কিন্তু অমরেশের কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে সেই সাপটার মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখছে। চোখ ফেরাতে পারছে না...এমনি একটা অমোঘ আকর্ষণে ওর দৃষ্টি তাতে নিবদ্ধ।

আনন্দ হয়েছে ওর ? নিশ্চিন্ত হয়েছে ?

তা অমরেশও জানে না। ওর অনুভূতিও যেন জড় হয়ে গেছে। প্রথমের সেই অসহ্য ক্রোধ আর নেই, বরং এই জিঘাংসার জন্য যেন নিজের কাছেই সে লজ্জিত ; তবু তাকিয়েই আছে সে।

সাপটা ছটফট করতে করতে খানিকটা এগিয়েছে...দোরের দিকে। রাজু আর এক ঘা মারতে যাচ্ছিল...অমরেশ ইঙ্গিতে নিষেধ করল।

মুখ-হাত ধুয়ে যখন প্রথম ঘরের ভেতর পা দেয় অমরেশ, তার তখনকার সেই পায়ের সজল ছাপটা এখনও শুকোয়নি। একটু বেশি জলই ছিল বোধহয় পায়ে...পরিপূর্ণ ছাপটা যথেষ্ট জল নিয়ে স্পষ্ট হয়ে আছে মেঝের ওপর।

মরণাহত সাপটা তার পিষ্ট দলিত মুখটাকে কোনমতে যেন বহন করে এনে সেই জলের ছাপের ওপর এসে স্থির হয়ে গেল। এইবার বোধহয় মারাই গেল সে।...

হয়তো মৃত্যু-যন্ত্রণার অসহ্য তৃষ্ণাই তাকে টেনে এনেছিল এই সামান্য জল-রেখার দিকে। হয়তো সবটাই আকস্মিক যোগাযোগ মাত্র, কিন্তু অমরেশের যেন মনে হল অন্তিম মুহূর্তে সরীসৃপটা তার পদচিহ্নে পৌঁছে সমস্ত অপরাধের জন্য চরম ক্ষমা প্রার্থনা করে গেল।

কে জানে কেন, আজ সে সুহাসিনীর জন্য দুঃখবোধ করল।

বেচারী ! সে নিজেও তো কখনও শান্তি পায়নি।

সবার অলক্ষ্যে চোখের কোণ দুটো মুছে অমরেশ আবার বিছানাতে গিয়েই বসল।

'বসবেন না, বসবেন না বাবু। ভাল করে দেখে নিই আগে। আর কোথাও কিছু আছে কিনা। ...এই হিমে যখন সাপ বেরিয়েছে...'

'নাঃ—আর ভয় নেই।' অমরেশ বেশ জোর দিয়েই বলে।

এ জোর সে কোথায় পায়, কে জানে !

আসল-নকল

প্রণব রায়

মহকুমা জেলের এক নিভৃত সেলে বসে এই কাহিনী শুনেছিলাম। বলেছিল একজন দ্বীপান্তরের আসামী। তারই জীবন-কথা। লোকটার বয়স হবে বছর পঁয়ত্রিশ। শুকনো দোহারা দেহ, বেশ লম্বা, কি এক অদৃশ্য বোঝার ভারে একটু ঝুঁকে পড়া। গাঢ় তামাটে রঙের মুখের রেখায় রেখায় ঠেকে-যাওয়া আর ঠকে-যাওয়া জীবনের প্রচুর ইতিহাস লেখা।

আমি ফৌজদারী আদালতের আইনজীবি। ক্রিমিনাল কেসে নাম আছে অল্পবিস্তর। লোকটা তার জানা একজনকে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। মামলার আগে নয়, রায় বেরোবার পর। তার মামলার বিশদ খবর আমি রাখিনি, তবে শুনেছিলাম এমন বিচিত্র কেস এ মহকুমায় আর একটিও আসেনি।

মনে মনে একটু কৌতূহল ছিল, তাই জেলের মধ্যে গিয়ে দেখা করলাম। লোকটা এ তল্লাটের নয়, কি জাত তাও জানিনে। পরনে জীর্ণ কালো রঙের চুড়িদার পায়জামা আর কালো ওয়েস্ট কোট, মাথায় মুখে রুখু ঝাঁকড়া চুল আর গোঁফ-দাড়ি। হাত-পায়ের পেশীগুলো গোটা গোটা, শক্ত। সবচেয়ে অদ্ভুত তার চোখ দুটো। থেকে থেকে মশালের মত দপ করে জ্বলে উঠে নিভে যায়। আর সেই চোখে মাঝে মাঝে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, কিন্তু কিছুই দেখে না যেন। অথবা অশরীরী কিছু লক্ষ্য করে। সেই সময় লোকটার দিকে তাকালে গা ছমছম করে ওঠে।

তার সেলের সামনে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম, হাতে পায়ে ডাণ্ডাবেড়ির ঝমঝম আওয়াজ করতে করতে সে তখন ছোট্ট সেলটার মধ্যেই অশান্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জেলার বললে, তোমার ব্যারিস্টারবাবু এসেছেন।

লোকটা মশাল-জ্বালা চোখে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হেসে সহজ ভাবে বললে, ভেতরে আসুন কত্তা।

জেলার সেল খুলে দিল। ভেতরে গেলাম। লোকটা সোজাসুজি বললে, আপীল করতে চাই,

ব্যালিস্টারবাবু।

আমিও সোজাসুজি জবাব দিলাম, খুনের চার্জ তোমার বিরুদ্ধে, সাজা মুকুব হবে বলে মনে হয় না।

লোকটা একটু হেসে বললে, সাজা বদল তো হতে পারে।

মানে ?

লোকটা ব্যগ্র গলায় বললে, কালাপানির বদলে ফাঁসি তো হতে পারে। আপনি আমার ফাঁসির জন্যে আপীল করে দিন ব্যালিস্টারবাবু।

কিছুক্ষণ থ হয়ে রইলাম। এ কেমনতর মানুষ, যেচে ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে চাইছে ? কয়েদী মাত্রই একটু অপ্রকৃতিস্থ হয়ে থাকে, কিন্তু এ লোকটা আগাগোড়াই অপ্রকৃতিস্থ নাকি ? না জীবনের প্রতি সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ ?

লোকটা ঝমঝমিয়ে একেবারে আমার সামনে এসে বললে, আমি জানি কত্তা, হাকিমবা আপনার কথা শোনে। আপনি আমার হয়ে আপীল করে দিলে ঠিক ফাঁসি হয়ে যাবে।

বললাম, কালাপানি গিয়েও কত লোকে আবার ফিরে আসে। তুমি ফাঁসি চাইছ কেন ?

কেমন অসহিষ্ণু গলায় লোকটা বলে উঠল, সে তো ঢের দেরি কত্তা! সে যাবার সময় বলেছিলাম, আমিও জলদি যাচ্ছি। আমার কথার খেলাপ হয়ে যাচ্ছে হুজুর। সে ভাবছে রূপলালটা বেইমান!

তার মশাল-চোখ দপ করে জ্বলে উঠল, আর দেখতে দেখতে নিভে গেল। তারপর সেই বর্ণহীন চোখের স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দেয়ালের দিকে। যেন অশরীরী কাউকে দেখছে।

গা'টা আমার ছমছম করে উঠল। তবু বললাম, কে তোমায় বেইমান ভাবছে ? কার কথা বলছ ?

আস্তে আস্তে সহজ হয়ে এল সে। তারপর বললে, গোড়া থেকেই বলি তবে শুনুন।

সেদিন সেই অদ্ভুত কয়েদীর মুখে আরো অদ্ভুত যে কাহিনী শুনেছিলাম, সেটা অপ্রাকৃত কি অলৌকিক, না একান্তই আজগুবি, তা আপনারাই বিচার করুন। আমি শুধু রূপলালের সেই আশ্চর্য কাহিনী শুনিয়ে যাচ্ছি।

পছিয়ার মাঠে ছোট ছোট তাঁবু পড়েছে। প্রতি বছর শীতের শুরুতে নানা জায়গা থেকে বেদের দল এ গাঁয়ে এসে আস্তানা পাতে। পছিয়ার মাঠই হল তাদের ডেরা। মেলা বসে, বেদের দল বাজীর খেলা দেখায়, লোকের হাতের রেখা বিচার করে, আর বেদেনীরা রঙিন পুঁতির মালা আর কুলো-ডালা বিক্রি করে। তারপর বসন্তকাল পড়লেই মরশুমী পাখির মত সব উধাও।

পছিয়ার মাঠে এ বছর এসেছে এক আজব দল। পায়ে হেঁটে নয়, সাতটা মোষের গাড়ি বোঝাই করে। এরা সার্কাস দেখায়, তিনটে ক্লাউন মজার চেহারা নিয়ে অনবরত তামাসা করে, বাঁদর কুকুর ছাগল সাইকেল চালায়, টিয়াপাখি কথা বলে, আরো কত কি! এ দলের প্রধান আকর্ষণ যে, সে হল 'কালা যাদুগর'। অন্ধকার তাঁবুর মধ্যে শুধু একটা মোমবাতির আলোয় মুখ দেখে সে মানুষের ভবিষ্যৎ ঠিক-ঠিক বলে দিতে পারে।

ছোট ছোট তাঁবুগুলো থেকে একটু তফাতে ওই যে বড় তাঁবুটা, ওটাই সার্কাসের আসর। বেলা দুপুর গড়িয়েছে, সূর্য মাথার ওপর হেলেছে। বড় তাঁবুর সামনেটা লোকের ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। আশপাশের পাঁচখানা গাঁ থেকে লোক আসছে। পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছে যেন দিনের কুয়াশা। তাঁবুর দরজার সামনে একটা উঁচু প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে, একজন ক্লাউন মাথায় ঠোঙার মত রঙিন টুপি পরে ঝাঁঝর-করতাল হাতে চিৎকার করে ছড়া কাটছে :

এসো ভাই, দেখে যাও,
হাজার মজা লুটে নাও।
দু' আনাতে দেখবে খাসা
কেয়া মজাদার রঙ-তামাসা!
আর দু' আনা ফেললে পরে
কালা যাদুগরের ঘরে।

যাদুতে ভাই জানতে পাবে
রাজা হবে না ফকির হবে ॥

ছড়ার শেষে ঝমর ঝমর করতালের আওয়াজ।

ক্লাউনের ডান পাশে বসে আছে থলথলে চেহারার একজন আধাবয়সী লোক। সামনে ডালার ওপর ফুটো-করা একটা বাক্স। তার কাজ শুধু দর্শকদের হাত থেকে পয়সা নিয়ে সেই ফুটোর মধ্যে ফেলে দেওয়া। আর বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে আছে কালা যাদুগর। কালো সাটিনের চুড়িদার পায়জামা পরনে, গায়ে কোমর পর্যন্ত খাটো কালো ওয়েস্ট কোট, মাথায় কালো সাটিনের রুমাল বাঁধা, আর চোখে জলদস্যুদের মত চশমা-প্যাটার্ন মুখোশ। কালো পোশাকে মোড়া লম্বা দেহটা তার স্থির হয়ে আছে।

ওই আমাদের রূপলাল। পাঁচ বছর আগেকার রূপলাল। তখন তিরিশ বছরের জোয়ান। উৎসুক দৃষ্টিতে রূপলাল তাকিয়ে আছে ভিড়ের দিকে। গাঁয়ের দেহাতী লোকদের ভিড়, তাঁবুতে আগে ঢোকার জন্যে ঠেলাঠেলি করছে।

রূপলালের উৎসুক চঞ্চল দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল এক জায়গায়। হ্যাঁ, আজও এসেছে ওরা! বুড়োর হাত ধরে সেই মেয়েটি। ভিড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। আজ নিয়ে ওরা তিনদিন এল। অথচ তাঁবুর ভেতরে পা দেয়নি একদিনও। বুড়োকে দেখলে গরীব চাষী বলেই মনে হয়। মাথার চুলগুলো একেবারে সাদা। কিন্তু মেয়েটা যেন টাটকা মৌসুমী ফুল! বছর সতেরো আঠারোর বেশি বয়স হবে না। নতুন কচি পাতার মত শ্যামলা রঙ, ঢলঢলে মুখ, চুল বাঁধেনি, মেঠো হাওয়ায় বারবার মুখে এসে পড়ছে।

বুড়োটা তো তাকিয়ে আছে রূপলালের দিকেই, কিন্তু মেয়েটা কেন তাকাচ্ছে না? কেন সে অপলক চোখে একটা নিষ্পত্র বাদাম গাছের দিকে তাকিয়ে রয়েছে?

ভিড় আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে এল। বড় তাঁবুর ভেতরটা প্রায় ভর্তি, খেলা এখুনি শুরু হবে। আসর জমানোর জন্যে ক্লাউন ভেতরে চলে গেছে, চলে গেছে বাক্স নিয়ে সেই থলথলে চেহারার লোকটিও। প্ল্যাটফর্মের ওপর একা রূপলাল। রূপলালের খেলা শেষের দিকে।

মেয়েটার হাত ধরে এগিয়ে এল বুড়ো। রূপলাল আজ যেচেই বললে, খেলা দেখবে নাকি?

বুড়ো ঘাড় নেড়ে বললে, না।

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রূপলাল বললে, পয়সা লাগবে না, দেখো গে যাও!

কিন্তু এত বড় প্রলোভনেও মেয়েটা চঞ্চল হল না। একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বুড়ো বললে, না যাদুগর, খেলা দেখবার লেগে আসি নাই। আমার দরকার তোমার সাথে—একটু নিরিবিলি চাই।

রূপলাল একটু অবাক হয়ে বললে, নিরিবিলি চাই! তাহলে সন্ধের পর আমার তাঁবুতে এসো।

মেয়েটা কেমন যেন ভয় পেয়ে বুড়োর হাত চেপে ধরে বললে, না, রেতের বেলা পছিয়ার মাঠে দানোরা আসে!

রূপলাল হেসে ফেললে। বললে, আচ্ছা, তবে থাক, আমিই যাব। ঘর কোথায় তোমার?

উত্তর দিলে বুড়ো, উই শালতলীতে। খুশিদের ঘর বললে দেখিয়ে দিবে।

খুশি কে?

একটু হেসে বুড়ো বললে, এই যে—আমার মেয়ে। ঠিক যাবে তো কত্তা?

যাব।

চলে গেল মেয়েকে নিয়ে বুড়ো। আশ্চর্য, এতক্ষণ তাকিয়ে রইল মেয়েটা রূপলালের দিকে, কিন্তু কোন ভাবেরই ছায়া পড়ল না তার চোখে।

মেয়েটির দেহে যৌবন এসেছে, কিন্তু মনের বয়স কি হয়নি?

যাবে বলে পুরোদস্তুর বেদে, রূপলাল হল তাই। বাপ-মা কে, কোথাকার লোক, জানে না। জ্ঞান হওয়া থেকে ঘুরছে বেদেব দলের সঙ্গে, বড় হয়ে উঠেছে তাদেরই আওতায়। এ-দল থেকে ও-দল, এ-গ্রাম ছেড়ে ও-গ্রামে।

ছোটবেলায় দড়ির ব্যালান্স শিখেছিল। সরু দড়ির ওপর দাঁড়িয়ে কসরৎ দেখাতো মেলায়।

আঠারো বছর বয়স অবধি। তারপর ভিড়ে গেল এক নেপালী বৌদ্ধ তান্ত্রিকের সঙ্গে—পাক্কা ছ'বছর। এই ছ'টা বছর রূপলালের জীবনে সবচেয়ে বিচিত্র অধ্যায়। তার জীবনের মোড় ঘুরে গেল এই ছ' বছরে।

নেপালী তান্ত্রিক ছিল জ্যোতির্বিদ আর জ্যোতিষবিদ্যায় পারদর্শী। শুধু মুখ আর কপালের গঠন দেখে লোকের ভূত-ভবিষ্যৎ আশ্চর্যভাবে গণনা করতে পারত। আর কথা কইত মৃত আত্মাদের সঙ্গে। বিশেষ করে যাদের মৃত্যু হয়েছে অপঘাতে, সেই সব নিম্নস্তরের প্রেতাত্মাদের সঙ্গে। এ হেন তান্ত্রিকের অনুগত চেলা হয়ে রূপলাল গুরুর সঙ্গে চলে গেল তিব্বতের মঠে। সাড়ে পাঁচ বছর বাদে যখন আবার ফিরে এল বেদের দলে, তখন সেই দুর্লভ বিদ্যা তার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয়ে গেছে। সে শিখেছে প্রেতাত্মাদের আবাহন করতে আর তাদের সাহায্যে জীবিত মানুষের ভবিষ্যৎ জেনে নিতে। এখন থেকে রূপলালের রূপ হল অন্য, পেশা হল ভিন্ন। মিশমিশে কালো সাটিনের আঁটোসাঁটো পোশাকে সেজে সে যখন অন্ধকার স্টেজে এসে দাঁড়ায়, হলদে মোমের আলোয় তাকে দেখে দর্শকের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

সেই থেকে তার নাম হল 'কালা যাদুগর'।

সন্ধের পর নিজের তাঁবুতে বসে একটু জিরিয়ে রূপলাল বেরিয়ে পড়ল শালতলীর উদ্দেশে। জায়গাটা পছিয়ার মাঠ থেকে মাইলটাকের মধ্যে। খুশিদের বাড়িটা জিজ্ঞেস করতেই পাওয়া গেল। বাড়ি বলতে খানদুয়েক মেটে ঘর আর উঠোন। রূপলাল তার কালো পোশাক পরে আসেনি, তাই বুড়ো প্রথমে চিনতে পারলে না। তারপর ডেকে বসালো ঘরের মধ্যে। ডেকে আনলো খুশিকে পাশের ঘর থেকে। বললে, এই এর লেগেই তোমারে কষ্ট দেওয়া যাদুগর। মেয়েটার কপালে কি লেখা আছে, ভাল করে দেখে বলে দাও।

রূপলাল একটু হেসে বললে, এই ব্যাপার! তা কাল তোমার মেয়েকে তাঁবুর মধ্যে নিয়ে গেলেই তো পারতে।

সাদা মাথা নেড়ে বুড়ো বললে, না যাদুগর, ওখেনে ভয়ে খুশি ভড়কে যেতো। তুমি ঘরেই দেখে দাও, তোমার পাওনা আমি ডবল দেব।

ঘরের কোণে কাঠের পিলসুজে একটা প্রদীপ জ্বলছিল। পকেট থেকে হলদে মোমবাতি বের করে প্রদীপ থেকে জ্বেলে নিলে রূপলাল, আর ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলে প্রদীপটা। তারপর এসে বসল খুশির মুখোমুখি। হলদে মোমের আলো খুশির মুখের ওপর ফেলতেই চমকে উঠল রূপলাল। ডাগর ডাগর দুই চোখের তারায় মণি নেই! আলোহীন ভাষাহীন বোবা দুই চোখ।

খুশি তাহলে অন্ধ! এতক্ষণে বুঝল রূপলাল, সার্কাসের তাঁবুর সামনে তার দিকে তাকিয়েও ওই দুটি চোখ কেন তার সঙ্গে কথা বলেনি!

রূপলাল প্রশ্ন করলে, খুশির চোখ এমন হয়েছে কদ্দিন থেকে মোড়ল?

একটা নিশ্বাস ফেলে বুড়ো বললে, জন্ম থেকেই। তাই তো পোড়াকপালীর কপালের লেখনটা জানতে চাইছি কত্তা। হাতখান দেখা খুশি।

রুপোর চুড়ি পরা একখানা হাত অসঙ্কোচে এগিয়ে এল রূপলালের দিকে। আর রূপলালেরও একখানা হাত আপনা থেকেই তুলে নিল একমুঠো তুলোর মত সেই নরম হাতখানাকে।

কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই খুশির হাতখানা ছেড়ে দিয়ে বলল, আমি হাত দেখি না, মুখ দেখে বলি।

মশাল-জ্বালা দুই চোখের দৃষ্টি খুশির মুখের ওপর কেন্দ্রীভূত করে রূপলাল চেয়ে রইল আর অস্পষ্ট দুর্বোধ্য ভাষায় তন্ত্রের মন্ত্র আওড়াতে লাগল। মাঝে মাঝে কাঁপতে লাগল হলদে মোমের শিখা।

বাইরে ঝিঁঝি-ডাকা রাত। মুহূর্তের পর মুহূর্ত চলে যাচ্ছে। দুর্বোধ্য তিব্বতী ভাষার তন্ত্রমন্ত্র রূপলালের চাপা গম্ভীর গলায় ক্রমশ দূরের ঘণ্টাধ্বনির মত মিলিয়ে আসতে লাগল। কেঁপে-ওঠা মোমের আলোয় খুশির ছায়াও পেছনের মেটে দেয়ালে কাঁপতে লাগল। আর মনে হতে লাগল, ঘরের আবছা অন্ধকারে ছায়া ছায়া মূর্তি ধরে কারা যেন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, ফিসফিস করে কথা বলছে।

স্থির হয়ে বসে আছে খুশি—দৃষ্টিহীন দুই চোখ মেলে। মোমবাতির হলদে আলোয় মুখখানা তার

অসম্ভব ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। এই শীতের রাতেও কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। রূপলাল বুঝতে পারলে তার ওপর প্রেতাত্মার ভর হয়েছে। তার চোখের মশাল আরো যেন উগ্র হয়ে উঠল। সেই উগ্র চোখের দৃষ্টি খুশির ফ্যাকাশে চোখের ওপর কেন্দ্র করে রূপলাল তার শেষ মন্ত্র উচ্চারণ করলে। বুড়ো দেখতে পেল না, কিন্তু রূপলাল স্পষ্ট দেখল, খুশির মুখখানা শুকনো পাতার মত ক্রমশ কালো হয়ে আসছে। মাথার ওপর চক্র দিচ্ছে একটা বাদুড়। আশেপাশে কিলবিল করছে বিষধর সাপ।

সেই ছবি দেখতে দেখতে অস্থির হয়ে উঠল রূপলাল, তার চোখের মশাল আস্তে আস্তে নিভে এল। এ কী দেখল সে! এ যে অমঙ্গল—ভয়ানক অমঙ্গলের লক্ষণ! সে তো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, খুশির মত সুন্দর, সরল, পবিত্র মেয়ের ভবিষ্যৎ-জীবনে এমন বিশ্রী অমঙ্গল এমন মর্মান্তিক দুঃখ লুকিয়ে ওৎ পেতে আছে!

অস্থির হয়ে রূপলাল পকেট থেকে ধূপের মত একটা পদার্থ বের করে জ্বালিয়ে দিলে। সুগন্ধি ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগল। সেই ধোঁয়ায় অশরীরী প্রেতাত্মার দল ঘর থেকে একে একে বিদায় নিল। সহজ আর হালকা হয়ে এল ঘরের বাতাস। স্বাভাবিক হয়ে এল খুশির মুখের রং। রূপলাল প্রদীপ জ্বেলে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল।

এতক্ষণে বুড়ো মোড়ল নড়েচড়ে বসল। সংশয় আর অনিশ্চয়তায় কাঁপা গলায় বললে, কী দেখলে যাদুগর, আমার খুশির মুখে? তোমার কালা যাদুবিদ্যের কিরে, সত্যি কথাই বল!

কিন্তু সত্যি কথাটা রূপলাল বলতে পারেনি। বলতে শুধু মুখেই বাধেনি, তার মনেও বেধেছিল। বলেছিল সে উল্টো কথা।

হাসি মুখেই রূপলাল বললে, ভালই দেখলাম মোড়ল। মেয়ে তোমার সুখী হবে—খুব সুখী হবে। দুঃখের আঁচড়টি ওর গায়ে লাগবে না, যদি—

যদি কি?—উৎসুক গলায় বুড়ো বললে।

খুশির ঢলঢলে মুখের দিকে তাকালে রূপলাল। টিকালো নাকের রুপোর নাকছাবি চিকচিক করছে। দেখতে পায় না, তবু বোবা চোখ মেলে তাকিয়ে আছে রূপলালেরই দিকে। বড় মায়া, বড় মমতা হল রূপলালের, বললে, যদি কেউ ওকে জীবনভোর আগলে রাখে।

ভারি কথা বললে। কে আগলে রাখবে গো সারা জেবন? কানী মেয়েকে কে নেবে?

নেবে বৈকি! সময় হলে ঠিক নেবে—আদর করে নেবে।

সত্যি বলছ যাদুগর?

মিথ্যে বলে লাভ?

বুড়োর মুখখানা জ্বলজ্বল করে উঠল। আর—আর অকারণে আঁচল দিয়ে মুখখানা ঘষে ঘষে লাল করে তুললে, না লাল মুখখানার রং মোছবার চেষ্টা করতে লাগল, একমাত্র খুশিই জানে।

যাবার সময় বুড়ো ট্যাঁক থেকে একটা গোটা টাকাই বের করে দিলে। হেসে ফিরিয়ে দিয়ে রূপলাল বললে, এখন থাক। আমার পাওনা আমি যেচেই নেব। চলি খুশি।

ছোট্ট জবাব এল, এসো যাদুগর।

উঠোন অবধি এগিয়ে দিলে খুশি। যাবার আগে রূপলাল বললে, আমাকে তোমার ভয় লাগে, না খুশি? আমি ভূত নামাই, দানো নামাই।

খুশি বললে, তখন থেকে আর ভয় লাগে না।

কখন থেকে?

একটু চুপ করে থেকে আবছা গলায় খুশি বললে, সেই যখন তুমি আমার হাত ধরলে।

ভারি মিষ্টি আওয়াজ খুশির! সেই আওয়াজের মিঠে রেশ কানে নিয়ে রূপলাল চলে গেল।

শীতের শুরু থেকে আজব সার্কাস পার্টি বসন্তকাল অবধি রয়ে গেল পাছিয়ার মাঠে। বড় তাঁবুতে লোকের ভিড় আর কমে না। সেই থলথলে-চেহারা লোকটির বাক্স পয়সাতে উপুছুপু।

রূপলাল রোজ বিকেলে তাঁবুতে 'কালা যাদু'র খেল দেখায়, আর সন্ধেবেলা গুটি গুটি হাজির হয় শালতলীতে। কোনদিন বা সকালবেলাতে। খুশির হাত ধরে বেড়িয়ে নিয়ে আসে ঝমুকি নদীর ধার অবধি। কোন কারণে এক-আধদিন যেতে না পারলে, পরের দিন খুশি চুপ মেরে যায়। তিনবার না

ডাকলে সাড়া মেলে না।

রূপলাল বলে, কি হল তোমার ? অমন গুম হয়ে আছো কেন ? আসতে পারিনি বলে রাগ-গোসা হল নাকি ?

আস্তে আস্তে খুশি বলে, রাগ-গোসা নয় যাদুগর, ভয়।

রূপলাল জানে, তবু প্রশ্ন করে, কিসেব ভয় ?

খুশি বলে, তা জানি না। থেকে থেকে মনে হয় কারা যেন চুপিসাড়ে ঘুরছে আমার পাশে, তাদের নিশ্বেসের হাওয়া গায়ে যেন লাগে।

রূপলাল জানে। তার গুরুর দেওয়া তান্ত্রিক বিদ্যাব দৌলতে সে বোঝে, কোন অমঙ্গল, কোন অকল্যাণের ছায়া থেকে থেকে খশির গায়ে বিষ-নিশ্বাস ফেলে যায়। এক মুহূর্তের জন্যে থমথমে হয়ে ওঠে রূপলালের মুখ। বুক ভরে যায় বড় মায়ায়, বড় মমতায়। পরক্ষণেই হেসে খুশির হাত ধরে বলে, এবার ? ভয় লাগছে ?

খুশিব ঢলঢলে শ্যামলা মুখখানি নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় প্রসন্ন হয়ে উঠল। ঝিকমিক করে ঠোঁটের কোণে হাসি। বলে, না যাদুগর, তুমি কাছে থাকলে, তুমি ছুঁয়ে থাকলে আর ভয় করে না।

একটু চুপ করে থেকে রূপলাল বলে, তবে তো মুশকিল হল খুশি, আমি তো বেদে মানুষ, হুট বলতে দলের সঙ্গে কবে ভেসে পড়ব কে জানে। তখন কি হবে ?

উত্তরে খুশি রূপলালের হাতটা জোরে চেপে ধরে।

প্রশ্নটা রূপলাল যেন খুশিকে করে না, করে নিজেকেই। কিন্তু উত্তর আর মেলে না।

তারপর ফাল্গুনেব শেষে চৈত্রের গোড়ায় পছিয়ার মাঠ থেকে তাঁবু তোলা শুরু হয়ে গেল। সাত সাতটা মোষের গাড়ি বোঝাই হয়ে, ধুলোয় ধুলোয় পছিযাব মাঠ অন্ধকার করে, আবার চলতে শুরু করল। সে গাড়িতে সবাই ছিল, ছিল না শুধু রূপলাল।

রূপলাল রয়ে গেল সেই শালতলীতেই।

বুড়ো মোড়ল প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি। জন্ম-কানী মেয়েকে কেউ জেনেশুনে বিয়ে করতে চায় নাকি ? কিন্তু রূপলাল যখন নাছোড়, তখন আনন্দে কেঁদে ফেললে বুড়ো। বললে, তুমি আমায় বাঁচালে যাদুগর। আমার আর ক'দিন বলো ? পোড়াকপালীর ভাবনায় রেতে আমার ঘুম ছেলো না মরতে সুখ ছেলো না !

অবাক হয়ে গেল শালতলীর লোকেরা। কানী মেয়ে খুশির বিয়ে ! যার তার সঙ্গে নয়, সার্কাস পার্টির কালা যাদুগরের সঙ্গে।

বাসর রাতে খুশি চুপি চুপি বললে, আমার লেগে তুমি একি করলে যাদুগর ?

রূপলাল হেসে বললে, এখনো তুমি আমায় যাদুগর বলেই ডাকবে ?

ফিক করে হেসে খুশি বললে, তুমি যাদুগরই তো ? সেই পেরথম দিন থেকেই আমায় সুদ্ধু যাদু করেছ যে !

রূপলাল পরম আদরে রুপোর নাকছাবি-পরা টিকোলো নাকটি নেড়ে দিলে।

তার পরের বছরই বুড়ো মোড়ল মারা গেল।

বেদেও ঘর বাঁধল। সে-ঘর দু-দশদিনের নয়, চিরদিনের। জীবনটা যে এমন ভাবে হঠাৎ মোড় ঘুরে যাবে, রূপলাল কি তা জানত ! রূপলাল কি ভেবেছিল, ত্রি-সংসারে যার কেউ নেই, এই শালতলীতে তার সবচেয়ে আপনজন জুটে যাবে ?

আর খুশিও কি কোনদিন স্বপ্ন দেখেছিল, সারাটা জীবন কেউ তাকে আগলে রাখবে ? শালতলীর বসন্তকাল কখন যে দুটি মন রাঙিয়ে দিল, তা কেউ জানে না। রূপলাল-খুশিও জানে না।

বড় সুখেই দিন যায়। খুশির মন থেকে ভয়ের ছায়া ধুয়ে-মুছে গেছে। আর রূপলালও ভুলে গেছে খুশির অশুভ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত।

ঠিক এই সময় নিতাইয়ের সঙ্গে দেখা।

ঝুমকির ধারে বসেছিল ওরা। একেবারে পাড় ঘেঁষে একটা বাবলা গাছের তলায়। বেলা তখন ঢলছে। ওপারের হিজল বনের আড়াল থেকে কে যেন মুঠো মুঠো সোনার আবির ছুঁড়ে এপারের

সাথে হোলি খেলছে !

রূপলাল আর খুশি যেন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিল। স্বপটা ভেঙে গেল একটা মেঠো গলার সুরেলা আওয়াজে। আওয়াজটা দূর থেকেই আসছে। রূপলাল তাকিয়ে দেখলে, ডিঙি বেয়ে একটা মানুষ এপারের দিকে আসছে আর গলা ছেড়ে গান ধরেছে :

সিঁয়াকুল তুলতে গিয়ে
হল এ কি জ্বালা লো, হল এ কি জ্বালা।
গলাতে জড়িয়ে গেল বনফুলের মালা ॥

ডিঙিটা কাছাকাছি আসতে রূপলাল দেখলে, পাতলাপানা একটা ছোকরা ডিঙি বাইছে। বয়সে তার চেয়ে দু-চার বছরের ছোটই হবে। নিকষ কালো চেহারা। মুখখানা যেন পোটোর হাতে গড়া। ঝাঁকড়া বাবরী চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে। হালকা গেরুয়া রঙের খাটো ধুতি সরু মাজায় আঁট করে বাঁধা। গায়ে সেই রঙেরই ফতুয়া।

একটা আশশ্যাওড়া ঝোপের পাশে ডিঙিখানা বাঁধলে সে। তারপর বাবলাতলায় চোখ পড়তেই গানটা তার থেমে গেল। শুধু গান থেমে গেল না, লোকটার নড়াচড়া এমন কি নিশ্বাসটুকুও যেন থেমে গেল।

খুশি হঠাৎই চঞ্চল হয়ে বলে উঠল, চল, ঘরে যাই।

রূপলাল বললে, কেন বল দিকি ?

খুশি বললে, কে যেন প্যাঁট প্যাঁট করে তাকিয়ে আছে।

অবাক হয়ে গেল রূপলাল অন্ধ খুশির কথা শুনে। সত্যিই তো, লোকটা এদিকেই তাকিয়ে আছে ! পথে-ঘাটে তাকায় তো কতজন, কই, খুশি তো টের পায় না ! আজ টের পেল কেন ? ওকে টের পাওয়াল যে, সে লোকটাই বা কে ?

খুশি রূপলালের হাতে নাড়া দিয়ে বলল, ওঠো !

কিন্তু ওরা উঠে যাবার আগেই ডিঙির লোকটা একেবারে কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। হাসিমুখে বললে, কালা যাদুগর না ?

রূপলাল জবাব দেবার আগেই লোকটা নিজেই ঘাড় নেড়ে বলল, হুঁ, চিনতে আমার ভুল হয়নি। গেল শীতে বাদামতলার মেলায় দেখেছিলাম আমি। আমি নেতাই গুণীন।

গুণীন !

রূপলালের মনে হল, গুণীন না হয়ে কবিয়াল হলেই নিতাইকে মানাত ভাল। চোখ দুটো তার সদাই হাসছে।

রূপলাল বললে, কিসের গুণীন ?

নিতাই বললে, সাপে কাটলে আমি ঝাড়ফুঁক করি, বাতের ব্যথা আরাম করি, বাঁজা মেয়েছেলেকে ওষুধ দিই, আর ঝুমুর গেয়ে বেড়াই।

গলা খুলে হেসে উঠল নিতাই। নিতাইয়ের চোখ দুটো শুধু হাসে না, সে নিজেও এমন হাসে যে বোঝা যায় মানুষটা দিলদরিয়া। একটু খ্যাপাটেও বটে। মজা লাগল রূপলালের।

হাসি থামিয়ে নিতাই জিজ্ঞেস করল, সঙ্গে উটি কে ওস্তাদ ?

রূপলাল বললে, আমার পরিবার।

মোড়ল বুড়োর মেয়ে খুশি, না ? তা বেশ, তা বেশ।

গলা ছেড়ে আবার হেসে উঠল নিতাই।

রূপলালের হাতে টান দিয়ে অসহিষ্ণু গলায় খুশি বললে, ঘরে চলো।

ঘর কোথায় ওস্তাদ ?—নিতাই প্রশ্ন করলে, শালতলীতে ?

রূপলাল বললে, হুঁ। কিন্তু শালতলীতে তোমায় তো আগে দেখিনি ? খুশিকে চেনো নাকি ?

হা-হা করে আবার হেসে উঠে নিতাই বললে, চিনি বৈকি ওস্তাদ। হাসিকেও চিনি, খুশিকেও চিনি। জেবনটাই যে হাসিখুশির মেলা !

হাতে আবার টান পড়তেই রূপলাল দেখলে, উল্টো পথে খুশি দু-পা এগিয়ে গেছে। পিছু নিলে সে। বাবলাতলায় দাঁড়িয়ে নিতাই চেয়ে রইল সেদিকে। তারপর আচমকা গলা ছেড়ে গান ধরলে :

অলো সই, কেনে এমন
হয়্যাছে মন উচাটন,
বুঝি লো বশীকরণ
জানে চিকনকালা।
হল এ কি জ্বালা লো, হল বিষম জ্বালা ॥

দিন দুই বাদে একদিন দুপুরে উঠোনের বেড়ার ওপার থেকে ডাক শোনা গেল : ওস্তাদ, ঘরে আছ ?

ঘরেই ছিল রূপলাল। ক্ষেত থেকে ফিরে সবে স্নান-খাওয়া সেরেছে। বেরিয়ে এসে দেখে নিতাই গুণীন। বললে, এই ভরদুপুরে কি মনে করে গুণীন ?

কপালের ওপর থেকে ঘামে-ভেজা চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে নিতাই বললে, কথা আছে ওস্তাদ। আগে দাওয়ায় বসতে বল !

নিতাই অবশ্য রূপলালের বলার অপেক্ষা রাখলে না, নিজেই এসে চেপে বসল। তারপর ফতুয়ার পকেট থেকে 'লাল লণ্ঠন' সিগারেট বের করে একটা রূপলালকে দিলে, একটা নিজে ধরালে। কিছুক্ষণ ধোঁয়া ছেড়ে, আসার কারণটা বললে, আমি জানি যাদুগর, কালা যাদুবিদ্যায় তুমি কত বড় ওস্তাদ। তোমার ওই মহাবিদ্যাটি আমায় শেখাতে হবে।

রূপলাল বললে, সেকি নেতাই, তুমিও তো গুণীন, কত বিদ্যে তোমার জানা।

ঠোঁট উল্টে নিতাই বললে, কিছু না, কিছু না ওস্তাদ। আমার একটা বিদ্যেই জানা, আর সব বুজরুকি।

কোন্ বিদ্যে জানা ? রূপলাল প্রশ্ন করলে।

মা ধূমাবতির বিদ্যে—রূপ-বদল।

উৎসুক হয়ে উঠল রূপলাল : ওটা কোন্ বিদ্যে গুণীন ? শিখলে কোন্ ক্ষ্যামতা বাড়ে ?

হেসে নিতাই বলে, সে বড় মজার বিদ্যে। তোমায় শিখিয়ে দেব'খন। কিন্তু আগে তোমার বিদ্যে আমায় দেবে বল ?

রূপলাল বললে, দেব না কেন ? তবে কালা যাদুবিদ্যে বড় ভজকট—ভূত-পেরেতের কারবার ; শিখতে সময় লাগে।

নিতাই বললে, তা লাগুক।—বলে ফতুয়ার পকেট থেকে আরো কয়েকটি জিনিস বার করলে নিতাই। একটি নতুন ছোট কলকে, সিকি তোলা গাঁজা, লাল সুতো এক গজ, পাঁচটা কড়ি আর পাঁচটি টাকা। বস্তুগুলি রূপলালের পায়ের কাছে রেখে নিতাই বললে, আজ থেকে আমাকে সাগরেদ করে নাও।

রূপলাল বললে, আজ নয়, পরশু অমাবস্যে—সেদিন থেকে।

ঠিক ?

ঠিক।

বাবা ভূতনাথের দিব্যি ?

বাবা ভূতনাথের দিব্যি।

চাপা একটা আনন্দে নিতাইয়ের চোখ-মুখ হেসে উঠল। পোড়া সিগারেটের টুকরো টান মেরে ফেলে নিতাই মনের আনন্দে গেয়ে উঠল :

গাজনের বাদ্যি বাজে, বাজে কাঁসি ঢোল,
মন রে, বোম ভোলানাথ বোল।

তারপর হঠাৎ গান থামিয়ে বললে, এক ঘটি জল ফরমাস করো না ওস্তাদ—তেষ্টায় ছাতি ফাটছে।

ঘরের দিকে চেয়ে রূপলাল বললে, এক ঘটি জল দিস তো খুশি !

খানিক পরে কপাটের শিকলটা নড়ে উঠল। তারপরেই মাজা কাঁসার ঘটিতে জল নিয়ে খুশি দাওয়ায় পা দিল। তড়াক করে উঠে গেল নিতাই, হাত বাড়িয়ে নিতে গেল জলের ঘটিটা। আঙুলে

আঙুলে একটু ছোঁয়া, অমনি খুশির হাত থেকে জলের ঘটিটা খসে পড়ল।

নিতাই বলে উঠল, আহা-হা, তেষ্টার জলটা পড়ে গেল গা ! থাক, আর কষ্ট করতে হবে না।

খুশি আস্তে আস্তে ঘরে ফিরে গেল। একটা অজানা আতঙ্কে তার মুখে ছায়া নেমেছে, হাতখানা কাঁপছে। নিতাইয়ের আঙুল নয়, একটা সাপের গা ছুঁয়ে ফেলেছে যেন খুশি !

নিতাইও আর দেরি করলে না : আসি গো ওস্তাদ, পরশু আসব। —বলে সেও পা বাড়াল।

পেছন থেকে রূপলাল বলে দিলে : সন্ধের পর মনসাপোতার শ্মশানতলীতে যেও। আমিও যাব।

ঘরে গিয়ে রূপলাল দেখলে, খুশি চুপ করে বসে আছে। পাঁশুটে মুখে ভয়ের ছায়া।

রূপলাল তার গায়ে হাত দিয়ে বললে, কি হল, অমন থমথমা হয়ে রইলি কেনে ?

আস্তে আস্তে খুশির মুখ থেকে পাঁশুটে রংটা মিলিয়ে গেল। বললে, অনেকদিন বাদে কেমন যেন গা ছমছম করছিল।

এক মুহূর্তের জন্যে রূপলালের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। তারপরেই হেসে বললে, ভয় কি, আমি তো আছি !

স্বামীর হাঁটুতে গাল রেখে খুশি বললে, হ্যাঁগা, ও লোকটাকে তুমি কালা বিদ্যে শেখাবে ? নাই শেখালে, ও কিন্তু ভাল নয়।

রূপলাল বললে, দিব্যি গেলে ফেলেছি যে ! তারপর একটু হেসে বললে, ছোঁড়াটা খ্যাপাটে, তবে খারাপ নয়।

কৃষ্ণপক্ষের ভরা চতুর্দশীর রাত। দুয়ারে খুটখুট শব্দ হল।

ভেতর থেকে খুশি বললে, কে ?

চাপা গলায় আওয়াজ হল, আমি।

দরজা খুলে খুশি বললে, কে, যাদুগর এলে ?

না গো, আমি নিতাই !

খুশি যেন একটা ধাক্কা খেলো। দরজার কপাটটা সজোরে আঁকড়ে ধরে বললে, তুমি এখেনে কেন ? যাদুগর তো মনসাপোতার শ্মশানতলীতে রয়েছে। সেখেনে যাও।

একঘটি ঠাণ্ডা জল হবে ? বড় তেষ্টা।

বিরক্তি আর বিতৃষ্ণায় খুশি বললে, এ কেমনতর কথা বাপু ? দিনে-রেতে যখন-তখন তেষ্টা !

গলা ছেড়ে হেসে উঠল নিতাই। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে চাপা গলায় বললে, ঠিক ধরেছ। দিনে-রেতে সব সময়েই আমার তেষ্টা।

জোড়া ভুরু কুঁচকে খুশি বললে, তা আমার কাছে ছাড়া আর কোথাও কি জল নেই ?

নিতাই বললে, না গো খুশি। আমার তেষ্টার জল তুমি ছাড়া আর কারো কাছে নেই।

নিতাইয়ের কথাগুলো কেমন লালা-জড়ানো।

খুশি দরজাটা বন্ধ করে দিতে গেল, তার আগেই নিতাই খপ করে একখানা নরম হাত ধরে ফেললে। বললে, জেবনটা হাসিখুশির মেলা গো ! যাদুগর তোমায় কি দিয়েছে ? আমি তোমায় অনেক দেবো—অনেক সুখ। তুমি আমার হও খুশি, তুমি আমার হও।

খুশির সর্বাঙ্গ তখন থরথর করে কাঁপছে। তার মনে হতে লাগল, কতকগুলো সাপ কিলবিল করে তার গা বেয়ে উঠছে। মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে বিশ্রী একটা বাদুড়। তার পাখা ঝাপটানোর হাওয়া মুখে লাগছে। ভয়ে চিৎকার করে উঠেই ঢলে পড়ল খুশি।

নিতাই এতটা ভাবেনি। সে আর দাঁড়াল না, ছুটে বাইরের অন্ধকারে মিশে গেল।

গাঢ় ঘুমের কুয়াশা ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসছে। আর তারই মাঝে রূপলাল যেন অনেক দূর থেকে ডাকছে, খুশি, খুশি, খুশি ! কি হল তোর খুশি ?

চোখের ভারী পাতা দুটো মেলে খুশি দেখলে, শিয়রে সত্যিই রূপলাল। স্বামীর বুকে মুখ রেখে হু হু করে কেঁদে ফেললে সে। তারপর কাঁদতে কাঁদতেই বললে, নেতাই শয়তানকে তুমি আর আসতে দিও না—কক্ষুনো না—ও আমায় গুণ করবে, ও আমায় মেরে ফেলবে—

খুশিকে বুকে জড়িয়ে ধরে রূপলাল হ্যাঁ করল না, না করল না। গুম হয়ে বসে রইল। শুধু তার মশাল-চোখ একবার দপ করে জ্বলে উঠল।

নিতাইকে মানা করতে হয়নি। নিজের থেকেই সে আর আসেনি।

দেড় দু-মাস কাটল। রূপলাল তবু নিশ্চিন্ত হতে পারল না। খুশি বলেছিল, উ খালভরা যখন আমার হাতখানা ধরল, তখন শরীলটা আমার অবশ হয়ে গেল—মনে হল, তুমি আমার হাত ধরেছ!

বলিস কি!—রূপলাল বললে।

খুশি বললে, হ্যাঁ গো। তারপর উ নচ্ছার যখন বললে, 'যাদুগর তুমারে কি দিয়েছে,' তখন হুঁশ হল। আমার মন বললে, এ তুমি নয়, এ নিচ্চয় শয়তানটা। আমার শরীলটা কাঁপতে লাগল—আর কিছু মনে নেই।

খুশির কথা শুনে মনে মনে চমকে উঠেছিল রূপলাল। নিতাই গুণীনের হাতের ছোঁয়ায় অবশ হয়ে এসেছিল খুশির সর্বাঙ্গ। মনে হয়েছিল রূপলালই তার হাত ধরেছে। তাহলে খুশিকে ঠিক অবশ নয়, বশ করেছিল নিতাই! তবে কি নিতাই গুণীন 'ডাকিনী-মন্ত্র' জানে? এত বড় গুণীন হয়েও কেন সে রূপলালের কাছে এসেছিল, সে তো এখন বোঝাই যাচ্ছে। কালা যাদুবিদ্যার লোভে নয়, এসেছিল খুশি-ফুলের টাটকা মধুর লোভে!

নেপালী তান্ত্রিক গুরুর বিদ্যে কখনো মিথ্যা বলে না। অন্ধ খুশির জীবনে তাহলে ওই শনি—ওই নিতাই গুণীন!

ছ্যাঁৎ করে উঠল রূপলালের বুকটা।

তারপব থেকেই খুশিকে আর চোখের আড়াল করে না রূপলাল।

ফসল কাটার দিন এসে গেছে। আউসের নতুন ফসল। বুড়ো মোড়লের বাইশ বিঘের ফসল তুলে গঞ্জে পাঠিয়ে দিয়েছে রূপলাল। এবার মহাজনের গদি থেকে 'আদায়' আনতে যাওয়ার কাজটাই বাকি। ফসল কাটার সময় নিজে একটিবারও মাঠে যায়নি রূপলাল—পাছ খুশিকে চোখের আড়াল করতে হয়। কিন্তু আদায়ের ব্যাপারে নিজে না গেলেই নয়।

রূপলাল বললে, ভোর-ভোর গঞ্জে চলে যাব, আর সূয্যি ঢলবার আগেই ফিরে আসব। ভাবিস নে খুশি। সুদামাকে রেখে যাচ্ছি।

গঞ্জে চলে গেল রূপলাল। কিন্তু যতই তাড়াহুড়ো করুক, ফিরতে ফিরতে সূর্য ঢলে পড়ল। ছোট ছোট কেউটের বাচ্চার মত কুণ্ডলী পাকানো ছোট কালো মেঘ সাঁঝের আকাশে জড়ো হতে লাগল। শালতলীর সীমানায় গাড়ি থেকে নেমে পড়ে জোরে পা চালিয়ে দিল রূপলাল। বলদের গাড়ি বড় ধিকিয়ে চলে।

খানিক দূরে এগোতেই তারই ক্ষেতের 'মুনিশ' সুদামার সঙ্গে দেখা। অন্ধকার নেমেছে বলেই বোধ হয় সুদামা তাকে দেখেনি। কিন্তু রূপলালের বিরক্তির সীমা রইল না। চেঁচিয়ে ডাকলে, এই সুদামা! ঘরে মানুষটাকে একা রেখে চলে যাচ্ছিস? বারে!

সুদামা কেমন একটু ঘাবড়ে গেল। বললে, হাই দ্যাখো! তুমি ঘরে ঢুকলে, তাই তো আমি চলে এলাম কত্তা।

রূপলালের মুখটা হাঁ হয়ে গেল। বললে, আমি ঘরে ঢুকলাম?

সুদামা বললে, ঢুকলে না? এই কতক্ষণ আগেই ঢুকলে তো। নিজে পেত্যক্ষ করলাম।

মাথার ওপর গুরগুর করে মেঘ ডেকে উঠল। গুরগুর করে উঠল রূপলালের বুক। আর কোন কথা না বলেই সে ছুটল ঘরের অভিমুখে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাতাসও হঠাৎ ছুটতে লাগল হু-হু করে। মাথার ওপর ঘনঘন হাঁকার দিতে লাগল অদৃশ্য দৈত্যদানোর দল। কালো কালো অসংখ্য মেঘ-বাদুড়ের দল আকাশে পাখা ঝাপ্টাচ্ছে।

তীরবেগে ছুটল রূপলাল। এক ধাক্কায় উঠোনের আগড়টা ঠেলে দাওয়ায় পা দিয়েই থমকে থেমে গেল। ঘরের কপাট বন্ধ। ভেতর থেকে আওয়াজ আসছে:

তোমায় ভালবাসি না তো কাকে বাসি গো?

সত্যি ?

সত্যি সত্যি সত্যি ! তুমি কি আমার মন বোঝ না ? থেকে থেকে শুধোও কেনে ?

এমনি। তোর মুখে শুনতে মিষ্টি লাগে।

আহা !

মাথাটা ঘুরতে লাগল রূপলালের। দুটো গলার একটা গলা সে চেনে—খুশির। কিন্তু পুরুষের গলাটা যে তার নিজের ! হুবহু তার গলার আওয়াজ, তারই বলাই ভঙ্গি ! কপাটের আড়ালে কে ? কপাটে ধাক্কা দিতে গিয়েও হাতখানা সরিয়ে নিলে রূপলাল। তারপর পা টিপে টিপে নেমে গেল উঠোনে বাতাবি লেবুর গাছটার পাশে। সামনেই আধখোলা জানলা। ভেতরে পিদিম জ্বলছে।

জানলায় উঁকি দিয়ে রূপলাল পাথর হয়ে গেল। দেখলে, বিছানার ওপর দু-হাতে খুশিকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে আরেকটা রূপলাল। যেন রূপলালেরই যমজ ভাই।

বাজপড়া তালগাছের মতই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল রূপলাল। তার বুঝতে বাকি রইল না ও কে ? জানে, নিতাই গুণীন ডাকিনী-মন্ত্র নিশ্চয়ই জানে। ডাকিনী-মন্ত্র ছাড়া রূপবদল করা যায় না। নিতাই বুঝেছিল রূপলাল ছাড়া খুশি আর কারো নয়, আর কারো হতে পারে না। খুশি তার ভালবাসা দিয়ে শুধু রূপলালকেই লতার মত জড়িয়ে আছে। কিন্তু নিতাইয়ের লোভ তবু যায়নি—পাপের গত থেকে তার লালসা লুকিয়ে হাত বাড়িয়েছে খুশির দিকে। ডাকিনী-বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত নিতাই রূপলালেব রূপ ধরে খুশিকে ভোগ করতে এসেছে।

দপ করে জ্বলে উঠল রূপলালের দুই মশাল-চোখ, দেখতে দেখতে শক্ত হয়ে উঠল তার দেহের পেশীগুলো। আবার ঘুরে গিয়ে সে দরজার কপাটে ঘা মারলে।

ভেতরে আর একটা রূপলাল সতর্ক হয়ে উঠল।

কপাটে আবার ঘা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার : খুশি !

ভেতরে চমকে উঠল খুশি। বললে, বাইরে তোমারই গলা যেন ! ও কে যাদুগর ?

কপাটে আবার ধাক্কা। আরো জোরে। আরো জোরে রূপলালের গলা শোনা গেল : দোর খোল খুশি ! তোব ঘরে শয়তান ঢুকেছে—ও নেতাই।

ধড়মড় করে উঠে বসল খুশি। আলুথালু হয়ে বললে, ও কি বলছে যাদুগর ? শুনছো !

দ্বিতীয় রূপলালের মুখ-চোখ তখনো লালসা-জড়ানো, ঘন নিশ্বাসে প্রথম রিপুর উত্তাপ ! খুশিকে কাছে টানবার চেষ্টা করে সেই একই গলায় বললে, ও মিছে বলছে খুশি, আমি রূপলাল, এই তোর কাছে রয়েছি। বাইরে ওটা নেতাই শয়তান।

বাইরের রূপলাল কপাটে আরো জোরে ধাক্কা দিলে—আরো—আরো জোরে। পুরোন কাঠের আগল সইতে পারল না, মড়মড়িয়ে ভেঙে পড়ল। দু-হাট হয়ে গেল দুটো কপাট। আর ঝড়ের মত ঘরে পা দিয়ে বাইরের রূপলাল চিৎকার করে উঠল, কার কোলে শুয়ে আছিস খুশি ? ও যে নেতাই গুণীন !

দ্বিতীয় রূপলাল ঠিক তেমনি গলায় বলে উঠল, ওর কথায় বিশ্বেস করিস না খুশি। ও-নেতাই, আমি রূপলাল !

দোরগোড়া থেকে প্রথম রূপলাল বললে, শয়তান গুণীন তোকে গুণ করেছে খুশি। আমিই রূপলাল।

হেসে উঠল দ্বিতীয় রূপলাল। হুবহু রূপলালের মতই হাসি। হাসতে হাসতেই বললে, মিছে কথা খুশি, মিছে কথা ! এই দেখ আমার হাত মুখ নাক—

খুশির একখানা হাত নিয়ে নিজের মুখে ছোঁয়াতে লাগল, দ্বিতীয় রূপলাল।

দোটানায় পড়ে অন্ধ খুশি কেঁদে উঠল, সত্যি করে বলো না গো, কোন্‌টা আসল যাদুগর !

কামের নেশা বড় নেশা। দু-হাত দিয়ে খুশিকে বুকে সাপটে ধরে, মুখের ওপর মুখ রেখে দ্বিতীয় রূপলাল বললে, আমি—আমি— আমি !

আর স্থির থাকতে পারলে না প্রথম রূপলাল। চালের বাতা থেকে কি একটা জিনিস তার হাতেব মুঠোয় চলে এল। পিদিমের আলোয় নিমেষের জন্যে বিদ্যুৎ ঠিকরে উঠল তার হাতে। তার পরেই দ্বিতীয় রূপলালের মুণ্ডুটা কাৎ হয়ে লটকে পড়ল।

আকাশে অদৃশ্য দৈত্য-দানোর দল বিকট শব্দে হাঁকার দিয়ে উঠল। খ্যাপা হাওয়া হেসে উঠল থরথর করে। আর রক্তমাখা রাম-দাখানা হাতের মুঠোয় ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রথম রূপলাল। তারই চোখের সামনে দ্বিতীয় রূপলালের রক্তমাখা দেহটা দেখতে দেখতে নিতাই গুণীনের চেহারা হয়ে উঠল।

খুশি যেন এতক্ষণ বোবা হয়ে গিয়েছিল। ভয়ে আতঙ্কে হঠাৎ চিৎকার করে উঠেই ঢলে পড়ল।

মশাল-জ্বালা চোখের স্থির দৃষ্টি মেলে রূপলাল দেখতে লাগল খুশির গা বেয়ে কিলবিল করে উঠছে বিষাক্ত সাপের দল, মাথার ওপরে চক্র দিচ্ছে রক্তশোষা বাদুড়।

ঠিক এই দৃশ্যই দেখেছিল রূপলাল, যেদিন সে প্রথম এসেছিল খুশির ভবিষ্যৎ গণনা করতে।

নেপালী তান্ত্রিকের দেওয়া বিদ্যা মিথ্যা বলে না।

হাতের অস্ত্রটা ফেলে আস্তে আস্তে খুশির কাছে এগিয়ে গেল রূপলাল। নাকের নিচে হাত রেখে দেখলে, নিশ্বাস পড়ছে না। দুই চোখের মশাল আস্তে আস্তে নিভে এল। খুশির মরা মুখের ওপর টসটস করে পড়ল দু-ফোঁটা জল। তারপর ভিজে গলায় রূপলাল শুধু বললে, তুই এগিয়ে যা খুশি, আমিও জলদি যাচ্ছি।

পরের দিনই পুলিশে ধরা পড়েছিল রূপলাল। নিতাই গুণীনকে খুন করে সে পালায়নি।

কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ফাঁসি হল না তার। হাতে-পায়ে লোহার ডাণ্ডা-বেড়ি পরে 'দায়মলী' রূপলাল একদিন আন্দামানের জাহাজে উঠল।

সে আজকের কথা নয়, ব্রিটিশ আমলের কথা। এতদিনে রূপলাল তার খুশির কাছে পৌঁছে গেছে কিনা কে জানে!

প্রশ্ন উঠতে পারে, ডাকিনী-মন্ত্রের বলে মানুষ কি সত্যিই রূপ বদলাতে পারে? তন্ত্র মন্ত্রের কি এমন অলৌকিক ক্ষমতা আছে? আপনারা কি বলবেন জানি না, ইতিহাস কিন্তু বলে, তন্ত্রশাস্ত্র মিথ্যা নয়; বিজ্ঞানের অগোচরে অনেক সত্যিই আছে।

ছায়া পূর্বগামিনী

ভবানী মুখোপাধ্যায়

টেলিফোনের ঘন্টা আবার বেজে উঠল।

তাড়াতাড়ি কল-টা ধরার জন্য ওঠার উদ্যোগ করতে করতে হেমাঙ্গ বলে ওঠে, 'আচ্ছা ফোন এলেই তুমি অমন লাফিয়ে ওঠো কেন ? কেন এই চঞ্চলতা ?'

মাধবীর দিকে তির্যক দৃষ্টি হেনে ফোনটা ধরল হেমাঙ্গ। মাধবী কিন্তু নীরবে নিস্পন্দ ভঙ্গিতে স্থির হয়ে বসে রইল। ঠোঁট দুটি ঈষৎ খোলা, একাগ্রচিত্তে টেলিফোনের কথাসূত্র ধরাব চেষ্টা করছে, অথচ জানে এইখানে বসে অপর প্রান্ত থেকে কি কথা আসছে তা জানা অসম্ভব।

হেমাঙ্গ ফিরে এসে সিগারেট ধবাতে ধরাতে বলে, 'ঘড়ির দোকান থেকে ফোন করছিল। ওরা বলছে কাল শনি, পরশু রবি, তার পরদিন ঈদের ছুটি। সেই মঙ্গল বাবের আগে আব ঘড়ি মেরামত হবে না।'

পরিপূর্ণ নিটোল স্বাস্থ্য হেমাঙ্গর, সাধারণ বাঙালী ঘবের পক্ষে কিঞ্চিৎ বে মানান। সামনের মাথায় চুল কম, টাক পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু পিছন দিকের বাবরি দেখবার মতন।

মাধবীর দিকে যখন তাকাল হেমাঙ্গ তখন তার চোখ দুটি যেন জ্বলছে।

মাধবী বলে, 'তোমাকে কিন্তু হেস্‌টিংস স্ট্রীটের অ্যাটর্নি বলে মনে হয় না, দেখায় যেন মাউন্টেড পুলিশ। কিংবা ওদের ঘোড়ার মতন—তেমনই তেড়ে উঠতে পার, তবে অবশ্য হাঙ্গামা যদি বাধে।

ওর মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকায় হেমাঙ্গ—কি অদ্ভুত তার ভঙ্গি, তেমনই বিচিত্র তার কথাবার্তা। সব কিছু লক্ষণ এবং ভঙ্গিমা দেখে কারো মনে হবে না যে মাধবী পরম প্রেমে আত্মহারা হয়ে আছে।

এইবার কর্কশ গলায় বলে হেমাঙ্গ, 'তুমি কিন্তু আমাকে কিছুতেই বললে না টেলিফোন কেন তোমাকে চঞ্চল করছে ! যেন কোন অজানা জনের সংবাদের প্রতীক্ষায় রয়েছে, ব্যাপার কি মাধবী ?'

'ছিঃ, পাগলামি করো না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার রুক্ষ গলায় বলে হেমাঙ্গ, 'নিশ্চয়ই কিছু কারণ আছে, আমার

চোখে ধূলো দিতে পারবে না। আমাকে সব বলতেই হবে।'

দুই হাতে কপালটা চেপে কিছুক্ষণ বসে রইল মাধবী, তারপর মৃদু গলায় বলল, 'তোমাকে আগে বলিনি— তুমি হয়তো কি ভাববে, আমাকে পাগল মনে করবে, কিন্তু স্বপ্নটা, উঃ —'

ধীর গলায় হেমাঙ্গ প্রশ্ন করে 'কি জাতীয় স্বপ্ন ?'

সেই ভাবেই গালে হাত রেখে বসে রইল ক্ষণকাল মাধবী, তারপর যেন আত্মকথনের ভঙ্গিতে টেবলের উপর দৃষ্টি রেখে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'হয়তো অদ্ভুত মনে হবে, কিন্তু ভোরের দিকে স্বপ্ন দেখলাম যেন আমার ছোটভাই নীলু আমার বিছানার ধারে এসে বসেছে, আমি বলছি— কিরে নীলু, এত রাত্তিরে কোথা থেকে ? নীলু বললে—দিদিভাই আমি আর বেঁচে নেই। বারোটার সময় মারা গেছি—কথাটা শুনে আমার ভারি মন খারাপ হয়ে গেল, হয়তো নিছক কল্পনা, স্বপ্ন মাত্র, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি স্পষ্ট তাকে দেখেছি, এমনি যেন আমার চোখের সামনে এসে বসেছিল সে, ওদিকে দেখছি পাশে শুয়ে তুমি অঘোরে ঘুমোচ্ছ।' কিছুক্ষণ থেমে মাধবী আবার বলতে শুরু করে, 'নীলু একথাও বলল আমি আজ সকালের ভিতরই খবর পাবো যে এ স্বপ্ন সত্যি, দিল্লী থেকে ট্রাঙ্ককলে খবর আসবে যে নীলু কাল রাতে মারা গেছে।'

সোজা ওর মুখের দিকে তাকায় হেমাঙ্গ—সে একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, মাধবী হঠাৎ এসব বলে কি, হল কি ওর ! হেমাঙ্গ সান্ত্বনার সুরে বলে, 'বেশ তো, এখন তো প্রায় দশটা বাজে, কেউ তো ফোন করেনি, আর ধর যদি—' ইতস্তত করে হেমাঙ্গ, তারপর আবার বলে, 'নীলু কিছুকাল ধরেই তো ভুগছিল, অবশ্য তোমরা দুজনে খুবই ঘনিষ্ঠ, কিন্তু তবু যা সত্য তাকে মেনে নিতে হবে, অনেক আগে থেকেই তো এই দুঃসংবাদের জন্য তৈরি হয়ে আছ। যদি সত্যিই এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে —'

মাধবী যেন ঘুমের ঘোরে কথা বলছে, সেই ভাবেই টেবলের দিকে চোখ রেখে বলে, 'তোমার কথাই সত্য, কিন্তু স্বপ্নের ভেতর নীলু আরো কিছু বলেছে। সে কি বলেছে জানো— ?' এইবার সোজা হেমাঙ্গর মুখের পানে তাকায় মাধবী। তার পর স্পষ্ট গলায় বলে, 'আমাকে সাবধানে করেছে নীলু, বলেছে আজ রাত বারোটার পর আমারও সব শেষ হবে—'

বিস্মিত হেমাঙ্গ বলে ওঠে, 'বল কি, আজই রাত বারোটা ? যতসব গাঁজা, তোমাকে আমি কতদিন বলেছি ওই সব ভূত-প্রেত আর গোয়েন্দা কাহিনী পড়া ছাড়ো, তুমি কিছুতেই কথা শুনবে না।'

মাধবীর কণ্ঠস্বর ক্ষীণ কিন্তু তীক্ষ্ণ, সে যেন আর্তনাদ করে উঠল, 'না, আমি আর বাঁচব না। আর বড়জোর চোদ্দ-পনের ঘণ্টা।' ঘড়ির দিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাধবী বলল, 'আর ক'টা ঘণ্টা মাত্র।'

এই বলে কান্নায় ভেঙে পড়ে মাধবী।

এক মুহূর্তের জন্য হেমাঙ্গর মনে করুণা হয়েছিল, সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে মাধবীকে বুঝি স্পর্শ করার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু সে ইচ্ছা দমন করে পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বার করে নাড়াচাড়া করে, তারপর কণ্ঠস্বর ঈষৎ মোলায়েম করে বলে, 'দেখ, এ সব তোমার বানানো গল্প কিনা কে জানে, যদি সত্যি বলেই ধরি তাহলেও স্বপ্ন। আর যদি স্বপ্ন হয় তাহলে দুঃস্বপ্ন। দুঃস্বপ্নকে মনে মনে রেখে বসে থেকেও কোন লাভ নেই, তাকে ভুলতে হয়, ভুলতে শেখো। তা নিয়ে বৃথা মন খারাপ করে বসে থেকে লাভ কি ?'

তন্দ্রাচ্ছন্ন ভঙ্গিতে বলে মাধবী, 'নীলু বললে, যখন খবরটা পৌঁছবে তখন বুঝবে আমার কথা সবটুকু সত্যি। সে যে ভবিষ্যৎ-বাণী করছে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।'

হেমাঙ্গ বললে, 'ছাই প্রমাণ পাবে, কিছুই প্রমাণ হবে না। তুমি জানতে তোমার ভায়ের কঠিন অসুখ, সে অনেকদিন ধরে ভুগছিল,—মাধবী তুমি লেখাপড়া জানা মেয়ে, নিশ্চয়ই জানো মাঝে মাঝে ভাই-বোনের মধ্যে এই জাতীয় সংবাদ আদান প্রদান ঘটে থাকে। ওকে বলে টেলিপ্যাথি—কোথায় কি হচ্ছে ওরকম বোঝা যায়।'

জানলার কাছ থেকে সরে এসে পরম প্রীতিভরে মাধবীর মাথায় হাত রাখে হেমাঙ্গ। সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বেশ মোলায়েম কণ্ঠে বলে, 'শোন মাধবী, ব্যাপারটা বেশ করে তলিয়ে ভাবো। আজ এই উনিশশো পঞ্চান্নয় তোমার এই ব্রাইট স্ট্রীটের বাড়িতে এই ধরনের ভৌতিক বাণী কি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, তার চেয়ে মাথাটা মাটির দিকে করে আর পা দুটি ওপরে করে হাঁটতে শেখা বরং সহজ।

এসব কাণ্ড কখনও ঘটে না। তাছাড়া নীলু তোমাকে যেরকম ভালবাসে, সে কখনই এই ভাবে স্বপ্নে ভয় দেখাবে না। সুতরাং উঠে পড়, যা কাজ আছে কর, খাও, দাও স্ফূর্তি কর। শুনছ ?'

হেমাঙ্গ লক্ষ্য করল মাধবী কাঁপছে, তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ওর কাঁধটা সজোরে ধরে, সাহস ও শক্তি দেওয়াটাই তার উদ্দেশ্য। স্বপ্নের ব্যাপারটি নেহাৎ একটা মনগড়া ফাঁকা আওয়াজ যে নয় তা এতক্ষণে বিশ্বাস হয়েছে হেমাঙ্গর, একটু আগেও ভেবেছে মাধবী অভিনয় করছে, ওকে বিভ্রান্ত করাটাই হয়তো তার ফন্দি।

মাধবী একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বলে, 'আচ্ছা, তুমি যা বলছ তাই হয়তো ঠিক। আমারই কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নটা হয়তো আমার মনোবিকার।'

একটু পরেই আবার টেলিফোন বেজে উঠল।

আবার মুখে হাত চেপে মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইল মাধবী। অতি দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল হেমাঙ্গ টেলিফোন রিসিভ করতে। ফিরে এল কিন্তু অনেক পরে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করল মাধবী, 'কি, দিল্লী থেকে খবর এল তো ? নীলু তাহলে নেই !'

মাথা নেড়ে সায় দেয় হেমাঙ্গ। সে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এতক্ষণ পর্যন্ত যা হাসি ঠাট্টার বিষয় ছিল, এখন তা নিষ্ঠুর সত্য হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে।

কি যেন বলার চেষ্টা করল হেমাঙ্গ, কিন্তু তার মুখে কথা যোগায় না, বিষয়টির ভয়ঙ্করত্বে সে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। সান্ত্বনা দিয়ে তবু আর একবার টেলিপ্যাথির কথা উচ্চারণ করে হেমাঙ্গ।

সব কাজকর্ম ছেড়ে সারাদিনটা মাধবীর সঙ্গে কাটাবে স্থির করল হেমাঙ্গ। মাধবী কিন্তু ভীষণ আপত্তি জানাল। অবশেষে বলল, 'একা থাকলে তবু একটু শান্তি পাব, অনেক ভাল থাকব হয়তো, একটু আমাকে না হয় একা থাকতে দাও।'

বেরিয়ে যাওয়ার সময় হেমাঙ্গ গম্ভীর গলায় বলল, 'সত্যি বলছি, তখন তোমাকে ঠাট্টা করেছি বলে এখন মনে কষ্ট হচ্ছে, ওই টেলিফোনের কথাটি বলা উচিত হয়নি আমার।'

মাধবী বেশ ঠাণ্ডা গলায় বলে উঠে, 'তাতে কি, বেশ করেছ, সংসারে এমন ঘটেই থাকে।'

হেমাঙ্গর গাড়ির আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই মাধবী তাড়াতাড়ি গিয়ে টেলিফোনটা ধরে, ওপার থেকে সাড়া আসতেই কান্নায় আকুল হয়ে উঠল মাধবী। অপর পক্ষ কোমল গলায় প্রশ্ন করে, 'হল কি তোমার ? বলতেই হবে সব খুলে।'

অতিকষ্টে, মাঝেমাঝে চাপা কান্নায় বাধা পেয়ে, ওপার থেকে শোনা কথায় আঘাত পেয়ে কোন রকমে সমগ্র কাহিনী শেষ করলে মাধবী। কিন্তু স্বপ্নের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এমন কতকগুলি নতুন কথা বলল যা হেমাঙ্গ বলেনি।

'প্রতুলদা, আমার বিছানায় নীলু যখন বসেছিল, তখন আমি ওকে প্রশ্ন করলাম যা ঘটবার তা ঘটবেই, তবু আমাকে সাবধান করার হেতু কি! আমি জানতে চাইলাম, কোন উপায় আছে কি বাঁচবার ? নীলু বলল—একেবারে নেই বলে কোন কথা নেই, পালাবার পথ নিশ্চয়ই আছে, ভাগ্যের হাত থেকে বাঁচার রাস্তা হল অতিশয় সাবধানে থাকা। তাহলে হয়তো পরিত্রাণ পেতে পার। কিন্তু প্রতুলদা, তারপর আমার মুখের দিকে অতি বিষণ্ণ চোখ মেলে বলল—কিন্তু মাধুদি তোমার যেরকম কাণ্ড, প্রতুলদাকে নিয়ে যেভাবে মেতে আছ তাতে যে তুমি অত সহজে নিষ্কৃতি পাবে মনে হয় না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, অপর প্রান্ত থেকে যে কথা ভেসে আসছে অতিশয় আগ্রহ ভরে তাই শুনছে মাধবী। তারপর অতি ক্ষীণ গলায় বলে, 'প্রতুলদা, আমি বেশ বুঝতে পারছি এ যাত্রা আর নিস্তার নেই, স্বপ্নের একাংশ যখন ফলে গেছে তখন অপর দিকটাও নিশ্চয়ই ফলে যাবে। কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। প্রতুলদা আমাদের...'

অপর প্রান্ত থেকে প্রতুলদা বলে ওঠে, 'ননসেন্স, কি সব বাজে বকছ, একটু শক্ত হও, লক্ষ্মীটি, এই সময়ে মনটাকে অত দুর্বল করতে নেই।'

এবার জোর গলায় বলে মাধবী, 'না প্রতুলদা, ব্যাপারটা সবটুকু একেবারে ননসেন্স নয়। আজ সকালেই লক্ষ্য করেছি উনি আমাকে বেশ সন্দেহ করছেন, বেশ বাঁকা বাঁকা কথাও বলেছেন, আমি সব সয়ে গেছি। এমন কি এই ইঙ্গিতও করেছেন যে কোন ভালবাসার জনের ফোন পাওয়ার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে আছি। এরপর আর কি বলবে ?'

'ও বাবা, এত সব কাণ্ড ঘটেছে ?'

'হ্যা, সেই জন্যেই আমি বিশ্বাস করছি যে নীলুর ব্যাপারটা নিছক উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়।'

প্রতুল বলল, 'কিন্তু মাধবী, আমি না হয় ধরছি নীলুর কথাই ঠিক, তবু জিনিসটা অবিশ্বাস্য। ধর, আমাদের এই ব্যাপার হেমাঙ্গ জানল, তা সে কি তোমাকে খুন করবে, অন্তত তুমি তো সেই কথাই বলছ ?'

'জানি না কি করবে না করবে। শুধু এইটুকু বুঝছি আমার ভয় হয়েছে, ভীষণ ভয়। আজ আর আমাদের দেখা করার দরকার নেই। অন্তত বিপদটুকু না কাটা পর্যন্ত দেখা না করাই ভাল। আজ যদি দেখা না হয় আমাদের, তাহলে হয়তো নীলুর কথাটা বিফল হতে পারে। খানিকটা আত্মত্যাগ বলা যেতে পারে। নীলু বলেছিল তোমার যা অবস্থা তাতে হয়তো তুমি সামলাতে পারবে না। তাহলে আর যাচ্ছি না....।'

অনেক বিতর্কের পর প্রতুলের কণ্ঠস্বর রাজী হল, তারপর শান্ত গলায় সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'কিন্তু মাধবী, কথা দাও তুমি এসব কথা নিয়ে মোটে চিন্তা করবে না। এতটুকু মাথা ঘামাবে না। আমি আবার তোমাকে রাত বারটার পর ফোন করব।'

'আচ্ছা, তাই করো প্রতুলদা, আমাকে তুমি ঠিক রাত বারটার পর ফোন করবে, স'বারোটার ভেতর।...তাহলে বুঝব বিপদ কাটল আর তুমিও জানবে কি খবর !'

কিন্তু—' প্রতুল কি প্রশ্ন করতে যায়।

মাধবী তাড়াতাড়ি বলে, 'কোন ভয় নেই, একবার শুলেই ওর জ্ঞান থাকে না, একেবারে পাথর হয়ে যায়। এমনিতেই এত ঘুম, তায় আজ আবার শনিবার, ক্লাব হয়ে ফিরবে, বুঝতেই পারছ এতটুকু জ্ঞান থাকবে না। ঠিক তাহলে বারটার পর ফোন করবে। তুমিই ফোন করো, যদি বুঝতে পারে, বলব বঙ নাম্বার।'

খাওয়া দাওয়া অনেকক্ষণ শেষ হয়েছে, হেমাঙ্গ শুতে গেছে অনেক আগে। আয়নার দিকে তাকিয়ে ড্রেসিং টেবলে চুপ করে বসে আছে মাধবী। হেমাঙ্গকে অনেক বুঝিয়ে শুতে পাঠানো হয়েছে। কিছুতেই সে শোবে না, বলেছিল, 'তুমিও বরং শুয়ে পড়, আজ আর সেলাই করে কাজ নেই, সারাদিন ধরে মনটা ক্লান্ত হয়ে আছে, বিশ্রামের প্রয়োজন।'

মাধবী চুপ করেছিল।

তবু বারবার বলেছে হেমাঙ্গ, 'ঠিক বলছ তোমার শরীর ভাল আছে ?'

মাধবীর চোখের কোণে জল দেখে হেমাঙ্গ শুতে গেছে। এতক্ষণে মাধবী একটু স্বস্তি বোধ করছে, শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি, আর কতটুকুই বা বাকি, এর মধ্যে কি আর ঘটতে পারে ? স্বপ্নের প্রথম দিকটা মিলেছে, তাই শেষটাও মিলবে এমন কথা নেই। কাল শরীর বুঝে না হয় প্লেনে চলে যাবে দিল্লী। নীলুর কথাটাও তো মোছা যায় না মন থেকে। জানলার ধারে গিয়ে পরদাগুলি ঠিকমত টেনে দেয় মাধবী। জানলার নিচেই ছোট্ট বাগান, কত বিচিত্র মরসুমী ফুল ফুটে আছে, এই ম্লান আলোয় অস্পষ্ট কার্পেটের মত মনে হয়।

কত কাছে অথচ কত দূরে। জানলায় কোন পরদা নেই, নতুন ফ্যাশান, যদি এই জানলার ফাঁকে উড়ে যাওয়া যেত, সত্যি যদি পাখনা থাকত, কত মজাই না হত, হেমাঙ্গর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে ডানা মেলে উড়ে চলে যেত মাধবী, কত দূর-দিগন্তের পারে মেঘের সঙ্গে গিয়ে মিশত।

কিন্তু কি সব কথা ভাবছে মাধবী, পাগলের মত। ডানাই বা মেলবে কেন, কলহ যদি হয় সামনের দরজাও খোলা রয়েছে—তারপর প্রশস্ত রাজপথ।

এখন সে অনেক ভাল আছে, এত ভাল আছে যে এই উদ্দাম চিন্তার উদ্ভট সম্ভাবনায় সে হাসতে পারছে।

এই স্তব্ধতার মধ্যে কিসের যেন একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা গেল, অপূর্ব তার ঝঙ্কার ! প্রথমটা কিছুতেই বুঝতে পারে না মাধবী শব্দটা কিসের। পরে মনে পড়ল সিঁড়ির ওপরকার ঘড়িটার ঘণ্টা বাজার আগে এমনই শব্দ হয়। তারপর ঘণ্টা বাজল, এক, দুই, তিন—

ভাল করে কান পেতে শোনে মাধবী। বারটাই বাজল শেষ পর্যন্ত। তবু কিছুক্ষণ সেইভাবে বসে

রইল মাধবী। বারটা যে বেজেছে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া চাই।

অনেকক্ষণ চুপ করে কপালে হাত রেখে বসে রইল মাধবী। সেই অশুভ মুহূর্ত পার হয়ে সে এসেছে নবীন জীবনে, সঙ্কটের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। বারবার ভাবে বিপদ কাটল।

পা টিপে একবার হেমাঙ্গর বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল, মুখে তার বিজয়িনীর দীপ্ত ভঙ্গিমা। তারপর পাশের ঘরে টেলিফোনটির সামনে বসে পড়ল। টেলিফোনটা বাজলেই সেটা যাতে ধরতে পারে। মনে মনে এক দুই করে সাত মিনিট, আট মিনিট পর্যন্ত সময় গুণলো। তারপর আর তার এতটুকু অপেক্ষা করার ধৈর্য থাকে না। চোরের মত অতি সন্তর্পণে সে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে কম্পিত কণ্ঠে প্রতুল লাহিড়ীর ফোন নাম্বারটা উচ্চারণ করে।

অনেক পরে ওপাব থেকে প্রতুলের কণ্ঠ শোনা যায়, 'হ্যালো।'

অনুযোগের সুরে মাধবী বলে, 'কি হল তোমার ? কখন বারটা বেজে গেছে, স'বারোটাও হয়ে গেল, তোমার সাড়া নেই কেন ?'

'সেকি ! এব মধ্যে বারটা পনের, হতেই পারে না, এখন তো পৌনে বারটা, তোমাদের ঘড়ি নিশ্চয়ই ভীষণ ফাস্ট চলছে।'

হঠাৎ পিছনে কি যেন খসখস করে উঠল। সচকিত মাধবী সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে পিছনে তাকিয়ে দেখে রবারের স্লিপার পায়ে হেমাঙ্গ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে, চোখের চাউনিটা কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মত।

উত্তেজিত ভঙ্গিতে মাধবী বলে, 'ওঃ, তুমি বুঝি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছ—'

তারপর সহসা রিসিভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উদ্দাম গতিতে মাধবী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। পিছনে যেন হেমাঙ্গও দৌড়ে আসছে, তার পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা সেই জানলার ধারে এসে পৌঁছায় মাধবী। ভীষণ আতঙ্কে তার সারা শরীর কম্পমান। তারপর হঠাৎ জানালার উপরে উঠেই শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

হয়তো তখনও ডানা মেলে দেওয়ার স্বপ্নের ঘোর তার কাটেনি।

'মাধবী, মাধবী !' চিৎকার করে ওঠে হেমাঙ্গ, কিন্তু কাছে আসার অনেক আগেই মাধবীর অচেতন দেহ মরসুমী ফুলের ওপর লুটিয়ে পড়েছে।

অনেক দূরে থানার ঘড়িতে বারটা বাজল।
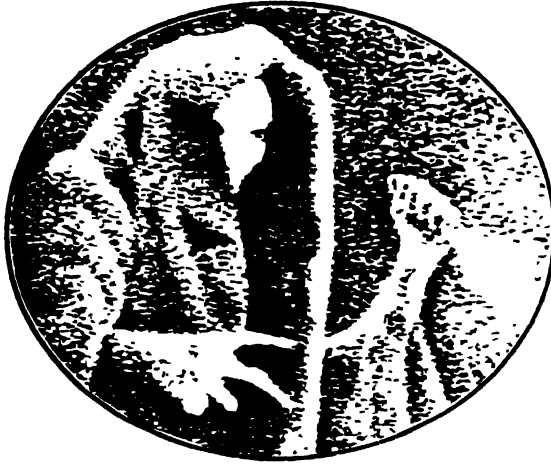
কুয়াশা

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মহীতোষের ডায়রির কয়েকটা পৃষ্ঠা। সেই ডায়রি থেকে থানার দারোগা ইউসুফ তাঁর এক বন্ধুকে যেমনটি বলেছিলেন তার জবানিতে :

ভয়ে গা'টা একেবারে কাঁটা দিয়ে উঠল মহীর।

তার সহজ বুদ্ধি-বিবেচনা ও বিচার দিয়ে বুঝতে পারছে, এমনটি হতে পারে না, হওয়া সম্ভবও নয়। তথাপি দু-চক্ষু দিয়ে একটু আগে যা সে দেখেছে, সেটাকে অস্বীকারই বা করে কি করে ? এবং একেবারে ভূতুড়ে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়েই বা দেয় কি করে ?

কিন্তু আশ্চর্য ! ভাবতে গেলে এখনো গা'টা যেন শিরশির করে উঠছে ; গায়ের লোমগুলো সোজা হয়ে উঠছে। টেবিলের উপরে রক্ষিত টেবিল-ল্যাম্পের শিখাটা আরো একটু উস্‌কিয়ে দিল মহী। আলোর শিখাটা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই উজ্জ্বল আলোয় তীক্ষ্ণ প্রখর অনুসন্ধানী চোখে আরেকবার মহী ঘরটার চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ঘরের প্রতিটি বস্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে—নাঃ, নেই কিছু। অথচ এই একটু আগেও দেখেছে সে স্পষ্ট।

যদিও ঘরের আলোটা ঈষৎ কমানো ছিল, তবু সেই কম আলোতেই সে স্পষ্ট দেখেছে। চোখের ভুল বলে উড়িয়ে দিতে পারে না। আলোটা চোখে লাগছিল বলে সামান্য একটু কমিয়ে ঝুঁকে পড়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে বইটা পড়ছিল মহী।

সুন্দর কমনীয় চুড়িপরা দু'খানি হাত কে যেন তারই ঠিক পাশে টেবিলের উপরে রাখল।

চুড়ির মিষ্টি মৃদু আওয়াজেই তার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল। একদৃষ্টে কতকটা গভীর বিস্ময়ের সঙ্গেই তার সামনে টেবিলের 'পরে ন্যস্ত চুড়িপরা হাত দুটির দিকে তাকিয়ে ছিল মহী। কী সুঠাম হাত দুটি, টেবিলের 'পরে ন্যস্ত হয়ে আছে ! যেন কোন দক্ষ শিল্পীর সাদা ক্যানভাসের উপরে অঙ্কিত দুটি বঙ্কিম রেখা। কিন্তু চোখ তুলে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গেই মহী যেন বিস্ময়ে ও ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত হয়ে গেছে। কেউ নেই তার সামনে। পার্শ্বে, পশ্চাতে বা ঊর্ধ্বে।

একা সে ঘরের মধ্যে আলোর সামনে বসে আছে। আশ্চর্য! তবে এই একটু আগে সে কার দুটি হাত দেখেছিল তারই সামনে টেবিলের উপর ন্যস্ত?

এতক্ষণে তার মনে পড়ে, বাড়িটা চমৎকার খোলামেলা দেখে অথচ কম ভাড়ায় সে যখন ভাড়া নেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে, দু'খানা বাড়ির পরের বাড়িটাতে যিনি থাকেন, রাধানাথবাবু তখন বারবার করে মহীকে বলেছিলেন, 'ও বাড়ি ভাড়া নেবেন না মহীবাবু, অনেকদিন থেকেই বাড়িটা অমনি খালি পড়ে আছে—'

'কেন বলুন তো?' বাড়িটা তো দেখলাম চমৎকার!'

'হ্যাঁ, বাড়িটা দেখতে-শুনতে চমৎকার সন্দেহ নেই, তবে—'রাধানাথবাবু কেমন যেন ইতস্তত করতে থাকেন।

'তবে কি মশাই?'

'মানে বাড়িটা সম্পর্কে নানা রকমের কথা শোনা যায়। এর আগেও দু-একজন এসেছেন, তবে টিকতে পারেননি এক রাত্রের বেশি।'

'তাই বুঝি অমন জায়গায় চমৎকার বাড়িটা আজও খালিই পড়ে আছে?' হাসতে হাসতে মহী বলে, 'কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক কি বলতে পারেন? ভূতের উপদ্রব আছে বুঝি বাড়িটায়?'

'জানি না মশাই। তবে বছর দুই অমনি 'ভেকেন্ট'ই পড়ে আছে এবং পূর্বে যে দু-চারজন ভাড়াটে এসে উঠেছিল, তারা এক রাত্রির বেশি থাকতে পারেনি—'

হাসতে হাসতে মহী জবাব দিয়েছিল, 'দেখুন রাধানাথবাবু, গত এক মাস ধরে বাড়ি খুঁজে খুঁজে আমি সারাটা শহর প্রায় চষে ফেলেছি, কিন্তু আমারও পক্ষে মানানসই হয়—একটু হাওয়া-বাতাস পেয়ে হাত পা মেলে থাকতে পারি, এমন একটি বাড়ি আজ পর্যন্ত দেখলাম না, যা ভাড়া পাওয়া যাবে। অথচ আমার ও আমার বুড়ি মার পক্ষে ওপরে-নিচে চারখানা ঘরওয়ালা ওই বাড়িটা একেবারে ঠিক যেমনটি খুঁজছিলাম, তেমনি। ভূতের ভয়ই থাক আর যাই থাক, এ সুযোগকে হারাতে আর যেই পারুক, আমি পারব না।'

'কিন্তু—'

'না রাধানাথবাবু, ভূতের ভয় তেমন আমার নেই।' মহী হাসতে হাসতে বলে, 'তাছাড়া সাতাশ বছর বয়স হল, আজ পর্যন্ত বহু কথিত ওই জীবটির দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটেনি, বাড়ি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সৌভাগ্যটা যদি একান্ত ভাবে উপস্থিত হয়, বহুদিনের আকাঙ্ক্ষাটাও সেই সঙ্গে মিটে যাবে।'

এমনি কি বাড়ির মালিক কান্তিবাবুও মহীর বাড়ি-ভাড়া নেওয়া সম্পর্কে এতটুকু আগ্রহ প্রকাশ করেননি এবং ভাড়ার কথা বলতে বলেছেন, 'দেখুন আগে আপনাকে বাড়িটা সুট করে কিনা। তারপর ভাড়ার কথা না হয় ঠিক করা যাবে।'

প্রত্যুত্তরে মহী বলেছে, 'না কান্তিবাবু, সেটি ঠিক হবে না। শেষকালে হয়তো একটা অসম্ভব ভাড়া হেঁকে বসবেন—যা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।'

'না, না, ভয় নেই আপনার। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনি। যদি আপনার থাকা হয়ই, যা ন্যায্য ভাড়া মনে করেন, তাই না হয় দেবেন—'

'মনে থাকে যেন—'

'থাকবে।'

সমস্ত বিচার-বিবেচনা-বুদ্ধি-শক্তি যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে মহীর।

একটু আগে যা সে স্পষ্ট দেখেছে, কোন মতেই সেটাকে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দিতে পারছেই বা কই?

আবার মহী বইটা খুলে বসল। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আবার তার মন বইয়ের বিষয়বস্তুর মধ্যে নিমগ্ন হল। আধঘণ্টাও বোধ হয় হয়নি মহী আবার দেখল, চুড়িপড়া পেলব হাত দুটি এবারে তার ডান দিকে টেবিলের 'পরে ন্যস্ত হল।

এবার কিন্তু মহী চোখ তুলে দেখবার চেষ্টা করল না। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ন্যস্ত হাত দুটির দিকে। কি সুন্দর চাঁপার কলির মত হাতের আঙুলগুলো। বাম হাতের অনামিকায় একটি

রক্তপ্রবালের অঙ্গুরীয়। কি সুন্দর নখাগ্র। যেন নখাগ্রগুলোতে কে চন্দনের প্রলেপ মাখিয়ে দিয়েছে।

অনিমেষে তাকিয়েই থাকে মহী।

'কি দেখছেন অমন করে ? ভয় করছে না আপনার ?' সুমিষ্ট মেয়েলি কণ্ঠে প্রশ্ন এল।

তথাপি মহী চোখ তুলে দেখবার চেষ্টা করে না। কি জবাব দেবে ভাবছে। চোখ তুলে চেয়ে দেখবে নাকি ?

'কি দেখছেন, বললেন না তো ?'

মহী চোখ তুলে তাকাতে লাগল। নাঃ, কেউ নেই। তবে কি সত্যি সত্যিই ব্যাপারটা ভৌতিক ? অবিশ্বাস্য ?

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, রাত দেড়টা বাজে।

মহীর কেমন যেন একটা রোখ চেপে গেছে মাথার মধ্যে। আবার সে পড়বার ভান করে, কিন্তু পড়ায় মন আর বসে না। দু-চক্ষুর দৃষ্টি তার অধীর অপেক্ষায় টেবিলের দিকে নিবদ্ধ।

তৃতীয়বার। পূর্ববৎ হাত দুটি ন্যস্ত হল টেবিলের উপরে এবং এবারে বাম দিকে প্রথমবারের মত।

'আশ্চর্য, আপনি এখনো ঘরের মধ্যে রয়েছেন ! ভয় পাননি ?' সেই মেয়েলি কণ্ঠ।

'ভয় ! ভয় কেন পাবো ?' মহী এবারে জবাব না দিয়ে পারে না।

'ভয় পাবেন না মানে ? আচমকা এমনি দুটো হাত দেখলে সবাই তো ভয় পায়। তাছাড়া—'

'তাছাড়া কি ?'

'আমার হাত দুটিই যে আপনার ওই কণ্ঠদেশকে মৃত্যুক্ষুধায় টিপে ধরবে না, কেমন করে জানলেন ?'

এবার আর মহী না হেসে থাকতে পারে না। হেসে ওঠে।

'হাসছেন যে ? বিশ্বাস হল না বুঝি আমার কথা ? জানেন, এই হাতে আমি গলা টিপে আমার স্বামীকে হত্যা করেছি ? চেয়ে দেখুন, দেখুন আমার আঙুলের বাঁকানো ধারালো নখরে এখনো রক্তের দাগ শুকিয়ে আছে—'

চমকে উঠল মহী। তবে কি নখাগ্রে ও রক্তের দাগ ? চন্দন নয়—রক্ত চন্দন নয় ?

আবার মুখ তুলে তাকাল মহী এবং পূর্ববৎ এবারেও দেখলে সে ঘর শূন্য।

এবং হঠাৎ ঠিক সেই মুহূর্তে দপদপ করে বারকয়েক কেঁপে উঠে টেবিল-ল্যাম্পটা নিভে গেল। ঘরটায় ভরে উঠল নিশ্ছিদ্র আঁধার। একটা চাপা বিষাক্ত নিশ্বাস যেন অন্ধকার ঘরটার মধ্যে জমাট বেঁধে উঠছে।

কেন বার বার আমাকে দেখবার চেষ্টা করছেন ? আমাকে দেখা যায় না। দেখতে পাবেন না আমাকে, কেবল আমার হাত দু'টি ছাড়া। স্বামী-হত্যাকারিণীর মুখ দেখাও যে পাপ, জানেন না এ কথাটা ? শোনেননি ?'

অন্ধকার যেন কথা বলে উঠল।

'কিন্তু আপনি যেই হোন—ভূত, প্রেতযোনী। জানবেন, ভয় দেখিয়ে আমাকে এ-বাড়ি থেকে সরাতে পারবেন না।' মহী এবারে বলে ওঠে।

'তাড়াবো কেন, থাকুন না ! তা আপনাকে একা দেখছি ? বিয়ে থা করেননি বুঝি ?'

'আপনারা যে লোকে বাস করেন শুনি, সব কিছুই তো আপনারা দেখতে পান, জানতে পারেন ! এ কথাটা জানেন না ?'

'কে বললে আপনাকে, আমরা সব কিছু জানতে পারি ? আমাদের গতিবিধি শক্তির একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। তার বেশি একচুলও এদিক ওদিক আমরা এগোতে পারি না।'

'তাহলেও বায়ুর জগতে শুনি লোকে বলে আপনারা বায়বীয় দেহ ধরে বাস করেন, সেদিক থেকে গতি আপনাদের যত্র-তত্র হওয়ারই তো কথা।'

'সেটাই তো হয়েছে মুশকিল। সব কিছুই আমাদের বায়বীয় হলে কি হয়, সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, হিংসা-ক্রোধ সবগুলো অনুভূতিই ঠিক আপনাদের মতই আমাদের বর্তমান।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা।

হঠাৎ আবার মহী প্রশ্ন করে : 'এই যে একটু আগে বলছিলেন, আপনি আপনার স্বামীকে হত্যা করেছেন, কিন্তু কেন বলুন তো ?'

'সকলকেই যে একঘেয়ে পতিব্রতা হতে হবে, তারই বা কি মানে আছে ? তাই পতিঘাতিনী হয়েছি আমি।'

'অদ্ভুত যুক্তি আপনার।'

'অদ্ভুত কিনা জানি না, তবে একজন পুরুষকে হত্যা করে আমার আশ মেটেনি—'

'বলেন কি ?'

'হ্যাঁ, আপনাকেও হত্যা করবার আমার ইচ্ছে হচ্ছে।'

'সর্বনাশ ! আপনার ইচ্ছাটি তো ভাল নয় !'

'তাই বলে ভয় পাবেন না যেন। এতক্ষণ ধরে আপনার মত কেউ এর আগে আমার সঙ্গে কথা বলতে সাহস পায়নি—'

'না পাওয়াটাই স্বাভাবিক, নয় কি ?'

'কিন্তু আর নয়, ভোর হয়ে এল। এবারে আমি আজকের রাতের মত আপনার কাছ থেকে বিদায় নেব। কিন্তু সকালে উঠেই পালাবেন না তো ?'

'পালাব কেন ? পালাবার কোন কারণই ঘটেনি।' মৃদু হেসে মহী বলে।

পরের দিন সকালে সারাটা রাত্রি জাগরণের পর একটু বেশি বেলা পর্যন্তই মহী ঘুমিয়েছিল। বাড়িওয়ালা কান্তিবাবুর ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল তার।

কান্তিবাবুও একটু আশ্চর্য হয়েছিলেন। পরম নিশ্চিন্তে মহীকে ঘরের মধ্যে এত বেলা অবধি ঘুমোতে দেখে।

ব্যাপার কি ! এত সকালে ?

'সকাল কোথায় মহীবাবু ? বেলা দশটা বাজে যে ! এখনো উঠছেন না দেখে—'

'ভয় নেই কান্তিবাবু। আপনার ভূতের সঙ্গে কাল রাত্রে বেশ আমার, যাকে বলে ভাবই জমে গেছে। বেশ বাড়িটি আপনার। শুধু খোলামেলাই নয়, চমৎকার একটা রোমান্সও এ বাড়িটার সঙ্গে আপনার জড়িত আছে।'

প্রচুর যেন হাসির কথা বলেছে মহী, এইভাবে সে হাসতে লাগল।

কিন্তু পরের দিন রাত্রি সওয়া একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন কারো দর্শন পাওয়া গেল না কতকটা যেন হতাশার সঙ্গেই মহী শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নিল এবং গত রাত্রের সেই অদ্ভুত অভিসারিণীর কথাই ভাবতে ভাবতে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল : হঠাৎ একটা শ্বাসরোধকারী অসোয়াস্তি ও বেদনায় ঘুমটা ভেঙে গেল। কঠিন হাতের দশ আঙুল দিয়ে কে যেন শায়িত তার গলা টিপে ধরেছে। উঃ, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে !

তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে আততায়ীর হাত দুটো ছাড়াবার চেষ্টা করতেই মহী চমকে উঠল। চুড়ি-পরা দুটি হাত লৌহ-বেষ্টনীতে তার গলা চেপে ধরেছে। নিয়মিত বারবেল-মুগুর ভাঁজার হাত মহীর। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করেও সেই অদৃশ্য আততায়ীর লৌহবেষ্টনী হতে নিজেকে যেন মুক্ত করতে পারে না সে।

একি ! ক্রমে শ্বাসবন্ধ হয়ে আসছে যে ! একটু হাওয়া। একটা গোঁ গোঁ শব্দ মহীর কণ্ঠ হতে বের হবার চেষ্টা করে।

হঠাৎ এমন সময় সেই অদৃশ্য হস্তের লৌহ-বেষ্টনী গলার ওপর থেকে শিথিল হয়ে গেল এবং শোনা গেল একটা সুমিষ্ট হাসি। খিল খিল করে আনন্দে কে যেন হাসছে।

টনটন করছে ব্যথায় এখনও মহীর গলাটা।

'কেমন লাগল ?' গত রাত্রের সেই নারী-কণ্ঠ।

মহীর গলা দিয়ে কোন স্বর তখনো বের হয় না।

পুনরায় নারী-কণ্ঠে প্রশ্ন হল, 'রোমান্সটা উপভোগ করলেন কেমন ? নারীর পেলব বাহুতে চিরদিন

আপনারা পুরুষেরা কামনার পরশই পেয়ে এসেছেন। মৃত্যুর পরশটা পেলব হাতে কেমন লাগল ?'

মহী তথাপি কোন জবাব দেয় না। চুপ করেই থাকে।

'কি ভাবছেন ?'

'ভাবছি, বিংশ শতাব্দীর নারী আপনি, না সেই আদিম প্রস্তর যুগের বন্যা নারী আপনি—'

বিংশ শতাব্দীর তন্বী নারীও তো সেই আদিম যুগেরই প্রবাহিকা। সেই রক্ত-মাংস, সেই সব—কেবল মাঝখানে হাজার হাজার বছরের একটা ব্যবধান মাত্র।'

'আপনি রাক্ষসী !'

'তবু নারী। এই নারীর জন্যই কি যুগে যুগে হ্যাংলা পুরুষ আপনারা আমাদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াননি ? এবং এখনও বেড়াচ্ছেন না ? যাকগে সে কথা, গলায় আপনার হাত বুলিয়ে দেব ?'

'রক্ষে করুন, যে নমুনা একটু আগে দেখিয়েছেন, আর হাত বুলিয়ে কাজ নেই।'

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল।

'ঠিক এমনি—এমনি ব্যথা লেগেছিল আমার, জানেন ? আমাকেও যে গলা টিপে হত্যা করেছিল।'

'কে ? কে হত্যা করেছিল আপনাকে ?'

'কে আবার ! আপনার মত এক পুরুষ ! কিন্তু আমিও তাকে হত্যা করেছি। প্রতিশোধ নিয়েছি। অনেক আশা করে সে এ-বাড়ি করেছিল। ভেবেছিল, আমাকে হত্যা করে আমারই অর্থে তৈরি এই বাড়িতে তার মনোমত বিবাহিত প্রিয়তমা স্ত্রীকে নিয়ে সুখে বসবাস করবে। নর্তকী-অভিনেত্রীর ভালোবাসা নাকি ভালোবাসাই নয়। কিন্তু নর্তকী অভিনেত্রী করেছিল অর্থের লোভে কে আমাকে ? বিবাহিত স্ত্রীকে অর্থের লালসায় রঙ্গমঞ্চে ঠেলে দিয়েছিল কে ?'

'আপনার কাহিনীটা শোনবার বড় ইচ্ছে হচ্ছে।'

'আমার কাহিনী ! কোন নতুনত্ব নেই তাতে। বাংলাদেশে অনেক হতভাগিনীরই জীবনে অমন ঘটনা ঘটেছে। কি শুনবেন সে পুরাতন কথা।'

'কিন্তু তা যেন হল, আমি তো আপনার কোন ক্ষতি করিনি, তবে আমার পেছনে আপনি লেগেছেন কেন ?'

'সব পুরুষই সমান। গোত্র এক।'

'তাহলে আপনি চান যে, এ-বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যাই ?'

'তা কেন যাবেন ! থাকুন না !'

'কিন্তু যেভাবে একটু আগে আজ আমাকে আপনি অভ্যর্থনা করেছিলেন, তার পরে আর থাকতে যে সাহস হচ্ছে না।'

'এই না আপনার ভূতের ভয় নেই বলছিলেন ?'

'ভূতের ভয় যে নেই, সে তো আপনি বুঝতেই পারছেন। কিন্তু আপনার মত পেত্নীকে এড়িয়ে চলাই মঙ্গল নয় কি ?'

'আমি পেত্নী ! জানেন, একদিন আমাকে একটিবার রঙ্গমঞ্চে চোখের দেখা দেখবার জন্যে প্রেক্ষাগৃহ ভরে যেত ?'

'তখন তো আপনি পেত্নী ছিলেন না !'

'ভারি দুঃসাহস তো আপনার ! এখুনি যদি আবার আপনার গলা টিপে ধরি ?'

'সত্যি সত্যিই ধরবেন নাকি ?'

'অসম্ভব নয় কিছু।'

'শুনুন তাহলে, আমি এইমাত্র মনে মনে একপ্রকার স্থির করেছি কি জানেন ?'

'কি ?'

'এ বাড়ি আমি ছাড়ব না—'

'আমার হাতে মরতে চান নাকি ?'

'ক্ষতি কি ! সে একটা বিচিত্র নাটকীয় মৃত্যুই হবে। একদিন না একদিন মরতে তো হবেই।'

তারপর প্রসঙ্গটা পাল্টে মহী প্রশ্ন করে, 'ঘরটা বড় অন্ধকার ; আলোটা জ্বালাব ?'

'আলো জ্বাললেই আমাকে চলে যেতে হবে—'
'তাই তো আমি চাই।'
'কেন, আমাকে কি আপনি সহ্য করতে পারছেন না?'
'না।'
'বেশ, তবে আমি চললাম—'

মহী বাড়িটা ছেড়ে গেল না বটে কিন্তু তার যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা গেল।
রাত্রি হলেই তার মধ্যে কেমন যেন একটা আত্মহত্যা করবার দুর্নিবার প্রচেষ্টা জাগে। আচমকা ঘুমের মধ্যে নিজের গলা দু-হাতে টিপে ধরে নিজেকে হত্যা করবার চেষ্টা করে।
মা এসেছেন।
তিনি বারবার ছেলেকে বলছেন, এ বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র কোথাও যেতে, কিন্তু মহী কোনমতেই রাজী হয় না। দিনের বেলাতে সে অত্যন্ত শান্তশিষ্ট, কোন কিছু বোঝবার উপায় নেই। রাত্রি হলেই বাড়ে তার অস্থিরতা। অধীর আগ্রহে ঘরের দরজা বন্ধ করে কার জন্য যেন প্রতীক্ষা করে। কাউকে সহ্য করতে পারে না।
'এমনি করে কতদিন তুমি এখানে থাকবে?'
মহী জবাব দেয়, 'যতদিন না তুমি আমাকে হত্যা করছ—'
'কিন্তু তোমার এ কষ্ট সহ্য করতে পারছি না।'
'তবে আমাকে হত্যা করো। আমিও আর সহ্য করতে পারছি না—'
'বেশ, তবে তাই হোক। তোমাকে হত্যাই আমি করব।'
'হ্যাঁ, তাই করো; আমাকে মুক্তি দাও।'
কিন্তু পারে না সে মহীকে হত্যা করতে।
প্রতি রাত্রের প্রতিজ্ঞা পরের রাত্রে শিথিল হয়ে যায়।
একজন করে প্রতিজ্ঞা। একজন করে চেষ্টা।
কাহিনীর শেষে দেখা গেল, একদিন প্রত্যূষে মহীর হিমশীতল মৃতদেহটা তার ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। তার গলায় দশ আঙুলের সুস্পষ্ট দাগ।
গলা টিপে শ্বাসরোধ করে কেউ তাকে হত্যা করেছে।
কিন্তু কে?
তার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল এবং টেবিলের ড্রয়ারে তার ডায়রিটা পাওয়া গিয়েছিল।
বাড়িটা আর ভাড়া হয়নি।

ভূতুড়ে কাণ্ড

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

যে কাজ যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না, কিংবা যে কাজ আশ্চর্যজনক ভাবে ঘটে যায়, তাকে আমরা বলি ভুতুড়ে কাণ্ড।

আবার ভূতেরা নিজে যে কাজ করে তাকে তো ভুতুড়ে কাণ্ড বলেই।

আমাদের পরিবারে এমনই এক ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটেছিল।

পরীক্ষা দিয়ে মামার বাড়ি বেড়াতে গেছি। দিদিমা আর মামাদের আদরের সঙ্গে প্রচুর আম জাম জামরুল খাচ্ছি। তোফা আনন্দে সময় কাটাচ্ছি।

তিন মামা। বড়মামা রেল অফিসে কাজ করতেন। বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে শহরের বাসাবাড়িতে থাকতেন। মাসে একবার বাড়িতে আসতেন।

তিনি মেজমামাকে তাঁরই অফিসে চাকরি করে দেবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু মেজমামা রাজী নন। ছেলেবেলা থেকে মেজমামা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। সব ব্যাপারেই বেপরোয়া।

তিনি বলেছিলেন, চাকরি-বাকরি আমার ধাতে পোষাবে না। আমি স্বাধীন ব্যবসা করব।

তা মেজমামা স্বাধীন ব্যবসাই শুরু করেছিলেন। পাঁচ মাইল দূরের মাছের ভেড়ি থেকে মাছ কিনে গঞ্জের হাটে ব্যাপারীদের কাছে সেই মাছ বিক্রি করা। পরিশ্রমের কাজ কিন্তু ভাল টাকাই হাতে থাকত।

ছোটমামা কিছু করত না। মামাদের চাষ বাসের জমি দেখত আর অবসর সময়ে জাল দিয়ে পাখি ধরত, কাঠি দিয়ে খাঁচা তৈরি করত আর তাতে পাখিগুলোকে রাখত। তবে বেশিদিন নয়। হঠাৎ একদিন খাঁচার দরজা খুলে পাখিগুলোকে উড়িয়ে দিত। এক নম্বরের খেয়ালী লোক।

আমাদের গল্প অবশ্য মেজমামাকে নিয়ে।

গল্পই বা বলি কেন, একেবারে আমার চোখে দেখা ঘটনা।

মেজমামা খুব ভোরে উঠে সাইকেলে রওনা হয়ে যেতেন। খুব ভোরে, তখন ভাল করে আলোও

ফুটত না। রাস্তাটা অনেকটা পাকা নয়। মানুষের পায়ে পায়ে চলে সরু একটু রেখা। বেশ কিছুটা যাবার পর ইউনিয়ন বোর্ডের পাকা রাস্তা।

একদিন ভোরেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। থেকে থেকে বিদ্যুতের ঝিলিক আর মেঘের গর্জন। বোঝা যাচ্ছে একটু পরেই ঝড়জল শুরু হয়ে যাবে।

মেঘের ডাকে আমিও ভোর ভোর উঠে পড়েছি। উঠে মেজমামার যাওয়ার তোড়জোড় দেখছি।

দিদিমা বললেন, ওরে, এই আবহাওয়ায় আজ না হয় নাই বেরোলি। আকাশের অবস্থা ভাল নয়। এখনই জোর তুফান উঠছে।

ঝড়কে দিদিমা তুফান বলতেন।

মেজমামা হাসলেন, তাহলে তো বর্ষাকালে বাড়ির বাইরে যাওয়া যায় না। আমার কাছে বর্ষাতি আছে। কোন অসুবিধা হবে না।

মেজমামা যখন বের হলেন, তখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। বাতাসও বেশ জোর।

আধ ঘন্টার মধ্যে দারুণ ঝড় উঠল। চারদিক অন্ধকার। বাজের শব্দে কান পাতা দায়। সেই সঙ্গে তুমুল বর্ষণ। এধারে ওধারে বড় বড় গাছ মড়মড় করে ভেঙে পড়ল কি বাড়ির চালা উড়ে গেল। ধসে পড়ল মাটির দেয়াল। দিদিমার কথাই ঠিক। তুফানই বটে।

আমি জানলার ধারে চুপচাপ বসে প্রকৃতির তাণ্ডব দেখছি। একটু পরেই দিদিমা এসে আমার পাশে বসলেন।

বসেই আক্ষেপ করতে লাগলেন, এই দুর্যোগে বাড়ির কুকুর বেড়াল বাইরে বের হয় না, আর এত বারণ করা সত্ত্বেও ছেলেটা রাস্তায় বের হল।

সত্যিই চিন্তার কথা। এই ঝড়জলে বর্ষাতি আর মেজমামাকে কতটুকু বাঁচাতে পারবে। হাওয়ার দাপটে সাইকেল চালানোই মুশকিল। সাইকেল থেকে নেমে যে কোন গাছের তলায় আশ্রয় নেবেন, তাও নিরাপদ নয়। মাথার ওপর গাছের ডাল ভেঙে পড়লেই হল।

সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা ঝড়বৃষ্টি চলল। দিদিমা খাওয়া দাওয়া ছেড়ে বিছানা নিলেন। মেজমামার নাম করে অঝোরে কান্না।

মেজমামা ফিরলেন রাত আটটা নাগাদ। সাইকেল নেই। হেঁটেই এসেছেন। হাঁটু পর্যন্ত কাদা। পরনের জামা কাপড় ছিন্নভিন্ন। বর্ষাতির খোঁজ নেই।

দিদিমা মেজমামাকে জাপটে ধরলেন। কিছুতেই ছাড়বেন না। শুধু কি জাপটে ধরা, ভেউভেউ করে কান্না।

মেজমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, আঃ ছাড়! জাপটাজাপটি আমার ভাল লাগে না। আমি মরছি নিজের জ্বালায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মেজমামা তোমার সাইকেল?

বটগাছ চাপা পড়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেছে।

বটগাছ চাপা?

হ্যাঁ, কাঞ্চনতলার কাছে দারুণ ঝড় উঠল। বটগাছের ডাল মড়মড় করে ভেঙে পড়ল আমার ওপর। সাইকেল চুরমার হয়ে গেল। আমি ছিটকে পড়লাম মাটির ওপর। এই দেখ না।

মেজমামা চুল সরিয়ে দেখালেন। মাথার এক জায়গায় রক্ত জমে কালো হয়ে আছে।

তারপর থেকে মেজমামা কেমন বদলে গেলেন।

মাছের ব্যবসা বন্ধ। সারাটা দিন ঘুমিয়ে কাটাতেন। রাত্রে বেরিয়ে যেতেন। কখন ফিরতেন কে জানে।

দিদিমা অনেক বলতেন, কিন্তু মেজমামা নির্বিকার।

শেষকালে দিদিমার নির্দেশে আমি শুতাম মেজমামার সঙ্গে। অবশ্য আলাদা খাটে।

একদিন খুব ভোরে মেজমামার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল।

এই, এক কাপ চা খাওয়াতে পারিস?

ঘরের কোণে স্টোভ ছিল। তাকের ওপর চা, চিনি কাপ ডিশ। আগে আগে ভোরে বের হবার

সময় মেজমামা নিজে চা করে খেতেন।

ঘুম জড়ানো গলায় বললাম, তুমি নিজে করে খাও না।

মেজমামা যেন ভয় পেয়ে গেলেন, না, আমি আগুনের কাছে যেতে পারব না। ভয় করে।

ভয় করে কথাটা মেজমামার মুখে নতুন শুনলাম। মেজমামা চিরকাল দুর্দান্ত প্রকৃতির। দারুণ সাহস।

সেই দুর্ঘটনার পর থেকে মেজমামা যেন কুঁকড়ে গেছেন। কারও সঙ্গে ভাল করে কথাও বলেন না। কেউ ডাকতে এলে বলে দেন, বল, আমি বাড়িতে নেই।

আরও আশ্চর্যের কাণ্ড মাথার একদিকের রক্ত জমে থাকাটা একই রকম রয়ে গেল। ওষুধপত্র মালিশ কিছুতে কিছু হল না।

অগত্যা উঠে চা তৈরি করে দিলাম। নিজেও খেলাম এক কাপ।

আর এক রাতে এমন এক ব্যাপার ঘটল, তাতে একটু ভয়ই পেয়ে গেলাম। ক'দিন গুমোট গরম পড়েছে। হাতপাখা নেড়ে নেড়ে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। কিছুতেই ঘুম আসছে না। বিছানায় এপাশ ওপাশ করছি।

বহুকষ্টে যাও-বা একটু ঘুম এল, সেটা পেঁচার কর্কশ আওয়াজে ভেঙে গেল।

ভয় পেয়ে উঠে বসলাম। জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। কোথাও একটু অন্ধকার নেই।

মেজমামার দিকে চোখ ফিরিয়েই চমকে উঠলাম। আমার মামার বাড়ির সবাই বেশ একটু খর্বকায়। মেজমামা আবার সবচেয়ে বেঁটে।

সেই মেজমামাকে দেখলাম, বিরাট চেহারা। দেহ খাটের বাইরে গিয়ে পড়েছে।

দুটো চোখ রগড়ে নিয়ে আবার দেখলাম একই দৃশ্য।

খাট থেকে নেমে পালাবার চেষ্টা করতেই দৃশ্য বদলে গেল। মেজমামা যেন নিজের সাইজে ফিরে এলেন।

মনকে বোঝালাম ঘুম চোখে নিশ্চয় ভুল দেখেছি। না হলে এমন ব্যাপার হতে পারে নাকি!

একথা কাউকে কোনদিন বলি নি, জানি কেউ বিশ্বাস করবে না।

কিন্তু পরে যা ব্যাপার ঘটল, তাতে আমি রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম।

এক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি, মেজমামা বিছানায় নেই। ভাবলাম প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেছেন এখনই ফিরবেন, কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেল, মেজমামা ফিরলেন না।

উঠে পড়লাম। জানলা দিয়ে বাইরে চোখ ফিরিয়েই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। মেজমামা রোয়াকে বসে আছে। জানলার দিকে পিছন ফিরে।

একটু দূরে গোটা কয়েক গাছ পার হয়ে একটা জাম গাছে ছোটমামা জাল পেতে রেখেছে পাখি ধরবার জন্যে। জালের এক জায়গায় ফুটো ছিল, ছোটমামা বোধ হয় লক্ষ্য করেনি। সেই ফুটো দিয়ে আটকে থাকা পাখিগুলো ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মেজমামা বসে বসেই হাত বাড়ালেন। কি বিরাট হাত। রোয়াক থেকে জাম গাছটার দূরত্ব কম পক্ষে ত্রিশ গজ তো হবেই।

হাতটা সোজা গাছের ওপর চলে গেল। যেখানে জালের ফুটো সেখানে। মেজমামা আঙুল দিয়ে জালে গিঁট বেঁধে দিলেন। পাখিদের পালানো বন্ধ হল।

আমি বুকের ওপর হাত চেপেও দুপদুপ শব্দ বন্ধ করতে পারলাম না। মনে হল এখনই অজ্ঞান হয়ে যাব। কোনরকমে কাঁপতে কাঁপতে খাটের ওপর শুয়ে পড়লাম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না। ভোরে উঠে দেখি মেজমামা খাটে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। আশ্চর্য কাণ্ড, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। কাল রাতে মেজমামা যখন রোয়াকে বসে তখন লক্ষ্য করেছি, দরজায় ছিটকানি।

তাহলে মেজমামা বাইরে গেলেন কি করে? বন্ধ দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যেই বা কি করে ঢুকলেন?

ঠিক করে ফেললাম, আর মামার বাড়ি নয়। কোন একটা অছিলায় বাড়ি পালাব।

এটাও কি চোখের ভুল? দু' দুবার এরকম চোখের ভুল হতে পারে কখনও!

দুপুরবেলা কিন্তু মত বদলে গেল। ছোটমামা জালে আটকানো পাখিগুলো নিয়ে খাঁচায় পুরছিল। আমি বসে বসে দেখছিলাম। মেজমামাও বসেছিলেন।

বেশির ভাগই মনুয়া আর টুনটুনি পাখি। একটা শুধু বড় আকারের টিয়া। গাঢ় সবুজ রং। লাল চোখ। কিছুতেই ধরা দেবে না। ছোটমামার হাতে ঠুকরে রক্ত বের করে দিল।

আমি তো তখন দেখছিলামই, আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করছিলাম। আড়চোখে দেখছিলাম উঠোনে মেজমামার ছায়া পড়েছে কিনা, আর তাঁর পায়ের আঙুলগুলো উল্টোদিকে কিনা!

দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। উঠোনের ওপর মেজমামার রীতিমত ছায়া পড়েছে আর তাঁর পায়ের আঙুলগুলো একেবারে স্বাভাবিক।

তার মানে রাত্রে নিশ্চয় আমি বিদঘুটে স্বপ্ন দেখেছি। পেট গরম হলে যা হয়। পেট ঠাণ্ডা করার জন্য রোজ সকালে একটা করে ডাব খেতে হবে।

আর বাড়ি ফিরে যাওয়ার বিপদও আছে। এখানে দিব্যি হেসে খেলে বেড়াচ্ছি, আর ওখানে বাবা রোজ পাঁচপাতা হাতের লেখা আর দশটা অঙ্ক কষাবে।

বেশ কিছুদিন অলৌকিক কিছু চোখে পড়ল না। বুঝতে পারলাম নিজের ভয়ের বিকৃত রূপটাই দেখেছি।

মেজমামা যে মাছের ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন, তাতে দিদিমা খুব খুশি। তাঁর দুশ্চিন্তার অবসান হয়েছে।

কিন্তু আমি ভাবি মেজমামার চলবে কি করে।

একদিন জিজ্ঞাসাই করে ফেললাম।

হ্যাঁ মেজমামা, তুমি যে মাছের ব্যবসা ছেড়ে দিলে ? কি হবে ?

মেজমামা চুল আঁচড়াচ্ছিলেন, ফিরে বললেন, কেন, তোর অসুবিধাটা কি হচ্ছে ?

মুশকিলে পড়ে গেলাম। সামনে গিয়ে বললাম, না, অসুবিধা আর কি ! আগে তুমি মাঝে মাঝে বড় বড় মাছ আনতে –

আমাকে থামিয়ে দিয়ে মেজমামা বললেন, ও, এই কথা ! তোকে আজই বড় মাছ খাওয়াচ্ছি।

মেজমামা বেরিয়ে গেলেন। ফিরলেন, হাতে একটা প্রকাণ্ড রুই মাছ নিয়ে।

আমি তো অবাক।

হ্যাঁ মেজমামা, এর মধ্যে এত বড় মাছ পেলে কোথায় ?

মেজমামা হাসলেন, একজন জেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মাছের ঝুড়ি নিয়ে হাটে যাচ্ছিল। আমার তো সবই চেনা। বলতেই দিয়ে দিল।

দিদিমার আনন্দ আর ধরে না। বঁটি নিয়ে এসেই মাছ কুটতে বসলেন। আমি কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম।

রোজ ছাই রঙা একটা উটকো বেড়াল এ বাড়িতে আসত। আহারের সন্ধানে। সেদিনও সে এসে হাজির।

বঁটির পাশে আঁশের স্তূপ। বেড়ালটা এগিয়ে এসে আঁশে মুখ দিয়েই বিকট স্বরে ম্যাঁও করে উঠল। অস্বাভাবিক স্বর। কেউ যেন তার গলা টিপে ধরেছে।

তারপর ল্যাজটা খাড়া করে সোজা পাঁচিলের ওপর গিয়ে উঠল। দিদিমাও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন।

তিনি বললেন, বেড়ালটার কি হল বল তো ? ওভাবে চেঁচিয়ে উঠল ! গলায় কাঁটা ফুটল না কি ?

কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখেছি বেড়ালটা একটা আঁশও মুখে তোলে নি। খাওয়া তো দূরের কথা ! কেবল শুঁকেই ওই রকম চিৎকার করে উঠল। সব ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয়েছিল।

এমন কি দিদিমা যখন একটা কলাপাতায় বড় মাছের টুকরো ভেজে আমাকে খেতে ডাকলেন তখন একটু ইতস্তত করেছিলাম।

তারপর মনে সাহস এনে মাছের টুকরো মুখে দিয়ে আশ্বস্ত হয়েছিলাম। না, কোন গোলমেলে ব্যাপার নেই। দিব্যি সুস্বাদু মাছ।

কত অল্পেতে আমরা ভয় পেয়ে যাই। বেড়ালটার ওভাবে চিৎকার করে ওঠার হাজার কারণ

থাকতে পারে।

তবে সেদিন থেকে বেড়ালটাকে আর ধারে কাছে দেখতে পাই না। বোধ হয় অন্য কোন বাড়িতে আস্তানা গেড়েছে।

এতদিন কথাটা দিদিমা কিংবা ছোটমামাকে বলি নি। কারণ, প্রথমত সব ব্যাপারটা নিজেই ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারি নি। হয়তো আমারই চোখের ভুল কিংবা ভয়ের ছায়াটা রূপ ধরে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

দ্বিতীয়ত প্রয়োজন হলে এই অলৌকিক কাণ্ড যে কাউকে দেখাতে পারব, এমন সম্ভাবনা কম।

তাছাড়া দিদিমাকে নিজের ছেলের সম্বন্ধে কি করে এসব কথা বলি।

তবে আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম আর একবার এরকম বীভৎস দৃশ্য চোখে পড়লেই মামার বাড়ি থেকে পালাব। এখানে আদরযত্নের লোভে তো আর বেঘোরে প্রাণ দিতে পারি না।

বেশ কিছুদিন সব স্বাভাবিক। কোথাও কোন গোলমাল হল না। মেজমামা অবশ্য মাছের ব্যবসায় আর গেলেন না। বাড়িতেও বিশেষ থাকতেন না। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াতেন কে জানে।

দিদিমা জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, একটা কিছু করবার চেষ্টায় আছি। কতদিন আর চুপচাপ বসে থাকব।

তারপরই অঘটন ঘটল।

মাঝরাতে বাথরুমে যাবার প্রয়োজনে বাইরে বেরিয়ে দেখি, ছোটমামা রোয়াকের এককোণে দাঁড়িয়ে। একেবারে পাথরের মূর্তির মতন নিস্পন্দ, নিশ্চল।

আমি কাছে যেতেই আঙুল দিয়ে বাগানের দিকে দেখাল। যা দেখলাম তাতে আমার মাথা ঘুরে গেল।

একটা গাছের ডালে মেজমামা পা ঝুলিয়ে বসে। মেজমামা মানে মুখটা মেজমামার, কিন্তু দেহটা বিরাট। মাথাটা প্রায় গাছের মগডালে ঠেকেছে। পা দুটো মাটির অল্প ওপরে।

কি খেয়ে খেয়ে বাগানের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলছেন। একটা ছিটকে এসে রোয়াকের ওপর পড়তে নিচু হয়ে দেখেই চমকে উঠলাম। রক্তমাখা হাড়ের টুকরো।

সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। মনে হল এখনিই বুঝি অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ব।

ছোটমামা আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরে আমার হাতটা শক্ত করে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসেছিল।

তারপর দিন পনের কি হয়েছে আমি জানি না। দারুণ জ্বরে আমি প্রায় বেহুঁশ।

দিদিমা চেয়েছিলেন আমার বাবাকে খবর দিতে, কিন্তু ছোটমামা অনেক বুঝিয়ে তাঁকে নিরস্ত করেছিল। ছোটমামা বলেছিল, শুধু ভয় পেয়ে আমার এই জ্বর। ডাক্তারেরও তাই মত। এর মধ্যে বাবাকে টেনে নিয়ে এলে আসল ব্যাপারটা তাঁকে জানাতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই কথাটা বাবা বিশ্বাস করবেন, এটা আশা করা যায় না।

অথচ তার পরের দিন সকালে দিদিমার পোষা ছাগলটা নিখোঁজ। খুঁজতে খুঁজতে বাগানের মধ্যে তার ছিন্নমুণ্ডটা পাওয়া গিয়েছিল। চারদিকে রক্তমাখা যে সব হাড়ের টুকরো পাওয়া গেল সেগুলো যে ছাগলেরই হাড় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু এমন কথা কে বিশ্বাস করবে ? বিশেষ করে শহরের লোক।

মেজমামা নাকি আশ্চর্যভাবে শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। হাঁটুর ওপর মাথাটা রেখে চুপচাপ বসে থাকতেন ঘরের মধ্যে। হাজার ডাকে সাড়া দিতেন না। খেতে ডাকলে রুক্ষকণ্ঠে উত্তর দিতেন, খিদে নেই। শরীর খারাপ।

দিদিমা যে মেজমামাকে এত ভালবাসতেন, সেই দিদিমা ছোটমামার কাছে সব শুনে মেজমামার ধারে কাছে ঘেঁষতে চাইলেন না।

আমি যখন সেরে উঠলাম, তখন ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়েছে।

শোবার ব্যবস্থা পালটে গেছে। একঘরে আমরা তিনজন শুতাম। একপাশে দিদিমা, অন্যপাশে ছোটমামা মাঝখানে আমি। সারারাত ঘরে আলো জ্বলত।

ছোটমামা দরজায় ভিতর থেকে ডবল তালা লাগিয়ে দিত। আমরা সবাই জানতাম অলৌকিক শক্তির পক্ষে এ তালা কোন বাধাই নয়, কিন্তু তবু বারণ করতে পারিনি।

ছোটমামা আর আমি ওই দৃশ্য দেখার পর, আমি আগে যা দেখেছি সব দিদিমা আর ছোটমামাকে বলেছি।

ছোটমামা বলল, কথাটা আগেই তোমার বলা উচিত ছিল, তাহলে আরও আগে ব্যবস্থা নিতে পারতাম।

কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাও ছোটমামা বলল।

বদনপুর এখান থেকে আড়াই মাইল। সেখানকার ভৈরব রোজা খুবই বিখ্যাত। তার খড়মের আওয়াজে ভূতপ্রেত থরথর করে কাঁপে।

তাকে পাওয়া একটু মুশকিল। লোকের ডাকে প্রায়ই ভিনগাঁয়ে চলে যায় আর দক্ষিণাও এক মুঠো টাকা।

দিদিমাকে ছোটমামা অনেক কষ্টে রাজী করাল। দিদিমা সব বুঝেও একটু ইতস্তত করলেন। হাজার হোক ছেলে তো।

ছোটমামা বোঝাল, বেশ তো, ভৈরব রোজা এলেই সব বোঝা যাবে।

খুব ভোরে ছোটমামা বেরিয়ে পড়ল। বদনপুরের ভৈরবকে যদি না পাওয়া যায়, তাহলে অন্য গাঁ থেকে তাকে ধরে আনতে হবে।

ছোটমামা যখন বের হয় তখন মেজমামা বাড়ি ছিলেন না। আধঘণ্টা পরে কোথা থেকে ফিরে এলেন।

চেহারা দেখে মনে হল অনেক দূর থেকে যেন ছুটতে ছুটতে আসছেন, হাঁটু পর্যন্ত কাদা। সারা দেহ ঘামে ভিজে গেছে। তাড়াতাড়ি আসতে গিয়ে ফতুয়াটা গাছের ডালে লেগে ছিঁড়ে গেছে।

দিদিমা রোয়াকে বসে তরকারি কুটছিলেন, আমি পাশে বসেছিলাম।

মেজমামা সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঠোঁটের দু পাশে ফেনা। লাল চোখ পাকিয়ে দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ছোনে কোথায় গেছে ?

ছোনে ছোটমামার ডাকনাম।

আমার বুকের দুপদাপ শব্দ আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম। ভয় হল অবশ হয়ে বঁটির ওপর না পড়ে যাই।

দিদিমা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, নিজের কি একটা দরকারে গেছে।

নিজের দরকার না ছাই। মেজমামা দাঁত কিড়মিড় করে উত্তর দিলেন, ভাই তো নয়, শত্তুর—শত্তুর ! আচ্ছা, ঠিক আছে।

কথাগুলো বলেই মেজমামা জোরে জোরে পা ফেলে বাড়ির চারপাশে ঘুরতে লাগলেন, দুটো হাত পিছনে, কেবল মাথা নাড়ছেন, থুতু ফেলছেন আর ঘুরছেন।

ব্যাপার দেখে দিদিমা আর সাহস পেলেন না। আমার হাত ধরে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজায় খিল তুলে দিলেন।

দিদিমার দিকে চেয়ে দেখি তার দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তাঁর মনের কষ্টটা বুঝতে পারলাম।

যতক্ষণ মেজমামা বাড়ির চারদিকে ঘুরতে লাগলেন, ততক্ষণ আমি আর দিদিমা ঘরের এককোণে চুপচাপ বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে মেজমামাকে আর দেখা গেল না। দিদিমা উঠে জানলা দিয়ে দেখে যখন নিঃসন্দেহ হলেন যে মেজমামা ধারে কাছে কোথাও নেই, তখন আমাকে খেতে দিলেন।

নিজে কিছু খেলেন না। ছোটমামা এলে এক সঙ্গে খাবেন।

আমি খাব কি ! তখনও শরীর থরথর করে কাঁপছে। মনে হচ্ছে কিছু খেলেই বমি হয়ে যাবে।

মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, কোন রকমে আজকের রাতটা কাটিয়ে কাল সকালেই বাড়ি রওনা হব। এখানে এভাবে ভয়ে কুঁকড়ে থাকলে শীঘ্রই শক্ত অসুখে পড়ে যাব।

ছোটমামা ফিরল বেলা আড়াইটে নাগাদ। সাইকেল রিকশায়। সঙ্গে ভৈরব রোজা।

আমি জানলা দিয়ে দেখতে লাগলাম।

ভৈরবের পরনে লাল টকটকে কাপড়। গায়ে কোন জামা নেই। গলায় অনেকগুলো রুদ্রাক্ষের মালা। দু হাতে রুদ্রাক্ষের তাগা।

লাল দুটি চোখ। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। ঝাঁকড়া পাকা চুল কাঁধ পর্যন্ত এসে পড়েছে।

ভৈরব নেমে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাতাসে কি যেন শুঁকল, তারপর ছোটমামার দিকে ফিরে বলল, কেউ গৃহবন্ধন করেছে।

ছোটমামা অবাক।

গৃহবন্ধন কি ?

কেউ মন্ত্র পড়ে গৃহবন্ধন করে দেয়, তাতে এই গৃহের মধ্যে কোন কাজকর্ম করলে তা ফল দেয় না।

কে এ কাজ করবে ?

যাকে তাড়াতে চাও সেই করবে।

কিন্তু তার পক্ষে তো কিছু জানা সম্ভব নয়।

ছোটমামার কথায় ভৈরব খুব জোরে হেসে উঠল।

প্রেতাত্মার পক্ষে সব কিছু জানতে পারাই সম্ভব। মানুষেব চেয়ে তারা অনেক বেশি শক্তির অধিকাবী হয়।

তাহলে উপায় ?

উপায় আছে বইকি। তুমি আগে সাইকেল-রিকশাকে বিদায় কর।

ছোটমামা সাইকেল-রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিল।

ভৈরব পাশে রাখা ঝোলা থেকে একটা মাটির সরা বের করল। তার ওপর চারটে পাকা লঙ্কা, একমুঠো সর্ষে, কতকগুলো কুশের ডগা রাখল। তারপর রাস্তার ওপরই বসে পড়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগল।

মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই লঙ্কা, সর্ষে আর কুশের ডগা আমাদের বাড়ির দিকে ছুঁড়তে লাগল।

পিছনে নিশ্বাসের শব্দ হতে ফিরে দেখলাম দিদিমা এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর চোখে তখনও জল।

আধ ঘণ্টা পরে ভৈরব উঠে দাঁড়াল।

ঠিক আছে। এবার বাড়ির মধ্যে চল।

ভৈরবের কাণ্ডকারখানা দেখে ইতিমধ্যেই রাস্তার ওপর গাঁয়ের কিছু লোক জড়ো হয়েছিল। ভৈরবের পিছন পিছন তারা বাড়ির মধ্যে এসে ঢুকল।

উঠানে মাটি দিয়ে বেদী করা হল। তাতে কাঠ, শুকনো ডালপালা নিয়ে আগুন জ্বালানো হল। ভৈরব সেই অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করতে করতে মাঝে মাঝে কাঠি করে ঘি ছিটিয়ে দিতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠতে লাগল।

ততক্ষণে সাহস পেয়ে আমি রোয়াকে গিয়ে বসেছি। দিদিমা আমার পাশে। ছোটমামা ভৈরবের কাছে। তার ফাইফরমাশ খাটছে।

আধ ঘণ্টা কিছু হল না। সব নিস্তব্ধ। শুধু ভৈরবের রুক্ষ গলায় মন্ত্র পাঠের শব্দ শোনা গেল। হিং টিং ছট করে অদ্ভুত ভাষা।

আমি যখন ভাবতে শুরু করেছি যে সবটাই বুজরুকি, তখন হঠাৎ শোঁ শোঁ আওয়াজ। ঠিক অনেক দূর থেকে ঝড় এলে যেমন হয়।

পশ্চিম দিকের গাছপালাগুলো ভীষণভাবে দুলতে লাগল। গাছের ডালে বসা কাকের দল চিৎকার করে আকাশে পাক খেতে লাগল।

একটু পরেই গাছপালার পিছন থেকে মেজমামা এসে হাজির। দুটি চোখ বনবন করে ঘুরছে। ফুলে উঠেছে নাকের পাটা। মুখে একটা মুরগি। বেচারি মরণযন্ত্রণায় পাখা ঝটপট করছে। মেজমামার দু কষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

মেজমামার সেই মূর্তি দেখে আমি ভয়ে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরলাম। দেখলাম উত্তেজনায় দিদিমাও ঠকঠক করে কাঁপছেন।

মেজমামা এসে দাঁড়াতে ভৈরবেরও চেহারা বদলে গেল। সে আরো জোরে জোরে মন্ত্র পড়তে লাগল। আগুনে মুঠো মুঠো কি ফেলল, তাতে আগুন আরো দাউদাউ করে জ্বলে উঠল।

মেজমামা এগোতে পারলেন না। গাবগাছের তলা পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বিশ্রীভাবে ভৈরবকে গালাগাল দিতে লাগলেন। আধখাওয়া মুরগিটা ছুঁড়ে দিল তার দিকে। মুরগিটা এসে পড়ল আগুনের মধ্যে।

কে তুই ? ভৈরব চেঁচিয়ে উঠল।

আমি দয়াল বাঁড়ুজ্জে। মেজমামা আরও জোরে চিৎকার করে বললেন।

না, তুই দয়াল ন'স। ঠিক করে বল, কে তুই ?

দয়াল বাঁড়ুজ্জে মেজমামার নাম। ডাকনাম টোনা।

বলব না।

মেজমামার সে কি গর্জন। ঠোঁটের দুপাশে ফেনা এসে জমল।

বলবি না ? আচ্ছা দেখি বলিস কি না।

ভৈরব পাশে পড়ে থাকা ঝাঁটাটা তুলে নিয়ে ঘটের ওপর মারতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মেজমামা আর্তনাদ করে উঠলেন। মনে হল ঝাঁটার প্রত্যেকটি ঘা যেন তাঁর দেহেই পড়ছে।

বলছি, বলছি, আর মারিস নি।

মেজমামা গাছতলায় বসে পড়লেন।

বল। ভৈরব ঝাঁটা আছড়ানো শব্দ করল।

আমি মহিন্দর ডোম।

ভৈরব দিদিমার দিকে চোখ ফেরাল, চেনেন মহিন্দর ডোমকে ?

দিদিমা একটু ভেবে নিয়ে বললেন, আমি কখনও দেখিনি। বাবার কাছে শুনেছি মহিন্দর পুজোর সময় ঢাক বাজাত। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে শরিকদের সঙ্গে গণ্ডগোল হওয়াতে তারা পিছন দিক থেকে মাথায় লাঠি মেরে লোকটাকে শেষ করে দিয়েছে।

মেজমামা আর বলব না। মহিন্দরই বলি।

মহিন্দর চুপচাপ সব শুনল। দিদিমার কথা শেষ হতে বলল, মাঠকরুণ ঠিক বলেছেন। শিবে আমার মাথায় লাঠি মেরেছিল। আমিও শোধ নিয়েছি। শিবের গুষ্টির ঘাড় মটকে পগারে ফেলে দিয়েছি। ওর বংশে বাতি দিতে আর কেউ নেই।

তুই দয়ালের দেহে এলি কি করে ?

সেদিন খুব ঝড়জলের সময় দয়াল সাইকেলে চেপে বটগাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল। ওটাই আমার আস্তানা। হঠাৎ মোটা একটা ডাল ভেঙে পড়ল দয়ালের মাথার ওপর। দয়াল খতম। তার সাইকেল চিঁড়েচ্যাপ্টা। আমি দেখলাম এমন সুযোগ আর পাব না। অমাবস্যায় বামুনের মড়া। অনেক বছর দেহহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সুড়সুড় করে ঢুকে পড়লাম।

এ দেহ তোকে ছাড়তে হবে। ভৈরব বলল।

মাথা খারাপ। আমি ছাড়ব না।

তবে রে।

আবার ঘটের ওপর ঝাঁটার আছড়ানি।

মাটির ওপর গড়াগড়ি দিয়ে মহিন্দর যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল।

একটু পরে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব, যাব।

কি করে বুঝব তুই গেছিস ?

কি করতে হবে বল ?

ভৈরব এদিক ওদিক দেখল। উঠোনের একপাশে মরচে ধরা একটা বরগা পড়েছিল। সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে ভৈরব বলল, ওটা দাঁতে করে তুলে নিয়ে যেতে হবে। আর একটা কথা।

বল।

গাঁ থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে চলে যেতে হবে।

ঠিক আছে। কাসুন্দিপুরের শ্মশানে আস্তানা বাঁধব। এদিকে আর আসব না।

যা তবে।

লোহার ভারী বরগা, যেটা তুলতে অন্তত জন চারেক লোকের দরকার, সেটা মহিন্দর অবলীলাক্রমে দাঁতে করে তুলে নিল।

আবার সেই ঝড়ো হাওয়া। গাছপালার মধ্য দিয়ে বরগা নক্ষত্রবেগে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

এদিকে নজর পড়তে দেখলাম মেজমামার প্রাণহীন দেহটা গাবগাছতলায় পড়ে আছে। দেহ থেকে বিশ্রী পচা গন্ধ বের হচ্ছে।

ভৈরব বলল, এখনই দেহটা সৎকারের ব্যবস্থা কর। অনেক দিনের বাসি মড়া।

দুম করে একটা শব্দ। দিদিমা অজ্ঞান হয়ে রোয়াকের ওপর ঢলে পড়লেন।

* * * *

এসব অনেক দিনের কথা।

দিদিমা কবে মারা গেছেন। মামারাও কেউ বেঁচে নেই। মামাতো ভাইবোনেরা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, খবর রাখি না।

আমারও বেশ বয়স হয়েছে।

খুব ঝড়জল শুরু হলে সব ঘটনাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

মাঝে মাঝে মনে হয় সত্যিই কি এসব অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটেছিল!

কিন্তু চোখের সামনে দেখা সব কিছু অস্বীকারই বা করি কি করে!

গিন্নি-মা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

দরজাব কড়া নাড়বার শব্দ শুনে যে আধবুড়ী মানুষটা দরজা খুলল তার পরনের কাপড়ে হলুদের ছোপ। চাউনিটা কেমন যেন ! মলিনাকে সে বলল, 'গিন্নি-মার সেবা-যত্ন করতে এসেছ, বাছা ? আমি তরকারিটা চড়িয়েছি। এস। তোমাকে আশীর্বাদ করছি : ভালয় ভালয় বাড়ি যেন ফিবে যেতে পার।'

মলিনা বেশ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। এসেছে আয়ার কাজ করতে। ভালয়-ভালয় কেন যে সে বাড়ি ফিরতে না পারে, কেন যে বুড়ীর আশীর্বাদ—কিচ্ছু সে বুঝতে পারল না।

এই আধবুড়ী মানুষটা পাগলি-পাগলি ধরনের। আপন মনেই কথা কয়। রান্নাঘরে যাবার সময় আপন মনে গজগজ করতে করতে সে বলে চলল, 'আবার জোয়ান ছুঁড়ি···কতগুলো ছুঁড়ির সব্বনাশ হতে দেখলাম যে··· নারায়ণ, নারায়ণ, মেয়েটা যেন বাঁচে···ঢলঢলেপানা মুখটা···আমার সেই মেয়েটার মত···নারায়ণ, নারায়ণ···মেয়েটা যেন···'

রান্নাঘরে তারপর থেকেই বুড়ী কাজের মানুষ।

তরকারি সাঁতলে মলিনাকে বলল, 'খুব সাবধান। প্লেট-টেটে যেন কিচ্ছু না পড়ে। ইদিক-উদিক হলেই গিন্নি-মা তুলকালাম করবে।'

প্লেটে খাবার সাজিয়ে দোতলায় গিন্নি-মার ঘরের ভেজান দরজার সামনে পৌঁছে মলিনার বুকের ভিতরটা দুরদুর করে উঠল। কেন যে হাত-পা শিরশির করতে লাগল সে বুঝল না। আয়ার কাজ সে নতুন করছে না। প্রায় পাঁচ বছর হল করছে। মিলনের সঙ্গে বিয়ের পর থেকেই। নইলে সংসার চলে না। কিন্তু এমনটা তো কই আগে কখনো হয়নি ! ভয়ডর নেই বলে মনে তার বেশ গর্ব ছিল। কিন্তু আজ এ কী ব্যাপার ? নিজের উপর সে বিরক্ত হল।

তারপর বেশ সন্তর্পণে হাঁটু দিয়ে ভেজানো দরজাটা খুলে সে ঘরের ভিতরে গেল।

রাস্তার দিকে দক্ষিণের জানালার একটা পাটি খোলা। আর সব জানালা বন্ধ। ঘরটায় তাই

আবছা আলো। খাটটা জানালা থেকে হাতখানেক দূরে। পর-পর তিনটে বালিশে মাথা রেখে গিন্নি-মা শুয়ে। শীতকাল, তাই গিন্নি-মার শরীর লেপে ঢাকা। শুধু দুটো হাত আর মুখ বেরিয়ে আছে। লেপ-ঢাকা শরীর ছোটখাটো পাহাড়ের মত। আর হাত তো নয়, যেন হাতির পা। ঝুলে-পড়া গাল দুটোর মধ্যে কত স্তর যে মেদ জমেছে কে জানে। মনে হয় তার শরীরে থলথলে মেদের নিচে হাড়গোড় বলে কিছু নেই।

কিন্তু চোখ দুটো অসম্ভব তীক্ষ্ণ। চোখে চোখ পড়লে বুকের ভিতরটা হিম হয়ে আসে! সাপের চোখের মত। এ-রকম নিষ্ঠুর চাউনি, এরকম মোটা শরীর জীবনে মলিনা দেখেনি।

সে শুনেছিল পঞ্চান্ন বছর ধরে পক্ষাঘাতে গিন্নি-মা বিছানায় শুয়ে। পঞ্চান্ন বছর হাঁটা-চলা নেই। তাই বেজায় মোটা হয়ে পড়েছেন। কোনদিন এ-রকম মানুষের মুখোমুখি যে হতে হবে মলিনার কল্পনাতেই ছিল না।

কুতকুতে চোখ দুটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মলিনাকে বিঁধে বাজখাঁই স্বরে গিন্নি-মা বললেন, 'তুই তা হলে নতুন ছুঁড়ি, আয়ার কাজ করতে এসেছিস? বেশ-বেশ। পাশের টেবিলে ট্রে-টা নামা। কাছে আয়। ভাল করে দেখি।'

ট্রে নামিয়ে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে গিন্নি-মার চোখ দুটোর দিকে আবার তাকাতেই মলিনার মাথার মধ্যে সবকিছু যেন উলটো-পালটা হয়ে গেল। মনে হল তার শরীরের মধ্যে দিয়ে যেন কারেন্ট বয়ে যাচ্ছে। মনে হল সে যেন ডুবতে বসেছে। তার শরীরটা যেন গলে যাচ্ছে। মনে হল, এই ঘরটা যেন নেই, খাট-চেয়ার-টেবিল-আলমারি নেই। গিন্নি-মাও যেন নেই। আছে শুধু কুতকুতে দুটো চোখ আর ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর একটা চাউনি। আর কিছু নয়…

কিন্তু সেটা মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল ঘর, চেয়ার-টেবিল খাট-আলমারি আর গিন্নি-মার ঢাউস শরীরটা।

গিন্নি-মা চোখ বুঁজে বলে চললেন, 'তোর বয়েসটা বেশ কাঁচা বলেই মনে হয়। বাইশ তেইশের বেশি নয়। শরীরটা মজবুত আর বেশ পুরন্তও। কিন্তু রূপের জোলুশ নেই। তোর বয়েসে আমি ছিলাম--যাকে বলে ডান-কাটা পরী। একমাথা ঘন চুল, মাখনের মত গায়ের চামড়া। ছিপছিপে শরীর। কোমরটা তোর মত ভারী নয়। কত ছোঁড়ার যে মাথা ঘুরিয়ে দিতাম। কত ছোঁড়া যে আমার সঙ্গে প্রেম করার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরত, যদি জানতিস,--কিন্তু আজ? পঞ্চান্ন বছর ধরে বিছানায় পড়ে। পঞ্চান্ন বছর মেঝেয় পা দিইনি। কিন্তু সে দিনগুলোর কথা ভুলিনি, যখন রূপসী ছিলাম, যখন জোয়ান ছিলাম, যখন যৌবন ছিল।'

গিন্নি-মার কথা শুনে তাঁর জন্য মলিনার কিন্তু বিন্দুমাত্র করুণা হল না। তার শরীরের অবশ ভাবটা আর নেই। কিন্তু তার বদলে মাথার মধ্যে হঠাৎ শুরু হয়েছে অসহ্য একটা যন্ত্রণা। মাথার মধ্যেকার দপদপ যেন কানের মধ্যে ধাক্কা দিচ্ছে! মলিনা তখন ঘর থেকে এক দৌড়ে একতলার রান্নাঘরে আধবুড়ী মানুষটার কাছে পালাতে পারলে বাঁচে।

হঠাৎ সুর পালটে গিন্নি-মা বলে উঠলেন, 'এই ছুঁড়ি, জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বালিশগুলো একটু উঁচু করে দে। নইলে খাব কী করে?'

মলিনা মাথাব বালিশগুলো ঠিকঠাক করছে এমন সময় গিন্নি-মা আচমকা তার ডান হাতের কব্জিটা চেপে ধরলেন। উঃ! এই মেদবহুল থলথলে হাত দুটোর মধ্যে এমন প্রচণ্ড শক্তির কথা কে কল্পনা করতে পেরেছিল? গিন্নি-মার ঠোঁটে একটা ধূর্ত হাসি ফুটে উঠল। তারপর অন্য হাত দিয়ে মলিনার কনুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত হাত বোলাতে লাগলেন। একবার আলতোভাবে চিমটি কাটলেন।

হাত বোলাতে বোলাতে গিন্নি-মা বলে চললেন, 'তুই ভেবেছিলি আমি একটা থলথলে বুড়ী? মোটেই নয়। শুধু খাবারে আমার তৃপ্তি নেই। জোয়ান বয়েসের দিনগুলোর কথা একটুও ভুলিনি। জোয়ান বয়েসের গা-শিউরনো আয়েসগুলোর কথা। ভেবেছিস বুঝি ডবকা ছুঁড়ি বলে একাই তুই সেগুলো ভোগ করবি! তাই না? তোর সিঁথিতে সিঁদুর। নিশ্চয়ই তা হলে বিয়ে হয়েছে। বরটা বেঁচে আছে? তোর বরের গল্প করে যা। ছোকরা লম্বা? জোয়ান? কী রকম জোয়ান? রোজ তোর সঙ্গে প্রেম করে? কবার করে প্রেম করে? খুব তাগড়া? খুব তাগড়া? বলে যা, বলে যা, বলে

যা—কেমন করে প্রেম করে—-কেমন করে প্রেম করে-

মরিয়া হয়ে এক ঝটকায় মলিনা তার হাত ছাড়িয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে গিন্নি-মার স্বর থেমে গেল। চোখের পাতা বুজে এল। তারপর ফাঁকা চোখে তাকিয়ে ট্রের দিকে থলথলে হাতটা তিনি বাড়ালেন।

রান্নাঘরে সে যখন পৌঁছল সর্বাঙ্গ তার থরথর করছে। গা গুলিয়ে-গুলিয়ে উঠছে। কী ঘিনঘিনে মন! কী জঘন্য মন! তার ইচ্ছে করছিল সবকিছু আছড়ে-আছড়ে ভাঙতে।

বালতি থেকে মগ-মগ জল তুলে দু হাতে হুড় হুড় করে সে ঢালতে লাগল।

আধবুড়ী মানুষটা তার দিকে সামান্য অবাক হয়ে তাকিয়ে বলে চলল, 'এর মধ্যেই গিন্নি-মার সঙ্গে খিটিমিটি বাধিয়েছ বাছা? মানুষটার সঙ্গে মানিয়ে চলা খুবই যে কঠিন সে-কথা মানছি। তবে পরের বাড়িতে চাকরি করতে গেলে অনেক কিছু সইতে হয়। তাই খুব সমঝে চল। কত মেয়েকেই যে আসতে যেতে দেখলাম আয়ার কাজ করতে! কেউই টিকতে পারে না। সত্যি কথাটা বলেই ফেলি। গিন্নি-মার মেজাজের দরুন সেই যে শ্রাবণ মাসে আয়া-মেয়েটা বাড়ি থেকে পালাল, আজ মাঘ মাসের আমাবস্যে—এর মধ্যে আয়ার কাজের জন্যে কাউকে জোগাড় করতে পারিনি। এ ক'টা মাস খেটে-খেটে আমার হাড় কালি হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমার মত দুটো আধবুড়ী আয়ার জোগাড় করেছিলাম। গিন্নি-মা তাদের দূর দূর করে তাড়াল। আধবুড়ী আয়া গিন্নি-মার দু চোখের বিষ। চায় জোয়ান-জোয়ান ছুঁড়ি। রোজ-রোজ কোথায় ছুঁড়ি ধরি বল তো বাছা? আর ছুঁড়িদের যেমন স্বভাব। ক'টা দিন কাটতে না কাটতেই গিন্নি-মার ঘর থেকে বেরিয়ে তাকে নকল করতে শুরু করে দেয়! আমাকে গেরাজ্যিই করে না। গিন্নি-মার মত হাত নাড়ে, গিন্নি-মার মত চোখ ক্ষুদি-ক্ষুদি করে কেমনতর যেন তাকায়, চোখ ঘোরায়। একটা তো গিন্নি-মার গলার স্বর অবিকল নকল করতে শুরু করেছিল। দেখেশুনে তো গায়ে কাঁটা দিত। বুকের রক্ত হিম হয়ে আসত। মেয়েটা তোমার বয়িসী ছিল। মাসখানেক টিঁকে ছিল। তারপর এক ভোরে বাগানের আমগাছটায় গলায় দড়ি দিয়ে মরে। কেন যে গলায় দড়ি দেয় আজ পর্যন্ত কেউ তার হদিশ করতে পারেনি। সে এক দারুণ হুজ্জত। দারোগা পুলিশে বাড়ি গিসগিস। হদিস করতে পারেনি।'

মলিনার দু-চোখ দিয়ে তখন অঝোরে জল ঝরছিল। সেদিকে তাকিয়ে আধবুড়ী মানুষটা বলে চলল, 'কেঁদো না বাছা, কেঁদো না। বুড়ী মানুষ। মাথার কি আর ঠিক আছে? ভীমরতি ধরেছে যে। যা বলে তা কি আর ভেবে চিন্তে বলে? তার কথায় কান দিয়ো না। মুখটি বুজে কাজ করে যেয়ো। আর একটা কথা বাছা—ওই সব ধিঙ্গি ছুঁড়িদের মত গিন্নি-মাকে আড়ালে-আবডালে কক্ষনো ভেংচি কেটো না—'

কিন্তু বেলা যত বাড়তে লাগল মলিনার মাথার যন্ত্রণাটাও বাড়তে লাগল তত। তার সঙ্গে অন্যমনস্কও হয়ে উঠতে লাগল। পদে-পদে কাজে তার ভুল হতে লাগল। পেঁয়াজ কুঁচোতে গিয়ে বুড়ো আঙুল কাটল। হাত থেকে পড়ে চাটনির পাথরের বাটিটা চুরমার।

বেজায় বেজার হয়ে বুড়ী মানুষটা বলল, 'হাত-পায়ে যে বশ নেই বাছা। বলি মনটা কোথায় পড়ে আছে গো? বরের কাছে?'

দুপুরের খাবার ট্রে-তে সাজিয়ে মলিনা গিন্নি-মার কাছে গেল। হাত-পা তখন বেজায় কাঁপছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। কিন্তু গিন্নি-মা তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। একটি কথাও কইলেন না।

মলিনা রান্নাঘরে ফিরে গেল। কাঁপা হাতে বাসন-পত্র ধুলো। কোন মতে নাকে-মুখে কিছু গুঁজল। আর কেবল ভাবতে লাগল সাড়ে সাতটা কখন বাজবে? কখন তার বরের ছুটি হবে? কারখানার ডিউটি সেরে মিলন তাকে কখন নিয়ে যেতে আসবে তার স্কুটারে?...মাথাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে...মিলন—মিলন, কখন তুমি আসবে?... মিলন—মিলন...

বুড়ী মানুষটার কাছ থেকে রাতের খাবারের ট্রে নিয়ে গিন্নি-মার ঘরে মলিনা যখন ঢুকল তখন সে

মনস্থির করে ফেলেছে। গিন্নি-মা যদি আগের মত তার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে নির্বিঘ্নে কথাগুলো বলেন, তাহলে সে আর ছেড়ে কথা বলবে না। নখ দিয়ে ফালি-ফালি করে ফেলবে থলথলে মুখটা। গেলে দেবে তাঁর সাপের মত ক্রূর চোখ দুটো।

উঃ, কিন্তু কী হয়েছে তার? এ-রকম ভাবনা কখনো তো তার মাথায় আসেনি। আর মাথা—মাথায় তার এমন যন্ত্রণা আর তো কখনো হয় নি!

কিন্তু কী আশ্চর্য !এবারওগিন্নি মা তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। একটি কথাও কইলেন না। মলিনা রান্নাঘরে ফিরে কাঁচের বাসনগুলো ধুলো। তারপর নিজের মুখ-হাত পরিষ্কার করে পুরোন হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে সিঁদুর কৌটো বার করে কপালে পরল বেশ বড়সড় লাল একটা টিপ।

এমন সময় দরজার সামনে শোনা গেল মিলনের স্কুটারের চাপা হর্ন। স্কুটারে সে কারখানায় যাতায়াত করে। ঠিক ছিল ফিরতি পথে এসে সে হর্ন দেবে। তারপর মলিনাকে পিছনে বসিয়ে বাড়ি ফিরবে।

এমন সময় আধবুড়ী মানুষটা গিন্নি-মার ঘর থেকে রান্নাঘরে ফিরে মলিনাকে বলল, 'যাও বাছা, গিন্নি মার সঙ্গে দেখা করে যাও। গিন্নি-মা বলে দিয়েছেন। তোমার বর এসে গেছে দেখছি। তাকে গিয়ে বলছি দু' মিনিট সবুর করতে।'

অসহায় চোখে বুড়ী মানুষটার দিকে তাকিয়ে মলিনা আবার গেল দোতলায় গিন্নি-মার ঘরে।

গলায় মধু ঢেলে গিন্নি-মা বললেন, 'তোর বর এসে গেছে, তাই না? জানলা দিয়ে তাকে স্কুটারে বসে অধৈর্য হয়ে হর্ন দিতে দেখছি।'

মলিনা বলল, 'হ্যাঁ গিন্নি মা।'

আবার গলায় মধু ঢেলে গিন্নি-মা বললেন, 'বেশ, বেশ। বাড়ি যাবি বৈকি বাছা। বরের স্কুটারের পেছনে বসে, তাকে সাপটে ধরে। তোকে আর ধরে রাখব না। এবার আমি ঘুমোব। শুধু যাবার আগে মাথার তলা থেকে একটা বালিশ সরিয়ে দিয়ে যা।'

তখনি মলিনার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। উচিত ছিল ঘর থেকে দৌড়ে পালানো। উচিত ছিল সেই সর্বনেশে হাত দুটোর নাগালের মধ্যে না যাওয়া। কিন্তু গিন্নি-মার মধু-ঝরা স্বরে তার মন খানিকটা ভিজেছিল।

বিছানার কাছে গিয়ে গিন্নি মার মাথার তলা থেকে একটা বালিশ সে সরালো আর বিদ্যুতের মত সেই সাঁড়াশি-শক্ত একটা হাত বজ্র মুঠোয় মলিনার একটা কব্জি ধরে তাকে নিজের কাছে টেনে আনল।

মলিনার গলা তখন শুকিয়ে কাঠ। যন্ত্রণায় মাথাটা যেন ছিড়ে যাচ্ছে। আর গিন্নি-মা সাপের মত হিসহিস করে বলে চলেছেন, 'নারে ছুঁড়ি, স্কুটারের পেছনে বসে বরকে সাপটে ধরে তোর আর বাড়ি ফেরা হবে না। জোয়ান বরটার সঙ্গে জীবনে আর রাতভোর আয়েস করে শিউরে-শিউরে উঠে প্রেম করা হবে না। বরটা তোর কোন দিন টেরও পাবে না সে-কথা! তুই যে আর মলিনা নোস, কী করে জানবে তোর তাগড়া বর? ভাববে তার জোয়ান ছুঁড়ি ডবকা বউ আরো জোয়ান হয়েছে! কী খুশি সে যে হবে... !'

মনে হোল গিন্নি-মা যেন কথা কইছেন না। কথা কইছে সাপের মত তাঁর ক্রূর চোখ দুটো। দেখতে দেখতে ঘরের আবছা আলো আরো আবছা হয়ে উঠল। সেই ক্রূর চোখ দুটো কয়লাখাদের মত নিকষ কালো হয়ে গেল। কালো আর গভীর। তারপর দুটো চোখ যেন এক হয়ে গিয়ে অমাবস্যার রাত হল। আর মলিনা সেখানে ডুবতে লাগল, ডুবতে লাগল...

ঘরটা বেজায় স্তব্ধ।

মলিনার মাথার মধ্যে আর যন্ত্রণা নেই। সর্বাঙ্গে শুধু একটা ঝিমঝিমে অবসাদ। সেই অবসাদ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল তার উরুতে, তার পায়ে, তার পায়ের গোছে। পা দুটো তার কী মোটা হয়ে গেছে! লেপের তলায় ছড়িয়ে রয়েছে। সাড় নেই কোন পায়েই।

নিজেকে দেখতে লাগল মলিনা। বিছানা ছেড়ে সে উঠল। কোমরের কশি আঁট করল। ঠিকঠাক করে নিল তার আঁচল। বড় আয়নায় নিজেকে দেখে মুখ টিপে হাসল। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। তারপর শুনতে পেল সিঁড়িতে তার চটি-পরা-পায়ের চটপট শব্দ।

এই প্রথম সে টের পেল পঞ্চান্ন বছর ধরে সে হাঁটেনি। জীবনে আর কোনদিন সে হাঁটতে পারবে না!

দুটো হাত তার নিশপিশ করতে লাগল। কী আশ্চর্য—হাত দুটোয় তার কী আশ্চর্য ক্ষমতা!

জানালা দিয়ে সে দেখল—মিলনের স্কুটারের পিছনের সিটে বসে তাকে সে সাপটে ধরেছে।

মিলনের গলা তার কানে এল, 'এত দেরি কেন?'

নিজের স্বর সে শুনতে পেল, 'গিন্নি-মা মাথার বালিশটা সরাতে ডেকেছিলেন।'

আয়না

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

মাস তিনেক আগে সন্ধ্যার পর বউবাজার স্ট্রীটের একজন বন্ধুর ফার্নিচারের দোকানে বসে গল্প করছিলাম। উত্তর দক্ষিণে লম্বা দোকানটির বেশির ভাগ জায়গা সরোজ গুদামের কাজে লাগিয়েছে। নানা প্যাটার্নের খাট, চেয়ার, আলমারিতে সেই গুদাম ভরতি। দোরের সামনে যে অল্প একটু জায়গা রয়েছে, সেখানে ছোট একটি টেবিল। সরোজের কাউন্টার। আমরা সেই টেবিলের ধারে দু'খানা চেয়ারে পাশাপাশি বসে সুখ দুঃখের কথা বলছিলাম।

বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। ফোঁটা কখনো ছোট, কখনো বড়। বৃষ্টিটা একটু জোরে শুরু হতেই সরোজ দোর বন্ধ করে দিল। বলল, 'কাণ্ড দেখ! এক ঝাপটায় সব ভিজিয়ে ফেলল। কার্তিকের শেষে এমন বদরসিক বৃষ্টি আর দেখেছ!'

বন্ধুর সেই বিরক্তিটুকু আমি উপভোগ করলাম। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'এবার যাই।'

কিন্তু সরোজ জোর করে আমার হাত ধরে টেনে বসাল, একটু ধমকের সুরে বলল, 'এসেই তো যাই যাই করছ! ন'মাসে ছ'মাসে একবার দেখা হয়, যদি দু-দণ্ড বসতেই না পার, তবে আস কেন?' তারপর হেসে নরম গলায় বলল, 'বসো আর একটু। মন-মেজাজ খুব খারাপ। যা ওয়েদার চলছে, তাতে কবে যে ফের খদ্দেরের মুখ দেখব, কে জানে!'

বললাম, 'তোমার গলায় সত্যিই বিরহের সুর ফুটছে।'

আমার কথা শেষ না হতেই দরজায় টোকা পড়ল। আমি গলা নামিয়ে বললাম, 'দেখ, তোমার খদ্দের বোধ হয় এবার একজন এলেন।'

সরোজ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন, দোর খোলাই আছে।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে দরজা ঠেলে এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। আমি একটু চমকে উঠে তাঁর দিকে তাকালাম। ভদ্রলোকের বয়স বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে। লম্বায় প্রায় ছ'ফুট। বেশ সুপুরুষ। গৌরবর্ণ চেহারা। নাক-চোখ টানা-টানা। শুধু সুপুরুষই নয়, ভদ্রলোক বেশ সৌখিন।

গায়ে গরদের পাঞ্জাবি। পরনে মিহি কোঁচানো ধুতি। এইটুকু পথ আসতেই বেশ একটু ভিজে গেছেন।

এমন একজন সুদর্শন পুরুষকে দেখেও আমার বন্ধু সরোজ খুব খুশি হয়েছে বলে মনে হল না। বরং তাকে যেন একটু অপ্রসন্নই দেখাল।

সরোজ গম্ভীর স্বরে বলল, 'বসো নিরঞ্জন। এই বৃষ্টি-বাদলের দিনেও বেরিয়েছ ?'

এতক্ষণ ভদ্রলোককে বেশ স্বাভাবিক সপ্রতিভ অবস্থায় দেখেছিলাম। কিন্তু সরোজের ওই সাধারণ একটি প্রশ্নে তিনি যেন অন্যরকম হয়ে গেলেন। যেন কি একটা গোপন অপরাধ তাঁর ধরা পড়ে গেছে। চোখে মুখে ঠিক তেমনি এক ধরনের নার্ভাস ভাব ফুটে উঠল।

তিনি যেন একটা অভিযোগের প্রতিবাদ করছেন তেমনি ভঙ্গিতে বললেন, 'হ্যাঁ, বেরিয়েছি। কি এমন ঝড়-ঝাপটা হচ্ছে যে মানুষ ঘর থেকে বেরোতে পারবে না! আমার এদিকে কাজ ছিল, তাই বেরিয়েছি।'

সরোজ একটু হাসতে চেষ্টা করে বললে, 'বেশ করেছ। দরকার থাকলে বেরোবে বৈকি! আমরা কি বেরোই না! বসো, ভাল হয়ে বসো।'

কিন্তু লক্ষ্য করলাম, ভদ্রলোকের মধ্যে যেন কিসের একটা চাঞ্চল্য আরম্ভ হয়েছে। তিনি তাকে জোর করে চাপতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু কিছুতে পেরে উঠছেন না। মনে হল, তিনি যেন একবার উঠে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু না পেরে হতাশ হয়ে বসে পড়লেন। যেন জোর করে তাঁকে কেউ উঠতে দিচ্ছে না, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকে রাখছে। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে কেমন যেন একটা অপ্রকৃতিস্থ বলে মনে হল।

তারপর হঠাৎ তিনি বললেন, 'সেই আয়নাখানা কোথায় ? বিক্রি হয়ে গেছে ?'

সরোজ তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি জানতুম, তুমি এ কথাটি ঠিক জিজ্ঞেস করবে। তুমি এর জন্যেই এসেছে।'

ভদ্রলোক ফের প্রতিবাদের সুরে বললেন, 'এর জন্যেই এসেছি ? আশ্চর্য তোমাদের ধারণা। আমার একটা জিনিস তোমাকে বিক্রি করতে দিয়েছি, সেটা তুমি বিক্রি করলে কি করলে না জিজ্ঞেস করলেই তা দোষের হয়ে গেল ?'

সরোজ শান্তভাবে বলতে চেষ্টা করল, 'আমি কি বলছি দোষের; তুমি এত চটছ কেন ? সত্যিই তো, তোমার জিনিসের কথা তুমি একবার কেন, হাজার বার জিজ্ঞেস করতে পার, তাতে কিছুই দোষের নেই। ওই তো তোমাদের সেই ড্রেসিং টেবিলটা রয়েছে। এখনো বিক্রি করতে পারিনি। ভেবো না, দরদাম হচ্ছে, একদিন বিক্রি হয়ে যাবে।'

'আমার ভাববার কি আছে।'

বলে ভদ্রলোক চেয়ারে চেপে বসে রইলেন। তারপর যেন নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে পড়লেন। ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়ালেন ড্রেসিং টেবিলটার সামনে। এতগুলি ফার্নিচারের মধ্যে আমি সেই টেবিলটাকে এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি। তিনি গিয়ে দাঁড়াতে এবার ড্রেসিং টেবিলটা আমার চোখে পড়ল। দেখলাম, টেবিল-আয়নাখানা সত্যিই বেশ সুন্দর। আগেকার আমলের বার্মাটিকে তৈরি। কালো পালিশ। আয়নাখানা বেশ পুরু আর স্বচ্ছ। আমি ফার্নিচার ডিলার নই। এসব জিনিস তেমন ব্যবহারও করিনে। তবু বুঝতে পারলাম, জিনিসটা বেশ দামী। আজকাল এ জিনিস খুব সুলভ নয়।

কিন্তু আয়নার মধ্যে ভদ্রলোকের মুখের যে ছায়া পড়েছে, তার দিকে হঠাৎ আমার চোখ পড়ায় আমি চমকে উঠলাম। বলতে লজ্জা নেই, আঁৎকে উঠলাম। এমন বিবর্ণ ভীত মুখ আমি আর দেখিনি। ভদ্রলোক আয়নার মধ্যে কি দেখছিলেন জানিনে, কিন্তু তাঁকে দেখে আমার মনে হল যেন তিনি আর আমাদের জগতের কেউ নন, কোন এক অলৌকিক লোকের অধিবাসী। ভয় জিনিসটা বোধ হয় সংক্রামক। নইলে তাঁর ভয় আমাকে এমন ভয়ার্ত করে তুলবে কেন ?

আমি সরোজকে ওঁর কথা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, দেখি সে ততক্ষণে উঠে গিয়ে ভদ্রলোকের একটা কাঁধ শক্ত করে চেপে ধরেছে। আমি তার গলা শুনতে পেলাম, 'নিরঞ্জন, নিরঞ্জন!'

ভদ্রলোক ফিরে এবার তাকালেন, অস্ফুট স্বরে বললেন, 'কি বলছ ?'

সরোজ ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'বলছি কি, তুমি এবার বাড়ি যাও। তোমাকে আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। বেশ রাত হয়ে গেছে। মাসিমা তোমার জন্যে ভাবছেন, বরানগর তো এখানে নয়। যেতেও তো সময় লাগবে। যাও এবার।'

ভদ্রলোক শান্ত বাধ্য ছোট ছেলের মত বললেন, 'হ্যাঁ, যাই, যাই। সত্যি, রাত হয়ে গেছে। আমি খেয়াল করিনি।'

তিনি এবার দরজার দিকে এগোতে লাগলেন। কিন্তু দু'পা যেতে না যেতে আবার ফিরে এসে আমার বন্ধুর দিকে চেয়ে বললেন, 'সরোজ।'

সরোজ কোমল স্বরে বলল, 'বল।'

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে বললেন, 'তুমি বরং আয়নাটা আমাকে ফেরৎই দাও। আমি ওটাকে বাড়ি নিয়েই রাখি। সেই আসতে তো আমাকে হবেই—'

তিনি একটু হাসলেন। সে হাসি যেমন করুণ, তেমনি বিষণ্ণ।

সরোজ বলল, 'কি যা তা বলছ ? এবার বাড়ি যাও তো তুমি! মাসিমা তোমার জন্যে ভাবছেন। শিগগির যাও।'

বলতে বলতে সরোজ তাঁকে একরকম জোর করেই ঘর থেকে বের করে দিল।

আমি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থেকে বললাম, 'ব্যাপারটা কি সরোজ ?'

জন দুই পালিশওয়ালা ভিতরের দিকে বসে কি কাজ করছিল, সরোজ আমার কথার জবাব না দিয়ে তাদের ধমকে উঠল, 'আচ্ছা, ফটিক, মুকুন্দ, তোমাদের কতদিন বলিনি, টেবিলটা সামনে না রেখে, ভিতরের দিকে কোথাও লুকিয়ে রেখ ? আমার কথা গ্রাহ্য হয় না, না ?'

পালিশওয়ালাদের একজন বলল, 'আজ্ঞে ছোটকর্তা, ভেতরেই তো ছিল। একজন খদ্দের নেবেন বলে গেলেন, তাই বাইরে এনে পালিশটালিশ করে রেখেছি। কই, তিনি তো আর এলেন না।'

দ্বিতীয় পালিশওয়ালাটি বলল, খোঁজ নিয়ে দেখুন তাঁর আসবার অবস্থা আছে কিনা! নাকি বেনেপুকুরের মধুবাবুর মত তাঁরও এতক্ষণে হয়ে গেছে।'

সরোজ ফের ধমক দিয়ে উঠল, 'কি যা তা বাজে কথা সব বলছ! নিজেদের কাজ করো তো!'

প্রথমজন বলল, 'আমাদের ধমকান আর যাই করেন ছোটকর্তা, আয়নাটাকে আপনি ঘর থেকে বিদায় করুন। কাউকে বিনি পয়সায় বিলিয়েও যদি দিতে হয়, তাও দিন আপনি। নইলে কবে যে আবার কি ঘটবে—'

সরোজ বাধা দিয়ে বললে, 'আঃ, ফের ওইসব কথা! তোমাদের মত Superstitious লোক নিয়ে কাজকর্ম করাই মুশকিল।'

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'সরোজ, ব্যাপারটা কি ?'

সরোজ একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'ব্যাপারটা বড়ই দুঃখের। নিরঞ্জনের যে এমন পরিণতি হবে, তা কোনদিন ভাবতে পারিনি। সত্যি কথা বলতে, কি ওর মত sane আর sober ছেলে আমাদের দলের মধ্যে আর দুটি ছিল না।'

বললাম, 'হঠাৎ কেন এমন হল ?'

সরোজ বলল, 'ঠিক হঠাৎ একদিনে হয়নি। আর একটা কারণেই যে অমন হয়েছে, তাও আমার মনে হয় না। তবু শেষের ঘটনা যে সবচেয়ে গুরুতর, তা মানতেই হয়। কিন্তু তোমাকে গোড়া থেকে না বললে কিছু বুঝতে পারবে না।'

বললাম, 'হ্যাঁ, গোড়া থেকেই বল।'

সরোজ তখন কাহিনীটা বলল : 'নিরঞ্জন হালদার সম্পর্কে আমার মাসতুতো ভাই। কিন্তু আত্মীয়তার চেয়ে ওর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কটাই আমার বড় ছিল। আমরা এক স্কুলে এক ক্লাসে পড়েছি। কলেজেও এক সঙ্গে ঢুকেছিলাম। আমি বছর দুই যেতে না যেতেই বেরিয়ে আসি। আর নিরঞ্জন ডিস্টিংশনে বি. এ পাশ করে। মেসোমশাই ছিলেন নাম করা অ্যাটর্নি। তাঁর ইচ্ছা ছিল নিরঞ্জন ল' পড়ে। কলেজে ভর্তিও হয়েছিল। কিন্তু মাস ছয়েক বাদেই ছেড়ে দিল। বলল, 'দূর, ভাল লাগল না!' এই নিয়ে মেসোমশাইয়ের সঙ্গে ওর সামান্য ঝগড়া-ঝাটি হয়েছিল। কিন্তু সে এমন বেশি কথা নয়, তিনি ছেলেকে খুবই ভালবাসতেন। একটা কড়া কথা বলে তিনি তিনবার গিয়ে

পিঠে হাত বুলোতেন। কিন্তু এত আদরযত্ন সত্ত্বেও নিরঞ্জন বিগড়ে গেল। বিরাজ গাঙ্গুলী বলে নিরুর এক পিসেমশাই ছিলেন। ও তাঁর খপ্পরে পড়ল। নিরুর পিসিমা অল্প বয়সে মারা গিয়েছিলেন। বিরজাবাবু আর বিয়ে করেননি। কিন্তু আর সবই করেছেন। জীবনটাকে উড়িয়ে-পুড়িয়ে না দেখলে তার রসটা পুরোপুরি ভাবে পাওয়া যায় না, এই ছিল তাঁর বাণী। নিরু তাঁর মন্ত্রশিষ্য হল। তাঁর সঙ্গে শেয়ার মার্কেটে যায়, রেসের মাঠে যায়, ফিরে এসে বসে পড়ে। খরচটা পিসেমশাই জোগান। কিছুদিন মেসোমশাই রাগ করে, অভিমান করে রইলেন। তারপর আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে জোর করে নিরঞ্জনের বিয়ে দিলেন। জোরটা অবশ্য ধমকের জোর নয়, চোখের জলের জোর। তাছাড়া যে মেয়েকে তিনি পছন্দ করেছিলেন, সে অসাধারণ সুন্দরী। তাকে দেখে নিরঞ্জনের নিজেরও মন টলল। বিয়ের পর নিরঞ্জনের বাইরের উদ্দামতা কমে এল। আমরা বললুম, 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।' এদিকে নিরঞ্জনের সেই মন্ত্রগুরু পিসেমশাই মারা গেলেন। খবরটায় আমার মেসোমশাই খুব নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু তাঁর শান্তি বেশিদিন টিকল না। নিরঞ্জন আবার বাড়াবাড়ি শুরু করল। এবারকার বাড়াবাড়ির জন্যে শুনলুম মীরা বউদিই দায়ী। কোন এক পুরোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় নিরঞ্জন নাকি সে রাত্রে মাত্র দুটি পেগ খেয়ে ফিরেছিল। তার জন্যে মীরা বৌদি স্বামীকে যা নয় তাই বলে গাল দিয়েছেন। রাগ করে অন্য ঘরে গিয়ে শুয়েছেন। নিরঞ্জন অনেক সাধাসাধি করেও বৌয়ের মান ভাঙাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ক্ষেপে গেছে। মাসিমা মেসোমশাই দুজনই এ নিয়ে মীরা বৌদিকে সেদিন বকাবকি করেছিলেন।

বছর পাঁচেক বাদে মেসোমশাইও চোখ বুজলেন। কিন্তু নিরঞ্জনের তখনও ফেরবার নাম নেই। শুই সেই পিসে বিরাজ গাঙ্গুলী যেন ওর মধ্যে নতুন জন্ম নিয়েছে।

এই সময় একদিন ছেলের অন্নপ্রাশনে ওদের নিমন্ত্রণ করেছিলাম। নিরঞ্জন আসেনি। মাসিমা আর মীরা বৌদি এসেছিলেন। শাশুড়ির অসাক্ষাতে মীরা বৌদি সেদিন আক্ষেপ করে বলেছিলেন, সরোজবাবু, বাবা আমাকে শুধু বাড়ি-ঘর দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন, কার হাতে দিলেন দেখেননি।

আমার স্ত্রী মল্লিকা বলেছিল, ওকথা কেন বলছেন মীরাদি। রূপ-গুণ বিদ্যা-বুদ্ধি কোনটাতেই তো তিনি খাটো নন। তাঁর তো সবই আছে।

মীরা বৌদি বলেছিলেন, মানুষ তো কেবল বাইরেটাই দেখে, ভিতরে যে থাকে সেই বোঝে সব থাকবার কি জ্বালা।

তাঁর সেই কথাগুলি আজও যেন আমার কানে লেগে রয়েছে।

আরো বছর তিনেকের মধ্যে নিরঞ্জন পৈতৃক বাড়ি-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি সব খোয়াল। দামী দামী সব ফার্নিচার ভারি সস্তায় বিক্রি করে দিল। আমাকে একবার জানালও না। আমি জানতে পারলে ওকে অমন করে ঠকাতাম না। মীরা বৌদি রাগ করে গিয়ে বাপের বাড়ি ছিলেন। ফিরে এসে দেখেন, বিয়ের সময় বাবার কাছ থেকে যৌতুক পাওয়া তাঁর খাট আলমারি পর্যন্ত নিরঞ্জন বিক্রি করে দিয়েছে। বাকি আছে ড্রেসিং টেবিলটা। তারও দরদাম হচ্ছে। মীরা বৌদি সেই আয়নার সামনে টেবিলের ওপর মাথা গুঁজে রইলেন। বললেন, আমাকে না বেচে তুমি আমার বাবার দেওয়া এই টেবিল বিক্রি করতে পারবে না। তাঁর দেওয়া একটা জিনিসও আমি রাখতে পারব না?

তারপর ওরা জোড়াবাগান ছেড়ে বরানগরের একটা ছোট ভাড়াটে বাড়িতে উঠে যায়। সেখানেও জোর দাম্পত্য-কলহ চলে। তারপর হঠাৎ নিরঞ্জন অসুস্থ হয়ে পড়ে। ও সেবার মাস ছয়েক ভুগেছিল। মাঝে মাঝে আমি যেতাম। আর দেখতাম, মীরা বৌদির সেবা-শুশ্রূষা। তখন তাঁর গয়না বিক্রি করে চিকিৎসা চলত, সংসার চলত। এই গয়নার বাক্স স্বামীর হাতে পড়বে বলে নিজের দাদার কাছে তিনি লুকিয়ে রেখে এসেছিলেন। বিপদের দিনে সেই বাক্স আবার তিনি ফেরৎ নিয়ে এলেন। নিরঞ্জন একদিন স্ত্রীকে বলেছিল, আয়নাটা বিক্রি করতে দিলে না, অথচ গয়নাগুলি দিব্যি বিক্রি করছ। আয়নাটা কি গয়নাগুলির চেয়ে দামী?

মীরা একটু লজ্জিত হয়ে বলেছিলেন, তা নয়। একটা আয়না বিক্রি করলে, কতই বা হত!

কিন্তু নিরঞ্জন আর মাসিমার কাছে শুনেছি, আয়নার ওপর মীরা বৌদির একটু বেশিরকম দুর্বলতা ছিল। গয়নাগাটি তিনি বেশি পরতেন না। কিন্তু সময় পেলেই যখন-তখন আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন। এক দৃষ্টিতে নিজের ছায়ার দিকে চেয়ে থাকতেন। কি দেখতেন, কি ভাবতেন তিনিই

জানেন। যে রূপে স্বামীকে মুগ্ধ করতে পারেননি, সেই রূপকে তিনি কি চোখে দেখতেন তা জানিনে। নাকি নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে নিজেকে বলতেন, আরো শক্ত হও, ধৈর্য ধর, কিছুতেই ভেঙে পড়ো না।

নিরঞ্জন সুস্থ হয়ে উঠল। ডাক্তার শাসন করে বলেছিলেন, ফের মদ ধরলে আর বাঁচবেন না। অনেক কষ্টে লিভারটিকে রক্ষা করেছি। আর অত্যাচার করলে সইবে না।

তবু মদের জন্য নিরঞ্জনের মন চঞ্চল হয়ে উঠত। কিন্তু উঠলে হবে কি, আর সেই অর্থও ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না। মৃদু মোলায়েম নেশা হিসাবে মীরা বৌদি নাকি তাকে এসময় ভাঙের সরবৎ করে দিতেন। নেশার সময়টাকে পার করে দেওয়ার জন্যে সেজেগুজে স্বামীর কাছে গল্প করতে বসতেন।

সুস্থ হওয়ার পর নিরঞ্জনের হঠাৎ সুমতি হল। এতকাল বাদে চাকরির খোঁজে বেরোল নিরঞ্জন। একটা ইনসিওরেন্স অফিসে ভাল চাকরিই পেল। চেহারা আছে, ডিগ্রি আছে, বলতে কইতে পারে, পাবে না কেন! খবর শুনে মীরা বৌদিকে কনগ্রাচুলেট করে এলাম। বললাম, আপনার ক্ষমতা আছে। আপনি ছাড়া ওকে আর কেউ ফেরাতে পারত না।

মীরা বৌদি স্মিত মুখে চুপ করে রইলেন।

বছরখানেক ভালই কাটল। কিন্তু তারপর তাঁর সে সুখ বেশি দিন সইল না।

নিরঞ্জনকে নতুন নেশায় ধরল। মদ নয়, মদের চেয়েও মারাত্মক। রেখা চ্যাটার্জি নামে বাইশ-তেইশ বছরের একটি মেয়ে নিরঞ্জনদের অফিসে টাইপিস্টের কাজ করে। তাঁকে নিরঞ্জনের চোখে পড়ল। আমি সে মেয়েটিকে দেখেছি। দেখতে কালো, রোগা, ঢ্যাঙা চেহারা। তার মধ্যে নিরঞ্জন কি যে দেখেছে সেই জানে। আমরা, টাইপিস্ট আর তার নাম জড়িয়ে নানা কথা শুনতে লাগলাম। ছুটির পর নিরঞ্জন সরাসরি বাড়ি আসে না। রেখাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোয়, সিনেমায় যায়, থিয়েটারে যায়। নানারকম সৌখিন জিনিস কিনে প্রেজেন্ট করে। মাইনের বেশির ভাগ টাকাই নাকি তার এইভাবে ব্যয় হয়ে যায়। আর এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দিন-রাত ঝগড়া চলে। সত্যি বলতে কি, মেয়ের দিকে নিরঞ্জনের আগে ঝোঁক ছিল না। সে মদেই খুশি থাকত। মীরা বৌদি তখন নাকি বলতেন, তুমি বরং অন্য মেয়েকে ভালবাস তা আমার সইবে, কিন্তু মদের গন্ধ আমি সইতে পারব না।—কিন্তু এখন তিনি টের পেলেন, মদের গন্ধের চেয়ে অন্য মেয়ের গন্ধ আরো কটু। এই নিয়ে ঝগড়াঝাটি খুব চলতে লাগল। তারপর কথার মুখে নিরঞ্জন একদিন বলে বসল, আমার যা খুশি তাই করব। আমি বিয়ে করব রেখাকে। আমি ছেলেমেয়ে চাই। তোমার দ্বারা তো আর তা হবে না।

প্রথম যৌবনে একটি ছেলে হওয়ার সময় হাসপাতালে মীরা বৌদির অপারেশন হয়েছিল। সেই থেকেই তাঁর সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়।

স্বামীর মুখে ফের সেই পুরোন কথা শুনে মীরা বৌদি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আর তিনি কারো সঙ্গে একটি কথাও বলেননি।

নিরঞ্জন অফিস থেকে সেদিনও খুব রাত করেই ফিরে এসেছিল। এসে দেখে, শোবার ঘরের দরজা বন্ধ। অনেক অনুনয় বিনয় রাগারাগির পরও দরজার পাট না খুলতে পেরে, রাত্রের জন্যে নিরঞ্জনকে মার ঘরে আশ্রয় নিতে হয়। পরদিন ভোরে মিস্ত্রি ডেকে ভেঙে ফেলে দরজা। দেখা যায় কড়িকাঠে ফাঁস লাগিয়ে মীরা বৌদি ঝুলছেন। তাঁর পায়ের ছায়া পড়েছে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায়। এ দৃশ্য দেখে নিরঞ্জন স্তব্ধ হয়ে যায়, মাসিমা চিৎকার করে উঠল। বাপ-মা মরা সুলতা নামে চোদ্দ-পনেরো বছরের একটি ভাইঝি থাকত তাঁর কাছে, সে মূর্ছা যায়। তারপর যা যা ঘটতে লাগল, সবই গতানুগতিক। আমার স্ত্রী একদিন মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনে এল, সুলতা নাকি ও বাড়িতে আর থাকতে চাইছে না। নিরঞ্জন অফিসে বেরিয়ে গেলে ঘরখানা সাধারণত বন্ধই থাকে। সেদিন বিকেল বেলায় সুলতা ঘর ঝাড় দেওয়ার জন্যে যেই দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেছে, কে যেন তাড়াতাড়ি আয়নার সামনে থেকে সরে গেল। আর একদিন সন্ধ্যার একটু আগে মাসিমা ওই ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চিরুণীতে চুল আঁচড়াবার শব্দ শুনতে পেলেন।

এমন কিছু নতুন নয়। যে বাড়ির বউ আত্মহত্যা করে মরে, সে বাড়ির মেয়েরা কিছুদিন এ

ধরনের অনৈসর্গিক ব্যাপার দেখতে-শুনতে পায়। আমি আমার স্ত্রীর কথা হেসেই উড়িয়ে দিলাম বললাম, কবে দোকান থেকে ফিরে এসে দেখব, মীরা বৌদি তোমার সঙ্গে বসে বসে গল্প করছেন।

আমার স্ত্রী রাগ করে বলল, তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না।

আমি একটু সপ্রতিভ হয়ে চুপ করে গেলাম। সত্যি, মীরা বৌদিকে নিয়ে ঠাট্টা করা চলে না। কিন্তু এত যাঁর বুদ্ধি, এত যাঁর ধৈর্য, তিনি ঝোঁকের মাথায় ও কাজ করতে গেলেন কেন ? নিরঞ্জনকে বাধা দেওয়ার আর কি কোন উপায় ছিল না ?

দিনকয়েক বাদে নিরঞ্জন এল এই দোকানে। একথা-সেকথার পর হঠাৎ বলল, মীরা বৌদির ড্রেসিং টেবিলটা সে বিক্রি করে দিতে চায়। তার কথা শুনে আমি তো অবাক। এমন কাজ কেন করতে যাবে নিরঞ্জন। মীরা বৌদির একটা স্মৃতিচিহ্ন থাক না ওদের বাড়িতে। আয়নাটা কত ভালোবাসতেন বৌদি।

নিরঞ্জন সেদিন আর কিছু না বলে উঠে গেল। দিনকয়েক বাদে মাসিমা আমাকে খবর পাঠালেন। তাঁর কাছে শুনলুম, নিরঞ্জন নাকি রাত্রে আলো জ্বেলে ঘুমোয়। অথচ এর আগে ঘরে একটু আলো থাকলে তার ঘুম হত না। এর পর তিনিও আমাকে টেবিলটা নিয়ে আসবার জন্যে অনুরোধ করলেন। বললেন, এখন তোর টাকা দিতে হবে না, বিক্রি হয়ে গেলে যদি কিছু দিতে হয় দিস, না দিলেও কিছু আমার লোকসান হবে না।

মাসিমা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে টেবিলটা নিয়ে আসার জন্যে আমাকে এমন বার বার করে বলতে লাগলেন যে পরদিনই আমি দোকানের একটা কুলিকে পাঠিয়ে দিলাম। নিরঞ্জন মুখে একটু আপত্তি করল, কেন আবার তুমি এত কষ্ট করতে গেলে। আয়নাটা যেখানে ছিল, সেখানেই না হয় থাকত।

কিন্তু ওর ভাবভঙ্গি দেখে আমার মনে হল, আয়নাটা ওর বাড়ি থেকে নিয়ে আসায় নিরঞ্জন নিশ্চিন্ত হয়েছে, খুশি হয়েছে।

ড্রেসিং টেবিলটার যা ন্যায্য দাম, আমি তাই ওকে দিতে গেলাম। কিন্তু নিরঞ্জন কিছুতেই নিল না। বলল, ঘর থেকে কেন দেবে, বিক্রি হয়ে গেলে তারপর দিও।

দাম নিল না বটে, কিন্তু নিরঞ্জন রোজ একবার করে আয়নাটার খোঁজ নিতে আসতে লাগল। জিনিসটা বিক্রি হয়েছে কিনা, কেউ এসে দর করে গেছে কিনা, রোজ এক প্রশ্ন।

মাসিমা আর একদিন খবর নিলেন, বললেন, নিরুর এবার একটা বিয়েটিয়ে দে।

কথাটায় আমি একটু আঘাত পেলাম। এই সেদিন মীরা বৌদি মারা গেলেন, তাও সাধারণ মৃত্যু নয়, আর এরই মধ্যে মাসিমা ছেলের বিয়ের প্রস্তাব করছেন ?

মাসিমা আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন, একা এক ঘরে থাকতে বোধ হয় ভয় হয়। সারা রাত ঘুমোয় না। আমি বলি, আমি এসে তোর কাছে থাকি, কিন্তু তাতে ও রাজী হয় না। বিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কি গতি আছে বল ? ও নাকি তাকে ভালবাসে। তুই তাকেই একটু বুঝিয়ে বল।

এরপর সত্যিই আমি সেই রেখা চ্যাটার্জির সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম। খুব বেশি ভূমিকা না করে বললাম, আপনি বোধ হয় দুর্ঘটনার কথা সব শুনেছেন ?

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল।

আমি বললাম, মাসিমার ইচ্ছা আপনারা তাড়াতাড়ি বিয়ে করুন।

রেখা বলল, তা হয় না।

কেন ? আপনিও কি ভূতের ভয় করেন নাকি ?

রেখা এবার চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল, বলল, না, ভূত নয়, ভূতে পাওয়া মানুষকে আমার ভয় সবচেয়ে বেশি।'

আমার বন্ধু তার কাহিনী শেষ করল।

আমি চুপ করে রইলাম। রেখা চ্যাটার্জির কথা যে কত সত্যি, তা আমি একটু আগেই টের পেয়েছি।

বৃষ্টির জোরটা একটু কমে এলে আমি বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আশ্চর্য, তারপর থেকে রোজই আমার ইচ্ছা করতে লাগল, আয়নাটার একবার খোঁজ নিয়ে আসি। কিন্তু ও-পথ আমি কিছুতেই আর মাড়ালাম না। শেষে আমিও কি নিরঞ্জনের মত হব ? তবু বার বার আমার কৌতূহল

হতে লাগল, কি হল সেই আয়নাটার, কি হল নিরঞ্জনের।

আজকের সকালের কাগজ আমার সেই কৌতূহল মিটিয়েছে। খবর বেরিয়েছে দমদম স্টেশনে কাল সন্ধ্যায় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। ট্রেনের তলায় কাটা পড়েছে একজন লোক। নিরঞ্জন হালদার বলে তাকে সনাক্ত করা হয়েছে। রেল পুলিশ যথারীতি তদন্ত করেছে। কেসটি আত্মহত্যা বলেই তাদের সন্দেহ।
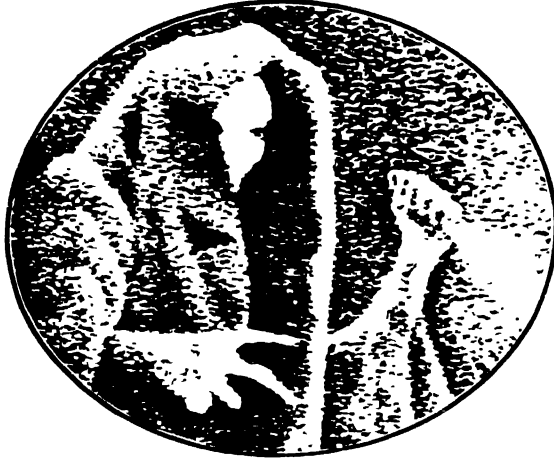
বুদ্ধির বাইরে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বিজ্ঞানের চোখে ভূতের অস্তিত্ব অচল। পাড়াগাঁয়ের ভূতের ভয় থেকে প্লাঁসেৎ, মিডিয়ামতত্ত্ব, রাত-বিরেতে সম্ভব অসম্ভব ছায়ামূর্তি দেখে চমকে ওঠা—এসব অনেক কিছুই তর্কের উপাদান জোগায়। ভৌতিক অস্তিত্বও ঈশ্বরের মতই নানা মতবাদে বিড়ম্বিত—সেখানে আস্তিক, নাস্তিক, স্কেপটিক বা অ্যাগনস্টিক কারুরই অভাব নেই।

সোজা কথায়, যুক্তির জগতে ভূতের জায়গা নেই। ভূত মানতে গেলে চোখ বেঁধে পিছু হটতে হয় একেবারে প্যালিয়োলিথিক আদিম যুগে। অশরীরী তত্ত্বে যারা আস্তিক্যবাদী, তাদের সঙ্গে আজ আর তর্ক চলবে না—চরম নিষ্পত্তির জন্যে হাতাহাতি করতে হবে।

তবু সবুকিছু বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব তর্কের মধ্যেও একটা 'কিন্তু' থেকেই যায়। এমন কতকগুলো প্রশ্ন ওঠে—যাদের উত্তর মেলে না। তার মানে এই নয় যে কোনদিন তাদের উত্তর একেবারেই পাওয়া যাবে না। হয়তো বিজ্ঞানের ব্যাপ্তি একদা সবকিছুর নিঃশেষ সমাধান করে দেবে। কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততক্ষণ কতকগুলো বিচিত্র ঘটনা আমাদের মনকে নানাভাবে আন্দোলিত করতে থাকে।

এই রকম একটি ঘটনা আমি বলব। এটা ভূতের গল্প কিনা জানি না। চোখ কিম্বা মনের ভুল কিনা, সে সম্বন্ধেও কোন রায় দিতে আমি প্রস্তুত নই। শুধু যা ঘটেছে, সেইটুকুই আমি বলব। যাঁর যা খুশি, তিনি সেই ভাবেই এগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারেন। মাত্র একটি কথা জানিয়ে রাখি—এগুলি ঘটেছে সম্পূর্ণ খোলা এবং অপ্রস্তুত চোখের সামনে—গঞ্জিকা বা মাধ্বীর কোন প্রভাব এসব ক্ষেত্রে ছিল না।

প্রায় বারো-তেরো বছর আগেকার কথা। তখন পশ্চিম বাংলার একটা ছোট গ্রাম থেকে আমি শহরে ডেলি প্যাসেঞ্জারী কবতুম। সাইকেলে করে আসতে হত আট মাইল দূরের স্টেশনে। একটা ছোট দোকানে সাইকেল জমা রেখে আমরা ট্রেন ধরতুম, সন্ধের গাড়িতে ফিরে আবার সাইকেল নিয়ে গ্রামে চলে আসতুম।

'আমরা' বললুম এই জন্যে যে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করতুম দুজনে ! আমি আর প্রিয়নাথ। মুন্‌সেফ্‌ কোর্টে চাকরি সেরে পাঁচটা নাগাদ প্রিয়নাথের সাইকেল রিপেয়ারিং-শপে এসে আমি আড্ডা দিতুম, চা খেতুম। তারপর সাতটায় দোকান বন্ধ করে সাতটা বাইশের ট্রেন ধরতুম দুজনে। কোন একজনের বাড়ি ফেরবার খুব বেশি তাগিদ না থাকলে ছিল এই আমাদের দৈনন্দিন প্রোগ্রাম।

স্টেশন থেকে আমাদের গ্রামের প্রায় সীমানা পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল একটা অনুর্বর কাঁকর মাটির মাঠ—যাকে বলে ব্রহ্মডাঙা। জেলা-বোর্ডের রাস্তাটা ঢেউ খেলানো মাঠের ভেতর দিয়ে চড়াই-উৎরাইয়ে চলে গেছে—কোথাও কোথাও কুড়ি-বাইশ ফুট পর্যন্ত ওপরে উঠেছে দু-ধারের ঢাল জমি ছাড়িয়ে। পথের পাশে দেড় মাইল দু-মাইলের মধ্যে কোন গ্রাম নেই ; শুধু এলোমেলো ফণী মনসা আর আকন্দের ঝোপ ছড়িয়ে আছে।

এককালে মাঠটা ডাকাতির জন্যে বিখ্যাত ছিল। পাঁচশো বছরের ভেতরে ওসব উপদ্রব আর শোনা যায়নি। কিন্তু তবুও একা এ-পথে ফিরতে সন্ধের পরে গা ছমছম করত। দু-একটা ভূতের কাহিনীও যে মাঝে মাঝে কানে আসত না এমন নয়। কিন্তু ও-ভয়টা কোনদিন আমাদের মনে যে এতটুকু ছাপ ফেলেছে, তা নয়। অন্তত সচেতন ভাবে তো নয়ই।

সেদিন কোর্ট থেকে বেরিয়ে কতগুলো সরকারী কাজ সেরে নিতে আমার রাত হয়ে গেল। প্রিয়নাথের দোকানে আসতেই তার ছোকরা চাকরটা জানালে যে আমার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে যথানিয়মে সাতটা বাইশের ট্রেনই ধরেছে প্রিয়নাথ।

আমার মনটা দমে গেল। শুধু একা ফিরতে হবে বলেই নয়, দিনটাও দুর্যোগের। একটু আগেই মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে—সেই সঙ্গে আকাশ-চেরা বাজের ডাক। বৃষ্টিটা আপাতত থেমেছে বটে, কিন্তু আকাশ এখনো ঘন-মেঘে একটা আলকাতরার আস্তর দিয়ে মোড়া। যে কোন সময়ে ঝমঝম করে নেমে পড়তে পারে। এরই মধ্যে রাত ন'টার পরে ওই সীমাহীন কালো মাঠটার ভেতর দিয়ে একা আট মাইল সাইকেলে করে আমায় ফিরতে হবে। কারণ, সন্ধের পরে স্বভাবতই নির্জন পথটাতে এই বৃষ্টি-বাদলের রাতে যে কোন সহযাত্রী মিলবে, এ আশা করাই বিড়ম্বনা।

কিন্তু উপায় নেই, আমাকে যেতেই হবে। ঘন কালো মেঘের দিকে তাকিয়ে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম, তারপর স্টেশনে এসে আটটা আটাশের গাড়ি ধরলুম।

ট্রেন ছাড়তে না ছাড়তেই বৃষ্টি নামল। এমন প্রবল বৃষ্টি সচরাচর দেখা যায় না। সারা আকাশটা যেন গলে গলে ঝরে পড়ছে—অন্ধকার সাদা হয়ে গেছে বৃষ্টির কুয়াশায়। মনের মধ্যে দুশ্চিন্তাটা আরো থিতিয়ে বসতে লাগল। উঁচু কাঁকরের রাস্তায় জল দাঁড়াবে না, কিন্তু মাঠের ভেতরে বৃষ্টির সঙ্গে হাওয়া মিশলে অবস্থা কী দাঁড়াবে, সেটা অনুমান করা শক্ত নয়।

বৃষ্টি অবশ্য বেশিক্ষণ রইল না। আধঘন্টার মধ্যে আমি স্টেশনে এসে নামতেই দেখি বৃষ্টিও ধরে গেছে। মেঘ হালকা হয়ে গেছে, শুধু অল্প অল্প ইলশেগুঁড়ি পড়ছে তিরতির করে।

যে মুদিখানায় সাইকেল জমা থাকে, সে লোকটা ঝাঁপ বন্ধ করবার উপক্রম করছিল। আমাকে দেখে হাই তুললে। হেসে বললে, 'এই রাতে ফিরবেন ? থেকে যান না আমার দোকানে ?'

বললুম, 'সে হয় না, বাড়িতে সবাই দুশ্চিন্তা করবে।' আরেকটা কথা অবশ্য বলা গেল না—সে তাগিদটাই প্রবলতর। অর্থাৎ মাসখানেক আমি বিয়ে করেছি এবং মাত্র তিনদিন আগে স্ত্রী এসেছে বাপের বাড়ি থেকে।

দোকানদার সাইকেলটা বের করে দিলে। জিজ্ঞেস করলুম, 'প্রিয়নাথ চলে গেছে ?'

'হ্যাঁ, উনি তো সাতটা পঞ্চান্নর গাড়িতেই নামলেন। ভেঙে বৃষ্টি আসছিল, বাজ চমকাচ্ছিল ঘনঘন। ওঁকেও দাঁড়িয়ে যেতে বলেছিলুম, রাজী হলেন না। বললেন, বোঁ বোঁ করে চলে যাবেন।'

বোঁ বোঁ করে চলে যাব—আমিও ভাবলুম। তারপর সেই ঘন কালো অন্ধকারে তিরতিরে বৃষ্টির ভেতরেই সাইকেল নিয়ে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়লুম।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই মাঠের রাস্তা এসে পড়ল। দু-ধারে নিবিড় কৃষ্ণতার ভেতরে ব্যাঙের ডাক, ঝিঁঝির আওয়াজ আর ছোট্ট-বড় নালায় বর্ষার জলের কলধ্বনি। ল্যাম্পের ছোট আলোটিতে সামনের পাঁচ-সাত হাত দূর পর্যন্ত বাঁকুড়ার রাঙামাটি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু কিছুক্ষণ

পরে সেটুকুও আর রইল না। ল্যাম্পে তেল ছিল না—খেয়াল করিনি। ক্ষীণ হতে হতে দপ করে নিভে গেল সেটা।

এইবার আমার ভয় করতে লাগল। চেনা রাস্তা—যতই অন্ধকার থাক, ঠিক নির্ভুল ভাবেই চলে যাব। তবু—তবু অন্ধকার, এই নির্জনতা! একবার যদি অসাবধান হই, তাহলে সাইকেল নিয়ে একেবারে দশ-বারো হাত নিচে গড়িয়ে পড়ব!

দু-চোখকে যতদূর সম্ভব তীব্র করে আমি সাইকেল চালাতে লাগলুম। তাড়াতাড়ি যেতে ভরসা হচ্ছে না, তবু উত্তেজনায় আপনা থেকেই দ্রুতবেগে পা ঘুরছিল প্যাডেলে। সেকেলে বি-এস-এ বাইক—আমার মনের শাসন না মেনেই সে যেন শোঁ শোঁ করে উড়ে চলল।

'থামো হে সেন, থামো!'

অন্ধকার ছিঁড়ে যেন তীরের মত স্বর উঠল একটা। প্যাডেলে আচমকা পা থেমে এল আমার। পেছন থেকে পরিষ্কার গলায় ডাকল প্রিয়নাথ: 'অত তাড়া কিসের হে? আমি যে সেই এক ঘন্টা ধরে মাঠের ভেতরে তোমার জন্যে হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে আছি!'

বিস্ময়ে এবং আনন্দে আমি সাইকেল থেকে নেমে এলুম। অন্ধকারেও দেখা গেল, পেছন থেকে প্রিয়নাথ দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

'ব্যাপার কি হে? সেই সাতটা পঞ্চান্নর ট্রেনে নেমে এতক্ষণ মাঠের ভেতরে কী করছিলে?'

প্রিয়নাথ বললে, 'সে অনেক কথা। ভারি মজার ব্যাপার হয়েছে একটা।'

'এই বর্ষার রাতে মাঠের ভেতরে কী এমন মজার ব্যাপার হতে পারে? আর তোমার সাইকেলই বা গেল কোথায়?'

অন্ধকারে প্রিয়নাথ এবার অল্প একটু শব্দ করে হেসে উঠল। বললে, 'বলছি তো, সে অনেক কথা। গ্রামে ফিরে শুনবে। আপাতত তোমার ক্যারিয়ারে আমায় তুলে নাও।'

'বেশ, উঠে পড় চটপট।'

প্রিয়নাথ কাছে এল: 'দেখেছ কাণ্ড! জলে-কাদায় একেবারে মাখামাখি হয়ে গেছি। হাড়ের ভেতরটা সুদ্ধ কাঁপছে ঠকঠক করে।'

'পড়ে গিয়েছিলে নাকি?'

'হুঁ, সে আর বল কেন! আছাড় বলে আছাড়! একেবারে অতল জলের ভেতর। কাদার মধ্যে প্রায় বসে গিয়েছিলুম। যাক, বাড়ি ফিরেই শুনবে সেসব কথা।'

আমি সাইকেলের প্যাডেল ঘোরালুম। তড়াক করে প্রিয়নাথ পেছনে উঠে বসল। একটা ঝাঁকুনি লাগল, টের পেলুম, সীটের আংটাটা প্রিয়নাথ আঁকড়ে রয়েছে।

এই ভিজে রাস্তায়, এমন অন্ধকারে আরেকটা মানুষকে ক্যারিয়ারে তুলে নেওয়া যে কী দুর্ভোগ, সে বলে বোঝাতে হবে না। কিন্তু অনুভব করলুম, হঠাৎ যেন আমার গায়ে দ্বিগুণ শক্তি বেড়ে গেছে। প্রিয়নাথের অতখানি ওজন আমাকে বিন্দুমাত্র কাবু করতে পারল না। সেকেলে মজবুত বি-এস-এ সাইকেল শনশন করে চলতে লাগল। এমন কি, অন্ধকারের সম্ভাব্য বিপদটাও মুছে গেল মন থেকে।

প্রিয়নাথ কোন কথা বলছে না—আমিও না। নিঃশব্দে প্রায় পনেরো মিনিট চলবার পর হঠাৎ দূর থেকে জলের একটা উগ্র গর্জন শোনা গেল। আমি চমকে বললুম, 'ওকি—খোয়াইতে বান এল নাকি?'

এইবার বিচিত্র ব্যাপার ঘটল একটা। প্রিয়নাথ আমার কথার জবাব দিলে। কিন্তু পেছনের ক্যারিয়ার থেকে নয়। পরম বিস্ময়ে দেখলুম, আমার সাইকেল থেকে প্রায় পনেরো হাত সম্মুখে দু-হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রিয়নাথ। হ্যাঁ, অন্ধকারেও দেখতে পেলুম, প্রিয়নাথই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্রিয়নাথ ডেকে বললে, 'নামো সেন, নামো। বানের জলে খোয়াইয়ের পচা কাঠের পুলটা ভেসে গেছে। আর এগোলে খাড়া ত্রিশ হাত নিচে আছড়ে পড়বে।'

মুহূর্তের মধ্যে সারা শরীরে আমার বিদ্যুৎ বয়ে গেল। কখন ক্যারিয়ার থেকে নামল প্রিয়নাথ, কখনই বা এমন করে পনেরো হাত দৌড়ে গেল সে? সাইকেলের গতি মন্দা করতে করতে আবার

শুনলাম : 'এখনো নামো সেন, এখনো নামো ! নইলে আমার যা হয়েছে, সে-দশা তোমারও হবে।'

ক' সেকেন্ডের মধ্যে সবটা ঘটল জানি না। দেখলুম, প্রিয়নাথের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। তারপর যেন করোটির কোটর ছেড়ে সে দুটো চোখ তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল আলোর মত উড়ে আসতে লাগল আমার দিকে ! যেন ফসফরাসের দুটো অতিকায় পতঙ্গ !

পরদিন সকালে আমাকে পাওয়া গেল রাস্তার ওপরে, সাইকেলটাকে জড়িয়ে ধরে আমি পড়েছিলুম। আর প্রিয়নাথকে পাওয়া গেল ভাঙা পুল থেকে তেইশ-চব্বিশ হাত নিচে, আরো তিন-চার ফুট জলকাদার তলায়। ওপর দিকে পা দুটো তুলে তার পেট পর্যন্ত কাদার মধ্যে গাঁথা। ভাঙা সাইকেলটা খানিক দূরে একখানা বড় পাথরের ওপরে ঝুলে রয়েছে।

ভূতো

সত্যজিৎ রায়

নবীনকে দ্বিতীয়বার হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হল। অক্রুরবাবুর মন ভেজানো গেল না। উত্তরপাড়ার একটা ফাংশনে নবীন পেয়েছিল অক্রুর চৌধুরীর আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয়। ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম। খেলার নামটা নবীনের জানা ছিল না। সেটা বলে দেয় দ্বিজপদ। দ্বিজুর বাবা অধ্যাপক, তাঁর লাইব্রেরিতে নানান বিষয়ের বই। দ্বিজু নামটা বলে বানানটাও শিখিয়ে দিল। ভি-ই-এন-টি আর-আই-এল-ও-কিউ-ইউ-আই-এস-এম। ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম। অক্রুর চৌধুরী মঞ্চে একা মানুষ কিন্তু তিনি কথা চালিয়ে যাচ্ছেন আরেকজন অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে। সেই মানুষ যেন হলের সিলিং-এর কাছাকাছি কোথাও শূন্যে অবস্থান করছে। অক্রুরবাবু তাকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করেন, তারপর উত্তর আসে উপর থেকে।

‘হরনাথ, কেমন আছ?’

‘আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদে ভালোই আছি।’

‘শুনলাম তুমি নাকি আজকাল সংগীতচর্চা করছ?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন।’

‘রাগ সংগীত?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ, রাগ সংগীত।’

‘গান করো?’

‘আজ্ঞে না।’

‘যন্ত্র সংগীত?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’

‘কী যন্ত্র? সেতার?’

‘আজ্ঞে না।’

'সরোদ ?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে কী বাজাও ?'

'আজ্ঞে গ্রামোফোন।'

হাসি আর হাততালিতে হল মুখর হয়ে ওঠে। প্রশ্নটা উপর দিকে চেয়ে করে উত্তরটা শোনার ভঙ্গীতে মাথাটা একটু হেঁট করে নেন অক্রুরবাবু, কিন্তু তিনি নিজেই যে উত্তরটা দিচ্ছেন সেটা বোঝার কোন উপায় নেই। ঠোঁট একদম নড়ে না।

নবীন তাজ্জব বনে গিয়েছিল। এ জিনিস শিখতে না পারলে জীবনই বৃথা। অক্রুর চৌধুরী কি ছাত্র নেবেন না ? নবীনের পড়াশুনায় আগ্রহ নেই। হাইয়ার সেকেন্ডারী পাশ করে বসে আছে বছর তিনেক। আর পড়ার ইচ্ছে হয়নি। বাপ নেই, কাকার বাড়িতেই মানুষ সে। কাকার একটা প্লাইউডের কারখানা আছে ; তাঁর ইচ্ছে নবীনকে সেখানেই ঢুকিয়ে দেন, কিন্তু নবীনের শখ হল ম্যাজিকের দিকে। হাত সাফাই, রুমালের ম্যাজিক, আংটির ম্যাজিক, বলের ম্যাজিক—এসব সে বাড়িতেই অভ্যাস করে বেশ খানিকটা আয়ত্ত করেছে। কিন্তু অক্রুর চৌধুরীর ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম দেখার পরে সেগুলোকে নিরামিষ বলে মনে হচ্ছে।

ফাংশনের উদ্যোক্তাদের কাছেই নবীন জানল যে অক্রুরবাবু থাকেন কলকাতায় অ্যামহার্স্ট লেনে। পরদিনই ট্রেনে চেপে কলকাতায় এসে সে সোজা চলে গেল যাঁকে গুরু বলে মেনে নিয়েছে তাঁর বাড়িতে। গুরু কিন্তু বাদ সাধলেন।

'কী করা হয় এখন ?' প্রথম প্রশ্ন করলেন ভেন্‌ট্রিলোকুইস্ট। কাছ থেকে ভদ্রলোককে দেখে হৃৎকম্প শুরু হয়ে গিয়েছিল নবীনের। বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশি নয়, চাড়া দেওয়া ঘন কালো গোঁফ, মাথার কালো চুলের ঠিক মধ্যিখানে টেরি, তার দু'দিক দিয়ে ঢেউ খেলে চুল নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত। চোখ দুটো ঢুলুঢুলু, যদিও স্টেজে এই চোখই স্পটলাইটের আলোতে ঝিলিক মারে।

নবীন বলল সে কী করে।

'এই সব শখ হয়েছে কেন ?'

নবীন সত্যি কথাটাই বলল।—'একটু-আধটু ম্যাজিকের অভ্যাস আছে, কিন্তু এটার শখ হয়েছে আপনার সেদিনের পারফরম্যান্স দেখে।'

অক্রুরবাবু মাথা নাড়লেন।

'এ জিনিস সকলের হয় না। অনেক সাধনা লাগে। আমাকেও কেউ শেখায়নি। যদি পার তো নিজে চেষ্টা করে দেখ।'

নবীন সেদিনের মত উঠে পড়ল, কিন্তু সাতদিন বাদেই আবার অ্যামহার্স্ট লেনে গিয়ে হাজির হল। ইতিমধ্যে সে খালি ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌মের স্বপ্ন দেখেছে। এবার দরকার হলে সে অক্রুরবাবুর হাতে পায়ে ধরবে।

কিন্তু এবার আরো বিপর্যয়। এবার অক্রুরবাবু তাকে একরকম বাড়ি থেকে বারই করে দিলেন। বললেন, 'আমি যে শেখাব না সেটা প্রথমবারেই তোমার বোঝা উচিত ছিল। সেটা বোঝনি মানে তোমার ঘটে বুদ্ধি নেই। বুদ্ধি না থাকলে কোনরকম ম্যাজিক চলে না—এ ম্যাজিক তো নয়ই।'

প্রথমবারে নবীন মুষড়ে পড়েছিল, এবারে তার মাথা গরম হয়ে গেল। চুলোয় যাক অক্রুর চৌধুরী। সে যদি না শেখায় তবে নবীন নিজেই শিখবে, কুছ পরোয়া নেহি।

নবীনের মধ্যে যে এতটা ধৈর্য আর অধ্যবসায় ছিল সেটা সে নিজেই জানত না। কলেজ স্ট্রীটে একটা বইয়ের দোকান থেকে ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম সম্বন্ধে একটা বই কিনে নিয়ে সে শুরু করে দিল তার সাধনা।

মোটামুটি নিয়মটা সহজ। প বর্গের অর্থাৎ প ফ ব ভ ম, কেবল এই ক'টা অক্ষর উচ্চারণ করার সময় ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকে, ফলে ঠোঁট নাড়াটা ধরা পড়ে বেশি। এই ক'টা অক্ষর না থাকলে যে কোন কথাই ঠোঁট ফাঁক করে অথচ না নাড়িয়ে বলা যায়। কোনো কথায় প বর্গের অক্ষর থাকলে সেখানেও উপায় আছে। যেমন, 'তুমি কেমন আছ, কথাটা যদি 'তুঙি কেঙন আছ' করে বলা যায়, তাহলে আর ঠোঁট নাড়াবার কোনো দরকারই হয় না, কেবল জিভ নাড়ালেই চলে। প ফ ব ভ

ম য়ের জায়গায় ক খ গ ঘ ঙ—এই হল নিয়ম। কথোপকথন যদি হয় এই রকম—'তুমি কেমন আছ ?' 'ভালো আছি,' 'আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই না ?' 'তা পড়েছে, দিব্যি ঠাণ্ডা।'—তাহলে সেটা বলতে হবে এই ভাবে—'তুমি কেমন আছ ?' 'ঘালো আছি' 'আজ ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই না ?' 'তা কড়েছে, দিগ্যি ঠাণ্ডা'।

আরো আছে। উত্তরদাতার গলার আওয়াজটাকে চেপে নিজের আওয়াজের চেয়ে একটু তফাত করে নিতে হবে। এটাও সাধনার ব্যাপার, এবং এটাতেও অনেকটা সময় দিল নবীন। কাকা এবং কিছু অন্তরঙ্গ বন্ধুকে শুনিয়ে যখন সে তারিফ পেল, তখনই বুঝল যে ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম ব্যাপারটা তার মোটামুটি রপ্ত হয়েছে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

সেই অদৃশ্য উত্তরদাতার যুগ আর আজকাল নেই। আজকাল ভেন্‌ট্রিলোকুইস্টের কোলে থাকে পুতুল। সেই পুতুলের পিছন দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মাথা ঘোরায় এবং ঠোঁট নাড়ায় যাদুকর। মনে হয় যাদুকরের প্রশ্নের উত্তর বেরোচ্ছে এই পুতুলের মুখ দিয়েই।

তার আশ্চর্য প্রোগ্রেসে খুশি হয়ে কাকাই এই পুতুল বানাবার খরচ দিয়ে দিলেন নবীনকে। পুতুলের চেহারা কেমন হবে এই নিয়ে দিন পনের ধরে গভীর চিন্তা করে হঠাৎ এক সময় নবীনের মাথায় এল এক আশ্চর্য প্ল্যান।

পুতুল দেখতে হবে অবিকল অক্রুর চৌধুরীর মত। অর্থাৎ অক্রুর চৌধুরীকে হাতের পুতুল বানিয়ে সে তার অপমানের প্রতিশোধ নেবে।

একটা হ্যান্ডবিলে অক্রুর চৌধুরীর একটা ছবি ছিল সেটা নবীন সযত্নে রেখে দিয়েছিল। সেটা সে আদিনাথ কারিগরকে দেখাল।—'এইরকম গোঁফ, এই টেরি, এইরকম ঢুলুঢুলু চোখ, ফোলা ফোলা গাল।' সেই পুতুল যখন মুখ নাড়বে আর ঘাড় ঘোরাবে নবীনের কোলে বসে, তখন কী রগড়টাই না হবে! আশা করি তাব শো দেখতে আসবেন অক্রুর চৌধুরী!

সাতদিনের মধ্যে পুতুল তৈরি হয়ে গেল। পোশাকটাও অক্রুর চৌধুরীর মত ; কালো গলাবন্ধ কোটের তলায় কোঁচা কোমরে গোঁজা ধুতি।

নেতাজী ক্লাবের শশধর বোসের সঙ্গে নবীনের আলাপ ছিল ; তাদের একটা ফাংশনে শশধরকে ধবে তার ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌মের একটা আইটেম ঢুকিয়ে নিল নবীন। আর প্রথম অ্যাপিয়ারেন্সেই যাকে বলে হিট। পুতুলের একটি নামও দেওয়া হয়েছে অবশ্য—ভূতনাথ, সংক্ষেপে ভূতো। ভূতোব সঙ্গে নবীনের সংলাপ লোকের কাছে খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। ভূতো হল ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার, আর নবীন মোহনবাগানের। বাগ্‌বিতণ্ডা এতই জমেছিল যে ভূতো যে ক্রমাগত ইস্টগেংগল আর ভোহনবাগান বলে চলেছে সেটা কেউ লক্ষই করেনি।

এর পর থেকেই বিভিন্ন ফাংশনে, টেলিভিশনে ডাক পড়তে পাগল নবীনের। নবীনও বুঝল যে ভবিষ্যৎ নিয়ে তার আর কোনো চিন্তা নেই, রুজি-রোজগারের পথ সে পেয়ে গেছে।

অবশেষে একদিন অক্রুর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হল নবীনের।

মাস তিনেক হল নবীন উত্তরপাড়া ছেড়ে কলকাতায় মির্জাপুর স্ট্রীটে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে রয়েছে। বাড়িওয়ালা সুরেশ মুৎসুদ্দি বেশ লোক, নবীনের খ্যাতির কথা জেনে তাকে সমীহ করে চলেন। সম্প্রতি মহাজাতি সদনে একটা বড় ফাংশনে নবীন এবং ভূতো প্রচুর বাহবা পেয়েছে। ফাংশনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে আজকাল নবীনকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। নবীনের নিজের ব্যক্তিত্বেও সাফল্যের ছাপ পড়েছে, তার চেহারা ও কথাবার্তায় একটা নতুন জৌলুস লক্ষ করা যায়।

হয়তো মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানেই অক্রুরবাবু উপস্থিত ছিলেন, এবং অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে নবীনের ঠিকানা জোগাড় করেছিলেন। সেদিনের আইটেমে নবীন আর ভূতোর মধ্যে কথাবার্তা ছিল পাতাল রেল নিয়ে। যেমন—

'কলকাতায় পাতাল রেল হচ্ছে জান তো ভূতো ?'

'কই, না তো।'

'সে কি, তুমি কলকাতার মানুষ হয়ে পাতাল রেলের কথা জান না ?'

ভূতো মাথা নেড়ে বলল, 'উহু, তবে হাসপাতাল রেলের কথা শুনেছি বটে।'

'হাসপাতাল রেল ?'

'তাই তো শুনি। একটা বিরাট অপারেশন, সারা শহরের গায়ে ছুরি চলছে, শহরের এখন-তখন অবস্থা। হাসপাতাল ছাড়া আর কি ?'

আজ নবীন তার ঘরে বসে নতুন সংলাপ লিখছিল লোড শেডিংকে কেন্দ্র করে। লোড শেডিং, জিনিসের দাম বাড়া, বাসট্রামে ভিড় ইত্যাদি যে সব জিনিস নিয়ে শহরের লোক সবচেয়ে বেশি মেতে ওঠে, ভূতোর সঙ্গে সেইসব নিয়ে আলোচনা করলে দর্শক সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায় এটা নবীন বুঝে নিয়েছে। আজকের নকশাটাও বেশ জমে উঠছিল, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। নবীন দরজা খুলে বেশ খানিকটা হকচকিয়ে দেখল অক্রুরবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

'আসতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই।'

নবীন ভদ্রলোককে ঘরে এনে নিজের চেয়ারটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিল।

অক্রুরবাবু তৎক্ষণাৎ বসলেন না। তাঁর দৃষ্টি ভূতোর দিকে। সে অনড় ভাবে বসে আছে নবীনের টেবিলের এক কোণে।

অক্রুরবাবু এগিয়ে গিয়ে ভূতোকে তুলে নিয়ে তার মুখটা বেশ মন দিয়ে দেখতে লাগলেন। নবীনের কিছু করার নেই। সে যে খানিকটা অসোয়াস্তি' বোধ করছে না সেটা বললে ভুল হবে, তবে অক্রুরবাবুর হাতে অপমান হবার কথাটা সে মোটেই ভোলেনি।

'তোমার হাতের পুতুল বানিয়ে দিলে আমাকে ?'

অক্রুরবাবু চেয়ারটায় বসলেন।

'হঠাৎ এ মতি হল কেন ?'

নবীন বলল, 'কেন বানিয়েছি সেটা বোধ হয় বুঝতে পারছেন। আমি অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিলাম আপনার কাছে। সবটুকু ভেঙে দিয়েছিলেন আপনি। তবে এটুকু বলতে পারি—আপনার এই প্রতিমূর্তিই কিন্তু আজ আমাকে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। আমি খেয়ে-পরে আছি এর জন্যেই।'

অক্রুরবাবু এখনো ভূতোর দিক থেকে চোখ সরাননি। বললেন, 'তুমি জান কি না জানি না—বারাসাতে সেদিন আমার একটা শো ছিল। স্টেজে নেমেই যদি চতুর্দিক থেকে 'ভূতো' 'ভূতো' বলে টিটকিরি শুনতে হয়, সেটা কি খুব সুখকর হয় বলে তুমি মনে কর ? তোমার ভাত-কাপড় আমি জোগাতে পারি, কিন্তু তোমার জন্য যে আমার ভাত-কাপড়ের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার কী হবে ? তুমি কি ভেবেছ আমি এটা এত সহজে মেনে নেব ?'

সময়টা সন্ধ্যা। লোড শেডিং। টিমটিম করে দুটি মোমবাতি জ্বলছে নবীনের ঘরে। সেই আলোয় নবীন দেখল অক্রুরবাবুর চোখ দুটো স্টেজে যেমন জ্বলজ্বল করে সেই ভাবে জ্বলছে। ছোট্ট মানুষটার বিশাল একটা দোলায়মান ছায়া পড়েছে ঘরের দেয়ালে। টেবিলের উপর ঢুলুঢুলু চোখ নিয়ে বসে আছে ভূতনাথ—অনড়, নির্বাক।

'তুমি জান কি না জানি না,' বললেন অক্রুরবাবু, 'ভেনট্রিলোকুইজ্‌মেই কিন্তু আমার যাদুর দৌড় শেষ হয়ে যাচ্ছে না। আমি আঠারো বছর বয়স থেকে আটত্রিশ বছর পর্যন্ত আমাদের দেশের একজন অজ্ঞাতনামা অথচ অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন যাদুকরের শিষ্যত্ব করেছি। কলকাতা শহরে নয় ; হিমালয়ের পাদদেশে এক অত্যন্ত দুর্গম স্থানে।'

'সে যাদু আপনি মঞ্চে দেখিয়েছেন কখনো ?'

'না। তা দেখাইনি কারণ সে সব স্টেজে দেখানোর জিনিস নয়। রোজগারের পন্থা হিসেবে আমি সে যাদু ব্যবহার করব না এ প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম আমার গুরুকে। সে কথা আমি রেখেছি।'

'আপনি আমাকে কী বলতে চাইছেন সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'আমি শুধু সতর্ক করে দিতে এসেছি। তোমার মধ্যে সাধনার পরিচয় পেয়ে আমি খুশিই হয়েছি। ভেনট্রিলোকুইজ্‌ম যেমন তোমাকে আমি শেখাইনি, তেমনি আমাকেও কেউ শেখায়নি।

পেশাদারী যাদুকররা তাদের আসল বিদ্যা কাউকে শেখায় না, কোনদিনই শেখায়নি। ম্যাজিকের রাস্তা যাদুকরদের নিজেদেরই করে নিতে হয়—যেমন তুমি করে নিয়েছ। কিন্তু তোমার পুতুলের আকৃতি নির্বাচনে তুমি যে ধৃষ্টতা দেখিয়েছ, সেটা আমি বরদাস্ত করতে পারছি না। শুধু এইটুকুই বলতে এসেছি তোমাকে।'

অক্রুরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। তারপর ভূতনাথের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার চুল আর গোঁফ এতদিন কাঁচা ছিল, এই সবে পাকতে শুরু করেছে। তুমি দেখছি সেটা অনুমান করে আগে থেকেই কিছু পাকা চুল লাগিয়ে রেখেছ। ... যাক, আমি তাহলে আসি।'

অক্রুরবাবু চলে গেলেন।

নবীন দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ভূতনাথের সামনে এসে দাঁড়াল। পাকা চুল। ঠিকই। দু-একটা পাকা চুল ভূতনাথের মাথায় এবং গোঁফে রয়েছে বটে। এটা নবীন এতদিন লক্ষ্য করেনি। সেটাও আশ্চর্য, কারণ ভূতোকে কোলে নিলে সে নবীনের খুবই কাছে এসে পড়ে, আর সব সময় তার দিকে তাকিয়েই কথাবার্তা চলে। সাদা চুলগুলো আগেই চোখে পড়া উচিত ছিল।

যাই হোক, নবীন আর এই নিয়ে ভাববে না। দেখার ভুল সব মানুষেরই হয়। মুখ চোখের দিকেই বেশি দৃষ্টি দিয়েছে নবীন, চুলটা তেমন ভালো করে দেখেনি।

কিন্তু তাও মন থেকে খটকা গেল না।

ভূতোকে বইবার জন্য নবীন একটা চামড়ার কেস করে নিয়েছিল, সেই কেসে ভরে সে পরদিন হাজির হল চিৎপুরে আদিনাথ পালের কাছে। তার সামনে কেস থেকে ভূতোকে বার করে মেঝেতে রেখে নবীন বললে, 'দেখুন তো, এই পুতুলের মাথায় আর গোঁফে যে সাদা চুল রয়েছে, সে কি আপনারই দেওয়া?'

আদিনাথ পাল ভারি অবাক হয়ে বলল, 'এ আবার কী বলছেন স্যার। পাকা চুলের কথা তো আপনি বলেননি! বললে, কাঁচা পাকা মিশিয়ে দিতে তো কোনো অসুবিধে ছিল না। দু'রকম চুলই তো আছে স্টকে; যে যেমনটি চায়।'

'ভুল করে দু-একটা সাদা চুল মিশে যেতে পারে না কি?'

'ভুল তো মানুষের হয় বটেই। তবে তেমন হলে আপনি পুতুল নেবার সময়ই বলতেন না কি? আমার কী মনে হয় জানেন স্যার, অন্য কেউ এসে এ চুল লাগিয়ে দিয়েছে; আপনি টের পাননি।'

তাই হবে নিশ্চয়ই। নবীনের অজান্তেই ঘটনাটা ঘটেছে।

চেতলায় ফ্রেন্ডস ক্লাবের ফাংশনে একটা মজার ব্যাপার হল।

ভূতোর জনপ্রিয়তার এইটেই প্রমাণ যে ফাংশনের উদ্যোক্তারা তার আইটেমটি রেখেছিলেন সবার শেষে। লোড শেডিং নিয়ে রসাল কথোপকথন চলেছে ভূতো আর নবীনে। নবীন দেখল যে ভূতোর উত্তরে সে যে সব সময় তৈরি কথা ব্যবহার করছে তা নয়। তার কথায় অনেক সময় এমন সব ইংরিজি শব্দ ঢুকে পড়ছে যেগুলো নবীন কখনো ব্যবহার করে না—বড় জোর তার মানেটা জানে। নবীনের পক্ষে এ একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা। অবিশ্যি তার জন্য শো-এর কোন ক্ষতি হয়নি, কারণ কথাগুলো খুব লাগসই ভাবেই ব্যবহার হচ্ছিল, আর লোকেও তারিফ করছিল খুবই। ভাগ্যে তারা জানে না যে নবীনের বিদ্যে হাইয়ার সেকেন্ডারী পর্যন্ত।

কিন্তু এই ইংরিজি কথার অপ্রত্যাশিত ব্যবহারটা নবীনের খুব ভালো লাগেনি। তার সব সময়ই মনে হচ্ছিল অন্য একজন কেউ যেন অলক্ষ্যে তার উপর কর্তৃত্ব করছে। শো-এর পর বাড়ি ফিরে এসে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে নবীন টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে ভূতোকে রাখল বাতির সামনে।

কপালের তিলটা কি ছিল আগে? না। এখন রয়েছে। সেদিন তার ঘরে বসেই নবীন প্রথম লক্ষ্য করেছে অক্রুরবাবুর কপালের তিলটা। খুবই ছোট্ট তিল, প্রায় চোখে পড়ার মত নয়। ভূতোর কপালেও এখন দেখা যাচ্ছে তিলটা।

আর সেই সঙ্গে আরো কিছু।

আরো খান দশেক পাকা চুল।

আর চোখের তলায় কালি।
এই কালি আগে ছিল না।
নবীন চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করে দিল। তার ভারি অস্থির লাগছে। ম্যাজিকের কারবারী সে কিন্তু এ ম্যাজিক বড়ই অস্বস্তিকর। যে ম্যাজিকে সে বিশ্বাস করে তার সবটাই মানুষের কারসাজি। যেটা অলৌকিক, সেটা নবীনের কাছে ম্যাজিক নয়। সেটা অন্য কিছু। সেটা অশুভ। ভূতোর এই পরিবর্তনের মধ্যে সেই অশুভের ইঙ্গিত রয়েছে।
অথচ একদৃষ্টে চেয়ে থেকেও ভূতোকে পুতুল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। চোখে সেই ঢুলুঢুলু চাহনি, ঠোঁটের কোণে অল্প হাসি, আর খেলার সময় তার নিজের হাতের কারসাজি ছাড়া যে কোন পুতুলের মতই অসাড়, নির্জীব।
অথচ তার চেহারায় অল্প অল্প পরিবর্তন ঘটে চলেছে।
আর নবীন কেন জানি বিশ্বাস করে এই পরিবর্তনগুলো অক্রূর চৌধুরীর মধ্যেও ঘটছে। তারও চুলে পাক ধরেছে, তারও চোখের তলায় কালি পড়ছে।
ভূতোর সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলে টেকনিকটা ঝালিয়ে নেওয়ার অভ্যাস নবীনের প্রথম থেকেই। যেমন—
'আজ দিনটা বেজায় গুমোট করছে, না রে ভূতো?'
'হুঁ, গেজায় গুঙোট।'
'তবে তোর সুবিধে আছে, ঘাম হয় না।'
'কুতুলের আগার ধাঙ—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!'
আজও প্রায় আপনা থেকেই নবীনের মুখ থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে পড়ল।
'এসব কী ঘটছে বল তো ভূতো?'
উত্তরটা এল নবীনকে চমকে দিয়ে—
'কর্ঙখল কর্ঙখল!'
কর্মফল।
নবীনের ঠোঁট দিয়েই উচ্চারণটা হয়েছে যেমন হয় স্টেজে কিন্তু উত্তরটা তার জানা ছিল না। এটা তাকে দিয়ে বলানো হয়েছে। কে বলিয়েছে সে সম্বন্ধে নবীনের একটা ধারণা আছে।
সে রাত্রে চাকর শিবুর অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও নবীন কিচ্ছু খেল না। এমনিতে রাত্রে ওর ঘুম ভালোই হয়, কিন্তু সাবধানের মার নেই, তাই আজ একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে নিল। একটা নাগাদ বুঝতে পারল বড়িতে কাজ দেবে। হাত থেকে পত্রিকাটা নামিয়ে রেখে হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিতেই চোখের পাতা বুজে এল।
ঘুমটা ভেঙে গেল মাঝরাত্তিরে।
ঘরে কে কাশল?
সে নিজে কি? কিন্তু তার তো কাশি হয়নি। অথচ কিছুক্ষণ থেকেই যেন খুক্ খুক্ শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে।
ল্যাম্পটা জ্বালালো নবীন।
ভূতনাথ বসে আছে সেই জায়গাতেই, অনড়। তবে তার দেহটা যেন একটু সামনের দিকে ঝোঁকা, আর ডান হাতটা ভাঁজ হয়ে বুকের কাছে চলে এসেছে।
নবীন ঘড়িতে দেখল সাড়ে তিনটে। বাইরে পাহারাওয়ালার লাঠির ঠক্ ঠক্। দূরে কুকুর ডাকছে। একটা প্যাঁচা কর্কশস্বরে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল তার বাড়ির উপর দিয়ে। পাশের বাড়িতে কারুর কাশি হয়েছে নিশ্চয়ই। আর জানালা দিয়ে হাওয়া এসে ভূতোর শরীরটাকে সামনে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে কলকাতা শহরের জনবহুল মির্জাপুর স্ট্রীটে তার এহেন অহেতুক ভয় অত্যন্ত বিসদৃশ।
নবীন ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল, এবং আবার অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ফিন্‌লে রিক্রিয়েশন ক্লাবের বাৎসরিক ফাংশনে নবীন প্রথম ব্যর্থতার আস্বাদ পেল।

প্রকাণ্ড হলে প্রকাণ্ড অনুষ্ঠান। যথারীতি তার আইটেম হল শেষ আইটেম। আধুনিক গান, আবৃত্তি, রবীন্দ্রসংগীত, কত্থক নাচ ও তারপর নবীন মুনসীর ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম। সকালে বাড়ি থেকে বেরোবার আগে নিজের গলার যত্ন নেবার জন্য যা করার সবই করেছে নবীন। গলাটাকে পরিষ্কার রাখা খুবই দরকার, কারণ সূক্ষ্মতম কন্ট্রোল না থাকলে ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম হয় না। স্টেজে ঢোকার আগে পর্যন্ত সে দেখেছে তার গলা ঠিক আছে। এমন কি ভূতোকে প্রথম প্রশ্ন করার সময়ও সে দেখেছে গলা দিয়ে পরিষ্কার স্বর বেরোচ্ছে। কিন্তু সর্বনাশ হল ভূতোর উত্তরে।

এ উত্তর দর্শকের কানে পৌঁছাবে না কারণ সর্দি-কাশিতে বসে গেছে সে গলা। আর এটা শুধু ভূতোর গলা। নিজের গলা সাফ এবং স্পষ্ট।

'লাউডার প্লীজ' বলে আওয়াজ দিল পিছনের দর্শক। সামনের দর্শক অপেক্ষাকৃত ভদ্র তাই তাঁরা আওয়াজ দিলেন না, কিন্তু নবীন জানে যে তাঁরা ভূতোর একটা কথাও বুঝতে পারছেন না।

আরো পাঁচ মিনিট চেষ্টা করে নবীনকে মাপ চেয়ে স্টেজ থেকে বিদায় নিতে হল। এমন লজ্জাকর অভিজ্ঞতা তার জীবনে এই প্রথম।

সেদিনের পারিশ্রমিকটা নবীন নিজেই প্রত্যাহার করল। এ অবস্থায় টাকা নেওয়া যায় না। এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি নিশ্চয়ই চিরকাল চলতে পারে না। অল্পদিনের মধ্যেই আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে এ বিশ্বাস নবীনের আছে।

ভাদ্র মাস। গরম প্রচণ্ড। তার উপরে এই অভিজ্ঞতা। নবীন যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত সাড়ে এগারোটা। সে রীতিমত অসুস্থ বোধ করছে। এই প্রথম ভূতোর উপর একটু রাগ অনুভব করছে সে, যদিও সে জানে ভূতো তারই হাতের পুতুল। ভূতোর দোষ মানে তারই দোষ।

টেবিলের উপর ভূতোকে রেখে নবীন দক্ষিণের জানালাটা খুলে দিল। হাওয়া বিশেষ নেই, তবে যেটুকু আসে, কারণ আজ শনিবার, রাত বারোটার আগে পাখা চলবে না।

নবীন মোমবাতিটা জ্বেলে টেবিলে রাখতেই একটা জিনিস দেখে তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

ভূতোর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

শুধু তাই না। ভূতোর গালে চকচকে ভাবটা আর নেই। ভূতো শুকিয়ে গেছে। আর ভূতোর চোখ লাল।

এই অবস্থাতেও নবনী তার পুতুলের দিকে আরো দু'পা এগিয়ে না গিয়ে পারল না। কত বিস্ময় কত বিভীষিকা তার কপালে আছে সেটা দেখবার জন্য যেন তার জেদ চেপে গেছে।

দু'পা-র বেশি এগোন সম্ভব হল না নবীনের। একটি জিনিস চোখে পড়ায় তার চলা আপনিই বন্ধ হয়ে গেছে।

ভূতোর গলাবন্ধ কোটের বুকের কাছটায় একটা মৃদু উত্থান-পতন।

ভূতো শ্বাস নিচ্ছে।

শ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে কি ?

হ্যাঁ, যাচ্ছে বৈ কি। ট্র্যাফিক-বিহীন নিস্তব্ধ রাত্রে নবীনের ঘরে এখন একটির বদলে দুটি মানুষের শ্বাসের শব্দ।

হয়তো চরম আতঙ্ক আর প্রচণ্ড বিস্ময় থেকেই নবীনের গলা দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে পড়ল—

'ভূতো !'

আর সেই সঙ্গে এক অশরীরী চিৎকার নবীনকে ছিটকে পিছিয়ে দিল তার তক্তপোশের দিকে—

'ভূতো নয় ! আমি অক্রুর চৌধুরী !'

নবীন জানে যে সে নিজে এই কথাগুলো উচ্চারণ করেনি। কণ্ঠস্বর ওই পুতুলের। অক্রুর চৌধুরী কোনো এক আশ্চর্য যাদুবলে ওই পুতুলকে সরব করে তুলেছেন। নবীন চেয়েছিল অক্রুর চৌধুরীকে তার হাতের পুতুল বানাতে। এ জিনিস নবীন চায়নি। এই জ্যান্ত পুতুলের সঙ্গে এক ঘরে থাকা নবীনের পক্ষে অসম্ভব। সে এখনই—

কী যেন একটা হল।

একটা শ্বাসের শব্দ কমে গেল কি ?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

ভূতো আর নিশ্বাস নিচ্ছে না। তার কপালে আর ঘাম নেই। তার চোখের লাল ভাবটা আর নেই, চোখের তলায় আর কালি নেই।

নবীন খাট থেকে উঠে গিয়ে ভূতোকে হাতে নিল।

একটা তফাত হয়ে গেছে কেমন করে জানি এই অল্প সময়ের মধ্যেই।

ভূতোর মাথা আর ঘোরানো যাচ্ছে না, ঠোঁট আর নাড়ানো যাচ্ছে না। যন্ত্রপাতিতে জাম ধরে গেছে। আর একটু চাপ দিলে ঘুরবে কি মাথা?

চাপ বাড়াতে গিয়ে মাথাটা আলগা হয়ে টেবিলে খুলে পড়ল।

* * *

পরদিন সকালে সিঁড়িতে নবীনের দেখা হল বাড়িওয়ালা সুরেশ মুৎসুদ্দির সঙ্গে। ভদ্রলোক অভিযোগের সুরে বললেন, 'কই মশাই, আপনি তো আপনার পুতুলের খেলা দেখালেন না একদিনও আমাকে। সেই যে ভেন্টিকলোজিয়াম না কী!'

'পুতুল নয়,' বলল নবীন, 'এবার অন্য ম্যাজিক ধরব। আপনার যখন শখ আছে তখন নিশ্চয়ই দেখাব। কিন্তু হঠাৎ এ প্রসঙ্গ কেন?'

'আপনার এক জাতভাই যে মারা গেছে দেখলুম কাগজে। অক্রূর চৌধুরী।'

'তাই বুঝি?'—নবীন এখনো কাগজ দেখেনি।—'কিসে গেলেন?'

'হৃদরোগ', বললেন সুরেশবাবু, 'আজকাল তো শতকরা সত্তর জনই যায় ওই রোগেই।'

নবীন জানে যে খোঁজ নিলে নির্ঘাৎ জানা যাবে মৃত্যুর টাইম হল গতকাল রাত বারোটা বেজে দশ মিনিট।
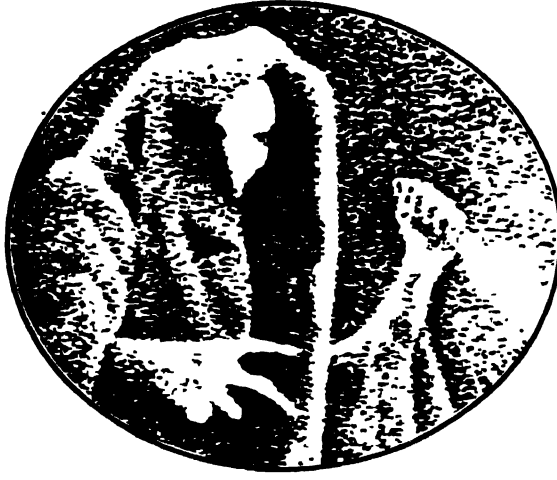
হয়তো বা

বিমল কর

আরও ফার্লংটাক এগিয়ে এসে গাড়িটা থামল। এতক্ষণ চাকা ঘষড়ে যাওয়ার বিশ্রী একটা শব্দ উঠছিল এবং এই ফাঁকা মাঠ, খালবিলে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। গোটা কুড়ি ওয়াগনের শ'খানেক চাকায় ব্রেকগুলো পুরোপুরি কামড় দেয়নি, একটু একটু করে দাঁত বসাচ্ছিল। শেষ কামড়ের সঙ্গে সঙ্গে সব চুপ। একেবারে নিস্তব্ধ।

সন্তোষ বাইরে দাঁড়িয়েছিল। ব্রেকভ্যানের ফাঁকা বারান্দাটুকুর মধ্যে। এটা আপ ট্রেন। ডান দিকের সিঁড়ির কাছটায় গলা বুক বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছিল সন্তোষ।

হল কি? লাইন ক্লিয়ার নেই, সিগন্যাল পায়নি? মাথার ওপর হাত তুলে যে হ্যাণ্ডেলটা ধরে সন্তোষ এতক্ষণ ঝুলছিল, এবার সেইটে আরও একটু শক্ত মুঠোয় ধরে আধখানা শরীরই গাড়ির বাইরে বের করে দিল।

না, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

চুলোয় যাক। গুডস্ ট্রেনের হালই এই। চলছে তো চলছে, দাঁড়াল তো দাঁড়াল—মাঠ-ঘাট ঠাঁই-বেঁঠাই বিচার নেই। লাইনে ফেলে রাখল তো রাখলই—সারা রাত জঙ্গলের মধ্যেই ফেলে রাখল।

একটু বিরক্ত হয়েছিল সন্তোষ। কিন্তু এখন যেন অযথা এই বিরক্তি উড়িয়ে দিতে, মনটা হালকা করতে ঠোঁটে একটা শিস তুলে বেশ টেনে টেনে বাজাল।

তারপর দেখতে লাগল। এই সন্ধেতেও চাঁদ উঠে গেছে আকাশে। শুক্লপক্ষের দ্বাদশী, ত্রয়োদশী হবে হয়তো। আকাশটা খুব পরিষ্কার, আলো পড়া কাচের মতন। চাঁদটা উঠেছে যেন মাঠ-ঘাট ঝলমলিয়ে। সামনে মাঠ, উঁচু-নিচু। টুকরো টুকরো ক্ষেত। জল জমা বিল। শালের ছোট ছোট ঝোপ। টেলিগ্রাফের পোস্ট, তার। এমনকি রেল লাইনের পাথরকুচি, ফিশ প্লেট, চকচকে লাইন পর্যন্ত স্পষ্ট দেখাচ্ছিল।

সন্তোষ মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। আর ভাবছিল, কী অদ্ভুত জ্যোৎস্না, মার্ভেলাস। একটা ছুঁচ পড়লেও খুঁজে পাওয়া যায়।

ঠোঁটের শিসে এবার একটা গানের কলি বাজাতে লাগল সন্তোষ। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে।

গুরু-গুরু শব্দটা দূর থেকে কানে আসছিল। ডাউন ট্রেন আসছে একটা। ও, এই জন্যেই লাইনে ঠেলে দিয়েছিল তার গাড়িটা। স্টেশনে লাইন পায়নি। কি ব্যাপার? ডাউন লাইনটায় আবার কোন্ গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে! লোকালটা নিশ্চয়। ওটাকে আটকে মেলটাকে পাস করিয়ে দিচ্ছে।

সন্তোষ মোটামুটি অনুমান করেছিল আগেই। এখন নিঃসন্দেহ হল, স্টেশনের কাছাকাছি কোন জায়গায় তার গাড়ি আটকে দিয়েছে। খুব সম্ভব ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের একটু আগেই। এ লাইনে গাড়ি নিয়ে তার যাতায়াত খুব অল্প। ভাল করে এখনও সব চিনতে পারেনি।

সার্চ লাইটের আলো পড়ল ছিটকে। পাশের লাইনে, আশেপাশে। শব্দটা খুব জোর। গলা বুকটা একটু ভেতর দিকে টেনে নিল সন্তোষ। আলোটা আরও ছড়িয়ে যেতে যেতে গোল হয়ে এসেছে। আহা, অমন চাঁদের আলোকে শুষে একেবারে শেষ করে দিল।

দেখতে দেখতে গাড়িটা এসে পড়ল। প্রচণ্ড এবং দ্রুত একটা যান্ত্রিক শব্দ। ফিশ প্লেটের জয়েন্টগুলো খটাখট নড়ছে আর কাঁপছে আর শব্দ তুলছে। মনে হচ্ছিল যেন একটা সাঙ্ঘাতিক ঝড় লাইন, বল্টু, পাথর, ফিশ প্লেট সব চিবিয়ে, উড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

তুফান মেল। নিশ্চয় তুফান মেল। লেট করেছে। খুব লেট করেছে আজ। যতটা পারে মেকআপ করে নেবার চেষ্টা করছে। স্পীডের ধরাধরি আর মানছে না।

মাধুরীর কথাটা মনে পড়ল। আচমকা। একটু স্পীডের মাথায় ট্রেন চললেই মাধুরীর যেন কি হত! বড় ভয় পেয়ে যেত! মুখ ফ্যাকাশে করে, কিছু একটা আঁকড়ে বসে থাকত।

সার্চ লাইটের আলোটা চোখের সামনে থেকে যখন আলগোছে উঠে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে আর ইঞ্জিনের কালো মুখটা চোখে পড়ছে সন্তোষের—ঠিক তখন—তখনই মনে হল—।

অল্পক্ষণ আর অন্য কিছু নেই। শুধু খটখট—খটাখট শব্দ, ভীষণ শব্দ—আর আলো অন্ধকার জানলা মুখ—পলকে সব যেন একাকার হয়ে কোথায় মিশে গেল!

ট্রেনটা চলে গেল। দূর থেকে দূরে—আরও দূরে। ঝকঝকে জ্যোৎস্নায় আবার সন্তোষের ব্রেকভ্যানের সামনের লাইন আর পাথরটুকরো—এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকল। ঝিঁঝি ডাকতে লাগল আগের মতন, দু'চারটে জোনাকি উড়তে লাগল।

সন্তোষ কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখে বুক ঝুঁকিয়ে ব্রেকভ্যানের সামনের লাইনটুকু দেখছিল।

হাসল সন্তোষ। শিস দিল। কী আশ্চর্য, মাঝে মাঝে মানুষের মনে এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা আসে—যার কোন মানে হয় না। একেবারে মিনিংলেস।

মেল ট্রেনের ইঞ্জিনটা যখন একেবারে কাছে—হাওয়ার বেগে লাইন কাঁপিয়ে উড়ে যাচ্ছে, তখন সন্তোষের হঠাৎ ওরকম মনে হল কেন?

মনে হল, সন্তোষের পাশ থেকে কেউ যেন এগিয়ে গিয়ে ঝপ করে লাইনের ওপর লাফিয়ে পড়ল। কী আশ্চর্য অনুভূতি। সন্তোষের গালে একটা ঘোমটার ছোঁয়া লাগতে না লাগতেই সব শেষ। আর কিছু নেই।

অজান্তেই একবার গালে হাত বুলিয়েছিল সন্তোষ। কিছু না। কিন্তু ঘোমটার ছোঁয়া লাগল, এ কথাই বা কেন মনে হল?

মনে মনে সন্তোষ যদিও বুঝছিল, ব্যাপারটা অসম্ভব, তবু পলকের জন্যে তার চোখ স্থির, হৃদপিণ্ড স্তব্ধ এবং একটা চমকানোর ভাব হয়েছিল। ট্রেনটা চলে যেতে সামনের লাইনের দিকে যেন কেউ জোর করে চোখটা আটকে রেখেছিল অল্পক্ষণ।

কই, কিছুই তো নয়। ভুল, সব ভুল। চোখের ভুল।

গা ঝেড়ে, হাত দুটো মাথার ওপরকার হ্যাণ্ডেল থেকে তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সন্তোষ। ব্রেকভ্যানের দু'হাত বারান্দায় জুতোর গোড়ালি ঠুকে ঠুকে একটু পায়চারি করলে। মাথার ওপরকার সুন্দর চাঁদ দেখল এবং এক টুকরো তুলোট মেঘ।

সিগারেট ধরিয়ে সন্তোষ তার ঘরটার মধ্যে উঁকি দিল। পায়রাখুপরি ঘর। টিমটিম বাতি, লাল-নীল লণ্ঠন, কাচের বাক্স, খাতাপত্র।

খোলা জায়গায় আবার একটু পায়চারি করে, সিঁড়ির কাছটায় বসল সন্তোষ। লাইনের দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ গলা ছেড়ে একটা গমগম সুরের গান গাইতে লাগল।

মেলটা অনেকক্ষণ চলে গেছে—তবু তার গাড়িটাকে আটকে রেখেছে কেন? সন্তোষ চটছিল মনে মনে। অযথা ডিটেন করা এ-এস-এমদের একটা দস্তুর। হয়তো স্টেশনে গিয়ে দেখবে, এ-এস-এম নেই; বাড়িতে বউয়ের হাতে এককাপ চা আর পান খেতে গেছে। কিংবা শালার বেটা পার্শেল লগেজ থেকে কিছু সরিয়ে বাড়িতে রাখতে ছুটেছে।

লাইন স্টাফ হলেই এই হবে। এক নম্বরের ছ্যাঁচড়, বদমাস, চোর। হাতটান থাকবেই।

ঘড়িটা দেখল সন্তোষ। চাঁদের আলোয় কাঁটাগুলো বেশ স্পষ্টই দেখাচ্ছিল। আটটা পাঁচ।

পৌনে ন'টা বেজে গেল, তবুও সন্তোষের গাড়ি লাইন পেল না। বাস্তবিকই এবার চটেছে সন্তোষ। এর মানেটা কি! দেড়শ' মাইলেরও ওপর তাকে রান করতে হবে, পঁচিশ মাইল আসতে না আসতেই এই কাণ্ড। পাকা দেড়টি ঘন্টা আটকে রাখল। ননসেন্স যত সব।

ভ্যানের মধ্যে থেকে লাল-নীল বাতিটা টেনে দিয়ে টপ করে লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে পড়ল সন্তোষ। থাক দাঁড়িয়ে গাড়ি, কোম্পানির মাল, তোমার যা আমারও তাই। এই আমি চললুম। স্ট্রেট স্টেশনে যাব। ব্যাপারটা কি!

হাতের বাতিটা পথ দেখে যাবার জন্যে নয়। যা আলো চাঁদের, তাতে পথ দেখার জন্যে এই লাল লণ্ঠন নেবার দরকার করে না। এটা শুধু গার্ড সাহেবের অস্তিত্ব। অর্থাৎ ড্রাইভার তুমি রুখে থাক, আমা বিহনে যেতে পারবে না। বলা তো যায় না, যদি এর মধ্যে সিগন্যাল পেয়ে যায় ড্রাইভার।

পাশের লাইনের স্লিপারের ওপর দিয়ে টপকে টপকে সন্তোষ ইঞ্জিনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। বাঁ হাতে বাতিটা ঝুলছে; হাঁটার তালে তালে দুলছে। নিজের ছায়াটা দেখতে পেল সন্তোষ। লাইনের ওপর এবং পাশ দিয়ে মাটি, কাঁকর, ঘাস গড়িয়ে দিব্যি চলেছে।

ইঞ্জিনের কাছাকাছি আসতে স্টিমের শব্দটা শোনা গেল। যেন ব্রয়লারে আগুন ঠেলে ঠেলে কোনরকমে স্টিমটা বাঁচিয়ে রেখেছে ওরা। ড্রাইভারদের দেখতে পেল সন্তোষ। আলোর মধ্যে দাড়িবালা ইব্রাহিমের প্রায় গোটা চেহারাটাই চোখে পড়ল। ফায়ারম্যান বয়লারের ঢাকনাটা খুলে কয়লা ছুঁড়ছে ভেতরে। গনগনে আগুনের আভায় ইব্রাহিম, ফায়ারম্যান—দুজনেই খুব স্পষ্ট।

সন্তোষ হাঁক দিল।

ইব্রাহিম পাদানির কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, স্টেশন এখান থেকে অনেকটা দূর বাবু। যাবেন না। বেকার গিয়ে কি লাভ! আমার মালুম, আপ লাইনটা মেরামতি হচ্ছে। ডাইন লাইন দিয়ে গাড়ি পাশ করাবে। লোকালটা আগাড়ি খুলে দিয়ে বাদ আমাদের লাইন দেবে।

অনুমানটা ঠিকই করেছিল ইব্রাহিম। দূরে সিগন্যালের দিকে তাকিয়ে সেটা বোঝা গেল। একটা ডাউন গাড়ি আসার সিগন্যাল পড়েছে।

ইব্রাহিমের সঙ্গে কথা বলে সন্তোষ ফিরব-ফিরব করছে—ডাউন গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল দূরে। লোকাল প্যাসেঞ্জারটা আসছে। এটাও আজ লেট।

ফিরতে গিয়েও ফিরল না সন্তোষ। ইঞ্জিনের পাদানি বেয়ে উঠে ইব্রাহিমের পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। ট্রেনটা চলে যাক আগে।

ডাউন ট্রেন চলে গেলে সন্তোষ তার ব্রেকভ্যানে ফিরে এল। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে।

এতক্ষণ পরে সিগন্যাল পেয়ে তার গাড়ির ইঞ্জিনটা হুইসল্ দিল। স্টিমের ভস্ ভস্ শব্দ ছাড়ল। ব্রেক ছাড়ানো চাকা একবার ঝাঁকুনি দিয়ে সামনে এগোল, আবার পেছনে। সবুজ আলো নেড়েই যাচ্ছিল সন্তোষ গা ঝুঁকিয়ে।

শেষ পর্যন্ত ছাড়ল, মালগাড়িটা ছাড়ল।

বারান্দায় একটু দাঁড়িয়ে থেকে আলোটা রাখতে কেবিনে ঢুকল সন্তোষ। আলোটা রাখতে

যাচ্ছে—হঠাৎ চোখে পড়ল। আর চোখে পড়তেই প্রথমটা থমকে গেল। ঘরের মিটমিটে আলোয় জিনিসটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অথচ সন্তোষ যে ডান হাতে তার গার্ডের বাতিটা ধরে আছে, এ সম্পর্কেও সে নিঃসন্দেহ। কাজেই এটা ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন নয়—অন্যমনস্ক হয়ে হঠাৎ দৃষ্টিভ্রম ঘটেছে, তাও নয়। তবু হাতের বাতির আলোটা ফেলল সন্তোষ।

ভীষণ ভাবে চমকে গেল এবার। চোখের পাতা পড়ল না আর। বিস্ময়টা যেন বুক, চোখ, নিশ্বাস-প্রশ্বাস—সমস্ত কিছুকে অদ্ভুত এক মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল। সন্তোষ বিমূঢ় এবং বিস্ময়বিহ্বল হয়ে দেখছিল জিনিসটা।

একজোড়া চটি। লেডিজ স্যাণ্ডেল। সন্তোষের বসবার জায়গাটায় রাখা রয়েছে।

কার স্যাণ্ডেল ? কোথা থেকে এল ? কেমন করে ? সন্তোষ কিছুই বুঝতে পারছিল না।

তার পায়রা-খুপরি কেবিনটা তবু ভাল করে দেখল সন্তোষ। বাইরে বেরিয়ে বারান্দাটুকুও নজর করল। কেউ নেই। কী আশ্চর্য, হ্যাণ্ডেল ধরে পিছনে তাকাল। চাঁদের আলোয় অনেকটাই দেখা যায়। ব্রেকভ্যানটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে অন্তত পঞ্চাশ গজ এগিয়ে এসেছে গাড়ি। কিছু আর বোঝা যাচ্ছে না।

অদ্ভুত ব্যাপার তো ! চটি জোড়া এল কি করে ? কে রেখে দিয়ে গেল ?

সন্তোষ যখন ব্রেক ছেড়ে চলে গিয়েছিল, নিশ্চয় তখন কেউ রেখে দিয়ে গেছে। কিন্তু এমন জন-মানুষহীন জায়গায় কে আসবে—আসতে পারে ? বিশেষ করে মেয়েছেলে ?

সন্তোষ মনে করে দেখল তার ব্রেক যেখানে দাঁড়িয়েছিল, তার আশেপাশে কোন ঘর-বাড়ি ছিল বলে তার মনে হচ্ছে না। এমনও নয় যে, কোন ছেলেমেয়ের দল বেড়াতে বেড়াতে ওখানে গিয়েছিল। সেরকম কাউকে সন্তোষ দেখেনি, কারও সাড়া পায়নি।

তবে ?

তবে কি কেউ আশেপাশে লুকিয়েছিল ! কেনই তা থাকবে ? থাকলেও চুপিসাড়ে এসে সন্তোষের কেবিনে যাতে চোখে পড়ে, এমন ভাবে পায়ের চটি জোড়া রেখে যাবে কেন ? কি উদ্দেশ্যে ? কোথায় বা লুকোবে সে ?

হঠাৎ মনে হল, এমন নয় তো যে—কোন মেয়ে আত্মহত্যা করতে এসেছিল গাড়ির চাকার তলায় ? এই জুতো জোড়া শুধু তার উপস্থিতির প্রমাণ।

সন্তোষের কপালে, গালে, গলায় দরদর করে ঘাম জমতে লাগল। যদি তাই হয়—তবে—তবে ?

ভাবতে পারছিল না সন্তোষ। মেল ট্রেনটা যাবার সময় তার মনে হয়েছিল, কে যেন ওর পাশ থেকে লাফিয়ে পড়ল লাইনের ওপর। অবশ্য সত্যিই কেউ আর লাফিয়ে পড়েনি। প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা যাবার সময় ব্রেকে ছিল না সন্তোষ—তখন যদি কেউ গলা বাড়িয়ে দিয়ে থাকে— ! দিতে পারে, দিলে জানবার উপায় নেই। কিংবা, বলা যায় না, হয়তো—সন্তোষেরই ব্রেকভ্যানের চাকার তলায় গলা বাড়িয়ে দিয়েছে।

সন্তোষের শরীরটা ভীষণভাবে ঘামছিল। সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা, অসাড়। বুকের মধ্যে কেউ যেন পাগল হাতে হাতুড়ি পিটছিল।

এই ভয় পাওয়া, মুষড়ে পড়া ভাবটা কিন্তু আস্তে আস্তে এক সময় অনেকটা কেটে গেল। অত বাড়াবাড়ি রকমের কল্পনা করে লাভ কি ? আত্মহত্যা করতেই কেউ এসেছিল, এর কি মানে আছে। হতে পারে, কোন দুজন বেড়াতে এসেছিল। একটি পুরুষ, একটি মেয়ে। মেয়েটির পায়ে হয়তো লাগছিল, ফোস্কা পড়েছিল—চটিটা নতুন, সদ্য নতুন, হয়তো সে আর হাঁটতে পারছিল না—তাই ফেলে দিয়ে গেছে। আর এমনি ফেলে দিয়ে যাওয়ার চেয়ে হয়তো সেই রসিক পুরুষ আর মেয়েটি সন্তোষকে খানিকটা বিহ্বল করার জন্যই এই রসিকতাটুকু করেছে।

সন্তোষ চটি জোড়া ভাল করে দেখতে লাগল। দামী চটি। মোরগের ঝুঁটির মতন লাল ভেলভেটের ফুলও আছে একটা করে।

মাধুরীকে আচমকা আবার মনে পড়ল। লাল জিনিসটা সে একদম পছন্দ করতে পারত না। এমনি একজোড়া চটি ছিল তারও। পরত না, পরতে চাইত না। সন্তোষ বলত, নষ্ট করে লাভ কি, পরে ফেল। দিনে পরতে লজ্জা হয়, রাতে পায়ে দিও। আমার তো ভালই লাগে দেখতে।

'আহা !' মাধুরী মুখ ভেংচিয়ে হাসত।

'ঠাট্টা করছি না। সত্যি বলছি। যা ধবধবে সুন্দর পা তোমার। খুব মানায়।' সন্তোষ জবাব দিত।

ইঞ্জিনটা বারবার সিটি দিচ্ছিল। সন্তোষের তন্ময়তা এবং ঘোর ভাঙল। একটা বড় স্টেশনের ইয়ার্ডের মধ্যে তার গুডস্ ট্রেনটা ঢুকে পড়েছে। লাইন থেকে আর এক লাইনে সরে যাওয়ার ঘটঘটানি, শান্টিংয়ের ফোঁস ফোঁস, একটা গাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেল, আলোয় আলোয় একাকার ইয়ার্ড।

সন্তোষ কেবিন ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

তার গুডস্ ট্রেনটাকে এখানে আটকে থাকতে হবে কিছুক্ষণ। ঘন্টাখানেক কম করেও।

গাড়ি থামলে, খাতাপত্র উঠিয়ে ব্রেক ছেড়ে নেমে আসতে গিয়ে কি যেন ভাবল সন্তোষ। আবার উঠে কেবিনের ভেতর গেল। লেডিজ স্যান্ডেল জোড়া খবরের কাগজটায় মুড়ে নিল। তারপর আস্তে আস্তে নেমে ইয়ার্ড ধরে হনহন করে স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল।

মাসখানেক পরে আবার। তেমনি ফুটফুটে চাঁদের আলো। মালগাড়ি নিয়ে সন্তোষ যাচ্ছে। লাইন ক্লিয়ার না পেয়ে আটকে গেল রাস্তাতেই। তবে রক্ষে এই যে, এবার আর অতটা মাঠজঙ্গলে পড়ে থাকল না। একটা মাঝারি স্টেশনের ওয়াটার রিজার্ভারের কাছেই থেমে গেল।

খানিকটা অপেক্ষা করে সন্তোষ হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল। কাছেই ক'টা রেল কোয়ার্টার। সামনে একটা বাঁধানো কিনারা উঁচু কুয়ো। কুয়ো থেকে মাঝে মাঝে জল তোলার শব্দ আসছিল—হুইলের শব্দ। পোর্টারদের কোয়ার্টারের বাইরে লোহার উনুনে আগুন জ্বলছিল। আর রেল কোয়ার্টারের জানলায় লণ্ঠন।

ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় বেড়াতে বেড়াতে প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত চলে এল সন্তোষ। হুইসলের শব্দটা এবার কানে এল। চোখে পড়ল সামনের সিগন্যালটা। সবুজ হয়ে রয়েছে। একটা গাড়ি আসছে। থামবে না, বরাবর বেরিয়ে যাবে। লাইনে শব্দটা উঠছিল। ছেলেবেলায় এই ভাবে কান পেতে কত শব্দ শুনেছে ওরা। এখন আর কান পেতে শব্দ শুনতে হয় না, এমনিতেই বুঝতে পারে—গাড়িটা আর কতদূর।

সন্তোষ হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছিল, থমকে দাঁড়াল। দক্ষিণের রাস্তা দিয়ে একটি মেয়ে খুব স্বচ্ছন্দ গতিতে হেঁটে আসছে। চাঁদের আলোয় তার শরীরটা দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু মুখটা অস্পষ্ট, একেবারেই অস্পষ্ট। মাথায় আধখানা ঘোমটা, শাড়ির রংটা চেনা যাচ্ছিল না।

একটা করবী ঝোপের পাশ দিয়ে আসতে আসতে মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল। সন্তোষও প্ল্যাটফর্মের শুরুর ঢালুটায় এসে পৌঁছেছে। সামনে থেকে সার্চ লাইটের আলোয় লাইন ভিজিয়ে ট্রেনখানা ছুটে আসছে। তার দুরন্ত শব্দ আর থেমে থেমে হুইস্‌ল্।

সন্তোষের পক্ষে এখন আর মেয়েটিকে দেখার উপায় নেই। ও একটু এগিয়ে রয়েছে। পিছু ফিরে চাইলে অবশ্য দেখা যায়।

সন্তোষের ইচ্ছে হচ্ছিল, এখন একবার ফিরে তাকিয়ে দেখে। কিন্তু বাধছিল। সার্চ লাইটের আলোটা ক্রমশই তার আশপাশের জায়গাগুলোকে এত বেশি ঝকঝকে করে তুলছিল—যাতে মনে হল, ফিরে তাকাতে গেলেই মহিলাটি দেখতে পাবে। দেখতে পাবে, সন্তোষ কি ভাবে পিছু ফিরে একটি মহিলাকে দেখছে।

তবু শেষ পর্যন্ত একবার না চেয়ে পারল না সন্তোষ। আলোটা যখন সরে গেছে তার সামনে থেকে—ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সন্তোষ। মহিলা সেখানেই দাঁড়িয়ে। মাটির দিকে অনেকটা নুয়ে পড়ে কি যেন খুঁজছে। কিছু বোধ হয় পড়ে গেছে রাস্তায়। হয়তো গলার হারটা, কিংবা কানের দুল—অন্য কিছুও হতে পারে।

থরথর করে কাঁপছিল লাইন। ঠকঠক খটখট—দ্রুত দুরন্ত একটা শব্দ জলদ সুরে বেজে যাচ্ছিল। ইঞ্জিনটা কয়েক হাতের মধ্যে এসে পড়েছে। সন্তোষের চারপাশে একটা গরম বাতাস ঢেউয়ের মত ভেঙে পড়ল। ক'টা আগুনের ফুলকি ইঞ্জিনের মুখ থেকে উঠে আকাশে ছিটকে

পড়ল।

সন্তোষ লাইনের দিকে তাকাল। ঝড়ের বেগে ইঞ্জিনটা পেরিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ—যাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ সন্তোষ যেন হাত বাড়িয়ে কিছু ধরতে গেল।

চোখের পলকে আলো অন্ধকার, গরম বাতাস, কয়েকটা মুখ—চোখে ধরল কি ধরল না। উধাও হয়ে গেল।

ট্রেনটা চলে গেল। শব্দটা তখনও বাতাসে থেকে গেল। তারপর আস্তে আস্তে মিলিয়ে আসতে লাগল।

লাইনের দিকে কেমন একটা ভীত, বিহ্বল চোখে তাকিয়ে ছিল সন্তোষ। না, কিছু নেই। ঝকঝকে পরিষ্কার লাইন। পাথরগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট। অথচ—!

সন্তোষ পিছু ফিরে তাকাল। আশেপাশে কেউ নেই। সেই মহিলা? না, মহিলাটিকেও আর দেখা যাচ্ছে না। অনেকটা দূরে ঝাঁকড়া মাথা এক গাছের তলা দিয়ে যেন চলে যাচ্ছে মহিলা।

কিন্তু আবার! আবার এমন হল কেন? ট্রেনের ইঞ্জিনটা যখন একেবারে সামনে এসে পড়েছে—সন্তোষের মনে হল, তার পাশ থেকে কেউ যেন লাফিয়ে পড়ল লাইনের ওপর। সন্তোষ তার গায়ের ছোঁয়া—না গায়ের ছোঁয়া ঠিক নয়—কিন্তু শাড়ির ছোঁয়া পেয়েছে। অত আলুথালু ছোঁয়া আর কিসেরই বা হতে পারে।

বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা কাঁপুনি আসছিল আর যাচ্ছিল। সন্তোষ বুঝতে পারছিল না, কেন—কেন এমন হল! একবার নয়—এই নিয়ে দু—দুবার। সবই সেই আগের মতন। অবিকল এক।

কি খেয়াল হল সন্তোষের—হঠাৎ পা চালিয়ে ও এগিয়ে যেতে লাগল করবী ঝোপটার দিকে—মহিলাটি খানিক আগে যেখানে দাঁড়িয়েছিল। যেন সন্তোষ বোঝবার চেষ্টা করছিল, সেটাও চোখের ভুল কি না।

করবী ঝোপের পাশে এসে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাল সন্তোষ। কেউ যে এসেছিল, দাঁড়িয়েছিল বোঝবার কোন উপায় নেই। সেটাই স্বাভাবিক।

কি খুঁজছিল মহিলাটি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? লাল মোরপের রাস্তা লাল দোপাটি ফুলের মত পরিচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। সন্তোষ ভাল করে নজর করে দেখল। কোথাও কিছু পড়ে নেই। একটা সেপটিপিন কিংবা মাথার কাঁটাও নয়।

সন্তোষের গুডস্ ট্রেন সিগন্যাল পেয়ে সিটি দিচ্ছিল। চমকে উঠে সন্তোষ ছুটতে ছুটতে তার ব্রেকের দিকে এগিয়ে চলল।

গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে ব্রেকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকল অনেকক্ষণ সন্তোষ। ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল নিজেকে। মনটাও বড় দমে গেছে। তার কি কোন অসুখ-বিসুখ করল নাকি? একটা বিশ্রী, ভীষণ অস্বস্তিকর অনুভূতি বারবার হচ্ছে কেন? কেন এরকম মনে হচ্ছে যে, তার গায়ের পাশ থেকে কেউ লাইনে চলতি গাড়ির সামনে লাফিয়ে পড়ল। কেন?

তেষ্টা পাচ্ছিল সন্তোষের, হাত-পাগুলোও অবশ লাগছিল। বসবার জন্যে ল্যাম্পটা উঠিয়ে নিয়ে কেবিনের মধ্যে চলে এল।

বাতিটা রাখতে গিয়ে আবার নিস্পন্দ নিথর হয়ে গেল। ঠিক ওর বসবার জায়গাটিতে একটা রুমাল পড়ে আছে।

বেহুঁশের মতন অনেকক্ষণ সেই রুমাল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল সন্তোষ। তারপর যেন ভীষণ একটা জেদ এবং যা হচ্ছে হয়ে যাক, এমন একটা নিস্পৃহ ভঙ্গিতে রুমালটা তুলে নিল সন্তোষ।

ছোট্ট রুমাল। কিনারাগুলো সবুজ সুতো দিয়ে মোড়া। এক কোণে ইংরিজি বাঁকা অক্ষরে লেখা 'এল'। গোলাপি লাল সুতোয় অক্ষরটা তুলেছে কেউ।

কি আশ্চর্য, এই রুমাল কোথা থেকে এল? কে ফেলে গেল? কেমন করে এখানে সে এল? কেনই বা এসেছিল?

সন্তোষের মাথা চোখ ভার হয়ে এল। কিন্তু আর সে বুঝতে পারছিল না, ভাবতে পারছিল না। শুধু অক্ষরটা চোখের সামনে একটা মরা প্রজাপতির মতন নিশ্চল হয়ে থাকল।

মাধুরীকে মনে পড়ছিল। মাধুরীর খুব রুমালের শখ ছিল। বড় ভাল ছুঁচের কাজ করত। পাড়াময় লোকের রুমালে নক্সা তুলে বলতো, এত কষ্ট করে সুতোর কাজ করে দিই, কিন্তু এই রুমাল কি কারুর পকেটে থাকে নাকি ভাবো ! হরদম হারায়। আমার তো বাপু হাতে রুমাল থাকলেই জানি সেটা যেখানে বসব ফেলে আসব। ঠিক ফেলে আসব।

পা থেকে একটা ঠাণ্ডা বরফের স্রোত যেন সাপের মতন কিলবিল করে গা-মাথা বেড় দিয়ে চলে গেল। সন্তোষ অস্ফুট একটা শব্দ করে সামনের কাঠটা ধরে ফেলল।

করবী গাছের ঝোপের পাশে লাল মোরপের রাস্তা আর সেই মহিলা, ট্রেন, ইঞ্জিনের মুখ থেকে হাওয়ায় উড়ে যাওয়া স্ফুলিঙ্গগুলো সব একাকার হয়ে চোখের সামনে দোল খাচ্ছিল।

কতক্ষণ কে জানে—জংশন স্টেশনে গাড়ি থামতে হুঁশ হল সন্তোষের। আলো, কলরব, মানুষজন দেখে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল।

তারপর এক সময় ঘোরটা কাটল। রুমালটা পকেটে পুরে ব্রেক থেকে নেমে গেল তাড়াতাড়ি।

যে ঘটনা দু'বার ঘটে গেছে—তৃতীয়বারও যে সেটা ঘটবে, সন্তোষ যেন সেটা জানত।

জানত বলেই তৃতীয় বারে আর সে অতটা বিস্মিত হল না, বিহ্বল হল না, ভয় পেল না।

সেদিন পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে। শালবনের মাথার ওপরে নরম একটি মেঘ ঘুমিয়ে পড়েছিল। বুনো একটা পাখি উড়ে যাচ্ছিল পথ ভুল করে। ডাকছিল ঘুরে ঘুরে। টেলিগ্রাফের পোস্টগুলো নিঃসঙ্গ মাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই ডাক শুনছিল।

সন্তোষের গুডস্ ট্রেন চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল এই মাঠ আর শালবনের পাশে।

থাক দাঁড়িয়ে—সন্তোষের আর যেন ভাবনা নেই। কেবিনের মধ্যে চুপ করে বসে ও অপেক্ষা করছিল। অপেক্ষা করছিল একজনের। হ্যাঁ, সে আসবে। যে এসেছে আগে। এসেছে আর তার লাল ভেলভেটের ফুল বসানো স্যাণ্ডেল ফেলে গেছে—আবার এসেছে আর তার সুন্দর ছোট্ট রুমাল ফেলে গেছে। আবার সে আসবে।

এমন দিনেই সে আসে—আকাশ যখন চাঁদের আলোয় খইয়ের মতন সাদা, হু-হু বাতাস বয়ে যায় মাঠ থেকে মাঠে—নির্জন নিরিবিলি জায়গায় গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ে।

সন্তোষের আজ আর কোন ভয় নেই, উদ্বেগ নেই, বুক ধুক-ধুক নেই। সে বসেই আছে। আসুক ও। অপেক্ষায় আছে সন্তোষ।

শব্দ হল কি ? না, শব্দ নয়—নিজেরই দীর্ঘশ্বাস।

ঘড়িটা দেখল সন্তোষ। আটটা বাজে। কান পেতে থাকল। রেল লাইনের স্লিপার আর পাথরে একটা অস্পষ্ট শব্দ উঠল না !...না।

একটা সিগারেট ধরালো সন্তোষ। গন্ধটা নাকে বেশ লাগছে। বুক ভরে ধোঁয়া টানল ও। ভালই লাগছে।

সিগারেট শেষ। আরো কাটল খানিক সময়। অধীর হয়ে উঠছিল একটু একটু করে সন্তোষ। কেন আসছে না এখনো ? সময় কি হয়নি !

ট্রেনের বারান্দা থেকে একটা ছায়া যেন কেবিনের দোরগোড়ায় এসে পড়ল। লাফিয়ে উঠল সন্তোষ। এসেছে—এসে গেছে !

ব্রেকের বারান্দায় বেরিয়ে এল। হ্যাঁ, যা ভেবেছিল সে। এসেছে। শাড়ির রেখায় সুন্দর এক মগ্নতা মেখে। ব্রেকের কিনারা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চাঁদের আলোয় স্নান-সেরে-ওঠা মাঠ দেখছে।

সন্তোষ প্রথমেই কাছাকাছি গেল না। একটু তফাতেই দাঁড়িয়ে থাকল।

'এবার কি এনেছ ?' সন্তোষ আচমকা প্রশ্ন করলে।

জবাব নেই। যাকে প্রশ্ন তার গা একটুও নড়ল না। ঘাড় বাঁকাল না সামান্য। যেন এ-প্রশ্ন তাকে নয়।

একটু অপেক্ষা করে আবার শুধোল সন্তোষ, 'কি এনেছ এবার ফেলে যেতে ?'

ও-পক্ষ থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই। যেন মানুষ নয়, একটা মোমের পুতুল দাঁড়িয়ে আছে।

সন্তোষ একটু হাসল। বলল, 'আমি জানি, স্যাণ্ডেল আর রুমালের পর তুমি আর কি ফেলে যেতে

পারো—'

একটু বোধ হয় নড়ল সেই আশ্চর্য শান্ত মূর্তি। ঘাড় বাঁকাল সামান্য। মাথার আলগা ঘোমটাটা খসে গেল। কালো চুলের ছন্দটি চোখে পড়ল। মুখের বাঁকা রেখাটুকু।

সন্তোষ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। বলল, 'আমি জানতাম তুমি আসবে। আমি তৈরি ছিলাম। অপেক্ষা করছিলাম।' একটু থামল, সামান্য এগিয়ে এল : 'কিন্তু এবারই শেষ। আর তুমি আসবে না। আসতে পারবে না। আমার কাছে তোমার আর কিছু নেই। যেটা শেষ ছিল—গলার সরু হারটা—আমি এনেছি।' সন্তোষ পকেটের মধ্যে থেকে সরু চিকচিকে হারটা বের করল, হাতের তালুতে রাখল, দেখল ক'পলক, তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, 'তোমার গলা টিপে আমি ধরতে যাইনি যে এই হারটা আমার হাতে ছিঁড়ে চলে আসবে। কি করে এসেছিল আমি জানি না।'

পুতুলের মুখ আস্তে আস্তে ঘুরে গেল। ভীত, বিস্ময়-স্তব্ধ, শীর্ণ একটি মুখ। চাঁদের আলোয় তার চোখ, নাক, মুখ, ঠোঁট স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। গলাটা নগ্ন। সোনার একটি বিন্দুও সেখানে চিকচিক করছিল না।

সন্তোষ চমকে উঠল না। যেন নাটকের এই দৃশ্যটা তার পুরো জানা, দেখা।

আরো একটু কাছে এগিয়ে গেল সন্তোষ। খানিকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে সেই সাদা নরম ভীত উদ্‌ভ্রান্ত মুখটি দেখলে, সেই মুখের টানা টানা চোখের কোল বেয়ে গড়ানো জল।

খুব আস্তে আস্তে স্পষ্ট করে বলল সন্তোষ, 'আমি তোমাকে সত্যিই ঠেলে ফেলে দিইনি, মাধুরী। আমি ভাবতেই পারিনি, অমন করে তুমি লাইনের ওপর লাফিয়ে পড়বে। বিশ্বাস করো, আমি হাত দিয়ে তোমায় ধরতে গিয়েছিলাম। তোমার গলার হারটা আমার আঙুলে জড়িয়ে গেল, তুমি লাফিয়ে পড়লে।'

মাধুরী একটু যেন সরে গেল।

সন্তোষকে কথায় পেয়েছে। সে থামবে না। বলল, 'আমি তোমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নতুনদি'র কাছে নিয়ে যাব বলে এই ব্রেকে এনে তুলিনি। এমন বে-আইনী কাজ, সবাইয়ের চোখ বাঁচিয়ে করা যে কী কঠিন! তবু তোমায় আমি এনেছিলাম ব্রেকে। কেউ দেখেনি, জানতে পারেনি। এটা আমার ভাগ্য।'

সন্তোষ থামল। জ্যোৎস্না-আকাশের এক প্রান্ত থেকে একটা অস্পষ্ট হুইস্‌লের শব্দ ভেসে এল। কান পেতে শুনল সন্তোষ।

মাধুরী আরো এক-পা সরে গেছে।

সন্তোষ বলল, 'তোমার ভয় বাতিকই সমস্ত নষ্টের গোড়া। গার্ডের বউ, স্বামী লাইনে গেলে একা কোয়ার্টারে থাকতে পারবে না। সারারাত ভয়ে মরবে। কেন? কেউ তো অমন করে না। তুমি করতে। অমরকে তুমি ডেকে এনে রাত্রে শুইয়ে রাখতে কোয়ার্টারে। হোক না অমর ভাল ছেলে, কিন্তু সে সুন্দর। সে তোমায় খুব ভালবাসত। তার মুখের বৌদি আর মনের বৌ'দি যে এক—এ আমি বিশ্বাস করিনি। আমি তোমাদের একসঙ্গে বসে গল্প করতে, চা খেতে, তাস-লুডো খেলতে দেখেছি। আর সেদিন স্টেশন পর্যন্ত এসে ফিরে গিয়ে দেখেছি—তোমরা কি করো। কি করছিলে তোমরা দুজনে অন্ধকারে? তুমি জাপ্টে ছিলে অমরকে। আর অমর বলছিল, ভয় কি, আমি আছি। দাঁড়াও, বাতিটা জ্বালি! তোমার ঘর অন্ধকার হয়েছিল কেন? কেন লণ্ঠন নিভে গিয়েছিল?'

দূরাগত হুইস্‌লের শব্দটা ঘনঘন বাজছিল। স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছিল।

মাধুরী ব্রেকের কিনারা ঘেঁষে আরো খানিকটা সরে গিয়েছিল।

'লজ্জা কি, ভয়ই বা কিসের—আমার লজ্জা নেই, ভয়ও নেই। আমি বলছি, আমি তোমায় সন্দেহ করতে শুরু করেছিলাম অনেক আগে থেকেই। সে-সন্দেহ আমার দৃঢ় হল তোমাদের ওভাবে দেখে। ...হ্যাঁ, আমি বলছি, তোমাকে আমি নতুনদি'র বাড়ি নিয়ে যাব বলে ব্রেকে এনে তুলেছিলাম। আর খুব লুকিয়ে-চুরিয়ে, সাবধানে। গাড়ি ছেড়ে দেবার পর আমি তোমায় কেবিনের মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসেছিলাম।

সন্তোষকে থামতে হল। ট্রেনটা কাছে এসে পড়েছে। নিশ্চয় তুফান মেল। আকাশ-বাতাস ফুঁড়ে সিটি দিতে দিতে ঝড়ের বেগে উড়ে যাচ্ছে। লাইন কাঁপছে। পাথরের টুকরোগুলোতে পর্যন্ত

শব্দ উঠছে। সার্চ লাইটের আলোটা এইবার এখানে এসে পড়েছে।

সন্তোষ মাধুরীর দিকে চেয়ে এবার গলার পর্দা তুলে বলল, 'তুমি বসেছিলে। আমি আস্তে আস্তে আসল কথায় এলুম। আমার মনে লুকোচুরি ছিল না। যা আমার মনে হয়েছে—আমি যে তোমায় সন্দেহ করি—আমি স্পষ্টই তা বলেছিলুম। তুমি শুনে চমকে উঠেছিলে, মুখটা সাদা হয়ে গিয়েছিল, ভয় পেয়েছিলে তুমি। তখন একটা গাড়ি আসছিল। আজকেরই মতন। ওই তফান মেল।'

সন্তোষ একটু থেমে লাইনের দিকে তাকাল। সার্চ লাইটের আলোয় সমস্ত জায়গাটা সাদা হয়ে গেছে। থরথর করে ইস্পাতের পাত দুটো কাঁপছে। ফিশ প্লেট, নাট, পাথরের এক বিচিত্র ঝঙ্কার উঠেছে। যেমন দ্রুত, তেমনি সরব।

লাইনের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সন্তোষ সেই বিহ্বলবাক মূর্তির দিকে চাইল। বলল, 'আমি তোমায় কেবিনের বাইরে টেনে আনিনি। তুমি নিজেই এসেছিলে। আর ঈশ্বর জানেন, মেলের ইঞ্জিনটা যখন দৈত্যের মতন আমার ব্রেকের ঠিক সামনে—একেবারে সামনে এসে পড়েছে, তখন তুমি লাইনের ওপর লাফিয়ে পড়লে। আমি ঠেলে দিইনি। বরং তোমায় ধরে ফেলবার চেষ্টাই আমি করেছিলুম। পারিনি। তোমার গলার হারটা শুধু আমার আঙুলে জড়িয়ে গিয়েছিল।

সন্তোষ চুপ করল। তাকাল লাইনের দিকে। একটা পৈশাচিক কালো মূর্তির মতন মেলের ইঞ্জিনটা সামনে এসে গেছে। ভীষণ শব্দ, যেন নরক থেকে একটা ঝড়ের দমকা ছিটকে এসে পড়েছে এখানে।

আচমকা কি যেন দেখে সন্তোষ চিৎকার করে উঠল, 'তোমায় আমি সন্দেহ করেছিলাম। বুঝলে মাধুরী। সে-সন্দেহ আজও আমার ঘোচেনি। তা বলে তোমায় আমি মারতে চাইনি। চেয়েছিলাম তুমি—তুমি—'

সন্তোষের গলা আর শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল না। বিকট শব্দে সব ডুবে যাচ্ছিল। মাধুরী লাফিয়ে পড়ার জন্যে পা-দানির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

সন্তোষ তার আঁচল ধরতে গেল।

গলায় যতটা জোর আছে, সমস্তটা নিঃশেষ করে সন্তোষ চিৎকার করে বলল, 'তোমার ফেলে যাওয়া স্যাণ্ডেল, রুমাল—সবই আমি রেল পুলিশের জিম্মায় দিয়েছি। এই হার—তাও ওরা পাবে। আর আমার চিঠিও।'

মাধুরী লাফিয়ে পড়েছিল। সন্তোষ মাধুরীকে দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু একটা উত্তপ্ত নিষ্ঠুর কালো কঠিন ছায়া তাকে হাওয়ার বেগে টানছিল।

গাড়ি চলে গেছে। আবার সব নিস্তব্ধ। পূর্ণিমার আলোয় লাইন, মাঠ, পলাশ বন ভিজে ভিজে গলে যাচ্ছে। ক'টা জোনাকি উড়ছে কোথায়, ঝিঁঝিঁ ডাকছে—রাতপাখিটা মাথার ওপর ঘুরে ঘুরে উড়ছে।

সন্তোষের মালগাড়ি লাইন পেয়েছে। ইঞ্জিন থেকে হুইস্‌ল বাজল। থেমে থেমে আবার বাজল।

মালগাড়ির ব্রেক থেকে আজ আর কেউ সবুজ বাতিটা দেখাচ্ছে না।

সেই মুখ

সমরেশ বসু

আবার সেই মুখ। সেই ঢুলু ঢুলু চোখ, যার আয়ত ক্ষেত্র অতিবিক্ত সাদা। মানুষের চোখের রঙ কি কখনো এত সাদা হয়? উন্নত নাসা, মোটা ভুরু, চওড়া কপালের ওপর রেশম-মোলায়েম কালো চুলে বাঁ-দিকে সিঁথি কাটা, এবং হেলিয়ে পিছন দিকে টেনে আঁচড়ানো। পাতলা গোঁফ ঠোঁটের দু-পাশ দিয়ে বেয়ে পড়েছে। বোঝা যায় ক্ষুর লাগানো হয় না, মাঝে মাঝে সযত্নে কাচি দিয়ে ছেঁটে দেওয়া হয়। চিবুকের মাঝখানে একটি রেখা।

সেই মুখ—যার শরীর আমি কখনো স্পষ্ট দেখতে পাই না, অথচ গলায় শার্টের হাইকলার এবং টাইয়ের নট স্পষ্ট দেখতে পাই। বাদবাকি মনে হয়, কালো রঙেব স্যুট পরে আছে। মনে হয়, তার কারণ, আমি তার গোটা শরীর কখনো দেখতে পাই না, এবং নিরালায় আমি সে-মুখ কখনো দেখিনি। যখনই দেখি, সব সময়ই লোকজনের মধ্যে। হঠাৎ সেই মুখ ভেসে ওঠে।

মুখের যে বর্ণনা দিয়েছি, তাতেই মুখটির সব কথা বলা হয় না। মুখের রঙ বেশ ফর্সা। এমনিতে রুগ্ন মনে হয় না, কিন্তু ফর্সা রঙের মধ্যে একটা অত্যধিক শুভ্রতা বর্তমান, যেন রক্তহীন। বয়স তিরিশ-বত্রিশ হতে পারে। যখনই আমি সেই মুখ দেখি, তখনই দেখি তার চোখ ঢুলু ঢুলু বা সেই রকমই একটা কিছু, এবং ঠোঁটের কোণে, নরম গোঁফের পাশে এমন একটি হাসি লেগে থাকে, সমস্ত অভিব্যক্তিটি যেন একটি বিশেষ অর্থপূর্ণ। মুখটি কখনোই সোজা থাকে না, ডাইনে বা বাঁয়ে একটু কাত করা। সেই হাসিভরা ঢুলু ঢুলু চোখ আর ঠোঁটের হাসি দেখলে মনে হয়, সে যেন আমাকে বিশেষ কিছু বলছে বা জিজ্ঞেস করছে।

কার মুখ, কে সে, আমি বুঝতে পারি না। মুখটি আমার মোটেই পরিচিত নয়। মুখটি আমি অদ্ভুত অদ্ভুত অবস্থায় দেখতে পাই। কবে থেকে যে এ মুখ দেখছি ঠিক মনে করতে পারি না, এবং ভাবলে আমার শিরদাঁড়ার কাছে কেমন শিরশির করে ওঠে। কারণ আমি স্পষ্টতঃই বুঝতে পারি, সেই মুখের বাস্তব বা প্রত্যক্ষ কোন অস্তিত্ব নেই। ইদানীং কালে প্রায়ই আড়ষ্ট আর শক্ত হয়ে থাকি

এই আশঙ্কায়, কখন হয়তো দেখব সেই মুখ একেবারে আমার সামনে, তার গরম নিশ্বাস পড়ছে আমার মুখে ; অথচ আমি তার কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। ভাবলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

সব থেকে আশ্চর্য, আর দশটা ভূতুড়ে ব্যাপারের মত সে-মুখ আমি কখনো অন্ধকারে নিরালায় মাঠে জঙ্গলে বা ফাঁকা জায়গায় দেখতে পাই না। যেমন এখন দেখতে পাচ্ছি। এখন আমি একটি ক্লাবে লাঞ্চ পার্টিতে রয়েছি। বেলা প্রায় দুটো, এখানে শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে সকলের হাতে হাতে পানীয়ের পাত্র। এখানে আজ বাংলা দেশের একজন মন্ত্রী মহাশয়কে লাঞ্চে আপ্যায়ন করা হচ্ছে, সেই উপলক্ষে আমি নিমন্ত্রিত। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একজন প্রবীণ কবির সঙ্গে কথা বলছিলাম। আশেপাশে অনেকেই দাঁড়িয়ে আছেন, নানারকম কথাবার্তা হচ্ছে। মন্ত্রী মহাশয়ের হাতে কমলালেবুর রসের পাত্র। তিনি একজন প্রবীণ ভাষাবিদের সঙ্গে কথা বলছেন, এবং সেখানে আরো কয়েকজন তাঁদের কথা শুনছেন। কয়েক হাত দূরেই সুদীর্ঘ ডাইনিং টেবিলের সামনে একজন বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, তাঁদের কাছে একজন চিত্রাভিনেত্রীও দাঁড়িয়ে আছেন। চিত্র-পরিচালকের পাশ থেকেই হঠাৎ সেই মুখ জেগে উঠল।

সেই মুখ, সেই ঢুলু ঢুলু চোখ। ঠোঁটের কোণে সেই হাসি। এবং ঘাড় বাঁ-দিকে কাত করা। কী এই হাসির অর্থ ? ঢুলু ঢুলু চোখে কি আসলে বিদ্রূপ মাখানো ? ঠোঁটের কোণের হাসিটাও এক সময় সেই রকম মনে হয়—যেন আমাকে বিদ্রূপ করছে, এবং বিদ্রূপ করে কিছু বলছে বা জিজ্ঞেস করছে। কখনো কখনো মনে হয়, সেই মুখ নীরবে আমাকে যেন জিজ্ঞেস করছে, 'কী, মনে পড়ে ? পড়ছে না ? চেষ্টা করে দেখ না !' অথবা ' 'আবার এলাম, বেশ পানভোজন চলছে দেখছি। ভালই আছেন মনে হচ্ছে, তাই না ?'

এখনো দেখছি সেই মুখ, সেই হাসি আর ঢুলু ঢুলু চোখের দৃষ্টি আমার চোখের দিকে। আমার হাতের গেলাস হাতেই থেকে গেল। মুখে তুলতে ভুলে গেলাম। সবাই যে-যাঁর কথা বলে যাচ্ছেন। আমার সামনে প্রবীণ কবি কথা বলে যাচ্ছেন ; কিন্তু কী বলছেন, আমি আর তা শুনছি না। সেই চিত্র-পরিচালক কথা বলে যাচ্ছেন, এবং তাঁকে যাঁরা ঘিরে রয়েছেন তাঁদেরই আড়াল থেকে চিত্র-পরিচালকের মুখের পাশে সেই মুখ আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। চিত্র-পরিচালক যে সে মুখ সম্পর্কে কিছুই জানেন না বা দেখতে পাচ্ছেন না, তা পরিষ্কার বোঝা যায় ; কারণ তিনি সেদিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না। কেউ-ই সে-মুখের দিকে তাকাচ্ছেন না। কারণ সে-মুখ আর কেউ দেখতে পাচ্ছেন না।

প্রবীণ কবি বলে উঠলেন, তুমি হঠাৎ ফিল্ম ডাইরেক্টারের প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়লে কেন ? উনি কি তোমার গল্প নিয়ে কথা বলছেন নাকি ?

আমি শুনছি, কিন্তু কোন জবাব দিতে পারছি না—কারণ আপাতত আমি যেন পার্টি-রুমে নেই। আমার আশেপাশে কেউ নেই। এবং এই শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে আমি ঘেমে উঠছি। তথাপি আমার এটুকু বোধ আছে, আমি চিৎকার করে উঠতে পারি না, বা হাতের গেলাসটা ওই মুখের দিকে ছুঁড়ে মারতে পারি না। তা অন্য কারোর মুখে লাগার যথেষ্ট সম্ভাবনা। আর চিৎকার করলে তা হবে বিশ্রী একটা নাটকীয় ব্যাপার, নানান রকম সন্দেহ জাগবে সকলের মনে, বিশেষত আমার হাতে এখন পানপাত্র। অনেকে দ্রব্যগুণের বিকার ভেবে হাসাহাসি করতে পারে। কিন্তু এই অলৌকিক ব্যাপারও আমি সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ড সহ্য করতে পারি না। আরো লক্ষ্য করেছি, আমি কিছুতেই সেই মুখের থেকে চোখ সরাতে পারি না। যেন সম্মোহিতের মত সেই মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

দিনের বেলা এত মহিলা পুরুষের সামনে তেমন একটা আতঙ্ক অনুভব করি না, কিন্তু আমার সমস্ত অনুভূতি জুড়ে যেন একটা অবসেশানের সৃষ্টি হয়, এবং আমি যেন একটা ভয়ঙ্কর কিছুর সঙ্কেত পাই। কে—এ কে ? কার মুখ ? কিসের হাসি ? কী বলতে চায় ?

হঠাৎ আমি সেই মুখের দিকে এগিয়ে গেলাম—যদি সে আমার সঙ্গে কথা বলে এই আশায়। আমি নিজেও তাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। কিন্তু কয়েক পা যেতেই সে মুখ অদৃশ্য হয়ে গেল। চিত্র-পরিচালক আমার দিকে ফিরে তাকালেন ; হেসে বললেন, আসুন। এত তন্ময় ভাব কেন ?

আমি খানিকটা সুপ্তোত্থিতের মত প্রশ্নসূচক শব্দ করলাম, অ্যাঁ।

সকলেই ঠোঁট টিপে হেসে উঠলেন। চিত্রাভিনেত্রী বললেন, কী, মাত্রা বেশি হয়েছে নাকি ?

আমি সচেতন হয়ে উঠলাম, এবং স্বাভাবিক ভাবে হাসলাম। আমি জানি সে মুখ আর আমি দেখতে পাব না। বললাম, আমাকে দেখে কি তাই মনে হচ্ছে ?

পরিচালক বললেন, না, না, আসলে আপনি অন্যমনস্ক হয়ে কিছু ভাবছিলেন বোধ হয়।

বললাম, ঠিক ধরেছেন।

আরো দু-চার কথার পরে আমি সেই প্রবীণ কবির দিকে এগিয়ে গেলাম। উনি তখন একজন কলকাতার মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমার দিকে রুষ্ট চোখে তাকালেন। জানি উনি আমাকে ভুল বুঝেছেন, হয়তো অভদ্র ভেবেছেন। কিন্তু আমি যে কত অসহায়, তা উনি জানেন না। আর ব্যাপারটা ওঁকে বলারও কোন মানে হয় না। বিশ্বাস করবেন না।

আজ পর্যন্ত আমি এ ঘটনা কাউকে বলিনি। কারণ আমি জানি, একথা কেউ বিশ্বাস করবে না। অন্য কারোর হলে আমিও বিশ্বাস করতাম না।

একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি, যখন আমি বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে একটু আমোদ-প্রমোদের মধ্যে থাকি, তখনই এই মুখ আমি দেখতে পাই। এবং তা দু-এক মিনিটের বেশি কখনো স্থায়ী হয় না। হয়তো কোন হোটেলের লাউঞ্জ বারে বসে আছি, বা কোন ওপন এয়ার বারে, কিংবা এমনি কোন সাধারণ রেস্তোরাঁয়, তখনই হয়তো দেখলাম, আমার কাছ থেকে একটু দূরেই, দুজন অপরিচিতের মাঝখানে সেই মুখ, আমার দিকে ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে হাসছে। দিনের বেলাও সে দেখা দেয়, রাত্রেও দেখা দেয়।

আমি অনেক ভেবে দেখেছি, আমার স্মৃতির গভীরে তন্নতন্ন করে হাতড়ে দেখেছি, সেই মুখের সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই। এমন কি পুরোন ফটোর অ্যালবাম খুলে দেখেছি।

সেই মুখ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় কী না। না, নতুন পুরোন, কোন অ্যালবামেই সেই মুখ আমি খুঁজে পাইনি। পাইনি, আর অসহায় একটা যন্ত্রণায় বারবার ভেবেছি, কে—কার মুখ ওটা ? কেন সে আমাকে এরকম করে দেখা দেয় ? অথবা, বাস্তবে আমি কোন মুখই দেখতে পাই না, এটা আসলে আমার অবচেতনের কোন উন্মাদনা। কিন্তু তাই বা কী করে সম্ভব ? অবচেতনের উন্মাদনার মধ্যে একটা কোন বাস্তব ঘটনার যোগাযোগ থাকতেই হবে। এবং একটি বাস্তব চরিত্রও, যার মুখ আমার চেনা থাকা উচিত। সেরকম কিছু হলে, আমি অচিরাৎ কোন মনোবিজ্ঞানীর কাছে ছুটে যেতাম, এবং উন্মাদনা ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের চেষ্টা করতাম। মাঝে কিছুদিনের জন্য দিল্লী যেতে হয়েছিল। সেখানেও একই ব্যাপার ঘটেছে। প্রেস ক্লাবে, হোটেলে, রেস্তোরাঁয়, সেই মুখ দেখা দিয়েছে, এবং সব সময়েই আমার সঙ্গে বন্ধু-বান্ধবীরা ছিল। আমি বুঝতে পারি না, কী করা উচিত। সেই মুখ নিয়ে যে আমি সব সময় ভাবছি, তা না। কিন্তু ভাবনাটা আমাকে কখনো ছেড়ে যায় না, সব সময়েই ছুঁয়ে থাকে। যেন জানিয়ে দেয়, সে আছে, এবং সময় হলেই সে দেখা দেয়।

আমি অতঃপর মনে মনে একটি সিদ্ধান্ত নিলাম। দিনে বা রাত্রে, সমস্ত রকম পার্টি আড্ডা ক্লাব হোটেল রেস্তোরাঁ—বন্ধু-বান্ধবী কিছুদিনের জন্য একেবারে ত্যাগ করলাম। তার ফলও পেলাম। সেই মুখ আর আমি দেখতে পাই না। আশ্চর্য ! মনে মনে বললাম, মুখটি আমার নৈতিক চরিত্র রক্ষা করছে নাকি ? যখনই একলা হয়ে গেলাম, তখনই সে বেপাত্তা। যেন সেই মুখ আমাকে প্রমোদ আসরে যেতে দিতে চায় না। কিন্তু সে তো আমাকে ভয় দেখায় না। শুধু তাকিয়ে হাসে।

আমার এই একলা অবস্থাতেই, আমার এক বান্ধবী একদিন টেলিফোন করল। ঊর্মিলা ওর নাম। সরকারী কর্মচারী, চাকরিটা ভালই করে। বয়স তিরিশ অতিক্রান্ত। এখনো বিয়ে করেনি, করবে না এরকমই আমাদের বলে। থাকেও একলা। স্বাস্থ্য ভাল, যৌবন এখনো অক্ষুণ্ণ, এবং মেজাজটিও প্রসন্ন, বেশ রসিকা। প্রেম নিয়ে কোন মাথা ব্যথা কখনো দেখিনি, চরিত্রের দিক থেকে স্বৈরিণী বলা যাবে না, সেরকম আচার আচরণ কখনো দেখিনি। কিন্তু আমার প্রতি ওর একটি বিশেষ প্রীতি আছে। যাকে প্রেম কখনোই বলা যাবে না, অথচ সম্পর্কটা পাতিয়েছি অনেকখানিই নিরাবরণ।

ঊর্মিলা টেলিফোনে বলল, কলকাতায় ওর ভাল লাগছে না। কাছে পিঠে কয়েকদিনের জন্য, কোথাও ঘুরে আসতে চায়, অবিশ্যিই যদি আমি সঙ্গে থাকি। ভাবলাম, মন্দ কী। সেই মুখের জন্য, এমনিতেই তো নিজেকে ঘরের মধ্যে নির্বাসিত করে রেখেছি। তার চেয়ে, কয়েকদিন একটু নিরিবিলিতে কোথাও ঘুরে আসি। দরকার নেই আমার পার্টি ক্লাব হোটেল রেস্তোরাঁয়। আমি

উর্মিলাকে আমার সম্মতি জানালাম। উর্মিলা নেতারহাট যাবার প্রস্তাব করল, এবং ও নিজেই রাঁচিতে ট্রাঙ্ক-কলে যোগাযোগ করে, পালামৌ বাংলোর একটি ঘর বুক করল।

নেতারহাটে ট্যুরিস্ট লজ আছে। কিন্তু পালামৌ বাংলোর কোন তুলনা হয় না। বৃটিশ আমলের তৈরি এই বাংলো অপূর্ব। একেবারে যেন আকাশের গায়ে ঠেকানো। সামনে তাকালে, যেন সমুদ্রের মত ঢেউ তোলা পাহাড়ের পর পাহাড়। নিচে, অরণ্যের পরেই, বালুচরের মাঝখান দিয়ে, সর্পিল কোয়েল নদী চকচক করছে।

বেলা দশটার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম। ডবল বেডের রুম, অ্যাটাচড বাথ, ব্যবস্থা চমৎকার। আমি উর্মিলাকে বললাম, 'আমরা কি এক ঘরেই থাকব ?'

উর্মিলা বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু আলাদা খাটে।'

'একটু কি নীতিবিগর্হিত কাজ হচ্ছে না ?'

'হত, যদি আমি অসম্মত হতাম।'

বলে ও চৌকিদারকে ডেকে, চা দিতে বলে, খাটের ওপর শুয়ে পড়ল।

জানি, নৈতিকতার প্রশ্ন তুলে কোন লাভ নেই, তুলতে হলে অনেক আগেই তোলা উচিত ছিল। আমি বাথরুমের দরজা খুলে ভিতরে গিয়ে দেখলাম, পিছনের দরজাটা খোলা। পিছনে ঝুপসি ঝাড়ের মধ্যে, জমি ঢালুতে নেমে গিয়েছে। আমি পিছনের দরজাটা বন্ধ করবার উদ্যোগ করতেই, ঝোপের ভিতর থেকে সেই মুখ ভেসে উঠল। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি। শরীরের বাকি অংশ ঝোপের আড়ালে। আমি সম্মোহিতের মত, সেই মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, এবং এই প্রথম একটি অদ্ভুত পরিবর্তন দেখলাম। ঢুলুঢুলু চোখ আস্তে আস্তে পুরোটা মেলে, আমার চোখের দিকে স্থির নিবদ্ধ হল, আর ঠোঁটের কোণের হাসিটা গেল মিলিয়ে। প্রায় মিনিট খানেক সে আমার দিকে স্থির অপলক চোখে তাকিয়ে রইল, তারপরে মিলিয়ে গেল। আমার গায়ের মধ্যে একটা শিহরণ খেলে গেল। আমি দু-হাত দিয়ে সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

শব্দটা নিশ্চয়ই খুব জোরে হয়েছিল, উর্মিলা ঘরের ভিতর থেকে বলে উঠল, 'উঃ, এত জোরে শব্দ করছ কেন ? চমকে উঠেছি।'

যে কারণে বাথরুমে গিয়েছিলাম, তা আর হল না। ঘরে ফিরে এলাম ফিরে এসে ড্রেসিং টেবিলে সামনের আয়নার দিকে তাকালাম। মুখের পরিবর্তনটা আমাকে যেন কেমন চমকে দিয়েছে। আর একটা ভয়ের শিরশিরানি এনে দিয়েছে। এ মুখ পালামৌ বাংলোর ঝোপে কেন এল ? আর এই প্রথম এই মুখ আমাকে একলা অবস্থায় দেখা দিল। কেন ? এর তাৎপর্য কী ?

উর্মিলা খাট থেকে বলল, 'কী হল, নিজের মুখ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলে নাকি ?'

আমি স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বললাম, 'না, দেখছি নিজের মুখের মধ্যে আর কোন মুখ দেখা যায় কিনা।'

উর্মিলা বলল, 'তোমার তো অনেক মুখ, কোন্‌টা দেখতে চাইছ ?'

বললাম, 'বুঝতে পারছি না।'

উর্মিলা বলল, 'আমার কাছে এসো, একটা মুখ দেখিয়ে দিচ্ছি।'

মনে মনে ভাবলাম, সেই ভাল, উর্মিলার কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকি। আমি উর্মিলার কাছে গেলাম। ও আমার হাত ধরে ওর পাশে বসিয়ে দিল ; বলল, 'আমার দিকে তাকাও, তাহলেই হবে।' বলে টেনে ওর পাশে শুইয়ে দিল। আমি চোখ বুজে শুয়ে রইলাম। ও আমার চুলে বিলি কেটে দিতে লাগল।

একটু পরেই দরজায় খটখট শব্দ হল, চৌকিদারের গলা শোনা গেল : 'চা লে আয়া।'

আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললাম, 'লে আও।'

চৌকিদার ঘরে ঢুকে দরজার বাঁ-দিকের টেবিলে চায়ের ট্রে বসিয়ে দিল। জিজ্ঞেস করল, 'দুপহর মে খানা কেয়া বানায়েগা ?'

উর্মিলা বলল, 'চাওল ঔর দাল, ভাজি, চিকেন কারি।'

চৌকিদার 'বহুত আচ্ছা' বলে চলে গেল। আমরা টেবিলের সামনে গিয়ে, চেয়ারে বসে চা-পান

করলাম।

ঊর্মিলা বাথরুমে স্নান করতে ঢুকল। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে সামনের বারান্দায় গেলাম।

সামনে মোরাম বিছানো ঘেরা উঠোন। আসলে বাংলোটি একটি পাহাড় শীর্ষে। উঠোনের নিচেই জঙ্গলময় খাদ নেমে গিয়েছে।

আমি উঠোনে নামলাম। চওড়া বাঁধানো হাঁটু সমান প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম, অপূর্ব দৃশ্য। সিগারেট শেষ করে, ডান দিকে এগিয়ে গেলাম। নানারকম ফুলের গাছ, সুন্দর করে সাজানো।

পিছনে কয়েকটা ছোট ছোট ঘর। বোধ হয় চৌকিদার সপরিবারে থাকে। দেখলাম, একজন লোক পিছন ফিরে বসে, কিছু করছে। তার সারা গায়ে আলখাল্লার মত জামা। সামনেই একটি গাছে গুচ্ছ গুচ্ছ লাল ফুল ফুটে আছে। আমি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ ফুল কা নাম কেয়া হ্যায় ?'

লোকটি কোন জবাব দিল না।

আমি আবার বললাম, 'এ ভাই, এ ফুল কা কেয়া নাম হ্যায় ?'

লোকটি আমার দিকে ফিরে তাকাল, আর আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, দেখলাম সেই মুখ। প্রায় তিরিশ সেকেণ্ড সে স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। পুরো খোলা চোখ, ঠোঁটে হাসি নেই। তারপরেই দেখি সেখানে কেউ নেই, শুধু ফুল গাছের ছায়া পড়ে আছে।

আমার শরীরটা বারে বারে শিউরে উঠল, আমি তাড়াতাড়ি বারান্দার দিকে ফিরে গেলাম। দীর্ঘ বারান্দা দিয়ে চৌকিদার হেঁটে যাচ্ছিল। আমি তাকে পিছন থেকে ডাকলাম। 'চৌকিদার, শুনো।'

চৌকিদার আমার দিকে ফিরে তাকাল। আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠতে যাচ্ছিলাম, চৌকিদারের পোশাকে, সেই মুখ! এবং কয়েক সেকেণ্ড পরেই বারান্দা শূন্য। টবের ফুলগাছের পাতা বাতাসে কাঁপছে।

আমি প্রায় ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। ঊর্মিলা সেই মুহূর্তেই বাথরুমের দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। সায়া আর ব্রা ওর পরনে। আমাকে দেখে চমকে উঠল। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, তোমার চোখ মুখ এরকম দেখাচ্ছে কেন ? কেউ তাড়া করেছে নাকি ?'

'তার চেয়েও মারাত্মক।' বলতে বলতে আমি ঊর্মিলার একেবারে গায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওর হাত ধরে খাটের কাছে এসে বসলাম। বললাম, 'তোমাকে একটা ঘটনা বলব, তোমাকে শুনতে হবে। এ কথা আমি কখনো কাউকে বলিনি। তোমাকেই প্রথম বলছি। তুমি শাড়ি পরে পোরো, আগে আমার কথা শোন।'

ঊর্মিলা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। আমার হাত ধরে ওর পাশে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'বল, আমি শুনছি।'

আমি সেই মুখের কথা আদ্যোপান্ত ঊর্মিলাকে বললাম। ঊর্মিলা মনোযোগ দিয়ে শুনল। সব শুনে আমাকে বলল, 'মুখের বর্ণনাটা আবার বল তো ?'

আমি সেই মুখের নিখুঁত বর্ণনা দিলাম। ঊর্মিলা খাট থেকে উঠে, ড্রেসিং টেবিলের পাশে, একটা টেবিলের ওপরে রাখা ওর সুটকেশ খুলল। খুলে তার ভিতর থেকে একটা খাম বের করল, খামের ভিতর থেকে একটা ফটো। আমার সামনে সেই ফটো দেখিয়ে বলল, দেখ তো, 'এই মুখ কী ?'

আমি চমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম, অবিকল সেই মুখ। স্যুট ও বুটেড সম্পূর্ণ দেহ, সেই মুখেরই ফটো। ফটোতে ঢুলুঢুলু চোখ এবং সেই ঠোঁটের কোণে হাসি। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই সেই। এ কে ?'

ঊর্মিলা একটু গম্ভীর ও অন্যমনস্ক হয়ে বলল, 'এর নাম অরিন্দম সেন। তোমাকে কখনো বলি নি। এর সঙ্গে আমার পরিচয় স্কুলে পড়বার সময়। বড় হয়ে ও ইঞ্জিনীয়ার হয়েছিল, ভাল চাকরিও করত। আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আমি করি নি। করি নি কারণ, আমার কখনো সে ইচ্ছা হয় নি। কিন্তু আমাকে নিয়ে ও অবসেশড হয়ে গেছল, বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তার আগে, এই ফটোটা আমাকে ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। লিখেছিল, অন্তত, এটা যেন আমি আমার কাছে রাখি, তাতে ও শান্তি পাবে।'

আমি ফটোটার দিকে আবার দেখলাম, আর সেই জীবন্ত মুখ আমার মনে পড়ে গেল। উর্মিলা ফটোটা খামে ভরে, সুটকেশ বন্ধ করল। আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে উর্মিলার কাছে গিয়ে বললাম, 'উর্মিলা, আমি আর এখানে থাকব না। এ অবস্থায় থাকা যায় না, চলো ফিরে যাই।'

উর্মিলা কিছু বলল না, ফিরেও তাকাল না। বোধ হয় অরিন্দমের স্মৃতিতে অন্যমনস্ক। আমি আবার ডাকলাম, 'উর্মিলা!'

উর্মিলা ফিরে তাকাল, আর আমার মস্তিষ্কে যেন সোঁ করে একটা হাউই উড়ে এসে লাগল। আমি দেখলাম, উর্মিলা না। সেই মুখ! এবং পরমুহূর্তেই সব শূন্য। পালামৌ বাংলার ঘরে আমি একলা।

আমার চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এল, শরীর টলে উঠল, তারপরে কি হল, আমি কিছুই জানি না।
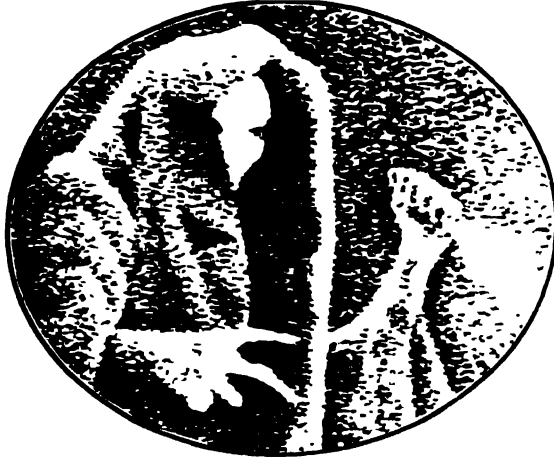
ফুলশয্যা

শিশির লাহিড়ী

সুধা জানে, আমি মরে ভূত হয়ে আমাব ঘরের ঘুলঘুলিতে বাসা বেঁধেছি। সে আজকের কথা নয়, আজ থেকে ছ'মাস আগের ব্যাপার। অফিস থেকে আসবার সময় ভিড়ে ভর্তি বাঘ মার্কা বাসে ছুটে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম। পিছনের চাকাটা আমার মাথাটাকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল। পকেটে আইডেনটিটি কার্ড না থাকলে, লোকে বেওয়ারিশ লাশ বলে মর্গে চালান দিত। কিন্তু তা হয়নি। রাত বারোটার সময় যখন থানার পুলিশ এসে সুধাকে খবর দিল, তখন সুধা কাটা কলাগাছের মত লুটিয়ে পড়ল।

আমি ঘুলঘুলি থেকে সুধাকে লক্ষ্য করছিলাম আর তাজ্জব বনে যাচ্ছিলাম। আমার স্ত্রী শ্রীমতী সুধারানী দেবী যে আমাকে এতখানি ভালবাসেন, তা কে জানত। তাহলে কোন শালা মঞ্জু অধিকারীর খপ্পরে পড়ে, ছুটে বাসে উঠছে যায়।

সেদিন সকালেও অফিস বের হবার সময় সুধা প্রিয় সম্ভাষণ করে দারুণ ঝাঁঝাল গলায় তড়পে উঠেছিল, আজ সন্ধের মধ্যে না ফিরলে, তোমার একদিন কি আমার একদিন। ছুটি হয় সেই পাঁচটায়, আর বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে নটা বাজে। জানি না সেই হাড়-হাভাতে টাইপিস্ট ছুঁড়িটাই তোমার নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে কিনা। আজ এ সিনেমা, কাল ও রেস্টুরেন্ট। বাড়িতে বিয়ে করা বউ একলা এঁদো ঘরে খাবি খাচ্ছে আর উনি কিনা একটা উটমুখো মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। লজ্জা করে না, কি বেহায়া মানুষ বাবা!

সুধাকে দোষ দেব না। সুধা মিথ্যে বলেনি। তবে বলার ডিগ্রিটার চাপান অনেক বেশি হয়ে গিয়েছে। মঞ্জুর চেহারায় একটা আলগা চটক আছে। ছুটির সময় মঞ্জু যখন তার রঙকরা চোখের পালক নাচিয়ে, গালে টোল ফেলে, ঠোঁটে হাসির ঝিলিক তুলে সুরেলা গলায় মিষ্টি করে ডেকে উঠত, 'দেবুদা এক মিনিট!' তখন আমার মনের রাশ আলগা হয়ে যেত। সেই এক মিনিটটা যে কোথা দিয়ে দু-তিন ঘন্টা হয়ে যেত, তা ভাবনার বিষয়। অবশ্য তার জন্য আমার কিছু রেস্ত খসত। কিন্তু

তার জন্য পরোয়া কে করে। হু কেয়ারস !

সুধা আঁচ করেছে ঠিকই। এটাও ধরে ফেলল। একদিন মাইনে তুলতে গিয়েছি, যামিনীদা আমাকে চমকে দিলেন। বললেন, দেবু মিত্তির তোমার মাইনে তো তুমি তুলতে পারবে না। আমি খেপে গিয়ে বললাম, আমার মাইনে আমি তুলব না, আপনি তুলবেন ? জেনে রাখবেন, আমি আসলি কায়েত বাচ্চা, শুধু ফোঁস করি না, দরকার হলে কামড়াই। যামিনীদা বললেন, তাহলে তুমি ঘরে গিয়ে তোমার মিসেসকে কামড়াও হে। তিনি একটা আর্জি পেশ করেছেন। আমাদের সদাশয় ম্যানেজিং ডিরেক্টর সেটি পড়ে তোমার সংসারে সুখ, শান্তি, প্রেম বজায় রাখতে আমাকে হুকুম দিয়েছেন যে, তোমার মাইনে তুলতে গেলে শ্রীমতী সুধারানী মিত্তিরের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

সেদিন রাত্রে বাড়িতে তুলকালাম হয়ে গেল। ফাটাফাটিটা শেষ অবধি হাতাহাতিতে গড়াল না। দুজনেই কিছু না খেয়ে দু'দিকের পাশবালিশ আঁকড়ে শুয়ে পড়লাম। দুজনের গায়ের গন্ধ না শুঁকলে যে ঘুম হয় না, সেকথা সেদিন আর কারও মনে ছিল না।

অফিসে ইজ্জত বলে একটা কথা আছে, সেটা চলে গেল। সেই সঙ্গে মঞ্জু। মঞ্জু যদি কাছে আসত, বলত, দেবুদা এর জন্যে আমিই দায়ী, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, তাহলে আমি হয়তো বাঁচতাম। কিন্তু সেদিনের সেই দুর্ঘটনার পর থেকে মঞ্জু আমাকে একেবারে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে হাল-আমলের ছোকরা আর্টিস্ট নিরুপম জোয়ারদারের কাঁধে ঝুলে পড়ল। আমার সেকশনের ছেলেছোকরারা আমাকে দেখে মুখ টিপে টিপে হাসত। শালা অজয় দাশগুপ্ত তো একদিন বলেই বসল, আর টাইপ করবে মাল ! না, কি-বোর্ডে আর আঙুল রাখতে দিচ্ছে না অধিকারী।

মনটা বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। ঘরে সুধার সঙ্গে কিচাইন, বাইরে শান্তি নেই। তার ওপর কাজের চাপে দম নিকলে যাবার যোগাড়। একদিন ছুটির পর সন্ধের মুখে মঞ্জু আর নিরুপমকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাসে উঠতে দেখে খেপে গেলাম। মনে হল, ওদের দুজনের একটাকে আজ নিকেশ করে দেব। কিন্তু কে জানত, যমরাজ তাঁর যমদূতকে আমার পেছনেই লাগিয়ে রেখেছেন। আমি লাফিয়ে বাসে উঠতে গিয়ে উঠতে পারলাম না। পেছনের চাকা আমার মাথাটা শ্লেটের মত থেবড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি মরে ভূত হয়ে গেলাম।

তিনদিন বাদে আমাদের অফিসের যামিনীদাকে দেখে সুধা ফুঁপিয়ে উঠল, যামিনীবাবু ওর এ মাসের মাইনে ? পেনশন, গ্রাচুইটি ?

যামিনীদা বললেন, হবে, হবে। আপনাকে নমিনি করা আছে, ভাবনা কি। তবে বুঝতেই পারছেন, একটু দেরি লাগবে।

সুধা চোখ মুছতে মুছতে বলল, তাহলে আমার কী করে চলবে যামিনীবাবু ?

সে কথাই ভাবছি। যামিনীদা ভাবনার মুখ করে বললেন, আচ্ছা, আপনি কি গ্রাজুয়েট ? গ্রাজুয়েট হলে আপনার একটা হিল্লে হয়ে যাবে। কমপ্যাশনেট গ্রাউন্ডে আপনি একটা চাকরি পেয়ে যাবেন অফিসে।

সুধা ঠোঁট ওলটাল। গ্রাজুয়েট হলে কি ওই বাঁদরের গলায় মালা দিই যামিনীবাবু ! আমার বাবা ওটা ভক্কি মেরেছিলেন।

আজ পাঁচ বছর বাদে এহেন সত্য কথা শুনে আমি পরম পুলকিত হলাম। পেট বগবগিয়ে হাসি উঠল। হাসিটা যে ফোয়ারা হয়ে যাবে কে জানত। যামিনীদা চমকে উঠে বললেন, কে হাসে !

সুধা ঘাড় কাত করে শুনছিল। চোখ ঘুরিয়ে বলল, কে আবার হাসবে, ওই আপনাদের দেবু মিত্তির। অপঘাত মৃত্যু তো ! বেঁচে থাকতে আমার হাড়মাস জ্বালিয়ে শান্তি হয়নি। এখন মরে জ্বালাতে এসেছে।

যামিনীদার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে এল। মুখের সামনে তুড়ি দিয়ে যামিনীদা বললেন, এবার তাহলে আসি।

সুধা বলল, আসুন। কিন্তু আমার পাওনা-গণ্ডা তাড়াতাড়ি দিতে ভুলবেন না। তাহলে কিন্তু ভূতটাকে আপনার বাসায় পাঠিয়ে দেব। ওই হাসি শুনলেই চিনতে পারবেন।

আমার কেমন মজা লাগছিল। আমি আবার খোনা গলায় হেসে উঠলাম। যামিনীদা তড়াক করে লাফ মেরে, দরজার বাইরে গিয়ে বুকে ক্রশ এঁকে, মনে মনে বললেন, রাম ! রাম !

বাছুরের শিঙ উঠলে গাছে ঘষে রক্তারক্তি করে। আমার নতুন শক্তি দেখে আমি নিজেই তাজ্জব। এতদিন শালা কেঁচো হয়ে ছিলাম। ঘরে সুধার ভয়, বাইরে পাঁচজনের। এখন কার পরোয়া! আমি ঘুলঘুলি থেকে লাফ মারলাম। কেউ আমাকে দেখতে পেল না। ঝড়ের বেগে ছুটে ঘরের জানলা-দরজাগুলো পটাপট দুলিয়ে দিলাম। ইচ্ছে হল বাপের আমলের আশিমনি ওই খাটটাকে একটু নাড়াই। ইচ্ছেটাকে কাজে লাগাতেই খাটটা চারপেয়ে দাঁতাল হাতির মত ঘুরে দেওয়াল-আলমারিতে গিয়ে ধাক্কা খেল। ঝনঝন করে কিছু কাচের বাসন মেঝেয় পড়ে ভেঙে চৌচির।

সুধা ছুটে এসে ঘরে ঢুকল। কেঁদে ফোলা ফোলা চোখ-মুখ। মাথায় রুখু এলোচুল। ক'দিন তেল মাখেনি সুধা, গায়ে খড়ি উঠেছে। পরনের কোরা কাপড়টা খসখসে, বারেবারে খুলে পড়ে যাচ্ছিল। রাগে সুধার চোখ জ্বলছিল। আঁচলের দিকটা গাছকোমর করে বেঁধে নিয়ে সুধা চোখমুখ ঘুরিয়ে বলল, দেখো নিজের জ্বালায় মরে যাচ্ছি, এখন ন্যাকামি ভাল লাগে না। সারাজীবন তো অপাট করে গেলে, এখনও তাই। লজ্জা করে না! নাও, যেখানকার জিনিস, যেমন ছিল, ঠিক তেমনি করে দাও। ভাঙা কাচ ঝাঁট দিয়ে কুড়িয়ে ফেল। উনিশ-বিশ হলে তোমার বাঁদরামি আমি ঘুচিয়ে দেব।

সুধার চোখমুখ দেখে আমার ভয় হল। বিশ্বাস নেই, কালই হয়ত রাজমিস্ত্রী ডেকে ঘরের ঘুলঘুলি গেঁথে দেবে সুধা। বেশি খেপে গেলে কলিঙ্গ হরিসংকীর্তন সমিতির লোকজন ডেকে এনে, এমন অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন শুরু করে দেবে যে, খোল-কর্তালের আওয়াজে আমাকে দেশছাড়া হতে হবে। কিম্বা ঘুঁটের জোয়াল দিয়ে ধোঁয়া দিলে আমি কি আর থাকতে পারব? সুতরাং লক্ষ্মী ছেলের মত ঘরদোর সাফ-সুরুত করে, যেমন খাট ছিল তেমনি সাজিয়ে আবার ঘুলঘুলিতে উঠে পড়লাম। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছিল। বেঁচে থাকতে সুধার সঙ্গে কোনদিন এঁটে উঠিনি, মরেও পারলাম না। কোন স্বামীই বা কোন স্ত্রীর কাছে জিততে পেরেছে। দুনিয়ায় আর যার কাছেই জারিজুরি খাটুক, বউয়ের কাছে কিছু খাটে না। সেখানে আমরা সবাই ঢোঁড়া সাপ।

দিনের বেলা আমার কিছু করবার তাগদ থাকত না। শরীরটা যেন ন্যাতা হয়ে আসত, গা টিসটিস। রোদের আলো ফুটলেই ঘুমিয়ে পড়তাম। ঘুম ভাঙত সন্ধেবেলা। সন্ধের পর রাত যেই একটু ঘন হত, তখন ফুর্তি দেখে কে! তখন গায়ে মত্ত হাতির বল, কি যে করব ভেবে পাই না। সাধে কি আর লোকে আমাদের ভূত বলে। এক একদিন সুধা যখন খাটে শুয়ে শুয়ে গায়ের জামা খুলে ঘামাচি মারত, তখন মনে হত লাফ মেরে সুধার পাশে গিয়ে শুই। কিন্তু সুধার যে মেজাজ, ভয়ে এগোতে সাহস হত না।

অবশ্য মেজাজ হবার কথা। আমি তো পার্থিব জীবন থেকে অকালে বিদায় নিয়েছি। আহা বেচারা, সংসারের সব ভাবনা, দায়িত্ব, একলা ভাবতে হচ্ছে। বেওয়ারিশ বিধবা দেখে, সুধার সম্পর্কের মাসি-পিসি এসে এ বাড়িতে থানা গাড়বার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সুধার কাছে খাপ খুলতে পারেনি। তিন দিনেই তাদের পত্রপাঠ বিদায় দিয়ে বলেছিল, আমার ভাবনা আমি ভাবব। গোদের ওপর বিষফোড়ার মত তোমরা যদি উড়ে এসে জুড়ে বস, তাহলে তো আমাকে গলায় দড়ি দিতে হয়।

কথাটা শুনে আমার ভালই লেগেছিল। সুধা যদি গলায় দড়ি দেয়, তাহলে আমাকেও আর একলা থাকতে হয় না। এ ঘরে চুটিয়ে দুজনে রাজ্যপাট করতে পারি। পরে ভেবে দেখলাম ওটা কথার কথা। কে আর ইচ্ছে করে সাধের জীবন ছেড়ে, ভূতের সঙ্গে ঘর করতে আসে। সুধাই যদি মরে যেত, আর আমি বেঁচে থাকতাম, তাহলে আমি কি সুধার শোকে বৈরাগী হয়ে ঘুরে বেড়াতাম, না মঞ্জুর মত কাউকে জুটিয়ে এনে দেদার ফুর্তি লোটার চেষ্টা করতাম। শালা বাঁচা মানুষের লজিকই আলাদা। ভূতের ট্র্যাজেডি কে আর বুঝতে চায়!

একদিন দেখি, সুধা আনমনা হয়ে জানলা খুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। বাইরে ঘন মেঘ করছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। আমায় ভয় হচ্ছিল। তেমন তোড়ে বৃষ্টি এলে, এই ঘুলঘুলিতে ভিজে একশা হয়ে যাব। আমার ছেলেবেলায় সর্দি-কাশির ধাত ছিল। ঠাণ্ডা লাগলে প্রায়ই জ্বরজারি হত। এখন যদি আবার জ্বর হয়, তাহলে কে দেখবে? মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার, কি একটু ভাল কথা

বলার লোক নেই। সুধাকে বললে, সুধা শুনবে কি!

আমি নিজের ভাবনা ভাবছি। ঠিক সেই সময় অস্পষ্ট একটা ফোঁপানির শব্দ কানে এসে বাজল। আমি চমকে তাকিয়ে দেখি, সুধা আমার ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলছে, তুমি কি বেআক্কেলে মানুষ, মরবার আর সময় পেলে না। দেখ, বাইরে কেমন অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে। এমন দিনে তোমাকে পাশবালিশ না করে কোনদিন শুয়েছি! বল, এই বয়েসে একলা শুতে কার ভাল লাগে। আমার ভয় করে না বুঝি। সেরকম যদি একটা বিকট বাজ পড়ে, তাহলে ভয় পেয়ে কাকে জড়িয়ে ধরব?

সুধার কথা শুনে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল। আহা, বেচারী! এই তো সবে তিরিশ বছর বয়স। আমার পূজনীয় শ্বশুরমশাই ভক্তি মেরে থাকলে বত্রিশ। সামনে খাঁ খাঁ দুপুরের মত যৌবন খাঁ খাঁ করছে, এতবড় জীবন পড়ে রয়েছে, আর আমি কিনা স্বার্থপরের মত একলা চলে এলাম। আহা, সুধা কি করবে। সুধার দুঃখে আমার চোখে জল এসে যাচ্ছিল। আমি মনে মনে বললাম, সুধা ভয় নেই, তোমাকে একা থাকতে হবে না। আমি তোমার পাশে এসে শুচ্ছি। তুমি যত খুশি আমাকে পাশবালিশ করে জড়িও, আমি কিচ্ছু বলব না। সারারাত ধরে তুমি মনের সুখে ঘুমিও, আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখব।

সুধা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। এলো গা। পরনের শাড়িটা আলগা করে বুকের ওপর ফেলা। আমার চোখ চকচক করে উঠল। দি ট্রাজেডি অব বিয়িং এ ভূত যে কি, আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম। তবু আমার মন মানল না। আমি মশারির ছোট ছোট ফুটোর মধ্য দিয়ে গলে সুধার পাশে গিয়ে গড়িয়ে পড়লাম।

সুধা চোখ বুজে শুয়ে ছিল। শীতল হাওয়ার স্পর্শ পেয়ে বলে উঠল, আঃ! বাঁচলাম। শরীর জুড়োল। আনন্দে আমার হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তেই আমি আমার উপস্থিতি জানাতে চাই না। আর একটু সময় যাক, সুধার মন যখন একেবারে গলে আসবে, তখন আমি বলব, অহম অয়ম ভোঃ—আমি এসেছি।

সুধা ধীরে ধীরে পাশ ফিরল। পাশবালিশ খুঁজছিল। আমি সুড়ুৎ করে বালিশের মত সুধার বাঁ পায়ে ঠেক দিলাম। সুধার বোজা চোখ খুলে গেল। আশ্চর্য হয়ে তাকাচ্ছে সুধা। বিছানায় পা পড়েনি, অথচ যেন বালিশে পা আছে এমন ভাব। সুধা ধড়মড় করে উঠে বসল। তারপর খেপে গিয়ে বলল, ছিঃ! ছিঃ! ছি! মরে গিয়েও শান্তি হয়নি। এখনো এইসব। লজ্জা করে না, বেহায়া কোথাকার। যাও না, তোমার সেই উটমুখো ছুঁড়িটার কাছে। সে তোমাকে কোলে নিয়ে স্বর্গে নাচাবে।

সুধার ঝাঁজ দেখে আমি বিন্দুপ্রমাণ হয়ে গেলাম। লোকের ভাল করতে নেই। আরে, যার জন্যে করি চুরি, সেই বলে চোর! সুধা রাগের গলায় বলল, তুমি ভালমানুষের ছেলে নও। এবার তোমার বিহিত করতে হয়। ঠিক আছে, এবার যেদিন রেগে গিয়ে গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে আসব, সেদিন ভূতগিরি বেরিয়ে যাবে।

গয়ায় পিণ্ডি! দু'চোখে আমার জল এসে গেল। আমার এ ভূতজন্ম যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে আমি কী নিয়ে থাকব।

ক'দিন আমি বিমনা হয়ে থাকলাম। ভূত বলে কি আমার মান অভিমান নেই। আহারে রুচি নেই, মুখটাও কেমন যেন বিস্বাদ। কিছুই ভাল লাগে না। মনে হয়, ধড়া-চুড়ো পরে সন্ন্যেসী হয়ে যাই। এ সংসারে যার স্ত্রী বিমুখ তার বেঁচে থাকায় লাভ কি। অবশ্য সুধা যদি আমার স্ত্রী হয়। মরে গেলে কি স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক থাকে, না ডিভোর্সের মত কাটান ছাটান হয়ে যায়।

তিন-চারদিন এভাবে থাকতে থাকতে, একদিন আমি খেপে গেলাম যেন। আমার হাত পা নিশপিশ করছিল। হঠাৎ মনে হল, কার জন্যে আমার এই অবস্থা। আমি বাসের তলায় পড়ে চ্যাপ্টা মাথা আর ভূতগ্রস্ত শরীর নিয়ে সুধার গালাগাল খেয়ে মরছি, আর আমার সেই অফিসফেরতা সাধের মঞ্জু তার চোখে পালিশ মেখে, গালে টোল ফেলে, হাসিতে গড়িয়ে পড়ে নিরুপমের সঙ্গে লদকালদকি করে বেড়াচ্ছে—এটা সহ্য করা যায় না। এবারে ওদের একটু টাইট দেওয়া দরকার। আমি মরব.

আর ও বেঁচেবর্তে সুখে-স্বচ্ছন্দে হেসে খেলে বেড়াবে, এ হয় না, হয় না।

শরীরটাকে ঠিক করে নিতে আমি ঘুলঘুলির ভেতর কষে ডন-বৈঠকি লাগালাম। হাতের গুলি ফোলালাম, পায়ের ডিম। ব্যায়াম করতে করতে যখন মনে হল, শরীরটা বেশ জুতের হয়েছে, তখন ঘুলঘুলি ছেড়ে আকাশে হাত-পা মেলে দিলাম। একটা রাতচরা চামচিকে আমাকে দেখে ভয়ে চোঁ-ও করে একটা আলো জ্বালা ঘরে ঢুকে পড়ল। দূরে কোথাও একটা প্যাঁচা ডাকছিল।

কলকাতায় যে প্যাঁচা থাকতে পারে আমার ধারণা ছিল না। পরে মনে হল ফ্ল্যাটবাড়ির ছোট ছোট কোটরে থাকতে থাকতে এ শহরের তিনভাগ মানুষ প্যাঁচা হয়ে গেছে। দিনের আলোয় তাদের পাত্তা পাওয়া যায় না। রাতে আলো জ্বললে, তারা জোড়ায় জোড়ায় বেরিয়ে পড়ে। বাড়িতে রান্না নেই, যে-কোন দোকানে ঢুকে খেয়ে নেওয়া। রাত ঘন হয়ে নামলে বিছানায় গড়ানো।

কার্জন পার্ক ছাড়িয়ে ময়দান মার্কেটে এসে পড়লাম। এখান থেকে মঞ্জু অন্তত খান ছত্রিশেক শাড়ি কিনেছে আমার পয়সায়। সিনেমা হাউসগুলো পেরিয়ে গেলাম। এসব হাউসে কম সিনেমা দেখিনি আমরা। মঞ্জুর আবার বেশির ভাগ সেক্স আর ভায়োলেন্সের ছবি পছন্দ ছিল। এক একটা ছবি দেখতে দেখতে মঞ্জু যখন ভয়ে আঁতকে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরত, কি আমার হাত কোলের ওপর টেনে নিয়ে খেলা করত, তখন সুধাকে কেমন যেন ফ্যাকাশে বিবর্ণ, মাটির পুতুলের মত লাগত। মনে হত, মঞ্জুই আমার জীবন, সুধা মরণ। কিন্তু শেষকালে ব্যাপারটা পুরো উলটো হয়ে গেল। আমাকে মঞ্জুর জন্যে মরতে হল, সুধা চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারল না।

আমি উড়তে উড়তে মঞ্জুর অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে চলে এলাম। সাতাত্তর নম্বর ঘরের দরজা যথারীতি বন্ধ। ঘরে ব্লু রঙের একটা আলো জ্বলছে। আমি কি-হোল দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, ঘরে দুজন মানুষ, সামনে সেন্টার টেবিলে তরল পানীয়। এ পানীয়ে অনেকদিন চুমুক দেওয়া হয়নি। গেলাস দেখেই আমার জিবে জল এসে যাচ্ছিল।

আমি হাইজাম্প দিয়ে ওপরে ওঠে গেলাম। ভেন্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে নিজেকে গলিয়ে তাজ্জব। আরে এ তো নিরুপম নয়, এ তো অজয় দাশগুপ্ত! এরই মধ্যে আর একবার পার্টনার পালটেছে মঞ্জু। আমি মনে 'এনকোর, এনকোর' বলে বললাম, তোমার হবে মঞ্জু। তুমি যেরকম শাড়ি পালটানোর মত পুরুষ পাল্টাচ্ছ, তাতে একদিন তুমি কুইন ক্লিওপেট্রা হয়ে যাবে।

অজয় মঞ্জুর কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে ছিল। ওর কাঁচাপাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে মদের সুবাস। হাত দুটো ঘুরিয়ে মঞ্জুর পিঠে রাখা। কি একটা কথা বলতে বলতে অজয় হাতের চাপে মঞ্জুর পিঠ বেঁকিয়ে মঞ্জুকে নিজের মুখের ওপর টেনে আনছিল।

আমার হাসি পেল। শালা, একদিন আমাকে খুব আওয়াজ দিয়েছিল। আজ আওয়াজ দেওয়াচ্ছি। আমি অজয়ের আঙুলের ফাঁকে মাছির মত গলে গিয়ে, মঞ্জুর পিঠে মোক্ষম একটা চিমটি কাটলাম। মঞ্জু চমকে লাফিয়ে উঠে বলল, কি ইডিয়টের মত করছ, পিঠে চিমটি কাটলে কেন?

অজয় পড়ে যেতে যেতে টাল সামলে অবাক হয়ে বলল, আমি!

মঞ্জুর পিঠ জ্বালা করছিল। জায়গাটা লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। হাজার হোক ভূতের চিমটি, হবে নাই বা কেন? মঞ্জু বলল, তুমি নয় তো কে আবার! ঘরে কি কেউ আছে!

অজয় নিজের নখ দেখল। ম্যানিকিওর করা নখ। চিমটি কাটবার ধার নেই তাতে। অজয় হাত মেলে দিয়ে বলল, তুমি বল, এই নখে চিমটি কাটা যায়?

মঞ্জু রাগে ফুঁসছিল। শাড়ির আঁচলটা কাঁধের ওপর ফিরিয়ে দিয়ে বলল, আমি কিছু দেখতে চাই না। তুমি মাতাল হয়েছ। গেট আউট। আই সে ইউ গেট আউট!

অজয় বলল, ইয়ার্কি! আজ তুমি আমার তিনখানা শয়ের পাত্তি খসিয়েছ, গেলেই হল।

অজয় মদের গ্লাসের দিকে হাত বাড়াল। আমি গ্লাসটাকে ইঞ্চি আষ্টেক ওপরে তুলে নিলাম। অজয় চোখ বড় বড় করল। তারপর বলল, একি রে বাবা! গ্লাসটা যে শূন্যবিহারী, বাতাসে ভাসছে।

মঞ্জু ড্যাবড্যাব করে তাকিয়েছিল। রঙ করা চোখের পাতা আর পড়ছে না। আমি গ্লাসটা আরও তুলে এনে মঞ্জুর মাথায় ঢেলে দিলাম। তারপর বোতল তুলে চোঁ করে এক নিমেষে বাকি মাল খেয়ে নিয়ে খিকখিক করে খোনা গলায় হেসে উঠলাম।

মঞ্জু আর অজয় দুজনে একই সঙ্গে ভূ-ভূ-ভূ করতে করতে মাটিতে জড়াজড়ি করে গড়াগড়ি খেতে লাগল। সে দৃশ্য দেখে হাসিতে আমার পেট ফেটে যাচ্ছিল। আমি হাসতে হাসতে বমি করে ফেললাম।

নেশার খোয়ারি কাটতে পাক্কা দুটো দিন। এই দুদিন আমি কোনরকমে মঞ্জুর ভেনটিলেটারে গা ঢাকা দিয়েছিলাম। অচেনা বিছানায় যেমন শুয়ে ভাল ঘুম হয় না, এও তেমন। কিন্তু কি করব, উপায় নেই। পুরো নেশা না কাটলে যাই কি করে। শেষে যদি পড়ে আবার হাত-পা ভাঙি, তাহলে ভূতের চেহারাও যে পালটে যাবে!

ভোরবেলা মঞ্জু সেই যে ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়েছে, আর ফ্ল্যাটে ঢোকেনি। ঢুকবেও না। আর কিছু না হোক, প্রাণের ভয় সকলের আছে। কে আর ইচ্ছে করে ভূতের হাতে প্রাণ দেয়।

তিনদিনের দিন, আমি আবার আমার ঘুলঘুলিতে ফিরে এলাম। দেখি, এই দুদিনেই আমার ঘরের চেহারা পালটে গিয়েছে। জানলায় নতুন পর্দা হয়েছে। বিছানায় কটকি চাদর পাতা। বালিশে বালিশে নতুন ঝালর দেওয়া ওয়াড় পরিয়েছে সুধা। ঘরে ঝুল নেই, মাকড়শা নেই, এমনকি সেই লেজকাটা টিকটিকিটাও নেই। আমার ফটোয় একটা ফুলের মালা ঝুলছে। পঞ্চমুখী ধূপদানিতে ধূপ।

ব্যাপার কি? হল কি! আজ যে আমার খাতির। তা হলে কি পেনশন আর গ্রাচুইটির টাকাটা পেল সুধা! এতদিনে পাওয়া উচিত। ছ'মাস হতে চলল, তাই হবে হয়তো। আমি নিচে নেমে আমার ফটোর মালা দুলিয়ে দিয়ে বললাম, কি দেবু মিত্তির, কেমন লাগছে? আজ যে বরবেশ। বাহ! বেশ আছ, তোফা। জ্যান্ত শালা কোনদিন তোমার কপালে ফুলের মালা জুটল না, চিরকাল গালাগাল হজম করলে, আজ মরে সুরতখানা বেশা খোলতাই করেছ। বেঁচে থাক বাবা, সুখে আনন্দে বেঁচে থাক। আমি শালা মরে ভূত হয়েছি, আমি এখন খাবি খাই।

ঘরের তালা খোলার আওয়াজ হল। আমি তড়াক করে লাফ মেরে আমার ঘুলঘুলিতে উঠে এলাম। ঘরে সুধা ঢুকল। সঙ্গে একজন দশাসই পুরুষ। ছ'ফুটের ওপর লম্বা। মাথায় মিলিটারি ছাঁট ছাঁটা। হাতের গুলিগুলো গা-চাপা জামা ফুঁড়ে ফুলে ফুলে উঠছে। পায়ে নতুন কেনা শু মসমস করছিল। কোমরের বেল্টে চকচকে রিভলবার।

আমি তাজ্জব হয়ে তাকিয়েছিলাম। এ মালকে তো কোনদিন দেখিনি। এ কে বাবা! সুধা হাসতে হাসতে বলল, উফ! আর পারি না রজতদা। সারা ট্যাক্সিতে তুমি এমন হাসিয়ে মেরেছ যে, এখনও আমার কুলকুল করে হাসি পাচ্ছে।

রজত বলল, হাসাব না! এসে দেখি, তুই মুখখানাকে শিমুলের চাকের মত করে বসে আছিস সুধা। তোর জীবনে যেন কোন সুখ নেই, শান্তি নেই, আনন্দ নেই। আরে মানুষ তো মরবেই। তোর বর মরেছে বলে তুই যেমন ভেঙে পড়েছিস, এমন আমি কাউকে দেখিনি। ঘরদোরের কি ছিরি করে রেখেছিলি বল। এই দুদিনে তবু একটু মানুষের মত দেখাচ্ছে। বুঝলি, তোকে আমি এখানে রাখব না, আমার সঙ্গে দেরাদুন নিয়ে যাব।

সুধা আঙুলে শাড়ির খুঁট জড়াতে জড়াতে বলল, যাঃ! তাই কি হয় নাকি! তুমি কি যে বল।

রজত বলল, আমি ঠিক বলিরে। তোর মামাতো ভাই সনৎ যেদিন তোর কথা আমাকে বলেছে, সেদিন থেকেই আমার মন বলছে, তোর একটা কিছু হিল্লে করা দরকার। এরকম একটা ভূতের জীবনে কি মানুষ বাঁচতে পারে। হাতের কটা টাকা, সেগুলো যখন ফুরিয়ে যাবে, তখন কি করবি। আরে জীবন অনেক বড়, আর তোর কি বয়স বল। আমি তোর বিয়ে দেবই দেব। আর যদি দিতে না পারি, তাহলে আমিই করব। আমি তো কনফার্মড ব্যাচেলর। একজন আইবুড়োকে মালা দিতে নিশ্চয়ই তোর আপত্তি হবে না।

কথাগুলো শেষ করেই রজত হো হো করে হেসে উঠল। হাসির শব্দ শুনে আমার মনে হল, আরে এ বেটা শোলের সেই আমজাদ। হাসে না তো যেন জয়ঢাক, বুকে ঘুষি মারে।

আমি মনে মনে বললাম, বাঃ! বেশ ব্যবস্থা। সুধার দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে। তা তুমি কে বাবা! বেঁচে থাকতে তো তোমাকে কোনদিন দেখিনি। আইডেনটিটিও জানি না। একবার ভাল করে ঝুলি

ঝাড়, তোমাকে পরখ করে নিই।

সুধা রজতের কথা শুনে কি-সব ভাবছিল। এসময়ে সুধা বলল, আমি আর একটু ভাবি, কি বল। একেবারে এত বড় একটা লাফ মারব!

রজত বলল, নিশ্চয়ই ভাববি। একশোবার ভাববি। ভাবনাচিন্তা না করে ভূতে কাজ করে, মানুষ করে না। মানুষের কাজ হল, যাহা করিবে তাহা ভাবিয়া করিও।

ভূতের উল্লেখে সুধার বোধহয় আমার কথা মনে পড়ল। সুধা আমার ফটোর দিকে তাকিয়ে বলল, রজতদা তুমি ভূতে বিশ্বাস কর?

রজত আবার সেই হাড়কাঁপানো হাসি হেসে বলল, ভূত, ভূত তো মনে! ভূতে বিশ্বাস করতে হলে তোর রজতদাকে বাঁচতে হত না। কত মিলিটারি অ্যাকশন করেছি, কত মানুষ মেরেছি। তারা যদি সব মরে ভূত হয়ে তেড়েফুঁড়ে আসত, তাহলে কি আর বাঁচতাম। কবেই অক্কা পেতাম।

সুধা চোখ বড় বড় করল। তুমি ভূতে বিশ্বাস কর না। কিন্তু আমি তোমাকে ভূত দেখাতে পারি। আমার হাতেই একটা পোষা ভূত আছে। তাকে আমি যা বলি, সে তাই করে। ডাকব, দেখবে!

রজত ইজিচেয়ারে নিজেকে আরও ছড়িয়ে বসল। তারপর হাসি গলায় বলল, কিরে, ছিকলিটিকলি বেঁধে রেখেছিস, না আবার বাঁদরের মত খাবলে কামড়ে দেবে? তারপর দরাজ গলায় হেসে বলল, যা ডাক। দেখি একবার তোর ভূতবাবুকে।

রাগে আমার গা কষকষ করছিল। আমি ভাবছিলাম, একবার উচিত শিক্ষা দিই। বিশেষ কিছু করতে হবে না। শুধু টাইটা ধরে যদি দুদিকে সমান টান দিই, তাহলে এখুনি আধহাত জিব বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু আবার মনে হল, সুধার ভাবগতিক দেখে সুবিধের মনে হচ্ছে না। এখন কোনদিকে ঢলবে ঠিক করতে পারেনি সুধা। ঠিক এ সময়ে সুধার কথামত রজতের সামনে বের হয়ে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করলে, ফল ভাল না হয়ে মন্দও হতে পারে। তাছাড়া আমার কি মানঅভিমান নেই। মাত্র কদিন আগে, ভাল করতে গিয়ে কি নাজেহালই না হয়েছি। সুধা গয়ায় পিণ্ডি দেবে বলেছে। কি দরকার আমার পাঁচ ঝামেলায় থাকার। আমি ভূত, ভূতের মত থাকব। তুমি মানুষ, মানুষের মত। ভূতে-মানুষে তো আর পিরিত হয় না।

সুধা আদুরে গলায় ডাকল, এই শুনছ, তুমি একবার আসবে?

আমি অতি কষ্টে মুখ গোঁজ করে রইলাম।

সুধার আবার বলল, হাসো না একবার। তারপর আবার বলল, আচ্ছা, হাসতে ইচ্ছে না হয়, আমাদের কৌচটাকে একটু টেনে সরিয়ে দাও। তাহলে বুঝব তুমি এসেছ।

সুধার এই আদুরি আদুরি কথা, বায়না, আমার মনে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল। কিন্তু আমি শক্ত হয়ে, ঘাড় গোঁজ করে ঘুলঘুলি কামড়ে পড়ে রইলাম। আজ পাঁচ বছর বাদে সুধার মুখে এই ভাল কথা শুনছি। এত সহজে কি ভবী ভোলে। বেঁচে থাকতে ভাল কথা বললে, আর ঘুলঘুলিতে থাকতে হত না দেবু মিস্তিরকে।

সুধার রজতদা একটু দেখল। তারপর হাড় কাঁপিয়ে হেসে উঠল। আচ্ছা মিলিটারিম্যানকে ভূত কেন, ভগবানও ভয় করে। তোর ভূত আর এসেছে, ভয়েই পালিয়েছে। আয় কাছে আয়, শোন।

রজতের লম্বা হাতটা সুধার কাঁধে এসে পড়ল। আমি সভয়ে চোখ বুঝলাম। আমার আর তাকানো উচিত নয়। সতীত্ব রক্ষা স্ত্রীলোকের ধর্ম, ভূতের কর্ম নয়।

দিন তিনেক বাদে সুধা একেবারে সেজেগুজে নতুন বউ হয়ে এল। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি, আর অবাক হয়ে যাচ্ছি। কে বলবে মাত্র ছ'মাস আগে সুধার স্বামী মারা গিয়েছে। চীনে চুল বাঁধার দোকান থেকে চুড়ো করে চুল বেঁধেছে সুধা। গায়ে টকটকে লাল বেনারসী। মুখ কেমন যেন তেলতেলা লাগছিল। মঞ্জুর মত চোখে, ঠোঁটে, গালে মেক-আপ মেরেছে। সুধার শরীরটাও প্যাক-আপ করা, যৌবন ফেটে পড়ছিল। বাহবা বাঃ! বেড়ে লাগছে সুধাকে। এমনটি তো আমি কোনদিন দেখিনি। এ যে দেখছি মঞ্জুর সেকেন্ড এডিশন।

রজত একরাশ ফুল নিয়ে ঘরে ঢুকল। আজ আদ্দির পাঞ্জাবি পরেছে রজত, কোঁচান ধুতি। পায়ে

লপেটা। ফুলগুলো সুধার হাতে দিতে দিতে রজত বলল, এগুলো দিয়ে বিছানাটা সাজিয়ে নাও তুমি। আজ আমাদের ফুলশয্যা। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, ওটাকে ওখানে টাঙিয়ে রেখেছ কেন সুধা ?

কোনটা ? সুধা চোখ তুলল।

ওই যে তোমার এক্স-হাসব্যাণ্ডের ছবি।

কোথায় রাখব তবে ?

জাহান্নামে!—আমার ছবিটা টান মেরে খুলে রজত পা দিয়ে টেবিলের তলায় ঢুকিয়ে দিল। তারপর বলল, তোমার আর আমার মাঝখানে ভূতপূর্ব কোন ব্যাপার থাকবে না সুধা। এখন থেকে তুমি আমার, আমি তোমার। দেবু মিত্তির বলে কেউ কোনদিন ছিল না, থাকতে পারে না, থাকবে না। দ্যাটস অল।

আরে শাবাস ! কী আওয়াজ ! দেবু মিত্তির ভক্তি হয়ে গেল। লোকটার এলেম আছে বলতে হবে। কি কম্যানডিং টোন। তুই তুই করে বলা কথাগুলো কি সুন্দর তুমিতে পালটে নিয়েছে। আমি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলাম। ব্যাপার বুঝতে যেটুকু সময়, তারপর অ্যাকশনে নামতে হবে।

বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ উঠল। হোটেল থেকে খানা এসেছে। রজত খাবার নিয়ে দরজা বন্ধ করল। তারপর টেবিলে সাজাতে সাজাতে বলল, তোমার হল ? আই অ্যাম হাংরি।

আরে, কতরকমের খাবার আনিয়েছে রজত ! চিকেন বিরিয়ানি, ফ্রিসফ্রাই থেকে পুডিং পর্যন্ত। ফিসফ্রাই আমার বড় প্রিয় খাদ্য ছিল। একবার ব্রজেনদার মেয়ের বিয়েতে একুশখানা ফ্রাই খেয়েছিলাম বলে সুধা আমাকে আদর করে, 'খুদে-রাক্ষস' বলেছিল। আহা ! সেদিন কি আর আছে।

ফুল সাজিয়ে ঝকমকে চোখে সুধা এসে টেবিলে বসল। রজত পকেট থেকে চ্যাপটা একটা বোতল বার করে দুটো গ্লাস টেনে নিল। তারপর এক পেগ মাল ঢেলে নিট মেরে দিয়ে, আর আধ পেগ আন্দাজ লাইম মিশিয়ে সুধার দিকে এগিয়ে দিল।

বেশ জিন চালাচ্ছে দেখছি। না, ওদিকে আজ নজর দেবার সময় নেই। মাল খেলে আমি অল্পেই বেহেড হই। শালা আমার ছবিটাতে যে লাথি ঝেড়েছে, সেটা এখনও আমার পাঁজরায় বাজছে। এর শাস্তি দিতেই হবে। একবার ভাবলাম, এবার রণাঙ্গনে নামব নাকি। তারপর ভাবলাম, ধীরে, দেবু মিত্তির ধীরে, আর একটু দেখা যাক।

সুধা গ্লাসটা হাতে নিয়ে বলল, মদ !

রজত সুধার কাঁধ বাঁ হাতে জড়িয়ে নিল। ইয়েস মাই সুইট গার্ল, আজ আমরা সেলিব্রেট করব। এতদিনে মনে হচ্ছে, আজ আমি একটা কাজের কাজ করেছি। এ রিয়েল পিস অব গুড ওয়ার্ক।

সুধা গ্লাস নাড়াতে নাড়াতে বলল, মদ যে খাই না।

রজত চোখ তুলল। খাই না, খাবে। আজকের জন্যে অন্তত খাবে। লেট আস হ্যাভ ফান। মদ নয়, বল ওয়াইন। ওয়াইন এণ্ড ওয়াইফ গোজ টুগেদার। নেশা না হলে কি প্রেম জমে ?

রজত হা হা করে হেসে উঠল। সুধা নাক টিপে এক চুমুক দিয়ে বলল, তোমার এই ব্যাপারগুলো আর কিছুদিন পেছিয়ে দিলে হত না। অন্তত রেজিস্ট্রিটা হয়ে গেলে। ছিঃ ! ছিঃ ! বিয়ের আগে ফুলশয্যা, আমার ভাবতেই গা কেমন করছে।

রজত চোখ বড় বড় করল। কাটলেটে একটা কামড় দিতে দিতে বলল, কি বলছ তুমি সুধা। মা কালীকে সাক্ষী রেখে বিয়ে কি বিয়ে নয় ! দেখ, পুরুত ডাকিয়ে তোমার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়েছি। ইটস এ রিয়েল ম্যারেজ।

সুধা বলল, ও তো সাতসিকের পুরুত। তাও ব্রাহ্মণ কিনা কে জানে !

রজত আর এক পেগ ঢালল। তারপর বলল, ওসব নিয়ে মন খারাপ করতে নেই। আমার হাতে বেশি সময় নেই, কাজ অনেক। নোটিশ দেওয়া আছে, যখন ডাক আসবে, তখন সাক্ষীসাবুদ নিয়ে সই করে এলেই চলবে। ব্যাঙ্কে খবর দিয়েছি, কালই আমার অ্যাকাউন্টটা তোমার সঙ্গে জয়েন্ট করিয়ে নেব। ইনসিওরেন্স পলিসিতে তোমাকে নমিনি করতে হবে।

সুধা বলল, ব্যাঙ্কে তোমার কত টাকা আছে ?

তা লাখ দুয়েক হবে। ইনসিওরেন্সটা লাখ টাকার।

সুধা অনেকটা যেন আশ্বস্ত হল। এক চামচ বিরিয়ানি তুলে মুখে দিল। রজত সুধার দিকে তাকিয়ে বলল, এখানে আর বেশিদিন থাকা সম্ভব নয়, আমাকে দেরাদুন যেতেই হবে। যাবার আগে তোমার বাড়িটা বেচে দিয়ে যাব। এই বাড়ির টাকা আর তোমার সামান্য যা কিছু আছে তুমি জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে রাখতে পার। সুধার মুখের দিকে মিনিট খানেক তাকিয়ে দেখে রজত বলল, ইচ্ছে হলে নিজে আর একটা অ্যাকাউন্ট করতে পার।

এতক্ষণে আমার কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সুধার মামাতো ভাই সনৎ-ফনত বাজে কথা। কোথা থেকে খবরটা জোগাড় করে রজত এসেছে। ও একটা কন ম্যান। লোককে টুপি পরিয়ে কাজ হাসিল করে। ও সুধার সর্বনাশ করে ছাড়বে। সুধার দিকে তাকিয়ে আমার মায়া হচ্ছিল। আহা! বিয়ে করার কত শখ। ভূতের বউ হয়ে কার আর বাঁচতে সাধ হয়।

আমি খিকখিক করে হেসে উঠলাম। রজত ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, কে হাসে!

সুধার মুখে যেন রক্ত ফিরে এল। সুধা বলল, আমার স্বামী।

রজত দাঁতে দাঁত পিষল। তোমার স্বামী আমি।

আমি লাফ দিয়ে নিচে এলাম, তারপর বললাম, ইয়ার্কি মারবার জায়গা পাওনি। স্বামী বদল হলেই হল। রিয়েল বিয়ে হলে না হয় কথা ছিল। নারায়ণ সাক্ষী কি ম্যারেজ ব্যুরোর খাতায় সই দিলে আমার বলবার কিছু ছিল না। শালা বিয়ের মামদোবাজি দেখিয়ে তুমি আমার বাড়ি, টাকাকড়ি, বউ হাতাতে চাও!

রজত একহাতে সুধাকে জাপটে ধরল। অন্য হাতে পিস্তল বাগিয়ে বলল, আমি মিলিটারি ম্যান, তোর মত একটা পেঁচি ভূতকে উড়িয়ে দিতে আমার এক মিনিটও লাগবে না।

সুধা ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল। আমি বললাম, শালা সাতপুরুষ তোর কেউ মিলিটারিতে ঢোকেনি। তুই খিদিরপুরের ইমপোর্টেড মাল, স্মাগলড হয়ে এসেছিস।

সুধা চেঁচিয়ে উঠল, বাঁচাও।

আমি সঙ্গে সঙ্গে রজতের কাছা খুলে দিলাম। কাপড় সামলাতে গিয়ে রজত হাত সরাতেই, সুধা ছিটকে বিছানায় গিয়ে পড়ল। রজত বিছানায় ঝাঁপ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, আমার মুখের গ্রাস কেউ ছিনিয়ে নিতে পারেনি। তোর ভূতের মত বরটাও পারবে না।

সুধা আবার চেঁচিয়ে উঠল। আমি তীরের মত এগিয়ে গিয়ে রজতের নাক কামড়ে দিলাম। রজত 'বাপস!' বলে উঠে দাঁড়াতেই, সুধা দরজার দিকে ছুটে গেল। রজত অন্ধ রাগে গুলি চালাল, দুম! দুম! দুম!

গুলির শব্দে আমি নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মাথা চিঁড়েচ্যাপটা করে দেবার সময় বাঘমার্কা বাসটাও এরকম একটা দুম করে শব্দ করেছিল। ভয়ে একলাফে আমার ঘুলঘুলিতে ঢুকে দেখি, লাল রঙের সুধা বসে আছে। সুধা পা দোলাতে দোলাতে বলল, তুমি বড্ড চালাক, না? ভেবেছিলে আমাকে একলা ফেলে, তোমার মঞ্জুবালার সঙ্গে মজা মারবে? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা, এবার তোমার নাকে নল ছেঁচে দেব।

আমি বললাম, তুমিও কম যাও না। তোমার রজতশুভ্র কোথায় গেল? ফুলশয্যা হবে না?

সুধা হেসে উঠল। সেই সঙ্গে আমিও। তারপর হে পাঠক-পাঠিকা, আমি আর বলতে পারছি না। আমার লজ্জা করছে। ছিঃ! ছিঃ! আমাদের দুই ভূত-ভূতানির নিরাবরণ বায়বীয় শরীর ক্রমশ সংলগ্ন হতে হতে একেবারে এক হয়ে গেল। আমরা অনন্ত, অপার আনন্দের উল্লাসে, ভৌতিক সুরে গেয়ে উঠলাম, আজ আমাদের ফুলশয্যা অকাল বসন্তে।

ঝারোয়ার জঙ্গলে

মহাশ্বেতা দেবী

মইনু, সোনাম আর তাতা এখনো জানে না ওদের সেই ঝারোয়া জঙ্গলের অভিজ্ঞতাটা সত্যি, না মিথ্যে না স্বপ্ন। অথচ এ কথাও সত্যি যে ওরা চারজন ঢুকেছিল জঙ্গলে। বাদল আর কোনদিনই ফেরেনি।

বাদলের জেদেই ঝারোয়া যায় ওরা। নইলে ঝারোয়ার নাম ওরা শোনেইনি কোনদিন। বাদলের কাকা পালামৌয়ের এক জঙ্গলে কাঠ কাটবার ঠিকাদার। এ বছর মার্চ মাসে বাদল ওঁর সঙ্গে কাজে লাগবে। স্কুল থেকেই চারজন বেজায় বন্ধু। মইনু আর তাতা সবে ব্যাঙ্কে ঢুকেছে। সোনাম ওর বাবার খবরের কাগজের আপিসে ঢুকবে এবার।

বাদলই বরাবর বেজায় ছটফটে আর খেয়ালী। স্বাস্থ্যটা ওর রীতিমত ভাল। দেখলে বাঙালী ছেলে মনে হয় না। বাদলের উৎসাহে ওরা সাইকেলে ভারতবর্ষ ঘুরেছে। হিমালয়ে উঠেছে কয়েকবার।

বাদলের একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। কি সে ক্ষমতা, কয়েকটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবে।

'তরুণ দল' ক্লাবের সঙ্গে সেবার ওরা গঙ্গোত্রীর কাছে এক গ্লেসিয়ারের গতিপথ দেখতে গিয়েছিল। যেখানে বেস্‌ক্যাম্প করার কথা, বাদল বলল, এখানে নয়। এখানে ভীষণ দুর্ঘটনা হবে।

দলের নেতা মোহনবাবু চটে গেলেন। তিনি একজন পাকা পর্বতারোহী। সঙ্গে আছে তিনজন অভিজ্ঞ শেরপা। তাঁরা বুঝছেন না, বাদল বেশি বুঝছে?

বাদল বলতে গেলে তাঁকে অমান্য করেই বন্ধুদের নিয়ে ফিরে গেল তাঁবুতে। আর সেই রাতে চাঁদের আলোয় যখন ধুয়ে দিচ্ছে বরফের আঙিনা, অপ্রত্যাশিত বরফের ধস্ নেমে মোহনবাবুদের বেস্‌ক্যাম্প নিশ্চিহ্ন করে দিল।

ঠিক এমনি ঘটে আগ্রায় তাজমহল দেখতে গিয়ে। হঠাৎ বাদল বলল, এক্ষুনি চল্ এখান থেকে।

কিছু একটা ঘটবে। থাকলে জড়িয়ে পড়ব।

ওদের খুব কাছে বসে নিথর হয়ে তাজমহল দেখছিল একটি যুবক। তার মত নিবিষ্ট হয়ে তাজমহল সেদিন আর কেউ দেখেনি।

ওরা তো চলে এল। তার আধঘণ্টা বাদেই নাকি দুজন লোক এসে যুবকটিকে লক্ষ্য করে দুমদাম গুলি ছোঁড়ে। যুবকটিও প্রস্তুত ছিল। দু পক্ষের সে লড়াইয়ে যুবকটি মরল। কয়েকজন ভ্রমণার্থী জখম হল।

বাদল আগে থেকে অশুভ কিছুর আঁচ পেত। মইনু, সোনাম আর তাতা তো তা স্বচক্ষে দেখেছে। ঝারোয়াতে গিয়ে কি হল ?

সব যেন দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়।

মার্চে কাজে লাগবে বাদল। খুব উত্তেজিত। জঙ্গলে ঘুরবে, কত রকম রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হবে। বাদলই বলল, তোরাও চল্। কয়েকদিন থেকে চলে আয়।

শিকার করা যাবে ?

যাঃ, শিকার করা বারণ। পাখি টাখি মারতে পারবি।

আর এক আধটা হরিণ--

থাকব কোথায় ?

কাকার বাংলোতে। কাকা বিয়ে করল না। সারা জীবন কাটাল জঙ্গলে জঙ্গলে। এক সময়ে বর্মায় হাতি ধরত। চল্ না, গল্প করবে জমিয়ে।

বাদলের কাকা থাকার জন্যে জায়গা বেছেছেন বটে। ট্রেন থেকে নামো কোমাণ্ডি নামে একটা জঙ্গল ঢাকা স্টেশনে। তারপর কাকার জীপে চল্লিশ মাইল ভিতরে চল। সুমা নামের একটা জায়গা। সুমা নদী পাথরে পাথরে নেচে বয়ে গেছে এঁকেবেঁকে। কাকার বাংলোর চারদিকে উঁচু কাঁটাতারের বেড়া।

এক সময়ে এখানে বক্সাইটের খনির কাজ শুরু হয়েছিল। বেশ কয়েক বছর কাজও হয়। তারপর খনির কাজ কেন যেন বন্ধ হয়ে যায়। খনির কাজের জন্যে তৈরি রাস্তাগুলো এখনো আছে। সেই পথেই কাঠবাহী ট্রাক চলে যায় ডালটনগঞ্জ।

দেখা গেল কাকা সংক্ষেপে জবাব দেন।

কাঁটা তারের বেড়া দিয়েছ কাকা ?

হাতি আসে।

বেড়া উপড়ে ফেলতে পারে না ?

পারে, ফেলে না। প্রখর বুদ্ধি রাখে।

মার্চ মাসেই বিকেল নাগাদ বেশ ঠাণ্ডা, সন্ধে থেকে শীত শীত।

বনতিতিরের রোস্ট আর চাপাটি খাওয়া হল। কফি খেয়ে কাকার মেজাজ যেন একটু খুশি হল।

তোরা তো এলি, কিন্তু সময়টা ভাল যাচ্ছে না। ভাল জঙ্গলটাতেই কাজকর্ম বন্ধ, কি যে হবে।

কেন ? কাজকর্ম বন্ধ কেন ?

কি যে বলি, নিজেই বুঝছি না।

বল না, বল না।

ওই পাহাড়টার ওপারে ঝারোয়ার জঙ্গল। কখনো হাত পড়ে নি, ভাল ভাল শালগাছ অঢেল।

কাকা কাহিনীটা বললেন। জঙ্গলটা জমা নেয় এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। নেয় খুব অদ্ভুত কারণে। নির্জনে থাকবে বলে নেয়।

একটা বাড়ি বানায়। বউ নিয়ে আসে। জানা যায় ওদের একটি বাচ্চাও জন্মায়। সপ্তাহে সপ্তাহে ধীলন হাটে আসত সওদা করতে।

হঠাৎ পর পর কয়েক সপ্তাহ তার দেখা নেই।

অবশেষে এক অবিশ্বাস্য খবর আসে কাকার কাছে। ধীলনের জীপ গাড়িটা রাস্তায় পড়ে আছে। আর ধীলনের মৃতদেহ পড়ে আছে তার বাড়িতে। বউ আর বাচ্চা উধাও।

কাকা তো গেলেন। তিনি দেখলেন ধীলন তার বারান্দায় পড়ে আছে। তার মুখে চোখে

অবিশ্বাস্য আতঙ্কের ছাপ। ঘরের মধ্যে পড়ে আছে বিশাল গ্রেট ডেন কুকুরটা। ধীলন বা কুকুর, দুটো মৃতদেহেই এক ফোঁটাও রক্ত নেই। ধীলন কাগজের মত সাদা।

বউ বা বাচ্চার কোন খোঁজ নেই।

খোলামেলা বাড়িতে মৃতদেহ পড়ে আছে। হায়েনা বা শিয়াল টানাটানি করেনি।

কাকার জঙ্গলকুলিরা বলল, এ কোন পিশাচদানোর কাণ্ড।

আর তাদের কাছেই কাকা জানতে পারলেন। ধীলন বিয়ে করেছিল একটি মেয়েকে, যার কোন কুলুজিকুষ্ঠি সে জানত না। জঙ্গলের মধ্যে একা একা মেয়েটিকে ঘুরতে দেখে সে নিয়ে আসে ও বিয়ে করে। গজাড় জঙ্গলে একা একা কি কোন মানুষের মেয়ে ঘোরে?

কাকা সে কথায় কান দেননি একেবারে। জঙ্গলে কাজ করতে হলে অত ভিতু হলে চলে না। আর এ কথা তিনি জানেন যে কুলিদের বেজায় বিশ্বাস ভূতপ্রেত, দেওপিশাচে। তিনি ধীলনকে দাহ করান, কুকুরটিকে কবর দেওয়ান। বাড়িটা বন্ধ করে চলে আসেন জীপটি নিয়ে।

তারপর জঙ্গল আপিসের সহায়তায় ধীলনের কে আছে না আছে খোঁজ নেন। অবশেষে রাঁচি থেকে এল ভার্মা নামে একটি ছেলে। ধীলন তার মামা। ভার্মা বলল, আমি ওখানে বাস করব না। বাড়িতে যা আছে তা জীপে চাপিয়ে নিয়ে রাঁচি চলে যাব।

ভার্মার সঙ্গে তার এক বন্ধুও এসেছিল। কোন জঙ্গলকুলি ওদের সঙ্গে গেল না। তারা সাফ বলে দিল। জানোয়ারের ভয় করি না। যেখানে জানোয়ার অব্দি ঢোকে না, সেখানে কে যাবে?

কাকা তাঁর হেড কুলিকে ধমকালেন। হেড কুলির নাম দাসাইন ওরাওঁ। সে বলল, বাবু! আমরা তো যাবই না। ওই বাবুও যেন না যায়।

ভার্মা সে সব কথা উড়িয়ে দিল। ভার্মার কাছেই কাকা ওই জঙ্গলটা ইজারা নিলেন। আদিম অরণ্য, বড় বড় শাল গাছ, প্রত্যেকটা গাছ খুব দামে বিকোবে। ভার্মা যাবার দিন হাটেও দেখা হল। ভার্মা বলল, কাল সকালে একবার আসবেন। একটু চা বানিয়ে আনলে তো কথাই নেই।

সেই শেষ দেখা। পরদিন সকালে থার্মস্ ভর্তি চা নিয়ে ঝারোয়ার জঙ্গলে হাজির হয়ে কাকা দেখেন ভার্মা এবং তার বন্ধু ঘরের মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে আছে। দুজনেই মৃত, দুজনের চোখ অবিশ্বাস্য আতঙ্কে বিস্ফারিত, দুজনের শরীরই রক্তশূন্য।

ছেলেরা বলল, তারপর?

দুজনের গলাতেই ছোট ছোট পাংচারের দাগ ছিল।

তার মানে কি?

জানি না। পুলিশ এখনো খোঁজ চালাচ্ছে। কিন্তু কোন কিনারা হয়নি। শুধু ভয়ঙ্কর আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। কেউ যাচ্ছে না ওখানে গাছ কাটতে।

পুলিশ যাচ্ছে না?

কয়েকবার গেছে। সেও এক রহস্য।

কি রকম?

বাড়িটা পুলিশ বন্ধ করে তালা মেরে আসছে। পরে গিয়ে বাড়ি খোলা পাচ্ছে। সব ঝকঝকে তকতকে। কে বলবে যে বাড়িতে মানুষ থাকে না।

তার মানে কি?

কোন মানুষ আছে এর পেছনে। আমার তাই বিশ্বাস। হাজার সত্তর শাল গাছ, করম গাছ, তেঁতুল গাছ, লাখ লাখ টাকার জঙ্গল তো। কেউ আতঙ্ক সৃজন করছে।

কাকা খুব মুষড়ে পড়েছেন মনে হল। ঝারোয়ার জঙ্গলের ওপর খুব ভরসা করেছিলেন।

বাদল বলল, তুমি ভাবছ কেন? আমরা চারজন আছি, বন্দুক নিয়ে থেকে যাব ওখানে। সব রহস্য ফরসা হয়ে যাবে।

পরদিন দাসাইন ওরাওঁ ওদের নিয়ে গেল চিপা ফরেস্টে। সেখানে এখন গাছ কাটা চলছে। দাসাইন খুব আত্মসম্মানী ভারভারিক্কি লোক। গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরে ও, হাতে রাখে ছড়ি। দাসাইন বলল, তোরা যাস না ঝারোয়া।

কেন? সেখানে কি আছে?

বোস্‌, বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই, চায় লা।

ওভারসিয়ারের তাঁবুর কাছে একটা লোক কেটলিতে চা বানাচ্ছে, বিড়ি বেচছে। কাটা গাছের ওপর বসল ওরা। দাসাইন বলল, বাবু অনেকদূর বুঝে। সবটা বুঝে না।

দাসাইনের গল্পটা জঙ্গলে বসে মনে হয়েছিল গল্প, আর শহরে বসে মইনু, তাতা ও সোনামের আজ মনে হয় সত্যি। কেন এমন হয় ?

গল্পটা এই রকম—

আদি অন্ত কাল আগে যখন পৃথিবী তৈরি হচ্ছিল, তখন বড় দেবতার সঙ্গে অসুরদের বউরা যুদ্ধ করতে যায়। বড় দেবতা শূন্য থেকে বউগুলোকে নিচে ফেলে দেন। তারাই হয়ে গেল পাহাড়। পাহাড়ের কোল দিয়ে ক্রমে বনও গজাল। আর একথাও সত্যি যে নানারকম মানুষ এসে সব জঙ্গল, সব মাটির দখল নিয়েছে।

তবু বনের কোন কোন জায়গা থাকে সংরক্ষিত। মানুষ সব দখল করছে বলে পাহাড় জঙ্গলের আত্মারা মানুষের উপর ক্ষেপেই থাকে। কেননা তাদের বসত ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। তখন তারা কোন কোন জায়গায় এসে ডেরা বাঁধে।

ঝারোয়ার জঙ্গল তেমনি এক জায়গা। এ কথা বাবু মানে না, বুঝে না। এ কথা কখনো বাবু ভেবে দেখল না যে ধীলন যেখানে ঘর করল, সেখানে গাছে পাখি বসে না ; কোন জানোয়ার ঢোকে না বাড়ির ভিতর ? আর ধীলনও ভেবে দেখল না, জঙ্গলের মধ্যে একটা মেয়ে কোথা থেকে এল, বিয়ে করে বসল। অবশ্য ধীলন কিছু করতেও পারত না। যখনি ওখানে বাড়ি করেছে, তখনি ও মরেছে। যখনি মেয়েটিকে দেখেছে, তখন তো ওর উপর শাপ লেগে গেছে।

ও তো মেয়ে নয়। মানুষের উপর প্রতিহিংসা নেবার জন্যে কখনো মেয়ে সেজে, কখনো হরিণ বা ময়ূর সেজে মানুষকে ভুলায়। তারপর মানুষের রক্ত চুষে শেষ করে ফেলে রেখে চলে যায়।

কেন ?—সোনাম বলল।

কেন শোধ নেবে না। মানুষ গাছ কেটে, পাহাড়ের পাথর চালান দিয়ে জঙ্গলের রক্ত চুষে নিচ্ছে না ?

তোমাদের কিছু হয়নি তো ?

দাসাইন শান্ত সুন্দর হাসল। বলল, আমরা তো জঙ্গলকে মারছি না বাবু, পাহাড় জঙ্গল শেষ করে টাকা জমাচ্ছি না। আমাদের মারবে কেন ? আমরা জঙ্গলের সন্তান। জঙ্গলের দেওদেওতার নিয়ম মেনে চলি। ওদের রাগ বাইরের মানুষের উপর। আমরা যাচ্ছি জঙ্গল দিয়ে। ধর্‌ কেন, জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ পথের উপর একটা ডাল ভেঙে পড়ল। ঝাঁ নেই, বাতাস নেই, ডাল পড়ল কেন ? তখনি জানলাম আর যাওয়া নিষেধ। আর যাব না, ফিরে আসব।

তাতা বলল, বাড়ি পরিষ্কার রাখছে কে ?

যে ধীলনকে খেয়েছে, সে।

কেন ?

আরো খেতে চায়, আরো মানুষ চায়।

পুলিশকে কিছু করে নি কেন ?

কে জানে !

পুলিশকে যে কিছু করে নি, তাতেই মইনুরা নিঃসংশয় হয় যে এ কোন মানুষের কারসাজি। তখনি বাদল ঠিক করে যে ওই বাড়িতে গিয়ে ওরা থাকবে।

কাকা বারণ করলেন।

পুলিশ অফিসার বারণ করলেন।

বারণ না করে, 'যাও' বললে ওদের উৎসাহ ফুরাত। বারণ করার ফলে যা ছিল উৎসাহ, তা হয়ে গেল জেদ। চার চারটে জোয়ান ছেলে। সাঁতার কাটতে, স্কুটার চালাতে, পাহাড়ে উঠতে সবাই পটু। রাইফেল ক্লাবে চারজনই একসঙ্গে ঢুকেছিল। অল্পবিস্তর বন্দুক চালাতে সবাই জানে। বাদলের তো লাইসেনস্‌ও আছে। জঙ্গলের কাজে আসার আগেই সে লাইসেনস্‌ নিয়েছে। মইনু কারাটে, তাতা আর সোনাম জুডোও শিখেছে।

পুলিশ অফিসার সুজা সিং বললেন, ঠিক আছে। পাহাড়ের এপারে সুমাতে আমি রইলাম আজ। অনেক দিন বাদে জমিয়ে তাস খেলা যাবে।

কাকার বাংলোয় রয়ে গেলেন সুজা সিং। আর ওরা যখন গেল বিকেলে, তখন বার বার বলে দিলেন, পাহাড়ে নির্জনে শব্দ বহুদূর যায়। এই হুইস্‌লটা রাখুন। কিছু বিপদ বুঝলেই বাজাবেন। আমরা চলে যাব।

দাসাইন ওদের কিছুদূর এগিয়ে দিল আর মাথা নাড়তে নাড়তে, বকবক করতে করতে ফিরে গেল।

সুমা থেকে ঝারোয়া, মাঝে একটি পাহাড়। পাহাড়টা খুবই নিচু। যাবার পথ পাহাড়ের গা ঘেঁষে পাহাড় ঘিরে। ধীলনের বাংলোটিতে ওরা যখন পৌঁছয় তখন বিকেল। কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে ওরা আশপাশটা দেখতে বেরোল। বাদল বলল, যত সব গাঁজাখুরি কথা। ওই তো হরিণ দৌড়ে গেল, কাঠবিড়ালি ছুটছে। ভুতুড়ে জঙ্গল না হাতি!

মইনু, সোনাম আর তাতা অবশ্য কোন হরিণ বা কাঠবিড়ালি দেখেনি। কিন্তু বাদল তো দেখেছে?

সন্ধে ঘনাতে ওরা ফিরে এল। বাদল বলল, এত বড় বড় শাল গাছ, ওঃ। কত দাম বল তো?

লাখ লাখ টাকা।

তাহলে?

তুই লক্ষপতি হচ্ছিস।

নাঃ, বেজায় বড়লোক হওয়াটা আর ঠেকানো গেল না দেখছি। কি আর করি বল্‌।

আমাদের মাঝে মধ্যে দিয়ে দিস।

বাংলোতে আলো জ্বলছে। তাই দেখেই ওরা অবাক হয় একটু। বারান্দায় পেট্রোম্যাক্‌স, ঘরে পেট্রোম্যাক্‌স, কে জ্বালল? আরেকটু এগিয়ে আসতে জবাব মিলল। বারান্দায় বসে আছে একটি মেয়ে। তার কোলে একটি বাচ্চা।

ওদের দেখে মেয়েটি উঠে দাঁড়াল বাচ্চাটিকে শুইয়ে রেখে। তারপর হাত জোড় করে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ছেলেরা যত না অবাক, তত বিব্রত, আবার আশ্বস্তও। মইনু বলল, থামুন, থামুন। কাঁদবেন না। আপনি, আপনি ধীলনের বউ?

হ্যাঁ বাবুজী। এ তো আমারই বাংলো।

কোথায় ছিলেন?

কোথায় থাকব? জঙ্গল দিয়ে আমাদের গাঁয়ে পালিয়ে ছিলাম। পুলিশ যে বড্ড ঝামেলা করে। কি বলে কিছু বুঝি না। আমি কি জানি যে স্বামী মরে যাবেন? উনি পরব পূজা পছন্দ করেন না। ঝগড়া করে আমি বাচ্চাকে নিয়ে চলে যাই। তারপর যা যা হল...গাঁয়ে আমায় থাকতে দেয় না। বলে, বাবুকে বিয়ে করেছিলি। সেখানে যা। এখানে এলে পুলিশ তাড়া করে।

আপনিই ঘরদোর সাফ করেন?

হ্যাঁ বাবুজী। কে করবে?

ঘর খোলেন কি করে?

এই যে, মাস্টার চাবি দিয়ে! এ চাবিগুলো দিয়ে সব তালা খোলা যায়। বাচ্চাটার বড় অসুখ। কেবল শুকিয়ে যাচ্ছে, কিছু খেতে চায় না। তাই এসে বসে আছি। ভেবেছি সকাল হলে নিজে যাব পুলিশ সাহেবের কাছে। বলব, আমাকে যা বল তাই করব, বাচ্চাটাকে হাসপাতালে দিয়ে দাও। জংলী মানুষ আমি, কিছু বুঝি না। স্বামী সব বুঝতেন, সব দেখে শুনে রাখতেন। বাবুজী! রাতটুকু থাকব?

ছি ছি, সে কি কথা! আপনি বাচ্চাকে নিয়ে ঘরে থাকুন। আমরা ওই ঘরে থাকব। সকালে আমরাই আপনাকে নিয়ে যাব।

মেয়েটি বাচ্চাকে শুইয়ে এল। সেই ওদের খাবার সাজিয়ে দিল প্লেটে। কাকা খাবার সঙ্গে দিয়েছিলেন। অনেক পীড়াপীড়িতেও নিজে কিছু খেল না। কথা বলল অনেক। ধীলনের ভাগ্যে

শর্মাকে কে মেরেছিল তা ও জানে না। ও তো ভয়ের চোটে আসতই না। গ্রামের লোকরা থাকতে দিল না বলে যাওয়া আসা করছে।

বসার ঘরে ওরা শুয়ে পড়ে। ঘুম কি আসতে চায়? এখন তো ঝারোয়ার বাংলোর রহস্যের সব সমাধানই মিলেছে। মেয়েটির গল্পের মধ্যে যে সব ফাঁকফোকর আছে তা ওদের এখন কিছু কানে বাজছে না। মেয়েটির চাউনি এত কাতর, গলার স্বর এমন কান্নায় ভরা!

হঠাৎ মেয়েটি কেঁদে উঠেছিল। ছুটে এসেছিল। বাবুজী, বাবুজী! মেয়ে আমার নেতিয়ে পড়ছে কেন? একটু দেখ না গো? এমন রাতে আমি কি করি, কোথায় যাই?

ধড়ফড় করে ওরা উঠে যায়, ছুটে যায়। সত্যিই, বাচ্চাটা, তিন-চার মাসের বাচ্চাটা যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। বাদল সামনে ছিল, পাগলিনীর মতো বাচ্চার মা বাদলের হাত ধরে টানতে থাকে।

এস বাবুজী, গায়ে হাত দিয়ে দেখ, বল আমার মেয়ে বেঁচে আছে।

হতভম্ব বাদল এগিয়ে যায় কাছে। আর যে বাচ্চাটা মরার মত পড়েছিল এতক্ষণ, সে হঠাৎ খলখল করে হেসে বিছানা ছেড়ে যেন ভেসে উঠে আসে, বাদলের গলায় মুখ লাগায়, চুষতে থাকে কি যেন। বাদলের গলার স্বর আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যায়। চোখ হয় বিস্ফারিত। মইনুরা এক পা নড়তে পারে না। এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে। মেয়েটি বাদলকে ধরে থাকে আর একেবারে মমতাময় মাতৃষী মায়ের গলায় বলতে থাকে, খেয়ে নে সোনা, খেয়ে নে মণি, খেয়ে নে…

সোনাম এই ভয়ঙ্করতার অভিশাপ কাটিয়ে বাদলের রাইফেলটা এনে পরপর গুলি করেছিল মেয়েটির উপর। মেয়েটি একটুকু নড়ে নি। বাচ্চাটাকে ও একসময়ে কোলে নিয়ে নেয়, বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। বাদল পড়ে যায়।

রাইফেলের শব্দে সুজা সিং ও কাকা এসে পড়েন। তারপর সব অস্পষ্ট। ধোঁয়াটে, গোলমেলে। ওদের চারজনকেই হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। বাদল অবশ্য জীবিত ছিল না।

তারপর ওরা একদিন ফিরে আসে।

ঝারোয়ার জঙ্গলের নাম ওরা কখনো করে না। কিন্তু খুব ছোট শিশু দেখলে ওরা ভীষণ ভয় পায় আজও। জীবনেও এ আতঙ্ক ওদের কাটবে না।

ঝারোয়ার জঙ্গলে এরপর আর কেউ ঢোকেনি।

পিশাচ

মঞ্জিল সেন

ডাক্তারি জীবনে বহু রোগীর সংস্পর্শে আসতে হয়েছে আমাকে ; বিচিত্র মন, বিচিত্র চরিত্রে মানুষ দেখেছি, তাই এখন আর নতুন কোন রোগী আমার মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কিন্তু রাঘব সামন্তকে দেখেই কেন জানি আমি বেশ একটা ধাক্কা খেলাম। আমার মনে ঠিক অনুভূতিটা বুঝিয়ে বলা মুশকিল—কেমন যেন গা ঘিনঘিন আর গা শিরশির করা অনুভূতি যেন একটা জীবন্ত মৃতদেহের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি।

গোড়া থেকেই শুরু করি। আমার চেম্বারের কিছু দূরেই একটা মেসবাড়ি। ওখানকার কি বাসিন্দা আমার রোগী, মাঝে মাঝে তাই ওখানে যেতে হয় আমাকে। হঠাৎ একদিন বর্ষার রাতে ফাঁকা চেম্বারে বসে উঠব উঠব করছি, এমন সময় মেসের মালিক স্বয়ং হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন দিন কয়েক হল এক নতুন বোর্ডার এসেছেন তাঁর মেসে, ভদ্রলোক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন গুরুতর কিছু বলেই মনে হচ্ছে, আমাকে এখুনি যেতে হবে। যেতে হল।

ছোট্ট একটা চিলেকোঠা ঘরে রোগী শুয়ে আছে। পরে মেসের মালিকের মুখে শুনেছিলা ভদ্রলোক কারো সঙ্গে ঘর ভাগাভাগি করে থাকতে চাননি, যত ছোট বা খারাপই হোক না কেন, ঘরটা সম্পূর্ণ তাঁর চাই, তার জন্য যত বেশি টাকা দিতে হোক না কেন, তিনি রাজী। তেমন কোন ঘর ছিল না, শেষ পর্যন্ত চিলেকোঠা ঘরটার জঞ্জাল পরিষ্কার করে ভদ্রলোককে দেয়া হয়। তিনি খুশি হয়েছিলেন।

ভদ্রলোক মেসে আসার পর থেকে এ ক'দিন কোথাও বেরোননি। কারো সঙ্গে বিশেষ একটা কথাও বলেননি। ওই ছোট্ট ঘরে দরজা বন্ধ করে নিজেকে যেন বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চেয়েছেন। মেসের চাকর ঘরে খাবার দিয়ে আসে, খাবার জন্যে নিচেও নামেন না তিনি।

আজ একটু আগে রাতের খাবার দিতে গিয়ে ছোকরা চাকর দেখে, ভদ্রলোক মাটিতে পড়ে আছেন—মুখটা হাঁ হয়ে আছে, দু'চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। তার চিৎকারে লোকজন ছুটে

আসে। নাড়ীর গতি এত মৃদু যে, মনে হয় জীবন-মরণের একটা লড়াই চলছে। ভয় পেয়ে মালিক ভদ্রলোক ছুটে এসেছেন আমার কাছে। মেসে কেউ মারা গেলে সেটা মেসের পক্ষে বদনাম, তাই তাঁর দুর্ভাবনাটাই বেশি।

মালিকের সঙ্গে তাঁর মেসবাড়িতে যেতে হল। যদিও আগে অনেকবারই এখানে এসেছি, কিন্তু চিলেকোঠায় কখনো আসিনি। সত্যিই একচিলতে ঘর। তক্তপোশের ধারে মাটিতে যিনি পড়ে আছেন, তাঁকে দেখে আমি চমকেই উঠলাম, সারা শরীরে কেমন একটা শিহরণ বয়ে গেল।

মাথার চুলের ডান দিকটা ধবধবে সাদা, কিন্তু বাঁ দিকটা কালো। মুখে অসংখ্য বলিরেখা। অথচ আমার মনে হল, ভদ্রলোককে যত বুড়ো দেখাচ্ছে, তত বুড়ো নন তিনি, অকালে বুড়িয়ে গেছেন। গায়ের রং ফ্যাকাশে, যেন কেউ রক্ত শুষে নিয়েছে। কেমন যেন একটা মৃত্যুর গন্ধ, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

ভদ্রলোকের শরীর বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে পরীক্ষা করে আমি কিন্তু রোগটা কি, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। প্রথমে ভেবেছিলাম হার্ট অ্যাটাক, কিন্তু ব্লাডপ্রেসার স্বাভাবিক। নিজের বিদ্যে-বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতায় মনে হল, ওসব ব্যাপার নয়। যা হোক, তখনকার মত চাঙ্গা করে তোলবার মত ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করলাম। ভদ্রলোক পরদিনই খাড়া হয়ে উঠলেন। আমি একটু অবাকই হলাম। আগের রাত্রে অমন একটা অবস্থার পর এত তাড়াতাড়ি তিনি সামলে উঠবেন, এ আমি আশাই করতে পারিনি। যা হোক, পরদিন তাঁকে দেখতে যেতেই, তিনি আমাকে বসতে বললেন। আমি লক্ষ্য করলাম, ভদ্রলোকের চোখের সাদা অংশটা একটু বেশি প্রকট, চাউনিতে কেমন একটা অস্থিরতা। আমাকে তিনি একদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছেন দেখে, আমার অস্বস্তি হতে লাগল। সেটা কাটাবার জন্যে আমি তাঁকে পরীক্ষা শুরু করলাম। সব কিছুই স্বাভাবিক।

আমার পরীক্ষা শেষ হতেই ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'আপনি ডাক্তার?'

প্রশ্নটা শুনে আমি থতমত খেলাম। আমার গলায় স্টেথিস্কোপ, হাতে ব্লাডপ্রেসার মাপার যন্ত্র, এতক্ষণ যত্ন করে পরীক্ষা করলাম, তারপরেও অমন প্রশ্নের কারণ কি হতে পারে।

ভদ্রলোক নিজেও বোধ হয় প্রশ্নটার অসারতা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই বললেন, 'মানে...আমিও একসময় ডাক্তার হবার স্বপ্ন দেখতাম, বছর তিনেক পড়েও ছিলাম।'

'তাই নাকি!' আমি এবার কৌতূহল নিয়ে তাকালাম, 'ছেড়ে দিলেন কেন?'

'ছাড়তে হল...সে অনেক কথা।' ভদ্রলোক হঠাৎ আমাদের কথায় যেন ছেদ টানতে চাইলেন। আমি ইঙ্গিতটা বুঝে, ও প্রসঙ্গ নিয়ে আর এগোলাম না।

এ ঘটনার দিন তিনেক পর, ভদ্রলোক হঠাৎ আমার চেম্বারে এসে হাজির হলেন। বর্ষার রাত, সেদিনও চেম্বার বন্ধ করে উঠব উঠব করছিলাম। ভদ্রলোককে দেখে মোটেই খুশি হলাম না আমি, কেন, তা অবশ্য জানি না।

ভদ্রলোক এটা ওটা কথার পর আমার সম্বন্ধে নানান প্রশ্ন করতে লাগলেন। কোন্ মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করেছি, কোন্ কোন্ প্রফেসারের কাছে পড়েছি, আমার পরিচিতদের মধ্যে কারা ডাক্তার হিসাবে নাম করেছেন, এসব ব্যক্তিগত প্রশ্ন। বলা বাহুল্য, আমি বিরক্তিই বোধ করছিলাম। হঠাৎ ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, ডাক্তার অনাথ চৌধুরী নামে কাউকে চেনেন?'

'ডাক্তার অনাথ চৌধুরী!' আমি বেশ অবাক হয়েই বললাম, 'তিনি তো প্রথম সারির একজন সার্জেন। চিনতেন নাকি আপনি তাঁকে?'

'হ্যাঁ, একসময় আমার সঙ্গে তাঁর খুবই জানাশোনা ছিল।'

'কিন্তু ওঁর বয়স তো আপনার মত হয়নি...'

ভদ্রলোক হা হা করে হেসে উঠলেন : 'ওখানেই আপনার ভুল!' হাসি থামিয়ে তিনি বললেন, 'আমার চাইতে বয়সে উনি বেশ কিছু বড়ই হবেন। আমার শরীর ভেঙে পড়েছে, তাই বেশি বয়স দেখায়... নয়তো আমারও একসময় জোয়ান চেহারা ছিল। হ্যাঁ, বেশ ভাল রকমই জোয়ান চেহারা ছিল আমার।'

আমার দৃষ্টিতে বোধ হয় অবিশ্বাসের ছাপ ফুটে উঠেছিল, তা লক্ষ্য করে ভদ্রলোক বললেন, 'না, আমি আপনাকে ধোঁকা দিচ্ছি না।' তারপরই একটু মুচকি হেসে বললেন, 'যদি অনাথ চৌধুরীর সঙ্গে

দেখা হয়, তবে জিজ্ঞেস করবেন, রাঘব সামন্তের স্বাস্থ্য কেমন ছিল।' বলেই আবার হা হা করে হেসে উঠলেন।

বিশ্রী হাসি। আমার কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল। রাত হয়ে যাচ্ছে বলে উঠে পড়লাম।

এর পর রাঘব সামন্ত মাঝে মাঝে আমার চেম্বারে আসতেন। ভিড় থাকলে এক কোণে চুপ করে বসে থাকতেন। সবাই চলে যাবার পর আমার মুখোমুখি বসে শুরু করতেন নানান কথা। একদিন হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, আপনারা তো হাল আমলের ডাক্তার, আপনাদের সময় কাটা-ছেঁড়ার জন্য ডেডবডির বোধ হয় তেমন অভাব ছিল না।' তারপর নিজেই সে প্রশ্নের জবাব দিলেন, 'হবেই বা কি করে, আজকাল কথায় কথায় লোকে ছুরি চালায়, বোমা মারে। মানুষ মারা এখন ডাল-ভাত হয়ে গেছে। ডেডবডির অভাব নেই, অনেক ক্ষেত্রেই সেসব বডির কোন দাবিদার থাকে না, ফলে মেডিক্যাল স্টুডেন্টদের সুবিধে হয়েছে। আমাদের সময় এত খুন-জখম ছিল না, ডেডবডিও ছড়িয়ে পড়ে থাকত না। রীতিমত সমস্যা ছিল ডেডবডি পাওয়া, মাঝে মাঝে ডিসেকশান বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা হত।'

শরতের মাঝামাঝি রাঘব সামন্ত মারা গেলেন। সেবারেও মেসের ছোকরা চাকর সকালবেলার চা নিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে কোন সাড়া না পেয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, ভদ্রলোক মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন। মুখটা একটু হাঁ করা, কয়েকটা মাছি ভন্‌ভন্ করছে মুখের সামনে।

আমি চেম্বারে আসতেই আমার ডাক পড়ল। এবার কিন্তু আর ভুল ছিল না, ভদ্রলোক মারাই গেছেন এবং করোনারি অ্যাটাকেই মৃত্যু হয়েছে। সার্টিফিকেট লিখে দিতে আমি কোন দ্বিধা করলাম না।

পরের দিন মেসের মালিক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁর হাতে একটা বড় পুরু লেফাফা। ওটা তিনি আমার হাতে দিলেন। আমি লেফাফার ওপর লেখাটায় চোখ বুলিয়ে অবাক হলাম। লেখা আছে, ব্যক্তিগত, আমার মৃত্যুর পর এটা যেন ডাক্তার বিমল ব্যানার্জিকে দেওয়া হয়।

রাতে বাড়ি ফিরে আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে লেফাফাটা খুললাম। আমার স্ত্রী সুষমা, দিন কয়েকের জন্য বাপের বাড়ি গেছে, আমি একা।

প্রথমেই একটা চিঠি।

'প্রিয় ডাঃ ব্যানার্জি,

আপনি হয়তো ভেবে অবাক হচ্ছেন, এত লোক থাকতে আপনাকেই কেন আমি আমার জবানবন্দি শোনাবার জন্য বেছে নিলাম। আসলে, সত্যিই আমি একদিন ডাক্তার হতে চেয়েছিলাম। যদি আমার জীবনে ওলটপালট না ঘটত, কিংবা যদি ডাঃ অনাথ চৌধুরী আমার জীবনে শনি হয়ে দেখা না দিত, তবে হয়তো আজ আমি একজন সফল ডাক্তার হিসাবে মানুষের জীবন বাঁচাবার মহৎ পেশায় ব্যস্ত থাকতাম। কিন্তু শনি আর রাহু এই দুয়ের মিলন ঘটেছিল আমার ভাগ্যের ঘরে, তাই...যাক, সে কথা। আপনাকে দেখে আমার জীবনের স্বপ্নের কথা মনে পড়েছে, আপনাকে কেন জানি ভাল লেগেছে। তাই আমার জীবনের বিচিত্র কাহিনী আপনার হাতে দিয়ে গেলাম। যদি অবিশ্বাস হয়, তবে ডাঃ অনাথ চৌধুরীকে প্রশ্ন করতে পারেন, সেই সঙ্গে তার মানসিক প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্য করবেন। তবে সাবধান, তার পথ মাড়াবেন না, সে শুধু লোভী নয়, নিষ্ঠুর। কত বড় নিষ্ঠুর, তা এই কাহিনী থেকেই জানতে পারবেন।

আমার শুভেচ্ছা রইল।

ইতি—

রাঘব সামন্ত

আমার কৌতূহলের লাগামটাকে যেন সামলাতে পারছি না। পাতা উল্টে আসল কাহিনী শুরু করলাম।

'সে আজ অনেক বছর আগের কথা, যদ্দূর মনে পড়ে, সালটা ছিল ১৯৪৪। দেশ তখনো স্বাধীন হয়নি। ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে আমি ডাক্তারি পড়ি। ছোটবেলা থেকে চট করে কিছু বুঝে নেবার ক্ষমতা ভগবান আমাকে দিয়েছিলেন। তার ওপর ছিলাম পরিশ্রমী, মাস্টারমশাইদের মান্য করে চলতাম, তাই সহজেই তাঁরা আমার প্রতি সদয় হতেন, সহজেই বিশ্বাস করতেন আমাকে। ছাত্র

হিসাবেও খারাপ ছিলাম না। আমি যে একদিন ডাক্তারি পাশ করে বেরোব, ডাক্তার হব, এ বিষয়ে মাস্টারমশাইয়ের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না—আমার তো নয়ই।

'ডাক্তার পাল ছিলেন তখন অ্যানাটমি বিভাগের প্রধান। নামটা ইচ্ছে করেই আমি গোপন করলাম, কারণ তাঁর তখন দারুণ খ্যাতি, এ কাহিনীর সঙ্গে তাঁকে আর জড়াতে চাই না। মিটফোর্ড হাসপাতাল আর মেডিক্যাল স্কুল ছিল পাশাপাশি, একটা সরু রাস্তা মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। ওই রাস্তার ওপরেই একটা বাড়িতে থাকতেন ডাক্তার পাল। তখন ওই রাস্তায় আর কোন বাড়ি ছিল না। বাড়িটার সদর দরজা দিয়ে বেরোলে হাসপাতালের পাঁচিল আর খিড়কির দরজা দিয়ে বেরোলে মেডিক্যাল ইস্কুলের পাঁচিল। খিড়কির দরজার কয়েক হাত দূরে পাঁচিলের গায়ে একটা দরজা ছিল, ওটা দিয়ে ডাক্তার পাল মেডিক্যাল স্কুলে যাতায়াত করতেন, অনেকটা ঘুরপথ বেঁচে যেত। রাত্তিরে ওই দরজায় বাইরে থেকে তালা ঝুলত, আর তার চাবি থাকত ডাক্তার পালের কাছে। ওই দরজা দিয়ে ঢুকে খানিকটা গেলে, বাঁ দিকে টিনের ছাউনির টানা লম্বা একটা ঘর। ওখানেই অ্যানাটমি ক্লাস নিতেন ডাক্তার পাল। মড়া কাটা-ছেঁড়া করে সার্জারিতে হাত পাকাত তরুণ সব ছাত্ররা—ভাবী কালের শল্যচিকিৎসক।

'ডাক্তার পালের বাড়িটা বেশ বড়, আসলে ওটা ছিল হাসপাতালেরই সম্পত্তি। মেডিক্যাল ইস্কুলে পড়ানো ছাড়াও হাসপাতালের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। অ্যানাটমির সব কিছু দায়িত্ব, এমন কি কাটা-ছেঁড়ার জন্যে মড়া যোগাড় করার ভারও ছিল তাঁর ওপর। ডাক্তার পাল অবশ্য নিজে মড়া যোগাড় করতেন না, তার জন্যে অন্য লোক ছিল, একটা খরচও বরাদ্দ ছিল, কিন্তু তাঁকে সব কিছুর হিসেব রাখতে হত।

'আমি এসময় ডাক্তার পালের সুনজরে পড়ে গেলাম, তখন আমার সবে তৃতীয় বছর চলছে। অ্যানাটমি ক্লাসের সব দায়িত্ব আস্তে আস্তে তিনি আমার ওপর ছেড়ে দিতে লাগলেন। ঘরটা ছিল লম্বা। ওই ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ছাত্রদের মধ্যে ঠিকমত লাশ ভাগ করে দেওয়া, ঠিকমত হিসেব রাখা এবং যারা লাশ নিয়ে আসে তাদের পাই-পয়সা চুকিয়ে দেওয়া, এসবই তিনি আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

'একটা কথা আগেই বলে রাখি। বৈধভাবে কাটা-ছেঁড়ার জন্যে যে লাশ আমরা পেতাম, তা মোটেই পর্যাপ্ত ছিল না, ফলে প্রায়ই আমাদের চোরা পথে ওটা সংগ্রহ করতে হত, না করে উপায় ছিল না। এসব কিন্তু আসত গভীর রাতে। ডাক্তার পালের খিড়কির দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ থেকে বুঝে নিতে হত যে চালান এসেছে। যারা নিয়ে আসত, তাদের দিয়েই ডিসেকশান রুমে বডিটা নিয়ে, তাদের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে আবার পাঁচিলের দরজাটা বন্ধ করে দেবার কাজটা আমার ওপরেই পড়ল। একটা খাতায় হিসেব লিখে রাখতে হত, আর যারা শব নিয়ে আসত, তাদের পাওনা মেটাবার জন্য একটা টিনের বাক্সে সব সময় বেশ কিছু টাকা জমা থাকত। এ প্রসঙ্গে আরো একটা কথা বলা ভাল, যারা মড়া নিয়ে রাতের আঁধারে চুপি চুপি আসত, তাদের চেহারা এক নজরে দেখেই বুঝতে অসুবিধে হত না যে, তারা অন্ধকার জগতের মানুষ, খুন রাহাজানি এসবই তাদের পেশা। প্রথম প্রথম আমার ভয় করলেও, পরে ব্যাপারটা আমার গা সয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া দরদস্তুরের পর পাওনা টাকা হাতে নিয়ে যখন তারা আমাকে সেলাম করত, তখন আমার নিজেকে খুব শক্তিমান পুরুষ বলেই মনে হত। ডাঃ পাল আমাকে তাঁর বাড়ির একতলায় থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আগেই বলেছি বড় বাড়ি, ডাক্তার পালের পরিবারের লোকজন কম থাকায় একতলাটা প্রায় খালিই পড়ে ছিল, বিশেষ করে খিড়কির দরজার দিকের অংশটায় আমি ছাড়া আর কেউ থাকত না।

'ব্যবস্থাটা যে আমার পক্ষে খুব সুখকর হয়েছিল, তা মোটেই নয়। শীতকালে গভীর রাতে কিংবা ভোর রাতে কড়া নাড়ার শব্দে আমাকে বিছানা ছেড়ে উঠতে হত। ঘুম জড়ানো চোখে হাতড়ে হাতড়ে ঘরের আলো জ্বালিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে আসতাম। আমার সামনে দাঁড়িয়ে কদর্য চেহারার গুণ্ডাশ্রেণীর লোক, তাদের সঙ্গে রয়েছে, 'মাল', যা দিয়ে সাজানো হবে শবব্যবচ্ছেদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড টেবিল, শিক্ষানবিসী ছাত্ররা ওই 'মাল' কাটা-ছেঁড়ার করে হাত পাকাবে, ভবিষ্যতে জীবিত মানুষের ওপর প্রয়োগ করবে আজকের অর্জিত বিদ্যা। যারা মাল নিয়ে আসত, তাদের পয়সা-কড়ি মিটিয়ে

তাদের দিয়েই আমি ডিসেকশান রুমে ওগুলো তুলতাম। তারপর ওরা চলে গেলে একা কিছুক্ষণ থাকতে হত আমাকে ওই ঘরে, যেখানে সাজানো রয়েছে পাশাপাশি মৃতদেহ, আর বিরাজ করছে একটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা, হয়তো বা কবরের নিস্তব্ধতা। মেডিক্যাল ইস্কুলের প্রধান দালান থেকে ওটা ছিল বেশ খানিকটা দূরে, তাই নির্জনতাও ছিল যথেষ্ট। একা একা ওখানে ওগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার যে গা ছমছম করত না, এ কথা বললে মিথ্যে বলা হবে, মনে হত ওরা যেন সব আমাকে লক্ষ্য করছে। তারপর একসময় ওই ঘরের তালা বাইরে থেকে লাগিয়ে আমি ফিরে আসতাম আমার ঘরে, নষ্ট ঘুম পুষিয়ে নেবার জন্য আবার আশ্রয় নিতাম বিছানায়।

'এইভাবে কাটছিল আমার দিন আর রাত। সাধারণ চোখে আমার তখনকার জীবন মোটেই হিংসে করার মত মনে না হলেও, মেডিক্যাল ছাত্রদের কাছে আমি কিন্তু হিংসের পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ডাঃ পালের আমার প্রতি সদয় ভাবটা তারা পক্ষপাতিত্ব বলেই মনে করত। বিশেষ করে অ্যানাটমি ক্লাসের সম্পূর্ণ ভার আমার ওপর তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন বলে অনেকের যে চোখ টাটাত, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। কাটা-ছেঁড়ার জন্য তাদের মধ্যে লাশ ভাগ করে দেবার ব্যাপারে আমি যে একটু মাতব্বরী করতাম না, কিংবা যারা এ ব্যাপারে আমার অনুগ্রহপ্রার্থী ছিল, তাদের প্রশ্রয় দিতাম না, এ কথা বললে মিথ্যে বলা হবে।

'এ ধরনেব জীবনে মানুষ স্বার্থপর হয়ে ওঠে এবং নিজের ছাড়া অপরের ভালর ব্যাপারে একেবারেই মাথা ঘামায় না বলেই আমার বিশ্বাস। আমার অভিজ্ঞতাও তাই বলে। ডাঃ পালের অনুগ্রহভাজন হবার ফলে আমি নিজের আখেরটা গুছিয়ে নেবার কথা ভাবতে শুরু করেছিলাম। বিবেকহীন, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এক যুবক। দিনে দিনে ডাক্তার পালের আমি ডান হাত হয়ে উঠলাম, আমাকে ছাড়া তাঁর চলে না। অ্যানাটমির প্রফেসর হিসাবে তাঁর তখন যথেষ্ট খ্যাতি, কিন্তু তাঁর খুব কাছাকাছি এসে আমার জানতে বাকি ছিল না যে, তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার পেছনেও আছে ঘোর স্বার্থপরতা আর বিবেকবর্জিত কার্যকলাপ। সারা দিনের খাটুনির পর তিনি আনন্দ লাভের জন্য এমন কয়েকটি বিশেষ বিশেষ জায়গায় যেতেন, যেখানে সুন্দরী রমণী আর বিলিতি সুরার অভাব ছিল না। কতদিন গভীর রাতে পানোন্মত্ত তাঁকে সদর দরজার সামনে থেকে তুলে এনে আমি ঘরে শুইয়ে দিয়েছি, তার হিসেব নেই। যাক, সে অবান্তর কথা।

'এদিকে ব্যবচ্ছেদের জন্য নিয়মিত শব সংগ্রহ করা একটা ঘোর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অ্যানাটমির ক্লাসে ছাত্রর সংখ্যা কখনো কম থাকত না, তাদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে এক একটি দেহ দেয়া হত, তারা পালা এবং ভাগাভাগি করে সেই বস্তুটির ওপর ছুরি চালাত, কিন্তু তাতেও অনেক সময় চাহিদা মেটানো যেত না। ফলে মাঝে মাঝে একটা বিচ্ছিরি আর অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হত, ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ লেগেই থাকত। এ সমস্যা সমাধানের জন্য বাইরের গোপন চালানের ওপর আমাদের বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হচ্ছিল আর তার ফলটাও বিপজ্জনক হয়ে ওঠার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। লাভজনক এই ব্যবসার কারবারীরা মাল সংগ্রহের জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠছিল, এবং সেটা যে সমাজের পক্ষে শুভ নয়, তা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না। ডাক্তার পালের এ ব্যাপারে একটা নীতি ছিল, যারা মাল সরবরাহ করে, তাদের কোন প্রশ্ন করবে না। তারা কোথা থেকে বস্তুটা সংগ্রহ করেছে কিংবা কিভাবে করেছে, তা জানার দরকার নেই। 'ওরা লাশ নিয়ে আসে, আমরা টাকা দিয়ে কিনি।' তিনি বলতেন, 'দু'পক্ষই লাভবান, সুতরাং প্রশ্ন করো না।'

'খুন করে লাশ নিয়ে আসা হয়েছে, এমন প্রশ্ন ওঠার সম্ভাবনা ছিল না। ডাক্তার পালের কাছে কেউ এ ব্যাপারে ইঙ্গিত করলে, তিনি যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠতেন। কিন্তু এমন একটা ব্যাপারে তাঁর হালকা কথার ধরন থেকেই বোঝা যেত, এ বিষয় নিয়ে আলোচনা তিনি মার্জিত রুচির পরিচয় বলে মনে করতেন না। অনেক সময় আমি লাশ দেখে চমকে উঠেছি—টাটকা মৃতদেহ, যেন সদ্য মারা গেছে। যারা রাতের অন্ধকারে ওগুলো নিয়ে আসত, তাদের ভয়াবহ চেহারা দেখেও কত সময় আমি শিউরে উঠেছি। অনেকবার মনে হয়েছে ডাক্তার পালকে আমার সন্দেহের কথা বলি, কিন্তু এতকাল এ ব্যাপারটা কি তাঁর চোখ এড়িয়ে গেছে, না ইচ্ছে করেই তিনি চোখ বুজে ছিলেন, এটা বুঝতে না পেরে শেষ পর্যন্ত চুপ করে থাকাটাই আমি উচিত মনে করেছিলাম। আমার কাজ হল, যে বস্তুটা আনা হচ্ছে তা গ্রহণ করা, দাম চুকিয়ে দেওয়া, আর অপরাধের কোন চিহ্ন থাকলে চোখ ফিরিয়ে

রাখা। এ ব্যাপারে আস্তে আস্তে আমি পোক্ত হয়ে উঠতে লাগলাম।

'পৌষ মাসের এক ভোর রাতে আমার এই চুপ করে থাকা বা চোখ ফিরিয়ে রাখার চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে গেল। সে রাতের কথা আমি ভুলব না।

দাঁতের যন্ত্রণায় ঘুম আসছিল না, বিছানায় ছটফট করছিলাম। রাত দুটোর পর একটু তন্দ্রা এল। ঘন্টাখানেক বোধ হয় ঘুমিয়েছিলাম, বেশ কয়েকবার কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। যে বা যারা কড়া নাড়ছে, বেশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। আকাশে চাঁদের পাতলা আলো, শীতের রাতে হিমেল হাওয়া, সারা শহর ঘুমিয়ে। যারা এসেছিল, তারা একটু দেরি করেই এসেছে। কিন্তু চলে যাবার জন্যে যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ঘুমে আমার চোখ ভেঙে আসছিল, কোনমতে দরজা খুলে তাদের সামনে দাঁড়ালাম। ঘুমের তখনো রেশ কাটেনি, মনে হল ওরা যেন গজগজ করছে। লাশ-কাটা ঘরে বস্তা সমেত মালটা ওরা বয়ে নিয়ে গেল। একটা টেবিলে সেটাকে ফেলে বস্তাটা সরিয়ে নিতেই, ঘরের আলো এসে পড়ল ওটার মুখের ওপর, আর আমি ভীষণ চমকে উঠলাম। দু'পা এগিয়ে একটু ঝুঁকে ভাল করে দেখে বললাম, এ কি কাণ্ড, এ যে মালতী !

'যে লোকদুটো বস্তায় মৃতদেহটা পুরে নিয়ে এসেছিল তারা কোন জবাব দিল না, কিন্তু যেন একটু সচকিত ভাবে দরজার দিকে সরে গেল।

'আমি মেয়েটিকে চিনি। —আমি এবার বেশ জোর দিয়েই বললাম, বাংলাবাজারে ওদের বাড়ি। সন্ধেবেলাও আমি ওর সঙ্গে কথা বলেছি। মেয়েটি যে আধা গেরস্ত, এবং ওর ওখানে আমার যাতায়াত ছিল, তা আর আমি খুলে বললাম না।...সন্ধেবেলা বেঁচে ছিল, কি করে মারা গেল ! তোমরা অন্যায় ভাবে এর লাশ এনেছ, কোন অসুখে ও মারা যায়নি।

'আপনি ভুল করতাছেন কত্তা—, ওদের একজন বলল, আপনার দিষ্টিবেভ্যম হইছে।

'দ্বিতীয়জন কিন্তু বিচ্ছিরি ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে তখুনি টাকা দাবি করল।

'লোকটার গলায় একটা অমঙ্গলজনক স্বর আমার কান এড়াল না, ভয় পেলাম। ওই নির্জন ঘরে আমাকে মেরে ফেলে রেখে গেলে, আমার কিছুই করার থাকবে না, হয়তো দিনের বেলা কোন টেবিল শোভা করে একজন ছাত্রের আমি হাত পাকাবার বস্তু হয়ে দাঁড়াব। আমি আমতা আমতা করে কিছু একটা বললাম, তারপর তাদের নিয়ে চলে এলাম ডাক্তার পালের বাড়িতে। ওদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ঘরের ভেতর থেকে টাকা গুণে এনে হাতে তুলে দিলাম। ওরা চলে যেতেই আমি তাড়াতাড়ি ফিরে গেলাম লাশকাটার ঘরে। মেয়েটার শরীরে কতগুলো মারাত্মক আঘাতের চিহ্ন আমার চোখে পড়ল, আর আমি থরথর করে কেঁপে উঠলাম। আমার সন্দেহ মিথ্যে নয়। কোনমতে পালিয়ে এসে আমি আমার ঘরে আশ্রয় নিলাম। পরে একটু শান্ত হবার পর আমি ভাবতে শুরু করলাম। ডাক্তার পালের উপদেশটা আমার মনে পড়ে গেল। আরো একটা কথা চিন্তা করলাম, যারা এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে আছে, আমি যদি তাদের বাধা হয়ে দাঁড়াই, তবে আমার পক্ষে সেটা খুব নিরাপদ হবে না। ওই শয়তানগুলো খুনে, নৃশংস। যা হোক, পরের দিন এ ব্যাপারে ডাক্তার পালের সহকারীর সঙ্গে কথা বলব, ঠিক করলাম।

'সহকারীটি হল একজন তরুণ ডাক্তার, নাম অনাথ চৌধুরী। সুপুরুষ এই তরুণ ডাক্তারটি ছাত্রমহলে তখন খুব প্রিয়। চতুর, ফিটফাট আর উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির, কিন্তু কথার চটকে অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করার অসাধারণ তার ক্ষমতা। দেশ-বিদেশেও ঘুরেছে, বিলেত থেকে ডাক্তারি পাশ করে এসেছে, তাই অল্প বয়সেই ছড়িয়ে পড়েছে নাম। তাছাড়া নাটক, অভিনয়, খেলাধূলা, সব কিছুতেই চৌকস। ছাত্রদের সঙ্গে সমানে মিশে যাবার একটা প্রবণতাই তাকে অত জনপ্রিয় করে তোলার মূলে।

'আমার সঙ্গে তার যথেষ্ট দহরম মহরম ছিল। আগেই বলেছি আমি ডাঃ পালের ডান হাত হয়ে উঠেছিলাম, আর অনাথ চৌধুরী ছিল তাঁর সহকারী, সুতরাং কাজকর্মের ব্যাপারে আমাদের খুব কাছাকাছিই থাকতে হত। যখন শবব্যবচ্ছেদের বস্তুর অভাব পড়ত, তখন আমাদের দুজনকে এ-বিষয়ে শলা-পরামর্শ করে একটা উপায় বার করতে হত। ডাক্তার পালকে এ ব্যাপার নিয়ে আমরা বিব্রত করতে চাইতাম না, তিনিও আকারে ইঙ্গিতে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে এই সামান্য ব্যাপারে তাঁকে যেন আমরা বিরক্ত না করি।

'সেদিন ডাক্তার অনাথ চৌধুরী একটু আগেই হাসপাতালে এসেছিল। আমি তাঁকে রাতের ঘটনা বললাম, আমার সন্দেহের কথা জানাতেও ভুল করলাম না। মৃতদেহের ক্ষতচিহ্নগুলি পরীক্ষা করে অনাথ চৌধুরী ঘাড় দোলালো, বলল, হুঁ, ব্যাপারটা সন্দেহজনক।

'আমি এখন কি করব ?—আমি প্রশ্ন করলাম।

'করবে ?—ডাক্তার আমার কথাটাই যেন আবার আওড়াল : কিছু করতে চাও নাকি তুমি ? কোন ব্যাপার নিয়ে যত কম ভাবা যায়, তত তাড়াতাড়ি সেটা মন থেকে মুছে যায়, এমন একটা প্রবাদ বাক্য শুনেছিলাম যেন।

'কিন্তু মেয়েটিকে কেউ চিনে ফেলতে পারে,—আমি প্রতিবাদ না করে পারলাম না : আমার মত অনেকেই ওর চারপাশে ঘুরঘুর করত।

'আমরা আশা করব যে, কেউ ওকে সনাক্ত করবে না—, ডাক্তার চৌধুরী জবাব দিল, তবে কেউ যদি মেয়েটিকে চিনেই ফেলে—তুমি চিনতে পারোনি—ব্যস, ল্যাঠা চুকে গেল। আসল ব্যাপারটা হল, এ ধরনের ঘটনা অনেকদিন ধরে চলে আসছে। তুমি এ নিয়ে যদি নাড়াচাড়া কর, তবে ডাক্তার পালকে ভয়ানক ঝঞ্ঝাটে ফেলবে। তুমি নিজেও জড়িয়ে পড়বে...মানে, লাশ যোগান দেবার ব্যাপারে একটা চক্র আর ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তুমি, আমি—সবাই জড়িয়ে পড়ব। যদি আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় আমাদের দাঁড়াতে হয়, তবে জেরার মুখে কি অবস্থা হবে আমাদের ? তাছাড়া কাগজে কাগজে ফলাও করে সব কিছু ছাপা হলে, কি চোখে লোকে আমাদের দেখবে, সেটাও ভেবে দেখতে হবে। খাপ্পা হয়ে উঠবে না সবাই আমাদের ওপর ? তবে সত্যি কথাই যদি জানতে চাও, আমাদের বেশির ভাগ চালানই খুন-জখমের লাশ—

'ডাক্তার চৌধুরী !—আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম।

'আ-হা !—অনাথ চৌধুরী আমাকে খিঁচিয়ে উঠল, যেন তুমি নিজে ব্যাপারটা সন্দেহ করনি, এখন এমন ভান করছ যেন নতুন জানছ। যত্তো সব, হুঁ !

'সন্দেহ করা এক জিনিস—

'আর প্রমাণ করা অন্য জিনিস। হ্যাঁ, তা জানি আমি ; এটা এখানে এসে তোমাকে বড় ভাবিয়ে তুলেছে বুঝতে পারছি—, ছড়ি দিয়ে মালতীর নিশ্চল দেহটাকে মৃদু আঘাত করতে থাকে অনাথ চৌধুরী : সবচেয়ে ভাল হল এটাকে না চেনার ভান করা, তাই করব আমি।—খুব শান্তভাবে কথাগুলো বলল সে : তোমার যদি মন চায়, তবে স্বীকার করতে পার যে, একে তুমি চিনতে। আমি তোমাকে উপদেশ দিতে চাই না, কিন্তু আমার মনে হয়, যে কোন বুদ্ধিমান মানুষই আমার পথে চলবে। তবে একথাটাও বলে রাখি, ডাক্তার পাল নিজেও হয়তো চাইবেন যে, আমরা এই পন্থা গ্রহণ করি। তিনি কেন আমাদের দুজনকেই তাঁর সহকারী হিসাবে বেছে নিয়েছেন, সে কথাও তোমাকে আমি ভেবে দেখতে বলব। নিশ্চয়ই মুখ দেখে তা করেননি তিনি, আমাদের কাজ-কর্মে তাঁর আস্থা জন্মেছিল, এ ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে আমরা পারব বলেই তিনি আশা করেন।

'এরপর বিষয়টা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, তা বুঝতে আমার দেরি হল না। তাছাড়া নিজের ভবিষ্যৎ আমাকে ভাবতে হবে না !

'মালতীর দেহটা কাটা-ছেঁড়া হয়ে গেল, কেউ তাকে নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলল না, আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

'এরপর ডাক্তার অনাথ চৌধুরীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। একদিন সন্ধের পর আমি নবাবপুরে একটা রেস্তোরাঁয় গেছি। একটা টেবিলে দেখলাম চৌধুরী একজন লোকের সঙ্গে বসে আছে। ছোটখাটো একজন মানুষ, ফ্যাকাশে গায়ের রং, চোখদুটো কয়লার মত কালো। লোকটির হাবভাব বা বেশভূষায় তাকে অতি সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। যেন গেঁয়ো মানুষ, চেহারায় রুক্ষতাই ফুটে উঠেছে, কিন্তু চৌধুরীর মত একজন চৌকস মানুষের ওপর তার প্রভাব দেখে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। যেন তার হুকুম তামিল করার জন্য চৌধুরী ব্যস্ত। কথায় কথায় চৌধুরীকে সে ধমকাচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়ে চৌধুরী হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল, আমি কাছে যাবার পর সেই লোকটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল, তাই এই অদ্ভুত ব্যাপারটা নজরে এসেছিল আমার। লোকটির নাম গোবিন্দ বসাক। তার সম্বন্ধে আর কিছু অবশ্য

চৌধুরী খুলে বলল না, আমার কৌতূহল সত্ত্বেও আমাকে চুপ করে থাকতে হল। গোবিন্দ বসাক কিন্তু কেন জানি না, আমার ওপর হঠাৎ খুব সদয় হয়ে উঠল। রেস্তোরাঁর একজন ছোকরাকে ডেকে আমার জন্যে মুর্গীর মাংস আর পরোটার হুকুম দিল। তারপর এই অল্প পরিচয়েই আপনা থেকে নিজের বিগত জীবন সম্বন্ধে বলে গেল অনেক কথা। তার বক্তব্যের দশ ভাগের এক ভাগও যদি সত্যি হয়, তবে সে যে একটি পাষণ্ড এবং আস্ত বদমাশ—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। নিজের দুষ্কর্মের কাহিনী শোনাতে শোনাতে তার চোখে মুখে ফুটে উঠছিল গর্বের ছাপ।

'আমি খুব খারাপ লোক—, গোবিন্দ বসাক মন্তব্য করল : কিন্তু চৌধুরীর কাছে শিশু। ও হল সাক্ষাৎ শয়তান, ওর আমি নাম দিয়েছি শয়তান চৌধুরী। ওহে শয়তান, তোমার বন্ধুর জন্য আরেক প্লেট মাংসের অর্ডার দাও না। শয়তান কিন্তু মনে মনে আমাকে ঘেন্না করে—, তারপরই চৌধুরীর দিকে ফিরে বলল, হ্যাঁ, শয়তান বাবু, আমি জানি তুমি আমাকে ঘেন্না কর।

'আমাকে ওই বিচ্ছিরি নামে ডেকো না !—চাপা গর্জন করে উঠল চৌধুরী।

'শোন ওর কথা—, গোবিন্দ বসাক হো হো করে হেসে উঠল। বলল, ছুরি মারামারি দেখেছেন ? আমার সমস্ত শরীরে ছুরির কোপ বসাতে পারলে ও খুশিই হবে।

'আমরা যারা ডাক্তারি পড়ছি, তাদের অন্য উপায় আছে। —আমি মন্তব্য না করে পারলাম না : আমরা যাকে পছন্দ করি না, তাকে ফালা ফালা করে কাটা-ছেঁড়া করি।

'চৌধুরী মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল, ওর দু'চোখে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি !

'বেশ অনেকক্ষণ আমরা ওই রেস্তোরাঁয় কাটালাম। বসাক নিজেও কয়েকবার এটা ওটা খাবারের অর্ডার দিল, চৌধুরীকেও সমানে হুকুম করল মুখরোচক খাবার অর্ডার দেবার। মাঝখান থেকে আমার ভুরিভোজটা ভালই হল। আমরা যখন উঠব উঠব করছি, রেস্তোরাঁর ছোকরাটি মোটা একটা বিল এনে আমাদের টেবিলে রাখল। ওটাতে চোখ না বুলিয়েই বসাক আঙুলে টোকা মেরে ওটা চৌধুরীর দিকে ঠেলে দিল। আমি দেখলাম, চৌধুরীর মুখটা যেন কেমন হয়ে গেল। প্রচণ্ড রাগ আর বাধ্যতা এই দুই পরস্পর বিরোধী অভিব্যক্তি ফুটে উঠল তার মুখে। অতগুলো টাকা ওকে একা দিতে হবে, এটা যেন সে বরদাস্ত করতে পারছে না, কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস নেই।

'সেদিন ফিরতে একটু রাতই হল। চৌধুরী আর বসাক ধরল এক রাস্তা আর আমি অন্য রাস্তা। পরদিন চৌধুরী ক্লাসে কিংবা হাসপাতালে এল না। আমি মনে মনে হাসলাম, গতকাল রাত্তিরের টাকার শোক ও এখনো ভুলতে পারেনি। কিংবা হয়তো গোবিন্দ বসাকের সঙ্গে কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। গোবিন্দ বসাক যেভাবে ওকে হুকুম করছিল, হুকমু তামিল হতে একটু দেরি হলে তিরিক্ষি মেজাজ করে উঠছিল, তা থেকে আমি ধরে নিয়েছিলাম, ভেতরে কোন ব্যাপার আছে। হয়তো চৌধুরীর কোন কুকীর্তির কথা বসাক জানে, তাই চৌধুরীকে সব সময় তটস্থ থাকতে হয়।

'সেদিন সন্ধের পর আমি আবার ওদের দুজনের খোঁজে গতকাল রাত্তিরের রেস্তোরাঁয় হানা দিলাম, কিন্তু ওদের দেখা পেলাম না। আরো কয়েকটা সৌখিন রেস্তোরাঁয় উঁকি মেরে দেখলাম, ওরা নেই। আমি আর রাত করলাম না, ফিরে এলাম। ভোর রাত চারটের সময়, সুপরিচিত সেই কড়া নাড়ার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলেই আমি থ। চৌধুরী তার পুরোন মডেলের ঝরঝরে অস্টিন গাড়িটা এনে দাঁড় করিয়েছে ওই গলির মধ্যে, একেবারে খিড়কির দরজার সামনে। আমি দরজা খুলতেই, সে একটা বস্তা টেনে বার করল—আমার পরিচিত বস্তা।

'কি ব্যাপার !—আমি একটু চেঁচিয়েই উঠলাম, আপনি একাই মালের খোঁজে বেরিয়েছিলেন ? একা সামলালেন কি করে ?

'চৌধুরী যেন ধমকে আমাকে থামিয়ে দিল, তারপর পাঁচিলের গায়ের দরজাটা খুলতে বলল। দরজার তালা খোলবার পর বস্তাটা দুজনে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে গেলাম। অ্যানাটমি ক্লাসটা দালান থেকে বেশ দূরে। তবে পাঁচিলের গায়ের ওই দরজা দিয়ে ঢুকলে ডাক্তার পালের খিড়কি থেকে তেমন একটা দূর নয়। সব দিক বিবেচনা করেই বোধ হয় ওই বাড়িটা অ্যানাটমির প্রধানের জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছিল। বস্তাটা টেবিলের ওপর রাখার পর চৌধুরী চলে যাবার জন্য ফিরল, তারপর একটু ইতস্তত করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি বরং মুখটা একবার দেখে নাও। হ্যাঁ, মুখটা তুমি একবার দেখেই নাও—, যেন নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে কথাটা সে বলল।

'কিন্তু কোথায় এটা পেলেন ? কেমন করে ? কখন ?—আমি না বলে পারলাম না।

'মুখের দিকে তাকাও !—জবাব এল।

'আমার কেমন যেন ভয় করতে লাগল। ডাক্তার চৌধুরী অমন করছে কেন ! আমি একবার তার মুখের দিকে, আরেকবার বস্তাটার দিকে তাকাতে লাগলাম। তারপর একসময় বস্তাটা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলতেই টেবিলের ওপর যে নগ্ন দেহটা আমার চোখের সামনে জেগে উঠল, সেটা দেখে আমি আঁৎকে উঠলাম। এক রাত আগে যার সঙ্গে বসে খানাপিনা আর গল্প করেছি, সেই গোবিন্দ বসাকের লাশ আমার সামনে। চোখদুটো আধবোজা, মুখে যেন একটা বিকৃত হাসি, বীভৎস সে দৃশ্য। আমি চৌধুরীর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না, আতঙ্কে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল।

'চৌধুরীই পেছন থেকে এসে আমার কাঁধে একটা হাত শক্তভাবে রেখে বলল, কমল নাথকে মাথাটা দিও।

'কমল নাথ আমারই মত একজন ছাত্র, ব্যবচ্ছেদের জন্য একটা মাথা অনেকদিন ধরেই দাবি করে আসছে।

'আমি কোন জবাব দিতে পারলাম না। খুনী ডাক্তার আবার বলল, এবার লেনদেনের ব্যাপারটায় আসা যাক। মালের জন্য তোমাকে টাকা দিতে হবে, তোমার হিসেবপত্তর ঠিক রাখতে হবে তো ?'

'আমি কোনমতে আমার ভাষা খুঁজে পেলাম। বললাম, টাকা দিতে হবে ! এর জন্য আপনাকে টাকা দিতে হবে ?

'নিশ্চয়ই।—জবাব হল : আমি এমনিতে একটা মাল তোমাকে দিতে পারি না, আর তুমিও বিনা মূল্যে ওটা নিতে পার না ; আমাদের দুজনের পক্ষেই সেটা সন্দেহজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। ভাল কথা, টাকা-পয়সা কোথায় থাকে ?

'আমি অনেকটা পুতুলের মত তাকে নিয়ে আমার ঘরে ফিরে এলাম। টিনের বাক্সটা আঙুল দিয়ে দেখালাম। চৌধুরী ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল : চাবিটা দাও ?—

আমি এক মুহূর্ত দ্বিধা করলাম, তারপর চাবিটা তুলে দিলাম তার হাতে। মনে হল, এতক্ষণে সে যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। হিসেবের খাতাটা একটা ছোট টেবিলের ওপর ছিল। সেটা খুলে সে আমার সামনে ধরল,তারপর চাবি দিয়ে টিনের বাক্সটা খুলে মালের দাম বাবদ যা হওয়া উচিত, তা বার করে বলল, পাওনা টাকা তুমি মিটিয়ে দিলে—এটা হল তোমার ওপর যে বিশ্বাস আশা করা যায়, তার মর্যাদা তুমি রেখেছ। তোমার নিরাপত্তার প্রথম সিঁড়ি হল এটা। এবার দ্বিতীয় ধাপ পার হতে হবে তোমাকে। খরচটা হিসাবের খাতায় লিখে নাও। শয়তানও তারপর তোমার মাথার চুল ছুঁতে পারবে না।

'পরের কয়েক মুহূর্ত আমার মনের মধ্যে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল। স্বার্থপর এবং উচ্চাভিলাষী হলেও, তখনো পর্যন্ত বিবেক একেবারে বর্জন করিনি, কিন্তু সেই মুহূর্তে চৌধুরীর প্রস্তাবে রাজী না হবার মত মনের জোর আমার ছিল না। তাছাড়া তার কথা না শুনলে আমি ভয়ানক বিপদে পড়ব এমন একটা সূক্ষ্ম অনুভূতি আমাকে সাবধান করে দিল। খাতায় লেনদেনের হিসাবটা লিখে ফেললাম।

'চমৎকার !—আমাকে যেন উৎসাহ দিয়ে চৌধুরী বলল, পুরস্কারের টাকাটা তোমারই পাওয়া উচিত। আমার পাওনা আমি পেয়ে গেছি।—অর্থপূর্ণভাবে সে হাসল, তারপর টাকাটা তুলে দিল আমার হাতে : ভাল কথা—, টিনের বাক্সের চাবিটা আমাকে ফিরিয়ে দিতে দিতে চৌধুরী আবার বলল, সংসারে কোন মানুষের হাতে হঠাৎ যদি কিছু টাকা এসে পড়ে,...তোমাকে একথা বলছি বলে কিছু অবশ্য মনে করো না—মানে, এসব ক্ষেত্রে একটা আচরণবিধি মেনে চলার নিয়ম আছে। খানাপিনা, নতুন নতুন জিনিসপত্তর কেন, পুরোন দেনা শোধ করা—এসবেব ধার-পাশ দিয়েও যেতে নেই। তা করলেই পাড়া-পড়শী, চেনাজানা মানুষ, সন্দেহ করতে শুরু করবে। কোথা থেকে টাকা আসছে ? যত ইচ্ছে ধার কর, কিন্তু কখনো ধার দিও না।

'ডাক্তার চৌধুরী !—আমি প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বললাম, আপনাকে অনুগ্রহ করার জন্যে আমি গলায় ফাঁসির দড়ি পরলাম।

'আমাকে অনুগ্রহ করার জন্যে ?—অনাথ চৌধুরীর গলা থেকে যেন ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল : বেশ মজার কথা বলেছ তো ! আমি তো দেখতে পাচ্ছি, তুমি নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই আমার কথামত কাজ করেছ। ধর, আমি যদি ঝামেলায় পড়ি, তুমি কি রেহাই পাবে ভেবেছ ? আজকের এই ছোট দ্বিতীয় ঘটনাটি প্রথম ঘটনাস্রোতেরই একটি গতি। গোবিন্দ বসাক হল মালতীর অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা। শুরু করে তুমি থামতে পার না। শুরু করেছ কি তোমাকে চালিয়ে যেতে হবে, এর মাঝামাঝি কোন পথ নেই।

'আমার চোখের সামনে সব কিছু যেন অন্ধকার হয়ে এল। একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্রের কবলে আমি পড়েছি, তা থেকে উদ্ধারের দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

'হায় ভগবান !—আমি সখেদে বলে উঠলাম, আমি কী এমন অন্যায় করেছি, যার জন্য আমাকে এমন মূল্য গুণতে হচ্ছে ? শুরুই বা করলাম আমি কখন ?

'কি ছেলেমানুষী করছ, সামন্ত ?—চৌধুরী মৃদু ধমকের সুরে বলল, কি ক্ষতি হয়েছে তোমার ? তুমি যদি মুখ না খোল, তবে কী ক্ষতিই বা তোমার হতে পারে ? জীবন সম্বন্ধে কোন ধারণাই তোমার নেই দেখছি। পৃথিবীতে দু'ধরনের মানুষ আছে, সিংহ আর মেষশাবক। যদি তুমি মেষশাবক হও, তবে আর পাঁচটা মড়ার মত এই লাশ-কাটা ঘরের টেবিলে তোমার স্থান হবে ; যদি সিংহ হও, তবে আমার, ডাক্তার পালের কিংবা পৃথিবীর সাহসী পুরুষদের মত গাড়ি চাপবে, জীবনটা উপভোগ করবে, বুঝেছ বোকারাম ? প্রথম ধাক্কাতেই তুমি টাল সামলাতে পারছ না। তুমি ভাগ্যবান বলেই ডাক্তার পালের সুনজরে পড়েছ, তা ভেবে দেখেছ কি ? সূত্রগুলো তুমি ঠাণ্ডা মাথায় ঠিক ঠিক অনুসরণ করবে, এটাই তিনি আশা করেন তোমার কাছে। আর একথাও তোমাকে আজ বলছি, আজ থেকে তিনদিন পরে আজকের কথা ভেবে তুমি নিজেই লজ্জা পাবে, আমি বাজি রাখতে পারি।

'অনাথ চৌধুরী আর অপেক্ষা করল না। অন্ধকার থাকতে থাকতেই তার সেই ঝরঝরে গাড়িটা নিয়ে চলে গেল। একা একা আমি নিজের অবস্থাটা ভেবে দেখবার চেষ্টা করলাম। নিজের দুর্বলতার জন্য নিজেকে দোষ দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না আমার। চৌধুরীকে সুবিধে দিতে দিতে আমি এত বাড়িয়েছি যে, তার ভাগ্য আমার হাতের মুঠোয় না এসে, আমিই তার কেনা গোলাম হয়ে পড়েছি। আঃ, একটু যদি সাহস থাকত আমার। আমার অবস্থা এখন দাঁড়িয়েছ যেন : অন্যায় যতই ঘটুক না কেন, আমাকে এমন ভাবে চলতে হবে, যেন সেটাই ন্যায়। হিসাবের খাতায় অভিশপ্ত সেই সর্বশেষ লেখাটাই বন্ধ করে দিল আমার মুখ।

'তারপর একসময় দিনের আলো ফুটল...ঘন্টা গড়িয়ে গেল, শুরু হল ক্লাস। গোবিন্দ বসাকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছাত্রদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল, তারাও কোন প্রশ্ন তুলল না। মাথাটা পেয়ে খুশি হল কমল নাথ। দু'দিন ধরে লাশ কাটা-ছেঁড়ার ওপর আমি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখলাম। যতই কাটা হচ্ছে, ততই ওটাকে চেনার সম্ভাবনা কমে আসছে, আর সাহস ফিরে আসছে আমার মনে।

'তৃতীয় দিনে অনাথ চৌধুরী এল। এ দু'দিন নাকি অসুখ করেছিল বলে আসেনি। প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে দু'দিনে যে সময় নষ্ট হয়েছে, তা উশুল করে দেবার জন্য সে যেন ব্যস্ত হয়ে পড়ল। টেবিলে টেবিলে ঘুরে নির্দেশ দিতে লাগল ছাত্রদের—অক্লান্ত কর্মীর মত। বিশেষ করে কমল নাথকে সাহায্য করার জন্য যেন সে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। তার কাছ থেকে অযাচিত উৎসাহ পেয়ে কমল নাথেরও উদ্দীপনার শেষ নেই। নানান কোণ থেকে মাথাটায় ছুরি চালিয়ে পাকাতে লাগল হাত।

'সপ্তাহটা শেষ হবার আগেই চৌধুরীর ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেল। আমি ভয় কাটিয়ে উঠলাম। মনে মনে একটা গর্ব অনুভব করতে লাগলাম। চৌধুরীর কথামত সিংহের দলেই আমি ভিড়েছি। চৌধুরীর সঙ্গে ক্লাসে দেখা হল, কিন্তু সে রাতের ঘটনা নিয়ে আমরা কেউ উচ্চবাচ্য করি না, যেন একটা অলিখিত চুক্তি হয়েছে আমাদের মধ্যে।

'কিন্তু ঘটনাচক্রে আবার আমাদের খুব কাছাকাছি আসতে হল। মাল সরবরাহে হঠাৎ টান পড়ল, অ্যানাটমির ক্লাস প্রায় বন্ধ, ছাত্রদের মধ্যে দেখা দিল মৃদু অসন্তোষ। ডাক্তার পাল উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি আমাকে আর চৌধুরীকে ডেকে এ ব্যাপারে তাঁর দুশ্চিন্তার কথা জানালেন। ঠিকমত মাল না পাওয়া গেলে ছাত্রদের পক্ষে কাটা-ছেঁড়া করা সম্ভব হবে না, তাঁর কাছে কর্তৃপক্ষ কৈফিয়ৎ চেয়ে বসবেন। আমাদের তিনি এ ব্যাপারে তৎপর হতে বললেন।

'আমরাও চিন্তিত হয়েছিলাম। আসলে পুলিশ সে সময় কিছু একটা ঘটনায় বেশ কিছু গুণ্ডাকে আটক করেছিল, ফলেই এই অচলাবস্থা। আমি আর চৌধুরী শলাপরামর্শ করতে লাগলাম, একটা উপায় আমাদের বের করতে হবে। ঠিক এমন সময় শহর ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা দূরে একটা খুব পুরোন কবরখানার খবর এল আমাদের কাছে। ওটার চারপাশে নাকি জঙ্গল, অনেকটা পরিত্যক্ত। খুব কাছের গাঁয়ের কিছু পুরোন মানুষ ছাড়া ওটা এখন আর কেউ ব্যবহার করে না, একটা নতুন কবরখানা অন্যদিকে হয়েছে, সেখানেই যায়। শুধু পুরোন মানুষরা ভাবপ্রবণতার খাতিরে হোক কিংবা পূর্বপুরুষদের স্মৃতির সম্মানেই হোক, ওটা এখনো ছাড়তে পারেনি। আরো যে খবরটা আমাদের কাছে এল, তা হল খালেদ মিঞা নামে এক বুড়ো চাষীর কমবয়সী বউ বাচ্চা হতে গিয়ে মারা গেছে। মাত্র গতকালই তাকে ওই কবরখানায় সমাধিস্থ করা হয়েছে। আমি আর চৌধুরী পরামর্শ করলাম, এ সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না।

সেদিনই সন্ধের পর চৌধুরীর ঝরঝরে গাড়িতে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। শহর ছাড়িয়ে বেশ অনেকটা দূরে সেই কবরখানা। ওখানে পৌঁছে কাজ শেষ করে আবার ফিরে আসতে অনেক রাত হয়ে যাবে। শহরের শেষ সীমনায় চৌধুরী গাড়ি থামিয়ে একটু অন্ধকার দেখে রাস্তার পাশে গাড়ি রাখল। পেছনের আসনের পায়ের কাছে ছিল শাবল আর কোদাল, আর ছিল চটের বস্তা। যাতে কারো চোখে না পড়ে, তাই অন্ধকারে গাড়িটা রাখল চৌধুরী। আমরা একটা হোটেলে ঢুকলাম। রাতের খাওয়াটা সেরে নেওয়াই ভাল, নয়তো পেটে কিছু পড়বে না।

'মাংস আর পরোটার অর্ডার দিয়ে চৌধুরী পকেটে হাত ঢোকাল, তারপর এক মুঠো টাকা বার করে আমার হাতে গুঁজে বলল, সেদিন আমার সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য এই সামান্য উপহারটুকু গ্রহণ কর।

'আমি টাকাটা পকেটে পুরে বললাম, আপনি একজন দার্শনিক। আপনি ঠিক কথাই বলেছিলেন, তিনদিন পর ও ব্যাপারটা নিয়ে আর আমি মাথা ঘামাইনি। আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না হওয়া পর্যন্ত আমি একটা বুদ্ধু ছিলাম। আপনি আর ডাক্তার পাল—আপনারাই আমাকে সত্যিকার মানুষ বানিয়ে ছাড়বেন। ভগবানকে ধন্যবাদ, আপনাদের নজরে পড়েছিলাম।

'তা আর বলতে !—চৌধুরী জবাব দিল : মানুষ তোমাকে না বানিয়ে আমরা ছাড়ব না ! আর তাই যদি বল, সেদিন আমার পাশে দাঁড়াবার জন্য একজন সাহসী মানুষই আমার দরকার ছিল। প্রকাণ্ড চেহারার অনেক মানুষই ওই দৃশ্য দেখে মূর্ছা যেত, কিন্তু তোমার বেলায় তা হয়নি—তুমি মাথা ঠিক রেখেছিলে। আমি লক্ষ্য করছিলাম তোমাকে।

'মাথা কেন ঠিক রাখব না ?—আমি বেশ গর্বের সঙ্গেই জবাব দিলাম। ওটা আমার কোন ব্যাপার নয়, তাছাড়া আপনাকে সাহায্য করার জন্য আপনি চিরকাল আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন, সেটাও কম কথা নয়।—আমার মনে হল, চৌধুরীর কপাল যেন কুঁচকে গেল, চোখদুটো ছোট ছোট করে তাকাল আমার দিকে। কিন্তু আমি ততক্ষণে বাচাল হয়ে উঠেছি। গলায় অহঙ্কার ফুটিয়ে বললাম, আসল কথা হল, ভয় না পাওয়া। ফাঁসিকাঠে আমি ঝুলতে চাই না একথা সত্যি, কিন্তু সব সময় ন্যায় পথে চলবে, ভগবানে বিশ্বাস রাখবে, এসব আদর্শের বুলি আমার কাছে উপহাস বলেই মনে হয়। আপনার আমার মত সাহসী মানুষদের জন্যেই এ জগৎ।

'হোটেলের টাকা মিটিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। ক্রমে রাস্তা নির্জন হয়ে এল, আকাশে আধখানা চাঁদ, খুব অসুবিধে হচ্ছিল না। অবশেষে কবরখানার সামনে পৌঁছলাম। চারপাশে জঙ্গল ; একটা পুরোন জীর্ণ মসজিদ, আর তার লাগোয়া কবরখানা। ভাগ্য ভাল, মসজিদে কেউ থাকে না, ওটাও বোধ হয় এখন পরিত্যক্ত।

'গাড়িটা সুবিধে মত জায়গায় রেখে আমরা গাড়ি থেকে দরকারী জিনিসপত্তর বের করলাম। একটা টর্চ, একটা লণ্ঠন, শাবল, কোদাল আর বস্তা।

'আধখানা চাঁদের আলো যেন এক ভুতুড়ে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। টুঁ শব্দটি নেই, চারদিকে কবরের নিস্তব্ধতা। একটা কাঠের ভাঙা গেট পেরিয়ে আমরা কবরখানার ভেতরে ঢুকলাম। বড় বড় ঘাস হয়েছে চারদিকে, সাপ থাকাও বিচিত্র নয়। সন্তর্পণে পা ফেলে, লণ্ঠন আর টর্চের আলোয় আমরা পথ করে এগোচ্ছিলাম। বড় বড় গাছের ছায়া চাঁদের আলো ঢেকে ফেলে এক এক জায়গায়

সৃষ্টি করেছে নিরন্ধ্র অন্ধকার। আমার গা ছমছম করে উঠল। মনে হল, যেন সারি সারি কবরের তলা থেকে চিরনিদ্রিত মৃতদেহগুলো আমাদের এই গোপন অভিসার লক্ষ্য করছে। আমরা তাদের শান্তিতে বাধার সৃষ্টি করেছি, অবৈধভাবে প্রবেশ করেছি তাদের সংরক্ষিত এলাকায়, সেটা তারা পছন্দ করছে না।

'চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সে কিন্তু নির্বিকার। আমার সাহস ফিরে এল। নতুন কবরটা বার করতে বেগ পেতে হল না। বেশির ভাগই বড় বড় ঘাসে ঢাকা পড়েছে, কিন্তু এটা সদ্য তৈরি, তাই ঘাস পরিষ্কার করা হয়েছে, সহজেই চোখে পড়ে।

'লণ্ঠনটা মাটিতে রেখে আমরা দুজন মাটি কোপাতে শুরু করলাম। নরম মাটি, সবে খোঁড়া হয়েছিল, তাই তাড়াতাড়ি গর্তটা বড় হতে লাগল। পরিশ্রমে আমাদের শরীরে নামল ঘামের বন্যা। তারপর একসময় কফিনটা আমাদের চোখে পড়ল। খুব সাবধানে চারপাশে গর্ত করে কফিনের দু'দিক শক্ত মুঠোয় ধরে ওটাকে আমরা মাটির ওপর রাখলাম। শাবলে চাপ দিয়ে ঢাকনাটা খুলে ভেতরের মৃতদেহটা শুইয়ে দিলাম, পাশের বড় বড় ঘাসের ওপর। অল্পবয়সী বউয়ের মৃতদেহ, তেমন ভারী নয়। এবার কফিনের ঢাকনাটা আবার বন্ধ করে, গর্তে যেমনটি ছিল, তেমনটি রেখে, ভরাট করে দিলাম মাটি। আমাদের কুকীর্তির প্রমাণ আমরা রাখতে চাই না।

'বস্তার মধ্যে লাশ ভরে আমরা ধরাধরি করে নিয়ে চললাম চৌধুরীর ছ্যাকরা গাড়িতে। পেছন দিকে পায়ের কাছে বস্তাটা রাখা হল। যন্ত্রপাতি, লণ্ঠন সব নিয়ে এসে আমরা ফিরে চললাম। এত সহজেই একটা লাশ পাওয়া গেছে বা যোগাড় করতে পেরেছি, ভেবে মন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। ওটার বাবদ যে টাকা হওয়া উচিত, সেটা আমরা দুজন ভাগ করে নেব। সহজ ভাবে টাকা রোজগারের ভাল একটা পথ পাওয়া গেছে। চৌধুরী গাড়ি চালাতে চালাতে কুৎসিত একটা রসিকতা করল, দুজনেই হেসে উঠলাম।

'হঠাৎ শুরু হল ঝিরঝিরে বৃষ্টি, মেঘে ঢাকা পড়ল চাঁদ। আমার পায়ের কাছে বস্তাটা ছিল। চৌধুরীর ঝরঝরে গাড়িতে খুব ঝাঁকুনি হচ্ছিল, আর বস্তাটা বারবার আমার পায়ের ওপর এসে পড়ছিল। আমি যতই পা দিয়ে ওটা ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিলাম, ততই যেন নতুন উদ্যমে ওটা এসে পড়ছিল আমার পায়ের ওপর। এই সংস্পর্শে গা ঘিনঘিন করে উঠছিল আমার! একবার যেন মনে হল, বস্তা থেকে একটা হাত বেরিয়ে এসে আমার পায়ে সুড়সুড়ি দিল। ভীষণ চমকে উঠলাম আমি। গলা দিয়ে বোধ হয় একটা শব্দ বেরিয়েছিল, চৌধুরী গাড়ি থামিয়ে আমার দিকে ফিরে বলল, কি হল ? চেঁচিয়ে উঠলে কেন ?

'আমার কেন জানি ভাল ঠেকছে না।—আমি কোনমতে বলালাম, আমার পায়ে কে যেন সুড়সুড়ি দিল।

'তোমার দেখছি ভয় ধরেছে!—ব্যঙ্গ কণ্ঠে বলে উঠল চৌধুরী, এই তুমি সাহসী পুরুষ, অ্যাঁ ?

'গাড়ি থামিয়ে ও নেমে এল। বৃষ্টির বেগটা বেড়েছে। হঠাৎ কোথা থেকে কতগুলো কুকুর আমাদের চারপাশে ডাকতে লাগল, তাদের সেই ডাকের মধ্যে হিংস্রতা নেই, আছে একটা কান্নার সুর। চারদিকের জমাটি অন্ধকার, কুকুরের কান্না, আমাদের সঙ্গে কবর থেকে সদ্য চুরি করে আনা একটি যুবতীর মৃতদেহ—সব মিলিয়ে একটা অশরীরী পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে আমাদের চার পাশে।

'চৌধুরী আমার বাঁ দিকের দরজাটা খুলে ভেতরে ঝুঁকে বলল, 'টর্চটা জ্বালাও, মেয়েমানুষের সুড়সুড়িতে তোমার ভয়ের চাইতে আরাম লাগাই উচিত।

'আমি পাশ থেকে টর্চটা তুলে আলো ফেললাম বস্তাটার ওপর। কয়েক মুহূর্ত আমরা স্তম্ভিতের মত তাকিয়ে রইলাম, কারো মুখে কথা নেই। সত্যি বস্তা থেকে একটা হাত বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু সেটা রমণীর কোমল হাত নয়, একটি লোমশ হাত। একটা ভয়ানক আতঙ্ক আমার বুকে যেন পাষাণের মত চেপে বসছে।

'এটা কার হাত!—চৌধুরী ফিসফিস করে বলল, মেয়েমানুষের হাত নয়—

'কিন্তু আমরা তো মেয়েমানুষের লাশই কবর থেকে তুলে এনেছি—, আমিও ফিসফিস করে জবাব দিলাম।

'আলোটা আরেকটু উঁচু করে ধর—, চৌধুরী হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে বলে উঠল, মুখটা আমি

দেখতে চাই—

'আমি টর্চের আলোটা বস্তার মুখের কাছে ধরলাম। চৌধুরী এক টানে ওটা সরিয়ে দিতেই, একটা মুখ বেরিয়ে পড়ল! দাড়ি কামানো একটা মুখ, চোখ দুটো খোলা, গভীর কালো দু'চোখের তারা, মুখে যেন ব্যঙ্গের হাসি। আমাদের উপহাস করছে।

'রাতের নিস্তব্ধতা খানখান করে দিল আমাদের দুজনের আতঙ্কিত চিৎকার। চৌধুরী এক লাফে সরে গেল, আমি কেমন করে ডান দিকের দরজা খুলে লাফ মেরেছিলাম, জানি না। অন্ধকারে শক্ত মাটিতে আছড়ে পড়ে হাত-পা ছড়ে গেল, কিন্তু আমার তখন ভ্রূক্ষেপ নেই, দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে আমি ছুটছি তো ছুটছিই।

'যে মুখটা আমাদের দিকে তাকিয়ে বীভৎস ভাবে হাসছিল, সেটা গোবিন্দ বসাকের মুখ—যাকে লাশ-কাটা ঘরে ফালা ফালা করে কাটা-ছেঁড়া করা হয়েছিল আমাদের দুজনের চোখের সামনে।'

পাহাড়ী গোলাপ

রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়

অনেকদিন পরে পুরাতন খদ্দেরকে দেখে মিসেস বড়ুয়া খুশি হলেন। মিষ্টি হেসে বললেন, মিস্টার বরুণ বিশ্বাস না ? নমস্কার !

ঠিকই চিনেছেন !—বরুণও মৃদু হাসল। বললে, আপনার স্মরণশক্তি আশ্চর্যরকম প্রখর।

চেনা অতিথিদের ভুললে আমার সরাইখানা চলবে কি করে বলুন ? মিসেস বড়ুয়া বললেন।

তা বটে। প্রায় দেড় যুগ আগে স্বামী দেবাশিস বড়ুয়া যখন মুসৌরীতে এই 'হিলম্যান' হোটেল খুলে বসেছিলেন, অনিতা বড়ুয়া তখন তরুণী। হোটেল পরিচালনা ব্যাপারে তখন থেকেই তিনি স্বামীর সহকারিণী। আজ কয়েক বছর হল দেবাশিস বড়ুয়া পরলোকে হোটেল খুলতে গেছেন। হিলম্যানের পুরো মালিকানা আর দায়িত্ব এখন মিসেস বড়ুয়ার। খদ্দেরদের প্রতি অমায়িক ব্যবহার, আন্তরিক যত্ন তো আছেই, তাঁর সরাইখানায় কেউ একদিনের জন্যে এলেও অনিতা তাকে সহজে ভোলেন না। এই কারণে সিজন্ টাইমে অন্য হোটেলের তুলনায় তাঁর হিলম্যান-এ ভিড় বেশি হয়।

পুরাতন আত্মীয়তার সুরে অনিতা বললেন, এবার কতদিন পরে এলেন !

বরুণ বললে, হ্যাঁ, তা অনেকদিন হল। এগারো বছর বাদে ! ঘর-টর পাওয়া যাবে তো ?

আপনার জন্যে সব সময় ঘর খোলা !

অনিতা বড়ুয়া এখন আর তন্বী তরুণী নেই। চল্লিশ পার হয়ে মোটাও হয়েছেন, চুলে রুপোলি ছোঁয়াও লেগেছে। তবু মুখের হাসি আর চোখের চাউনিতে তরুণ বয়সের মাদকতা রয়েছে। নিজেই চাবি নিয়ে বললেন, আসুন—

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতলার বারান্দায় উঠে একেবারে শেষ ঘরখানার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। দরজায় চাবি লাগিয়ে বরুণকে বললেন, এটা সরাইখানার বেস্ট কামরা, আর এটাই আপনার পুরোন ঘর। কোন অসুবিধে হবে না।

দরজা খুলে দিয়ে অনিতা বললেন, চা নিচে খাবার টেবিলে খাবেন, না রুক্‌মা দিয়ে যাবে ?

রুক্‌মা !

ভেতরে ভেতরে বরুণ যেন চমকে উঠল।

অনিতা বললেন, সে-রুক্‌মা নয়, এখানকার পাহাড়ী বস্তিতে অমন অনেক রুক্‌মা আছে।

অনেকটা সহজ হয়ে উঠল বরুণ। বললে, স্নান সেরে খাবার টেবিলেই যাচ্ছি।

আচ্ছা।

হেসে অনিতা চলে গেলেন। বরুণ ঘরে ঢুকল। হাতের সুটকেশটা নামিয়ে রেখে চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল। হ্যাঁ, এই ঘরখানাই বটে! হোটেলের অন্যান্য ঘরগুলোর তুলনায় এখানা আকারে বেশ বড়ই হবে। কাঠের ফ্লোর, কাঠের দেয়াল। শুধু ফায়ার-প্লেস ইটের। দু-দিকে দুটো দুটো চারটে জানলা। পুবের জানলার সার্শি দিয়ে সকালের দুধে-ধোওয়া উষ্ণ রোদ মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ে। আর, উত্তরের জানলা—

দ্রুতপায়ে এগিয়ে, বরুণ উত্তরের একটা জানলার সার্শি খুলে বাইরে তাকালে। জানলার ঠিক নিচেই খাদ—সেই অতলান্ত খাদ! ঝুঁকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। ক্ষিপ্র হাতে বরুণ জানলা বন্ধ করে দিলে। একটা পাহাড়ের মাথায় বলে হিলম্যান হোটেলটাকে মন্দ দেখায় না। চারপাশের নিসর্গ শোভাও দেখতে ভাল লাগে। কিন্তু এই ঘরখানাকে একেবারে খাদের ধারে তৈরি না করলেই বা কী ক্ষতি হত?

অবশ্য ঘরের পোজিশন আর সাজানো-গোছানোর দিক দিয়ে এ ঘরখানা হোটেলের সেরা কামরা ঠিকই, তবু বরুণের মনে হল মিসেস বড়ুয়া তার থাকার জন্যে অন্য কামরার ব্যবস্থা করলেই যেন ভাল হত।

সে কি ভাবতে পেরেছিল দীর্ঘ এগারো বছর পরে আবার এই ঘরেই তাকে পা দিতে হবে?

সেপ্টেম্বরের শেষ। মুসৌরীর পাহাড়ী অঞ্চলে ঠাণ্ডাটা জাঁকিয়ে পড়েছে। তবু বরুণ স্নান করলে। ট্রেন-জার্নির পর স্নান করাই ওর বরাবরের অভ্যাস।

গরম জলে স্নান করে, দাড়ি কামিয়ে, পোশাক বদলে বরুণ যখন চায়ের টেবিলে যাবার জন্যে রেডি হল, তখন শরীরের সঙ্গে মেজাজটাও তার বেশ হালকা হয়ে গেছে।

বেলা পড়ে আসছে। উত্তরের জানলার কাচের সার্শি দিয়ে পশ্চিম আকাশের সমচতুষ্কোণ একটা টুকরো চোখে পড়ে। হিন্দী রঙিন ফিল্মের মত রঙচঙে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বরুণ একতলায় নেমে গেল।

টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে, অনিতা নিজেই অপেক্ষা করছিলেন। হোটেলে বোর্ডার তখন খুব কম। দু-চারজন যারা আছে, তারা চা-পান শেষ করে বেড়াতে বেরিয়েছে।

চেয়ারে বসতে বসতে বরুণ বললে, আপনি নিজে চা বানাচ্ছেন যে! লোকজন কেউ নেই?

চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে অনিতা বললেন, এ সময়টা খদ্দের কম বলে লোকজন কমিয়ে দিয়েছি। কেবল একজন বেয়ারা। আর রুক্‌মা বলে যে মেয়েটা আছে, সে এখন কিচেনে।

আবার রুক্‌মা! চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে বরুণ এক সেকেন্ড থেমে রইল। তারপর অন্য প্রসঙ্গে ঘুরে গেল। বললে, আপনার সরাইখানা এতদিনেও কিছু বদলায়নি দেখছি! সবই আগের মত রয়েছে, ওই জাপানী টি-পটটা পর্যন্ত।

কেকের প্লেট বরুণের দিকে সরিয়ে দিয়ে অনিতা হেসে বললেন, কিছুই বড় একটা বদলায় না, শুধু মানুষ বদলে যায়। এই আমাকেই দেখুন না, আগের চেয়ে কত মোটা হয়েছি, বুড়িয়ে গেছি!

এ আপনার বুড়িয়ে যাওয়া নয়, বাড়িয়ে বলা।—বরুণও হেসে জবাব দিলে, সময়ের ধর্মই হচ্ছে বদলে যাওয়া। আমাকেও কি এখনো যুবক মনে হয়?

বরুণের কাপ দ্বিতীয়বার ভর্তি করে দিলেন অনিতা। তারপর প্রশ্ন করলেন, এবার ক'দিন থাকবেন?

বলতে পারছি নে। ব্যবসাদার মানুষ আমি—যতক্ষণ ব্যবসা, ততক্ষণই থাকা।

এবার কিসের বিজনেস?

এখানকার নতুন হসপিট্যালের জন্যে স্টিল ফার্নিচার আর সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতির অর্ডার যোগাড়

করতে এসেছি। কর্তাদের তোয়াজ করতে অন্তত চার-পাঁচটা দিন লাগবে বোধ হয়।

চা-পর্ব শেষ করে আরেকটা সিগারেট- ধরালে বরুণ। মিসেস বড়ুয়া জিজ্ঞেস করলেন, আজ রাতে কি খাবেন? কোন স্পেশাল ডিশ?

ফরমাস না করে আপনার অভিরুচির ওপর ছেড়ে দিলাম। —চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল বরুণ।

অনিতা বললেন, বেড়াতে বেরোচ্ছেন?

নাঃ, টায়ার্ড লাগছে। ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নেব। আমি কিন্তু দশটার আগে ডিনারে বসি না।

আমার মনে আছে। আপনার ডিনার দশটাতেই রেডি থাকবে।

সত্যিই ক্লান্ত বোধ হচ্ছিল বরুণের। ঘরে এসে দেখল, উত্তরের জানলায় ফ্রেমে-আঁটা আকাশ থেকে সমস্ত রঙের বাহার মুছে গেছে। ফায়ারপ্লেসের আগুন-তাপে ঘরখানায় উষ্ণ আরাম ছড়ানো।

ইটালিয়ান কম্বলখানা গায়ে টেনে নরম বিছানায় বরুণ এক ঘুম ঘুমিয়ে নিল।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন নটা বেজে গেছে। শরীরে এখনো কেমন একটা আলস্যের জড়তা লেগে আছে। অতএব সুটকেশটা খোলা যাক। মার্তেল ব্র্যান্ডির বোতল তার সঙ্গেই থাকে। বিশেষত ট্যুরে বেরোলে।

বারান্দায় বেরিয়ে বরুণ গলা চড়িয়ে গরম পানির ফরমাস করলে। খানিক পরেই পাহাড়ী চাকরটা এসে গরম জলের পাত্র টেবিলে নামিয়ে রেখে গেল। সঙ্গে গ্লাস। বোতল খুলে বরুণ গ্লাসে এক ইঞ্চিটাক ঢাললে। গরম জলের পাত্রের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে, ফুলদানির দিকে চোখ পড়ল। সেই ড্রাগন-আঁকা তামার ফুলদানিটা না? আশ্চর্য, এগারো বছর আগে ওই টেবিলে এই ফুলদানিটাই ছিল! ছিল তো ছিল। দুনিয়ায় অনেক জিনিসই এগারো কেন, একশো এগারো বছর ধরে ছিল এবং আছে। তাতে কি এল গেল?

গ্লাসে গরম জল মিশিয়ে বরুণ একটা লম্বা চুমুক দিলে। সিগারেট ধরালে। তারপর টেবিল থেকে একখানা বিলিতি ম্যাগাজিন খুলে বসল।

গ্লাসটা দ্বিতীয় চুমুকেই খালি হয়ে গেল। দ্বিতীয়বার ব্র্যান্ডি নিল বরুণ। গরম জল নিতে গিয়ে ফুলদানিটা আবার নজরে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বরুণ চোখ সরিয়ে নিল। তার মনে হল, মিসেস বড়ুয়ার রুচি নিতান্ত পুরোন পচা! এমন কী নিয়ম আছে, এগারো বছর ধরে একই ফুলদানি একই টেবিলে রাখতে হবে? ওই ফুলদানিটা তো কারো স্বামী নয় যে বদলানো চলবে না!

হঠাৎ খেয়াল হল বরুণের, এরই মধ্যে সে বার তিন-চার ফুলদানিটার দিকে তাকিয়েছে। হাসি পেয়ে গেল তার। এই বয়সে ড্রাগন দেখে ভয় পেলো নাকি সে? মনে পড়ল অনিতা বড়ুয়ার কথা, কিছুই বড়-একটা বদলায় না, শুধু মানুষ বদলে যায়।'

বরুণ তৃতীয় পেগ ঢাললে। গ্লাসটা যখন শেষ করলে, তখন দশটা দশ। বোতলটা সরিয়ে রেখে সে একতলায় নেমে গেল। ডিনারের টাইম হয়েছে।

টেবিলে প্লেট সাজিয়ে বসে আছেন অনিতা। বরুণ এসে বসতেই কিচেনের দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাক দিলেন, রুক্‌মা! খানা লাও।

বরুণ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। অথচ নেশা তার হয়নি। তিন পেগে তার নেশা হয় না। বড়জোর চোখ দুটো একটু লালচে হয়।

ধূমায়িত সুপের পাত্র দু'হাতে ধরে মোটাসোটা মাঝবয়সী একটি পাহাড়ী স্ত্রীলোক খাবার ঘরে এল। এই তাহলে রুক্‌মা। অনিতা বলেছিলেন বটে এখানকার পাহাড়ী বস্তিতে অনেক রুক্‌মা আছে।

খেতে খেতে সে বললে, পাহাড়ী মেয়েদের মধ্যে রুক্‌মা নামটা খুব কমন বুঝি?

অনিতা বললেন, হ্যাঁ, তাই। রুক্‌মা ওদের প্রিয় নাম।

বরুণ জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা, আপনার সে-রুক্‌মার খবর কি মিসেস বড়ুয়া? কোন খোঁজ-টোজ পেয়েছিলেন তার?

মিসেস বড়ুয়া বললেন, না। বিস্তর খোঁজাখুঁজি করা হয়েছিল, কিন্তু মেয়েটাকে আর পাওয়া গেল না! কোথায় যে গায়েব হয়ে গেল, কে জানে!

বরুণের অস্বস্তি ভাব এক মুহূর্তে কেটে গেল।

পুলিশ ভাল করে তদন্ত করেনি ?

প্রশ্নটা এত সহজে করল বরুণ, যেন কথার পিঠে কথা।

করেছিল বৈকি ! কোন সন্ধান না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। আরেকখানা গরম কাটলেট দিই ?

গরম কাটলেট ? ফাইন ! দিন না।

বরুণের মেজাজ ভারি প্রফুল্ল মনে হল। কাটলেট চিবোতে চিবোতে বললে, ব্যাপারটা কিন্তু রীতিমত রহস্যময় ! শার্লক হোমসের গল্পের মত, তাই না ? একটা জলজ্যান্ত মেয়ে উবে গেল। আচ্ছা, আপনার কি ধারণা ?

অনিতা বললেন, ব্যাপারটা আমার ধারণার বাইরে। তবে পাহাড়ী বস্তির লোকেরা বলে, কোন ট্যুরিস্ট সাহেব নাকি রুক্‌মাকে ধরে নিয়ে গেছে।

তাই নাকি ? ভারি ইন্টারেস্টিং তো ?

শব্দ করে হেসে উঠল বরুণ। হেসে বললে, তবে মেয়েটার চেহারা যা ছিল, তাতে ট্যুরিস্ট সাহেবকে দোষ দেওয়া যায় না।

ডিনার শেষ করে বরুণ উঠে পড়তে যাচ্ছিল, অনিতা বললেন, উঠবেন না ! আপেলের পুডিং আছে—আপনার ফেবারিট ডিশ !

অবাক হয়ে বরুণ বললে, ধন্যবাদ ! কিন্তু সে যে এগারো বছর আগের কথা ! এখনো আপনার মনে আছে ?

অনিতা পুডিংয়ের প্লেটটা এগিয়ে দিয়ে মৃদু হেসে বললেন, এগারো বছর আগের এই সরাইখানাকে আপনিই কি ভুলতে পেরেছেন ?

চামচে করে একটু পুডিং মুখে তুলতে গিয়ে বরুণ এক সেকেন্ড থেমে গেল। তারপর আবার খেতে লাগল।

নিজের রুমে বরুণ যখন ফিরে এল, কাছাকাছি কোন চার্চের ঘড়িতে রাত এগারোটা বাজছে। সারা হোটেল নিঝুম। কোন বোর্ডারের ঘরে সাড়াশব্দ নেই। ডিনার-টেবিলে বরুণই শেষজন।

কাচের জানলার বাইরে আকাশ ও পৃথিবী এখন একই রঙের— শ্লেটের মত গাঢ় ধূসর। পাহাড়ী অঞ্চলের শীতার্ত রাত এরই মধ্যে নিশুতি হয়ে এসেছে। শব্দ বলতে থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে শুধু দমকা হাওয়ার এলোমেলো প্রলাপ।

দরজায় ছিটকিনি তুলে দিয়ে বরুণ এসে বসল ফায়ারপ্লেসের ধারে। ঠাণ্ডা বেশ জমিয়ে পড়েছে। তা পড়ুক, এখনই শুয়ে পড়বার তাড়া কিসের ? কিছুক্ষণ বসে বসে মৌজ করে সিগারেট টানা যাক। ইচ্ছে হলে একটা ছোট পেগ ব্র্যান্ডিও নিতে পারে।

কি যেন বললেন অনিতা বড়ুয়া ? এগারো বছর আগের এই সরাইখানাকে আপনিই কি ভুলতে পেরেছেন ?

পেরেছিল বৈকি। এগারোটা বছর ধরে বরুণ তো দিব্যি ভুলে গিয়েছিল। মুসৌরীতে আরো হোটেল থাকতেও কেন যে এই হিলম্যান-এ এসে উঠল, তা সে নিজেও জানে না। আর, দোতলার বারান্দার এই শেষ ঘরে পা দিয়ে আবার সব মনে পড়ে গেল নতুন করে।

কিন্তু এগারো বছর বাদে হিলম্যান হোটেল তাকে আবার টানলো কেন ? কেন আবার ! এ হোটেলের আরাম আর মিসেস বড়ুয়ার যত্নই তার কারণ। ধরো, ফ্রুট-স্যালাড অথবা অ্যাপল্‌পুডিং—তার প্রিয় খাদ্য অপর কোন হোটেলে না-চাইতেই পাওয়া যেত কি ? চাইলেও হয়তো মিলতো না।

টেবিল থেকে অ্যাস-পটটা নিতে গিয়ে ফুলদানিটা আবার চোখে পড়ে গেল বরুণের। ড্রাগন খোদাই-করা সেই তামার ফ্লাওয়ার ভাস !

আশ্চর্য, সব মনে পড়ছে তার। স্পষ্ট মনে পড়ছে ! যেন গত সপ্তাহের ঘটনা। বরুণ তা হলে সত্যিই ভুলে যায়নি। চাপা পড়ে ছিল বিস্মৃতির কবরে। কবর ফুঁড়ে আবার বেঁচে উঠেছে পুরোনো স্মৃতি।

আগের বার সে যখন এখানে এসেছিল, সেটা সেপ্টেম্বর ছিল না, ছিল মার্চের গোড়ার দিক। শীত তখনো এই পাহাড়ী অঞ্চলে জাঁকিয়ে রাজত্ব করছে। ভি. আই. পি.'দের জন্যে সরকারী ভবনের একদিকটা আরো বাড়ানো হবে, গৃহসজ্জার কনট্রাক্ট ধরতে তার মুসৌরীতে আসা ওই প্রথম। পাহাড়ের ওপর বেশ ছবির মত দেখতে হিলম্যান হোটেল তার ভাল লেগে গিয়েছিল। মালিক দেবাশিস-বড়ুয়া তখন বেঁচে। বরুণ একটু নিরিবিলি থাকা পছন্দ করে শুনে, তিনি দোতলার বারান্দার এই শেষ ঘরখানাই তার জন্যে খুলে দিয়েছিলেন।

ঘরখানা একেবারে একটেরে বলে সত্যিই নিরিবিলি। অন্য বোর্ডারদের সঙ্গে সম্পর্ক খুবই কম। এই খাটখানা তখন ঘরের এইখানেই ছিল। বড় সোফাটা, ড্রেসিং আয়নাটা আর সেন্টার টেবিলখানা তখন যেখানে ছিল, এগারো বছর বাদে ঠিক সেই জায়গাতেই রয়েছে। ড্রাগনওয়ালা তিব্বতী ফুলদানিটাও। এমন কি, বরফে-ঢাকা পাহাড়ের একটা এনলার্জ করা বাঁধানো ফোটো পুবের দেওয়ালের হুকে তেমনি করেই ঝুলছে।

কিছুই বদলায়নি!

হ্যাঁ, এই ঘরেই রুক্‌মাকে সে প্রথম দেখেছিল। সকালবেলা বেড-টি নিয়ে এসে, তার ঘুম ভাঙিয়েছিল রুক্‌মা। ডেকেছিল, চায় লায়া বাবুজী!

একটু মোটা অথচ মেয়েলি গলার আওয়াজে বরুণ ঘুম-চোখে তাকাল। মেয়েটা গালে টোল পড়িয়ে মিষ্টি করে হাসল। আবার বললে, চায় লায়া বাবুজী! পিও!

ঘুম-চোখে একপলক তাকিয়েই বরুণের চোখ থেকে ঘুম চলে গেল। একটা জীবন্ত পাহাড়ী গোলাপ ফুটে রয়েছে তার ঘরে!

পাহাড়ী মেয়েদের বয়স ধরা মুস্কিল। কিন্তু এ মেয়েটাকে দেখে বোঝা যায়, বয়সটা বিশ বাইশের বেশি হতে পারে না—এমনই মসৃণ লালিত্য তার গায়ের ফর্সা গোলাপী চামড়ায়। ঘন সবুজ ছিটের ফ্রক পরনে, গায়ে লাল পশমের সোয়েটার। মাথায় সাদা ফুটকি-দেওয়া একটা নীল সিল্কের রুমাল বাঁধা, তারই তলা দিয়ে লালচে কটা চুলের একজোড়া খাটো বিনুনি উপচে ওঠা বুকের দুপাশে ঝুলছে। অস্পষ্ট ভুরুর নিচে ছোট ছোট চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। পাতলা গোলাপী ঠোঁটের ফাঁকে ক্ষুদে ক্ষুদে হলদেটে দাঁতের সারি।

বরুণ চেয়েই রইল।

মেয়েটা শুধু পাহাড়ী সৌন্দর্যের একটা ছবি নয়, পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবন দিয়ে গড়া টাটকা তাজা যৌবন।

বন্য সরলতার সঙ্গে মেয়েটা বললে, কেয়া দেখতা বাবুজী? চায় পিও!

নিজেকে সামলে নিয়ে বরুণ গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলে, কেয়া নাম হ্যায়?

ফিক করে হেসে ফেলে মেয়েটা বললে, রুক্‌মা।

রুক্‌মার সঙ্গে বরুণের সেই প্রথম আলাপ। এগারো বছর আগে।

তার পর থেকে বরুণ যতক্ষণ হোটেলে থাকত, তার ফাইফরমাসের অন্ত ছিল না। জল দাও, চা আনো, কফি বানাও, 'বিস্তারা'র চাদর আর বালিশের ওয়াড় বদলে দাও, আরো কতরকম। ঘড়ি ঘড়ি রুক্‌মাকে ডেকে পাঠাত। ডেকে পাঠাত আর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে রুক্‌মাকে দেখত। রুক্‌মাকে দেখত আর কি এক জ্বালায় জ্বলত। যে-জ্বালায় শুধু নওজোয়ান পুরুষ জ্বলে। কত বয়স তখন বরুণের? বড়জোর ত্রিশ-বত্রিশ!

সারা ভারতবর্ষ জুড়ে মাকড়সার জালের মত রেল-লাইন ছড়িয়ে আছে। সেই লাইন ধরে স্টেশনে স্টেশনে ঘুরছে বরুণ। কোথাও দুদিন, কোথাও পাঁচদিন। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেবল অর্ডার ধরেছে, ব্যবসা করেছে, টাকা গুণেছে। টাকার যে উল্টো পিঠ আছে, জীবনের যে আরেকটা দিক আছে, ভাববার অবসর হয়নি। কখনো পুরুষের চোখ দিয়ে দেখেনি যে, দুনিয়ায় মেয়ে বলে একশ্রেণীর বিচিত্র প্রাণী আছে। পুরুষের মন দিয়ে কখনো ভাবেনি যে, তারও যুবক-জীবনে একটি মেয়ের প্রয়োজন আছে। কোনদিন অনুভব করেনি তারও একটা অদ্ভুত ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, যা ডিনারে বা চা-কফিতে তৃপ্ত হবার নয়।

পুরুষের সেই দৃষ্টি, সেই মন, আর সেই অনুভূতি বরুণের জীবনে জাগিয়ে তুলেছিল মুসৌরী

পাহাড়ের মেয়ে রুক্মা। জ্বলন্ত যৌবনবতী রুক্মা!

সে কি আজকের কথা? এগারো বছর পূর্বের এক মার্চের। অথচ সবই মনে পড়ে যাচ্ছে।

নিতান্ত বন্য, নিতান্ত সরল ছিল রুক্মা। অল্পেই ভারি খুশি হয়ে যেত।

একদিন তার জামায় একটু সেন্ট লাগিয়ে দিয়েছিল বরুণ। বারবার জামাটা শুঁকে তার যেন তৃপ্তি হয়নি। গোলাপী ঠোঁটের ফাঁকে হলদেটে দাঁতের সারি দেখিয়ে বললে, আ! কিতনা আচ্ছা ফুলকা খুশবু!

বোধ হয় এই ভেবে সে অবাক হয়েছিল যে, ছোট্ট শিশির ভেতর থেকে টাটকা ফুলের সুগন্ধ বেরোল কেমন করে?

আরেক দিন।

বিকেলে চায়ের পর বরুণ একটা সিগারেট ধরিয়েছে, রুক্মা এল চায়ের ট্রে নিয়ে যেতে। 'টোস্টেড' তামাকের গন্ধ পেয়ে মেয়েটা বলে বসল, এ বাবুজী, একঠো চুরুট দেও না।

বরুণ জিজ্ঞেস করলে, কেয়া করো গে?

রুক্মা অসঙ্কোচে জবাব দিলে, হাম পিয়ে গা।

মজা লাগল বরুণের। একটা সিগারেট দিয়ে বললে, পিও!

সিগারেটটা একবার নাকের কাছে ধরে রুক্মা বলে উঠল, কিতনা আচ্ছা! আভি নেহি, রাতমে খানা খানেকো বাদ পিয়েগা।

সিগারেটটা রুক্মা তার টাইট সোয়েটারের মধ্যে বুকের কাছে রেখে দিলে।

সেদিকে তাকিয়ে বরুণ বললে, আচ্ছা সোয়েটার মালুম হোতা! তুম বানায়া?

একটু যেন গর্বের সঙ্গে রুক্মা বললে, নেহি, মেরা মা বানায়া। ইসমে ভি আচ্ছা বানাতা। বাজারমে বিক্‌তা হ্যায়। সাত রূপেয়া, দশ রূপেয়া, বারা রূপেয়া!

হাঁ!—ইচ্ছে করে অবাক হয়ে বরুণ বললে।

রুক্মা বরুণের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বললে, দেখো না, কিতনা আচ্ছা!

তারপর বিনা দ্বিধায় ফস করে বরুণের একখানা হাত নিজের বুকের ওপর রাখল। হকচকিয়ে গেল বরুণ। তার আঙুলের চাপ লাগছে রুক্মার পুরন্ত নরম বুকে। কয়েক সেকেন্ড বাদেই হাত টেনে নিলে সে।

কেয়া হুয়া?—অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে রুক্মা।

নিজের আঙুলে ফুঁ দিতে দিতে বরুণ বললে, জ্বল গিয়া!

জ্বল গিয়া! ক্যায়সে?

আগমে।

আরো অবাক হল রুক্মা। বললে, কাঁহা আগ?

রুক্মার চোখে চোখ রেখে বরুণ বলে বসল, তুমারা জওয়ানীমে।

বন্য সরল পাহাড়ী মেয়েও লজ্জা পায়। রুক্মার গালের রাঙা আপেল-রঙ তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। ছোট ছোট জ্বলজ্বলে চোখ দুটো তেরছা করে শুধু বললে, হট্!

তারপর তাড়াতাড়ি চায়ের ট্রে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল।

রুক্মা চলে গেল, কিন্তু রেখে গেল একটা বিষের জ্বালা। সে-বিষ বরুণের হাতের আঙুল থেকে ক্রমে সারা দেহের রক্তবাহী শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হতে থাকল।

আর, ঘটনাটা ঘটল সেই রাতেই।

বোর্ডারিদের মধ্যে সবশেষে ডিনার খেতে নামে বরুণ। দশটা অবধি তার নিজস্ব সময়। কয়েক পেগ 'হট ড্রিঙ্কস' নিয়ে একা একা কাটায়। তারপর ডিনারে বসে। সে-রাতে একটা ভাল হুইস্কির বোতল ছিল সঙ্গে। তিন পেগের কিছু বেশিই হয়ে গিয়েছিল। তারপব নেমে গেল একতলায়।

ডিনার-টেবিলে পরিবেশন করলে রুক্মা। আগের মতই সহজ ভাবে। বিকেলের কথা সে হয়তো ভুলেই গেছে। কিন্তু বরুণ কি ভুলতে পেরেছিল সেই বিষের জ্বালা? ভোলা তো দূরের কথা, জ্বালাটা যেন নেশার মত ক্রমশ তাকে অস্থির করে তুলছিল।

ডিনারের পর কফির অর্ডার দিয়ে ঘরে ফিরে গেল বরুণ। সিগারেট ধরালে। হোটেল হিলম্যান এখন চুপচাপ। বোর্ডাররা যে-যার বিছানায় গায়ে কম্বল টেনেছে। পাহাড়ী অঞ্চলের রাত এগারোটা বাজতে না বাজতেই নিশুতি। আকাশে শ্লেটের রঙ। শীতের দমকা হাওয়ায় আজ ঝোড়ো মত্ততা।

ফায়ার-প্লেসের ধারে বসেছিল বরুণ। ঘরের দরজায় টোকা পড়ল।

ক্যওন ?—বরুণ জিজ্ঞেস করলে।

বাইরে থেকে জবাব এল, রুক্‌মা। কফি লায়া বাবুজী।

দরজা ভেজানোই ছিল, বরুণ বললে, আও।

দু-হাতে ট্রে ধরে রুক্‌মা ঘরে এল, টেবিলে রেখে কফি তৈরি করতে লাগল। তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বরুণ উঠে দরজাটায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। আর দাঁড়িয়ে রইল বন্ধ দরজার সামনে।

রুক্‌মা একটু চমকে উঠে বললে, উ কেয়া কিয়া ? দরোয়াজা খুল দেও।

নেহি।—বরুণ অদ্ভুতভাবে হাসলে।

রুক্‌মার মুখে এবার বিরক্তি ফুটল। বললে, কেয়া তামাসা করতা বাবুজী ! খুল দেও দরোয়াজা। হাম ঘর চ্যলা যায়েগা।

কেমন যেন অস্বাভাবিক গলায় বরুণ বলতে লাগল, রুক্‌মা শুনো ! রাত আঁধেরা, আওর বাহারমে বহুৎ জাড়া ! মৎ ঘর যাও, আজ রাতমে তুম ইঁহা ঠ্যায়রো !

পুরুষের দৃষ্টি নারীর চিনতে দেরি হয় না। বন্য পাহাড়ী হলেও রুক্‌মা মেয়ে। বরুণের চোখের দিকে তাকিয়ে, তার ভেতরকার আদিম জন্তুটাকে চিনতে রুক্‌মার এক মুহূর্তও দেরি হল না। গুহাশায়ী জন্তুটা হঠাৎ আজ গুহার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছে। তার রাক্ষুসে চেহারাটা দেখে সাহসী পাহাড়ী মেয়ে রুক্‌মাও ভয় পেয়ে গেল।

বরুণ আস্তে আস্তে এগোচ্ছে, আর রুক্‌মা এক পা এক-পা করে ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। পিছোতে পিছোতে সোফার ওপর পড়ে গেল রুক্‌মা, আর তৎক্ষণাৎ বরুণ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। দু-হাতে সেই পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবন দিয়ে গড়া দেহটা তুলে নিয়ে খাটের পুরু গদীর ওপর ছুঁড়ে ফেললে। বলিষ্ঠ হাতের একটানে ছিঁড়ে গেল সোয়েটার, টুকরো হয়ে গেল ভেতরের জ্যাকেট, ফালা ফালা হয়ে গেল ছিটের ফ্রক। চিৎকার করে উঠতে গেল রুক্‌মা, তার আগেই লোলুপ একজোড়া ঠোঁট রুক্‌মার পাতলা লালচে ঠোঁট দুখানা চেপে ধরলে।

পারল না—সে-রাতে রুক্‌মা কিছুতেই ঠেকাতে পারল না বরুণকে। আদিম প্রবৃত্তির হাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল পাহাড়ী গোলাপ !

শীতের ঝোড়ো হাওয়া তখন আরো প্রমত্ত হয়েছে !

রাতের ঘড়ির সময়ের কাঁটা আরো ক'টা ঘর পার হয়ে গেল, বরুণের খেয়াল ছিল না। গলাটা শুকিয়ে উঠেছে। ছোট একটা পেগ হুইস্কি নিয়ে বরুণ নিট খেয়ে ফেললে। তারপর সোফায় বসে, সিগারেট ধরিয়ে, মুখ তুলতেই দেখল, বিছানায় রুক্‌মা উঠে বসেছে।

তার গোটা চেহারাই এখন বদলে গেছে। ও যেন আগের সেই রুক্‌মা নয়। ছেঁড়া সোয়েটারের ফাঁকে রক্তচিহ্ন আঁকা বাম স্তনটা বেরিয়ে আছে। ফালি-করা ফ্রকের ভেতর থেকে একটা ধবধবে সুপুষ্ট উরু সম্পূর্ণ অনাবৃত। মাথার রুমাল খসে পড়েছে। একগোছা চুল একটা চোখ ঢেকে মুখের ওপর নেমে এসেছে। আরেকটা ছোট জ্বলজ্বলে চোখ যেন একটুকরো জলন্ত কয়লা ! মুখ থেকে পাকা আপেলের রঙ কে যেন মুছে দিয়েছে। সারা মুখখানায় মার্বেল পাথরের শ্বেত কাঠিন্য।

বরুণ সিগারেট টানতে ভুলে গেল।

আস্তে আস্তে খাট থেকে নামল রুক্‌মা। বরুণের দিকে এক চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি ফেলে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর সাপের মত হিসহিস স্বরে বলতে লাগল, তুম বদমাস ! তুম খারাপ আদমি হ্যায় ! হামকো খারাব কর দিয়া। হাম ইসকো বদলা লেগা—জরুর বদলা লেগা !

বরুণ নরম গলায় বললে, রুক্‌মা, কিঁউ গোসসা করতা ? যো হো গিয়া, উসকো যানে দেও।

তিক্ত ঘৃণায় রুক্‌মা বলে উঠল, নেহি, কভি নেহি। কাল সবেরে হাম সব কোইকো বোলেগা তুম

কিতনা বদমাস—কিতনা শয়তান হ্যায়।

তারপর পাহাড়ী ভাষায় বিড়বিড় করে গাল পাড়তে লাগল।

মনে মনে প্রমাদ গুণলে বরুণ। সর্বনাশ! মেয়েটা তাকে ব্ল্যাকমেল করবে? নাকি ব্ল্যাকমেলিংয়ের ভয় দেখিয়ে দেহের দাম আদায় করতে চায়?

পার্স থেকে একখানা একশো টাকার নোট বার করে বরুণ বললে, রুক্‌মা, তুমকো হাম প্যার করতা! ইয়ে লেও—

নোটখানা ছোঁ মেরে নিয়ে, রুক্‌মা তার ওপর থুথু ফেললে। তারপর নোট ছুঁড়ে ফেলে, প্রচণ্ড আক্রোশে ভারী তিব্বতী ফুলদানিটা তুলে বরুণের দিকে লক্ষ্য করলে। সঙ্গে সঙ্গে বরুণ তার হাত চেপে ধরে ফুলদানিটা ছিনিয়ে নিলে।

কিন্তু পাহাড়ী রক্তে তখন আগুন ধরে গেছে। ক্রুদ্ধ বনবিড়ালীর মত হিংস্র হয়ে উঠেছে মেয়েটা। হাতের কাছে হুইস্কির বোতলটা পেয়ে, সেটা নিয়েই সে আবার আক্রমণ করলে। এবারেও বরুণ তার হাত মুচড়ে বোতল কেড়ে নিলে।

ব্যর্থ আক্রোশে রুক্‌মা বলে উঠল, তুমকো হাম নেহি ছোড়েগা—আভি সব কোইকো বোলেগা তুম বদমাস—তুম হামকো খারাব কিয়া হ্যায়।

রুক্‌মা দরজার দিকে ছুটে গেল। কিন্তু তার আগেই বরুণ দরজা আগলে দাঁড়িয়েছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে রুক্‌মা বললে, হট যা বদমাস!

বরুণ নড়ল না।

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে রুক্‌মা আবার বললে, যা, হট যা—নেহি তো হাম চিল্লায়গা!

বরুণ তবু অনড়। তার রক্ত টগবগ করে ফুটছে।

রুক্‌মা এবার মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠতে গেল। কিন্তু গলা চিরে চিৎকার বোরোতে না বেরোতেই বলিষ্ঠ দুখানা হাতের কঠিন আঙুলগুলো তার কণ্ঠনালীকে সাঁড়াশির মত চেপে ধরল। রুক্‌মা প্রাণপণে ছাড়াতে চেষ্টা করল। পারল না। আঙুলের সাঁড়াশি তার কণ্ঠনালীর ওপর দুদিক থেকে চাপ দিতে লাগল। জোরে—আরো জোরে—আরো আরো জোরে—

রুক্‌মার ছোট ছোট চোখ দুটো বড় হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল। হলদেটে দাঁতের ফাঁকে জিভখানা অস্বাভাবিক লম্বা হয়ে ঝুলে পড়ল। তারপর ছটফট করতে করতে একসময় স্থির হয়ে গেল রুক্‌মা। আঙুলের সাঁড়াশি শিথিল হতেই তার দেহ একটা বস্তার মত ধপ করে পড়ে গেল মেঝেয় কার্পেটের ওপর।

সেদিকে তাকিয়ে বরুণ পুতুলের মত কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল মনে নেই। মাথার ভেতরটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেছে। কি ঘটে গেল, কিছুই ধারণা করতে পারছে না। হঠাৎ কে যেন তাকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে তুললে। তৎক্ষণাৎ মেঝেয় বসে পড়ে সে রুকমার গায়ে নাড়া দিয়ে দেখলে, হাতের নাড়ী টিপলে, বুকে কান পেতে শোনার চেষ্টা করলে। না, নাড়ীতে স্পন্দন নেই, বুক ধুকধুক করছে না। রুক্‌মার জীবনের ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে!

ভয়ের একটা হিমস্রোত বরুণের শিরদাঁড়া দিয়ে নেমে যেতে লাগল। রুক্‌মাকে সে খুন করে ফেলেছে!

এখন? এখন কি করবে সে? কি করা উচিত?

প্রাণী মাত্রেরই যে সহজাত আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি থাকে, সেই প্রবৃত্তি তার কানে কানে বললে, এখন নিজেকে বাঁচাতে হবে! যে মরবার সে মরেছে, কিন্তু তাকে বাঁচতেই হবে।

বরুণ নিজেকে অনেকখানি শক্ত করলে। মুখ তুলে তাকাতে চোখ পড়ল উত্তরের জানলার দিকে। কাচের সার্শিতে শীতের ঝোড়ো হাওয়া ধাক্কা দিচ্ছে। যেন কিছু বলতে চায় বরুণকে। কি বলতে চায়? বুঝেছে, বরুণ তা বুঝেছে! উঠে গিয়ে উত্তরের কাচের সার্শি খুলে দিলে সে। একঝলক হিমশীতল হাওয়া যেন বরফের কুচি ছিটিয়ে দিলে তার মুখ চোখে। বরুণ ফিরে এল রুক্‌মার কাছে। দু-হাতে তুলে নিলে তার দেহটা, তারপর আবার জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। চার ফুট সমচতুষ্কোণ ফ্রেঞ্চউইণ্ডো। গরাদ নেই, গ্রীল নেই। যেন বরুণের সুবিধের জন্যেই নেই। এক মুহূর্ত ভেবে, বরুণ রুক্‌মার নিস্পন্দ দেহটা জানলা গলিয়ে অন্ধকারে ছেড়ে দিলে। অতলান্ত

খাদের কোন অতলে গিয়ে পৌঁছল রুক্‌মা, কে জানে !

ব্যস, নিশ্চিন্ত !

কাচের সার্শি আবার বন্ধ করে দিলে বরুণ।

কাল যদি পুলিশ আসে, আসুক। ততক্ষণে রুক্‌মার দেহের টুকরোগুলো খাদের বুনো জন্তুগুলোর পেটে হজম হয়ে গেছে !

তারপর এগারো বছর ধরে অনেক ঘুরেছে বিজনেসম্যান বরুণ। মাকড়সার জালের মত ভারতবর্ষের রেললাইনের ধারে বহু স্টেশনে নেমে পড়েছে, বহু সরাইখানায় রাত কাটিয়েছে, বহু নারীসঙ্গের স্বাদ পেয়েছে। আর, তাদেরই ভিড়ে কবে কখন হারিয়ে গেছে মুসৌরীর পাহাড়ী মেয়ে রুক্‌মা। সারা জীবনেও তাকে মনে পড়ত না, যদি এগারো বছর বাদে আবার মুসৌরীতে আসতে না হত। এই হিলম্যান হোটেলের দোতলার শেষ ঘরখানায় পা দিয়ে আবার মনে পড়ে গেল—পুরোন ফিল্মের মত সবই মনে পড়ে গেল ! এমন কি, আজকের মত সে-রাতের শীতের হাওয়ায় ঝড় উঠেছিল, তাও !

কিন্তু কেনই বা মনে করা ? কি হবে মনে করে ? রুক্‌মা মরেছে, ফুরিয়ে গেছে। তার নিয়তি তাকে টেনেছিল ওই অতলান্ত খাদে। একটা পাহাড়ী বস্তির মেয়ের দেহের দাম কত হতে পারে ? বরুণ তো ঢের বেশিই দিতে চেয়েছিল। তবু সে ব্ল্যাকমেলের ভয় দেখাল কেন ? কেন সে চেষ্টা করল প্রতিহিংসা নিতে ? কোথায় রইল তার প্রতিহিংসা ? বরুণ তো তাকে মারতে চায়নি, সে মরবে বলেই এসেছিল তার জ্বলন্ত যৌবন নিয়ে। বরুণ কি করবে ?

কিন্তু আর নয়। আর ভাবতে ভাল লাগছে না। চুলোয় যাক রুক্‌মা। তার মৃত্যু রহস্য যখন সে ছাড়া পৃথিবীর দ্বিতীয় ব্যক্তি জানে না, তখন কেন আর মাথা ঘামানো ? অতএব জীবন থেকে মুছে ফেলে দাও রুক্‌মাকে—মুছে ফেলে দাও এগারো বছর পূর্বের মার্চের একটা বিশ্রী রাত !

কিন্তু সেই বিশ্রী রাতটা মুছতে গিয়ে মোছা যাচ্ছে না। আজকের এই সেপ্টেম্বর রাতটা ঠিক সেই রকম। তেমনি ঠাণ্ডা, তেমনি ঝোড়ো। পাগলাটে শীতের হাওয়া ঠিক তেমনি করেই উত্তরের কাচের সার্শিতে ধাক্কা দিচ্ছে। যেন বলছে, আমায় চিনতে পারছ ? আমি এগারো বছর আগের সেই বিশ্রী রাতের সাক্ষী।

ড্যাম ইট ! হলই বা সাক্ষী। বরুণের কিছু আসে যায় না। রুক্‌মা বেঁচে থাকলে না হয় ভয় থাকত ! কিন্তু মরা মানুষ তো ফিরে আসে না ! সুতরাং যা কিছু অস্বস্তি, মন থেকে দূর করে দাও। নিশ্চিন্ত, একেবারে নিশ্চিন্ত !

চার্চের ঘড়িতে ঢং করে একটা শব্দ হল। সাড়ে এগারোটা।

আজকের রাতটা বড় বেশি অন্ধকার, বড় বেশি নিশুতি। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাটাও বাড়ছে। এক কাপ গরম কফি খেলে হত। ডিনারের পর আজ আর কফির অর্ডার দেওয়া হয়নি। ভুল হয়ে গেছে ! এতক্ষণে ডাইনিং রুম, কিচেন বন্ধ হয়ে গেছে নিশ্চয়। ইস, কী ভুল হয়ে গেছে !

দরজায় টোকা পড়ল।

অবাক হয়ে বরুণ জিজ্ঞেস করলে, কৌন ?

বন্ধ দরজার বাইরে থেকে জবাব এল, রুক্‌মা। কফি লায়া বাবুজী।

দারুণ খুশি হয়ে গেল বরুণ। শীতের সময় শোবার আগে এক কাপ কফি খাওয়া তার বরাবরের অভ্যাস। মিসেস বড়ুয়া ঠিক মনে রেখে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ তাঁকে !

ফায়ারপ্লেসের পাশ থেকে উঠে গিয়ে, বরুণ দরজা খুলে দিলে। আর খুলে দিয়েই দু-পা পিছিয়ে এল।

আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল রুক্‌মা। হাতে কফির ট্রে নেই। কিন্তু এ কোন রুক্‌মা ? এ তো কিছুক্ষণ আগে দেখা তামাটে রঙের মাঝবয়সী রুক্‌মা নয়, এ রুক্‌মাকে বরুণ দেখেছিল এগারো বছর আগে ! এ যে সেই জ্বলন্ত যৌবনবতী রুক্‌মা ! আদিম প্রবৃত্তির হাতে ছিন্নভিন্ন সেই পাহাড়ী গোলাপ !

ছেঁড়া সোয়েটারের ফাঁকে রক্তচিহ্ন-আঁকা বাম স্তনটা বেরিয়ে আছে। ফালা ফালা করে চেরা

ফ্রকের বাইরে ধবধবে সুপুষ্ট একটা উরু সম্পূর্ণ অনাবৃত। এলোমেলো লালচে চুলের একগোছা একট
চোখ ঢেকে দিয়ে মুখের ওপর নেমে এসেছে। আরেকটা ছোট চোখে জ্বলন্ত কয়লার আগুন!

কিন্তু এ কি করে সম্ভব? মরা মানুষ কি ফিরে আসে? ফিরে আসতে পারে?

বরুণের বিস্ফারিত চোখ সেই জ্বলন্ত অঙ্গার চোখের দিকে। রুক্মার এক চোখের অপলক তী
দৃষ্টি বরুণের দিকে।

একটা ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা হিমস্রোত বরুণের শিরদাঁড়া বেয়ে শিরশির করে নামছে। সারা দেহ কাঁপ
থরথর করে। চিৎকার করতে চাইল সে, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না।

পলকহীন এক চোখের লক্ষ্য বরুণের দিকে রেখে, রুক্মা এক-পা এক-পা করে এগোচ্ছে। আর
বরুণ এক-পা এক-পা করে পিছু হটছে। ঠিক যেমন করে এগারো বছর আগে সেই মার্চের রাতে
রুক্মা আস্তে আস্তে পিছু হটেছিল।

শীতের ঝোড়ো হাওয়া তখন উত্তরের কাচের সার্শিতে ধাক্কা দিয়ে বরুণকে বলছে, এস, আরো
সরে এস, একেবারে জানলার ধারে—খুলে দাও কাচের সার্শি, তারপর দেখ অতলান্ত খাদ কী গভীর!
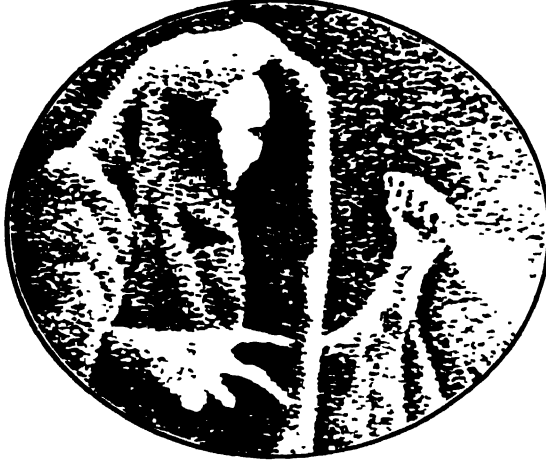
ছক্কা মিয়ার টমটম

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এ মুলুকে রাতবিরেতে বাস ফেল করলে ছক্কা মিয়ার টমটম ছাড়া আর উপায় ছিল না। ঝড়-বৃষ্টি হোক, মহাপ্রলয় হোক, রাতের বেলা ভীমপুর গদাইতলা দশমাইল পিচের সড়কে যদি কষ্ট করে একটু দাঁড়িয়ে থাকা যায়, ছক্কা মিয়ার টমটমের দেখা মিলবেই মিলবে। অন্ধকার ঝড়বৃষ্টির মধ্যে প্রথমে ঠাহর হবে একচিলতে টিমটিমে আলো। তারপর আলোটা এগিয়ে আসবে আর এগিয়ে আসবে মেঘের ডাকাডাকি যতই থাক, কানে বাজবে অদ্ভুত এক আওয়াজ টং লং...টং লং... লং। বিদ্যুতের আলোয় হঠাৎ চোখে পড়বে কালো এক এক্কাগাড়ি—তেরপলের চৌকা একটা টোপর চাপানো। সামনে কালো এক মূর্তি আর নড়বড় করে দৌড়ানো এক টাট্টু!

মুখে কিছু বলার দরকার নেই। ছক্কা মিয়ার টমটম সওয়ারি দেখামাত্র থেমে যাবে। তখন একলাফে পেছনের তেরপল চালিয়ে চৌকা টোপরে ঢুকলেই নিশ্চিন্ত। আবাব টলতে টলতে চলতে থাকবে ছক্কা মিয়ার টমটম—টং...লং...টং লং।

টমটম কথাটা এসেছে ইংরেজি 'ট্যান্ডেম্' থেকে—যে গাড়ির সামনে কয়েক সার ঘোড়া যেত। কিন্তু ভীমপুরের ছক্কা মিয়ার এক্কাগাড়ির ঘোড়া মোটে এক। তবু আদর করে লোকে নাম দিয়ে দিয়েছিল টমটম।

ছক্কা মিয়ার চেহারাটি কিন্তু ভারি বদরাগী। ঢ্যাঙা, টিঙটিঙে রোগা, একটু কুঁজো গড়ন। লম্বাটে মুখের বাঁকানো নাকের তলায় পেল্লায় গোঁফ। চামড়ার রঙ রোদপড়া তামাটে।

তেমনি তার টাট্টুও। যেমন মনিব, তেমনি ঘোড়া। হাড়-জিরজিরে লম্বাটে গড়ন। ঠ্যাং চতুষ্টয় যেন চারখানি কাঠি। মাথাটা দেখে সময় সময় ঠাহর করা কঠিন, এই প্রাণীটি সিংঙ্গি, না প্রকৃত একটি ঘোড়া। হ্রেষাধ্বনি করলেই পিলে চমকে ওঠে। ভীমপুর বাজারের তাবৎ নেড়িকুকুর দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যায় লেজ গুটিয়ে।

লোকে আজকাল রাস্তা চলতে বাস-রিকশোই পছন্দ করে। ছক্কা মিয়ার টমটম চড়লে হাড়মাংস

দলা পাকাতে থাকে বলেও না। কালের রেওয়াজ আসলে।

কিন্তু ওই যে বলেছি, রাতবিরেতে বাস ফেল করলে তখন উপায় ? ছক্কা মিয়া এটা বোঝে এবং দিনে তার টমটমের বাহনটিকে নিয়ে বনজঙ্গল বা ঝিলে চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। রাতের বেলা ছোট্ট বাজারের চৌরাস্তায় শিরীষ গাছের তলায় ঘাপটি পেতে বসে থাকে। পাশেই টমটম রেডি।...

সেবার পুজোর সময় কলকাতা থেকে ছোটমামার সঙ্গে আসছি। মাঝপথে একখানে ট্রেন দাঁড়িয়ে রইল তো রইল। আর নড়ার নাম নেই। ব্যাপার কী ? না—আগের স্টেশনে মালগাড়ি বেলাইন। বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। তারপর যখন ট্রেনের চাকা গড়াল, ছোটমামা বেজার মুখে বললেন, 'বরাতে আবার হতচ্ছাড়া ছক্কা মিয়ার টমটম আছে। বাপ্‌স্ !'

ওই টমটমে কখনও চাপিনি। তাই কথাটা শুনে আমার আনন্দ হয়েছিল। বললুম, 'খুব মজা হবে, তাই না ছোটমামা ?'

ছোটমামা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'মজা হবে ! বুঝবে ঠ্যালাটা 'খন।'

ঠ্যালাটা কিসের বুঝলাম না আগেভাগে। দেখলাম, ছোটমামা ট্রেনের জানলা দিয়ে মুণ্ডু বাড়িয়ে বারবার যেন আকাশ দেখছেন। একটু পরে বললেন, 'খুব ঝড়বৃষ্টি হবে ! কার মুখ দেখে যে বেরিয়েছিলাম। বড়দা অত করে বললেন, তবু থাকলুম না। ছ্যা ছ্যা, আমার কী আক্কেল !'

ভীমপুর স্টেশনে যখন নামলুম, তখনও কিন্তু ঝড়বৃষ্টির পাত্তা নেই। রাত একটা বেজে গেছে। বাজার নিশুতি। চৌমাথায় শিরীষতলায় গিয়ে দেখি, ছক্কা মিয়ার টমটম দাঁড়িয়ে আছে। বলা-কওয়া নেই, দরদস্তুর নেই, ছোটমামা টমটমের পেছনদিকে তেরপল তুলে ঢুকে ডাকলেন, 'হাঁ করে দেখছিস কী ? উঠে আয়। এক্ষুনি একগাদা লোক এসে ভাল জায়গা দখল করে ফেলবে যে।'

ভেতরে খড়ের পুরু গাদার ওপর তেরপল পাতা। কেমন একটা বিচ্ছিরি গন্ধ। অন্ধকারও বটে। যেন এক গুহায় ঢুকেছি। সামনে সরে গিয়ে ছোটমামা পর্দাটা ফাঁক করে রাখলেন। একটু পরে আরও জনাদুই লোক ভেতরে ঢুকে পড়ল। সে এক ঠাসাঠাসি অবস্থা।

আর তারপরই আচমকা চিক্কুর ছেড়ে ছেড়ে মেঘ ডাকল এবং শনশন করে এসে গেল একটা জোরালো হাওয়া। ছোটমামা বললেন, 'ওই যা বলেছিলুম। হল তো ?'

ছক্কা মিয়া সামনের আসন থেকে ঘোষণা করল, 'আরাম করে বসুন বাবুমশাইরা ! এবার রওনা দিই।' তার ঘোড়াটাও মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চিঁ হিঁ হিঁ ডাক ছেড়ে যখন পা বাড়াল, তখন টের পেলাম কেন ছোটমামা 'বাপ্‌স্' বলে মুখখানা তুম্বো করেছিলেন।

সত্যি 'বাপ্‌স্'। হাড়গোড় ভেঙে যাবার দাখিল। বাইরে হাওয়ার হইচই আর মেঘের হাঁকডাক যত বাড়ছে, ছক্কা মিয়ার ঘোড়াটাও তত যেন তেজী হয়ে উঠছে। একটু পরেই চড়বড়িয়ে বৃষ্টির ফোঁটা টোপরের তেরপলে পড়তে শুরু করল। ছোটমামা ফাঁকটুকু বন্ধ করে দিলেন। আমি তখন অবাক। ছক্কা মিয়া বাইরে বসে চাবুক হাঁকাচ্ছে। ওর বৃষ্টির ছাঁট লাগবে না ?

রাস্তাটা ঘুরে রেল লাইন পেরুলে দুধারে বিশাল আদিগন্ত মাঠ। ফাঁকা জায়গায় ঝড়বৃষ্টিটা মিয়ার টমটমকে বেশ বাগে পেল। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি উল্টে গিয়ে রাস্তার ধারের গভীর খালে নাকানিচুবানি খাবে। আমাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে, সেও ভাববার কথা।

কিন্তু আশ্চর্য, টমটম সমান তালে নড়বড়িয়ে টলতে টলতে চলেছে। মাঝে মাঝে ঝড়বৃষ্টির শব্দের ভেতর শোনা যাচ্ছে অদ্ভুত এক শব্দ—টং লং...টং লং ...টং লং। কখনও ছক্কা মিয়ার টাট্টুঘোড়া বিকট চিঁ হিঁ করে চেঁচিয়ে উঠছে। তারিফ করে আমার পেছন থেকে এক সওয়ারি বলে উঠলেন, 'পক্ষি-রাজের বাচ্চা !'

এতক্ষণে তেরপলের টোপর থেকে ফুটো দিয়ে জল চোঁয়াতে থাকল। সওয়ারিরা নড়েচড়ে বসার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সরবে কোথায় ? বেহদ্দ ভিজে সপসপে হয়ে যাচ্ছিল জামাকাপড়। একসময় ছোটমামা হঠাৎ বাজখাঁই চেঁচিয়ে বললেন, 'আঃ ! হচ্ছে কী, হচ্ছে কী মশাই ? আমার ওপর পড়ছেন কেন ?'

'আপনার ওপর আমি পড়লুম, না আপনি আমার ওপর পড়লেন ?'

'কী বাজে কথা বলছেন ? আমায় ঠাণ্ডা করে দিয়ে আবার তক্ক ? আপনি মানুষ, না বরফ ?'

'আমি বরফ ? আপনিই তো বরফ। ইস। কী ঠাণ্ডা ! হাড় অব্দি জমে গেল দেখছেন না !'

আমার পিছনের সওয়ারি চাপা খিকখিক করে হেসে আমার কানের ওপর বলল, 'ঝগড়া বেধে গেছে। বরাবর যায়, বুঝলেন তো মশাই ? ছক্কা মিয়ার টমটমের এই নিয়ম। খিক্‌খিক্ খিক্‌খিক্।'

এমন বিদঘুটে হাসি কখনও শুনিনি। কিন্তু এঁর শ্বাসপ্রশ্বাসও যে বরফের মতো হিম। বললুম, 'ইস ! একটু সরে বসুন না। বড্ড ঠাণ্ডা করে যে !'

লোকটা ভারি অদ্ভুত ! সে ওই বিদঘুটে খিক্‌খিক্ খিক্ হাসতে হাসতে আরও যেন ঠেসে ধরল আমাকে। চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ছোটমামা ! ছোটমামা !'

কিন্তু ছোটমামার কোন সাড়া পেলাম না। টোপরের ভেতরটা ঘন অন্ধকার। ফের ডাকলুম, 'ছোটমামা ! কোথায় তুমি ?'

লোকটা সেই খিক্ খিক্ হাসির মধ্যে বলল, 'আর ছোটমামা বড়মামা ! মামারা এখন রাস্তায় পড়ে কুস্তি করছে।'

হতভম্ব হয়ে হাত বাড়িয়ে ছোটমামাকে খুঁজলুম। সুটকেশটা হাতে ঠেকল। কিন্তু সত্যিই ছোটমামা নেই। তারপর পেছনের দিকে চোখ পড়ল। ওদিককার পর্দাটা যেন ফর্দাফাঁই। বৃষ্টির ছাঁট এসে ঢুকছে। আমি প্রচণ্ড চেঁচিয়ে বললাম, 'ছক্কা মিয়া ! ছক্কা মিয়া ! গাড়ি থামাও ! গাড়ি থামাও !'

পেছনের সওয়ারি ফের সেই বিদঘুটে হাসি হেসে উঠল। এবার আমি সামনের পর্দা ঠেলে সরিয়ে ছক্কা মিয়ার ভেজা জামা খামচে ধরলুম। 'গাড়ি থামাও, গাড়ি থামাও বলছি !'

এতক্ষণে যেন ছক্কা মিয়া আমার কথা শুনতে পেল। ঘুরে বলল, 'কী হয়েছে বাবুমশাই ?'

'ছোটমামা পড়ে গেছেন কোথায়।'

ছক্কা মিয়া বলল, 'বালাই যাট ! পড়বেন কোথায় ? ঠিকই আছেন। খুঁজে দেখুন না।'

'নেই। তুমি গাড়ি থামাবে কিনা বলো !'

'সামনে একটা মন্দির আছে ! সেখানে থামাব।' ছক্কা মিয়া চাবুক নেড়ে ঘোড়াটাকে খুঁচিয়ে দিয়ে বলল, 'যেখানে-সেখানে থামলে ঝড়বৃষ্টিতে কষ্ট পাবেন বাবুমশাই। বুঝলেন না ? ওইখানে থামিয়ে আপনার ছোটমামাকে খুঁজবেন বরঞ্চ।'

মন্দিরের আটচালার সামনে গাড়ি দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি ছক্কা মিয়ার পাশ দিয়ে লাফ দিলাম। তারপর আটচালায় ঢুকে পড়লাম। বুদ্ধি করে ছোটমামার সুটকেশ আর মামার কিটব্যাগটাও দুহাতে নিয়েছিলাম।

কিন্তু আটচালায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম, ছক্কা মিয়ার টমটম বৃষ্টির মধ্যে আচমকা গড়াতে শুরু করেছে। ঘোড়াটা চিঁ হিঁ হিঁ ডাক ডেকে তেমনি নড়বড়ে পায়ে দৌড়তে লেগেছে। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। মুখে কথাটি পর্যন্ত আর ফুটল না। ভারি অদ্ভুত লোক তো ছক্কা মিয়া !

এখন ঝড়টা প্রায় কমে এসেছে। বৃষ্টি সমানে পড়ছে। নির্জন আটচালায় দাঁড়িয়ে আছি। প্যান্ট শার্ট ভিজে চবচব করছে। প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা আর কি !

কিছুক্ষণ পরে বিদ্যুতের আলোয় দেখি, কে যেন আসছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'কে—কে ?'

ছোটমামার সাড়া এল। 'অন্তু নাকি রে ?'

আমি কাঁদো কাঁদো গলায় বললুম, 'হ্যাঁ। তোমার কী হয়েছিল ছোটমামা ?'

ছোটমামা আটচালায় ঢুকে বললেন, 'কী হবে আবার। যা হবার, তাই হয়েছিল। তবে ব্যাটাকে এবার যা জব্দ করেছি, আর কক্ষনো ছক্কা মিয়ার টমটমে ভুলেও চড়তে আসবে না।'

ছোটমামা আমার কাছে সুটকেশ দেখে খুশি হয়ে বললেন, 'জানতুম, তুই ঠিকই নেমে পড়ে আমার অপেক্ষা করবি কোথাও।'

'কিন্তু লোকটা কোথায় রইল ?'

হাসলেন ছোটমামা। 'ওকে তুই লোক বলছিস এখনও। ওটা কি লোক নাকি ?'

'তবে কে ?'

'বুঝলিনে ? ওর ঘাড়ে একটা চন্দ্রবিন্দু বসিয়ে দে, তাহলে বুঝবি। থাকগে, এখন রাতবিরেতে ও-নিয়ে আলোচনা করতে নেই। ব্যাপারটা কী জানিস অন্তু ? রাতবিরেতে অমন দু-একজন সওয়ারি

ছক্কা মিয়ার টমটমে উঠে পড়বে। তারপর কী করবে জানিস ? অন্ধকারে ঘাড় মটকানোর তাল করবে। যেই টের পেয়েছি আমার পেছনের লোকটার মতলব কী, অমনি ওকে ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ব্যাটা পড়বার সময় অ্যায়সা হ্যাঁচকা টান মেরেছে যে আমিও ওর সঙ্গে তেরপলের ফাঁক দিয়ে নিচে পড়েছি।'

'তারপর ? তারপর ছোটমামা ?'

'তারপর আর কী ? ঝড় বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় কুংফু জুডো যা সব অ্যাদ্দিন কষ্ট করে শিখেছি. চালিয়ে গেলুম। এক প্যাঁচে ওকে এমন করে ছুড়লুম যে একেবারে বিশ ফুট গভীর খাদে গিয়ে পড়ল। এতক্ষণ কোন বাজ পড়া ন্যাড়া গাছের ডগায় বসে হিঁপিয়ে হিঁপিয়ে কাঁদছে।' ছোটমামা হাসতে হাসতে গায়ের জামা খুলে নিঙড়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'ঘন্টা তিনেক কাটাতে পারলেই ফার্স্ট বাস পেয়ে যাব। জামাটা নিঙড়ে নে। ব্যাগ থেকে তোয়ালে বের করে মাথা মুছে ফেল। বাপ্‌স্ !'

আমি শুধু ভাবছিলুম, তাহলে আমার পেছনকার সেই সওয়ারিও কি লোক নয়, সেই লোকটিও কি আমার ঘাড় মটকানোর তালে ছিল ? অন্য লোকটার মত ?

আমার মুখ দিয়ে ছোটমামার প্রতিধ্বনি বেরিয়ে গেল, 'বাপ্‌স্ !...'

ছক্কা মিয়ার টমটমে তারপর আর ভুলেও চাপার কথা ভাবতুম না। কিন্তু বছর দশেক পরে, যখন কিনা আমি পুরোপুরি সাবালক, একরাতে ভীমপুর স্টেশনে নেমে শুনলুম, লাস্ট বাস চলে গেছে।

স্টেশনবাজার তখন নিঃঝুম। সময়টা শীতের। আকাশে একটুকরো চাঁদও আছে। কিন্তু কুয়াশার ভেতর তার দশা বেজায় করুণ। একটা চায়ের দোকান খোলা ছিল। শীতের রাত বারোটায় চা-ওলা সবে ঝাঁপ ফেলার যোগাড় করছিল, আমাকে দেখে বুঝি তার দয়া হল। এক কাপ চা খাইয়ে দিল। শেষে বলল, 'বাবুমশাই তাহলে যাবেন কিসে গদাইতলা ?'

'কিসে আর যাব ? বরং দেখি যদি ওয়েটিং রুমে রাতটা কাটানো যায়।'

চা-ওলা মুচকি হেসে বলল, 'ছক্কা মিয়ার টমটমেও যেতে পারেন।'

ছক্কা মিয়ার টমটমের কথা ভুলে গিয়েছিলুম। সেবার ঝড়বৃষ্টি ছিল, কম। ছোটমামাও বড় গপ্পে মানুষ ছিলেন।

হনহন করে চৌমাথায় চলে গেলুম। গিয়ে দেখি, শিরীষতলায় আগুন জ্বেলে বসে আছে সেই আদি অকৃত্রিম ছক্কা মিয়া। পাশেই তার টমটম তৈরি। ঘোড়াটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে। শীত বাঁচাতে তার পিঠে একটুকরো চটের জামা। বললুম, 'গদাইতলা যাবে নাকি ছক্কা মিয়া ?'

ছক্কা মিয়া ইশারায় টমটম চড়তে বলল।

আজ আর কোন সওয়ারি এল না দেখে আশ্বস্ত হওয়া গেল। টমটম তেমনি নড়বড় করে চলতে শুরু করল। ঘোড়াটাও বিকট চিঁ-হিঁ-হিঁ ডাকতে ভুলল না। অবিকল সব আগের মতই আছে। এমনকি ছক্কা মিয়ার পেল্লায় গোঁফটারও ভোল বদলায়নি। আর সে অদ্ভুত ঘন্টার শব্দ, টং লং...টং লং...টং লং।

কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া তেরপলের ঘেরাটোপের ছেঁদা দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে উত্যক্ত করছিল। জড়সড় হয়ে কোণা ঘেঁসে রইলুম। সামনেকার মোটা ছেঁদা দিয়ে বাইরে কুয়াশা মাখানো জ্যোৎস্নায় ঝিমধরা মাঠঘাট চোখে পড়ছিল। গাছগুলো আগাপাছতলা কুয়াশার আলোয়ান চাপিয়েছে ; আর মাথায় পড়েছে কুয়াশার টুপি। টুকরো চাঁদখানা ছেঁড়া ঘুড়ির মত একটা ন্যাড়া তালগাছের ঘাড়ে আটকে গেছে দেখতে পাচ্ছিলুম।

মাইলটাক চলার পর রাস্তার ধার থেকে কে বাজখাঁই হাঁক ছাড়ল, 'রোখো, রোখো !' অমনি টমটম থেমে গেল। ঘোড়াটাও স্বভাবমত সামনে দু'ঠ্যাং তুলে একখানা চিঁ-হিঁ ছাড়ল। তারপর ছক্কা মিয়ার গলা শুনলুম। 'দারোগাবাবু নাকি ? সেলাম, সেলাম।'

মুখ বাড়িয়ে দেখি, বিশাল এক ওভারকোট পরা মূর্তি। সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কোন এক দারোগাবাবু। বললেন, 'রোসো।' সাইকেলখানা তুলে দিলেন। তারপর যখন টোপরের ভেতর ঢুকলেন, মনে হল ভূমিকম্প হচ্ছে। ঢুকেই আমাকে টের পেয়ে চমকানো গলায় বলে উঠলেন,

'কে ? কে ?'

বললুম, 'আমি।'

'আমি ? আমি কি মানুষের নাম হয় নাকি ?' বলে দারোগাবাবু টর্চ জ্বেলে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাকে দেখে নিলেন। নামধাম বলতেই হল। পুলিশের লোক বলে কথা। সব শুনে উনি বললেন, 'আমি আপনাদের গদাইতলা থানার চার্জে। কিন্তু আপনাকে কখনও দেখিনি।'

বেগতিক দেখে বললুম, 'কলকাতায় আছি বহুকাল। তাই দেখেননি। তা আপনার নামটা জানতে পারি স্যার ?'

'বংকুবিহারী রায়।'

'আসামী ধরতে বেরিয়েছিলেন বুঝি ?' ওঁকে খুশি করার জন্যই বললুম।

বংকু দারোগা জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, 'হুম ! ব্যাটা এক দাগী বেগুনচোর ভীষণ ভোগাচ্ছে। আজ একটা বেগুনক্ষেতে দুজন সেপাই নিয়ে ওত পেতে ছিলুম। তাড়া খেয়ে সটান একটা তালগাছের ডগায় উঠে গেল। তাকে আর নামাতে পারলুম না। তখন সেপাই দুজনকে তালগাছের গোড়ায় বসিয়ে রেখে এলুম। আসতে আসতে হঠাৎ সাইকেলের বেয়াদপি।'

দাগী বেগুনচোর এই শীতকালে সারারাত তালগাছের ডগায় বসে আছে ! কিন্তু তার জন্য নয়, হতভাগা সেপাই দুজনের কথা ভেবে আমার উদ্বেগ হচ্ছিল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আহা !'

'আহা মানে ?' আমাকে ফের টর্চ জ্বেলে সন্দিগ্ধ নজরে দেখে বংকু দারোগা বললেন, 'হুম ! আপনি মশাই এই মড়া-বওয়া গাড়িতে এতরাতে চাপলেন যে। আপনি জানেন, আজকাল সওয়ারি জোটে না বলে ছক্কা মিয়া মড়া বয়ে নিয়ে যায় গঙ্গার ঘাটে !'

'বলেন কী ! তাহলে তো ভয়ের কথা।' অবাক হয়ে বললুম, 'সত্যি ভয়ের কথা। আগে জানলে...'

কথা কেড়ে বংকু দারোগা বললেন, 'হয়তো জেনেশুনেই চেপেছেন। কিচ্ছু বলা যায় না।'

'কেন এ কথা বলছেন ?'

'বলছি আপনার চেহারা দেখে। এমন শুঁটকো রোগা চিমসে বাসি মড়ার মত লোক সচরাচর দেখা যায় না কি না।'

এবার, আমার খুব রাগ হল। 'কী বলতে চান আপনি ?'

'রাতবিরেতে আজকাল ছক্কা মিয়ার টমটমে কে জ্যান্ত, কে মড়া বোঝা যায় না মশাই !'

হাত বাড়িয়ে বললুম, 'এই আমার হাত ! পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, আমি মড়া না জ্যান্ত !'

বংকু দারোগা আমার হাত সরিয়ে দিলেন জোরে। 'বাপ্‌স্ ! এ যে বেজায় ঠাণ্ডা !'

'ঠাণ্ডা হবে না ? শীতের রাতে এই মাঠের মধ্যে হাত কি গরম থাকবে ?'

'না মশাই। এমন রাতে বিস্তর সিঁদেল চোরের হাত পাকড়েছি। তারা কেউ এমন ঠাণ্ডা ছিল না।'

'কী ? আমায় সিঁদেল চোর বললেন !'

বংকু দারোগা গলার ভেতর থেকে বললেন, 'সিঁদেল চোরের ভূত হতেও পারেন। কিচ্ছু বলা যায় না। তখন আহা বলা শুনেই সন্দেহ জেগেছে।'

আর সহ্য হল না। খাপ্পা হয়ে চেঁচালুম, 'পুলিশ হোন, আর যাই হোন, আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি মশাই।'

দারোগাবাবু ফের মুখের ওপর টর্চ জ্বেলে বললেন, 'উঁ হুঁ হুঁ। বড্ড এগিয়ে এসেছেন। সরে বসুন ! সরে বসুন বলছি !'

মুখের ওপর টর্চের আলো কারই বা সহ্য হয় ! 'টর্চ নেভান !' বলে টর্চটা ঠেলে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলুম। টর্চটা নিভে গেল। এবং কোথায় ছিটকে পড়ল। কিন্তু এটাই বোধ হয় ভুল হল। আর বংকু দারোগা বিকট গলায় 'ভূত ! ভূত !' বলে চিক্কু ছেড়ে আমাকে এক রামধাক্কা মারলেন। টোপরের একপাশের জরাজীর্ণ তেরপলের ওপর কাত হয়ে পড়লুম। তেরপলটা ফরফর করে ছিঁড়ে গেল এবং টাল সামলাতে না পেরে গড়িয়ে নিচে পড়ে গেলুম। কানের পাশ দিয়ে চাকা গড়িয়ে গেল প্রচণ্ড বেগে। পলকের জন্য দেখলুম কুয়াশা-ভরা নীলচে জ্যোৎস্নায় কালো টমটম দূরে সরে

যাচ্ছে। ভেসে আসছে অদ্ভুত এক শব্দ টং লং...টং লং...টং লং... !

ভাগ্যিস, রোডস দফতরের লোকেরা রাস্তা মেরামতের জন্য কিনারায় বালির গাদা রেখেছিল। আঘাত টের পেলুম না। সামনে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। লোকেরা লণ্ঠন লাঠিসোঁটা নিয়ে বেরিয়ে এল। তখন ঘটনাটা তাদের আগাগোড়া বলতে হল।

কিন্তু সব শুনে ওরা আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। একজন বলল, 'কী বলছেন বাবু ? ছক্কা মিয়ার টমটম পেলেন কোথায় ? কাল ভীমপুরের কাছেই একটা ট্রাকের ধাক্কায় ছক্কা মিয়া আর তার ঘোড়াটা মারা পড়েছে যে ! ভাগ্যিস, টমটমে একটা মড়া ছিল শুধু। সঙ্গের লোকেরা বাসে চেপে গঙ্গার ধারে গিয়েছিল। কিন্তু অবাক কাণ্ড দেখুন, মড়াটা একেবারে আস্ত ছিল। তুলে নিয়ে গিয়ে ভালয় ভালয় চিতেয় তুলতে পেরেছে।'

বংকু দারোগার ওপর সব রাগ সঙ্গে সঙ্গে ঘুচে গেল। বরং উনি আমাকে বাঁচিয়েই দিয়েছেন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওঁর নিজের ভাগ্যে কী ঘটল কে জানে ! আহা বেচারা !

কী ঘটল, তা পরদিন শুনলুম। বংকুবাবু তখন হাসপাতলে। লোকে বলছে, আসামী ধরতে গিয়ে সাইকেল থেকে পড়ে কোমরের হাড় ভেঙেছে। সাইকেলও অক্ষত নেই। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তো আমি জানি। তবে যাই হোক, আমার ওপর যেটুকু ফাঁড়া গেছে, তার জন্য দায়ী স্টেশন বাজারের সেই ধড়িবাজ চা-ওলা। কেমন হেসে বলেছিল, 'ছক্কা মিয়ার টমটমেও যেতে পারেন।' সব জেনে শুনেও কী অদ্ভুত রসিকতা।

অবশ্য এমনও হতে পারে, সে বলেছিল, 'ছক্কা মিয়ার টমটমেও যেতে পারতেন।' আমিই হয়তো ভুল শুনেছিলুম। ক্রিয়াপদের গোলমাল স্রেফ !...

চুল

অদ্রীশ বর্ধন

যে কাহিনীটি আপনাদের আজ বলতে যাচ্ছি, তা বিশ্বাস করা না করাটা আপনাদের অভিরুচি। কেননা, নিজের মনেই বিশ্বাস উৎপাদন করানোর মত যুক্তি আজও আমি খুঁজে পাইনি।

বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। সালটা খুব সম্ভব উনিশশো বত্রিশ। রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে। শয়নের উদ্যোগ করছি, এমন সময়ে সদর দরজার কলিং বেলটা বেজে উঠল এবং তার মিনিট খানেক পরেই বিবেকের পুরোন চাকর রাধু হাতে তুলে দিলে ওপরে লাল পেন্সিলে 'জরুরী' লেখা ভারী এনভেলাপটা। ভেতরে কয়েক তাড়া কাগজে দ্রুতহস্তে লেখা একটা চিঠি। ড্রইংরুমের সোফায় পাশাপাশি বসে আমি আর রমিতা চিঠিটা পড়তে শুরু করলাম।

প্রিয় আশিস,

সময় খুব অল্প, তাই যথাসম্ভব সংক্ষেপ করে আমার এ কাহিনীটা তোমায় বলে যেতে চাই। এ চিঠি আমার স্বীকৃতি-পত্র—প্রয়োজন হলে যথাস্থানে এটা হাজির করার অধিকারও তোমার রইল।

প্রায় বছর খানেক আগে ফ্রি স্কুল স্ট্রীট ধরে বাড়ি ফিরছিলাম। রাত তখন প্রায় ন'টা। আশপাশের কয়েকটি দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, আরও কয়েকটি বন্ধ হচ্ছে। এমন সময়ে হঠাৎ চোখ পড়ল একটা কিউরিওর দোকানের ওপর।

দোকানটা খুব বড় নয়। বাইরের ধুলো-পড়া কাচের শো-কেসে পুরোন আমলের বহু দর্শনীয় বস্তু থরে থরে সাজানো। জানোই তো আমার হবি কি, দাঁড়িয়ে পড়লাম সেখানে। শো-কেসের একেবারে পেছন দিকে একটা সেল্‌ফের ওপর দেখলাম একটা গোলাকার তামার ডিবে। ডিবেটার আকার মোটেই পাউডার-কেসের মত নয়, আর বোধ হয় সেই কারণেই জিনিসটার ওপর আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল প্রথম থেকেই। সঠিক কি কারণে জানি না, বোধ হয় এরকম কোন বাক্স ইতিপূর্বে দেখিনি বলেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম।

শো-কেসের কাচটায় ময়লা এমনই পুরু হয়ে জমেছিল যে সে আস্তরণ ভেদ করে আমার দৃষ্টি

ভেতরে ভাল করে প্রবেশ করতে পারছিল না। তাই, জিনিসটাকে একবার হাতে করে দেখবার জন্যে দোকানের ভেতরে পদক্ষেপ করলাম। কাউন্টারের পেছন থেকে এগিয়ে এল অবিশ্বাস্য রকমের বৃদ্ধ এক চীনাম্যান। ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে সে আমায় কৌটো সম্বন্ধে অনেক কথা বললে। ডিবেটো বেশ ভারী, আগাগোড়া তামা দিয়ে তৈরি, গোলাকার, চার ইঞ্চি উঁচু আর ব্যাস প্রায় তিন ইঞ্চি। ভেতরে একটা কিছু জিনিস নিশ্চয় ছিল, কেননা ঝাঁকানি দিলে ভেতরে সেটা নড়ে ওঠার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু কৌটোটাকে কেউ নাকি আজ পর্যন্তখুলতেপারেনি। চীনাম্যানটি এটি কিনেছিল চট্টগ্রাম থেকে সদ্য আগত এক জাহাজের খালাসীর কাছ থেকে। কিন্তু পৃথিবীর কোন্ অংশ থেকে ডিবেটির আবির্ভাব ঘটেছে—সে সম্বন্ধে কোন তথ্যই সে আমায় সরবরাহ করতে পারল না।

'গিভ মি টু লুপিজ স্যার।' বললে চীনাম্যানটি।

আমি তাকে একটা টাকা দিলাম। ডিবেটি নিয়ে বাড়ি ফিরে সিধে গেলাম আমার ছোট্ট ওয়ার্কশপটায়। প্রথমেই কৌটোটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ভাল করে জোর আলোয় পরীক্ষা করলাম। সেটার গঠনভঙ্গি থেকেই মনে হল, বহু পুরোন আমলের সামগ্রী সেটি—এমন কি ডিবেটো তৈরি করার সময়ে লেদের ব্যবহারও করা হয়নি—আগাগোড়া হাতে তৈরি। কৌটোর ঢাকনির ওপর এক সময় একটা কিছু খোদাই করে লেখা হয়েছিল, কিন্তু উকো দিয়ে ঘষে সেটুকুও তুলে ফেলা হয়েছে।

এরপর আমার কাজ হল ডিবেটার কোন ক্ষতি না করে ঢাকনিটিকে খোলার ব্যবস্থা করা। ডালাটা এমনই এঁটে বসে গেছল যে শুধু হাতের জোরে অথবা কোন মামুলী পদ্ধতিতে তা খোলা অসম্ভব। অতএব বিজ্ঞানের শরণ নিতে হল।

প্রথমেই আমি ডিবেটার ডালা নিচের দিক করে এক ডিস গ্লিসারিনে এক হপ্তা ডুবিয়ে রাখলাম। ইতিমধ্যে তামার পাত কেটে তৈরি করে ফেললাম দুটি কলার—একটা কৌটোটির জন্য, অপরটি কৌটোর ঢাকনির জন্যে। সাতদিন কেটে যাবার পর আমি নাট স্ক্রু দিয়ে কলার দুটোকে বেশ শক্ত করে লাগিয়ে দিলাম। তারপর কৌটোটিকে 'ভাইস'এ চেপে ধরে কলারের ওপর হাতুড়ি ঠুকে ঢাকনিটাকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ঢাকনিটা ঘুরল না। তখন বিপরীত দিকে হাতুড়ির ঠোকা দিতেই তৎক্ষণাৎ ঘুরে গেল ডালাটা। বুঝলাম, আজ পর্যন্ত কেন কেউ এটা পেঁচিয়ে খুলতে পারেনি। কৌটোটার প্যাঁচ সাধারণ নিয়মের সম্পূর্ণ উল্টো—ডান দিকে ঘোরালে তবে সেটা খোলে। মনে পড়ল, বহু বছর আগে এইরকম উল্টো নিয়মেরই প্রচলন ছিল।

যাই হোক, ধীরে ধীরে ঢাকনিটা ঘুরিয়ে দিতে লাগলাম। অতি সন্তর্পণে হাত দুটি সামনে বিস্তার করে ধরেছিলাম ডিবেটা। কেননা, ভেতরে এত বছর ধরে কি বস্তু যে লুকিয়ে আছে, তা তো জানি না। বোমার মত সেটা আচমকা ফেটেও পড়তে পারে, লাফিয়ে উঠে হয়তো আমার মুখে প্রচণ্ড আঘাতও হানতে পারে। ডালাটা খুলে আনার পর কিন্তু চাঞ্চল্যকর বিশেষ কিছু ঘটল না। মনে হল ডিবেটার অর্ধেক শুধু ধুলোতেই ভর্তি, কিন্তু একেবারে তলায় ছিল বিনুনি পাকান খানিকটা কোঁচকান চুল। সিধে করে ধরলে লম্বায় সেটি প্রায় ন' ইঞ্চি আর প্রায় একটা পেন্সিলের মত মোটা। বিনুনির দু-একটি পাক খুলে দেখলাম, অতি সূক্ষ্ম শত শত চুলের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু সেখানে নেই। কিন্তু চুলগুলির ওপর নোংরা এমনই জমাট বেঁধে রয়েছে যে, উল্লেখযোগ্য আর কিছুই দেখতে পেলাম না। সুতরাং সেগুলোকে পরিষ্কার করাই হল আমার পরবর্তী কাজ।

প্রথমে জল-মেশানো পাতলা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে রাখতে চুলের তেলতেলে ভাবটা চলে গেল, তারপর কাপড়-কাচা সোডার জলে ডুবিয়ে রাখতে চুলে আর অ্যাসিডের অবশিষ্ট লেগে রইল না। এর পরে ডিস্‌টিলড ওয়াটারে বেশ করে ধুয়ে অ্যালকোহলে ডুবিয়ে তুলে নিলাম। ফলে জলকণামুক্ত হল চুলগুলি। সবশেষে ইথারে ডুবিয়ে দিলাম বিনুনিটা।

ইথার থেকে যখন চুলের গোছাটা সবে তুলেছি, এমন সময়ে খবর এল যে ফোনে আমায় কে ডাকছে। সুতরাং হাতের কাছে প্রথমেই যে পরিষ্কার জিনিসটা পেলাম, সেটা একটুকরো সাদা কার্ডবোর্ড—তার ওপরেই পিন দিয়ে বিনুনিটাকে গেঁথে চলে গেলাম ফোন ধরতে।

পরে যখন চুলের গুচ্ছটাকে ভালভাবে পরীক্ষা করলাম, একটি বিষয় দেখে যেমনই আশ্চর্য হলাম, তেমনই হলাম কৌতূহলী। চুলগুলি একজন নারীর কেশ থেকে সংগৃহীত হয়নি—বিভিন্ন নারীর কেশসম্ভার থেকে সংগ্রহ করে এনে তবে তাদের বিনুনি পাকিয়ে একত্র করে রাখা হয়েছে। ঘোর

কৃষ্ণবর্ণ থেকে শুরু করে বাদামী, লালচে, সোনালী এমন কি শ্বেতশুভ্র চুল পর্যন্ত পাকিয়ে রাখা হয়েছে পরম যত্নে। কোন চুলেরই কৃত্রিম রঙ নেই, তা থেকেই প্রমাণিত হয় কত বহু বছর আগেকার সে বিনুনিটি।

এরপর নিছক কৌতূহলের বশে দু'একজনকে বিনুনিটি দেখালাম, কিন্তু বস্তুটি তাদের বিশেষ আগ্রহের খোরাক হয়ে উঠেছে বলে মনে হল না। সুতরাং সেটিকে আমি তামার ডিবেতে ভরে কাবার্ডের অন্যান্য সংগ্রহের সাথে রেখে দিলাম। তারপব এক সময়ে ধীরে ধীরে মন থেকে মুছে গেল সেকথা।

আর তারপরেই ঘটল অদ্ভুত ঘটনাটা।

প্রায় দিন দশেক পরে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল আমার এক বন্ধুর সাথে আর এক বন্ধুর বৈঠকখানায়। বন্ধুটির নাম সমরজিৎ। সমরজিতের কপাল ঘিরে একটা পুরু ব্যাণ্ডেজ। স্বভাবতই জিজ্ঞেস করলাম তার মাথায় কি হয়েছে। কিন্তু তার উত্তর শুনে অবাক হয়ে গেলাম। মাথায় যে তার কি হয়েছে, তা সে নিজে তো জানেই না, এমন কি তার ডাক্তারও জানে না। চা খেতে খেতে আচম্বিতে সে ধড়াস করে পড়ে যায় মেঝের ওপর—নিস্পন্দ দেহে থাকে পড়ে। বেজায় ভয় পেয়ে গিয়ে তার স্ত্রী তৎক্ষণাৎ খবর পাঠালে ডাক্তারের কাছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই চেতনা ফিরে আসতে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করলে সমরজিৎ যে কে তার কপালে মারল। কিছুক্ষণের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠল সে—শুধু কপালে তীব্র যন্ত্রণাবোধ ছাড়া আর কোন অসুবিধা রইল না। কপালের যে স্থানটায় যন্ত্রণাটা অনুভূত হচ্ছিল, সেখানটায় ডাক্তার প্রথমে একটা লালচে দাগ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলে না। দাগটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠতে লাগল দাগটা—শেষে মনে হল কপালের ওই স্থানটায় লাঠি দিয়ে হানা হয়েছে এক প্রচণ্ড আঘাত। পরের দিন দাগটা সেই রকমই রইল, তবে দেখা গেল দাগটার চারদিকে বেষ্টন করে গোল ভাবে ফুটে উঠেছে থেঁতলে যাওয়াব মত একটা চিহ্ন নীলচে কালসিটার আভা। তারপর ধীরে ধীরে সব ভাল হয়ে আসতে লাগল। ব্যাণ্ডেজ খুলে সমরজিৎ দাগটা আমায় দেখাল। গোলাকার কালসিটার মাঝে ঈষৎ বাঁকানো রক্তবর্ণ একটা দাগ ছাড়া আর কিছুই নেই—বিশ্রী কৃমিকীটের মত লাল আভা নিয়ে প্রকট হয়ে রয়েছে দাগটা।

ডাক্তারের মতে দুর্বলতা বশত হঠাৎ মাথা ঘুরে যাওয়াব ফলে পড়ে যায় সমরজিৎ, সেই সময়ে কোনরকমে মাথাটা ঠুকে যাওয়ার ফলেই এই বিপত্তির সৃষ্টি। ডাক্তারের যুক্তিহীন মতের এইখানেই সমাপ্তি।

প্রায় মাসখানেক পরে সুমিতা বলল, সত্যি তোমার ওয়ার্কশপটা একটু গোছগাছ করা দরকার। মাগো, কি নোংরা!

তাই নাকি?—বললাম আমি।

আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই, কোন ভদ্রলোক কি ওখানে কাজ করতে পারে?

শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি, কিন্তু সুমিতা ছাড়বার পাত্রী নয়। কোমরে আঁচল জড়িয়ে এক হাতে ঝাঁটা এবং অপর হাতে আমাকে ধরে যাত্রা করল ওয়ার্কশপ অভিমুখে।

পরিষ্কার করার মধ্যে কাজ ছিল শুধু ঘরের বিভিন্ন স্থান থেকে যন্ত্রপাতিগুলো সংগ্রহ করে সেলফের যথাস্থানে রক্ষা করা আর মেঝের বাজে জিনিস দেখলেই তুলে জঞ্জাল-গাদায় স্তূপীকৃত করা। আর তার মাঝেই সবিরাম চলতে লাগল সুমিতার সম্মার্জনী।

প্রথমেই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল একটুকরো সাদা কার্ডবোর্ডের ওপর—এটা সেই বোর্ড, যার ওপর আমি টেলিফোন-কল আসার জন্যে চুলের গুচ্ছটা রেখে গেছলাম।

কার্ডবোর্ডটার অপর দিকে চোখ পড়তে দেখলাম, সেটা ফ্ল্যাশলাইটে তোলা একটা গ্রুপ ফটোগ্রাফ—বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আমিও আছি সে ফটোটিতে। সুমিতা ফটোগ্রাফটার দিকে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ সে বলে উঠল, আচ্ছা, সমরজিৎ বাবুর কপালে ওটা কিসের দাগ বল তো?

আমি সেদিকে তাকালাম, আর দেখলাম—না, কোন ভুল হয়নি আমার—সেই একই দাগ, যে দাগ দেখেছিলাম একমাস আগে সমরজিতের কপালে; সেই রকমই ঈষৎ বাঁকানো, রক্তবর্ণ চিহ্ন। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হল এই যে ফটোটা তোলা হয়েছিল প্রায় পাঁচ মাস আগে।

এরপর আমরা ফটোগ্রাফের পেছন দিকটা লক্ষ্য করলাম। দেখলাম একটা আবছা বাদামী রেখা। ইথার থেকে তুলে নিয়ে পিন দিয়ে গেঁথে শুকোতে দিয়ে গেছলাম—রেখাটা নিশ্চয় সেই পিনেরই দাগ। আর তারপরে কার্ডবোর্ডটা ইথারটুকু শুষে নিয়েছে বলেই বিপরীত দিকে সমরজিতের কপালে ফুটে উঠেছে ওই দাগটা। পিনের দাগের মধ্যে দিয়ে একটা ছুঁচ এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতে, সত্যই সেটা এপাশে সমরজিতের কপালের সেই চিহ্নটার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এল। দুটো ঘটনাই একসাথে সংঘটিত হওয়াটা আপাতদৃষ্টিতে বেশ অদ্ভুত।

এরপর কি জানি আমার মনে হল, আমি সময় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার প্রয়াস পেলাম। অবশেষে স্থির একটা সিদ্ধান্তেও পৌঁছলাম। একটা বিশেষ দিনে ৪টা থেকে ৪-১৫ মিনিটের সময় আমি ফটোগ্রাফটা পিন দিয়ে গেঁথেছিলাম, আর ঠিক সেইদিনেই প্রায় ৪-১৫ মিনিটের সময়ে সমরজিতের ওপর হয়েছিল সেই আশ্চর্য আক্রমণটা (!)—এ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহের বাষ্পটুকুও অবশিষ্ট রইল না। দুটো ঘটনার মধ্যেই রয়েছে বেশ স্পষ্ট একটা এককালীন সংঘটনের সম্পর্ক।

এই কথাগুলোই একদিন চিন্তা করতে করতে আচম্বিতে মনের মধ্যে উদিত হল একটা মতলব পরীক্ষাটা একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে। অবশ্য সমরজিৎ বেচারার ওপর আর নয়, কেননা ইতিপূর্বেই তার ওপর অজান্তেই তো বেশ একচোট হয়ে গেছে, আর তা ছাড়া সে আমার বন্ধু তো বটেই। শত্রুদের প্রতি আমাদের যে সদয়ভাবাপন্ন হওয়া উচিত —এ হিতবাক্য আমার অজানা নয় আর বাস্তবিকপক্ষে সে বাক্য আমি কিছু কিছু মেনে চলতেও চেষ্টা করি। কিন্তু যেখানে এরকম একটা এক্সপেরিমেন্টের নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে—যদিও সহস্রের মধ্যে একটিতে সাফল্য আসবে কিনা সন্দেহ, তবুও স্বভাবতই বন্ধু অপেক্ষা শত্রু মনোনয়নই শ্রেয়। সুতরাং এর পর থেকে আমি ব্যস্ত রইলাম মনোমত একটা শিকার অন্বেষণে। যাতে দৈবাৎ যদি আবার একটা coincidence ঘটে যায়, তবে আমার বিশেষ ক্ষতি হবে না। আর যে ব্যক্তিবিশেষটিকে মনোনীত করলাম, সে আমার পরবর্তী গৃহের অধিবাসিনী এক আয়া।

বাথরুমের জানলা থেকে ওদের উঠোনটা আমরা দেখতে পেতাম। প্রায় লক্ষ্য করেছি, শিশুটি যখন তার তত্ত্বাবধানে থাকত, আর আশপাশে যদি কাউকে না দেখা যেত, তখন শিশুটির সঙ্গে নিতান্ত অকারণে ব্যবহার করতো অত্যন্ত হৃদয়হীনার মত। অপরের গৃহের দৈনিক ঘটনাবলী লক্ষ্য করা অবশ্য অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কিন্তু অবোধ শিশুটার ওপর তার অযৌক্তিক নির্দয় আচরণ তুমি দেখলে নিশ্চয় এ অপরাধ থেকে আমায় মুক্তি দিতে। আমরা তো ওকে দু-চোখে দেখতেই পারতাম না এ জন্যে। আরও একটা ব্যাপারে মেজাজটা আমার তার ওপর বিগড়ে ছিল। প্রথম যখন সে ও বাড়িতে এল, বাগানের পাঁচিলটার ওপর ঝুঁকে পড়ে গোলাপের গন্ধ শুঁকত। এতেই যদি ক্ষান্ত থাকত, তাহলে কিছুই হত না। কিন্তু অনর্থক বোঁটাশুদ্ধ ফুলগুলো তুলত আর ছুড়ে ফেলত মাটিতে। অচিরেই সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়া আমি বন্ধ করলাম। পাঁচিলের ওপর থেকে সহজলভ্য কয়েকটি গোলাপ গাছের চারপাশে বঁড়শি দিয়ে এমন সুকৌশলে এক দুর্ভেদ্য ব্যারিকেড রচনা করলাম যে, পরের দিনই সকালে বেশ একটু হৈ-চৈ শোনার পর এক হপ্তা ধরে দেখেছিলাম আয়ার হাতে পুরু ব্যাণ্ডেজটা।

মোটের ওপর আমার এক্সপেরিমেন্টের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত ব্যক্তি হল সে। কাজেই, আমার প্রথম কাজ হল তার একটা ফটোগ্রাফ তুলে ফেলা! পরের দিন ঝলমলে রোদ্দুর ভরা সকালে যখন সে উঠোনে পায়চারি করছে, আমি বাথরুমের জানলা থেকে এরোপ্লেন ওড়ার মত কি ওইরকম একটা বিদ্‌ঘুটে শব্দ করতে সে মুখ তুলে তাকাল, আর তৎক্ষণাৎ শাটার টিপে দিলাম আমার জাইসআইকনের।

প্রথম প্রিন্টটা যখন শুকোল, সেই রাত্রেই প্রায় এগারটার সময়ে, আমি চুলের বিনুনিটা নিয়ে তার কপালে দুটো পিন দিয়ে আটকে রাখলাম। অবশ্য নিজের এই নির্বোধ কার্যকলাপের জন্য হাসি পাচ্ছিল খুবই, কিন্তু নিতান্তই একটা ছেলেখেলা পরীক্ষার মত সহজভাবে সেটাকে গ্রহণ করতে পেরেছিলাম। তারপর, পিন লাগানো ফটোগ্রাফটা রেখে দিলাম ওয়ার্কশপের কাবার্ডে।

পরের দিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতে সুমিতা বলল, শুনেছ আজ সকালে পাশের বাড়ির আয়াটাকে বিছানায় মরে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। আরও অনেক কিছুই গর্ গর্ করে বলে গেল সুমিতা

লোকজন এ ব্যাপারে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে, পুলিশ এসে জোর তদন্ত শুরু করেছে, ইত্যাদি।

মনে হল, চোখের সামনে ঘরের দেওয়ালগুলো ঘুরতে শুরু করেছে। কতক্ষণ স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না, অবশেষে আত্মসংবরণ করে নিয়ে প্রশ্ন করলাম, কিসে মারা গেছে, কিছু শুনেছ?

বুঝতেই পারছ, সুমিতা আমার এক্সপেরিমেন্ট সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ জানত না। জানলে, এ পরীক্ষায় হাত দিতে কখনই সে আমায় দিত না। জানোই তো, কুসংস্কারের হাওয়া সব সময়ে তাকে কেমন ঘিরে থাকে—আমার সঙ্গে এতকাল বসবাসের পরও মনের অন্ধকার তার এখনও পুরোপুরি ঘোচেনি।

যত তাড়াতাড়ি পারলাম, সুমিতা চোখের অন্তরালে যেতেই ওয়ার্কশপের কাবার্ড থেকে বার করলাম ফটোগ্রাফটা—আর, জানি তুমি বিশ্বাস করবে না একথা, কিন্তু তাতে আমার কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না—বিনুনি থেকে যখন পিন দুটো খুলে নিলাম, দেখলাম আয়ার কপালে দুটি সুস্পষ্ট রক্তবর্ণ চিহ্ন!

কতক্ষণ যে অভিভূতের মত বসেছিলাম, সে সময়ের হিসাব ছিল না। ইংরাজীতে যাকে coincidence বলে, তা কি কখনও দুবার ঘটা সম্ভব? একবার সমরজিতের ক্ষেত্রে, আবার এই আয়ার ক্ষেত্রে, কিন্তু আমার চোখকে আমি অবিশ্বাস করতে পারি না, আমার চোখের সামনে আয়ার কপালে দুটি জ্বলজ্বলে রক্তবর্ণ বিন্দু আমার শিক্ষা-সংস্কৃত মনকে যেন মৌন ভাষায় বিদ্রূপ করতে লাগল।

এই ব্যাপারে তখনকার মত মনের মধ্যে যেটুকু অনুতাপের অগ্নিশিখা দেখা দিয়েছিল, প্রবল ঔৎসুক্যের বারি-সিঞ্চনে অচিরেই তা নিভে গেল। প্রথমেই শুরু হল আমার ব্যক্তিগত তদন্ত, কিভাবে আয়ার মৃত্যু ঘটেছে, সে অনুসন্ধান করতে আমি উঠেপড়ে লাগলাম। পুলিশী রিপোর্টে অবশ্য ছিল মৃত্যুটা হয়েছে নিছক প্রকৃতির নিয়মানুসারে, অর্থাৎ ব্রেনের মধ্যে কয়েকটি শিরা অতিরিক্ত রক্তের চাপে ফেটে যাওয়ার ফলেই মৃত্যু এসেছে; কিন্তু শুধু একটি স্থানেই সব ডাক্তারদের বুদ্ধি ঘুলিয়ে গেল যে প্রকৃতির সেই নিয়মটি কি কারণে হঠাৎ কার্যকরী হয়ে উঠে এ মৃত্যুকে ডেকে আনলে। সমরজিতের কপালে যেমন চিহ্ন দেখেছিলাম, এরও কপালে ছিল হুবহু সেই চিহ্ন, তবে এবার সংখ্যায় দুটি। দু-একজন ডাক্তার অবশ্য বলেছিল যে এক্সরে করে করোটির ভেতরটা দেখা যাক। এক্সরে ফটোও উঠেছিল, কিন্তু আভ্যন্তরিক কোন স্নায়ু বিকৃতি দেখা যায়নি। সুতরাং ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল এইখানেই।

কিন্তু আমার মস্তিষ্কে তখন চিন্তার বল্লরী ঔৎসুক্যের বনস্পতিকে ঘিরে পাক খেয়ে ঊর্ধ্বে উঠছে। শরীর খারাপ থাকার জন্যে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়াটাও তো আয়ার পক্ষে সম্ভব? আরও তো কত কারণ থাকতে পারে! সত্যিই কি ওই কেশগুচ্ছের সঙ্গে এ মৃত্যু সম্পর্কিত? বাস্তবিকই, ওইখানেই বিষয়টার ওপর আমি যবনিকা টেনে দিতে পারলাম না। সুতরাং আবার একটা পরীক্ষার জন্য খুঁজতে লাগলাম আর একজনকে, আর অনেক ভেবে-চিন্তে আমার বাড়ির বিপরীত দিকের বাড়ির এক বাসিন্দাকে মনে মনে বেশ পছন্দ হয়ে গেল।

লোকটি অবশ্য আয়ার মত ততটা খারাপ ছিল না। কেননা, নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ সে নয়—অন্তত নিজের ইচ্ছায় তো নয়ই। শুধু সারাদিন, বিশেষ করে গভীর রাত পর্যন্ত বেহালা বাজাবার এক বিদ্‌ঘুটে নেশা তার ছিল। সুতরাং স্থির করলাম, খুন করাটা উচিত হবে না- তার চেয়ে অল্পের ওপর দিয়ে একটু মজা করা যাক।

মুশকিল হল ফটো তোলা নিয়ে। কেননা, বাইরে সে খুবই কম বেরোত। যার সঙ্গে আমার দৈনিক একাধিকবার চোখাচোখি হচ্ছে, তার অগোচরে তারই মুখের পরিষ্কার ফটো তোলা যে কি কঠিন ব্যাপার, তা তুমি উপলব্ধি করছো নিশ্চয়ই। যাই হোক, প্রায় দিন পনেরো পরে এ দিকটা আমি কোনমতে কায়দা করে সামলে নিলাম। ফটোটা যদিও খুবই ছোট্ট হয়েছিল, কিন্তু পরে আমি সেটা বেশ বড় করে এনলার্জ করে নিলাম।

সন্ধ্যার পর থেকে ওপরের একটা ঘরে বেশ অঙ্গভঙ্গি করে ছড়ি টানত ভদ্রলোক। একনাগাড়ে টেনেই যেত, আর বিচিত্র সব রাগ-রাগিনীর স্বরলহরীতে ভরিয়ে তুলত আকাশ-বাতাস। সুতরাং

রাত্রের খাওয়া সাঙ্গ হলে আমি গেলাম আমার ওয়ার্কশপের জানলায়। অপেক্ষা করতে লাগলাম সেখানে। খেয়েদেয়ে এসে লোকটি যখন আবার ছড়ি তুলল, আমিও তুলে নিলাম আমার চুলের গোছাটি—সে যখন ছড়ি ছোঁয়ালে বেহালার তারে, আমি বিনুনি দিয়ে স্পর্শ করলাম ফটোটি—খুব আলতো ভাবে।

প্রথম যখন বিনুনিটা ছুঁয়ে গেল ফটোটা—ভদ্রলোকের বেহালা থেকে উত্থিত হল এক বেসুরো শব্দ। এতে আমার মনটা তৃপ্ত হল না—আবার ধীরে ধীরে বিনুনি ছোঁয়ালাম ফটোটিতে। এবার আর কোন সন্দেহই রইল না। অত্যন্ত ক্ষিপ্রভাবে কাঁধ থেকে সে নামিয়ে নিল বাদ্য-যন্ত্রটি এবং প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে ডাঙায় ওঠা মাছের মত খাবি খেতে লাগল। তার ছটফটানি দেখে মনে হল নিশ্বাস যেন তার রুদ্ধ হয়ে আসছে। উদগ্রীব হয়ে দেখতে দেখতে আমি এমন অবাক হয়ে গেলাম, মনে হল যেন আমার নিজেরও নিশ্বাস-ক্রিয়া রহিত হয়ে আসছে।

বিনুনিটা আমি সরিয়ে নিলাম।

তারপরে ভাবতে লাগলাম যে, এর পরে আমার কর্তব্য কি। বিপদজনক ওই চুলের গোছাটা কি পুড়িয়ে ফেলব, না রেখে দেব? অনেক ভেবে দেখলাম, সাধারণদর্শন কিন্তু অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ওই চুলগুলোকে আরও বিভিন্ন উপায়ে আমি ব্যবহার করতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে আমার কার্যপন্থাও স্থির হয়ে গেল।

আমার পরবর্তী এক্সপেরিমেন্টগুলোর বিশদ বিবরণ তোমায় বলতে গেলে একটা বই লিখে ফেলা দরকার। এ-সব পরীক্ষা চলেছিল বেশ কয়েকটি মাস ধরে। শেষকালে সমগ্র বিষয়টাকে আমি এমন একটা নিখুঁত বিজ্ঞান পরিধির মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে ফেললাম যে, যে কোন জীবন্ত প্রাণীকে মশক দংশনের মত ক্ষুদ্র যন্ত্রণা দেওয়া থেকে শুরু করে হত্যা করা পর্যন্ত আমার কাছে নিতান্ত ছেলেখেলার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। মনে রেখ, এ সাফল্য এসেছিল একটি পুরুষ, একটি নারী, অসংখ্য কুকুর বেরাল, খরগোশ আর চেতনা সম্পন্ন প্রাণীর বিনিময়ে।

এরকম একটা আবিষ্কার করে যে আনন্দ আমি পেয়েছিলাম, এক্সপেরিমেন্টের পর এক্সপেরিমেন্ট করে যে মজা অনুভব করেছিলাম– তা প্রকাশ করা ভাষার সাধ্য নয়। মনটা কেমন জানি এক নিষ্ঠুর আনন্দে উঠত ভরে, আর বার বার সেই আনন্দেরই আস্বাদ পাওয়ার নেশায় মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠত। তারপর একদিন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, এই অপরিমেয় শক্তির প্রসাদে ত্রিভুবন জয় করাও আমার আর অসাধ্য নয়।

কেশগুচ্ছটার ব্যবহার-মাত্রা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা এমনই গভীর আর নির্ভুল হয়ে উঠল যে, ভাবলাম এরপর যদি এ শক্তিকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করি, তাহলে সেটা হবে নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। অর্থাৎ অন্য ভাবে বলতে গেলে, অধিক জীবন নষ্ট না করে অল্প সময়ে এবং অল্পায়াসে সৌভাগ্য-সূর্যকে মধ্যগগনে আনতে হলে এবার শক্তির বাস্তব প্রয়োগ নিতান্ত প্রয়োজন।

ভেবে দেখলাম, অপ্রিয়ভাজন আর অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের ওপর ক্রমাগত শক্তির প্রয়োগ করতে গেলে সময় লাগবে অনেক। অর্থাৎ ধরা যাক, যে লোকগুলোকে তুমি দু'চক্ষে দেখতে পার না তাদের নামে মোটা ইন্সিওর করে দিলে। এর পরেই তাদের মৃত্যু হওয়াটা নিতান্ত অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াবে—সুতরাং অন্তত পক্ষে একবছর তো তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। আর তাছাড়া কয়েকবার এই রকম মৃত্যু হওয়ার পর প্রত্যেকেরই মনে একটা খটকা লাগবে—তখনই কোম্পানীর পেমেন্ট দেওয়া নিয়ে শুরু হবে হাঙ্গামা। ভাবতে ভাবতে, আচম্বিতে মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলোর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-চমকের মতই খেলে গেল এক অভিনব পরিকল্পনা।

তোমার বোধ হয় মনে থাকতে পারে যে, কয়েকমাস আগে থেকে আমি রেসকোর্সের মাঠে যাতায়াত শুরু করেছিলাম, আর প্রতিটি বাজীতে মোটা অর্থ ফেলেছি, তুলে এনেছি তার বহুগুণ অর্থ। তোমরা বলেছিলে, হঠাৎ আমার ওপর মা-লক্ষ্মী সদয় হয়ে উঠেছেন—কেননা একটি বাজীতেও না হেরে স্বল্পকালের মধ্যে কয়েক লক্ষ টাকার মালিক হওয়ার এরকম নজীর তোমাদের চোখে আর পড়েনি। কিন্তু আমার এ সৌভাগ্যের মূলে কি ছিল জানো?

বিচিত্র বর্ণের ঐ কেশগুচ্ছটি।

কাজটা খুবই সহজ। আমাকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল শুধু একটুকরো কার্ডবোর্ড, আর তার ওপরে আঠা দিয়ে লাগিয়ে রেখেছিলাম একটি ছাড়া সব কটি দৌড়বাজ ঘোড়ার ফটোগ্রাফ—যেটির ফটো ছিল না, সেটির ওপরই বাজী ধরতাম আমার সর্বস্ব। তারপর দৌড় শুরু হওয়ার একটু আগে এসে বসতাম সুবিধামত নিরালা দেখে এক জায়গায়। এমন জায়গা বেছে নিতাম, যেখান থেকে সমস্ত রেসকোর্সটা পড়ে থাকত আমার চোখের সামনে।

ভাবছ বুঝি, রেসের ঘোড়াগুলোকে আমি জখম করে দিতাম? ভুল ধারণা! মারাত্মক রকমের আমি কিছুই করতাম না। শুধু ঘোড়াগুলো যখন দৌড়তে শুরু করত, আমি বিনুনিটি খুব আলতো ভাবে ফটোগুলোর ওপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে যেতাম—ফলে ক্লান্তিবোধ ছাড়া ঘোড়াগুলোর আর কোন ক্ষতিই হত না। যদি দেখতাম, তা সত্ত্বেও কোন তেজী ঘোড়া আমার প্ল্যান বানচাল করার চেষ্টা করছে, তখন আবার একটু মোলায়েম স্পর্শ—ব্যস।

দৌড়ের মাঝে সব কটি ঘোড়াই যেন ক্লান্ত হয়ে না পড়ে আর দৌড় যেন পণ্ড না হয়ে যায় - সেজন্য আমি গোড়া থেকেই বেশ সতর্ক থাকতাম। একটা ছাড়া সব কটি ঘোড়াই যদি ভূমিশয্যা গ্রহণ করে, অথবা থেমে গিয়ে ছটফট করতে থাকে—তাহলে রেস বাতিল হয়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই বেশি। সুতরাং রীতিমত নৈপুণ্যের সঙ্গে চুলের গোছা ব্যবহার করেছি প্রতিবার, আর ঘরে এনেছি রাশি রাশি অর্থ।

কিন্তু এজন্যে আগে থেকেই আমায় দিতে হয়েছিল তিন-তিনটি মহড়া। আর প্রতিটিই হয়েছিল অতীব চমৎকার।

এই সময় থেকেই আমার মানস-তটে আছড়ে পড়তে লাগল একটির পর একটি পরিবর্তনের ঢেউ। তোমার কাছে সবই আজ স্বীকার করতে বসেছি—গোপন কিছুই করব না। সাধারণ মধ্যবিত্তের অনটনের মধ্য থেকে অপরিমেয় ক্ষমতা আর অর্থ-প্রাচুর্যের মধ্যে এসে পড়লে পরিবর্তন আসাটা স্বাভাবিক। আমি যে শুধু বৈভব-স্রোতেই গা ভাসালাম, তা নয়, সেই সাথে বিস্মৃত হলাম আমার আজন্মের শিক্ষা—নৈতিক নিষ্ঠা। ভুলে গেলাম আমার চরিত্রের বলিষ্ঠতা আর আদর্শ, ভুলে গেলাম আমার বিবাহিত জীবনের কর্তব্য।

আমি মদ ধরলাম, একদিনেই আসক্তি আমার আসেনি। মনটা যখন বেজায় খুশি হয়ে উঠত—তখন খুশির মাত্রায় আরও দু'এক পর্দা রঙ চড়াবার অভিলাষে দু'এক চুমুক রঙিন পানীয়ের আস্বাদ গ্রহণ করতাম। যত দিন যেতে লাগল, অর্থ আসতে লাগল স্রোতের মত, আর ততই ধীরে ধীরে মনের যেটুকু বাধা ছিল, তাও গেল মুছে। বিজয় গৌরবে উল্লসিত হয়ে মদ খাওয়াটা তখন প্রায় নিত্য-কর্মেই দাঁড়িয়ে গেল। এজন্যে কোনদিন আর অনুভব করিনি কোন গ্লানি। সুমিতা প্রথমটা ধরতে পারেনি—তারপর যখন পানীয়ের মাত্রা সীমা ছাড়াল, সুমিতার আর কিছুই অজ্ঞাত রইল না। কিন্তু ভাই আশিস্, তার মত স্ত্রী পাওয়া বহু জন্মের পুণ্যের ফল। সে রাগ করেনি, রুক্ষ কথা শোনায়নি, অভিমান করেনি। শুধু গভীর দুটি বড় বড় চোখে নীল সায়রের মত অশ্রুধারা দুলিয়ে আমাকে মিনতি করেছে, দুটি পা চোখের জলে ধুইয়ে দিয়েছে—কিন্তু তবুও আমার চৈতন্য হয়নি। হেসে তার মিনতিকে উড়িয়ে দিয়েছি, বলেছি—খাচ্ছি তো একটা খাবারই জিনিস। অখাদ্য তো নয়, কেন এত ভাবছ বল তো? আর যে কত কি বলেছি—তা মনে নেই। কিন্তু জানোই তো যার ওপর সুরার ক্রিয়া একবার হয় শুরু—ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে আসে তার স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি আর চৈতন্য বোধ। এই রকমই এক রঙিন নেশাভরা মুহূর্তে সুমিতা চোখের জলে দুটি গাল ভাসিয়ে আমাকে কাকুতি মিনতি করে বলছিল এ জিনিস ত্যাগ করতে—ওইরকম একটা সুন্দর আমেজভরা মিষ্টি মুহূর্তে কানের কাছে একঘেয়ে কান্না শুনতে শুনতে হঠাৎ কেমন জানি মেজাজটা বিগড়ে গেল। বললাম, আমার স্ত্রী তুমি, তুমি আমার সহধর্মিনী। যে ধর্ম আমার, সে ধর্ম তোমারও। অতএব—

এরপর যা হল তা লিখে আর লেখনী কলঙ্কিত করতে চাই না। সুমিতার মুখে শেষ পর্যন্ত এক ফোঁটা হুইস্কিও ঢালতে পারিনি। কিন্তু সেদিন তার যা মূর্তি দেখেছিলাম—জীবনে আর দেখিনি সে মূর্তি। এখনও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি তাকে—তার মুখ অশ্রুসিক্ত, চুল এলোমেলো আর অঙ্গের বসন বিস্রস্ত। কণ্ঠে তার সে কি তীব্রতা। যেটুকু চৈতন্য আমার জেগেছিল—এরপর

সেটুকুও যেন লোপ পেল। কি সে বলেছিল মনে নেই—শুধু মনে আছে মাথার মধ্যে যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল নরকের আগুন। চিৎকার করে বলেছিলাম, তবে দেখ আমার ক্ষমতা—মদ তোমাকে আজ খাওয়াবই! চক্ষের পলকে আলমারি থেকে টেনে বার করলাম পারিবারিক অ্যালবাম। আর পকেট থেকে চুলের গোছাটা বার করে চেপে ধরলাম ফটোটির ওপর...

তুমি জানো, ডাক্তার বলেছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সুমিতা মারা গেছে। হৃদরোগ তার সত্যই ছিল—অতখানি উত্তেজনার পর শক্তির ওই আকস্মিক আঘাত তার দুর্বল হৃদযন্ত্র বহন করতে পারেনি—চিরতরে নিস্পন্দ হয়ে গেছে।

তারপরে দিনের পর দিন গেছে কেটে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। রাতের নিদ্রা আমায় ত্যাগ করেছে অনুভব করতে পারি না ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা। চোখ বুজলেই চোখের সামনে দেখি উস্কোখুস্কো কেশে বিশ্রস্ত-বসনা বিস্ফারিত-চক্ষু সুমিতার সেই মূর্তি—যে মূর্তি জীবনে একবারই দেখেছিলাম। আর চোখ খুললেই মাথার মধ্যে অনুভব করি এক যন্ত্রণা; দিবানিশি একটি চিন্তা অক্টোপাশের মত মারণ-বাহু দিয়ে আঁকড়ে রয়েছে আমার মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলোকে—নির্মল, নিষ্ঠুর, নির্দয়ভাবে শোষণ করছে, পেষণ করছে আমার মস্তিষ্ককে। আমার স্ত্রীর হত্যাকারী আমি স্বয়ং শ্রীবিবেক রায়। এ ছাড়া আর কোন চিন্তা আমার নেই। বুঝতে পারছি, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। দিবারাত্র বিড় বিড় করে কি সব বকি—ভালবাসি নির্জনে থাকতে—এমন কি রাধুও সামনে এসে পড়লে উঠি আঁৎকে—এই বুঝি সে ধরে ফেলল আমার অপরাধ। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার চিন্তাধারা বিকৃত হয়ে যাচ্ছে—আমি উন্মাদ হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তার আগেই লিখে রেখে গেলাম আমার স্বীকৃতি। বিশ্বাস করো আর নাই করো, যে মহাপাপ আমি করেছি—তার শাস্তি দেবার আয়োজন করেছেন বিধাতা স্বয়ং সারাটা জীবন ধরে। কিন্তু আমি পারব না, পারব না—এ শাস্তি সারা জীবন ধরে বহন করতে আমি পারব না!

ইতি—

তোমার বিবেক

স্ত্রী-শোকে সত্যই বেচারা একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে।

চিঠিটা ভাঁজ করতে করতে বললাম আমি।

ওগো, না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি—এখুনি চল। আমার কেমন জানি মনে হচ্ছে—একটা বিষম বিপদ এখুনি ঘটবে। বলতে বলতে রমিতার দুই চোখ জলে ভরে ওঠে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা পৌঁছলাম বিবেকের প্রাসাদে। তিনতলায় ওর কক্ষ। দরজা বন্ধ ছিল—ঠেলা দিতেই খুলে গেল।

প্রথমে ঘরে কাউকে চোখে পড়ল না। নিবিড় নৈঃশব্দে ঘরের আবহাওয়া থমথমে হয়ে উঠেছে। টেবিলের ওপর রক্ষিত একটিমাত্র টেবিল-ল্যাম্পের মৃদু নীলাভ আলোয় রহস্যঘন আলো আঁধারিতে ভরে উঠেছে ঘরেব কোণগুলি।

চারদিকে ভাল করে চোখ বোলাতে গিয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হল পালঙ্কের ওপর শায়িত একটি দেহের ওপর। এগিয়ে গেলাম।

বহুদিন ধরে অযত্নবর্ধিত দাড়ি-গোঁফে মুখ আচ্ছন্ন থাকলেও, বিবেককে চিনতে আমাদের দেরি হল না। সে যেন গভীরভাবে ঘুমোচ্ছে। শান্ত মুখশ্রী। কপালের ডানদিকে একটা বীভৎস রক্তবর্ণ ক্ষতচিহ্ন—চিহ্নটিকে বলয়াকারে বেষ্টন করে রয়েছে নীলচে কালসিটার সুস্পষ্ট চিহ্ন।

পাশেই পড়ে রয়েছে একটা ফটোগ্রাফ। আলোর কাছে ধরলাম সেটি! বিবেকের ফটো। তার প্রশস্ত ললাটের মাঝে বিদ্ধ একটা পিন আর একটা চুলের গোছা।

পিনটা আর কেশগুচ্ছটা সরিয়ে আনতে যা দেখলাম, তাতে আমার মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে হিম-শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল।

ফটোতে বিবেকের ললাটে উজ্জ্বল হয়ে জেগে রয়েছে একটা রক্তবর্ণ চিহ্ন!

তমসান্তরিতা

শোভিন সোম

গ্রামের সন্ধ্যা, তার উপর ভরা ভাদ্রের শেষ বর্ষণের ঘটা। মেঘের ছায়ার অন্ধকার চতুর্দিকে তরল হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। একহাত দূরের মানুষ দেখা যায় না এমনই নিকষ অন্ধকার। গাছগুলি দিনের বেলায় দূরে দূরে স্থাণুর মত দাঁড়াইয়াছিল, সন্ধ্যা হইতে না হইতেই যেন কাছাকাছি ঘেঁষিয়া আসিয়া পরস্পরের ডালে ডাল রাখিয়া নিবিড় আলিঙ্গনে অন্ধকারকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

থাকিয়া থাকিয়া প্রাঙ্গনের কদম ও কামিনী হাওয়ার হাতে করিয়া সুগন্ধ পাঠাইতেছে। ভেকের সঙ্গীতের বিরাম নাই, ঝিল্লিরব মুখরিত হইতেছে। রাত্রিবেলা শব্দগুলা যেন দ্বিগুণ শক্তি লাভ করে, সামান্য আওয়াজ, মর্মর ঘর্ষণ, ধ্বনি কান এড়াইয়া যায় না।

নিশানাথ কবে, কোন লগ্নে দেশ গ্রাম ছাড়িয়া শহরবাসী হইয়াছিলেন, আজ তাহা স্পষ্ট মনেও নাই। মনে রাখিবার কোন প্রয়োজনও তিনি বোধ করেন নাই এতদিন, ব্যবসা ভিন্ন অন্য কোন প্রসঙ্গ—বিশেষ করিয়া হৃদয়-দৌর্বল্যের কোন প্রাক্তন-প্রসঙ্গ তাঁহার চিন্তায় প্রবেশ করিতে পারে না। লোহালক্কড়ের ব্যবসা করিয়া তিনি তিলে তিলে ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছেন ; লোহার শিকল দিয়াই চঞ্চলা লক্ষ্মীকে বাঁধিয়াছেন। দেশ গ্রামের প্রতি কোন টানও প্রাণে অবশিষ্ট ছিল না। পিতৃপুরুষের কোন একজন সুদূর-পুরুষ একদা বিরাট সম্পত্তি ও জমিদারীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরবর্তী পুরুষেরা নিষ্কর্মার মত তাহাই ভাঙাইয়া খাইয়াছেন। বাঈজী, মদ, মেম-সাহেবের পার্টি এবং বিলাতসুলভ বিলাসের পিছনে সম্পত্তি ক্ষয় হইতে হইতে যখন কেবলমাত্র ভিটাটুকুতে আসিয়া থামিল, তখন এই বিশাল বিপুলায়তন নির্জন প্রাসাদে বংশের শেষতম বাতি স্বরূপ রহিলেন একমাত্র নিশানাথ। নিশানাথ পিতৃপুরুষের আদর্শ অনুসারে তেমনই বসিয়া বসিয়া বিলাস ব্যসনে অর্থ ব্যয় করিবেন, এমন সঙ্গতি তাঁহার নাই।

যৎসামান্য কুড়াইয়া বাড়াইয়া, ভিটা সংলগ্ন বাগান পূর্বতন নায়েব মুরারিমোহনের নিকট লীজ দিয়া নিশানাথ কলিকাতায় ভাগ্যান্বেষণে আসিলেন। স্ত্রী মল্লিকাকে সঙ্গে নিয়া আসেন, সে উপায় ছিল

না ; কলিকাতায় সংসার পাতিয়া বসা সহজ কথা নয়, বিশেষত নিশানাথ চাকুরি করেন না, ব্যবসা জগতে ভাগ্য পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন। নিশানাথ কালিঘাটের সস্তাতম মেস-এ আসিয়া উঠিলেন। মল্লিকাকে বলিলেন, ভাগ্য যদি মুখ ফিরিয়া তাকায়, তবে তোমাকে অবশ্যই কলিকাতায় লইয়া যাইব।

মল্লিকা সজল নেত্রে বলিয়াছিল, ভাগ্য তোমার দিকে মুখ ফিরাইবেন। তাহার অন্ধ চোখে কি মল্লিকা ধরা পড়িবে !

নিশানাথ সস্নেহে তরুণী স্ত্রীর স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিয়াছিলেন, এই ভর ত্রিসন্ধ্যায় এমন অশু কথা উচ্চারণ করিতে নাই। এমন কথা কেন ভাবিলে !

মল্লিকা প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল, ওগো, ভাবিয়া চিন্তিয়া বলি নাই, মুখ হইতে নিজেরই অজ্ঞাতে বাহির হইয়া গেল।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথম দিকে ব্যবসায় নিশানাথ বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। দীর্ঘদিন সেই হেতু তাঁহাকে মেস হোটেলে কাটাইতে হইয়াছে। অবশ্য স্ত্রীকে আনাইবার ইচ্ছা যদি সত্যই প্রগাঢ় হইত, তবে তখনই নিশানাথ তাহা করিতে পারিতেন। কিন্তু ব্যবসা বড় নেশা, টাকার নেশা মানুষকে সব কিছু ভুলাইয়া দেয়।

মল্লিকা নিশানাথকে নিয়মিত পত্র লিখিত। 'শ্রীচরণকমলেষু' বানানেই দশবার নিব ভাঙিত; বানানের গোলমালে শব্দগুলি উচ্চারণ করার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। কিন্তু তাহাতেও চিঠির উত্তাপে এতটুকু ঘাটতি পড়িত না। নিশানাথ কালেভদ্রে কুশল জানাইতেন। আসলে নিশানাথ মল্লিকাকে ভালবাসিতে পারেন নাই। বাল্যে বিবাহ হইয়াছিল, তখন বিবাহ শব্দেরই অর্থ জানিতেন না। মল্লিকার গাত্রে প্রাত্যহিকতার স্পর্শ লাগিয়াছে,—ঘর-বাড়ি, চেনা জিনিসের মত মল্লিকাও অতি সাধারণ হইয়া উঠিয়াছে ; যৌবনে উপনীত হইবার পূর্বেই নিশানাথ মল্লিকাকে জানিয়া ফেলিয়াছেন—তাহাতে যৌবনের কৌতূহল পাথর চাপা ঘাসের মত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। মল্লিকা সংসারের মধ্যে দৈনন্দিন সামান্যতার মধ্যে করেই নিঃশেষে ফুরাইয়া গিয়াছে। মল্লিকা তাঁহার নিকট একটি কর্তব্য পালন ভিন্ন আর কিছু নহে।

মুরারিমোহনের বিধবা ভগ্নী কমলা মল্লিকা বৌঠানের সঙ্গে থাকিত। নিশানাথ আর কিছু করুন না করুন, মল্লিকার নামে মাসোহারা পাঠাইয়া আপন কর্তব্য পালন করিয়া যাইতেন। মল্লিকার অসুখের সংবাদ পাইয়া নিশানাথ বিশেষ গা করিলেন না, ভাবিলেন ম্যালেরিয়া ; দু বড়ি কুইনিন পড়িলেই পালাইবে। কিন্তু মুরারিমোহনের আকস্মিক পত্র তাহার সে ধারণা ভাঙিয়া দিল। মল্লিকার ডবল নিউমোনিয়া হইয়াছিল। সেই গণ্ডগ্রামে উপযুক্ত চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিল না। মল্লিকার মৃত্যু গ্রামের সহিত নিশানাথের যে সামান্য সম্পর্কটুকু কোনক্রমে লাগিয়াছিল, তাহাও ছিন্ন করিয়া দিল। নিশানাথ আর গ্রামে আসেন নাই।

মৃত মানুষের জন্য তো কাহারও দিন বসিয়া থাকে না, তাহার উপর নিশানাথের প্রাণে শোকের ঝাঁঝও আদৌ প্রবল ছিল না। কিছুদিন পর নিশানাথ অর্থের মুখ দেখিলেন, সিন্দুক বাক্স ছাপাইয়া উঠিল। নিশানাথ ভাগ্যবান পুরুষে রূপান্তরিত হইলেন, তাহার প্রতি নানাজনের দৃষ্টি পড়িল। অপুত্রক মৃতদার, ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা। সুতরাং জীবিত লক্ষ্মী আনিবেন না কেন ?

এবার নিশানাথ ডাগর ডোগর দেখিয়া তাহারই এক সম-ব্যবসায়ীর কন্যাকে বিবাহ করিলেন। এতদিনে তিনি প্রথম যৌবনের স্বাদ জানিলেন। সেই প্রিয়বালা আজ আর তরুণী সুরসিকা নহেন, শরীরে তাহার গয়নার প্রাচুর্যের সঙ্গে মেদের প্রাচুর্য পাল্লা দিতেছে। বিষয় সম্পর্কে প্রিয়বালার জ্ঞান বুদ্ধি নিশানাথের চেয়েও প্রবল। ব্যবসায়ীর কন্যা, জন্মাবধি ব্যবসার হাওয়ায় বর্ধিত হইয়াছেন। নিশানাথ তাহার পরামর্শ উপেক্ষা করিতে পারেন না। দ্বিতীয় পক্ষ বলিয়া তাহার প্রতি নিশানাথ অধিকতর মনোযোগী। মল্লিকা ছিল নিরীহ, শান্ত, মুখ ফুটিয়া প্রাণের কথা বলিতে পারিত না, সংসারের আবশ্যিক কর্মের গণ্ডীটুকু পার হইয়া স্বামীর উপর আপন অধিকারের হাত বিস্তার করিতে পারিত না ; নিশানাথও তাহাকে সেই অধিকার আপনা হইতেই দেয় নাই। সে যেন বিশাল বৃক্ষের সবুজ অন্ধকারের একান্তে অনাদৃত সাধারণ ফুলের মত ফুটিয়াছিল, কোন পূজায় লাগে নাই ; একদিন একে একে পাপড়ি খসাইয়া নিঃশেষ হইয়া গেল—দিবার মত গন্ধও তাহার ছিল না।

সরকার মাইল তিনের ভিতর একটি স্থান স্টীল প্ল্যান্টের জন্য মনোনয়ন করিয়াছেন, তাহার চতুর্দিকে গড়িয়া উঠিবে নবীনা নগরী। নিশানাথের গ্রামও যুগযুগান্তরের অন্ধকার হইতে সভ্যতার প্রখর আলোকে জাগিয়া উঠিবে। যে গ্রামকে তিনি এতকাল অবহেলা করিয়াছেন, সে-গ্রামের কপালে এমন বিধিলিপি লিখিত ছিল, কে জানিত? জানিলে তিনি প্রাচীন জমিদারী আওতার সমস্ত জমি কিনিয়া নিয়া পিতৃপুরুষের পাপ স্খালন করিতেন, প্রিয়বালাই উদ্যোগী হইয়া তাহাকে পাঠাইয়াছেন। জ্যেষ্ঠপুত্র প্রাপ্তবয়স্ক পিতার অনুপস্থিতিতে ব্যবসা চালাইবার ক্ষমতা রাখে। তাহার উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশানাথ গ্রামে আসিলেন ; উদ্দেশ্য : পৈতৃক ভিটা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং যতখানি সম্ভব জমি কেনা।

বাপের আমলেও প্রথম দিকে নায়েব ছিলেন, যদিও তখন জমিদারী বলিতে কিছু ছিল না অথচ ঠাঁট পুরামাত্রায় ছিল। নায়েব মুরারিমোহন এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনিই নিশানাথের নিকট হইতে বাড়ির বাগানটি দীর্ঘমেয়াদে লীজ নিয়াছিলেন। বাগানের খাতিরে এতকাল ধরিয়া তাঁহাকে নিশানাথের পরিত্যক্ত বিশাল বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইতেছে, কেননা বাড়িটি সাপ-খোপের আড্ডা হইলে তাহা বাগানের পক্ষেও বিপদজনক।

নিশানাথের চিঠি পাইয়া তিনি নিচের মহলের একটি সম্মুখবর্তী ঘর পরিষ্কার করাইয়া গুছাইয়া বাসোপযোগী করাইয়া রাখিলেন।

কলিকাতা হইতে বর্ধমানের এই গণ্ডগ্রামে পৌঁছানোও সহজ কথা নহে।

পথ যদিও বেশি নহে কিন্তু যাত্রা দুর্গম।

অবশেষে বিকাল চারিটা নাগাদ গ্রামে আসিয়া পৌঁছানো গেল। ভাদ্র মাস, শরৎকাল ; কিন্তু আকাশের মতিগতি বিশেষ সুবিধার নহে, মেঘের ভারে পৃথিবীর উপর উপুড় হইয়া পড়িতে চায়। বৃষ্টি নামিল।

মুরারিমোহন বলিলেন, এই বাড়িতে রাত্রি যাপন না করিয়া, ছোটকর্তা কী আমার ওখানে থাকিলে ভাল করিতেন না?

হাজার হোক, এককালে তো নায়েব ছিলেন, তাহার বাড়িতে নিজের ভিটা থাকিতে রাত্রি যাপন করা নিশানাথের মর্যাদার পক্ষে হানিকর। মনে মনে তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন।

বলিলেন, না কাকা, না।

অতঃপর তিনি বৈষয়িক কথা পাড়িলেন, জমিজমা সম্পর্কে জানিতে চাহিলেন।

মুরারিমোহন বলিলেন, গ্রামের লোকও সম্প্রতি সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছে। হাওয়ার গতি তাহারা বুঝিতে পারে। জমির দাম একলাফে দশগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, আরো যে না বাড়িবে সেকথা বলা যায় না। জমি লইয়া রীতিমত ফাটকাবাজি চলিতেছে।

নিশানাথ হাসিয়া বলিলেন, বটে, বটে। সাপের পাঁচ পা দেখিয়াছে। কত টাকা চায়! জমি কিনিব বলিয়া আসিয়াছি, খালি হাতে ফিরিয়া যাইব না।

মুরারিমোহন—নিশ্চয়ই। খালি হাতে ফিরিবেন না।

নিশানাথ ভণিতা না করিয়া এবার বলিলেন, আপনি আমার বাগানটা ছাড়িতে পারেন না? বাগানের পিছনে তিন বিঘা জমি অনর্থক নষ্ট হইতেছে।

মুরারিমোহন বলিয়া উঠিলেন, সে কী ছোটকর্তা, ইজারার চুক্তির মেয়াদ তো এখনো শেষ হয় নাই!

নিশানাথ—মনে করুন, যদি আমি কিনিয়া লই?

মুরারিমোহন—আমিও তো একদিন টাকা দিয়াই ইজারা লইয়াছিলাম। অমন কথা বলিবেন না।

নিশানাথ তাঁহাদের এককালের অধস্তন কর্মীর স্পর্ধা দেখিয়া চটিলেন, কিন্তু কিছু বলিতে পারিলেন না, কোন আইনের ফাঁদে তাহাকে ফেলিবারও অবকাশ নাই।

মুরারিমোহনের বাসা হইতেই খাবার আসিল। উঠিবার পূর্বে মুরারিমোহন কহিলেন, জমিজমার কথাবার্তা কাল সবিস্তারে হইবে। ছোটকর্তা এখন বিশ্রাম গ্রহণ করুন। পথের ধকল তো কম হয় নাই। তবে বলিতেছিলাম কী, ছোটকর্তা বোধ হয় আমার ওখানেই রাত্রি যাপন করিলে ভাল করিতেন।

নিশানাথ এবার উষ্মা মিশ্রিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, বারবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একই কথা বলিতেছেন কেন ?

মুরারিমোহন বলিলেন, তবে আপনাকে বলিয়াই ফেলি।

নিশানাথ—হ্যাঁ, তাই বলুন।

মুরারিমোহন—আপনার পূর্বেই জানিয়া রাখা উচিত, নচেৎ বিমূঢ় হইবেন। এই ভিটায় ভূত আছে।

নিশানাথ—কী বলিলেন !

মুরারিমোহন—এই ভিটায় ভূত আছে।

নিশানাথ—আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন ?

মুরারিমোহন—দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার চেহারা দেখা যায় না। হাওয়ায় যেন একটি লঘু শীর্ণ, কাপড় পরিহিত নারীমূর্তি এই ভিটায় সন্ধ্যায় রাতে ভাসিয়া বেড়ায়। সে কখনো কাহারও কোন অনিষ্ট করে না। তবু বলিতেছিলাম, ছোটকর্তা তো বহুদিন দেশ গাঁয়ে বাস করেন নাই। যদি—

নিশানাথ—কী সব গাঁজাখুরি বকিতেছেন। উহা আপনাদের দৃষ্টিবিভ্রম। রাতের আলো আঁধারিতে হাওয়ায় যেন কাপড় ভাসিয়া বেড়াইতেছে, অমন মনে হয়। ভূত হইলে তাহার চেহাবা দেখিতেন। আমিও গ্রামে মানুষ, ওই সব গল্প শুনিয়া ভয় পাই না।

মুরারিমোহন উঠিয়া দাঁড়াইলেন—দরজাটা দিন ছোটকর্তা। খাটের নিচে কুঁজোয় জল রহিল।

ফের মুরারিমোহন ফিরিয়া আসিলেন,—ছোটকর্তা, আপনার এখানে শুইবার জন্য কি আমার নাতিকে পাঠাইয়া দিব ?

নিশানাথ—আপনি আমাকে ভয় দেখাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন। যান, কাল অতি ভোরে আসিবেন।

লণ্ঠনটি কমাইয়া খাটের পায়ার কাছে রাখিয়া মশারি গুঁজিয়া দিয়া নিশানাথ শুইয়া পড়িলেন। পাতায় পাতায় বিচিত্র শব্দে বৃষ্টি পড়িতেছে, ভেককুল অনর্থক একঘেয়ে চেঁচাইয়া চলিয়াছে, থাকিয়া থাকিয়া দমকা হাওয়া জানালা গলিয়া বাদল দিনের পুষ্পসার পৌঁছাইয়া দিতেছে।

বর্ষা নিশীথের অপূর্ব এক মাদকতাময় রূপ আছে।

চোখে ঘুম আসিতে চাহে না, নিশানাথ বিছানায় শুইয়া শুইয়া সিগারেট টানিতে লাগিলেন। চোখ বন্ধ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া বহুদিন পর তিনি স্মৃতির জাবর কাটিতে লাগিলেন। কবে তিনি সব ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার বৃহৎ সম্পত্তির নিকট তো এখানের ভিটার আয়তন ও মূল্য এতকাল তুচ্ছ ছিল। হঠাৎ সরকারী নেক নজরে পড়িয়া গ্রামের কপাল ফিরিয়া গিয়াছে।

মশারি হইতে হাত বাহির করিয়া নিশানাথ সিগারেটের শেষ টুকরাটি জানালার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। জানালার শিকে ঠোকর খাইয়া সিগারেটের টুকরাটি নিচে পড়িয়া গেল। যদিও পথশ্রমে শরীর ক্লান্ত, তবু চক্ষে ঘুম আসিতে চাহিতেছে না। নিশানাথ এপাশ ওপাশ ফিরিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাহিরে বৃষ্টি প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে। বৃষ্টি, ভেকের ডাক, ঝিল্লিরব সব মিলাইয়া এক অদ্ভুত ঐক্যতান সৃষ্টি করিয়াছে। মশারির বাহিরে মশককুলের গুঞ্জনও শোনা যাইতেছে। ঘুমের চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া অতঃপর নিশানাথ আরেকটি সিগারেট জ্বালাইলেন। শুইয়া শুইয়া তিনি মুরারিমোহনের কথা ভাবিতে লাগিলেন। মুরারিমোহনের উপর এক বিশ্রী সন্দেহে তাঁহার মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল। বাপ-পিতামহ এই ভিটায় জন্মিয়া মরিলেন, নিশানাথের জন্মও এইখানে, তাঁহার যৌবনও এইখানেই অতিবাহিত হইয়াছে ; এখানে কস্মিনকালে কেহ ভূতের নাম শোনে নাই—আর আজ কিনা বেটা বুড়া তাঁহাকে ভূতের ভয় দেখাইতেছে। আসলে বেটা বাগান ছাড়িতে চাহে না, ভিটার প্রতিও তাহার লোভ। বাগানটি যে করিয়া হোক, করায়ত্ত করিতেই হইবে। কত ধানে কত চাল হয় বুড়া জানে না। আজ সে কিনা নিশানাথকে টাকার কথা বলে ! কার টাকার কত জোর নিশানাথ তাহা পরখ করিয়া দেখিবেন তবে ছাড়িবেন। বুড়া নিশানাথকে মারিবার চক্রান্ত তো করে নাই ! গ্রামের লোকেদের তিনি ভালো করিয়া চেনেন ; ইহাদের অসাধ্য কিছু নাই।

কাছাকাছি কোথাও সাপে ব্যাঙ ধরিয়াছে ; বেচারী ব্যাঙ থাকিয়া থাকিয়া গোঙাইতেছে।

সিগারেটের পোড়া টুকরাটি এবারও দিকভ্রষ্ট হইয়া জানালার কাছে মেঝেয় পড়িয়া ধোঁয়ার সরু, হালকা রেখা উপরের দিকে উড়াইতে লাগিল। পায়ের দিকে রাখা পাতলা চাদরটি টানিয়া নিশানাথ গায়ে দিলেন।

ঈষৎ তন্দ্রার আমেজ আসিয়াছিল, অকস্মাৎ মনে হইল বুঝি ঘরে বিচিত্র সব কুসুমগন্ধের সমারোহ লাগিয়া গিয়াছে। ব্যাঙের আর্তনাদও আর শোনা যাইতেছে না। রাত ক'টা কে জানে, ঘড়িটা বালিশের পাশে আছে। রাত্রে এক গ্লাস জল খাওয়া তাঁহার নিত্যকার অভ্যাস। চোখ খুলিয়া উঠিয়া বসিতেই মনে হইল, জানালার কাছে ঝাপসা শাদা ধোঁয়া যেন একটি নারীমূর্তির রূপ পরিগ্রহ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পোড়া সিগারেটের টুকরার ধোঁয়া তাঁহার চক্ষে বিভ্রম ঘটাইয়াছে মনে কবিয়া তিনি চোখ রগড়াইয়া ফের তাকাইলেন। মনেব ভুলও তো হইতে পারে! বেটা বুড়া মুরারিমোহনের কথা শুনিয়া কি তাঁহার এমন মনে হইতেছে!

না, মনের ভুল নহে। হাওয়ায় যেন শ্বেতবসনা এক নারীমূর্তি ভাসিতেছে। মুখ হাত পা কিছুই দেখা যাইতেছে না, অথচ যেন বস্ত্র পরিহিতা নারীমূর্তি! মূর্তিটি এবার যেন নড়িয়া উঠিল। বুড়া মুরারিমোহনের কারসাজি নয় তো?

নিশানাথ বলিয়া উঠিলেন, কে, কে ওখানে?

মূর্তিটি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল,—আমি, আমি। চিনিতে পাবিতেছ না!—শুকনো পাতার উপর দিয়া বহিয়া যাওয়া হাওয়ার মত খসখসে, দূরাগত, অপার্থিব সেই স্বর।

নিশানাথের গলা শুকাইয়া আসিল, তবু কোনক্রমে পুনরায় প্রশ্ন কবিলেন, কে তুমি?

মূর্তিটি সম্মুখের দিকে আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল, ওগো আমি- ! ভুলিয়া গেলে!

সেই স্বর শুনিয়া নিশানাথের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, শুইয়া পড়িয়া আপাদ মস্তক চাদবে ঢাকিয়া দিলেন। নিশানাথ অনুভব করিলেন, মূর্তিটি একেবারে মশারির নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মৃদু নিশ্বাসও শোনা যাইতেছে। নিশানাথ নিশ্চেতন হইয়া শুইয়া রহিলেন।

তেমনই দূরাগত খসখসে অপার্থিব স্বরে মূর্তিটি বলিয়া উঠিল, ওগো, আমি, আমি মল্লিকা! আমায় তুমি ভুলিয়া গেলে!

নিশানাথের জবাব শুনিবার জন্য বোধ হয় মূর্তিটি কিয়ৎকাল নীরব রহিল। নিশানাথ রা টি কাড়িতেছেন না দেখিয়া পুনরায বলিয়া উঠিল, ওগো, আমি যে তোমার পথ চাহিয়া এতকাল প্রতীক্ষা করিতেছি। তুমি আমায় শহরে লইয়া যাইবে না?

নিশানাথ নিশ্চুপ।

মূর্তি—ওগো, একবার চোখ মেলিয়া দেখ। আমি মল্লিকা, তোমার পত্নী। আমি জানিতাম, তুমি আসিবে। এতকাল পর তুমি আসিলে। এতকাল পর আমার যাইবার সময় হইল।

নিশানাথ নিরুত্তর।

মূর্তি—কেন কথা কহিতেছ না? ওগো চোখ মেলো, তাকাও!

মূর্তিটি নীরব হইয়া কিছুকাল দাঁড়াইয়া রহিল। নিশানাথ চাদরের নিচে ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন; তাহার শরীর দিয়া দরদর করিয়া ঘাম বহিতে লাগিল।

অধৈর্য হইয়া মূর্তিটি মশারি তুলিয়া ধরিল। নিশানাথ অনুভব করিলেন, মূর্তিটি এইবার তাঁহার মুখের উপর হইতে চাদরটি সরাইবার জন্য হাত বাড়াইয়াছে। নিশানাথের কপালে তাহার হাতের স্পর্শ লাগিল। বরফের চাইতেও তীব্র শীতল সেই হাত। এক নাম-না-জানা আকস্মিক ভয়ে নিশানাথ হঠাৎ আড়ষ্ট হইয়া গেলেন, তাঁহার চেতনা লুপ্ত হইল।

দীর্ঘ ঘুমের পর নিশানাথ জাগিলেন। এতক্ষণ কী-সব আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখিয়াছেন। চোখের পাতা ঘুমের দরুণ ভারী হইয়া উঠিয়াছে। নিশানাথ চোখ মেলিলেন। সমস্ত শরীর যেন দীর্ঘ ঘুমের দরুণ বড় হালকা ঠেকিতেছে। নিশানাথ দেখিলেন, মূর্তিটি তেমনই দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু এ কী, ইহার তো চোখ মুখ সব দেখা যাইতেছে! ঠিক মল্লিকার মত। নিশানাথ হাসিয়া উঠিলেন,—বুড়া মুরারিমোহন ধরা পড়িয়া গিয়াছে। নিশানাথকে ভয় দেখাইবার জন্য কাহাকে না-কাহাকে মল্লিকা সাজাইয়া পাঠাইয়াছে। রোসো, উহাকে কাল মজা দেখাইয়া ছাড়িবেন তিনি।

বেটা বদমাইশির আর জায়গা পায় নাই! মূর্তিটিকে তিনি ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিবেন, কাল সকালে সর্ব সমক্ষে মুরারিমোহনের জারিজুরি ভাঙিয়া দিবেন।

মূর্তিটিকে ধরিবার জন্য তিনি উঠিয়া বসিয়া মশারির বাহিরে হাত বাড়াইলেন। মনে হইল, নিশানাথের সর্বশরীরও কেমন যেন হিমসিক্ত হইয়া গিয়াছে।

মূর্তিটিকে ধরিবার পূর্বেই সে নিশানাথের নাগাল হইতে সরিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, আঃ, লজ্জা করে না। এ বয়সেও...

—তোমাকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিব। —নিশানাথ কহিলেন।

মূর্তি -ধরিতে হইবে না, আমি আপনিই ধরা দিয়াছি।

নিশানাথ—মানে!

মূর্তি -এখন চলো, ওঠো।

নিশানাথ—কোথায়! রাতবিরেতে এমন ইয়ার্কি সহ্য হয় না।

মূর্তি— ইয়ার্কি!

নিশানাথ- -নয় তো কী! মুরারিমোহন বলিয়াছিল, এ ভিটায় ভূত চরিয়া বেড়ায়, তাহার মুখ চোখ কিছুই দেখা যায় না। আমি তো তোমার মুখ চোখ সবই দেখিতে পাইতেছি। তুমি মল্লিকা সাজিয়া আসিয়াছিলে আমাকে ভয় দেখাইতে! রোসো, তোমাকে পুলিশে—

মূর্তিটি জবাব দিল- -ওগো, না গো না। মুরারিমোহন ঠিকই বলিয়াছিল। আমি মল্লিকা। জীবিত লোকে আমার মুখ দেখিতে পায় না।

বিস্ময় বিমূঢ় নিশানাথ কহিলেন, কী বলিতেছ?

মূর্তিটি হাসিয়া উঠিয়া বলিল, তুমি তো কুড়ি মিনিট আগেই ভয় পাইয়া মরিয়া গিয়াছ, তাই তোমার মল্লিকার মুখ...নাও, এখন চলো, আমারও প্রতীক্ষার অবসান হইল।

কামিনী কাঞ্চন

আনন্দ বাগচী

সিঁড়ির বাঁকের মুখে হতবুদ্ধি সমীরণ লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে আচমকা দাঁড়িয়ে গেল। নিচে থেকে অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে যে উঠে আসছিল, লণ্ঠনের অপ্রত্যাশিত আলোয় সেও বোধ হয় রীতিমত অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। দুই অসাবধান মানুষের মুখোমুখি সংঘর্ষটা একটুর জন্যে বেঁচে গেল। কিন্তু দুজনেই কিছু সময়েব জন্য অনড় আর আড়ষ্ট থমকে রইল।

সরু সিঁড়ি। দুটো মানুষের কোন রকমে জায়গা হয়। পথ ছেড়ে দাঁড়াবার প্রশ্ন নেই, যে কোন একজনকে উঠতে কিংবা নামতে হবে। সমীরণের স্বাভাবিক ভদ্রতার হুঁশ ছিল না। তার অবাধ্য চোখদুটো লণ্ঠনের অশালীন আলোর মতই ছড়িয়ে পড়েছিল মেয়েটির সর্বাঙ্গে। প্রথম ঝলকে মনে হয়েছিল মেয়েটি নির্বসন, চোখের ভুল ধরা পড়ে গেল পরের মুহূর্তেই। সদ্য স্নাতা তরুণীটির গায়ে কাচ কাগজের মত স্বচ্ছ কিছু লেপটে আছে। ভিজে পাতলা শাড়ির এক পোঁচর। কুচকুচে কালো আঙুরের থোকার মত কোঁকড়া চুলের ফ্রেমে নরম ডিমের মত মুখ, শাঁখের মত গ্রীবা ছুঁয়ে মোম-পাথরে গড়া একটি সুঠাম শরীর আলতা পরা পায়ের আঙুল পর্যন্ত বিস্তৃত। এরকম ফেটে পড়া রূপ এবং যৌবন একসঙ্গে প্রায় অবিশ্বাস্য। প্রতিটি রেখা, প্রতিটি বিপজ্জনক খাঁজ বাঁক বর্তুল ছায়াবৃত রক্তাভাস পৃথক করে দেখার মত মানসিক ভারসাম্য সমীরণের ছিল না। সব মিলিয়ে তার মনে হল রক্ত-মাংস-ত্বকে মোড়া পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ফোরক একটি বোমা সদ্য সদ্য পলতের আগুন গিলে ফেলেছে। মাথাটা যেন ঘুরে গেল তার। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বিস্ময় আর লজ্জার ঘোর কাটিয়ে তরুণীটি তার পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠে গেল। দু হাতে দুটি জলভরা পেতলের বালতি। যাবার সময় একটা ভিজে ছোঁয়া রেখে গেল সমীরণের দেহে। হিমেল বিদ্যুতের মত সেই স্পর্শ শিরদাঁড়ার মধ্যে ঢুকে থার্মোমিটারের উর্ধ্বমুখী পারদের মত মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছল।

সমীরণের সর্বনাশ হয়ে গেল। তার আব কুয়োতলায় গা ধুতে যাওয়া হল না।

সব কাহিনীরই একটা আরম্ভ থাকে। অর্থাৎ যাকে বলে আরম্ভের আরম্ভ, শুরুর শুরু। এ কাহিনীরও শুরুটা খুঁজতে গেলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে কয়েক ঘণ্টা আগে, বড়জোর একটা বেলা। ঠিক যখন অনিমেষ আর রাখাল চন্দ চলে যাবার পর খাটের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছিল সমীরণ। সকাল থেকে একটানা পিকনিক মুডে হৈচৈ হয়েছে। ওদের বয়স অল্প ওরা পারে, কিন্তু বয়স আর স্বভাবের উজানে চলতে গেলে সমীরণের হাঁফ ধরে যায়, দম ফুরিয়ে আসা কলের গানের মত বেসুরো বেতালা এক হাস্যকর আওয়াজ বেরোতে থাকে ভেতর থেকে। দম এবং উদ্যম দুইই ফুরিয়ে আসে আপনা থেকে। শরীর বয় না।

ওরা কিন্তু সকাল থেকে এই যাবার আগে পর্যন্ত একটানা চালিয়ে গেল। ওরা দুজনেই খুব কাজের। সকালে পৌঁছেই ঘরদোর সাফসুফ করে চা বানালো। চা শেষ করেই আবার ফার্নিচার টানাটানি। সেকেল ওজনদার কাঠের আসবাব, খাট-আলমারি, চেয়ার-টেবিল, একটা আলনা। পালিশ ফালিশ কবে উঠে গেছে, শুধু আবলুস কালো রং লেগে আছে গায়ে। আর কোন আদ্যিকালের গন্ধ। রাখালের দিদিমার শ্বশুরের বিয়ের যৌতুক। সে কি আজকের কথা।

মালপত্র বলতে বিশেষ কিছু ছিল না সমীরণের। বিছানাপত্র, রান্নাবান্নার বাসন-কোসন আর চায়ের সরঞ্জাম, একটা কেরোসিন স্টোভ আর প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় টুকিটাকি কিছুকিঞ্চিৎ। বিছানা করে দিয়ে, মালপত্র বইফই গুছিয়ে দিয়ে ওরা বেরোল বাজার করতে, চাল-ডাল-নুন তেল চাই। একজন ঠিকে কাজের লোক চাই। ওরা বেরিয়ে গেলে সমীরণ তার আশ্রয় স্থলটা এক চক্কর ঘুরে দেখে নিল।

বাড়িটা বিরাট, এককালে জমিদার বাড়ি ছিল এটা। বিশাল দেউড়ি এখনো মাথা উঁচু করে সেই গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। যদিও পলেস্তারা খসে ইঁট-সুরকি বেরিয়ে পড়েছে, জানলা-দরজার রং জলে ধুয়ে, রোদে জ্বলে ফ্যাকাশে সাদা হয়ে গেছে। মূল বাড়িটা গায়ে গতরে দিনে দিনে বেড়ে উঠেছিল এক সময়, ঠিক যেন দশো বছরের পুরোন বটগাছ ডালপালা ছড়িয়েছে আর থামের মত মোটা মোটা ঝুরি নেমেছে। পিলার তুলে তুলে আদি বাড়ির গায়ে গায়ে ঘর বাড়িয়েছিলেন কর্তারা, ফলে এক দেওয়ালের পিঠ ঠেলে ঘরের পর ঘর জুড়ে জুড়ে দুর্গের মত হয়ে গেছে বাড়িটা। শ্রী ছাঁদ আর নেই, গোলমেলে জ্যামিতির কাঠামো যেন, উঁচু নিচু ছাদের পরে ছাদ, এপাশ ওপাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠেছে, সুড়ঙ্গের মত ঢাকা বারান্দার অলিগলি পরস্পর কাটাকুটি খেলেছে।

জমিদারী গেছে, তবে বাড়িটা আছে, বাগান আছে, পুকুর আছে। সেই জাঁকজমক আর পয়সার গরমের দিন শেষ। কিন্তু বাঁশে কঞ্চিতে মিলে ঝাড় বেড়েছে, বংশ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভাগ হয়ে গেছে মহলের পর মহল, শরিকী বাঁটোয়ারায় টুকরো টুকরো হয়েও কুলোয়নি। বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচির মত, বাড়ির তুলনায় উত্তরাধিকারী বেশি, ঘরের তুলনায় মালিকানা। তবে এই পাড়াগাঁয়ে সুরকি ঝুরঝুর বাড়িতে একআধখানা ঘরের মায়ায় রাখালের মাতুল পরিবারের অনেকেই আর বসে নেই, দেশে-বিদেশে নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছেন। সফল এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাই কেউ আর ভুলেও এপথ মাড়ান না। কেউ কেউ নিজের অংশ দান করে দিয়েছেন, কেউ জলের দরে বিক্রি করেছেন, শুধু যাদের কোন সঙ্গতি নেই, তারাই শেয়াল-ডাকা এই ভিটেমাটি কড়ি-বরগা আঁকড়ে পড়ে আছেন। ভাড়াটে বসিয়ে গেছেন কেউ কেউ। ফলে হতদরিদ্র অথচ মান খোয়াতে না পারা কিছু দুঃস্থ অনাথা বিধবা, বেকার ঘরজামাই আর প্রায় দিন-আনি দিন-খাই কিছু ভাড়াটে গোলা পায়রার মত এর খোপে ওর খোপে বাসা বেঁধে আছে। দিনমানে তাদের মন্থর গুঞ্জন শোনা যায়, ঘটি বালতি বাসনকোসনের ঝনঝন ঠনঠান আর তোলা উনুনের ছ্যাঁকছোঁক কানে আসে। সন্ধে হতে না হতেই সব এক রকম সানসুন হয়ে যায়, লণ্ঠন আর কুপির আলো আলেয়ার মত এখানে ওখানে সামান্য সময় নাচানাচি করে নিবে যায়। এ এক অদ্ভুত জীবন, জীবন্ত মানুষের ঘুমন্ত গোরস্থান যেন, কলকাতায় বসে কল্পনাও করা যায় না। অথচ কলকাতা থেকে কতই বা দূরে ? শেয়ালদা লাইনে ঘণ্টা দুয়েকের পথ মাত্র।

শুয়ে শুয়ে অনিমেষ আর রাখালের কথাই ভাবছিল সমীরণ। সারাদিন ওরা এমন মাতিয়ে রেখেছিল যে এই নির্জনতা সে আন্দাজ করতে পারেনি। রান্নাবান্না সেরে হৈ হৈ করে পুকুরে স্নান করতে গেছে। ঝাঁপাঝাঁপি করে সাঁতার কেটেছে ওরা, মাছ ধরেছে। সমীরণ সাঁতার জানে না,

কলের জলে ছাড়া জীবনে কখনো মাথা ভেজায়নি। ভয়ে ভয়ে ঘাটে কোমর জলের ধাপে নেমে গিয়েছে কখন। রাখাল চায়ের জল চাপিয়ে এসে আবার আসরে বসেছে, 'আমার প্রপার্টি কি রকম দেখছ সমীরদা ?'

'ওয়াণ্ডার ফুল ! দোতলার পুব-দক্ষিণ খোলা, তার ওপর এই সাইজ, কলকাতার হিসেবে এক একখানা হলঘর। মেঝেতে আবার মার্বেল পাথরের টালি বসানো। না হে, মাতুল সম্পত্তি তোমার ফেলনা নয়। দু-এক হাজার টাকা খরচ করে একটু অদলবদল সাবাই ফাবাই করে নিলে আর দেখতে হবে না।'

রাখাল খুশি হল, 'যাক, তোমার পছন্দ হয়েছে তা হলে ?'

'পছন্দ হবে না বল কি ! কোথায় কিভাবে ছিলাম আর কোথায় এসেছি !'

তা সত্যি, মন-রাখা কথা বলেনি সমীরণ। মেসের এক চিলতে ঘরে বিশ বছর একটানা কাটিয়ে দিতে দিতে পাখা-মরে-যাওয়া পাখির মত অবস্থা হয়েছিল তার। শরীরের যেন কোন সাড় ছিল না। হাত-পা ছড়িয়ে আয়েস করা কাকে বলে ভুলেই গিয়েছিল একেবারে। সরু একফালি তক্তপোশ আর কেরোসিন কাঠের একজোড়া চেয়ার-টেবিল কোন রকমে পাতার পরে আরও একটা আস্ত মানুষের জায়গা হওয়া কঠিন। কোন রকমে শোয়া আর বসা চলে। ঘাড় গুঁজে লিখতে লিখতে যখন ঘাড়-পিঠ টনটন করতে থাকে, তখন দরজার সামনের সামান্য ফাঁকা মেঝেটুকুর ওপর আড়মোড়া ভেঙে দাঁড়াতে পারা যায়। তাও সাবধানে, মাথার ওপর হাত তোলা নিষেধ। ভাড়াটে সুদর্শন চক্রের মত একটা মান্ধাতা আমলের পুরোন সিলিং ফ্যান রড ছাড়াই ছ'ফুটের মধ্যে নেমে এসেছে। নিচু ছাদ। তাই মেপেজুকে, বহুদিনের জানা অঙ্কের মত বাঁধা ছকে নির্ভুল ভাবে পা ফেলে হাত তুলে জীবনের দুর্লভ কুড়িটা বছর কাটিয়ে দিয়েছে সমীরণ। মেসের সে প্রথম মেম্বার, বলতে গেলে লাইফ মেম্বার, সেই সুবাদে এখনো দশ টাকা ভাড়ায় একটা আস্ত ঘরের বাসিন্দা। যদি অবশ্য এটাকে আস্ত ঘর বলা যায়।

সমীরণের বয়স হয়েছে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ, আজন্ম ব্যাচেলার। দীর্ঘকাল ধরে সংসারের প্রতি কর্তব্য করার পরে এখন একা। চার চারটে বোন ছিল। একে একে তাদের পার করেছে। মা-বাবা দুজনেই স্বর্গত হয়েছেন। সামনে পেছনে আর কোন টান নেই তার এখন। স্থায়ী বন্ধুবান্ধব কেউ নেই। মেস বাড়িতে একদা যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তারা সকলেই যে যার মত মেস ছেড়ে চলে গেছে, যোগাযোগ ধীরে ধীরে ছিন্ন হয়েছে। এখন এই অনিমেষ আর রাখাল এসে জুটেছে। বয়সে যদিও অনেক ছোট, তবু একরকম বন্ধুর মতই হয়ে গেছে। বন্ধু এবং ভক্ত। অনিমেষ খবরের কাগজের অফিসে কাজ করে আর রাখাল দোকান নিয়েছে কলেজ স্ট্রীটে। বইয়ের দোকান। সে শুধু বই বেচে না, বই ছাপেও। খান পনের বই ইতিমধ্যেই সে প্রকাশ করেছে। শ্রীরামপুরে পৈতৃক বাড়ি। উইক এণ্ডে বাড়ি যায়। সমীরণ দস্তিদারের নিজের খবর বেশি কিছু নেই। বিশ বছর আগে এক রকম ঝোঁকের মাথায় গোঁয়ার্তুমি করেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল সে। একটা টিনের সুটকেশ, বিছানার বাণ্ডিল আর নিজের কলমটি সম্বল করে। আকাঙ্ক্ষা ছিল লেখক হবে। কিছুকাল আগেও বাঙালীর ছেলেরা যেমন বাড়ি থেকে পালাতো, বম্বে গিয়ে সিনেমার নায়ক হবার স্বপ্ন নিয়ে। সমীরণ অবশ্য লেখক হয়েছে। বাজারে খুব একটা রমরমা না থাকলেও গুটি পঞ্চাশ বইয়ের জনক। কলমই তার জীবন, কলমই তার জীবিকা। একটা সামান্য চাকরি করত এতদিন, সে নাম কো ওয়াস্তে চাকরিটাও ছেড়ে দিয়ে এখন পুরোপুরি স্বাধীন হয়েছে।

'তা হলে এবার হাত-পা ছড়িয়ে সাধনায় বসে যাও। টপ গিয়ারে কলম চালিয়ে তোমার এপিক উপন্যাসখানা শেষ করে ফেলো। আমি ছাপব।'

অনিমেষ ধুয়ো ধরল, 'হ্যাঁ, সমীরদা ! এবার চাই তোমার মাস্টারপীস, বাংলা সাহিত্যকে তাক লাগিয়ে দেওয়া চাই। এরকম কাম অ্যান্ড কোয়ায়েট জায়গা তুমি তপোবনের আশ্রমেও পাবে না।'

রাখাল হাসল, 'এখানে তুমি আমার গেস্ট। এক মাস লাগুক, দুমাস লাগুক, সব ইনভেস্টমেন্ট আমার। উইক এন্ডে এসে আমরা দেখে দেখে যাব। চাল ডাল নুন লকড়ির চিন্তা তোমাকে করতে হবে না, সেজন্যে আমরা রয়েছি। আর কাল থেকে ভবানীমাসী আসবে, সকালে বিকেলে তোমাকে রেঁধেবেড়ে দিয়ে যাবে।'

সমীরণ কিছু বলার আগেই রাখাল তার কথা শেষ করে চা আনতে চলে গেল। তারপর চা খেয়ে ওরা চারটে পঁচিশের গাড়ি ধরে চলে গেল। খাটের বিছানায় শুয়ে শুয়েই সমীরণ গাড়িটার চলে যাওয়ার শব্দ শুনল। রাখাল ছেলেটা খুব প্র্যাকটিক্যাল, অনিমেষও কম যায় না। খুঁটিনাটি সব দিকে নজর আছে। মোমবাতি আর দেশলাইয়ের বাণ্ডিল, চা বিস্কুট, টিনের দুধ, সিগারেটের কার্টন, একটা টর্চ, সব কিছু গুছিয়ে রেখে গেছে। মায় খবরের কাগজের বন্দোবস্ত পর্যন্ত করে দিয়ে গেছে।

আর সেই সঙ্গে রেখে গেছে নির্জনতা। এত নির্জনতা যে থেকে থেকে কানে তালা ধরে যাচ্ছিল সমীরণের।

বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করছিল সমীরণের, এরকম ঝুঁকি না নিলেই ভাল হত। মেয়েরা সব সময়েই আনপ্রেডিকটেবল, কখন কি করে বসবে মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না। যে মুহূর্তে মনে হবে গলে গেছে, সে মুহূর্তেই হঠাৎ জ্বলে উঠতে পারে। বোমার পলতের আগুন নিভে যাবার পরে গুটি গুটি আবার তার দিকে আগুন নিয়ে এগোবার সময় যেমন বুকের মধ্যে একটা চাপা আতঙ্ক গুড় গুড় করতে থাকে। হয়তো কাছে পৌঁছনো মাত্র একটা আচমকা বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে।

অবশ্য এরকম ঘটনা তার জীবনে আগে কখনো ঘটেনি। তার পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবনে মেয়েদের নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ আসেনি এর আগে। লেখক মানুষ, তবু মেয়েদের মুখের দিকে চোখ তুলে কখনো তাকায়নি সমীরণ। স্ত্রীভূমিকা বর্জিত জীবনটা একটানা নিরামিষ এবং একঘেঁয়েই কেটে গেছে, বাকি দিনগুলোও তাই যেত, যদি না এখানে এই অদ্ভুত নির্জন পরিবেশে কাঞ্চনের সঙ্গে ওভাবে দেখা হয়ে যেত তার। আর যদি না দেখামাত্র তার প্রেমে পড়ে যেত ওভাবে।

প্রথম দর্শনে প্রেম বলে একটা কথা আছে ইংরেজীতে। কিন্তু সমীরণের কেস তার চেয়েও জটিল। তার প্রেমে শুধু প্রথম দেখা নয়, প্রথম ছোঁয়াও লেগে আছে। ভিজে শরীরের একটা শীতল স্পর্শ তার ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। এখন আর নিজের ওপরে তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এই দুদিন ধরে সে কাঞ্চনকে কম করেও অন্তত বার তিরিশেক দেখেছে। এই জানলা দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে, হ্যাংলা চোরের মত। যদিও একবারের জন্যেও কাঞ্চন তার দিকে চোখ তুলে তাকায়নি, তবু সমীরণের কেমন মনে হয়েছে এদিকে মুখ না ফিরিয়েও মেয়েটি সব টের পাচ্ছে। ওর মুখের ওই ঠোঁট টেপা হাসিটা নিশ্চয়ই সমীরণের উদ্দেশেই। একটা যুবতীসুলভ প্রশ্রয় আছে ওই হাসির মধ্যে। পুরুষকে মেয়েরা তো এই ভাবেই লাই দেয়। শুধু হাসিটুকু প্রমাণ নয়, ওর এই অকারণ আনাগোনাও মনে হয় বিশেষ উদ্দেশ্যপূর্ণ। কুয়োতলায় ওর এত কি কাজ যে দিনের মধ্যে ছত্রিশবার সিঁড়ি ভেঙে ওঠা-নামা করতে হয়। শুধু হাতেই তো উঠছে নামছে বারবার।

প্রথম দেখার পর রাতটা ওর কথা ভেবে ভেবে প্রায় জেগেই কাটিয়ে দিয়েছে সমীরণ। কে এই তরুণী? কি এর পরিচয়? বছর চব্বিশ পঁচিশ বয়স হবে মনে হয়, যদিও দেখায় আরও কম। বিবাহিত। অবস্থা বোধ হয় খুব ভাল নয়। গায়ে গয়নাগাটি প্রায় নেই বললেই চলে। এই ধরনের রক্ষণশীল পরিবারে, আব্রুটানা অন্দরমহলে অনেক গোপনগল্প থাকে, অনেক গণ্ডগোল। বজ্র আঁটুনির তলায়ই ফসকা গেরো, ঘোমটার তলায় কি যেন বলে সেই নাচ, এ তো জানা কথাই। বাইরের লোক দেখানো বনেদীআনা আর আভিজাত্য তলায় তলায় কবে ফোঁপড়া ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। তরুণীটি যে সংসারের বধূ সেই গেরস্থালির চেহারা কি রকম সমীরণ জানে না, কিন্তু লেখক হিসেবে কিছুটা কল্পনা করতে পারে। জমিদার বংশের ভগ্নাংশ হলেও পড়তি অবস্থাতেও নীল রক্তের দাপট ছিল একদিন। গরীব ঘর থেকে তুলে আনার পর ছেলের শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ রাখেনি এই পরিবার। বিয়ের পরদিন থেকেই কাঞ্চন অন্তরীণ হয়ে রয়েছে। শাশুড়ী এখন বাতে পঙ্গু, শ্বশুর গত হয়েছেন। স্বামীটি অপদেবতা বিশেষ। পৈতৃক যা কিছু ছিল নানান বদ খেয়ালে উড়িয়ে ফুরিয়ে এখন বউয়ের গায়ে হাত দিয়েছে। মদ্যপ লম্পট রেসুড়ে মানুষের শেষ পরিণতি যেরকম। রাতে কোনদিন বাড়ি ফেরে, কোনদিন ফেরে না। অথবা গল্পটাকে আর একভাবে ভাবা যায়। বৃদ্ধ যক্ষ যক্ষিণীর মত শ্বশুর-শাশুড়ী নিয়ে কাঞ্চনের সংসার। স্বামী বিদেশে, আগে ঘনঘন আসত, এখন বাড়িতে আসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। অবিশ্যি মনিঅর্ডারের যোগসূত্রটা

ছিড়ব-ছিড়ব করেও এখনো ছেড়েনি। ফিলমের গল্পের মত কে জানে সে গোপনে আর একটা সংসার পেতে বসেছে হয়তো। চোখের আড়ালেও প্রকৃতি তার আপন নিয়মে নির্ভুল অঙ্কের মত এগোয়। ন্যাড়া ডাল একদিন সবুজ পাতায় ছেয়ে যায়, কুঁড়ি আসে ফুল ফোটে। দেহের কানায় কানায় ভরা যৌবন একদিন উপচে পড়তে থাকে। নারীকে তার নিজের আগুন নিয়ে খেলতেই হয়। দীর্ঘ দিন দীর্ঘতর রাত জুড়ে তার নিঃসঙ্গতা অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে ক্রমশ। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সমীরণ এসে পড়েছে একেবারে তার গায়ের কাছে আচমকা।

প্রথম রাত্তিরটায় সমীরণের খুব কষ্ট হয়েছিল এই সব ভেবে। বিছানায় এপাশ ওপাশ করেছে। তীব্র আপত্তি আর বেদনা বোধ করেছে কাঞ্চনের জন্যে। কাঞ্চন নামটা অবশ্য তখনো সে জানত না। কী নাম হতে পারে মেয়েটির ? ভাবতে ভাবতে প্রথমে কামিনী নামটাই এসে গিয়েছিল মনের মধ্যে। তারপর ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল কখন।

আবছা ঘুমের মধ্যেই সমীরণ টের পাচ্ছিল দরজায় কেউ নক করছে। ঘুম ভেঙে যাবার পরেও ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসে আবার শুনতে পেল শব্দটা। ব্যাকুল এবং উত্তেজিত হয়ে কেউ মুহুর্মুহু দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। ঘুম জড়ানো চোখে দিশেহারা সমীরণ টেবিলের টাইমপীসটার দিকে তাকাল। ফসফরাস মাখানো ডায়ালে সাড়ে চারটে জ্বলজ্বল করছে। রাত পুইয়ে এসেছে। একটা জ্যালজেলে অন্ধকার এখনো ঘরের মধ্যে মশারির মত ফেলা। এই অসময়ে কে ? কে এল তার কাছে এত জরুরী দরকার নিয়ে ? নতুন জায়গা। ঝট করে দরজা খুলে দেওয়া ঠিক না। ছিটকিনিতে হাত রেখে সমীরণ জিজ্ঞেস করল, 'কে ? কি চাই ?'

'শিগগির খুলুন। আমি কাঞ্চন। মেয়েলী গলায় কাতর আহ্বান ভেসে এল ওপিঠ থেকে।

'কাঞ্চন !' নিজের মনেই প্রতিধ্বনি করল সমীরণ। এই নামের কাউকে মনে পড়ল না। না পড়ুক, কিন্তু যে এসেছে সে বোধ হয় খুব বিপন্ন। দরজা খুলে দিতেই সে হুড়মুড় করে সমীরণের গায়ের ওপর এসে পড়ল। টাল সামলাতে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরেও দু পা ঘরের মধ্যে পিছিয়ে আসতে হল সমীরণকে। মেয়েটি হাঁপাচ্ছিল, বুকের ওঠা-পড়া টের পাচ্ছিল সে। বেশবাস আলুথালু, ভাল করে দাঁড়াবার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে যেন। ভাঙা ভাঙা ধরা গলায় সে যেন কোন রকমে উচ্চারণ করল, 'বাঁচান ! আমাকে ও মেরেই ফেলবে ! বাঁচান !'

লজ্জিত হতভম্ব সমীরণ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে নিতেই শুনতে পেল একটা মত্ত কন্ঠের গর্জন, ভেতরের বারান্দা দিয়ে কেউ খ্যাপা ষাঁড়ের মত তার দরজার দিকেই ছুটে আসছে। অনিবার্য এবং আসন্ন বিপদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সশস্ত্র সমীরণ তাড়াতাড়ি দরজায় খিল তুলে দিতে গেল কিন্তু পারল না, তার ভীত কম্পিত হাত থেকে খিলটা পিছলে পড়ে গেল। আর সেই মুহূর্তেই একটা ঝনঝন শব্দে তার ঘুমটা সত্যি করে ভেঙে গেল।

চোখ খুলেও কিছুক্ষণ সমীরণ অসাড় হয়ে শুয়ে থাকল। সদ্য দুঃস্বপ্নের আঘাত কাটিয়ে উঠতে, বুকের ধকধকানি শান্ত করতে একটু সময় লাগল।

ভয় এবং একটা মধুর আবেশ এক সঙ্গে বুক চেপে ধরেছিল সমীরণের। তার শরীরে তখনও যেন স্বপ্ন কাঞ্চনের জীবন্ত স্পর্শ লেগে রয়েছে। এত বাস্তব, এত মুহূর্ত আগের, যে চোখ খুলেও তার জের কাটেনি। ভোরের আলোয় ঘর ভেসে যাচ্ছে, কিছুই আর অস্পষ্ট নয় এখন, দরজায় যেমন খিল বন্ধ ছিল তেমনি আছে, শূন্য নির্জন ঘরের শান্তি যেন চিড় খায়নি এক চুল। শুধু তার মনের মধ্যে সব উথাল পাথাল হয়ে গেছে। নিজের মনের অবচেতন আকাঙ্ক্ষা থেকেই এই স্বপ্নটার জন্ম তাতে আর সন্দেহ নেই সমীরণের। নইলে লণ্ঠনের গায়ে হলুদ আলোয় যে যুবতীকে সে সন্ধেবেলা এক ন্যুড মডেলের দুর্লভ ভঙ্গিমায় দেখে ফেলেছিল সিঁড়ির মুখে, তাকেই সে নিজের আলিঙ্গনের মধ্যে পেয়ে গেল কি করে। যার নাম ভেবেছিল কামিনী, সেই স্বপ্নের মধ্যে বন্ধ দরজায় ঘা দিয়ে নিজের নাম জানিয়ে গেল—কাঞ্চন। কাঞ্চনই হয়তো মেয়েটির নাম, সত্যিকারের নাম, টেলিপ্যাথির মত কোন অজ্ঞাত প্রক্রিয়ায় তার কাছে পৌঁছে গেল। স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল বুঝতে পেরে সমীরণ ধড়মড়িয়ে উঠে বসে নামতে গেল, আর তক্ষুনি দেখতে পেল মেঝেটা জলে থৈ থৈ করছে। ঘুমের মধ্যে বোধ হয় হাত ছুঁড়েছিল সে, হাতের ধাক্কা লেগে টিপয়ের ওপর থেকে জলের জগটা মাটিতে পড়ে গেছে। জগের মুখটা একটা ডিশ দিয়ে ঢাকা ছিল, সেটা মাটিতে চার টুকরো হয়ে পড়ে

আছে।

সমীরণ জল আর পোর্সিলিনের টুকরো বাঁচিয়ে মাটিতে পা রাখতে যাবে এমন সময় কি একটা নরম জিনিস তার কোলের ওপর এসে পড়ল। চমকে তাকিয়ে দেখল গোল গোল গোটা দুই পাতাসুদ্ধ একটা বেগনী রঙের ফুল, ডাঁটি থেকে সদ্য ছেঁড়া। অবাক কাণ্ড! ফুলটা শূন্য থেকে খসে পড়তে পারে না, কেউ নিশ্চয়ই ছুঁড়ে মেরেছে। কে মারল? তার সঙ্গে এই রসিকতা কে করল? চারপাশে তাকাতেই ওপাশের জানলাটা চোখে পড়ল, যেখান দিয়ে ফুলটা ছিটকে আসার সম্ভাবনা।

ফুলটা হাতে নিয়ে এক লাফে সমীরণ জানলার কাছে পৌঁছল আর তখনই প্রথম আবিষ্কার করল সিঁড়ির মাথা আর একচিলতে ভেতরের বারান্দা এই জানলার তল ঘেঁষে চলে গেছে। এপাশ ওপাশ তাকিয়ে কাউকে অবশ্য দেখা গেল না, শুধু রিনরিন ঝিনঝিন একটা শব্দ যেন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে গেল। ভুরু কুঁচকে বিভ্রান্ত সমীরণ কিছু মনে করবার চেষ্টা করল এক মুহূর্ত। কি একটা যোগসূত্র সে যেন ঠিক ধরতে পারছে না। যেন সুতোর দুটো প্রান্ত জট পাকিয়ে কোথায় মুখ লুকিয়েছে, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, উল্‌টে টানাটানির ফলে ফাঁসটা আরও জটিল হয়ে উঠছে।

বিরক্ত সমীরণ চিন্তা-ভাবনা ঝেড়ে ফেলে হাতের ফুলের দিকে ভাল করে তাকাল। আর সঙ্গে সঙ্গে গায়ে কাঁটা দিল, কাকতালীয় হলেও যোগাযোগটা বিচিত্র। ফুলটা গোলাপ নয়, গাঁদা নয়, কাঞ্চন। আবার সেই কাঞ্চন, সেই স্বপ্নের কাঞ্চন। দুয়ের মধ্যে একটা মিসিং লিঙ্ক আছে, আর সেটা ধরতে পেরেই লাফিয়ে উঠল সে। মেয়েটার নাম কাঞ্চন, আর সেটাই কাঞ্চন ফুল উপহার দিয়ে কৌশলে জানান দিয়ে গেল বোধ হয়। কাঞ্চন, কাঞ্চন, কাঞ্চন। শেষ বয়সে, এই অবেলায় প্রেম কি সত্যিই নিঃশব্দ চরণে তার দরজায় এসে দাঁড়াল, প্রায় অযাচিত ভাবে, প্রায় অনায়াসে। পরকীয়া প্রেমের একটা বাড়তি আকর্ষণ আছে, যাকে বলা যায় অবৈধ আকর্ষণ। সে তার রক্তের মধ্যে সেই দুর্বার টানটা অনুভব করছিল, মনে হচ্ছিল, অনুচিত অন্যায় পাপ কিংবা লোকনিন্দার দোহাই দিয়ে নিজেকে সে আর ধরে রাখতে পারবে না। এতক্ষণ পরে হঠাৎ রিনরিন ঝিনঝিন শব্দটা শনাক্ত করতে পেরে সব ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। কাল সন্ধেবেলা যখন কাঞ্চন সিঁড়ির মুখে তাকে পাশ কাটিয়ে উঠে গিয়েছিল, তখন সে এই শব্দটাই শুনতে পেয়েছিল। হাতের চুড়ি আর পায়ের নূপুর মিলিয়ে বোধ হয় এইরকম আওয়াজ উঠছিল। তাহলে এই ফুলটা নিশ্চয়ই কাঞ্চনই ছুঁড়ে দিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। এই জানলাটাও তাহলে সেই খুলেছে, কারণ তার যতদূর মনে পড়ছে কাল রাতেও এটা বন্ধই ছিল।

চায়ে গোটাদুই চুমুক দেবার পর সমীরণের খেয়াল হল চা জুড়িয়ে একেবারে জল হয়ে গেছে।

চার ছড়িয়ে মাছ-শিকারী যেমন করে এক দৃষ্টিতে ফাত্‌নার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে, সমীরণ সেই ভাবেই আধখোলা জানলার ফাঁকে দৃষ্টি রেখে বসেছিল, চায়ের কাপের কথাটা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিল। পনের বিশ মিনিট হতে পারে, আধ ঘন্টা চল্লিশ মিনিট হওয়াও বিচিত্র নয়। স্নায়ুক্ষয়কারী উদ্বেগ নিয়ে সে কাঞ্চনের অপেক্ষা করছিল। কিন্তু আজ দুপুর থেকে তার দেখা পাওয়া দূরে থাক, সেই রিনরিন ঝিনঝিন শব্দটাও দূর থেকে কানে আসেনি। দেওয়ালের ওপিঠে আজ কি হচ্ছে কে জানে, আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাসও হতে পারে, সব যেন নিঃশব্দ নিঃঝুম হয়ে গেছে। চিঠিটা ঝোঁকের মাথায় এমন কতকগুলো কথা লিখে ফেলেছে, যা কাঞ্চন অসম্মানজনক মনে করলেই বিপদ। এখন মনে হচ্ছে, চিঠিটা লিখে খুবই মূর্খের মত কাজ করা হয়েছে। আসলে কাঞ্চনের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে পরিষ্কার কোন ধারণায় আসা মুশকিল। যে কোন মেয়ের সম্বন্ধেই তাই, ঠমক গমক আর ঠোঁটের হাসি দেখে কিছুই বোঝা যায় না, পেণ্ডুলামের মত এই মুহূর্তে যে কাছে আসে পরের মুহূর্তেই সে ততোধিক দূরে সরে যায়। গলে গেছে মনে করে গদগদ হতে না হতেই সে জ্বলে ওঠে। ছেলেবেলায় কালীপুজোর রাতে এরকম কিছু বোমা বা পটকা দেখার অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। পলতের আগুন হজম করে যে নিরীহ নষ্ট চেহারা নিয়ে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে শুধু কাছে যাওয়ার অপেক্ষায়, তারপর আচমকা ফেটে পড়ে। ভগবান না করুন, এখন কাঞ্চনও সে রকম একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলতে পারে। চিঠিটা যদি তার স্বামী কিংবা অন্য কারো হাতে তুলে দিয়ে থাকে তাহলে মারাত্মক কেলেঙ্কারি ঘটতে আর দেরি নেই। মান-সম্মান খুইয়ে এখান থেকে তাকে কি

নোটিশে পাততাড়ি গুটোতে হবে। মনে মনে অধৈর্য সমীরণ কাঞ্চনের উত্তরের অপেক্ষা করছিল। চিঠি যদি নাও আসে, একবার কাঞ্চনের দেখা পেলেও কিছুটা আঁচ পাওয়া যেত। বিপজ্জনক ফাঁদে জড়িয়ে পড়ার আগেই মানে মানে এখান থেকে সরে পড়া যেত!

আকাশ পাতাল ভেবে সমীরণের বুকের ভেতরটা কি রকম গুড়গুড় করছিল। দুপুরে খেতে যাবার আগে চিঠিটা সুতোয় বেঁধে জানলায় ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে চিঠিটা উধাও হয়েছে। অর্থাৎ যার উদ্দেশে চিঠি সে নিজে হাতে নিয়ে গিয়েছে। প্রথমটা মনটা আনন্দে উল্লাসে নেচে উঠেছিল কিন্তু এখন যত সময় যাচ্ছে, পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে, নানারকম বিশ্রী আশঙ্কায় মনের ভেতরটা কালো হয়ে উঠছে। চিঠিটা যে কাঞ্চনের হাতেই পড়েছে তারই বা ঠিক কি! কাঞ্চনের এই দীর্ঘ নীরবতা, এই অনুপস্থিতি সত্যিই ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত দু'দিন এবকম ঘটনা ঘটেনি, কুড়ি মিনিট আধ ঘন্টা অন্তর অন্তর এই দুপুর বেলা তার সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। কারণে অকারণে সে এসেছে গেছে, প্রতিবারই ঠোঁটের হাসি, আড়চোখের দৃষ্টি তার বুকে আগুন ছড়িয়েছে। কাঞ্চন ফুলটি পাবার পরই প্রকৃতপক্ষে এই জানলাটা সে আবিষ্কার করেছে। তারপর জানলার সামনে বসে থাকার অজুহাত হিসেবে লেখার টেবিল এখানে সরিয়ে এনে ঘাঁটি গেড়েছে।

উদ্বেগের মধ্যে ঝুলেই রইল সমীরণ। ক্রমে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হল। আচ্ছন্ন ম্রিয়মান সমীরণ আলো জ্বালল না, এক মুহূর্তের জন্যেও টেবিল ছেড়ে উঠে যেতে সাহস পেল না। পাছে সেই মুহূর্তে কাঞ্চন তার নজর এড়িয়ে চলে যায়। বসে থাকতে থাকতে কেমন একটা ঝিমুনির ভাব এসে গিয়েছিল, চোখদুটোও হয়তো বুজে এসেছিল কয়েক লহমার জন্যে। হঠাৎ একটা চেনা পারফিউমের গন্ধ আর সেই মিঠে শব্দটা তাকে এক মুহূর্তে সজাগ করে দিল।

দু'চোখ কচলে সমীরণ বাইরের অন্ধকারে তাকাল জানলা দিয়ে। রিনঝিন শব্দটা এগিয়ে আসছিল একটা অস্পষ্ট আলোর আভা নিয়ে। কাঞ্চন আসছে, সিঁড়ির ধাপে তার শরীরটা ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ হচ্ছিল, মোমরঙা পায়ের পাতা থেকে শাড়ির পাড় বেয়ে সমীরণের চোখ লাফিয়ে লাফিয়ে থাই, ঢেউ দোলানো কোমর, শঙ্খমুটি অনাবৃত বাহুলতা, আঁচল ঢাকানো উদ্ধত বুক ধরে নিচ্ছিল। হঠাৎ মুখের দিকে নজর পড়ল, এই প্রথম কাঞ্চন সরাসরি তাকিয়েছে, চোখে যেন বিদ্যুৎ এবং চুম্বক একই সঙ্গে খেলে গেল, ঠোঁটে অন্তর্ঘাতী হাসি। যখন সমীরণের চোখের সামনে দিয়ে লণ্ঠন দোলাতে দোলাতে তরতরিয়ে নেমে গেল, যাবার মুখে একটা চোখ টিপে যেন একটা টিপ্পনী ঝেড়ে গেল। মনে হল এক ঝলক বদ্ধ বাতাস হঠাৎ ছাড়া পেয়ে তার মুখের ওপর পাখা ঝাপটে উড়ে গেল। চেনা পারফিউমের সঙ্গে ফিসফিসানির মত একটা কথা জড়িয়ে গেল কিনা বোঝা গেল না। ঝাঁ ঝাঁ করা কানের মধ্যে হাওয়া ঢুকে হয়তো একটা কথার ইলিউশন তৈরি হল। সমীরণের মনে হল কাঞ্চন বাতাসের গলায় তাকে একটুকরো কথা উপহার দিয়ে গেল : আজ রাতে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।

সম্বিত ফিরে পাবার পর সমীরণের মনের মধ্যে একটিই কথা শুধু পাক খেতে লাগল, কখন, কোথায়? কখন, কোথায়? স্বস্তিতে, উল্লাসে উত্তেজনায় তার দু'চোখে যেন ঘুম জড়িয়ে আসবে। কত দিনের বাঁধভাঙা ঢল নেমে আসবে সারা শরীর বেয়ে। কিন্তু এখন ঘুম তো তুচ্ছ কথা, তার এখন মরবারও সময় নেই। এক বিচিত্র রূপকথার জগৎ এখন তার হাতের মুঠোয় এসে গেছে। কিংবা বলা যায়, এমন রহস্যপুরীর গোপন দরজার চাবিকাঠি, যেখানে সে এই প্রথম, তার নিঃশেষ হয়ে যাওয়া জীবনে এই প্রথম প্রবেশ করবার ছাড়পত্র মিলল। যে রহস্য যে রোমাঞ্চের স্বাদ থেকে সে চিরকাল বঞ্চিত থেকে গেছে। নারীর দেহ সে কোনদিন স্পর্শও করেনি, নারীর মন তার নিতান্তই কল্পনার সামগ্রী, শুধু গল্পের জন্যে বানিয়ে বানিয়ে এতদিন যা কিছু লিখেছে।

মানুষের মন এই রকমই। কয়েক মিনিট আগেও যে আশঙ্কায় আশঙ্কায় কন্টকিত হয়েছিল, এই যাত্রায় কোনক্রমে পার পেয়ে গেলে এমন কাজ আর কখনো করবে না বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, বলতে গেলে নাক কান মলেছে—সেই মানুষই আবার আরও বড় ঝুঁকি নেবার জন্যে উন্মাদের মত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখছে।

সমীরণ আবার ঘড়ি দেখল। রাত ন'টা।

গোটা বাড়িটাই কবরখানার মত নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। বাইরের প্রকৃতি এখন আঁকা ছবির মত নিস্পন্দ। জলাজঙ্গল ঝোপঝাড় মাঠের ওপর মরা জ্যোৎস্নার সর জমে রয়েছে। ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল সে। শেয়ালের প্রহর ঘোষণার পর ধাতব শব্দের করাত টেনে আপ-ডাউন দুখানা ট্রেন পরস্পর কাটাকুটি খেলে চলে গেল।

সমীরণ আর পারছে না। এই বয়সে এই উত্তেজনা আর সহ্য হয় না। অপেক্ষা করার চেয়ে স্নায়ুঘাতক বোধ হয় আর কিছু নেই। মনে হচ্ছে, অনন্তকাল ধরে সে কাঞ্চনের অপেক্ষা করে আছে। একটা সঙ্কেত, দরজায় একটা ভীত চাপা হাতের টোকা পড়বে এরকমই আশা করে বসেছিল সমীরণ। কিন্তু কেউ এল না। মনে পড়ল, কাঞ্চন তার কাছে আসবে এরকম কোন প্রতিশ্রুতিই সে দেয়নি। বরং বলেছে, আজ রাতে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। তার মানে কাঞ্চনই অপেক্ষা করবে, সমীরণকেই যেতে হব তার কাছে। কিন্তু কোথায় ? কখন, ক'টার সময় ? মেয়েদের স্বভাবই এই, কোনদিন যদি কোন কথা পরিষ্কার করে বলতে শিখল। সবই তাদের ঝাপসা, সব কিছুরই ওপর একটা রাখাঢাকা দেওয়া আছে।

এই সব ভাবতে ভাবতে সমীরণ কখন ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, খেয়াল করেনি। ভেতরের করিডোরে চাপা জ্যোৎস্না এসে পড়েছে বাঁকা হয়ে। বারান্দাটা পার্টিশান দিয়ে আধখানা করা। ওপাশে যেতে হলে সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নেমে অন্য সিঁড়ি ধরতে হবে। ওপথে কাঞ্চনকে বহুবার যে দেখেছে সে। আশা করেছিল কাঞ্চনকে দেখতে পেয়ে যাবে, কিন্তু ভেতর বারান্দাটা একেবারে জনশূন্য। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে থেকে পা টিপে টিপে সিঁড়ির বাঁকে নেমে ওপাশের রাস্তা ধরল। জায়গাটা কেমন অন্ধকার, কারণ চাঁদের আলো সিঁড়িতে পৌঁছয়নি। হাতে টর্চ ছিল, কিন্তু টর্চ জ্বেলে হঠাৎ কারো নজরে পড়ে যেতে রাজী নয় সমীরণ। প্রথম রাতের দুঃস্বপ্নটা ঝপ করে মনে পড়ে যেতেই গা'টা ছমছম করে উঠল। খ্যাপা ষাঁড়ের মত ছুটে আসা কাঞ্চনের স্বামী যদি সত্যি সত্যিই এখন দেখা দেয় ! পরের মুহূর্তেই তার মন অভয় দিল, না, কাঞ্চনের স্বামী আজ বাড়ি নেই। বাড়িতে থাকলে কখনোই কাঞ্চন তাকে আসতে বলত না।

ধীরে ধীরে কখন সে ওপাশের বারান্দায় পৌঁছে গেল। বারান্দার দু'ধারে ছোট বড় মিলিয়ে গুটি চারেক ঘর। কিন্তু সবগুলোরই দরজা বন্ধ। গোটা কতক জানলা আছে অবশ্য, কিন্তু কাচের শার্সি বন্ধ থাকায় ভেতরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবে এটা ঠিক কোন ঘরেই আলো নেই। ঘরগুলো ঘুমে তলিয়ে আছে যেন। সমীরণের বুকের ভেতরে হাতুড়ি পড়ছে, হাতের আঙুলের ডগাগুলো ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে যেন। এই বারান্দা তার নিষিদ্ধ জায়গা, এখানে তার এই অবৈধ অনুপ্রবেশের কোন যুক্তি নেই। সমীরণ মনে মনে তবু একটা যুক্তি খাড়া করে নিল। টর্চটা পকেটে লুকিয়ে ফেলল। কারো সামনাসামনি পড়ে গেলে বলতে পারবে, নতুন জায়গা, অন্ধকারে ঠাহর করতে না পেরে ভুল সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেছে। কথাটা ভেবে ইস্তক জোর পেল সমীরণ। কান খাড়া করে ঘরের বাসিন্দাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শোনবার চেষ্টা করতেই চমকে উঠল। সেই চেনা পারফিউমের গন্ধটা যেন এক ঝলক নাকে এসে লাগল। সেই সঙ্গে রিনঝিন শব্দটা।

সমীরণ সেই মুহূর্তে একটা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ক্যাঁচ করে এক আবছা আওয়াজ করে ভেজানো পাল্লাটা যেন সামান্য ফাঁক হয়ে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে বুকটা ধড়াস করে উঠল তার। ধোঁয়ার মত আবছা ফর্সা একখানা হাত কপাটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসে ইশারায় তাকে ডাকল। সম্মোহিতের মত সমীরণ বোবা গলায় শুধোল, 'কান্চন্ ?'

সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল সমীরণের মগজের মধ্যে। কানের পাশে একটা মদালসা চাপা গলায় কেউ বলল, 'এস...ভেতরে এস।' কথাটা যেন ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে, অণুপরমাণুর টুকরো টুকরো হয়ে কানের মধ্যে অনন্তকাল ধরে বেজেই চলল, এস...ভেতরে এস...

সপ্তার শেষে, শনিবারে রাখালরা যখন এসে পৌঁছল, তখন বাড়ি লোকে লোকারণ্য। পুলিশ এসেছে। উঠোনে সমীরণের পচে দুর্গন্ধ বেরোন লাশ সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা রয়েছে। পাশে একটা কঙ্কাল, তার দুটো পায়ের গোছে দু'গাছা নূপুর।
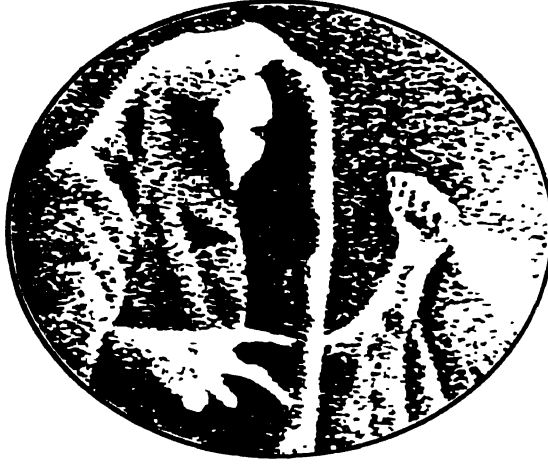
সবুজ আলো

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যে রকম পথে ঘাটে হিপিদের দেখা যায়, লম্বা লম্বা চুলওয়ালা ছেলে ও মেয়ে, অনেক সময় খালি পা, নোংরা পোশাক, সেই রকমই এক যুবক-যুবতীকে আমি দেখেছিলাম। কিছুই অবাক হইনি।

ওরা পার্ক স্ট্রীটে চৌরঙ্গীর মোড়ে দাঁড়িয়েছিল, দুজনেরই পোশাক এক রকম, প্যান্ট ও শার্ট, সোনালী রঙের চুল, হালকা নীল চোখের মণি, দুধে-আলতা রং, অন্য হিপিদের মতন এরা তেমন নোংরা নয়, যদিও পোশাক ছেঁড়াখোঁড়া।

ওরা চুপ করে দাঁড়িয়ে পরস্পরের মধ্যে নিচু গলায় কথা বলছিল। আমি দু-এক পলক ওদের দিকে তাকিয়েছিলাম, ওরা এতই রূপবান যে না তাকিয়ে পারা যায় না। দুজনেরই মুখে অপরূপ সারল্য মাখানো।

আমি ভাবলাম, ওরা তো বেশ ভালোই আছে। চাকরি বাকরি কিংবা টাকা পয়সা উপার্জন কিংবা ঘর সংসার নিয়ে থাকাই এই পৃথিবীর নিয়ম। এ নিয়ম বড্ড পুরোন হয়ে গেছে। ওরা যদি সে নিয়ম না মানে, তাহলে বুঝতে হবে ওরা অন্যরকম সুখ চাইছে।

অধিকাংশ হিপিই এক রকম চেহারার হয়, এবং সাহেব-মেমেদের মুখ একবার মাত্র দেখে মনে রাখাও যায় না। সুতরাং ওদেরও মনে রাখার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু আমি ঘাম মুছবার জন্য যেই পকেট থেকে রুমাল বার করতে গেছি, অমনি ঝনঝন করে কয়েকটা খুচরো পয়সা রাস্তায় পড়ে গেল। কয়েকটা গড়িয়ে গেল ওদের পায়ের কাছে।

আমি নিচু হয়ে পয়সা তুলতে গেলাম। ছেলেমেয়ে দুটিও পয়সা কুড়িয়ে আমার হাতে দিল। আমি হেসে বললাম, থ্যাঙ্ক য়ু।

ওরা দুজনে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর কি বলল আমি বুঝতে পারলাম না। বোধ হয় ওদের ভাষা ইংরেজী নয়। জার্মান, ফরাশী, ডাচ ছেলেমেয়েরাও তো হিপি হয়।

আমি আর সেখানে দাঁড়ালাম না। হাঁটতে লাগলাম ধর্মতলার দিকে। ওরা সেখানেই রইল দাঁড়িয়ে। মেয়েটির হাসি আমার এতই সুন্দর লেগেছিল যে আমি দু-একবার ওদের দিকে ফিরে ফিরে না তাকিয়ে পারিনি। বেশিবার তাকানো আবার অভদ্রতা।

এটা একটা সামান্য ঘটনা। মনে রাখবার মতন কিছু নয়। আমি মনেও রাখিনি।

এর কয়েক দিন পর আমি বেনারস গিয়েছিলাম। বেনাবস তো একেবারে হিপিদের রাজত্ব। রাস্তায়, বিশেষত গঙ্গার ধাবে শত শত হিপিদের যখন তখন দেখা যায়। এদের মধ্যে যদিও সেই দুজন হিপিকে হঠাৎ একদিন দেখি, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমি কিন্তু ওদের দুজনকে অত ভিড়ের মধ্যেও চিনতে পেরেছিলাম। সেই মেয়েটির হাসি দেখেই চিনলাম। হাসিটা আমার চোখে লেগেছিল। মেয়েটির শরীরটা এত সুন্দর এবং মুখখানা এত লাবণ্যময় যে সিনেমায় নামলে দারুণ নাম করতে পারত। তার বদলে একটা পাতলা জামা প্যান্ট পরে গঙ্গার ধারে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে।

এর দুদিন পরে বেনারসে একটা ছোটখাটো দাঙ্গা লাগার উপক্রম হল। একদল লোক লাঠিসোটা, এমন কি খোলা তলোয়ার হাতে রাস্তায় নেমে পড়ল। তারা সব হিপিদের তাড়াবে। কয়েকজন হিপিকে মারধোরও করল খুব, তবে ঠিক সময় পুলিশ এসে পড়ায় বেশিদূর গড়াল না। অনেক গ্রেপ্তার হল, লোকগুলো নাকি অধিকাংশই গুণ্ডা শ্রেণীর।

হিপিদের ওপর ওদের অত রাগের কারণটা পরে জানতে পারলাম।

বেনারসে আমি উঠেছিলাম আমার বন্ধু প্রশান্তর বাড়িতে। আমার বন্ধুর স্ত্রী গীতি যাকে বলে সরকারী গেজেট। রোজ সকাল বেলা বাজার করতে গিয়ে গীতি যাবতীয় খবর সংগ্রহ করে আনে।

গীতি আমাদের একটি লোমহর্ষক কাহিনী শোনাল।

বেনারসের আশেপাশে এখনো অনেক ছোটখাটো রাজা ও জমিদার রয়ে গেছে, যারা প্রায় মধ্যযুগীয় কায়দায় জীবন কাটায়। তারা নিজস্ব গুণ্ডা পোষে, অনেক সময় লোকজনকে খুন করে মৃতদেহ গায়েব করে দেয়, নানা জায়গা থেকে স্ত্রীলোকও ধরে আনে।

হিপিদের মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর মেয়ে আছে বলে অনেক সময় এই সব রাজা ও জমিদাররা গুণ্ডা দিয়ে হিপি মেয়েও লুঠ করে। আগেকার দিনে কোন মেমসাহেবকে ভোগ করার কথা তারা ভাবতেও পারত না। এখন অনেক সুযোগ। বেনারসে এত হিপি মেয়ে গিসগিস করছে ; তার মধ্যে দু-একজন হারিয়ে গেল কি না গেল কে খোঁজ রাখে।

সেই রকমই একটা ঘটনা ঘটেছিল গতকাল। একজোড়া হিপি ছেলেমেয়ে রাত্তিরবেলা একটা সরু গলি দিয়ে যাচ্ছিল, এই সময় তিনজন গুণ্ডা তাদের অনুসরণ করে। গুণ্ডাদের সঙ্গে লাঠি ও ছুরি ছিল।

গলিটা ছিল কানাগলি। এক জায়গায় শেষ হয়ে গেছে, সামনে দেয়াল। হিপি ছেলে ও মেয়েটি বুঝতে পেরেছিল, তাদের পেছনে গুণ্ডা লেগেছে। কিন্তু রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের আর পালাবার উপায় নেই, তাই পেছনে ফিরল।

সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডা তিনজন ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটির ওপর। মেয়েটি কিন্তু একটুও ভয় পায়নি। সে চিৎকার করে কি যেন বলল ছেলেটিকে।

ছেলেটি একজন গুণ্ডাকে টেনে তুলল। তারপর সে গুণ্ডাটির দুটি হাত ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলে। ছিঁড়ে ফেলে মানে শরীর থেকে একেবারে ছিঁড়ে আলাদা করে মাটিতে ফেলে দেয়। এরপরে সে গুণ্ডাটার চোখ দুটো খুবলে নেয়।

গল্পের মাঝখানে বাধা দিয়ে আমি বললুম, গীতি, বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে না!

গীতি তার সুন্দর মুখে দারুণ বিস্ময় ফুটিয়ে বলল, আপনি বিশ্বাস করছেন না? সবাই একথা শুনেছে!

—তারা কি করে জানল। ওখানে কি আর কেউ উপস্থিত ছিল। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি যেন পাশে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলে!

—এসব কথা ঠিক জানা যায়, বুঝলেন। পরে সেই ডেডবডিটা অনেকে দেখেছে!

—বাকি গুণ্ডা দুজন কি করল?

—তারা সে বীভৎস দৃশ্য দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল।

মানুষের হাত টেনে ছিঁড়ে ফেলা একটা অমানুষিক কাজ। হিপিরা সাধারণত নিরীহ হয়। ওদের কাছে অস্ত্র থাকে না। তাছাড়া গাঁজা-ভাং খেয়ে খেয়ে শরীরেও জোর থাকে না বিশেষ। তবে, জুডো আর ক্যারাটি নামে কয়েক রকম যুযুৎসু আছে, যাতে একজন ছোটখাটো মানুষও বিশাল চেহারার লোককে টিট করে দিতে পারে। কিন্তু হাত ছিঁড়ে ফেলা অসম্ভব।

আমরা এই বিষয় নিয়েই আলোচনা করছিলুম, এমন সময় প্রশান্তর বন্ধু তুষার এল।

তুষার সব শুনে নিল, গল্পটার অনেকখানি অংশ সত্যি। গতকাল রাত্রে কাশীর একটা সরু গলিতে একজন কুখ্যাত গুণ্ডার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেছে। তার একটা হাত কাটা অবস্থায় পড়েছিল পাশে। চোখ দুটোও গেলে দেওয়া হয়েছে।

তুষারের মামা এখানকার পুলিশের একজন হোমরা চোমরা অফিসার। তিনি দিয়েছেন এ খবর। ব্যাপারটার মধ্যে বেশ রহস্য আছে।

মারা গেছে একজন কুখ্যাত গুণ্ডা--সে একটা মেয়েকে চুরি করতে গিয়েছিল সুতরাং সে যোগ্য শাস্তিই পেয়েছে বলা যায়। কিন্তু দেখা গেল, বেনারসে অধিকাংশ লোকই হঠাৎ ক্ষেপে গেল হিপিদের ওপরে। দাবী উঠল, সব হিপিকে তাড়িয়ে দেওয়ার। থাইল্যান্ড কিংবা শ্রীলঙ্কায় যে রকম করা হয়েছে। গুণ্ডারা বেনারসে চিরকালই ছিল এবং থাকবে, তাদের ঘাঁটাবার কোন মানে হয় না।

শিক্ষিত লোকেরা বলতে লাগল, হিপিদের মধ্যে সি আই'এর দালাল এবং নানারকম স্পাই মিশে থাকে। ওদের এরকম যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা দেওয়া যায় না। কথাটার মধ্যে হয়তো কিছু সত্যি থাকতেও পারে। তবে, হিপিদের মধ্যে যে অন্য অনেক কিছু মিশে থাকে, তার প্রমাণ আমি পেলাম কয়েকদিন পরে।

বেনারসে ওই ঘটনা শুনে আমার বারবার মনে হচ্ছিল, আমি যে হিপি যুগলকে চিনি এই ব্যাপারটা বোধ হয় তাদের নিয়েই। অবশ্য এর কোন ভিত্তি নেই। হাজার হাজার হিপি রয়েছে। তবে হিপিদের মধ্যে অনেক সুন্দর মেয়ে থাকলেও ওই মেয়েটির মতন অত সুন্দর আর কাউকে দেখিনি।

শুনলাম অনেক হিপি বেনারস ছেড়ে চলে গেছে। নিশ্চয়ই ওদের স্বর্গস্থান নেপালে আরও ভিড় বাড়বে।

প্রশান্তর ফিয়াট গাড়িটা গ্যারেজ থেকে মেরামত হয়ে আসবার পরই ও বললে, চল, কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে ঘুরে আসি।

বেনারসে আমি বেশ কয়েকবার এসেছি, অনেক কিছুই দেখা। শুধু চুনারে আমার যাওয়া হয়নি। তাই ঠিক হল, চুনারে যাওয়া হবে।

কথা ছিল, সকালে গিয়ে সন্ধের আগে ফিরে আসা। কিন্তু চুনারের দুর্গের ওপরের গেস্ট হাউসটি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমি ভারতের বহু জায়গায় গেস্ট হাউসে থেকেছি, কিন্তু এমন সুন্দর জায়গা দেখিনি প্রায় বলতে গেলে।

পাহাড় কেটে বসানো হয়েছে দুর্গ, সেই দুর্গে এক সময় যেটা ছিল দরবার, এখন সেটাই জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। বিশাল বিশাল সুসজ্জিত ঘর। সামনে সুন্দর সাজানো চাতাল, অনেক নিচে গঙ্গা। গঙ্গা এখানে একটা বাঁক নিয়েছে। সন্ধের আধো অন্ধকারে মনে হল ঠিক যেন বাঁকা চাঁদ।

আমি গীতি আর প্রশান্তকে বললাম, এসো, আজ রাতটা এখানেই থেকে যাই।

গীতি বলল, দারুণ জায়গা। আমারও থাকতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সঙ্গে জিনিসপত্র যে কিছু আনিনি।

প্রশান্তরও থাকার খুব ইচ্ছে, কিন্তু কাল সকালেই ওর অফিসের ব্যাপারে একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

তখন ঠিক হল, আমি একাই ওখানে থেকে যাব। প্রশান্ত আর গীতি আজ ফিরে যাবে, আবার ফিরে আসবে কাল বিকেলে। তারপর তিন চার দিন থাকা হবে।

গেস্ট হাউসের ঘর দুটোই ফাঁকা ছিল, সুতরাং রিজার্ভেশন পেতে কোন অসুবিধে হল না।

যাবার সময় গীতি আমায় বলল, সুনীলদা, আপনার একা একা এখানে ভয় করবে না তো!

আমি বলালম, যাঃ, ভয় আবার কি !

প্রশান্ত হাসতে হাসতে বলল, এখানে রাজা মহারাজাদের আমলে এত যুদ্ধ চলেছে, কত খুন জখম হয়েছে, তাদের ভূত-টূত থাকতে পারে !

আমি বললাম, ভূতরাও মিলিটারিদের ভয় পায় !

দুর্গটার এক অংশ এখন মিলিটারিদের দখলে। একদিকে একটা মন্দিরে আছে আর এই গেস্ট হাউস শুধু জনসাধারণের জন্য।

আমি এক জামা কাপড়ে রয়ে গেলাম সেখানে। প্রশান্ত আর গীতি চলে যাবার পর আমি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সামনের চত্বরটায় বসে গঙ্গা দেখতে লাগলাম। সন্ধের পর আর বাইরের লোকদের এখানে আসতে দেওয়া হয় না। জায়গাটা এখন খুবই নির্জন। অনেকদিন এমন নির্জনতা উপভোগ করার সুযোগ পাইনি।

—সাব !

আমি চমকে উঠেছিলাম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, ডাকবাংলোর চৌকিদার।

সে জিজ্ঞেস করল, রাত্তিরে আমার জন্য খাবার বানাতে হবে কিনা !

তাই তো, নির্জনতা নিয়ে কবিত্ব করতে গিয়ে আমি খাবার কথাই ভুলে গিয়েছিলাম ! কথাটা ভাবতেই আমার খিদে পেয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, খাবার কি পাওয়া যাবে ?

সবচেয়ে সুখাদ্য এবং সহজে রান্না করা যায়, অর্থাৎ ভাত আর মুরগীর মাংস, তারও ব্যবস্থা আছে। আমি সেটারই অর্ডার দিলাম। এবং বললাম, খুব জলদি বানাতে।

আপশোষ হতে লাগল, কেন একটা হুইস্কি বা ব্র্যাণ্ডির বোতল সঙ্গে আনিনি, তাহলে এই নির্জনতা আরও ভালভাবে উপভোগ করা যেত।

চৌকিদারকে কথাটা জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করছিল। তারপর লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম। সে বলল, এনে দিতে পারে, তবে অনেকটা সময় লাগবে। পাহাড়ের নিচে বাজারে যেতে হবে কিনা।

আমি তাকে পাঁচ টাকা বকশিস দিয়ে বললাম, যাও, তাই নিয়ে এসো।

চৌকিদার চলে যাবার পর জায়গাটা আরো বেশি নির্জন মনে হতে লাগল। একটা জিনিস লক্ষ্য করে আমি অবাক হয়ে গেলাম। চারপাশে এত সৌন্দর্য, মাথার ওপরে বিশাল আকাশ নিচেও বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়, গঙ্গার রূপও এখানে অসামান্য, চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে —তবু একা থাকার জন্য আমি এসব তেমন ভাবে উপভোগ করতে পারছি না। আমার একটু ভয় ভয় করছে। ঠিক ভূতের ভয় নয়, বরং চোর ডাকাতের ভয়ই বেশি। চৌকিদারকে না পাঠালেই হত। আমাকে এখানে একা পেয়ে কেউ যদি খুন করে টাকা পয়সা কেড়ে নিয়ে যায় ? আমার কাছে মাত্র শ'দেড়েক টাকা রয়েছে যদিও, কিন্তু এদেশে পাঁচ দশ টাকার জন্যও অনেক সময় মানুষ খুন হয়।

হঠাৎ মনে হল, ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্য আমার একটু শীত শীত করছে। আসলে এটা একটা অজুহাত। বাইরে একা বসে থাকতে আমার গা-ছমছম করছিল। ঘরের মধ্যে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বেশ নরম গদী। খুব আরামের।

একটুক্ষণ বাদেই আমি বাইরে কার যেন গলার আওয়াজ শুনলাম। দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, চত্বরের একেবারে শেষ প্রান্তে গঙ্গার দিকে দুজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিজেদের মধ্যে গল্প করছে মনে হয়।

সিগারেট ধরিয়ে আমি বাইরে এলাম। অল্প চাঁদের আলোয় দেখলাম, একজন সাহেব ও মেম। রাত্রে সাধারণত কাউকে আসতে দেওয়া হয় না। তবে সাহেব ও মেমদের জন্য সব সময়েই অনেক বেশি সুযোগ থাকে। কিংবা হয়তো ওদের আগে থেকে ঘর রিজার্ভ করা ছিল।

একটু এগিয়ে এসে আমি দারুণ চমকে উঠলাম। সেই দুজন হিপি যুবক-যুবতী। এদের একবার আমি দেখেছি কলকাতার পার্ক স্ট্রীটে, একবার কাশীতে, আবার এখন চুনারে। আমি যেখানে যাচ্ছি, এরা কি সেখানেই যাচ্ছে ?

নিজের মনকে বোঝালাম, হয়তো ব্যাপারটা কাকতালীয় যোগাযোগ। হঠাৎ এরকম মিলে যেতেই

পারে। বেনারস থেকে হিপিরা বিতাড়িত হচ্ছে বলেই বোধ হয় ওরা দুজন চুনারে এসেছে। অস্বাভাবিক কিছু নয়।

ওরা যখন আমার প্রতিবেশী, তখন ওদের সঙ্গে আলাপ করা যেতে পারে।

এগিয়ে গিয়ে বললাম, হ্যালো!

ওরা একটু চমকে ঘুরে দাঁড়াল। ওরা নিজেদের মধ্যে গল্পে মশগুল হয়ে ছিল। মেয়েটির দিকেই আমার প্রথম চোখ পড়েছিল। মেয়েটির মুখে সেই রকম হাসি নেই। বরং একটা রাগের ভাব। আমাকে কিছু না বলে দুর্বোধ্য কি একটা ভাষায় কিছু বলল ছেলেটিকে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম ওরা ইংরাজী জানে না।

আমি ছেলেটির দিকে তাকালাম, ভারতবর্ষে যখন ঘুরছে তখন কিছু একটা সুবোধ্য ভাষা তো জানবে। বোধ হয় হিন্দী জানে। তাই আমি বললাম, আপলোগ....

ছেলেটি আমায় কিছু বলতে দিল না। দুর্বোধ্য একটা শব্দ করে আমার দিকে তাকালে। আমার শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল। ছেলেটির দু-চোখ দিয়ে সবুজ রঙের আলো বেরোচ্ছে। দুটো সবুজ আলোর রেখা এসে ভেদ করলে আমার মুখ। সে রকম ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমি কখনো দেখিনি।

ছেলেটি এগিয়ে এসে আমার একটা হাত ধরল। কি অসম্ভব গরম তার হাত। একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর হলেও মানুষের দেহে অতখানি উত্তাপ থাকে না।

স্বীকার করতে একটুও লজ্জা নেই, আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেও পারলাম না। সমস্ত শরীর দিয়ে বুঝতে পারলাম, এরা সাধারণ মানুষ নয়।

আমার মনে পড়ে গেল কাশীর সেই গুণ্ডাটার হাত ছিঁড়ে যাওয়ার এবং চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা! আমি এক হাতে চোখ ঢেকে চিৎকার করে বললাম, আমায় ছেড়ে দিন! দয়া করে ছেড়ে দিন। আমার কোন খারাপ মতলব নেই।

আমি সেখানে অজ্ঞান হয়ে অনেকক্ষণ পড়েছিলাম। চৌকিদারটা ফিরে এসে আমাকে ওই অবস্থায় দেখতে পেয়ে মাথায় জলের ছিটে দেয়। চোখ মেলেও প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, আমি মরেই গেছি। তারপর দেখলাম, নিজের দুটো হাত ও দুটো চোখ অক্ষত আছে কিনা। সবই ঠিক আছে। সেই ছেলেটি ও মেয়েটি সেখানে নেই। তাদের কেউ দেখেনি। চৌকিদার জোর দিয়ে বলল, রাত্তিরে এখানে কারোর আসার হুকুম নেই।

আমি আজ ভূতে বিশ্বাস করি না। আমার দৃঢ় ধারণা, ওরা ভূত টুত নয়– -অন্য কিছু। আমাদের জানা জগতের বাইরের কোন অস্তিত্ব। বন্ধুরা অবশ্য সব শুনে বলে, পুরো ব্যাপারটাই আমার চোখের ভুল। নির্জন জায়গায় সম্পূর্ণ একলা থাকলে ওই রকম নাকি হয়।

টেলিফোনে

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

টেলিফোন তুললেই একটা গম্ভীর গলা শোনা যাচ্ছে, 'সিক্স ফোর নাইন ওয়ান···সিক্স ফোর নাইন ওয়ান···সিক্স ফোর নাইন ওয়ান··· ।'

সকাল থেকে ডায়াল-টোন নেই। টেলিফোনের হরেক গণ্ডগোল থাকে বটে, কিন্তু এ-অভিজ্ঞতাটা নতুন। গলাটা খুবই যান্ত্রিক এবং গম্ভীর। খুব উদাসীনও।

প্রদীপের কয়েকটা জরুরী টেলিফোন করার ছিল। করতে পারল না।

কিন্তু কথা হল, একটা অদ্ভুত কণ্ঠস্বর কেবল বারবার চারটে সংখ্যা উচ্চারণ করে যাচ্ছে কেন ? এর কারণ কী ? ঘড়ির সময় জানার জন্য বিশেষ নম্বর ডায়াল করলে একটা যান্ত্রিক কণ্ঠে সময়ের ঘোষণা শোনা যায় বটে, কিন্তু এ তো তা নয়। মিনিটে-মিনিটে সময়ের ঘোষণা বদলে যায়, কিন্তু এই ঘোষণা বদলাচ্ছে না।

অফিসে এসে সে তার স্টেনোগ্রাফারকে ডেকে টেলিফোনের ত্রুটিটা এক্সচেঞ্জে জানাতে বলেছিল। তারপর কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সে একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বড় অফিসার। বহু বছর দিল্লিতে ছিল, সম্প্রতি কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছে। কোম্পানিই তাকে বাড়ি, গাড়ি ও টেলিফোন দিয়েছে। তার আগে এই পদে ছিলেন কুরুপ্পু নামে দক্ষিণ ভারতের একজন লোক। তিনি রিটায়ার করে দেশে ফিরে গিয়ে ফুলের চাষ করছেন বলে শুনেছে প্রদীপ। খুবই দক্ষ ও অভিজ্ঞ মানুষ ছিলেন তিনি। রিটায়ার করার বয়স হলেও কোম্পানি তাঁকে ছাড়তে চায়নি। বরং আরও বড় পোস্ট দিয়ে ধরে রাখতে চেয়েছিল। কুরুপ্পু কিছুতেই রাজী হননি।

দুপুরে লাঞ্চের আগে সে একটি পার্টিকে একটা বকেয়া বিলের জন্য তাগাদা করতে টেলিফোন তুলে ডায়ালের প্রথম নম্বরটার বোতাম টিপতেই আচমকা সেই উদাসীন, গম্ভীর, যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, সিক্স ফোর নাইন ওয়ান···তারপরই অবশ্য কণ্ঠস্বর থেমে গেল।

প্রদীপ খুবই অবাক হয়েছিল। সামলে নিয়ে বাকি নম্বর ডায়াল করতে রিং বাজল এবং ওপাশে

একজন ফোনও ধরল। প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিয়ে প্রদীপ খুব চিন্তিতভাবে অফিসের ইলেকট্রনিক টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল। এই ফোনেও কণ্ঠস্বরটা এল কী করে ? এসব হচ্ছেটা কী ?

কলকাতার বাড়িতে প্রদীপের আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। তার মা, বাবা, বোন, ভাই সব দিল্লিতে। সে বিয়ে করেনি। একা থাকে। একজন রান্নার ঠিকে লোক রেঁধে দিয়ে যায়। আর ঘরদোর সাফ করা, বাসন মাজা ও কাপড় কাচার জন্য ঠিকে একজন কাজের মেয়ে আছে। তারা কেউ বাড়িতে থাকে না। আলিপুরের নির্জন অভিজাত পাড়ায় তিনতলার মস্ত ফ্ল্যাটে প্রদীপ সম্পূর্ণ একা। তবু প্রদীপ হঠাৎ ফ্ল্যাটের নম্বর ডায়াল করল এবং শুনতে পেল ওপাশে রিং হচ্ছে।

মাত্র তিনবার রিং বাজতেই কে যেন ফোনটা ওঠাল। কিন্তু কথা বলল না।

প্রদীপ বলল, 'হ্যালো ! হ্যালো !'

কেউ জবাব দিল না। কিছুক্ষণ পর ফোনটা কেউ আস্তে নামিয়ে রাখল।

দুপুরবেলাতেও প্রদীপের শরীর হিম হয়ে এল। এসব হচ্ছেটা কী ? যদি রং নম্বরই হয়ে থাকে তা হলেও তো ওপাশ থেকে কেউ না কেউ সাড়া দেবে !

বিকেলে পার্টি ছিল, ফ্ল্যাটে ফিরতে একটু রাতই হয়ে গেল তার। আর ফেরার সময় মাথায় দুশ্চিন্তাটা দেখা দিল। সে অলৌকিকে বিশ্বাসী নয়, কিন্তু কোনও ব্যাখ্যাও তো পাওয়া যাচ্ছে না।

দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢোকার পর একটু গা-ছমছম করছিল। তবে আলো জ্বেলে ঝলমলে আধুনিক ফ্ল্যাটটার দিকে চেয়ে তার ভয়-ভয় ভাবটা কেটে গেল। তবে ফোনটার ধারেকাছে সে আর গেল না।

প্রদীপের গভীর ঘুম ভাঙল রাত দুটো নাগাদ। হলঘরে ফোন বাজছে। ঘুমচোখে সে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। দিল্লিতে মা বাবার শরীর খারাপ হল না তো !

ফোন ধরতেই শিউরে উঠল সে। সেই যান্ত্রিক উদাসীন গম্ভীর গলা বলতে লাগল, 'সিক্স ফোর নাইন ওয়ান···সিক্স ফোর নাইন ওয়ান···সিক্স ফোর নাইন ওয়ান···।'

ফোনটা রেখে দিল সে। বাকি রাতটা আর ঘুম হল না। বিছানায় এপাশ ওপাশ করে কাটিয়ে দিল।

কলকাতার টেলিফোন-ব্যবস্থা যে খুব খারাপ, তা প্রদীপ জানত। তবু সকালে ব্রেকফাস্টের সময় টেলিফোন বেজে উঠতেই প্রদীপ যখন কম্পিত বক্ষে গিয়ে টেলিফোন ধরল, তখন একটি অমায়িক কণ্ঠস্বর বলল, 'সার, আপনি টেলিফোন খারাপ বলে কমপ্লেন করেছিলেন কাল। কিন্তু আমরা টেস্ট করে দেখেছি আপনার লাইনে তো কোনও গণ্ডগোল নেই। লাইন তো চালু আছে।'

'কিন্তু আমি যে টেলিফোনে একটা অদ্ভুত গলা শুনতে পাচ্ছি।'

'হয়তো ক্রস কানেকশন হয়ে গিয়েছিল। আমাদের যন্ত্রপাতি সব বহু পুরোন, তাই মাঝে মাঝে ওরকম হয়। আপনি ডায়াল করে দেখুন এখন, লাইন ঠিক আছে।'

বাস্তবিকই লোকটা কানেকশন কেটে দেওয়ার পর ডায়াল টোন চলে এল এবং অফিসের নম্বর ডায়াল করতেই লাইনও পেয়ে গেল প্রদীপ।

ফোন স্বাভাবিক হল বটে, কিন্তু প্রদীপের মাথা থেকে 'সিক্স ফোর নাইন ওয়ান··' গেল না। কাজকর্মের ব্যস্ততার ফাঁকে-ফাঁকে নম্বরটা মনে পড়তে লাগল। এক-আধবার প্যাডে নম্বরটা লিখেও ফেলল।

বিকেলের দিকে কয়েকটা চিঠি সই করতে গিয়ে হঠাৎ চিঠির ওপরে টাইপ-করা তারিখটা দেখে সে একটু সচকিত হল। টু ফোর নাইন্টি ওয়ান। অর্থাৎ একানব্বই সালের দোসরা এপ্রিল। সিক্স ফোর নাইন ওয়ান মানে কি এপ্রিলের ছয় তারিখ ?

কথাটা টিকটিক করতে লাগল মাথার মধ্যে। অফিস থেকে বেরিয়ে সে গেল একটা ক্লাবে টেনিস খেলতে। তারপর একটা হোটেলে রাতে খাবার খেয়ে ফ্ল্যাটে ফিরে এল। টেনিস খেলার ফলে ক্লান্ত শরীরে খুব ঘুম পাচ্ছিল। শোওয়ার আগে সে সভয়ে টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল। দিল্লিতে ফোন করে মা-বাবার একটা খবর নেওয়া দরকার। ফোন করাটা উচিত হবে কি ? যদি আবার··· ?

না, ফোন তুলে ডায়াল-টোনই পাওয়া গেল। দিল্লির লাইনও পাওয়া গেল একবারেই। মা, বাবা, ভাই ও বোনের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে মনটা হালকা লাগল। আজ শুয়েই ঘুমিয়ে

পড়ল।

তিন-চারদিন আর কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটল না। টেলিফোন স্বাভাবিক। দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগটাও আস্তে-আস্তে সরে যেতে লাগল মন থেকে।

কিন্তু রবিবার সকালে গল্‌ফ খেলতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল প্রদীপ। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। প্রদীপ অন্যমনস্কভাবে টেলিফোন তুলতেই সেই অবিস্মরণীয় যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'দিস ইজ দ্য ডে·· দিস ইজ দ্য ডে···দিস ইজ দ্য ডে··· দিস ইজ দ্য ডে...'।

সকালের আলোর মধ্যেও ভয়ে হঠাৎ হিম হয়ে গেল প্রদীপ। চিৎকার করে বলল, 'হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অব ইট?'

অবিচলিত কণ্ঠস্বর একইভাবে বলে যেতে লাগল, 'দিস ইজ দ্য ডে··· দিস ইজ দ্য ডে··'

প্রদীপ চিৎকার করে ধমকাল, দু-একটা নির্দোষ গালাগালও দিল, কাকুতি-মিনতি করল। কিন্তু কণ্ঠস্বরের অধিকারী ওই একটা বাক্যই উচ্চারণ করে গেল।

এপ্রিলের কলকাতা এমনিতেই গরম। ফোনে চেঁচামেচির পর আরও ঘেমে উঠল সে। ফোনটা রেখে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইল। এর মানে কী?

হঠাৎ খেয়াল হল, আজ এপ্রিলের ছয় তারিখ। সিক্স ফোর নাইন ওয়ান। আজকের দিনটা সম্পর্কে কেউ তাকে কিছু বলতে চাইছে কি? কী বিশেষত্ব এই দিনটার?

আজ তো চমৎকার একটা দিন। আজ সারাদিন তার দারুণ প্রোগ্রাম। তাদের অফিসের সবচেয়ে বড় ক্লায়েন্ট মাণ্টু সিং সরখেরিয়ার আমন্ত্রণে তারা আজ যাচ্ছে কলকাতার বাইরে দিল্লি হাইওয়ের কাছে সরখেরিয়ার বিশাল বাগানবাড়িতে। সকালে সেখানে গল্‌ফ আর টেনিসের আয়োজন, দুপুরে বিশাল লাঞ্চ, সন্ধেবেলায় হাই টি। তারপরও গানবাজনা হবে। একেবারে ডিনার সেরে ফেরার কথা। এমন চমৎকার মজায় ভরা দিনটা নিয়ে চিন্তা করার কী আছে?

ফুরফুরে হাওয়ায় হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে দিল্লি রোড হয়ে সরখেরিয়ার বাগানবাড়িতে পৌঁছনোর সময় দুশ্চিন্তাটা কখন উবে গেল। অনেক অতিথি জড়ো হয়েছে, হাসি-হট্টগোল চলছে। গল্‌ফ কিট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল প্রদীপ, এক কাপ কফি খেয়ে নিয়েই।

সরখেরিয়ার খামারের পাশেই গল্‌ফের বিশাল মাঠ। মাঝে-মধ্যে ঝোপ-জঙ্গল, জলা। অনেক গল্‌ফ-খেলোয়াড় জড়ো হয়েছেন। খেলতে খেলতে সব দুশ্চিন্তা সরে গেল মাথা থেকে।

বলটা একটা ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। প্রদীপ বল খুঁজতে সেখানে ঢুকল। জায়গাটা যেন অন্ধকার এবং দুর্গম। কিন্তু জঙ্গলটা এমন জায়গায় যে, গর্ত পর্যন্ত যেতে হলে এই জঙ্গলটি পেরোতেই হবে।

সেই জঙ্গলে নিচু হয়ে বলটা খুঁজবার সময়ে আচমকাই একটা দূরাগত কণ্ঠ যান্ত্রিকভাবে হঠাৎ বলে উঠল, 'দিস ইজ দ্য ডে···'

একটা ক্লিক করে শব্দ হল কোথাও। সন্দেহজনক কিছু নয়। কিন্তু হঠাৎ প্রদীপের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই যেন কিছু জানান দিল। সে বিদ্যুৎ-গতিতে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই বজ্রপাতের মত একটা বন্দুকের শব্দ হল। গাছের গোটা কয়েক ডাল প্রচণ্ড শক্তিশালী বুলেটের ঘায়ে ভেঙে পড়ল। তারপরই এক জোড়া পায়ের দ্রুত পালানোর শব্দ।

প্রদীপ যখন উঠে বসল তখন খানিকটা হতভম্ব হয়ে চারদিক দেখল সে। কেউ তাকে মারার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু খুবই সামান্যর জন্য বেঁচে গেছে।

উঠে গায়ের ধুলোটুলো ঝেড়ে চারদিকটা দেখল সে। তাকে মারতে চায়? কেনই বা?

বন্দুকের শব্দ শুনে কেউ ছুটে আসেনি। তার কারণ আশপাশে অনেকেই শিকারে বেরিয়েছে। বন্দুকের শব্দ হচ্ছেও আশপাশে।

সারাদিনটা খুব অন্যমনস্কতার মধ্যে কেটে গেল প্রদীপের। ঘটনাটার কথা সে কারও কাছে প্রকাশ করল না। রাতে বাড়ি ফিরে সে টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, টেলিফোনে এই দিনটার পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছিল তাকে। কিন্তু কেন? কে দিচ্ছিল?

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ টেলিফোন বেজে উঠল। সভয়ে টেলিফোন ধরল প্রদীপ।

'হ্যালো।'

ওপাশ থেকে একটি ভরাট গলা তার নম্বরটা উচ্চারণ করে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'এই নম্বর তো!'

'হ্যাঁ। আপনি কে?'

'আমি কুরুপ্পু। আপনি কে?'

'প্রদীপ রায়!'

'ওঃ, হ্যাঁ। আমি আপনার নাম জানি। দিল্লিতে ছিলেন। শুনুন, জরুরী একটা কথা আছে। সরখেরিয়ার এক কোটি চব্বিশ লাখ টাকার একটা বিল আছে। আপনি কি সেটা পাস করে দিয়েছেন?'

'না। বিলটা একটু ইররেগুলার। ক্ল্যারিফাই করার জন্য ডিপার্টমেন্টকে বলেছি।'

'খুব ভাল। ওই বিলটা একদম জালি। কিন্তু বিলটা আটকালে আপনার বিপদ হতে পারে। সরখেরিয়া বিপজ্জনক লোক।'

'বোধ হয় আপনি ঠিকই বলেছেন। আজ কেউ আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল।'

'হ্যাঁ, এরকম ঘটনা আরও ঘটতে পারে। কিন্তু ভয় পাবেন না, টেলিফোনটার দিকে মনোযোগী থাকবেন।'

এইবার প্রদীপ চমকে উঠে বলে, 'হ্যাঁ, টেলিফোনেও একটা অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে…'

কুরুপ্পু স্নিগ্ধ গলায় বললেন, 'জানি, মিস্টার রায়, ভূত মাত্রই কিন্তু খারাপ নয়। অন্তত ওই ফ্ল্যাটটায় যে থাকে সে খুবই বন্ধু ভূত। তাকে অবহেলা বা উপেক্ষা করবেন না, ভয়ও পাবেন না। তা হলেই নিরাপদে থাকতে পারবেন। বিপদের আগেই সে সাবধান করে দেবে। আমাকেও দিত। তার পরামর্শেই আমি রিটায়ার করে ফুলের চাষে মন দিয়েছি। আচ্ছা। গুড নাইট।'

প্রদীপ হাতের স্তব্ধ টেলিফোনটার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

মুখ

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক, অনেকদিন কেটে যাবে তারপর। শেষে একদিন একটি সোনালী বিকেলে হয়তো সীতা নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবে। আর, সেই ঝরে-যাওয়ার পরে কেউ কি মনে রাখবে যে এখানে একদা ভোরবেলাকার শিশির সূর্যের ছোঁয়া পেয়ে ঝলমল করে উঠেছিল। শুধু সেদিনকার সেই শিশিরের স্মৃতিতে দিন কয় হয়তো তাকিয়ে থাকবে নির্জন শিশুগাছটা। তারপর একসময়ে, শীতের সময়ে শিশুগাছের পাতা ঝরবে টুপটাপ, পড়ন্ত রোদের মিষ্টি আভার দিকে তাকিয়ে কিছুকাল মুহ্যমান থাকবে গাছটি, তারপর একদিন সকালের লালে সে নিজেই অবাক হয়ে যাবে—নতুন সবুজ পাতার রঙে রঙে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তখন আর সেই নীল নির্জন মুহূর্তের কথা মনেও থাকবে না তার।

জানলার কাচের ওপাশে বিকেলের রোদ। এপাশে মারবেল পাথরের মেঝেয় তারই চৌকো আলো।

সাদা, নরম, দুধের বিছানা থেকে উঠল সীতা। রুগ্‌ণ পাণ্ডুর বি-রঙ হাতে খুলে দিল জানলাটা। নিটোল একটি বিকেল গড়িয়ে পড়ল মারবেল পাথরের মেঝেয়। জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে রইল সীতা, সেদিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। সুরকি-ঢালা ফুলের কেয়ারি-করা লন। দীঘল একসার বনঝাউ, লম্বা ঝাঁক বাঁধা বাদাম, আম গাছের সবুজ পাতায় ছায়ার আলপনা, শঙ্খলতা রাজকন্যার দীঘল নরম আঙুলের মত সোনালী রঙের চাঁপা গাছ। গাড়ি-বারান্দা, লন পেরিয়ে ফটক।

উঃ, কতদিন হল সীতা বেরোয়নি বাইরে! অনেকদিন বাদে সেদিন ফটক পর্যন্ত গিয়েছিল। মালিকে ডেকে কিছু একটা বলতেও যাচ্ছিল তখন, তারপর সেই মুখটা চোখের সামনে অসহ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠায় কিছুই করতে পারেনি। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়ে ফিরে এসেছিল। মারবেল পাথরের বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে ঢুকেছিল তেতলার এই ঘরটায়। তারপর নিজেকে এলিয়ে দিয়েছিল সাদা রবারের ফেনা জমানো বিছানায়। বালিশে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল সেদিন।

কী করতে পারে এ-ছাড়া ?

লাইব্রেরি থেকে প্রায় প্রত্যেক দিনেব ডাকেই নতুন নতুন বই আসে। সুন্দর, ঝকঝকে কাচের মত সেলোফেনে মোড়া বই। দামী দামী। উঃ, কত কি লিখতে পারে লোকে! আজকাল সীতার আব পড়তেও ভাল লাগে না। একঘেয়ে লাগে। পানশে লাগে খবরকাগজও। চুপ করে কতক্ষণ আর ভাবা যায় ? মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে, শীর্ণ গাল বেয়ে ধারাপাত হয় শ্রাবণের, তারপর ঠোঁটে যখন সেই জল এসে পড়ে, তখন বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা ছাড়া কী আর করবার থাকে ওব ?

এত বড় বাড়িটা কী নির্জন !

সীতা জানলার শিক থেকে হাতটা সরিয়ে আনল, আকাশ থেকে ফিরিয়ে আনল চোখ। তাকাল ঘরের দেয়ালে। দেয়ালে এবং ঘড়িতে। বিকেল তখন। তাকাল সরোজের অয়েল পেন্টিংটাব দিকে। সুন্দর, স্বাস্থ্যবান সরোজ। তাকাল টেবিলে। ফুলদানিতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা! নতুন ফুল। কখন যে মালি এসে ফুল বদলে দিয়ে গেছে জানে না সীতা। হয়তো ঘুমিয়েছিল তখন। সাদা টেবিল-ক্লথটায় সুন্দর একটা নকশা কাটা। সাদা লেসের। সীতাবই কবা।

পায়ে পায়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে এল সীতা। সাদা শীর্ণ হাত বুলিয়ে নিল নকশাটার উপর।

কী করবে সীতা এখন ? ঘরটা আবছা হয়ে আসছে। অন্ধকাবে। সন্ধে নামছে তেতলাব এই ছোট্ট ঘরে।

আলোটা জ্বালল সীতা। বোতাম টিপতেই ঝলমল করে উঠল সারা ঘব। এমনি করে হয়তো উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারত সীতার জীবন।

টেবিলের ড্রয়ার খুলল সীতা। একটা চৌকো নীল কাগজের বাক্স। চিঠির। আলগোছে একটা চিঠি তুলে নিল সীতা। কালির রং এখনও তো বিবর্ণ হয়নি, চিঠিব মসৃণ কাগজটায় এখনও হালকা মিষ্টি একটা গন্ধ আছে। তবে কেন সীতার সব ফুরিয়ে গেল ? কেন ফুরিয়ে গেল সীতার সবকিছু ?

বিয়ের রাতে বিকাশ সীতাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল চিঠিগুলো। স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ অক্ষবে লিখে দিয়েছিল একটা ছোট্ট মন্তব্য : 'এখন আর কী দরকার আমার এই চিঠিগুলোয় ? তোমাব চিঠি তোমারই থাক।'

বিয়ের রাতের কথা মনে পড়তেই ফ্যাকাশে হয়ে এল সীতাব শীর্ণ মুখ। তারপর আলতো হাতে একটা নীল কাগজ তুলে নিল সীতা। আবাব পড়ল নিজের লেখা অনেকবার পড়া চিঠিটা।

'অনেক, অনেকদিন পর চিঠি লিখতে বসে ভাবছি, সবই তো বলা হয়েছে, তবুও কেন আমার আকুলতা কমল না। প্রত্যেক ভোরে কোথায় যে ফুল পায় পূজারী, অথচ ফুল ছাড়া তার পুজো সারা হয় না। হেসো না। আমার হয়েছে মুশকিল। আমি চাই তোমাকে কিছু বলতে, এমন কিছু যে আমার ভাবনাটাকে সুন্দরতর করে গোছানো যায়, গুছিয়ে তোমাব কাছে মেলে ধরা যায়, কিন্তু বড় এলোমেলো হয়ে পড়ে।

কত কথাই যে কত সময় ভাবি! তুমি যদি কোনরকমে আমার মনে একবার ঢুকতে পারতে, অবাক হয়ে যেতে তবে।

অসম্ভব মন কেমন করছে তোমার জন্যে।

স্নান করতে করতে উঠে এসে সোনালী বালুর ওপর শুয়ে থাকি মাঝে মাঝে। একা, একেবারে একা। দুই হাত মাথার নিচে দিয়ে তাকিয়ে থাকি সমুদ্রের ফেনার দিকে। সাদা সাদা ফেনার কুচি, ঠিক তোমার হাসির মত। সকালবেলার সচিত্র আলো আমার চোখে-মুখে। গাঙশালিকের কাঁপা ডানার পালকে রোদ্দুরের ঝালর। তোমায় মনে পড়ে। তখন মনে হয়, হয়তো চোখ ফিরিয়েই দেখব তুমি নিঃশব্দে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছ। কিংবা মনে হয় এখুনি তুমি টানবে আমার হাত ধরে। টানতে টানতে নিয়ে যাবে সমুদ্রের দিকে।

স্নান সেরে যখন বাড়ি ফিরি, ছপছপ করে তখন ভিজে শাড়ি। চুল দিয়ে বালি ঝরে। ঝাউবনের পথ দিয়ে চলি। মনে হয় তুমিও চলেছ আমার পাশাপাশি। তখন আর আশেপাশে তাকাতে মন চায় না। তাকালেই দেখব তুমি নেই। সে তো চাই নে আমি। তুমি আছ। তুমি আছ আমার পাশে, আকাশের নীলে, হাওয়ায়, সব খানে, আমার মনে। ইচ্ছে হয়, পথ যেন আর না ফুরোয়।

কী করে হয় তা ? বাড়ির গেট তো একটু পরেই। তুমিও নেই আমার পাশে। বাড়ি ঢুকে

চান-ঘরের শাওয়ারের নিচে এলিয়ে দিই শরীর। তারপর একঘেয়ে দিন। ভাল লাগে না।

সত্যি কথা বিকাশ, বিশ্বাস কর তুমি। সেদিন সন্ধের সময় যখন বৃষ্টির নূপুর বাজল, আমার অসম্ভব মন কেমন করে উঠল ঝাউবনের আবছায়ার দিকে তাকিয়ে। স্পষ্ট যেন তোমার সিগারেটের গন্ধ পেলুম। তোমার গায়ের উত্তাপ আর সকৌতুক চাউনি অনুভব করলাম যেন সর্বাঙ্গে।

জীবনের কোথাও যেন বাঁক নেই, এই কথাটাই সবচেয়ে বেশি মনে হচ্ছে আজকাল। তাই মাঝে মাঝে অসহায় রাগ হয় আমার। ভীষণ। ভাবি, এমন একটা জায়গা কি থাকবে না, যেখানে শুধু আমি, শুধু আমার একলার সত্তা।

শুনলে হয়তো অবাক হবে। হয়তো-বা ঠোঁট চেপে একটু হেসেও নেবে একটা গল্প শুনলে। গল্পটা অবশ্য তোমার ভাবনা আমায় কেমন পেয়ে বসেছে তার একটা উজ্জ্বল নমুনা। কাল দুপুরবেলায় নতুন ধরনের একটা মাছ রান্না করা হয়েছিল শস্ দিয়ে। চমৎকার লাগল। খুব ভাল। ভাবলাম, রান্নাটা শিখে নিই। তারপর মুহূর্তেই মনে হল, কবে যেন তুমি বলেছিলে, শস্ তোমার খুব বেশি একটা ভাল লাগে না। তবে আর শিখে কী লাভ? কোন উৎসাহ আর আমাকে ধন্য করতে পারল না। শেখা হল না রান্নার কায়দাটা।

খুব মজার গল্প সন্দেহ নেই, কিন্তু ভেবে দেখ তো কী করুণ অবস্থা আমার। নিজের যেটা ভাল লাগে তা-ও আমার কাছে নগণ্য, যদি না তোমার মনের মত সেটা হয়।

এবার থেকে তোমার সব কথা মেনে নোব না, এমনি একটা সঙ্কল্প গ্রহণ করলে মন্দ হয় না। যা দেখছি, কোনদিন তোমারও হয়তো একঘেয়ে লাগবে এমন অনুগত সীতাকে পেয়ে। ঝগড়া করা তো দুজনেই বোধ হয় ভুলে গিয়েছি। এখন মনে হয়, লোকে কী করে ঝগড়া করে বাজে সময় নষ্ট করে।'

চোখের কালো মণি নীল কাগজটা থেকে উঠে এসে পড়ল জানলায়। একটানা অল্পক্ষণ বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকার পরে দৃষ্টিটা আবার ফিরে এল ঘরের ভিতরে। দেয়ালে আর ঘড়িতে। সরোজের ফটোতে। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই মুখ, সেই ভয়াবহ মুখটা ফুটে উঠল সীতার চোখের সামনে।

তাড়াতাড়ি টেবিলের দেরাজ বন্ধ করল সীতা। দৃষ্টিকে নামিয়ে আনতে চাইলে সরোজের ফটোটা থেকে। কিন্তু পারল না। চুম্বনের মত তাকে আকর্ষণ করল একটি মুখ, ভয়াবহ মুখ।

পরক্ষণেই সরোজ তার স্টাডি থেকে শুনতে পেল চিৎকারটা, যে চিৎকারটা আজকাল নিয়মিত হয়ে উঠেছে: ওই যে! ওই যে!

ছুটে এসে ঘরে ঢুকল সরোজ। তেতলার ঘরটায়। আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে সীতা। মেঝের ওপর।

সন্ধে সাতটার সময়ে ডক্টর রায় আসবেন। এক মিনিট এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। ভারি কড়া লোক! তিনি একাই রোগীর সঙ্গে কথা বলবেন, ঘরে আর কেউ থাকবে না। মানসিক চিকিৎসার ধারাই নাকি এই রকম—ডক্টর রায় আগেই জানিয়েছেন।

সীতার বিছানার পাশে সরোজ বসেছিল। সীতার জ্ঞান হয়েছে বটে কিন্তু চোখ বুজে শুয়ে আছে সে। সাতটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি। চাকর এসে খবর দিলে ফোন এসেছে। পা টিপে টিপে সন্তর্পণে সরোজ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সীতা বিছানায় পাশ ফিরল। মাথার মধ্যে কী রকম একটা অস্বস্তি হচ্ছে। ঠিক যন্ত্রণা নয়, কিন্তু যন্ত্রণার চেয়েও যেন খারাপ। দেখল ঘরে কেউ নেই। সরোজ বোধ হয় কোন কাজে বাইরে গেছে। টেবিলের ওপরের ফুলদানির রজনীগন্ধা এখন গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে। পর্দার ফাঁকে এক ঝলক হাওয়া এসে ফুলের গন্ধ সারা ঘরে ছড়িয়ে দিল। দেয়ালের ঘড়িতে সাতটা বাজতে তেরো মিনিট বাকি। নিশ্বাস ফেলতে অসুবিধে হচ্ছে সীতার। রুমালটা নিয়ে ও ঘামে ভেজা কপালের ওপর বুলিয়ে নিল। রুমালে ল্যাভেণ্ডারের ভিজে ঠাণ্ডা গন্ধ। বোতাম টিপে সীতার কথামত ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়েছিল সরোজ। চোখে আলো এসে বড় লাগে। ঝোলানো বারান্দার ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে পর্দার ফাঁক দিয়ে। সন্ধের অন্ধকারে অস্পষ্টের মত ঘরের সমস্ত জিনিস।

একটা গভীর নিশ্বেস ফেলে সীতা পাশ ফিরে শুলো। সন্ধেব অন্ধকারে মাথার কাছে বিছানার বে সন্তর্পণ পায়ে যেন কে এসে দাঁড়াল। চোখ বুজেই সীতা শুধোল, কে ?

নরম গলায় উত্তর এল, ব্যস্ত হবেন না। যেমন শুয়ে আছেন, থাকুন। আচ্ছা, আপনার অসুখের ব কথা আমার কাছে খুলে বলুন তো—কিছু বাদ দেবেন না।

ওঃ, ডক্টর রায় ? বসুন।

থাক, থাক,—যেমন চোখ বুজে শুয়ে আছেন থাকুন।

মাথার ভিতরে খুব অস্বস্তি হচ্ছে সীতার। আর সহ্য হয় না।

আচ্ছা, শুনুন তাহলে। সব কথাই বলছি। প্রায় চার পাঁচ মাস হল এ ব্যাপারের শুরু হয়েছে। কদিন গীতবিতানের সঙ্গীত সম্মেলন থেকে ফিরছি, রাত প্রায় আটটা। সারকুলার রোড আর ৌরঙ্গীর মোড়ের কাছে আমার গাড়ি দাঁড়াল লাল আলোব জন্যে। হঠাৎ দেখি গ্যাসপোস্টের তলায় কটা লোক আমার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে আছে। এত খারাপ লাগল, ভীষণ : রোগা লম্বা চহারা। একদিকে চোখ ঝুলে নেমে এসেছে। কপালের ওপর এলোমেলো চুল। খোঁচা খোঁচা াড়ি। চোয়ালটা যেন আলগা, যেন অন্য কারও। মুখটা হাঁ হয়ে গেছে, জিভও একটু বেরিয়ে ড়েছে।

আপনি তো বেশ ভাল করেই লক্ষ্য করেছিলেন ?

হ্যাঁ। নিস্তেজ গলায় বলতে থাকে সীতা : আর তাছাড়া একবার তো শুধু দেখিনি, তারপব নেকবার। এত ভয় কবছিল তখন ! লোকটা আমাব দিকে বিশ্রী উঁচু নিচু দাঁত বের করে হসেছিল। ময়লা ছেঁড়া স্যুট গায়ে ঝলমল করে আলগা হয়ে ঝুলছিল। ভয়ে শবীর আমার যেন াঁটা দিয়ে উঠল। ড্রাইভারকে তাড়াতাড়ি গাড়ি চালিয়ে যেতে বললাম। কিন্তু সেই বিশ্রী ভয়ানক খ আমার স্বপ্ন-জাগরণ ছেয়ে থাকল। কখনও লোকটাকে দেখিনি, তবু বাববার মনে হতে লাগল কে যেন চিনি। কী রকম বিশ্রী ভিজে ভিজে ফ্যাকাশে মুখ।

তারপর ?

একটু দম নিল সীতা। কপালে তার ঘামের বিন্দু-বিন্দু। বোজা চোখের দু-পাশে গালের রগ স্পষ্ট য়ে উঠেছে—নীল রগ। একটা হাত বালিশের তলায় গুঁজে সীতা বলতে থাকল, তারপর যখনই াড়ি থেকে বেরোই, মনে হয় লোকটা বোধ হয় আমার জন্যে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। নিউ মার্কেট থকে কিছু জিনিসপত্র কিনে হয়তো গাড়িতে উঠতে যাব, এমন সময় হয়তো চোখে পড়ল, সেই লাকটা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আমার দিকে মিটমিট করে তাকাচ্ছে, কিংবা কখনও অপলক স্থির চাখে। আমি হয়তো তখন তাড়াতাড়ি গাড়ির দবজা বন্ধ করে দিলাম। তারপর থেকে মনে একটা কণ ভয় হল। অনেক দিন অনেক পথের মোড়ে দেখতে পেলাম এই লোকটাকে। একদিনের থা বলছি। এক বান্ধবীর বাড়ি গিয়েছিলাম। সন্ধেব পর বান্ধবীটি আমাকে বাড়ির কাছে নামিয়ে দয়ে গেল। নির্জন শব্দহীন পথ। শুধু মাঝে মাঝে গ্যাসের আলো। হঠাৎ মনে হল, যদি সেই লাকটার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ! সঙ্গে সঙ্গে শিরশিরিয়ে উঠল সারা গা। ভয়ে ভয়ে পিছন ফিরে দখি পাঁচ সাত হাত দূরে লোকটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছে। ভয়ে যেন হাত-পা ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গল। প্রায় ছুটতে ছুটতে বাড়ির দিকে এগোলাম। পিছনে একটানা খুঁড়িয়ে চলার শব্দ। বাড়ির গট পার হয়ে ছুটতে ছুটতে হলঘরে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

সীতা একটু চুপ করে থাকল। উত্তেজনায় আর ভয়ে মুখ যেন ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গছে। ঘরে কোনও শব্দ নেই। নিচে সিঁড়ির পাশে সরোজের গলা শোনা যাচ্ছে। টেলিফোনে কথা বলছে। হাওয়ায় ঘরের পর্দা সামান্য দুলছে। ফুলের গন্ধে ঘরের হাওয়া ভারী হয়ে উঠেছে।

অনেকদিন—সীতা বলতে থাকল, আমার স্বামীকে কিছু বলিনি। নানা কাজে উনি ব্যস্ত, আমিও ই। কিন্তু একদিন বললাম। উনি হেসেই উড়িয়ে দিলেন। বললেন, বয়েস হবার আগেই ভমরতি হল ? জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা শুরু করলে নাকি ? বাড়ির গেটের কাছে এরকম কোন লোককে তো দরোয়ান দেখেনি। তুমি বরং দিন কতক বাড়িতে বিশ্রাম নাও ! কিন্তু ডক্টর রায়, তবপর থেকেই আমি অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম।

ধীর, স্পষ্ট গলায় উচ্চারিত হল, আচ্ছা, বলে যান—

তারপর রাস্তায় একদিন অ্যাকসিডেন্ট। একটি ছোট মেয়ে বাসের তলায় বীভৎসভাবে চাপ পড়েছে। লোকেরা ড্রাইভারকে ধরে মারতেই ব্যস্ত। ভিড়ের মধ্যে দেখি সেই লোকটা। ছো মেয়েটার রক্ত-মাখা শরীরের দিকে লোলুপ চোখে তাকিয়ে আছে—চোখে-মুখে একটা কুৎসি উল্লাস। ড্রাইভার মেয়েটিকে আমার গাড়িতে তুলে আনল হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে। দেখত পেলাম লোকটা ভিড়ের ভেতর থেকে আঙুল তুলে আমাকে যেন শাসাচ্ছে। সেই রাত্রে, ডক্টর রা কী বিশ্রী যে স্বপ্ন দেখলাম! দেখলাম, আমি যেন হাসপাতালে অপারেশান টেবিলে শুয়ে আছি ক্লোরোফর্ম দিতে কে যেন আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়াল—তাকিয়ে দেখি সেই লোক। চিৎক করে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তারপর থেকেই অসুখের খুব বাড়াবাড়ি। প্রায় সব সময়েই মনে হ যেন সেই মুখ দেখা দেবে। রাত্রে ঘুম হয় না। হার্ট ভয়ানক দুর্বল হয়ে গেছে। আর সইতে পা নে। ডক্টর রায়—সীতার উত্তেজিত গলা কথা কয়ে উঠল, ডক্টর রায়, হয় আমাকে সারিয়ে ফেলু নয়তো দ্রুত যেন আমার মৃত্যু হয়। এইভাবে আর পারি নে।

গভীর নিশ্বাস ফেলে সীতা তেমনি চোখ বুজে শুয়ে থাকল। সুন্দর ফরসা কপাল ঘামে ভি উঠেছে, শ্রান্ত মুখ বড় করুণ। ঘর অন্ধকার। প্রায় কিছুই দেখা যায় না। শুধু খোলা জানলার পদ ফাঁকে সামান্য একটু আলো বিছানার ওপর এসে পড়েছে।

আচ্ছা, সেই লোকটাকে আপনার বাড়িতে কখনও দেখেননি, না?

না, তাহলে মরেই যেতুম।

মুখটা কি খুব বিশ্রী?

ভীষণ! সে ভাষায় বোঝান যায় না!

দেখুন তো, এই রকম কি?

একটা মুখ বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ল। চোখ খুলেই চিৎকার করে উঠল সীতা।

তীব্র ভয়ের সেই চিৎকার একবার যে শুনেছে, সে কখনো ভুলতে পারবে না।

সীতা! সীতা!—সরোজ টেলিফোন রেখে দ্রুত পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে উপরে ছুটে এল।

বিছানায় সীতার নিশ্চল স্পন্দনহীন দেহ। ঘরে কেউ নেই।

সীতার নিস্পন্দ বুকে স্পন্দনের ধ্বনি অনুভব করবার জন্যে সরোজ কান পাতল। কিন্তু কোন যে ওই বুকে আর স্পন্দন শোনা যাবে না, এই কথা যখন সরোজ বুঝতে পারল, তখন তার বিস্ফা চোখের মণি অকস্মাৎ অদ্ভুত হয়ে উঠেছে।

নিচের হলঘরের ঘড়িতে সাতটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই ডক্টর বিকাশ রায়ের মোটরের হর্ন শে গেল।

ছায়ার সঙ্গে

শেখর বসু

ট্রেনের বাথরুম থেকে ঘুরে এসে কুপের দরজা লক করে দিলাম। নিচের বার্থে অকাতরে ঘুমোচ্ছে নবেন্দু। ওপরেব বার্থে আমি শোব। শোবার কথা ভাবতেই রাজ্যের ক্লান্তি ভেঙে পড়ল সারা শরীরে।

কাল সারা রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি। ডাক্তার বলেছিল, জেগে থাকবেন, সেবা-শুশ্রূষা করা দরকার। কিন্তু ওকে সেবা শুশ্রূষা না বলে, পাহারাদারীই বলা উচিত। বিকারের ঘোরে নবেন্দু তিন-চারবার দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল। কোন রকমে আটকেছিলাম। শেষকালে ভেতর থেকে তালা দিতে হয়েছিল।

ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে নবেন্দু কথা বলেছিল অনর্গল। কী বলেছিল বুঝতে পারিনি, তবে এটা বুঝতে পেরেছিলাম, স্বপ্নে ও ওর খুব ঘনিষ্ঠ কারও সঙ্গে গল্প করছিল।

আজ সারা দিনটা ও ভালই ছিল, তবে আছন্ন ভাবটা এখনো পুরোপুরি কাটেনি। ডাক্তার বলেছে, আর কোন ভয়ের কারণ নেই। কিন্তু ভয়ের কারণটা কেন দেখা দিয়েছিল ? ডাক্তার শুধু এইটুকু বলেছে, কোন একটা ব্যাপারে ও খুব শকড হয়েছে। কী সেটা !

এখন যা ভাবছি, কালকেও ঠিক তাই ভেবেছি, একবার নয় অসংখ্যবার। তবে ভেবে কোন কূলকিনারা পাইনি। অবশ্য দুশ্চিন্তার ভার কমেছে অনেকখানি। নবেন্দু এখন আগের চাইতে ভাল আছে। আর, এই রাতটা কাটলেই আমি দায়মুক্ত হয়ে যাব। সকালবেলায় হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবে ট্রেনটা। তারপর ট্যাক্সি, আধ ঘন্টার মধ্যে আমি ওর বাড়ি পৌঁছে যাব।

ঘড়ি দেখলাম। এগারোটা-দশ। ট্রেনের মধ্যে এগারোটা দশ কম না বেশি রাত্তির ! ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। চলন্ত ট্রেনে রাত বোধ হয় আলাদা কোন নিয়মে বাড়ে। হুড়মুড় করে ট্রেন ছুটছে, জানলার বাইরে চাঁদনি রাতের মাঠ, গাছ আর জঙ্গল। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে দুলতে দুলতে ঘুমোচ্ছে নবেন্দু। ওর স্বাভাবিক, ঘুমন্ত মুখটা একবার দেখে নিয়ে আমি আপার বার্থে উঠে পড়লাম। বড়

আলোটা নিবিয়ে ছোট নীল আলোটা জ্বাললাম, তারপর শুয়ে পড়লাম টানটান হয়ে।

একটানা বসে বসে কোমর-পিঠে বেশ ব্যথা হয়ে গেছে। মাথাটা ভার-ভার। সারা শরীর ঠেলে বিরাট-বিরাট দুটো হাই উঠে এল। অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ার সমস্ত চিহ্ন আমার শরীরে, কিন্তু ঘুম আসছে না কিছুতেই। যা-যা ভাবব না বলে একটু আগেই প্রতিজ্ঞা করেছি, ঠিক সেই-সেই চিন্তাগুলো মাথার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমাগত। চিন্তা তাড়াবার জন্যে আমি পাশ ফিরে শুলাম।

ঠিক কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না, কিন্তু খটখট শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল একসময়। আচমকা ঘুম ভাঙার জন্যে কিছুই বুঝতে পারলাম না প্রথমে। এমন কি, আমি যে বাড়িতে নয়, ট্রেনে ঘুমোচ্ছি—এটা বুঝতেই লেগে গেল কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই একসঙ্গে মনে পড়ে গেল সব কথা। আমি লাফ দিয়ে উঠে বসলাম। মৃদু নীলচে আলোয় দেখলাম, নবেন্দু হাতড়ে হাতড়ে কুপের দরজা খোলার চেষ্টা করছে। শব্দ উঠছে খট খট খটাস।

হাত বাড়িয়ে বড় আলোটা জ্বেলে দিলাম। আলো জ্বলতেই নবেন্দু ঘুরে তাকাল। কিন্তু দৃষ্টি স্বাভাবিক নয়, কেমন যেন ঘোর লাগা, আগের রাতেও ওর ঠিক এই রকম চাউনি দেখেছিলাম। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'নবেন্দু, নব—'

নবেন্দু চাইল আমার দিকে, কিন্তু ও আমাকে চিনতে পেরেছে বলে মনে হল না।

'বাইরে যাবি ? বাথরুম ?'

নবেন্দু আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করতে লাগল আগের মত। চেষ্টার মধ্যে কোন স্বাভাবিকতা ছিল না, দরজার ওপরের লকটা ও এলোপাথাড়ি টানাটানি করছিল।

কাছে গিয়ে ওর কাঁধের ওপর হাত রেখে বললাম, 'কী রে !'

বলার সঙ্গে সঙ্গে ও চমকে আমার দিকে ঘুরে তাকাল। দৃষ্টি আগের মতই আচ্ছন্ন। মাঝরাতে আচমকা ঘুম ভাঙার একটু পরে চোখের সামনে এই রকম ঘোলাটে দৃষ্টি দেখে আমি কেমন যেন ঘাবড়ে গেলাম। আর, সেই জন্যেই বোধ হয় ওর দুটো কাঁধ খামচে ধরে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললাম, 'কী রে ! কী হল তোর ?'

ঝাঁকুনি খেতে খেতে নবেন্দুর ঘোলাটে মণির ওপর চোখের পাতা নেমে এল, তারপর ওর মাথাটা এলিয়ে পড়ল আস্তে আস্তে।

আমি ওকে ধরে ধরে বেঞ্চের ওপর হেলান দিয়ে বসিয়ে দিলাম। ওর মাথাটা কাঁধের ওপর ঝুঁকে আছে। ওর হাত, আমার হাতের মধ্যে। কী করব এবার !

ট্রেন আগের মতই প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে। জানলার বাইরে আগের মতই দৃশ্য, তবে চাঁদের আলোর রং পাল্টে গেছে। ঘড়িটা খুলে রেখেছি আপার বার্থে, কত রাত কে জানে ! জানলা দিয়ে হু-হু করে হাওয়া আসছে, মাথার ওপর ফুল স্পীডে পাখা খোলা, কিন্তু ঘামে সারা শরীর ভিজে গিয়েছিল। নবেন্দুর হাতও ভেজা-ভেজা, ও বোধ হয় আমার চাইতেও বেশি ঘেমেছে। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে থাকার পরে বললাম, 'নবেন্দু, জল খাবি ? জল ?'

একই কথা আবার বললাম, তবে এবার বেশ জোরে, আর ওর হাতটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে। নবেন্দু যেন বহু দূর থেকে উত্তর দিল, 'হুঁ।'

আমি ওয়াটার বটল থেকে এক গ্লাস জল ভরে ওর হাতে দিলাম। নবেন্দু চোঁ-চোঁ করে পুরো গ্লাসের জলটা খেয়ে নিল। ওকে জল খেতে দেখে আমি বেশ আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কফি খাবি ?'

নবেন্দু এবার স্পষ্ট গলায় উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।'

ফ্লাস্ক থেকে দু'কাপ কফি ঢাললাম। এক কাপ ওকে দিয়ে আর এক কাপ নিজে নিলাম। শান্ত গম্ভীর মুখে কাপে কয়েকটা চুমুক দেওয়ার পরে নবেন্দু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল আমাকে। তারপর ও কেমন যেন চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আরে, তুই ! তুই কবে এলি ?'

ওর দৃষ্টি দেখে আমার বেশ অস্বস্তি হতে শুরু হয়েছিল, কিন্তু প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলে বললাম 'একেই বলে সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে... । আরে বাবা, দু'দিন ধরে তোর সেবা-শুশ্রূষা করলাম, তুই আমার সঙ্গে বেশ কয়েকটা কথাও বলেছিস, আর এখন কিনা জিজ্ঞেস করছিস, তুই কবে এলি ?'

কথাগুলো শুনে নবেন্দুর কপালে ভাঁজ পড়ল অনেকগুলো ! ওর চোখ-মুখ দেখে বুঝতে পারলাম

ও পেছনের কথা ভাবছে।

আমি ওকে খেই ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে বললাম, 'আমার বাড়িতে তোর অফিসের সেনগুপ্ত টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল—তুই ভীষণ অসুস্থ, শীগগির চলে আসুন। আমি এসে দেখলাম, তুই জ্বরে পড়েছিস। একটু সুস্থ হতেই ডাক্তারের পরামর্শে তোকে তোর বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। এবার মনে পড়েছে ?'

মনে হল না, নবেন্দু সব কথা মনে করতে পেরেছে। ও শুধু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ি যাচ্ছি ? কেন ?'

'কেন আবার, বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নিয়ে শরীরটা ঠিকঠাক করে নিবি। তাছাড়া বাড়িতেও তো যাসনি বহুকাল, তা প্রায় বছরতিনেক হবে। একা-একা এভাবে পাহাড়ের মাথায় পড়ে থাকতে ভাল লাগে ?'

'একা ? একা কোথায় ! আমি তো একা থাকি না।' নবেন্দু কেমন যেন অস্বাভাবিক চোখ-মুখ করে প্রতিবাদ করল।

আমি একটা বদ রসিকতা করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ওর চোখ-মুখের চেহারা দেখে সাহস পেলাম না। মিনমিন করে বললাম, 'একা না ? তুই কি লুকিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করেছিস ?'

নবেন্দুর অস্বাভাবিক মুখে হাসির রেখা খেলে গেল। 'না, বিয়ে করিনি, তবে ও সব সময় আমার সঙ্গে থাকে, সব সময়। এই তো একটু আগেই ও আমাকে ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে চাইছিল, বন্ধ জায়গায় ওর থাকতে ভাল লাগে না।'

আমি অবাক হয়ে নবেন্দুর দিকে তাকালাম। ওর প্রত্যেকটি কথাই আমার কাছে কেমন যেন ধোঁয়াটে ঠেকল।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে নবেন্দু বলল, 'সিগারেট আছে ?'

আমি প্যাকেটটা এগিয়ে দিলাম। ও একটা সিগারেট ধরাল, আমিও ধরালাম। নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নবেন্দু বলল, 'আলোটা নিবিয়ে দিবি, চোখে লাগছে।'

বড় আলোটা নিবিয়ে দিলাম। নীল আলো জ্বলছে, কিন্তু ওটা থাকা না থাকা সমান। কাচের ঘেরাটোপটা শুধু নীল হয়ে আছে। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো খাপছাড়া ভাবে এসে পড়েছে বেঞ্চ আর মেঝের ওপর। ট্রেনের নির্দিষ্ট তালের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ কোথাও নেই। এখন কত রাত কে জানে !

অস্বস্তিকর রকমের চুপচাপ হয়ে বসে আছি আমরা দুজনেই। সিগারেটের দুটো জ্বলন্ত বিন্দু মাঝেমধ্যে জোরালো হয়ে উঠছে। ঘুম, ক্লান্তির কোন চিহ্ন নেই আমার শরীরে। বারবার মনে হচ্ছিল, বিচিত্র এক অভিজ্ঞতার সামনে এক্ষুনি পড়তে হবে আমাকে।

নবেন্দু হঠাৎ চাপা গলায় কী যেন বলল। বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বলছিস ?'

ও কোন উত্তর দিল না। তারপর কিছুক্ষণ বাদে ও হেসে উঠল, কারো রসিকতা শুনে হেসে ফেলার মত হাসি। আমি চমকে উঠে বললাম, 'হাসছিস কেন ?'

নবেন্দু এবারও কোন জবাব দিল না। কয়েক মুহূর্ত পরে ও আবার নিচু গলায় কী যেন বলল। আমি প্রশ্ন করতে গিয়েও পারলাম না। কেন জানি না আমার মনে হল, ও আমি নয়, আর কারও সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু আমি ছাড়া তো কুপেতে আর কেউ নেই ! আর, এটা মনে হতেই আমার গা শিরশির করে উঠল। আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বললাম, 'নবেন্দু কী বলছিস কী ? তোর কী ব্যাপারটা বল তো ? শরীর খারাপ লাগছে ?'

নবেন্দু হেসে উঠল। মনে হল, এ হাসিটা আমার কথা শুনে। কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না। একটু থেমে ও থমথমে গলায় বলল, 'তোর কাছে পুরো ব্যাপারটা উদ্ভট লাগছে, তাই না ? অবশ্য লাগাটাই স্বাভাবিক। তবে, আমার কাছে নয়। আমার কাছে তুই যতটা সত্যি, ও-ও ততটা। কে বিশ্বাস করল, না করল—আমার কিছু এসে যায় না। তুই যদি শুনতে চাস, আমি বলতে পারি।'

আমি শুনতে চাই, কিন্তু 'হ্যাঁ' বলতে গিয়ে আমার মুখ দিয়ে বিচিত্র একটা শব্দ বেরোল।

আবছা অন্ধকারের মধ্যে চুপচাপ কিছুক্ষণ সিগারেট টানার পরে নবেন্দু বলল, 'পাহাড়ে চাকরি

নিয়ে যাওয়ার পরে প্রথম-প্রথম খুব খারাপ লাগত। অসম্ভব নির্জন জায়গা, তারপর আমার কোয়ার্টার্সও এমনি জায়গায়, যার আশেপাশে আর কোন বাড়িঘর নেই। অফিসের কাজকর্মের অবস্থাও সেই রকম, সারা সপ্তাহে দু' ঘণ্টা কাজ করলেই যথেষ্ট। প্রায়ই মনে হত, চাকরি-বাকরি ছেড়ে চলে আসি, এভাবে থাকলে বোধ হয় পাগল হয়ে যাব। কিন্তু নির্জনতার একটা অদ্ভুত টান আছে। কী রকম নির্জনতা জানিস—'

আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম 'তোর তখনকার একটা চিঠির কথা আমার মনে আছে। রাত্রে গরম কফিতে চিনি মেশাবার পরে চমকে উঠতিস প্রথম প্রথম। এত নির্জন এলাকা যে, কফিতে চিনি গুলবার শব্দ পর্যন্ত উঠত।'

নবেন্দু ওর চিঠি নিয়ে একটুও আগ্রহ না দেখিয়ে বলল, 'ঠিক এই সময় একটা বই এসে গেল আমার হাতে। বইটার নাম 'ডকট্রিন অব দ্য মিস্টিকস্'। অদ্ভুত ইন্টারেস্টিং বই। ওই নির্জন পাহাড়ের পরিবেশে বইটা আমার ওপর দারুণ প্রভাব ফেলল। আমি লক্ষ্ণৌ থেকে এই ধরনের আরো বই আনালাম। তারপর দিনরাত ডুবে থাকলাম বইগুলোর মধ্যে। একটা বইতে অশরীরীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার বিচিত্র সব সাধনপদ্ধতির উল্লেখ আছে। আমি সেগুলোর চর্চা আরম্ভ করে দিলাম। প্রথমেই মনঃসংযোগ, মনঃসংযোগ করার অদ্ভুত একটা কায়দা আছে, কী রকম জানিস—'

কেন জানি না আমার বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল, ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'বড় আলোটা জ্বালব ?'

'না।' নবেন্দু গম্ভীরভাবে উত্তর দিল। তারপর একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল, 'সাধনার অনেকগুলো স্টেজ আছে, আমি অনেকখানি তৈরি, এবার আমার পরীক্ষা করা দরকার।'

'কী পরীক্ষা ?' আমার গলার স্বর আমার কাছেই কেমন যেন আতঙ্কগ্রস্ত ঠেকল।

নবেন্দু বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে বলল, 'আত্মার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা।'

আমার হঠাৎ মনে হল, গলার ভেতরটা কেমন যেন শুকিয়ে গেছে। একটু কফি খেতে পারলে হত ! ফ্লাস্কটা ব্র্যাকেটে দুলছে, কিন্তু উঠে গিয়ে নামিয়ে আনতে পারলাম না, আমার শরীরের ওপর আমার যেন পুরোপুরি দখল নেই। চাঁদের ওপর দিয়ে বোধ হয় মেঘ ভেসে যাচ্ছে, আবছা আলোছায়া দুলছে কুপের ভেতর। হুড়মুড় করে ছুটে যাওয়া ট্রেনটা থেকে থেকে কেমন যেন নিঃশব্দ হয়ে যাচ্ছে। সত্যিই কি তাই...নাকি—

নবেন্দু খুক খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'মাঝ রাত, কেউ কোথাও নেই, চারদিক অসম্ভব নির্জন। আমি মনঃসংযোগ করে পরীক্ষায় বসলাম। একটু পরেই জানলা কাঁপিয়ে ঝোড়ো হাওয়া ঢুকে ঘরের মোমবাতিটা নিবিয়ে দিল। বুঝলাম, কেউ এসেছে, কিন্তু কে সে ? জিজ্ঞেস করলাম, কোন উত্তর পেলাম না। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে সে তার উপস্থিতি আমাকে টের পাইয়ে দিচ্ছিল।'

জোর করে হেসে বললাম, 'কী উল্টোপাল্টা বকছিস ?'

নবেন্দু আমার দিকে তাকিয়ে রাগী গলায় বলল, 'একটুও উল্টোপাল্টা নয়, যা বলছি সত্যি কথা বলছি।'

আবছা অন্ধকারের মধ্যে নবেন্দুর চোখের মণিদুটো অদ্ভুতভাবে জ্বলছিল। ওই চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না, আমি চোখ নামিয়ে নিলাম।

নবেন্দু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'অশরীরিণী ওই মেয়েটিকে আমি কিন্তু ডাকিনি, ও নিজে থেকে এসেছিল। এসেছিল আমার ক্ষতি করতে, কিন্তু করেনি। পরদিন এল, তার পরের দিনও এল। তারপর থেকে ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ও আমাকে ছেড়ে আর কোথাও যায় না। সব সময় থাকে আমার মনে। এখনও আছে।'

'নবেন্দু !' আমি কেমন যেন ভয়-পাওয়া গলায় চিৎকার করে উঠলাম।

ও অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে মৃদু হেসে বলল, 'এই তো আমার পাশেই বসে আছে, আলাপ কর না, ভাল লাগবে।'

নবেন্দু বেঞ্চের এক ধারে বসে আছে। ওর আর আমার মধ্যে এক হাত শূন্য জায়গা। আমি ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে দেখলাম, কেউ নেই সেখানে। শূন্য জায়গায় আবছা অন্ধকার। কেউ নেই জেনেও আমি কেমন যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম ওই শূন্য

স্থানটা। এমন সময় জানলা দিয়ে এক তাল অন্ধকার লাফিয়ে ঢুকল ঘরের মধ্যে। আঁতকে উঠলাম। অন্ধকারটা কুপের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে আমার আর নবেন্দুর ভেতরের ফাঁকা জায়গায় জমাট হয়ে গেল। আমি প্রাণপণ ভাববার চেষ্টা করলাম, চাঁদের ওপর দিয়ে নির্ঘাত কালো মেঘের টুকরো ভেসে যাচ্ছে।

কিন্তু, নবেন্দু নিচু গলায় কার সঙ্গে গল্প করছে?
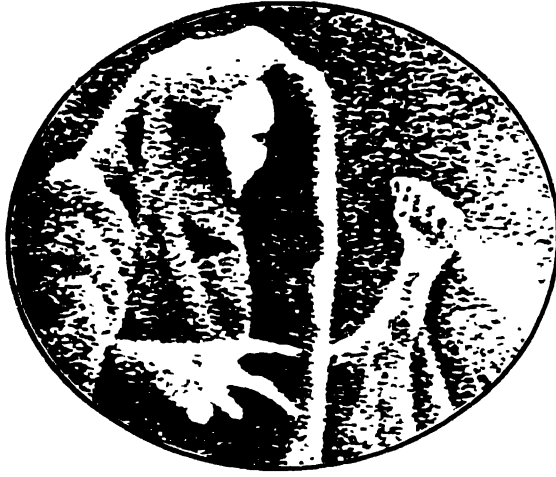
কালরাত্রি

মনোজ সেন

চিত্তপ্রসাদবাবু নিবিষ্টচিত্তে যথারীতি দাবা খেলছিলেন আমাদের ক্লাবে। আমরা সবাই তাঁর ভ্রূকু অগ্রাহ্য করে চারদিকে ঘিরে বসে পড়লুম। বললুম, 'অনেকদিন আপনার জীবনের কাহি শুনিনি আমরা রায়মশাই, আজ একটা শোনাতেই হবে।'

চিত্তপ্রসাদ বিরক্ত মুখে বললেন, 'উঃ, জ্বালিয়ে মারলেন আপনারা। আপনাদের এই ক্লাবে আ দেখছি বন্ধ করতে হবে। যা হোক, গল্প শুনতে চাইছেন যখন, শোনাব। কিন্তু এই শেষ।'

আমরা সমবেত ভাবে মাথা নেড়ে বললুম, 'না, না, তা কি করে হয় ? তবে এইটে শোনার প আর মাসখানেক কিছু শুনতে চাইব না, কথা দিচ্ছি আমরা।'

চিত্তপ্রসাদ বললেন, 'বেশ। মাসখানেক পরে আমাকে আর ইহজগতে দেখতে পাবেন কি আপনারা কে জানে। এখন গল্প যে শুনতে চাইছেন, কিসের গল্প শুনতে চান, বলুন। আমা জীবনে অদ্ভুত আর ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা তো বড় কম হয়নি। কাজেই, কি ধরনের গল্প শুনতে চা জানালে সুবিধে হয়।'

বিকাশ বলল, 'আচ্ছা রায়মশাই, আপনি তো বিখ্যাত উকিল আবার আইনসভার সদস্য ছিলেন। মানে, আপনি আইনের স্রস্টা এবং ব্যাখ্যাতা, দুই-ই। আপনি জেনেশুনে, ইচ্ছে ক কোনদিন আইন ভেঙেছেন ?'

চিত্তপ্রসাদ গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'আইন আমি অনেকবারই ভেঙেছি। জন্যে জেলও খেটেছি। তবে সে আইন ছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর, আমাদের ওপর জোর ক চাপিয়ে দেওয়া আইন। আপনি বোধ হয় সে রকম আইনের কথা বলছেন না। আপনি জান চাইছেন, আমি এমন কোন অপরাধ করেছি কিনা, যা সর্বদেশে সর্বকালের সামাজিক আইনে বিরোধী, তাই না ? হ্যাঁ, করেছি। আমার চোখের সামনে ঘটা একটা হত্যাকাণ্ডের সমস্ত সাক্ষ্য প্রমা লুপ্ত করেছি এবং হত্যাকারীকে পুলিশের হাতে তুলে দিইনি। এই কাজ কোন দেশের আইন স

কবে না, তা দেশ স্বাধীন বা পবাধীন যাই হোক না কেন ?'

আমরা বিস্ফারিত চোখে সমস্বরে বললুম, 'কী সর্বনাশ। এবকম কাণ্ড কবতে গেলেন কেন ?'

চিত্তপ্রসাদ দাবার বোর্ড সবিয়ে রেখে বললেন, 'কবেছিলুম ; সে কাহিনীই তাহলে শুনুন। তবে সেটা একটা এতই অবিশ্বাস্য ঘটনা যে আপনাবা হয়তো সব শুনে বলবেন বুড়োব ভবল ভীমবতি হয়েছে। তা, যা খুশি আপনারা বলতে পাবেন, আমাব কিছুই যায় আসে না। আগে এ সব অভিজ্ঞতার গল্প বলতে ভয় পেতুম, আজ আর পাইনে। জীবনেব প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে সমালোচনা, প্রশংসা সবই আমার কাছে তুল্যমূল্য।'

"উনিশশো তিরিশ থেকে উনিশশো চল্লিশেব মধ্যে আমি অজস্রবাব জেল খেটেছিলুম। এই একটা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলুম, ধবে নিয়ে তিন মাস ঠুকে দিলে। আবাব বেবিয়ে এসে বিলিতি কাপড়েব দোকানের সামনে পিকেটিং কবলুম, দু মাসেব জন্য ঢুকিয়ে দিলে। এই বকম চলছিল। এবই মধ্যে আমাব ওকালতিও চলছিল, নামও হচ্ছিল।

এই সময় বোধ হয় উনচল্লিশ কি চল্লিশ সাল হবে, হঠাৎ একদিন আমাব কাছে আমাব বন্ধু চন্দ্রশেখরেব জরুরী তলব দিয়ে এক টেলিগ্রাম এসে হাজিব। চন্দ্রশেখব ছিল বর্তমান মালদা জেলাব বকুলপুব গ্রামেব জমিদাব, আমাব ছোটবেলাকাব বন্ধু। তাব আহ্বান অগ্রাহ্য কবতে পাবিনে। কাজেই, একদিন বসন্তকে সঙ্গে নিয়ে বকুলপুব বওনা দিলুম।

এখানে বসন্ত সম্পর্কে দু চাবটে কথা বলে বাখা ভাল। কাবণ এই গল্পে তাব ভূমিকাই প্রধান বলা চলে।

বসন্তেব সঙ্গে আমাব পবিচয় হয়েছিল আলিপুব সেন্ট্রাল জেলে। আমি তখন সেখানে বাজবন্দী, বসন্ত আমাব দেখাশুনো কবত। শ্যামপুকুবেব আদিত্য সিংহেব বাড়িব লক্ষ টাকা দামেব গৃহদেবতাব মূর্তি চুবির জন্যে তাব লম্বা সাজা হয়েছিল।

তা, সে সময় আমবা মনে কবতুম, জাতীয় চবিত্রেব উন্নতি না হলে স্ববাজ আসতে পাবে না। কাজেই দেশোদ্ধাবেব সঙ্গে সঙ্গে মানুষেব, বিশেষত পতিত মানুষেব চবিত্র সংশোধন কবতে চেষ্টা চালিয়ে যেতুম আমবা। আব এই কাজের আদর্শ জায়গা তো জেল। আমাদেব লেকচাব শুনতে শুনতে অনেক চোব বোধ হয় চুবি কবা ছেড়ে দিয়েছিল এই ভয়ে যে ধবা পড়ে জেলে আবাব না ওই লেকচার শুনতে হয়।

বসন্তকে এমনি লেকচাব দিতে গিয়ে আমার খটকা লাগল। দেখি, লোকটা সাধাবণ অপবাধী বলতে যা বোঝায়, তা নয়। লক্ষ্য করলুম সে পারতপক্ষে মিথ্যে কথা বলে না, অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করে আর অবসর সময়ে অন্য কয়েদীদেব সঙ্গে খিস্তিখেউড় না কবে চুপ কবে ধ্যানস্থ হয়ে বসে কী সব ভাবে, তখন তাকে দেখলে রীতিমত সম্ভ্রম হয়। এমন লোককে উচিত অনুচিত বা নীতি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে লাভ কি ? উল্টে আমিই মাঝে মাঝে লেকচাব শুনে ফেলতে লাগলুম।

এরকম মানুষটা হঠাৎ চুরি করতে গেল কেন ? একদিন বসন্তেব আড়ালে আব এক কয়েদী কার্তিককে ডেকে ব্যাপারটা জানতে চাইলুম। কার্তিকও চোব ছিল কিন্তু সে দেখতুম বসন্তকে শ্রদ্ধাভক্তি করে থাকে।

কার্তিক বলল, 'বসন্তদাদা চুরি কবতেই পারে না, বায়বাবু। তাঁকে শ্যামপুকুবেব সিঙ্গিবা অন্যায় করে ফাঁসিয়েছে।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কেন ? সিঙ্গিদের সঙ্গে তোর বসন্তদাদার শত্রুতা কিসের ?'

সে বলল, 'শত্রুতা নয় রায়মশাই, গেরোর ফের। ব্যাপাবটা বলি শোনো। বসন্তদাদা সিঙ্গিদেব বাড়ি চাকরের কাজ করত। খোদ বড়বাবুর খাস চাকর ছিল তিনি। একদিন হঠাৎ সিঙ্গিদের মন্দির থেকে মা দুর্গার সোনার মূর্তি আর তার যত হীরে-জহরতের গয়না গায়েব হয়ে গেল। চুবিটা হয়েছিল দুপুররাত্রে, কিন্তু হতে না হতেই এক দরওয়ান মন্দিবের দরজা খোলা দেখে মহা হৈচৈ জুড়ে দিলে। তারপর তো হুলস্থুল ব্যাপার। পুলিশ এসে তার ওপর তাণ্ডব জুড়ে দিলে। আর দেবে না-ই বা কেন ? বড়বাবু যে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেবে বলেছিল, সেটি তো বড় কম টাকা নয়।

'আর সবার সঙ্গে পুলিশ এসে বসন্তদাদাকেও ধরলে। জেবার পব জেরা। বসন্তদাদা সত্যি

কথাই বলে, আমি চুরি করিনি। সে ঘরে বড়বাবুও ছিল। তিনি দরোয়ানকে বলল, বসন্তকে আমি চিনি, ও কখনো মিথ্যে বলে না। বলে, হঠাৎ কি খেয়াল হল, বড়বাবু বসন্তদাদাকে জিজ্ঞেস করে বসল, আচ্ছা, তুমি চুরি করোনি, তা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু কে চুরি করেছে, তুমি জান?

'ব্যস, বসন্তদাদা চুপ। আর কথা কয় না। পুলিশে বড়বাবুতে কত চেষ্টা, কাকুতি-মিনতি, ভয় দেখানো, বসন্তদাদা কোন কথাই বলে না। তখন বড়বাবুই আবার জিজ্ঞেস করল, চোরাই মাল কোথায় আছে, তুমি জান? বসন্তদাদা বললে, জানি। বড়বাবু জিজ্ঞাসা করল, কোথায়? বসন্তদাদা বললে, ছোটরাণীমার সিন্দুকে বেনারসী শাড়ির তলায়।

'মাথায় বাজ পড়লেও বোধ হয় বড়বাবু এত আশ্চর্য হত না, রায়বাবু। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভেতরে খবর গেল। আর চোরাই মাল যেখানে বসন্তদাদা বলেছিল, সেখানেই পাওয়া গেল।

'রাগে দুঃখে অপমানে বড়বাবুর মাথায় রক্ত উঠে গেল। আর সেই সবটুকুর ঝালটা গিয়ে পড়ল বসন্তদাদার ওপরে। বড়বাবু বসন্তদাদার গলা টিপে ধরে বলল, তোমাকে বলতেই হবে কে চুরি করে ওখানে মালটা রেখেছে। ছোটখোকার মহলে তুমি কোনদিন যাওনি, ছোটরাণীর ঘরে ঢোকা তো দূরস্থান, তুমি কি করে জানলে যে মালটা ওখানে আছে? বসন্তদাদা কিছুতেই বলবে না। তখন বড়বাবু হান্টার দিয়ে বসন্তদাদাকে পিটতে শুরু করল। যখন আর সহ্য করতে পারে না, তখন বসন্তদাদা বলেই ফেলল, চুরি করেছে ছোটবাবু। মদে, জুয়ায়, মেয়েমানুষে এত দেনা যে এমন একটা কিছু না করলে আর মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না। বড়বাবু জিজ্ঞেস করল, তুমি কি করে জানলে, নিজের চোখে দেখেছ? বসন্তদাদা বলল, হ্যাঁ।

'ছোটবাবুকে ডেকে আনা হল। ছোটবাবু বলল, সব বাজে কথা। যদি আমি চুরি করেই থাকি, ও নিজের চোখে দেখল কি করে? কারণ বসন্ত তো সেদিন রাত্রে দাদার শ্বশুরবাড়িতে কি কাজে সন্ধেবেলা গিয়ে পরদিন সকালে ফেরে। তা হলে, সে মিথ্যে কথা বলছে। আসলে সে রাত্রে বসন্তই গোপনে ফিরে এসে চুরি করে মাল সিন্দুকে রেখে আবার ফিরে গিয়েছিল।

'কথাটা মন্দ নয়। বড়বাবু বসন্তদাদাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি সেরাত্রে বেলেঘাটায় ছিলে? বসন্তদাদা বলল, ছিলুম। বড়বাবু বলল, তাইলে তুমি দেখলে কি করে। বসন্তদাদা বলল, আমি মাঝে মাঝে দেখতে পাই।

'আচ্ছা, একথা কে বিশ্বাস করবে, রায়মশাই? পুলিশ ছোটবাবুর কথাই মেনে নিল। তারা বলল, বসন্তদাদা তাদের জেরায় নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে গেছে। বলে, তাকে চালান করে দিলে। বড়বাবুও তাদের কষে পেট ভরে খাইয়ে দিল। পরিবারের সম্মানটা তো বাঁচল। একটা বসন্ত গেলে পাঁচটা বসন্ত পাওয়া যাবে, কিন্তু ইজ্জত একবার খোয়ালে তাকে ফিরে পাওয়া বড় শক্ত, না কি বলেন রায়বাবু?

আমি বললুম, 'দেখ কার্তিক, লালবাজারের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তো এমন কিছু মধুর নয়, কিন্তু তবুও আমি বলব পুলিশ বোধ হয় খুব অন্যায় করেনি এক্ষেত্রে। তোর বসন্তদাদা বেলেঘাটায় বসে শ্যামপুকুরের চুরি দেখতে পায়, এ কথা আমাকে স্বয়ং ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির এসে বললেও আমিও বিশ্বাস করতুম না।'

কার্তিক হাত নেড়ে বলল, 'তা বিশ্বেস করবে কেন? আপনারা তো লেখাপড়া শিখেছ, ইংরিজিতে কাগজ পড়, ফটফট করে বক্তৃতে দাও যার কোন মাথামুণ্ডু হয় না, আপনারা বিশ্বেস করবে কেন? বসন্তদাদার তো ভর হয়। তখন বসন্তদাদা অনেক কিছু দেখতে পায়। আপনি শুনলে আশ্চর্য হবে রায়বাবু, বসন্তদাদার পরিবার তান্ত্রিকের পরিবার। তাঁদের কত যুগের সাধনা। আজ তো আর সে সবের কোন মূল্য নেই। পেটের দায়ে বসন্তদাদা চাকরের কাজ করে। চোর বলে জেল খাটে।' বলে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল কার্তিক।

তাতে অবশ্য কিছুমাত্র বিচলিত বোধ করিনি আমি। আজকালকার দিন হলে স্বতন্ত্র কথা ছিল, হয়তো কৌতূহলী হয়ে উঠতুম। কিন্তু আজকের মত সে যুগে তো আমরা এই একস্ট্রা সেনসরি পারসেপশন বা ক্লেয়ারভয়েন্স বা টেলিপ্যাথি ইত্যাদির নাম শুনিনি। তখন ইংরিজি শিক্ষায় শিক্ষিত নব্যযুবক আমরা এসব তন্ত্রমন্ত্র, ভূত-প্রেত, ভর হওয়া ইত্যাদি সমস্তই বুজরুকি বলে উড়িয়ে দিতুম। পাত্তাই দিতুম না।

আর বসন্তও কোনদিন আমাকে তার কোন অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার গল্পও করেনি বা তার পরিচয় দেবার চেষ্টাও করেনি। কেবল একদিন ছাড়া। সে কথায় পরে আসছি।

চন্দ্রশেখরের যেদিন টেলিগ্রাম এল, তার কিছুদিন আগেই আমি আর বসন্ত একসঙ্গে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি। আমি তখন রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে একটা ঘরভাড়া করে থাকি। বসন্তও এসে আমার সঙ্গে জুটে গেল। আমি ব্যাচেলার লোক, বসন্তের মত অ্যাসিস্ট্যান্ট পেয়ে বেঁচে গিয়েছিলুম।

সে যুগে বকুলপুর যাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। কিছুটা ট্রেনে, কিছুটা বাসে আর শেষটুকু গরুর গাড়িতে করে যেতে হত। বসন্তকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ায় বেশ সুবিধেই হয়েছিল। এতটা দীর্ঘ পথ, সঙ্গে একজন সঙ্গী থাকলে পথের কষ্ট অনেকটা লাঘব হয়, বিশেষ করে যদি বসন্তের মত সঙ্গী হয়, যে সাহায্য করার জন্যে উন্মুখ হয়েই আছে।

চন্দ্রশেখর আমাকে নেবার জন্য স্টেশন পর্যন্ত এসেছিল। সে কিন্তু দেখলুম, বসন্তকে দেখে যেন একটু অসন্তুষ্টই হয়েছে। বুঝলুম, বাসে আর গরুর গাড়িতে যেতে যেতে তার আমাকে কিছু বলবার ছিল, বসন্ত সঙ্গে থাকায় ব্যাপারটায় একটু অসুবিধে হয়ে গেল। সারাটা রাস্তাই দেখলুম, চন্দ্রশেখর কেমন যেন একটু গম্ভীর আর সন্ত্রস্ত হয়ে রইল।

চন্দ্রশেখর আজ বেঁচে নেই, থাকলে দেখতে পেতেন, তার মত দিলখোলা আমুদে ফুর্তিবাজ মানুষ খুব কম দেখা যায়। তার চেহারাটা ছিল ছোটখাটো, কিন্তু অন্তরটা ছিল মস্ত বড়। আজকের মত সে যুগে ক্লাস স্ট্রাগল বা ক্লাস হেটরেড ব্যাপারটা খুব চালু হয়নি, তাই জমিদার হলেও তাকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতুম।

এ হেন একটা মানুষকে গম্ভীর আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখলে একটু অস্বস্তি হয়ই। আমি আর ওকে সারা রাস্তা ঘাটালুম না।

যখন বকুলপুরে এসে পৌঁছলুম, তখন প্রায় মাঝরাত। গ্রামের রাস্তা স্বভাবতই অন্ধকারে জনমানবহীন। কিন্তু আপনারা শহুরে লোক বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, মাঝরাত্রেও গ্রামের রাস্তার কতগুলো শব্দ আছে, যারা তার সঙ্গে পরিচিত তাদের কানে সেই শব্দ ধরা পড়ে। আমি গ্রামের ছেলে, আমারও হঠাৎ মনে হল, কী অদ্ভুত শব্দহীন গ্রাম, মনে হয় যেন এখানে কোন জীবিত প্রাণী বাস করে না। লণ্ঠনের আলোয় দেখলুম, চন্দ্রশেখরের মুখ বিবর্ণ, বোধ হয় খানিকটা আতঙ্কিত।

হঠাৎ সেই নির্জনতা ভেঙে গাড়ির সঙ্গে আসা চারজন পাইক সমস্বরে চিৎকার করে কথা বলতে আরম্ভ করল। 'ওহে পঞ্চানন, ঠিক আছ তো হে?' বা 'মামু হে, কথা কও না কেন?' প্রভৃতি চিৎকার যার অর্থ স্পষ্টতই এরা সবাই ভয় পেয়েছে।

গাড়ি যখন প্রকাণ্ড জমিদার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল, দেখি তার সামনে চত্বরে একগাদা হ্যাজাক জ্বালিয়ে একদল পাইক বসে আছে। আমরা ঢোকা মাত্র তারা আলো নিয়ে সামনে এগিয়ে এসে আমাদের মালপত্র নামাতে শুরু করল।

বাড়ির ভেতরেও দেখি বারান্দায়, সিঁড়িতে আলো জ্বলছে। ওপরে উঠতে উঠতে চন্দ্রশেখর জিজ্ঞেস করল, 'তোমার সঙ্গে লোকটি কি তোমার চাকর?'

আমার তখন ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছে। বললুম, 'না, চাকর নয়, ভ্যালে বলতে পার।'

চন্দ্রশেখর হাসল না। বলল, 'ও কি নিচে আমাদের চাকরদের মহালে শুতে পারে?'

আমি বললুম, 'পারে।'

'বেশ।' বলে চন্দ্রশেখর একজন পাইককে বলল, 'এঁর সঙ্গে যে লোকটি এসেছে, তাকে তোমাদের মহালে নিয়ে যাবে।'

বসন্ত আমার ব্যাগটা নিয়ে পেছনেই আসছিল। চন্দ্রশেখরের কথা শুনে দৃঢ় ভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'না, আমি রায়বাবুর ঘরের বাইরেই শোব। আমার কেমন যেন গোলমাল লাগছে।'

চন্দ্রশেখর' ভয়ানক গম্ভীর হয়ে বলল, 'না। ঘরের বাইরে শোয়া চলবে না। ওই মহালেই শুতে হবে তোমায়।'

বসন্ত ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি তর্কাতর্কি থামানোর জন্যে বললুম, 'ঘরের বাইরে

শুলে তোমার আপত্তি। ভেতরে শুতে পারে ?'

চন্দ্রশেখর স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, 'পারে, যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে।'

আমি বললুম, 'আমার আবার আপত্তি কিসের ? এসব ব্যাপারে আমার কোনই প্রেজুডিস নেই, তুমি তো জানো।'

চন্দ্রশেখর বলল, 'বেশ। তাহলে সেই ভাল।' তারপর যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, 'সমস্ত দরজা জানলা ভাল করে বন্ধ করে শোবে, ভোর হবার আগে দোর খুলবে না, কেউ ডাকলেও না, এমন কি আমি ডাকলেও না।'

এইবার আমার ঘুম ছুটে গেল। বললুম, 'তার মানে ? এসব রহস্যের মানে কি ? আর জানলা না খুলে আমি ঘুমুতেই পারি না।'

চন্দ্রশেখর ম্লান হেসে বলল, 'রহস্যটা কাল শুনো। আর জানলা খুললে তোমারই অসুবিধে হবে, কারণ তোমার জানলার নিচেই পাইকরা আগুন জ্বেলে বসে বাকি রাতটুকু গল্প গুজব করবে। তুমি ঘুমুতে পারবে না।'

আমি প্রতিবাদ করে বললুম, 'আমার জানলার নিচে পাইক ? কেন ? এসব তো আগে কখনও দেখিনি। বলি, ব্যাপারটা কি ?'

চন্দ্রশেখর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'কাল শুনো।'

বসন্ত ঘরের কোণায় দাঁড়িয়েছিল। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কিছু বুঝলে ? ডাকাতি ফাকাতির ব্যাপার নাকি ?'

বসন্ত ঘাড় নাড়ল। বলল, 'না রায়বাবু, ডাকাতির ব্যাপার নয়। ব্যাপার অনেক খারাপ। এই গ্রামে কালরাত্রি নেমেছে, আমি তার গন্ধ পাচ্ছি।'

কালরাত্রি নেমেছে, তার আবার গন্ধ ? বুঝলুম, এতটা রাস্তার ধকল আর এতসব রহস্য একসঙ্গে হজম করা আমার দুঃসাধ্য। অতএব আমি আর বাক্যব্যয় না করে লম্বা হলুম।

রাত্রে ঘুম বড় মন্দ হল না। ভোরবেলা উঠে হাতমুখ ধুয়ে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দেখি চন্দ্রশেখর একটা চেয়ারে বসে আছে, তার সামনে টেবিলে দু'কাপ চা। আমাকে দেখে মৃদু হেসে বলল, 'এস চিত্তপ্রসাদ, চা তৈরি।'

আমি বললুম, 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু হে জমিদারনন্দন, তুমি কি স্রেফ আমাকে চা খাওয়াবে বলেই এই সাতসকালে বিছানা ছেড়ে উঠে বসে আছ ?'

চন্দ্রশেখর স্মিতমুখে ঘাড় নাড়ল। বলল, 'না, তোমার সঙ্গে কথা বলব বলে বসে আছি। বেলা বাড়লে কথা বলার সুযোগ নাও পেতে পারি।'

আমি একটা চেয়ার টেনে ওর মুখোমুখি বসে বললুম, 'ব্যাপারটা কি বল তো ? গোলমাল যে একটা পেকেছে, সেটা তো বুঝতেই পারছি। আমাকে ডেকেছ কি বন্ধু হিসেবে পরামর্শ দেবার জন্যে, না, উকিল হিসেবে কনসালটেন্সির জন্যে ?'

চন্দ্রশেখর বলল, 'দুই-ই। ব্যাপারটা কি তোমাকে তা পুরোপুরি বোঝাতে পারব কিনা জানি না, তবে চেষ্টা করতে হবে। ব্যাপারটা এতদূর অবিশ্বাস্য যে আমার তোমাকে বলতে অস্বস্তি হচ্ছে।'

আমি বললুম, 'দ্যাখো চন্দ্রশেখর, ধানাই পানাই করো না। আমি উকিল, আমাকে নিঃসঙ্কোচে তোমার মনের কথা খুলে বল। ভনিতা যদি কর তো বল, উঠে চলে যাই।'

চন্দ্রশেখর হাত নেড়ে বলল, 'না, ভনিতা করব না।' বলে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে মাটির দিকে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'ভ্যামপায়ার কাকে বলে, তুমি জান ?'

এমন একটা অদ্ভুত আকস্মিক প্রশ্নের জন্যে আমি একদম প্রস্তুত ছিলুম না। থতমত খেয়ে বললুম, 'হ্যাঁ, জানি, দক্ষিণ আমেরিকার একরকম রক্তচোষা বাদুড়।'

চন্দ্রশেখর ফ্যাকাশে মুখে বলল, 'হ্যাঁ, তাই বটে, তবে পুরোটা নয়। যে কোন রক্তচোষা জীবকেই ভ্যামপায়ার বলা হয়। জাপানী উপকথায় একরকম ভ্যামপায়ার ক্যাট বা রক্তচোষা বেড়ালের কথা আছে, তেমনি য়ুরোপে রক্তচোষা মানুষরা শুধুই ভ্যামপায়ার, যেমন কাউন্ট ড্রাকুলা।'

আমি বললুম, 'সে সব উপকথা বা আষাঢ়ে গল্প। তা, আমাকে এতটা পথ ডেকে এনেছ কি

তোমার ভ্যামপায়ার কথামৃত শোনাবার জন্যে নাকি ?'

চন্দ্রশেখর মাথা নেড়ে বলল, 'চিত্তপ্রসাদ, এতদিন আমিও তোমার মত ভাবতুম যে ভ্যামপায়ার একটা কুসংস্কার বা আষাঢ়ে গল্প। কিন্তু আজ আর তা ভাবি নে। আমাদের এই বকুলপুর গ্রামে এমন একটা কিছুর আবির্ভাব হয়েছে, যেটাকে ভ্যামপায়ার ছাড়া আর অন্য কোন বিশেষণেই অভিহিত করা চলে না।'

আমি চন্দ্রশেখরের কথা শুনে হাসতে শুরু করেছিলুম, কিন্তু সে একটা উজ্জ্বল স্থির দৃষ্টি দিয়ে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলে চলল, 'তোমার খুব হাসি পাচ্ছে, নয় ? তুমি থাকো কলকাতায়, সেখানে সন্ধে হলে হাজার আলোর রোশনাই, ট্রাম বাসের ঘড়ঘড়ানি, সিনেমা আর থিয়েটারে মাঝরাত পর্যন্ত সরগরম। আর ওই সামনের দিকে তাকিয়ে দেখ। ওখানে শুধুই অন্ধকার, পদে পদে ভয়। দারিদ্র্য আর অশিক্ষা, অসুখ-বিসুখ আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়, হিংস্র জানোয়ার আর বিষাক্ত সাপ, মৃত্যু যেন সব সময় ওঁৎ পেতে বসেই আছে। এখানে বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্তই মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার জন্য খরচ হয়। আমার বাবা, ঠাকুর্দা তাঁদের গ্রামের দিকে তাকাননি, তোমাদের কলকাতা তাঁদের টেনে নিয়ে চলে গেছল। কিন্তু আমি যেতে পারিনি। আমার সামান্য ক্ষমতায় আমার গ্রামের জন্যে কিছু করব, এই আশায় রয়ে গেছি এইখানেই। দেখেছি, এখানাকার প্রায় সব সমস্যাই মানুষের বিশেষত কলকাতার মানুষেরই সৃষ্টি। এখানে থেকে অবিচলিত ভাবে চেষ্টা চালিয়ে গেলে হয়তো একদিন এই সবেরই সমাধান সম্ভব হবে। কিন্তু চিত্তপ্রসাদ, আজ যে সমস্যার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, তা তোমাদের আলোকোজ্জ্বল কলকাতায় আসতে পারে না, এই অন্ধকার গ্রামই তার আশ্রয়, আর এই সমস্যার মোকাবিলা করা বোধ হয় আমার সাধ্যের বাইরে।'

আমি ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'তুমি যে রীতিমত সিরিয়াস হয়ে উঠলে হে। এত লেখাপড়া শিখে শেষ পর্যন্ত এরকম একটা কুসংস্কারে বিশ্বাস আরম্ভ করলে ? কি হয়েছে কি ? গ্রামের কিছু লোক রক্তহীনতায় মারা গেছে আর গণকঠাকুর শুনে নিয়ে বলেছেন গ্রামে রক্তচোষা এসেছে, এই তো ? ওটা যে অ্যানিমিয়া...'

চন্দ্রশেখর প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'থাম চিত্তপ্রসাদ, এবার তুমি আমাকে হাসালে। একটা সুস্থ জোয়ান লোক রাত্রিবেলা ঘরের বাইরে বেরোল আর তার পরদিন তার রক্তহীন ছিবড়ে হয়ে যাওয়া দেহটা পাওয়া গেল গ্রামের বাইরে ধানক্ষেতের পাশে, এটা অ্যানিমিয়া, না ? আর এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠিক গুণে গুণে একুশ দিন পর পর, এটাও কি অ্যানিমিয়ার লক্ষণ ?'

আমি বললুম, 'তুমি কি নিজের চোখে এ ঘটনা একটাও দেখেছ, না সবই তোমার শোনা কথা ?'

চন্দ্রশেখর বলল, 'শেষ ঘটনাটা ঘটেছে আজ থেকে ষোল দিন আগে আমারই বাড়িতে। আমার ধাই-মা'কে তোমার মনে পড়ে ? তাঁর মৃত্যু ঘটে এমনি ভাবেই আমাদের পেছনের উঠোনে।'

এইবারে আমাকে সামলে নিতে হল। বললুম, 'কী সর্বনাশ ! বল কি ? একেবারে তোমার বাড়ির ভেতরে ? ব্যাপারটা আমাকে একটু বিশদভাবে বলবে ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চন্দ্রশেখর বলল, 'আর কি বলব ? রাত্রিবেলা ধাই-মা যখন শুতে যান, তখন তিনি দিব্যি সুস্থ, আমাকে একটা পান খাওয়ালেন, সুমিত্রাকে একটা দিলেন, কোন গোলমাল নেই। সকালবেলা উঠোনের ওপর তাঁর মৃতদেহ প্রথম আবিষ্কার করল আমাদের রাঁধুনী ঠাকরুণ। সেই একই রকম মৃত্যু। গলার ওপর দুটি রক্তের ফোঁটা, যেন কিছু দাঁত ফুটিয়েছে আর শরীরের সমস্ত রক্ত জল।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তার মানে ? রক্ত বের করে নেওয়া হয়নি ?'

চন্দ্রশেখর মাথা নাড়ল। বলল, 'না। মানে, ব্যাপারটা কি রকম জান ? অনেকটা অ্যানিমিয়ার মতই। যেন রক্তের সমস্ত লাল কণিকাগুলো কোন অজ্ঞাত কারণে ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে। আর সেটা হয়েছে মুহূর্তের মধ্যে। ফলে অ্যানিমিয়ার যেসব লক্ষণ, যেমন হাত-পা ফোলা, পেট ফুলে ওঠা, সেসব কিছু নেই। মৃত্যুর অব্যবহিত কারণ অক্সিজেনের অভাবে অ্যাজফিকসিয়া।'

'এরকম হওয়ার কারণ ?'

'জানি না। গলার দাগ দুটি দেখে মনে হয়, এই গ্রামে কোন একটি নিশাচর জীবের আবির্ভাব হয়েছে, যে গলায় কামড়ালে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে এমন একটা বিষ ঢুকে যায় যা সঙ্গে সঙ্গে রক্তের

লাল কণিকাগুলো মেরে ফেলে। ফলে তার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।'

'কি বিষ?'

'তাও জানি না। কোন কেমিক্যাল বিষ হতে পারে, তবে তার সম্ভাবনা কম। কারণ সেক্ষেত্রে একজন দুর্বৃত্ত বা হত্যাকারী বা ক্রিমিন্যাল থাকার সম্ভাবনা। আবার সেই সঙ্গে এই অপরাধের একটা উদ্দেশ্য থাকা দরকার। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডগুলো এতই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন যে কোন একটা উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব। তাই মনে হয়, বিষটা জৈববিষ যেমন সাপের বা কাঁকড়াবিছের বিষ এবং নিহত লোকেদের এমনি বিষধর কোন প্রাণীর কামড়েই মৃত্যু হয়েছে।

'আর একটা সম্ভাবনা হল, ভ্যামপায়ার জাতীয় কোন প্রাণী এদের রক্ত চুষে খেয়ে তাদের শরীরের ভেতরে কোন অজ্ঞাত একটা তরল পদার্থ ঢুকিয়ে রেখে যায়। কিন্তু সেখানে একটা অসুবিধে আছে।'

'কি অসুবিধে?'

'দ্যাখো, আমাদের এখানে প্রথমে মানুষ মরতে শুরু করেনি। সব রিপোর্ট তো পাইনি, তবে প্রথম মারা যায় একটা গরু। আমাদের পাশের গ্রাম যদুতলির এক গাড়িওলা অন্তা কাহার বলে একজনের গরু ছিল সেটা। তারপর মরে আর একটা গরু, ওই যদুতলিরই আর একজন গোয়ালার। এখন, গরু মরা গাঁয়ের মানুষের কাছে সহজ ব্যাপার নয়। গরু তাদের একটা সম্পদ। কাজেই হৈচৈ পড়ে যায়। আমার কানেও কথাটা আসে। আমি তখন ভেবেছিলুম গোমড়ক লেগেছে বুঝি। তাই এ গাঁয়ের লোকেদের ডেকে সাবধান করে দিই। কিন্তু তার পর অদ্ভুত অদ্ভুত সব খবর কানে আসতে লাগল। শুনলুম, ওরা নাকি এক গোবদ্যি ধরে এনেছে, সে বলেছে অসুখ বিসুখ কিছু নয়, গরুগুলো মরেছে রক্তচোষার কামড়ে।

'তোমারই মত আমি ব্যাপারটা কুসংস্কার বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু এর পরের আঘাতটাই এল যদুতলির পণ্ডিতমশাই নগেন ভট্টাচার্যি মশায়ের বাড়িতে। পণ্ডিতমশায়ের গরু মঙ্গলা একইরকমভাবে মারা যায়। পণ্ডিতমশায়ের কাছে যা শুনলুম, তাতে তো আমার চক্ষুস্থির। গোবদ্যির কথা শুনে তিনি মঙ্গলাকে গোয়ালঘর থেকে বের করে এনে বাড়ির ভেতরের উঠোনে বেঁধে রেখেছিলেন আর নিজে শুতেন বারান্দার ওপর। যেদিন মঙ্গলা মরে, সেদিন তিনি অনেক রাত অবধি পড়াশুনো করে আলোটা নিয়ে বাড়ির পেছনে কুয়োতলায় গিয়েছিলেন হাত-পা ধুতে। সেখান থেকে মঙ্গলাকে দেখা যায় না। হঠাৎ তিনি একটা ধপ করে আওয়াজ শোনেন এবং তারপরেই তাঁর মনে হয় কিছু একটা রাঙচিতার বেড়া ভেঙে প্রচণ্ড বেগে ছুটে বাইরে চলে গেল। তিনি দৌড়ে এসে দেখেন, মঙ্গলা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং আস্তে আস্তে, তাঁর চোখের সামনে, গড়িয়ে মাটির ওপর পড়ে যায়।

'এখন, এর থেকে দুটো জিনিস প্রমাণ হয়। এক, রক্তচোষাই হোক বা যাই হোক, যে জীবটি বেড়া ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছিল, সে মঙ্গলার রক্ত চুষে খায়নি। কারণ একটা গরুর শরীরে কত সের রক্ত থাকে আমি জানি না, কিন্তু দুনিয়ায় বোধ হয় কোন শক্তি নেই যা সেই পরিমাণ রক্ত এক মুহূর্তের মধ্যে চুষে খেয়ে সেই পরিমাণ তরল পদার্থ শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ মঙ্গলার মৃত্যু হয়েছে কোন বিষে। দুই, জীবটি সাপ জাতীয় কোন প্রাণী নয়, কারণ বেড়ার মধ্যে যে গর্ত হয়েছিল, তার মধ্যে দিয়ে কোন বড় জানোয়ারই বেরিয়ে যেতে পারে, কোন সরীসৃপ নয়। আর ধপ করে শব্দটাও তাই প্রমাণ করে।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমাদের পণ্ডিতমশায় লোক কেমন?'

'অতিশয় সজ্জন। গাঁজা-ভাঙ তিনি খান না, কদাচ মিথ্যে কথা বলেন না, শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তাছাড়া, আমি নিজে মঙ্গলাকে দেখেছি, ভাঙা বেড়াটা দেখেছি। বীভৎস ব্যাপার।'

'অন্যান্য মৃত্যুগুলো দেখনি?'

'দেখেছি। তবে সবগুলো নয়।'

'তাদের সম্পর্কে কিছু বল।'

'দ্যাখো, পণ্ডিতমশায়ের ব্যাপারটার পর যদুতলির চণ্ডীমণ্ডপে আমি একটা মিটিং ডেকেছিলুম। ওখানে একটা নাইট ওয়াচের জন্য ভলান্টিয়ার পার্টি তৈরি করেছিলুম, প্রত্যেক গোয়ালের সামনে

যাতে সারা রাত আগুন জ্বলে আর কেউ না কেউ জেগে পাহারা দেয়, তারও বন্দোবস্ত করেছিলুম। ফলে হিতে বিপরীত হল। অন্যদিকের গ্রাম পাখনায় গরু মরতে আরম্ভ করল। পাখনায় লোকেরা যখন ভলান্টিয়ার পার্টি বানাল, তখন মানুষ মরতে শুরু করল।'

'কি রকম ?'

'প্রথমে তো ভলান্টিয়ার পার্টির লোকই মরতে আরম্ভ করল। কেউ একটু একা হয়ে গেছে বা একটু অন্ধকারের দিকে চলে গেছে বা গাছতলায় বসে ঢুলুনি এসেছে, ব্যস, মরণ ছোবল তাকে একেবারে বৈতরণী পার করে দিয়েছে। এই সময়েই আমরা আবিষ্কার করলুম, এই ছোবলটা আসে প্রতি কুড়ি থেকে বাইশ দিনের মধ্যে।

'ফলে, ভলান্টিয়ার পার্টি বন্ধ হয়ে গেল। গাঁয়ের লোক তাদের গরুছাগল নিয়ে সন্ধে হতে না হতেই ঘরের মধ্যে ঢুকে আগল আটকে দিতে লাগল। কিন্তু সারা রাতে একবারও ঘরের বাইরে বেরোবে না, এ তো হয় না। যে বের হয়, সেই মরে।

'কিন্তু তারপরে যা শুরু হল, তা আরও অবিশ্বাস্য।'

'কি ?' আমি জিজ্ঞেস করলুম।

চন্দ্রশেখর আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, 'নিশির ডাক।'

আমি আকাশ ফাটিয়ে অট্টহাস্য হেসে উঠতে যাচ্ছিলুম। চন্দ্রশেখর আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'হেসো না চিত্তপ্রসাদ, হেসো না। তিনটে গাঁয়ের লোক যখন পেট খারাপ হলেও ঘরের বাইরে বেরোনো বন্ধ করল, তখন যার মরণ ঘনিয়ে এসেছে, তাকে একটা অদ্ভুত সুরেলা কণ্ঠ নাম ধরে ডেকে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করল। আর এখনও সেই রকমই চলেছে। সেই ডাক নাকি অপ্রতিরোধ্য। যাকে ডাকে, তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলেও সে নাকি সব ছিঁড়ে বেরিয়ে চলে যায়।'

'যখন বেরিয়ে যায়, তখন তার আত্মীয়-স্বজন তাকে অনুসরণ করে না কেন ?'

'দেখ, যারা আতঙ্কে অর্ধমৃত হয়ে আছে, তাদের কাছ থেকে তুমি এরকম বীরত্ব আশা করতে পার না, পার কি ? আর অনুসরণ করেই বা কী হবে ? গ্রামের পথ নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি। সেই অন্ধকার কি হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলো ভেদ করতে পারে ?'

'ওই নিশির ডাক কি তুমি শুনেছো ?'

চন্দ্রশেখর অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'না, শুনিনি।'

এরপর আর কথা এগুলো না। ভেতর বাড়ির থেকে ডাক এল চান করতে যাবার, চন্দ্রশেখরের কাছারি যাওয়ার সময় হল। আমার কিন্তু মনের মধ্যে একটা সন্দেহ খচখচ করতে লাগল। চন্দ্র যা বলেছে সেটা সত্যি কি মিথ্যে জানিনে, কিন্তু সে সত্যি ভেবেই বলেছে। তবে, সেটাও বড় কথা নয়। আমার সন্দেহ হল, সে কিছু কথা গোপন করে যাচ্ছে, আমাকে প্রাণ খুলে সবটা বলছে না। অর্থাৎ রহস্যটা যে কেবল বাস্তব তাই নয়, ওপর থেকে যা মনে হয়, তার চেয়েও গুরুতর।

চন্দ্রশেখর কাছারি চলে গেলে, আমি গ্রামটা ঘুরতে বের হলুম। বকুলপুর গ্রাম আমার বহুদিনের পরিচিত। ছোটবেলায় অনেকবার এখানে এসেছি, বড় হয়েও বেশ ক'বার। শেষবার এসেছিলুম চন্দ্রশেখরের বিয়েতে বছর তিনেক আগে বরযাত্রী যাব বলে। তবে যাওয়া হয়নি, সন্ধেবেলা পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল। তাই নিয়ে মহা হাঙ্গামা হয়েছিল। তা সে অন্য কথা।

চন্দ্রশেখরের বিয়ে হয়েছিল মালদা জেলারই গঙ্গাযমুনা গ্রামের জমিদার ঘনশ্যাম রায়ের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে। ঘনশ্যামের সঙ্গে আমার পরে পরিচয় হয়েছিল কলকাতায়। লোকটি যেন কেমন অদ্ভুত বলে তখন আমার মনে হয়েছিল। কখনও সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন না, চেপে চেপে প্রতিটি কথা বিচার করে করে বলেন। আমার প্রথমেই ধারণা হয়েছিল লোকটি অত্যন্ত ঘুঘু।

তবে চন্দ্রশেখরের স্ত্রী সুমিত্রা অবশ্য তার বাপের মত নয় বলেই শুনেছি। সে জমিদার বাড়ির বউ, অসূর্যম্পশ্যা, কিন্তু তার গৃহিণীপনার গল্প আমাদের কানে এসেছিল। আর কানে এসেছিল তার অসাধারণ সৌন্দর্যের কথা। তাকে নিয়ে আর তার জমিদারিটি নিয়ে কত সুখেই না থাকতে পারত চন্দ্রশেখর। তা নয়, কোত্থেকে কী এক ভয়াবহ একটা প্রাণী এসে সব ছারখার করে দিলে। এই সব

ভাবতে ভাবতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, চন্দ্রশেখর আমার বন্ধু, কেবল বন্ধু বলব না, আমার অনেক বিপদে আপদে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে, আমার সেই বন্ধুর এই দুঃসময়ে, সেটা সত্যি বা কাল্পনিক যাই হোক না কেন, তার পাশে আমি দাঁড়াব, তাকে উদ্ধার করব।

এমন সময় হঠাৎ শুনি কে আমার নাম ধরে ডাকছে, 'চিত্তবাবু, ও চিত্তবাবু!' তাকিয়ে দেখি, বকুলপুরের বর্ধিষ্ণু চাষী সন্ন্যাসী কৈবর্তর ছেলে বিষ্ণুপদ কৈবর্ত। বিষ্ণুপদ কলকাতায় লেখাপড়া করতে গিয়েছিল, বেশিদূর সেটা চালাতে পারেনি বটে, তবে নিজের গ্রামের প্রতি অশ্রদ্ধাটা পুরোপুরি রপ্ত করে ফেলেছিল। হেদোর কাছে একটা ওষুধের দোকানে চাকরি করত আর গোয়াবাগানে একটা মেসে থাকত। মানিকতলার বাজারে তার সঙ্গে মাঝেমধ্যে আমার দেখা হত।

বিষ্ণুপদ বলল, 'একি চিত্তবাবু, আপনি এখানে কি করছেন?'

আমি বললুম, 'আমি তো এখানে আসতেই পারি বিষ্ণুপদ, এখানে আমার বন্ধুর বাড়ি। বরং তুমি এখানে কি কবছ বল তো? তোমার সঙ্গে তো যখনই দেখা হয়, তুমি বল, গ্রামে নাকি ভদ্রলোকের থাকা অসম্ভব। তা, তুমি কি আবার ছোটলোকদের দলেই ভিড়লে নাকি?'

বিষ্ণুপদ মাথা নিচু করে বলল, 'ওসব কথা বাদ দিন, চিত্তবাবু। বাবা মারা গেছেন, এত জমিজমা ফেলে কোথায় থাকব? কলকাতায় পড়ে থাকলে তো পাঁচভূতে লুটে নেবে।'

আমি দুঃখিত হয়ে বললুম, 'সন্ন্যাসীদা মারা গেছেন নাকি? কবে? কি হয়েছিল?'

বিষ্ণুপদ বলল, 'বাবা মারা গেছেন মাস ছয়েক হল। আর কি হয়েছিল? কেন, জমিদারবাবু আপনাকে কিছু বলেননি?'

আমি বললুম, 'রক্তচোষা?'

বিষ্ণুপদ মৃদু হেসে বলল, 'হ্যাঁ, লোকে তাই বলে বটে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনে।'

'তুমি কি বিশ্বাস কর?'

'আমার ধারণা, এটা একটা কোন নতুন ধরনের ছোঁয়াচে রোগ, যা জীবজন্তু মানুষকে রক্তশূন্য করে ফেলে। আর এই রোগটা এমন একটা জীবাণু থেকে হয়, যা কোন মানুষ বা জন্তুর শরীরে ঢুকলে কুড়ি-বাইশ দিন সময় নেয় তৈরি হয়ে নেবার। যেমন, ধরুন ম্যালেরিয়া।'

'ম্যালেরিয়া? না বিষ্ণুপদ, তোমার উপমাটা ঠিক হল না, তবে তুমি যে কি বলতে চাইছ, তা বুঝতে পারছি। তার মানে, ও গাঁয়ের পণ্ডিতমশাই যা দেখেছেন বা এই তিনটে গাঁয়ের লোক যে নিশির ডাক-টাকের কথা বলছে, সেগুলো তুমি মনে কর মিথ্যে।'

'ঠিক মিথ্যে নয়, বলব কুসংস্কার। আর এ সবের জন্যেই তো আমি গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে থাকি।'

আমাদের কথাবার্তা হতে দেখে ইতিমধ্যে চারপাশে কয়েকজন গ্রামবাসী দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তাঁদের মধ্যে চন্দ্রশেখরের খাজাঞ্চী নিমাই পাটোয়ারীর ছোট ভাই গোবিন্দও ছিলেন। গোবিন্দ লেখাপড়া বেশি করেননি, কিন্তু সৎ সজ্জন লোক বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি বিষ্ণুপদর কথা শুনে হঠাৎ চটে উঠলেন। বললেন, 'তোমার ওখানে গিয়েই থাকা উচিত বিষ্ণু। তোমার মত অপদার্থ গাধার এ গাঁয়ে ঢোকাই উচিত নয়।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'কি হল গোবিন্দদা? এত চটে উঠলেন কেন?'

গোবিন্দ হাত নেড়ে বললেন, 'চটব না? যেখানে আমাদের জীবন মরণের সমস্যা, সেখানে উনি বলছেন কিনা, এটা আমাদের কুসংস্কার? এমন লোককে জুতোপেটা করতে ইচ্ছে করে কিনা তুমিই বল চিত্তপ্রসাদ।'

আমি বললুম, 'আপনি এই নিশির ডাক শুনেছেন?'

গোবিন্দর মুখের ভাবটা কেমন একরকম হয়ে গেল। কথা বলতে গিয়ে একবার ভয়ে ভয়ে চারদিক চেয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, শুনেছি।'

'কিরকম শুনলেন?'

ফ্যাকাশে মুখে গোবিন্দ বললেন, 'কি রকম? কি রকম আবার? অনেকটা এই মেয়েছেলের গলার মত। আমাদের পাশের বাড়ির জগন্নাথকে ডাকলে, তখন শুনেছি। জগন্নাথ নেই, মরে গেছে।'

গোবিন্দর কথা শুনে আমার এইবার আর হাসি পেল না। গোবিন্দর কথা বলার মধ্যে এমন

একটা স্বাভাবিকতা ছিল যে তার কথা অবিশ্বাস করা সম্ভব হল না। আমি বলতে যাচ্ছিলুম, 'আপনি তো ভুলও শুনে থাকতে পারেন!' কিন্তু তার আগেই ভিড়ের ভেতর থেকে অতুল মণ্ডল বলল, 'হ্যাঁ গোবিন্দদা, মেয়েছেলের গলাই বটে। যেদিন বাঁদর কামড়ালে, সেদিন শুনেছিলুম। ইস্! তখন যদি ছুটে বেরোতুম!'

আমি বললুম, 'বাঁদর কামড়ালে মানে? কাকে বাঁদর কামড়াল? কি হয়েছিল?'

অতুল মণ্ডল মাথা নেড়ে বলল, 'বাঁদর কাউকে কামড়ায়নি গো! তিনিই বাঁদরকে কামড়ালো। সেই গতবার তো জমিদারবাবুর ধাইমা মারা গেল তার আগের বার। সেদিন ছিল ঝড় বৃষ্টির রাত, আর তাঁর আসবারও সময় হয়েছিল। তাই গাঁ-শুদ্ধ লোক দু দিন ধরে জেগে বসেছিল। আর নিশির ডাক শুরু হয়েছে তো, তাই সবাই চিৎকার করছিল, কোন কোন বাড়িতে খানিক অন্তর অন্তর শাঁখ বাজছিল আর বৃষ্টিও নেমেছিল বটে। নিশি ডাকলেও শোনা যেত কিনা সন্দেহ।

'তা, আমার বাড়ির পাশে একটা ঝুপসি বটগাছ আছে। কিছুদিন হল সেখানে একদল বাঁদর আশ্রয় নিয়েছিল। সে রাতে যখন বৃষ্টিটা একটু ধরেছে, হঠাৎ শুনি গাছের ওপর একটা ঝুটোপাটির আওয়াজ। আর তারপরেই ধপ! মনে হল যেন একটা ভারী কিছু ওপর থেকে পড়ল। তারপর আবার একটা ধপ! আর সঙ্গে সঙ্গে একটা মেয়েমানুষের গলায় চিৎকার। মানে ব্যথা পেলে তারা যেমন ককিয়ে ওঠে, তেমনি। আমি শুনে ছুটে বেরুতে যাচ্ছিলুম, আমার পরিবার আমার কাছা চেপে ধরলে, বেরুতেই দিলে না।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তারপর?'

অতুল বলল, 'তারপর আর কি? পরদিন সকালে গাছতলায় গিয়ে দেখি একটা গোদা বানর মরে পড়ে আছে আর বটগাছ খালি। ভোর হতে না হতেই পুরো দলটা গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গেছে।'

শুনতে শুনতে আমার কেমন যেন মনের মধ্যে সব গোলমাল পাকিয়ে যেতে লাগল। এতগুলো শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা সম্পূর্ণ নিরক্ষর লোক একসঙ্গে জোট পাকিয়ে অনবরত মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে? কার স্বার্থে? আমাকে বোকা বানিয়ে মজা পাওয়া এর উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর পেছনে কোন একটা সত্য লুকিয়ে আছে, অশিক্ষা আর কুসংস্কারের গোলকধাঁধায় পড়ে হয়তো তার এমন একটা হাস্যকর রূপ তৈরি হয়েছে। সেই সত্যটা কি? এতগুলো প্রাণ গেছে, সেটা তো রসিকতা নয়। তাছাড়া কাল শুতে যাবার আগে বসন্ত একটা কথা বলেছিল, তার মানেই বা কি?

আমি হঠাৎ গোবিন্দদার দিকে ফিরে বললুম, 'আচ্ছা, গোবিন্দদা, কালরাত্রি কি?'

গোবিন্দ গম্ভীর মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'হুঁ, তুমিও শুনেছ কথাটা। পণ্ডিতমশাই বললেন, কালরাত্রি মানে যে রাত্রে মানুষের ঘরে মৃত্যু নেমে আসে। যে রাত ভীষণ বিপদের রাত। আমাদের গাঁয়ে সেই কালরাত্রি নেমেছে চিত্তপ্রসাদ, কেউ আমাদের উদ্ধার করতে পারবে না। একে একে আমরা সবাই যাব। তবে হ্যাঁ, মৃত্যুটা বোধ হয় খুব তাড়াতাড়ি আসে। বেশি কষ্ট পেতে হয় না। সেটাই যা বাঁচোয়া।'

আমি উত্তেজিত হয়ে বললুম, 'কালরাত্রি নেমেছে আর আপনারা সবাই মহানন্দে তার ছোবলের মুখে গলা বাড়িয়ে দেবেন? বাঁচবার চেষ্টা করবেন না? সবাই একজোট হয়ে দাঁড়িয়ে এই বিপদের মোকাবিলা করবেন না?'

গোবিন্দ মৃদু হেসে ঘাড় নাড়লেন, 'কোন লাভ নেই চিত্তপ্রসাদ। চেষ্টা কি আমরা করিনি? কিন্তু দৈব বড়ই প্রবল হে, তার সঙ্গে লড়াই করার সাধ্য আমাদের নেই।'

আমি বললুম, 'দৈবকে হারানো যায় না, আমি তা বিশ্বাস করি না গোবিন্দদা। একটু চেষ্টা, একটু মনের জোর থাকা চাই। আর সাধ্য? টাকা-পয়সা? আমি কলকাতায় গিয়ে আপনাদের এই বিপদের কথা বলে আন্দোলন করব, দেখবেন সমস্ত দেশের মানুষ আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। টাকা-পয়সা যা দরকার আমি তার ব্যবস্থা করব। আর চন্দ্রশেখর তো আছেই।'

আমি চন্দ্রশেখরের নাম করতেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। স্তম্ভিত হয়ে দেখি, চন্দ্রশেখরের নাম শুনেই সেই ভিড়ের প্রায় প্রত্যেকটি লোক মুখ বিকৃত করল। আমি তো অবাক। এতদিন আমার ধারণা ছিল বকুলপুর গ্রামের প্রত্যেকটি লোক চন্দ্রশেখরকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে। কিন্তু, এ কি হল? আমি এত আশ্চর্য হয়েছিলুম যে বোধ হয় আমার মুখ দেখে সেটা সবাই বুঝতে পেরেছিল।

গোবিন্দ তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা সামলানোর জন্যে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো বটেই। জমিদারবাবু আছেন. তুমি আছ, দেশের আর পাঁচজন আছেন। দেখ, যদি কিছু করে উঠতে পার।'

আমি ততক্ষণে বিস্ময়টা কাটিয়ে উঠেছি। আর এও বুঝেছি যে গোলমালটা অনেক গভীরে পৌঁছেছে। কাজেই সাবধানে বললুম, 'নিশ্চয়ই করব গোবিন্দদা। আর আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করেই করব। আজ সন্ধেবেলা আপনারা আসুন না চন্দ্রশেখরের বাড়িতে, একটা আলোচনা করা যাবে।'

গোবিন্দ বললেন, 'আলোচনা ? আলোচনা তো অনেক হল চিত্তপ্রসাদ, তাতে আর লাভ কি হবে ? এর আগে পরামর্শ করে যা কিছু করা হয়েছে, তাতে সুরাহা তো কিছু হয়নি, উল্টে কতগুলো প্রাণ বেঘোরে গেছে। তার চেয়ে এখন আমরা যেমন ভাবে চালাচ্ছি, তেমনি ভাবেই চলুক। তাঁর আসবার তো সময় হয়ে এসেছে। এখন সন্ধে হলেই যে যার ঘরে দোর দিয়ে সারা রাত জেগে শাঁখ আর কাঁসর বাজাবে, চিৎকার করবে যাতে বাইরের কোন শব্দ শোনা না যায় আর কেউ যেন বাইরে না থাকে। তা হলেই হবে। আর নতুন করে কোন পরামর্শের কোন দরকার দেখি না চিত্তপ্রসাদ। যদি তুমি নিজের বিবেচনায় কিছু করতে পার তো কর।' বলে গোবিন্দদা আস্তে আস্তে চলে গেলেন। ভিড়ের লোকজনও যে যার চলে গেল। দেখি হতবাক আমি আর বিষ্ণুপদ কেবল দাঁড়িয়ে আছি।

বিষ্ণুপদ মৃদু হেসে বলল, 'দেখলেন তো চিত্তবাবু, এই আমাদের গাঁয়ের লোক।'

আমি চটকা ভেঙে বললুম, 'গাঁয়ের লোককে দোষ দিও না বিষ্ণুপদ। ওরা যে একটা ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে আছে, এতে তো কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। ওদের সহানুভূতি দেখাতে না পার ঠাট্টা কর না। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার ভীষণ খটকা লাগছে। এরা চন্দ্রশেখরের ওপর অসন্তুষ্ট কেন ? কি করেছে সে ?'

বিষ্ণুপদ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'আপনি ওদের ওপর সহানুভূতি দেখাতে বললেন, না ? কোত্থেকে সহানুভূতি আসবে বলতে পারেন ? এমন একটা অকৃতজ্ঞ জাত ! যে জমিদারবাবু নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে এখানে পড়ে থেকে এদের জন্যে এত কিছু করলেন, আজকে এরা তাঁকেই....' বলতে বলতে বিষ্ণুপদ থেমে গেল।

আমি বললুম, 'থেমো না বিষ্ণুপদ। কি হয়েছে বল। এরা চন্দ্রশেখরকে সন্দেহ করছে ? ভাবছে এই মৃত্যুগুলোর পেছনে চন্দ্রশেখরের হাত আছে ?'

বিষ্ণুপদ নীরবে ওপরে নিচে ঘাড় নাড়ল।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললুম, 'কিন্তু কেন ? তার অপরাধ ?'

বিকৃত মুখ করে বিষ্ণুপদ বলল, 'অপরাধ ? প্রথমত, তিনি যেসব নাইট ওয়াচ বসিয়েছিলেন তাদের অনেকেই মারা গেছে। দ্বিতীয়ত, যদিও তিনি প্রায় প্রত্যেক রাত্রে গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় বন্দুক হাতে টহল দিয়ে বেড়ান, কিন্তু যেদিন মৃত্যুগুলো ঘটে সেদিন আর তাঁকে দেখা যায় না।

'আচ্ছা, আপনিই বলুন, এসব কি কোন যুক্তি ? আরে, ওদের কথাই যদি মেনে নিতে হয়, তাহলে জমিদারবাবুকে তো সন্দেহ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'ওদের কি কথা ?'

বিষ্ণুপদ তিক্ত হাসি হেসে বলল, 'জানেন না ? সেই যে তিনি, মানে যিনি কামড়ে থাকেন, তাঁকে তো দু'তিনজন দেখেছে। তাঁর বর্ণনার সঙ্গে আর যার মিলই থাকুক, জমিদাবাবুর নেই।'

আমি উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম। বললুম, 'বল কি বিষ্ণুপদ ? তাকে কেউ দেখেছে ? বর্ণনাটা কি রকম ?'

'ওঃ, সে ভারি মজার। বর্ণনাটা মোটে কোন গোটা মানুষেরই না। মানে, আধখানা মানুষের আর আধখানা গিরগিটির। মানে, একটা গিরগিটি যদি পেছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ায় তাহলে যেমন দেখাবে তেমনি। এমন কি একটা মোটা ল্যাজও আছে।' বলে বিষ্ণুপদ হাসতে লাগল।

আমিও হেসে ফেললুম। বললুম, 'তবু লোকে চন্দ্রশেখরকে সন্দেহ করে ? কি ভাবছে তারা, এটা ওর ছদ্মবেশ ?'

'হ্যাঁ, তাই বটে।'

'কারা কারা দেখেছে ?'

'এ গাঁয়ের দুজন, শ্যামচরণ আব নীলু আব পাখনাব একজন, চৌকিদাব গুপীচবণ।'

'তাদের সকলের বর্ণনাই এক ?'

'হ্যাঁ, প্রায় এক।'

যখন বাড়ি ফিরলুম তখন বেশ বেলা হয়েছে। দেখি, বৈঠকখানা ঘবে আমাদের খাওয়ার জায়গা কবছে বসন্ত। আমাকে আসতে দেখে বসন্ত বলল, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলেন রায়বাবু ? জমিদারবাবু অনেকক্ষণ থেকে আপনাকে খুঁজছেন। আপনি চান করে আসুন, আমি কাছাবি বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়ে আসি।'

আমি স্নান সেরে খাওয়াব জাযগায এসে দেখি, চন্দ্রশেখব বিষণ্ণ গম্ভীব মুখে মাথা নিচু করে আসনে বসে আছে। আমাব পাযেব শব্দ শুনে মুখ তুলে বলল, এসো, চিত্তপ্রসাদ। কোথায় গিয়েছিলে ?'

আমি ওব পাশে বসে বললুম, 'এই, গ্রামটা একটু ঘুবতে গিয়েছিলুম।'

চন্দ্রশেখর একটু চুপ কবে থেকে জিজ্ঞেস কবল, 'কিছু শুনলে ?'

আমি চুপ কবে রইলুম।

চন্দ্রশেখর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'শুনেছ, না ? এবাব বুঝেছ, কেন আমি তোমাকে ডেকে এনেছি ? তুমি আইনজ্ঞ, বুদ্ধিমান, আব আমাব বন্ধু। এ বিপদ থেকে তুমিই আমাকে উদ্ধাব কবতে পার। আমাব প্রজাদেব জীবন আমি বক্ষা কবতে পারিনি, আমাব সংসাব ভেঙে যাচ্ছে, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি চিত্তপ্রসাদ।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'সংসাব ভেঙে যাচ্ছে কেন ?'

'ওই যে। প্রজারা আমাব নামে যে সন্দেহ কবে, তা সুমিত্রাব কানে পৌঁছেছে। তাবপব থেকে সে আর এ বাড়িতে থাকতে চায় না। সাবাদিন ঘুবে ঘুবে বেড়ায়, বাত্রে একঘবে থাকতে চায় না। তার ওপর, বাড়ির ভেতরে ধাই-মা মাবা যাওযাব পব, সে তো প্রায় নাওয়া খাওয়া ত্যাগ কবেছে। আমি বেশি কাছে গেলেই ভয়ে সাদা হয়ে যাচ্ছে। আব মুখে শুধু ওই এক কথা, আমাকে বাপেব বাড়ি রেখে এস, আমি এখানে এক মুহূর্ত থাকতে চাই না। তুমি বল চিত্তপ্রসাদ, আমি কি কবতে পারি ?'

'ঘনশ্যাম বাযকে খবব দিযেছ ?' আমি জিজ্ঞেস কবলুম।

'হ্যাঁ, শ্বশুবমশায়কে খবব দিয়েছি। তিনি আসবেন বলেছেন। কিন্তু তিনি ব্যস্ত লোক, চট কবে চলে আসা তো সহজ নয় তাঁর পক্ষে। এদিকে সময় এগিয়ে আসছে। আব যতই সময় এগিয়ে আসছে, সুমিত্রা ততই আতঙ্কে দিশেহাবা হয়ে পড়ছে।'

আমি বললুম, 'তা, তুমি সুমিত্রাকে নিয়ে বাইবে কোন জায়গা থেকে কিছুদিন ঘুবে এস না। সুমিত্রাব সন্দেহও কাটবে, তুমিও একটু বিশ্রাম পাবে।'

মাথা নেড়ে চন্দ্রশেখব বলল, 'না চিত্তপ্রসাদ, তা হয় না। আমি যে এ কথাটা চিন্তা কবিনি, তা নয়। কিন্তু মনে কর, আমার যেমন দুর্ভাগ্য, হয়তো বাইবে গেলুম, আব সেবাবেই কিছু হল না। তখন কি হবে ? আমি কি আব কোনদিন এ গাঁয়ে ঢুকতে পাবব ? ঢুকলে সবাই আমাকে ছিঁড়ে টুকবো টুকবো কবে ফেলবে না ?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, তা বটে। তাহলে তুমি ঘনশ্যাম বাযকে একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম পাঠাও।'

'তাও পাঠিয়েছি। আশা করছি, কাল পবশুব ভেতবেই উত্তব পাব।'

'কিন্তু চন্দ্রশেখর, সুমিত্রা যদি আর না ফিরে আসে ?'

চন্দ্রশেখর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল, 'ও নিশ্চয়ই ফিবে আসবে। তুমি দেখো। এ রহস্যের জাল ছিঁড়ে ফেলে ও নিশ্চয়ই নিজের ভুল বুঝতে পাববে। কিন্তু কত দিনে ?'

এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা ছিল না। কাজেই চুপ করে রইলুম।

রাত্রিবেলা শুতে যাবার সময় বসন্ত বলল, 'রায়বাবু, গন্ধটা বাড়ছে, টের পাচ্ছেন ?'

আমি মাথা নেড়ে বললুম, 'কোন গন্ধটা বসন্ত ? আমার নাকে তো নানা রকম গন্ধ আসছে।'

বসন্ত স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'কালরাত্রির গন্ধ, মৃত্যুর গন্ধ।'

আমি শুয়ে পড়ে বললুম, 'মৃত্যুর গন্ধ যে কেমন, তা তো আমার জানা নেই বসন্ত। কাজেই সেট বাড়ছে না কমছে, তা বলব কি করে ?'

বসন্ত আমার কথার খোঁচাটা বুঝল কি না কে জানে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপ আমার যখন প্রায় ঘুম এসে গেছে, তখন হঠাৎ আমাকে ডেকে বলল, 'রায়বাবু, আমার চোখটা এক দেখবেন।'

আমি একটু চটেই গেলুম। বললুম, 'কি পাগলামো হচ্ছে, বসন্ত! শুয়ে পড়।' আর বল বলতেই ওর দিকে চোখ পড়ায় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। দেখি ওর চোখ দুটোর মধ্যে মণি নেই পুরোটাই সাদা। কোনরকমে বললুম, 'কি করছ, বসন্ত ? এমন চোখ কপালে তুলে বসে আ কেন ?'

বসন্ত চোখ বন্ধ করে মৃদু হাসল। বলল, 'চোখ কপালে তুলিনি রায়বাবু। মণিদুটো দেখত পাননি, না ? যাক, ভালই হয়েছে।'

'ভাল হয়েছে মানে ? কি ভাল হয়েছে ? মণি না দেখতে পাওয়ার মধ্যে ভালটা কোথায় ?'

'আছে, রায়বাবু। একে আমরা বলি চক্ষুক্ষীর। এটা চোখের ওপর এলে, তখন চোখ আ দেখতে পায় না, দেখতে পায় বোধ হয় মন। কিভাবে হয় জানি না, তখন অনেক কিছু দেখতে পা যা সাদা চোখে কখনও দেখা যায় না। সব সময় তো এটা আসে না, কখনও সখনও কালেভাদ্রে আসে। যখন আসে, তখন পৃথিবীটার রূপই পাল্টে যায়। মনে মনে বড্ড চাইছিলুম, এটা যে আসে। প্রার্থনা করছিলুম যদি কোন পুণ্যফল আমার থাকে, তাহলে এই ভীষণ বিপদের দিনে যে এটা পাই।'

আমি আবার লম্বা হয়ে বললুম, 'দেখ বসন্ত, সারা দিন ধরে নানা রকম ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব ক শুনতে হয়েছে, তার ওপর তুমি এলে তোমার চক্ষুক্ষীর না চক্ষুস্থির, কি সব নিয়ে। আর সহ্য করতে পারছি না। এবার ঘুমোতে দাও। কাল আবার সকালবেলা বেরোতে হবে মোটা ল্যাজওলা আধখান মানুষ আর আধখানা গিরগিটির সন্ধানে। কি যে সব হচ্ছে, কে জানে। বুঝতে পারছি না যে, আমি কি একটা পাগলা গারদের মধ্যে এসে পড়লুম না সবাই আসলে সুস্থ, কেবল আমিই পাগল হ গেছি।'

বসন্ত বলল, 'পাগল কেউই হয়নি রায়বাবু! কেবল একটা কথা মনে রাখা দরকার, আমরা রো যা চোখে দেখি বা কানে শুনি, তার বাইরেও অনেক কিছু হয় বা আছে, যা কল্পনা করাও আমাদে পক্ষে অসম্ভব।'

আমি বললুম, 'হুঁ! শেক্সপীয়রও এরকমই কি একটা কথা যেন বলেছিলেন বটে।'

পরদিন ভোরবেলা উঠে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দেখি, চন্দ্রশেখর বসে আছে। কিন্তু তার মুখে দিকে চেয়ে আমি স্তম্ভিত। কী এক প্রচণ্ড অন্তর্গূঢ় বেদনায় সে মুখ বিকৃত হয়ে রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কি হয়েছে ?'

চন্দ্রশেখর ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলল, 'সুমিত্রা আমাকে আল্টিমেটাম দিয়ে দিয়েছে গতকাল। যেভাবে হোক, আজ রাত্রের মধ্যে ও চলে যাবেই। আমি যতক্ষণ ব্যবস্থা না করছি, ততক্ষণ সে অন্নজল স্প করবে না বলে দিয়েছে।'

আমি বললুম, 'বল কি ? এ তো মহা বিপদ দেখছি। ঘনশ্যামবাবুর কাছ থেকে কোন খব পেলে ?'

মাথা নেড়ে চন্দ্রশেখর বলল, 'নাঃ। আজ আসবে হয়তো।'

'তবে তুমি ভেতরে গিয়ে বৌঠানকে বল যেন আজকের দিনটা অপেক্ষা করেন, তারপরে কাল হয় অন্য ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।'

'কি ব্যবস্থা নেবে তুমি ? ধাই-মা মারা গেছেন আজ সতেরো দিন হল। আর একটা মৃত্যু আস আর দিন তিন-চারেকের মধ্যে। গাঁয়ের লোক রাত্রে বেরোনো বন্ধ করেছে। পাইকদের

বেহারাদের কাউকে বললেও কেউ এখন বেরোবে না। কেটে ফেললেও না।'

'দিনে দিনে যাবে, দিনে দিনে চলে আসবে। কি আছে তাতে ?'

'আরে, তুমি শুধু তাদের নিরাপত্তার কথা ভাবছ। তাদের তো পরিবার রয়েছে। তারা তো তাদের কথা ভাবছে।'

'হুঁ ! সে কথা ঠিক। তাহলে কি করবে ?'

'তাই তো বুঝতে পারছি না। সুমিত্রা আমাকে যা-ই সন্দেহ করুক না কেন, তার জন্যে যদি নাওয়া খাওয়া ত্যাগ করে ভয়ের চোটে একটা ভালমন্দ করে বসে, তাহলে আমি কোথায় যাব বলতে পার ?'

আমি বললুম, 'সত্যি তো ! এ তো মহা অসুবিধে দেখতে পাচ্ছি। তা এমন কেউ নেই, যার পরিবার টরিবার নেই ?'

চন্দ্রশেখর চিন্তিত মুখে বলল, 'আছে। তার গরুর গাড়িও আছে। আমাদের রামকেষ্ট গাড়োয়ান। কিন্তু সে ব্যাটা বদ্ধ মাতাল। অন্তত দুটো পাইক ছাড়া সুমিত্রাকে তার হাতে ছাড়ি কি করে ? দু'দিনের পথ।'

'তুমি সঙ্গে যাও না ?'

'না, চিত্তপ্রসাদ, তা হয় না। বললুম না, সময় হয়ে এসেছে।'

আমার বুকের ভেতরটা কেমন ছ্যাঁক করে উঠল। বললুম, 'তুমি এখন কিছুতেই যেতে পার না ?'

দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে চন্দ্রশেখর বলল, 'না, অন্তত এই ক'টা দিন নয়।'

কেমন যেন ধাঁধাঁ লেগে গেল আমার। কোথায় একটা গোলমাল লাগছে, মনটা স্থির করে কিছুতেই একটা পরিষ্কার মীমাংসায় আসতে পারছি না। চন্দ্রশেখর কাছারি চলে গেলে, অন্যমনস্ক ভাবে আমি বের হলুম শ্যামচরণ আর নীলুর খোঁজে।

নীলুর একটা মুদীর দোকান ছিল। তাকে সেখানে গিয়ে ধরলুম ; জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি নাকি কী সব দেখেছ ? কি দেখেছ ?'

নীলু বা নীলকণ্ঠ আধবুড়ো মানুষ, আমার কথা শুনে কেঁপে-ঝেঁপে অস্থির। প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলল, 'না, না, আমি কিছু দেখিনি রায়বাবু। বুড়ো লোক আমি, অন্ধকারে কত ছায়া দেখি। সেসব কি ধরতে আছে ?'

আমি বললুম, 'আমাকে ভাঁওতা দিও না নীলকণ্ঠ। কি দেখেছ, বল !'

কিছুতেই বলবে না। শেষটা হঠাৎ মাথায় একটা আইডিয়া এসে গেল। ওর পাশে রাখা হিসেব লেখার শ্লেট আর পেন্সিলটা তুলে নিয়ে বিজ্ঞান বইয়ে যে ডিনোসোরের ছবি আঁকা থাকে সেরকম একটা মোটামুটি স্কেচ এঁকে ওকে দেখালুম। মুহূর্তের মধ্যে নীলকণ্ঠের মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল। ফিসফিস করে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তবে তুমিও দেখেছ রায়দাদা ?'

আমি কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, 'হ্যাঁ দেখেছি। তবে অনেকদূর থেকে তো, কতটা উঁচু বুঝতে পারিনি। তুমি বলতে পার ?'

নীলকণ্ঠ বলল, 'আমি তো খুব কাছ থেকে দেখিনি। আর এক লহমার জন্যে তো ! তবে মনে হয় এক মানুষ কি তার চেয়ে একটু বেশি উঁচু হবে।'

শ্লেটটা ধার নিয়ে গেলুম শ্যামচরণের কাছে। সে মাঠে কাজ করছিল। আমার ছবি দেখে সে আমার শিল্পপ্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করতে লাগল। আর তারও মত দেখলুম সেটা এক-মানুষ সমান উঁচু হবে। আর চক্ষের পলকে ছুটে বেরিয়ে যায়। শরীরটা যতই ভারী দেখাক না কেন, অবিশ্বাস্য তার গতিবেগ।

শ্যামচরণের কাছ থেকে ফিরে আসতে আসতে দেখলাম মনটা কেমন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। এটা কি দুঃস্বপ্ন ? এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে নীলকণ্ঠ আর শ্যামচরণ আলাদা আলাদা সময়ে সাদা চোখে, অবশ্য আবছায়া অন্ধকারে, একটা অতিকায় সরীসৃপের অবয়ব দেখেছে। তারা মিথ্যে কথা বলছে না কারণ আমার মত ঘাঘু উকিলকে এরকম পর্বতপ্রমাণ ধাপ্পা দেওয়া তাদের

সাধ্যাতীত। তাছাড়া, এতে এদের কোন স্বার্থও থাকতে পারে না।

তাহলে, এরকম একটা জীব দিন কুড়ি বাইশ কোথায় লুকিয়ে থাকে ? চারদিকে যে জঙ্গল আছে সেগুলো এমন কিছু মারাত্মক গভীর বা সেখানে একদম কোন লোকজন চলাচল করে না, এমন নয়। আর জঙ্গলের দিকে যারা থাকে তারা তো তেমন মরেনি, বরং বেশি মারা গেছে তারা যারা গ্রামের ভেতরের দিকে থাকে। অতএব, ধরে নিতে হয়, সেই প্রাণীটি গ্রামের ভেতরেই কোথাও লুকিয়ে থাকে।

কিন্তু, সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে সে থাকে কোথায় ? কেউ কি তাকে লুকিয়ে রাখে ? আর দিন কুড়ি বাইশ অন্তর অন্তর সে ক্ষুধার্ত হলে তাকে ছেড়ে দেয় ? তাহলে নিশির ডাক ? সেটা যদি সত্যি হয় তাহলে বলতে হবে কেউ সেই সরীসৃপটি সঙ্গে নিয়ে বেরোয়, তাকে শিকার ধরে দিতে সাহায্য করে। সে কে ? আর, এরকম একটা অতিকায় সরীসৃপ লুকিয়ে রাখার মত জায়গাই বা কোথায় ? জমিদার বাড়ি ?

অসম্ভব নয়। ও বাড়ির তো মাত্র একটা অংশে চন্দ্রশেখর থাকে। আর বেশির ভাগ অংশই তো তালাবন্ধ হয়ে পড়ে থাকে। ওদিকে কি কিছু আছে ?

দুপুরবেলা খেতে বসে চন্দ্রশেখরকে আমার গবেষণার কথা বললুম। চন্দ্রশেখর স্থির উজ্জ্বল দৃষ্টিতে সব কথা শুনল। কিন্তু কোন মতামত প্রকাশ করল না। খাওয়া শেষ হলে অন্দরের ভেতরে গিয়ে একটু বাদেই বেরিয়ে এল এক হাতে একটা রাইফেল আর অন্য হাতে একটা চাবির গোছা নিয়ে। বলল, 'চল, অন্য মহলগুলো একটু খুঁজে দেখি।'

আমি বললুম, 'চল।' বসন্ত কাছেই ছিল। সেও জুটে গেল। কেবল জুটে গেল নয়, আঠার মত আমার সঙ্গে সেঁটে গেল বলা যায়।

কিন্তু কোন লাভ হল না। কিছুই পাওয়া গেল না। আমরা হতাশ হয়ে ফিরে এলুম।

বৈঠকখানা ঘরে এসে বসতেই একজন পাইক একটা টেলিগ্রাম দিল চন্দ্রশেখরের হাতে। সেটা পড়ে চন্দ্রশেখরের মুখটা ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

আমি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'কি হল ?'

ভগ্ন কণ্ঠে চন্দ্রশেখর বলল, 'শ্বশুর মশায়ের তার। উনি আসছেন, তবে আরও সাতদিন বাদে।'

সেদিন সন্ধেবেলা চন্দ্রশেখর আমাকে ওর অন্দরমহলের বসবার ঘরে ডেকে পাঠাল।

ঘরে ঢুকে দেখি ঘরের মাঝখানে চন্দ্রশেখর দাঁড়িয়ে রয়েছে, মুখটা লাল টকটক করছে আর এক কোণে পেছন ফিরে ঘোমটা টানা একটি মেয়ে, বুঝলুম সুমিত্রা। আর এও বুঝতে পারলুম দাম্পত্যকলহে কিছুতেই জিততে না পেরে চন্দ্রশেখর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে সাহায্যের জন্যে।

চন্দ্রশেখর আমাকে দেখে চাপা গলায় বলল, 'তোমার বৌঠানকে একটু বুঝিয়ে বল তো চিত্তপ্রসাদ যে আজ রাত্রে তার পক্ষে এ গ্রাম ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কোনমতেই সম্ভব নয়।'

ঘোমটার আড়াল থেকে সরোষ প্রশ্ন এল, 'কেন সম্ভব নয় ? সম্ভব করলেই সম্ভব !'

সরোষ প্রশ্ন বললুম বটে, কিন্তু কী গলা ! মনে হল যেন একটা সেতার বেজে উঠল। এমন একটা আশ্চর্য মিষ্টি সুরেলা গলা আজ পর্যন্ত আর শুনিনি।

আবার সেতার বেজে উঠল,'কারোর সাহায্যেরও দরকার হত না। পা'টা যদি না মচকাতো, তাহলে আমি একাই হেঁটে চলে যেতাম।'

চন্দ্রশেখর বলল, 'তোমার পা মচকায়নি, হাড় ফেটে গেছে। এ অবস্থায় গরুর গাড়ি করে এই অন্ধকারে কখনও কি কারোর যাওয়া সম্ভব ? মেয়েমানুষের কথা বাদ দাও, কোন পুরুষমানুষই কি এরকম অবস্থায় যেতে পারে ? কেন তুমি এরকম করছ ? তুমি আমাকে বিশ্বাস না কর, ঘরে খিল দিয়ে থাক, বাইরে দশটা পাইক বসিয়ে দিচ্ছি।'

'না, না, না। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না, তোমার পাইকদের বিশ্বাস করি না, কাউকে না। ধাই-মা মারা গেছেন, এবার আমার পালা। এমন ভাবে পড়ে পড়ে আমি মরতে পারব না। আমি চলে যাব, আজই চলে যাব।'

চন্দ্রশেখর আমার দিকে ফিরে বলল, 'আতঙ্কের এমন ভয়ঙ্কর রূপ এর আগে কখনও দেখে

চিত্তপ্রসাদ ?'

আমি কিন্তু তখন অন্য কিছু দেখছিলুম। মনে মনে একটা কুৎসিত ছবি এঁকে ফেলছিলুম। আমি মোটামুটি শিক্ষিত লোক, ভদ্র সন্তান, একটা আদর্শের অনুগামী যে আদর্শের একটা প্রধান ভিত্তি হচ্ছে সচ্চরিত্রতা, কিন্তু সেই আমার মনের মধ্যে অদ্ভুত কলুষিত চিন্তা অবচেতনের ক্লেদাক্ত গহ্বর থেকে সাপের মত ফণা তুলে দাঁড়াল। সুমিত্রার গলা শুনে আমার মাথার মধ্যে কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল। আমি ভাবলুম, সুমিত্রা শুনেছি অপরূপ সুন্দরী, এমন কণ্ঠস্বর যার সে অসাধারণ না হয়ে যায় না, তার ওপর তার পা ভাঙা, অতএব প্রায় চলচ্ছক্তিহীন বলা চলে। একটা মাতাল গাড়োয়ানের গাড়িতে একে নিয়ে অন্ধকার পথ দিয়ে যাওয়ার সুযোগ একটা পুরুষ মানুষের জীবনে দুবার আসে না। চন্দ্রশেখর জাহান্নামে যাক, এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করব না এমন নির্বোধ বন্ধু আমি নই।

আমি বললুম, 'ঠিক আছে, বৌঠান যখন এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তখন আমিই না হয় ওঁকে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

চন্দ্রশেখর অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বলল, 'তুমি যাবে ? বেশ, তাই হোক। তবে সঙ্গে বসন্তকে নিয়ে যাও।'

আমার মাথায় চড়াৎ করে রক্ত উঠে গেল। কোন রকমে সামলে নিয়ে বললুম, 'কেন, বসন্ত কেন ? তুমি কি মনে কর, আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারি না ?'

চন্দ্রশেখর স্থির গলায় বলল, 'না, তা নয়। যদি তোমাদের কেউ আক্রমণ করে, তাহলে একজন পালিয়ে গিয়ে খবর দিতে পারবে। সুমিত্রা বা রামকেষ্টর পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না। আর তুমি যদি বিপদের মোকাবিলা করতে থাক, তাহলে বসন্ত পালিয়ে তো যেতে পারবে।'

আমি আবার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু সুমিত্রার গলা শুনতে পেলুম আবার, 'আপনি আপত্তি করবেন না, চিত্ত ঠাকুরপো। চলুক না আপনার বসন্ত আমাদের সঙ্গে। অসুবিধে কিচ্ছু হবে না, দেখবেন।'

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের মধ্যে অনেকগুলো চিন্তা দ্রুত খেলে গেল। এক, যদি বসন্তকে নিয়ে গোলমাল পাকাই, হয়তো যাওয়াটাই বন্ধ হয়ে যাবে। দুই, যদি বসন্ত যায়ও, ওকে তাপ্পি দিয়ে সরিয়ে দেওয়া অসুবিধে হবে না। তিন, বসন্ত যদি গোলমাল করে, ওকে না হয় খুনই করে ফেলা যাবে। পরে এসে বলব, রক্তচোষা মেরেছে।

কাজেই বললুম, 'ঠিক আছে, বসন্ত চলুক আমাদের সঙ্গে।'

চন্দ্রশেখর বলল, 'বেশ, তাহলে তৈরি হয়ে নাও। আর অস্ত্রশস্ত্র কিছু সঙ্গে আছে, না একটা বন্দুক দিয়ে দেব সঙ্গে ?'

আমি বললুম, 'আমি তৈরিই আছি। আর অস্ত্রের দরকার কি ? তোমার মত অত ভয় আমার নেই। তাছাড়া, আমি বন্দুক চালাতেই জানি না।'

চন্দ্রশেখর বলল, 'না, অস্ত্র ছাড়া আমি তোমাদের কিছুতেই যেতে দেব না। তুমি না নাও, বসন্ত নিক। ওকে ডাক, দেখি অন্তত শড়কি চালাতে জানে কিনা।'

বসন্ত ঘরে ঢুকেই একটা ঝাঁকানি দিয়ে শরীর শক্ত করে দাঁড়িয়ে গেল। চন্দ্রশেখর একটু বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞেস করল, 'কি হল বসন্ত ?'

বসন্ত একটা অস্বাভাবিক গম্ভীর গলায় বলল, 'গন্ধটা বড্ড বেশি !'

চন্দ্রশেখর আবার কি একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল। আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'তোমার ওই ন্যাকামো বন্ধ কর তো বসন্ত ! জমিদারবাবু যা প্রশ্ন করছেন, তার জবাব দাও। গন্ধ গন্ধ করে মাথা খারাপ করে দিল একেবারে।'

আমার রূঢ়তায় বসন্ত চমকে উঠল। আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি প্রশ্ন ?' বলতে বলতে দেখি ওর চোখের ওপর একটা অস্বচ্ছ ঘন তরল আবরণ নেমে এসে মণিদুটোকে আড়াল করে দিচ্ছে। দেখে রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল, ওকে চিৎকার করে গালাগালি করতে ইচ্ছে হল।

কিন্তু আমি কিছু করার আগেই চন্দ্রশেখর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি বন্দুক চালাতে জানো, বসন্ত ?'

বসন্ত মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

'শড়কি চালাতে পারো ? বা বর্শা ?'

'হ্যাঁ, পারি। শড়কির খেলায় আমি গুরু যাদবচন্দ্র পালের শিষ্য।' বলে দু'হাত জোড় করে মাথায় ঠেকাল বসন্ত।

চন্দ্রশেখর একটা দেয়াল আলমারির ভেতর থেকে একটা রুপো বাঁধান লাঠি বের করে নিয়ে এল। সেটার মাথাটা খুলতেই ভেতর থেকে প্রায় একহাত লম্বা একটা চকচকে ইস্পাতের ফলা বেরিয়ে এল। সেই প্রাণঘাতি অস্ত্রটাকে বসন্তের হাতে ধরিয়ে দিয়ে চন্দ্রশেখর জিজ্ঞেস করল, 'এটা ব্যবহার করতে পারবে ? এটা আমার ঠাকুরদাদার গুপ্তি, তাঁর বংশের মর্যাদা রেখেছে অনেকবার।'

বসন্ত গুপ্তিটা ভক্তিভরে নাড়াচাড়া করে বলল, 'হ্যাঁ, এ অস্ত্র ব্যবহার করতে পারব। কিন্তু কেন ? কোথায় ব্যবহার করতে হবে ?'

এবার আমি কথা বললুম, 'বৌঠাকুরাণী আজ এখুনি বাপের বাড়ি যাবেন। গরুর গাড়িতে যাবেন, সঙ্গে আমি থাকব। তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে।'

বসন্ত দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়ল। বলল, 'না, আপনার যাওয়া হতে পারে না, রায়বাবু। গন্ধটা আজ বড্ড বেশি আর আপনার ভেতরে...সে কথা থাক। আমি আপনাকে কিছুতেই যেতে দেব না।'

বসন্তের কথায় রাগে আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। আমি চিৎকার করে বললুম, 'তুমি আমায় যেতে দেবে না ? কোথাকার লাটসাহেব তুমি ? তুমি না যাও, ওই গুপ্তি নিয়ে আমি একাই যাব। ওটা দাও আমাকে।'

বসন্ত বিনাবাক্যব্যয়ে অস্ত্রটা আমার হাতে দিয়ে দিল, কিন্তু আমি সেটা ভাল করে ধরার আগেই চন্দ্রশেখর আমার হাত থেকে টেনে নিল সেটা। বলল, 'না, না, চিত্তপ্রসাদ, এ জিনিস চালানো বড় সহজ নয়। কায়দা জানা না থাকলে, নিজেই আহত হয়ে পড়বে, এমন কি কোন গুরুতর বিপদ কিছু ঘটে যাওয়াও অসম্ভব নয়।' তারপর বসন্তের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাও না বসন্ত, আমি বৌঠাকুরাণীকে কথা দিয়েছি যে তাঁকে আজ বাপের বাড়ি রওনা করিয়ে দেবই।'

বসন্ত ঘাড় নিচু করে বলল, 'না জমিদারবাবু, সেটা অসম্ভব।'

তখন ঘরের কোণ থেকে আবার সেই শততন্ত্রী বীণা বেজে উঠল, 'কিন্তু যেতে যে আমাকে হবেই বসন্ত। তুমি না নিয়ে গেলে আমি যাব কি করে ?'

ঘরে যে একজন তৃতীয় ব্যক্তি রয়েছেন, সেটা এতক্ষণ বসন্ত বুঝতে পারেনি। সুমিত্রার গলা শুনে পূর্ব্ববৎ ঘাড় নিচু করেই একটু অস্বস্তিভরা গলায় বলল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন মা, আমি বুঝতে পারিনি আপনি ঘরেই আছেন। তবে ছেলের বেয়াদবি মাপ করবেন, আমি কিছুতেই যাব না, রায়বাবুকে যেতে দেব না। মানে, আমি জীবিত থাকতে উনি যেতে পারবেন না।'

শুনে আমি বলতে গেলুম যে জীবিত তুমি থাকবে না, কিন্তু তার আগে সুমিত্রা বলে উঠল, 'আমার অনুরোধ তুমি রাখবে না বসন্ত ?' বলতে বলতে এসে বসন্তের সামনে দাঁড়াল।

বসন্ত যথারীতি চোখ নিচু করে বলল, 'না বৌঠাকরুণ, আমাকে মাপ করতে হবে। আজ গন্ধটা বড্ড বেশি।'

তখন সুমিত্রা একটা অদ্ভুত কাজ করল, এমন কাজ যা সে-যুগে কোন জমিদারবাড়ির বৌয়ের পক্ষে করা শুধু অদ্ভুত নয়, অসম্ভব ছিল। বসন্তের সামনে সে মুখের ঘোমটা সরিয়ে পিঠের ওপর ফেলে দিল। বলল, 'আমাব মুখের দিকে তাকাও বসন্ত। বল, আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করবে না ?'

আমি আর চন্দ্রশেখর স্তম্ভিত বিস্ময়ে সুমিত্রার দিকে চেয়ে রইলুম। সে কী আশ্চর্য রূপ ! একজন সীতার জন্যে যে লঙ্কা ধ্বংস হতে পারে, একজন হেলেনের জন্যে নিশ্চিহ্ন হতে পারে ট্রয় বা একজন দ্রৌপদীর জন্যে নির্বংশ হতে পারে কুরুরাজবংশ, তাতে আজ আর আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সেই রূপ আমার সর্বাঙ্গে বাসনার আগুন জ্বালিয়ে দিল। ইচ্ছে হল এই দেবভোগ্য সৌন্দর্যে অধিকার শুধু আমার, চন্দ্রশেখর আর বসন্ত দুজনকেই গলা টিপে মেরে একে বুকে নিয়ে অন্ধকারে পালিয়ে যাব, কেউ বাধা দিতে এলে শেষ করে দেব তাকেও।

আমার এই চিন্তার মধ্যেই সুমিত্রা আবার বীণায় ঝঙ্কার তুলল, 'তাকাও বসন্ত, আমার দিকে তাকাও।'

নতনেত্র বসন্ত আস্তে আস্তে মুখ তুলে ঘোলাটে চোখ রাখল সুমিত্রার মুখে। এক মুহূর্ত। তারপরেই মাতালের মত তীক্ষ্ণ তীব্র চিৎকার করে উঠল, 'কে তুমি ? কে তোমাকে এখানে এনেছে ?'

চন্দ্রশেখর এক পা এগিয়ে বিস্ময়-কম্পিত গলায় বলল, 'উনিই বৌঠাকুরাণী বসন্ত। উনিই বাপের বাড়ি যাবেন।'

'বাপের বাড়ি ! কোথায় বাপের বাড়ি ?'

'ওঁর বাপের বাড়ি গঙ্গাযমুনা গ্রামে। এখান থেকে দুদিনের রাস্তা।'

'গঙ্গাযমুনা গ্রামে ? দুদিনের রাস্তা ?' হা হা করে হেসে উঠল বসন্ত। 'ওর বাপের বাড়ি নরকে জমিদারবাবু, পৃথিবীর পেটের মধ্যে, পাতালে—যেখানে গনগন করে আগুন জ্বলছে। এই পিশাচীরা উঠে আসে সেখান থেকে। এরা যা কিছু ছোঁয় তাই অপবিত্র হয়, যার দিকে তাকায় সেই অপবিত্র হয়ে যায়। এদের বেসাতি লালসার, এদের তৃপ্তি মৃত্যু আর ধ্বংসে। এদের গলার মধ্যে বিষ জমে ওঠে, সেই বিষ ঢেলে একটা প্রাণ না নিলে এরা নিজেরাই সেই বিষের জ্বালায় জ্বলে মরে। তোর তো সেই বিষ ঢালার সময় হয়ে এল না শয়তানী ? এই বাড়ির মধ্যে পাইক পেয়াদায় আটকা পরে, ঠাং ভেঙে অসুবিধে হচ্ছে, নয় ? তাই ভেবেছিস বাইরে গিয়ে একজনের ওপর বিষ ঢালবি। তাই এত আকুলিবিকুলি, এত ছটফটানি ?'

আমি বসন্তের কথা শুনে রাগে দিশেহারা হয়ে সামনের দিকে ছুটে যাচ্ছিলুম ওকে মারব বলে, চন্দ্রশেখর আমাকে পেছন থেকে টেনে ধরল। নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে সুমিত্রার পায়ের দিকটা দেখাল। যেখানে একটু আগে দেখেছিলুম একজোড়া রাঙা পদ্মের মত পা, সেখানে কী দেখলুম !

বসন্ত তখনও বলে চলেছে, 'আর তা হতে দিচ্ছিনে। আমি তোকে কিছুতেই বেরুতে দেব না। তুই নিজের বিষে জ্বলে পুড়ে মরবি, তাই আমি দেখব।'

সুমিত্রার গলা শুনলুম, 'আমি মরব না রে...মরবি তুই। মর, তুই মর।'

বলতে বলতেই ফড়ফড় করে কাপড় ছেঁড়ার শব্দ হল। আমি যে বিভীষিকা দুটির দিকে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে ছিলুম তারা ঢেকে গেল কতগুলো ছেঁড়া শাড়ি জামা আর ভাঙা গয়নায়। তারপর একসঙ্গে দুটো শব্দ শুনলুম, একটা বসন্তের ক্ষীণ হাহাকার আর একটা খ্যাক করে আওয়াজ। মুখ তুলে দেখলুম, সেই ভয়ঙ্কর আকৃতি, যেটা একটু আগে ছিল পরমা রূপসী সুমিত্রা, তার বর্ণনা দেবার চেষ্টা করব না ; কারণ তাহলে আপনারা বলবেন বুড়ো বয়সে আমার কেবল ভীমরতিই ধরেনি, আমি গাঁজাও ধরেছি। কাজেই সেটা থাক। সেই ভীষণাকার একটা শরীর মৃত্যু যন্ত্রণায় আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে। তার গলায় চন্দ্রশেখরের হাতের গুপ্তিটা আমূল গাঁথা। আমি সম্মোহিতের মত দাঁড়িয়ে রইলুম আর দেখতে লাগলুম সেই অতিকায় দংষ্ট্রাকরাল বীভৎস মুখটা আকাশের দিকে উঁচু হয়ে খাবি খেতে খেতে আস্তে আস্তে স্থির হয়ে নেতিয়ে পড়ল। শেষ সংক্ষোভে শরীরটা বারকয়েক ঝাঁকানি খেলো। তারপর সব স্তব্ধ।

তবে বিস্ময়ের এখানেই শেষ ছিল না। আবার আমাদের চোখের সামনে সেই নারকীয় দুঃস্বপ্নের একটা পরিবর্তন ঘটতে লাগল। বোধ হয় পাঁচ মিনিট। তারপরেই দেখি বসন্তের রক্তহীন মৃতদেহের পাশে পড়ে আছে আর একটি নিরাবরণ শরীর, মৃত্যুযন্ত্রণায় বিকৃত হলেও সেই অসাধারণ রূপের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু, আশ্চর্য এই যে সেই রূপ দেখে এবার আমার মনের মধ্যে যে ভাব জেগে উঠল তা আতঙ্কের। মনে হল, এক্ষুনি পালিয়ে যাই। যদি ওটা আবার বেঁচে ওঠে, যদি গলায় বেঁধা গুপ্তিটা খুলে ফেলে উঠে দাঁড়ায়।

চন্দ্রশেখরের দিকে তাকিয়ে দেখি সে তখনও আতঙ্ক, অবিশ্বাস, ঘৃণা, বিস্ময় মেশান বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মৃতদেহ দুটির দিকে তাকিয়ে আছে। তখন আমার সম্বিত ফিরে এল। আমার আইনজীবির মস্তিষ্ক দ্রুত কাজ শুরু করে দিল। আমি এগিয়ে গিয়ে সুমিত্রার গলা থেকে গুপ্তিটা টেনে বের করে একটা চাদর দিয়ে দেহটা ঢেকে দিলুম। তারপর চন্দ্রশেখরের কাছে গিয়ে তাকে স্পর্শ করলুম। সঙ্গে সঙ্গে সে সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেল।

চন্দ্রশেখরের যখন জ্ঞান ফিরে এল, তখন তার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল যেন সে দীর্ঘকাল কোন দুরারোগ্য অসুখের পর সদ্য সুস্থ হয়েছে। ক্লান্ত অবসন্ন গলায় বলল, 'ব্যাপারটা যে এরকমই

কিছু সে সন্দেহ আমার বেশ অনেক দিনই হয়েছিল। মৃত্যুগুলো যে রাত্রে ঘটত সেই রাত্রিগুলোর কোন স্মৃতিই আমার থাকত না। সেই রাত্রিগুলোর দু-একদিন আগে থেকেই সুমিত্রা কেমন অদ্ভুতভাবে ছটফট করে বেড়াত। ওর গায়ে আমি কতগুলো কাটা এবং আঁচড়ের দাগ দেখেছি যেগুলোর কোন উপযুক্ত ব্যাখ্যা ও দিতে পারেনি। আর, যেদিন বাঁদরটা মারা পড়ল সেদিন ওর পায়ের হাড় ভাঙার কোন কারণই খুঁজে পাচ্ছিলুম না। বাথরুমে পড়লে ওরকম হতে পারে না। তারপর যখন ধাই-মা মারা গেলেন তখন আমি প্রায় নিঃসন্দেহ হয়েছিলুম। অন্তত এটুকু বুঝেছিলুম যে আমার বিয়ের পর থেকেই এখানে যে কাণ্ড শুরু হয়েছে তার শেকড়টা রয়েছে আমারই বাড়িতে। তবে ব্যাপারটা যে এমন ভয়ঙ্কর, তা আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। আর কিছু করতেও পারছিলুম না। কেমন যেন সম্মোহনের মধ্যে ছিলুম। তবে আমার অবচেতন বোধ হয় তৈরি হচ্ছিল। তাই আজ চোখের সামনে ওই দৃশ্য দেখেই আমার হাত গুপ্তিটা ছুঁড়ল লক্ষ্যস্থলে, কিন্তু তাকে আমার বোধশক্তি চালায়নি, চালিয়েছে আমার মগ্নচৈতন্য। আসলে আমার চিন্তা করার শক্তিই বোধ হয় চলে গিয়েছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল, 'এবার আমরা কি করব চিত্তপ্রসাদ ? পুলিশে খবর দেব ?'

আমি ততক্ষণে মনস্থির করে নিয়েছি। বললুম, 'না। পুলিশে খবর দিলে তারা এসে তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে, আমরা যা দেখেছি তার শতাংশের একাংশও বিশ্বাস করবে না। করতে পারেও না। তুমি মানুষের কল্যাণ করে খুনী বলে পরিচিত হবে। এ আমি হতে দিতে পারি না, কেবল তোমার বন্ধু বলে নয়, একজন মানুষ বলে।'

'তবে আমরা কি করব ?'

'তুমি এখুনি গাঁয়ের লোককে খবর দাও। বল, এবার রক্তচোষার শিকার দুজন, বৌঠাকুরাণী আর তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে বসন্ত। বসন্তের মৃতদেহ দেখলে সবাই নিশ্চিন্ত হবে। সুমিত্রাকে তুমি স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে দাও আর ঘোমটা আর কাপড় দিয়ে যতটা সম্ভব মুখটা ঢেকে দাও। সবাইকে বলে দাও, যত শীঘ্র সম্ভব দাহ শেষ করে যেন চলে আসে। কেউ কোন সন্দেহ করবে বলে মনে হয় না। মৃত্যুভয় তার পরেও থাকবে। থাকুক। যখন অপঘাত মৃত্যুগুলো বন্ধ হবে, তখন আতঙ্কটা আস্তে আস্তে কেটে যাবে।'

'তুমি আমার কাছে থাকবে তো।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। অন্তত যতদিন ঘনশ্যামবাবু না আসছেন।'

ঘনশ্যাম এসে নাক কুঁচকে বললেন, 'রক্তচোষা মেরেছে ? আমি এ সবে বিশ্বাস করি না। তোমরা ওকে খুন করেছ। আমি পুলিশে যাব, আমার মেয়েকে খুন করার জন্যে তোমাদের হাঁড়ির হাল করে ছাড়ব। ওই ফচকে উকিল সামনে ধরে তুমি পার পাবে না চন্দ্রশেখর।'

আমি বললুম, 'ঘনশ্যামবাবু, আপনি অনেক মামলা মোকদ্দমা লড়েছেন, আমি জানি। অতএব একথা নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে খুনের মামলা বড় বিষম বস্তু, তাতে অনেক কিছু নিয়েই টান পড়ে। সে টানা পোড়েন সইতে পারবেন তো ?'

ঘনশ্যাম রায় আমার দিকে অবজ্ঞার চোখে তাকিয়ে বললেন, 'আমার কি নিয়ে টান পড়বে, উকিল মহাশয় ?'

'আপনার স্ত্রী তো বেঁচে আছেন ? ডাক্তারী পরীক্ষায় ধরা পড়ে যদি তিনি নিঃসন্তান ? সুমিত্রা আপনার মেয়ে নয় ?'

'তাতে কি হল ? আমার মেয়ে না হলেই তাকে খুন করতে হবে ?'

'আপনার কুলপুরোহিত শুনেছি দুবার আপনার প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছিলেন। এও শুনেছি, শিশুহত্যা করতে গিয়েছিলেন তাই। কথাটা সত্যি নাকি ?'

'তাতে কি প্রমাণ হয় ?'

'কিছুই না, কিছুই না। তবে শুনেছি, সুমিত্রার এগারো বছর হওয়ার সময় থেকে আর তার বিয়ে হওয়া পর্যন্ত আপনার গাঁয়ের মুসলমান প্রজাদের ঘরে অনেকগুলো মৃত্যু হয়েছে, যেগুলোর সঙ্গে

এখানকার অপঘাত মৃত্যুগুলোর অনেক মিল ! তারা নাকি শপথ করেছে যে এ মৃত্যুগুলোর জন্যে যে বা যা কিছুই দায়ী হোক না কেন, জান দিয়েও তাবা তাকে শেষ করে ছাড়বে। এখন কেউ যদি তাদের গিয়ে এখানকার মৃত্যুগুলোর কথা বলে, তাহলে তাবা কি ভাববে বলুন তো ?'

ঘনশ্যাম গুম হয়ে গেলেন। বললেন, 'কি ভাববে ?'

'ভাববে, আপনি জেনে শুনে তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন। তারা ভাববে, আপনি ইচ্ছাকৃত নরহত্যাকারী, তাদের আত্মীয় পরিজন পরিবারের সর্বনাশের মূল কাবণ। তখন, তাদেব বিচারে আপনার কি শাস্তি হবে, তা ভেবে দেখেছেন ?'

'তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ ?'

'হ্যাঁ। আপনি অতি জঘন্য অপরাধী। আপনাকে ভয় দেখানো নীতিগত অধিকার আমাব আছে। আপনার দুর্ধর্ষ লাঠিয়ালরা আপনার ওই মুসলমান প্রজারাই। আপনি তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এখন এসেছেন চন্দ্রশেখরের হাঁড়ির হাল করতে।'

'তুমি এত কথা জানলে কোত্থেকে ?'

'ঘনশ্যামবাবু, আমি ফচকে উকিল হতে পারি, কিন্তু নির্বোধ নই। আপনাকে চিনতে আমাব একটুও ভুল হয়নি এবং আপনি যে এরকমই একটা কাণ্ড করবেন, তা আগে ভাগে বুঝে নিয়ে, সুমিত্রার মৃত্যুর পরদিনই আমি আপনার গ্রামে চলে গিয়েছিলুম। সেখান থেকে সব খববই নিয়ে এসেছি। আর খানিকটা ছেড়েছি আন্দাজে। তবে আমার ভুল হয়নি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘনশ্যাম বললেন, 'না, তা হয়নি। ঠিক আছে। যা কবেছ বেশ কবেছ। আমি তাহলে এখন চলি।'

আমি বললুম, 'দাঁড়ান। সুমিত্রা আপনার নিজের মেয়ে নয় তাতে সন্দেহ নেই, কাব মেয়ে সে ?'

ঘনশ্যাম বললেন 'আমি তার পরিচয় জানি না। আজ থেকে বছব কুড়ি আগে একদিন একটা ভবঘুরে এসেছিল আমাদের গাঁয়ে তার ভেল্কি দেখাতে। অতি অদ্ভুত ছিল তাব খেলা। কিন্তু তার খেলার চেয়েও যেটা আমায় সবচেয়ে অবাক করেছিল তা হচ্ছে তার খেলার চুবড়ির পাশে ছেঁড়া ন্যাকড়ায় শোয়ান একটি প্রায় সদ্যোজাত শিশু। অবাক করেছিল, কারণ লোকটি ছিল অবিশ্বাস্য রকমের কুৎসিত, এত কদাকার যে তাকে দেখলেই ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে আর মেয়েটি ছিল তেমনি সুন্দর, ফুটফুটে। আমার নিজের সন্তান ছিল না। তাই লোকটিকে ডেকে বাচ্চাটা কিনে নিতে চাইলুম। পঞ্চাশ টাকায় রফা হয়েছিল।

'পরে বাচ্চাটার স্বরূপ বুঝতে পারি। তাকে দু'বার মারতেও গিয়েছিলুম। কিন্তু কেমন যেন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলুম যে শেষ মুহূর্তে আর পারিনি।'

চন্দ্রশেখর কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে আপনি তাঁর বিয়ে দিলেন কেন ? আমি তো আপনার কোন ক্ষতি করিনি। আমার এমন সর্বনাশটা করলেন কেন ?'

ঘনশ্যাম কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'ভেবেছিলুম, বিয়ে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন দেখছি ভুল করেছিলুম। তা সে যাক তো। সব তো চুকে বুকে গেছে। এখন আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

চন্দ্রশেখর ক্লান্ত গলায় বলল, 'হবে কি ? বসন্ত যা বলে গেছে তা যদি ঠিক হয়, তবে তো এরা আবার উঠে আসবে আর আপনার মত লোক যদি পায়, তবে তাকে আশ্রয় করে আবার এরা নিয়ে আসবে কালরাত্রি। তবে বসন্তের মত লোকও নিশ্চয়ই থাকবে যারা কেবল চোখ দিয়েই দেখবে না, মন দিয়েও দেখবে। সেটাই যা ভরসা। তা না হলে এই সুন্দর পৃথিবীটা তো কবেই বিষের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যেত।'

চোখের বাহিরে

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

বুড়ীদের ওই এক দোষ, সব সময় বকবক করবেই—সায় দেবার মত কাছে কেউ থাক আর নাই থাক।

মণিপিসিকে খানিকটা সেইজন্যেই এ বাড়ির কেউ পছন্দ করে না, আমি ছাড়া। আমার নিজেরও মাঝে মাঝে বিরক্তি ধরে যায়, যেমন এখন। কিন্তু মণিপিসিকে আমি ভালবাসি। গুরুজনদের মধ্যে একমাত্র মণিপিসিই জীবিত বলে নয়, মণিপিসি আমায় সত্যি করে স্নেহ করেন বলেই। আমার বাবার নিজের বোন অবশ্য ছিল না, মণিপিসি বাবার খুড়তুতো বোন, বাবার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়। কিন্তু মানুষ হয়েছে সব একসঙ্গে—একই একান্নবর্তী পরিবারে। একান্নবর্তী পরিবার কবে ভেঙেচুরে গিয়েছে, সুতরাং আমার সম্পর্কিত পিসি সংসারের অন্ন ধ্বংস করবেন—সুরমা স্বাভাবিক ভাবেই সেটা পছন্দ করেনি। বাধা দিতে পারেনি আমার জন্যেই, কিন্তু ওর বিরক্তিও আমি চাপা দিতে পারিনি।

আমার একমাত্র মেয়ে মোম যে ওর দিদাকে খুব অপছন্দ করে তা নয়, অফিস থেকে ফিরে অনেকদিনই আমি দেখতে পেয়েছি মোম পিসির কোলের কাছ ঘেঁষে বসে গল্প শুনছে। কিন্তু ওর পছন্দসই কাজ না হলেই দিদার ওপর ও চোটপাট করে, এবং বলা বাহুল্য মায়ের কাছ থেকে সে ব্যাপারে কোন বাধা পায় না।

মণিপিসিকে বলতে গেলে আমিই আড়াল করে রেখেছি। বাবা নেই মা নেই—ওঁদের স্মৃতি জাগিয়ে রাখার মতো একটিমাত্র আপনজন এ পৃথিবীতে আমার আছে, মণিপিসি। সব ভাল মণিপিসির, কেবল এই সন্ধের সময়টুকু ছাড়া। একবাটি মুড়ি নিয়ে এই সময় বসবেন মণিপিসি প্রায়ান্ধকার বারান্দার একটা কোণে। ওপরে তিনটে আর নিচে চারটে—সাকুল্যে এই সাতটা দাঁত নিয়ে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করে যাবেন মুড়িগুলোকে কায়দা করবার। আসলে মুড়ি খাওয়াটাও যেন পিসির আসল উদ্দেশ্য নয়, এই সময়টা কেমন ঝিমুনি ধরে পিসির। এই দৃশ্যটা ছুটির দিনে আমি অনেকবার দেখেছি। মুড়ির বাটি নিচে নামানো। চোয়াল নড়ছে মণিপিসির। শরীর এলানো।

চোখ বোজা নয়, সামনে চেয়ে আছেন--কিন্তু চোখের দিকে তাকালে মনে হবে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আকাশের তারা দেখছি। আর ওই বিড়বিড় করে চলেছেন একটানা- যত সব অর্থহীন কথাবার্তা। বেশির ভাগ কথাই আপন মনে এবং এইরকম :

'কে রে, বুড়ো নাকি ! কেমন আছিস বাবা ? কেন যে কষ্ট করে আসিস আমি তো ভালোই আছি ! খোকা আমায় খুব ভালবাসে।'

অথবা এইরকম :

'না না, ভয় নেই বিভা- তোমার সংসার আমি মাথায় করে রেখেছি। বৌমার কথা বলছো ? না, ওই মুখেই যা বলে--মনে মনে আমাকে বেশ ভক্তি করে ও।'

বুড়ো আমার বাবার নাম, পিসি ওই নামেই বাবাকে ডাকতেন। বিভা আমার মার নাম। বাবা মারা গেছেন আমি যে বছর কলেজে ভর্তি হই সেই বছর, আর মা মারা যান বছর পাঁচেক আগে। মণিপিসি ভুল বকছেন মনে করা শক্ত, কারণ এসব তিনি জ্বর জারি হলে বলেন না, সুস্থ অবস্থাতেই বলেন। দ্বিতীয়ত, ঘুমের ঘোরে না ঘুমিয়ে স্বপ্নটপ্ন দেখে এসব বলতে আমি পিসিকে কখনো শুনিনি। এসব শুরু করলে সুরমার বিরক্তি অত্যন্ত বেড়ে যায়, সৌজন্যের আবরণ না রেখে ওঁকে শুনিয়ে ও প্রায়ই বলে, 'বুড়ো হলে মানুষের ভীমরতি হয় !'

মোম প্রথম প্রথম মজা পেত, বলত, 'ও দিদু, তুমি যাত্রার পার্ট বলছো নাকি !' পরে অবশ্য জ্বালাতন করে পিসির ভুল বকা বন্ধ করার আগ্রহই ওর বেশি দেখতে পাই।

আমি নিজেও পিসিকে বারণ করেছি, বলেছি, 'সন্ধেবেলা ওরকম আবোলতাবোল বকে তুমি কী আনন্দ পাও বল দেখি !'

মণিপিসি একগাল হেসে বলেছেন, 'ওমা, আবোলতাবোল কী রে, ওরা এলে আমি চুপ করে থাকব ?'

'ওরা মানে ? বাবা মা তোমার কাছে আসে বলতে চাও ?'

'না এলে কেউ ওদের সঙ্গে কথা বলে ?'

'আর কে কে আসে ?'

'আসে—কখনো সখনো তোর জ্যেঠাকেও দেখতে পাই, ক্বচিৎ কখনো পিসেমশাইও আসে।'

'আসে তো আমরা দেখতে পাই না কেন ?'

'সে তো আমি জানি না বাবা।'

'দেখো পিসিমা--' আমি পিসিকে প্রথম দিকে বেশ কয়েকবার এ কথা বলেছি, 'এসব তোমার মনের ভুল। এরকম করে আপন মনে কথা বললে লোকে তোমায় পাগল বলবে।'

'তোর মেয়ে তাই মনে করে বটে !'

'সবাই তাই মনে করবে। এসব পাগলামি তুমি আর করো না।'

ওই বলাই সার। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছি আমি। বুড়ীদের একটু বেশি বকার দোষ থাকে, মণিপিসি আপন মনে এরকম বাজে বকে, এই ভেবেই ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিয়েছি।

কিন্তু সব সময় তো আর মানুষের মনমেজাজ ভাল থাকে না। যেমন, এখন। বৃষ্টি বাদলা দেখে চারটের মধ্যে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছি। কিন্তু তার পর থেকে আকাশ যেন ভেঙে পড়েছে ! মুষলধারে বৃষ্টি চলছে তো চলছেই—আটটা বাজে, ছাড়া দূরে থাক কমারও কোন লক্ষণ নেই। অথচ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার সেনসাহেবের মেয়ের বিয়ে, এদের যদি নিয়ে নাও যাই, নিজে তো একবার হাজির হতেই হবে। সেনসাহেবের বাড়িও কাছেপিঠে নয়, দমদমের ওদিকে জয়পুর রোড়ে। নিজের গাড়ি আছে বটে, কিন্তু ভবানীপুর থেকে দমদম যাওয়া এই দুর্যোগে কি চাট্টিখানি কথা ! যাওয়া হবে না বলে মোম যখন গাল ফুলিয়ে বসে আছে, সুরমা ওকে জামাকাপড় ছাড়িয়ে একটা বোনা নিয়ে বসেছে, ঠিক সেই সময়েই মণিপিসি শুরু করেছেন তাঁর বকুনি।

সুরমার ভুরু কুঁচকে উঠেছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। হতেই পারে, কারণ বৃষ্টির জন্যে বারান্দায় নয়—এই ঘরেই বসেছেন আজ। আমার নিজের মনের অবস্থাও তো তেমন ভালো নয়। বেশ চড়া মেজাজেই বললাম, 'মণিপিসি, তুমি একটু থামবে ?'

প্রথমে যেন শুনতেই পেলেন না, দ্বিতীয়বার কথাটা বলতে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'বলছিস

কিছু ?'

'হ্যাঁ, বলছি ! রোজই তো চলে পাগলামি—আজ অন্তত একটু থামাও ।'

মুখ ঘুরিয়ে সামনের দেওয়ালের দিকে তাকালেন, বললেন, 'তুই আজ যা বুড়ো, খোকা রাগ করছে। অ্যাঁ, কি বললি—যেতে বারণ করব ? বারণ করলে কি আর শুনবে রে—বারণ তো আগেই করেছি। কোন সাহেবের মেয়ের বিয়ে যেন আজ—'

বিরক্তিকর ! মণিপিসির দিকে না তাকিয়ে সুরমাকে আমি বলেছি, বৃষ্টি কমার কোন লক্ষণ নেই। আমি ঘুরেই আসছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

গ্যারেজের সামনেটাও পায়ের পাতা ডোবানো জল। ছাতাটা গ্যারেজের ভেতরেই ঝুলিয়ে রেখে সন্তর্পণে বার করলাম গাড়ি। বাইরের ফটক বন্ধ করার জন্যে একবার বেরুতে হল। তাতেই অর্ধেক ভিজে গেলাম প্রায়।

সবে স্টার্ট দিয়েছি, লোডশেডিং হয়ে গেল !

অসহ্য ! বিরক্তিতে আমার মাথার শিরা দপদপ করতে লাগল। বিপদ যখন আসে সব দিক দিয়েই আসে। ব্যাটারি অবশ্য ফুল চার্জ করা আছে—কিন্তু ঘন বৃষ্টির দেওয়াল ফুঁড়ে আলো আর যাচ্ছে কতদূর ! সামনে আসা গাড়িগুলোও হাত বিশেকের মধ্যে না এসে গেলে তাদের আলো দেখতে পাচ্ছি না। এইভাবে আমি কতক্ষণে পৌঁছবো দমদম !

মোটামুটি মাথা ঠাণ্ডা রেখেই চালাচ্ছিলাম, স্পীডও কম রেখেছিলাম যতটা সম্ভব। ঝামেলাটা হয়ে গেল থিয়েটার রোডের কাছাকাছি এসে। ডানদিকের রাস্তা থেকে সবেগে বেরিয়ে আসা একটা মোটর-সাইকেলকে বাঁচাতে গিয়ে মুখোমুখি পড়ে গেলাম এগিয়ে আসা একটা বাসের।

কী যে হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে কিছুই বুঝতে পারলাম না। দুটো হেডলাইটের তীব্র চোখ-ঝলসানো আলো, সজোরে ব্রেক চাপার বীভৎস শব্দ, মাথায় একটা তীব্র যন্ত্রণা—তারপরই সবকিছু অন্ধকার !

আস্তে আস্তে জ্ঞান যখন ফিরে এল, কোথায় আছি বুঝতেই আমার খানিকটা সময় কেটে গেল।

বুঝতে পারলাম, গাড়িতেই আছি। কিন্তু গাড়িটা এখন সোজা নেই—বেশ খানিকটা কাত হয়ে রয়েছে। রাস্তার ওপরও ঠিক নেই, একটা ধারে টাল খেয়ে পড়েছে।

বেরুলাম কোনরকম করে। মাথায় যন্ত্রণাটা এখন টের পাচ্ছি না। এত বড় দুর্ঘটনার পর হাতে-পায়ে ব্যথা-বেদনাও তেমন কিছু নেই। এখন হয়তো বুঝতে পারছি না, পরে জানান দেবে !

বৃষ্টি তখনও হয়ে চলেছে সমান তালে। রাস্তায় গাড়িও চলছে এখনও, তবে সংখ্যায় কম। ক'টা বাজে বুঝতে পারছি না, হাতের ঘড়িটা আটটা পঁচিশ হয়ে বন্ধ হয়ে রয়েছে।

গাড়ির অবস্থা দেখে কান্না পেলো। সামনের বনেট তুবড়ে যা তা অবস্থা। এঞ্জিনটা প্রায় বিধ্বস্ত বলা চলে। এ গাড়ি যে চলবে না সেটা বোঝা এমন কিছু শক্ত নয়। পোশাকের অবস্থা অন্ধকারে ভাল টের পাচ্ছি না, কিন্তু এ অবস্থায় কোথাও যাওয়া যায় না। বাড়ি ফিরতে হবে।

গাড়ির মায়া ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। বাসের আশা এখন না করাই ভাল। রাত যতই হোক, পথচারী প্রায় নেই। ট্যাক্সিও দেখা যাচ্ছে কদাচিৎ, এবং কোনটাই খালি নয়। সুতরাং হাঁটা ছাড়া পথ নেই।

কী করে যে এলাম এতটা রাস্তা সে-কথা না বলাই ভাল। গেট খুললাম নিজের হাতে। গ্যারেজের দরজা তখনও হাঁ হয়ে আছে। বারান্দায় উঠে নিশ্চিন্ত হলাম। রাত বেশি হয়নি ! জানলা দিয়ে বাইরের ঘরের ভেতরটা দেখা যায়। যেমন দেখে গিয়েছিলাম, ঠিক তেমনিই রয়েছে অবস্থাটা—মণিপিসি মুড়ির বাটি নিয়ে ঝিমুচ্ছেন। সুরমা উল বুনছে। মোম একটা কমিকস পড়ছে উপুড় হয়ে।

সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে হাসি পেল আমার। কী বিরাট দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গিয়েছি ওরা কেউ জানে না। এরকম মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে প্রাণ নিয়ে ফেরাটাই যেখানে সংশয়, সেখানে রাস্তায় পড়ে থাকা নয়, হাসপাতাল নয়, সোজা বাড়িতে ফিরে এসেছি আমি !

কলিংবেলে হাত দিলাম।

আশ্চর্য, সুরমার কোন ভাবান্তর নেই। শুনতে পাচ্ছে না নাকি ! কিন্তু কলিংবেল তো ঠিকই

আছে ! বিকেলেও অফিস থেকে ফিরে কোন গণ্ডগোল দেখিনি।

আবার টিপলাম। আবার।

ব্যাপারটা কী ! বিরক্ত হয়ে দরজায় ধাক্কা মারলাম। দরজা এমনিই খুলে গেল।

রাগ হলো সুরমার ওপর। রাত হয়েছে, ফিরতে আমাব কত দেবি হত ঠিক নেই কিছু ! দবজা খুলে রাখে এমনি করে !

ঘরে ঢুকতেই একরাশ উজ্জ্বল আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর।

একী ! নিজের অবস্থা দেখে নিজেই ভয় পেয়ে গেলাম আমি।

সমস্ত জামাকাপড় রক্তে আর কাদায় মাখামাখি। এত বৃষ্টিতেও সেসব ধুয়ে যায়নি ! কী করে যে এলাম এতটা রাস্তা সেটাই আশ্চর্য।

কিন্তু এটা কেমন ব্যাপার ! ঘরে ঢুকে পড়েছি, তবু সুবমার খেয়াল নেই ! এত মন দিয়ে উল বোনার কী থাকতে পারে !

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলছিল আমার। কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'সুবমা, ব্যাপার কী বল তো !'

সুরমা আগের মতই নির্বিকার। আমার গলা ওর কানে গিয়েছে বলে মনে হল না। মোম যখন বই পড়ে তখন মন দিয়েই পড়ে। কিন্তু আমি ঘরের মধ্যে চলে এসেছি ডাকছি, তাও শুনতে পাবে না !

চকিতে একটা সম্ভাবনা আমার মাথায় বিদ্যুতের মত খেলে গেল।

তাহলে কি, তাহলে কি আমি—

ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'সুবমা, আমি এসেছি দেখো, আমি যেতে পারিনি ওখানে—'

সুরমা একটা হাই তুলে উলকাঁটা সরিয়ে রাখল। মোমের দিকে ফিবে বলল, 'মোম, খাবি এখন ?'

মোম মুখ তুলল। এবার আমার মুখোমুখি। কিন্তু ঘরে কাউকে দেখতে পাচ্ছে বলে আমার মনে হল না। কমিকসটা আবার টেনে নিয়ে বলল, 'বাপি আসুক মা !'

ভয়ের একটা হিমশীতল স্রোত আমার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। পাগলের মত গলা ফাটিয়ে আমি আবার বলে উঠলাম, 'সুরমা, মোম,—তোমরা দেখো, আমি এখানে—এই ঘরে ! আমি ফিরে এসেছি, আমি ফিরে এসেছি—'

আমার বিহ্বল চোখের সামনে মোম কমিকসে আবার মুখ গুঁজে দিল, সুরমা উলকাঁটা টেনে নিল ফের। কেবল মণিপিসি মুখ তুলে চাইলেন আমার দিকে। যন্ত্রণায় পিসির মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, টেনে টেনে বলতে লাগলেন, যেমন প্রতি সন্ধ্যায় বলেন, 'খোকা রে, এত করে বারণ করলেন ওরা, তবু গেলি ! কপাল আমার—সবাই তোরা এমনি করে আমার সামনে থেকে চলে যাবি রে ! আয় বাবা, বোস, কী করে এমন হল বল দেখি—'

পাশবিক

অনীশ দেব

এ জাতীয় দৃশ্যের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

মনসুখ ভাটিয়ার আমন্ত্রণ পেয়ে এসেছি। সুতরাং তাঁর দেখা পাওয়াটা প্রত্যাশিত। কিন্তু ভাবিনি, একটা প্রকাণ্ড হিংস্র জন্তু নিয়ে ভাটিয়া সাহেব এরকম বিচিত্রভাবে ব্যস্ত থাকবেন। আর ব্যস্ত থাকার জন্যই আমাকে প্রথমটা তিনি খেয়াল করেননি। হাঁটুগেড়ে বসে একটা বড় মাপের লোহার ফাইল নিয়ে একান্ত মনোযোগে ঘষে চলেছেন জন্তুটার ঝকঝকে ধারালো দাঁতগুলো—একটার পর একটা। বাছুরের আকৃতির লোমশ কালো প্রাণীটা অদ্ভুতভাবে দাঁত খিঁচিয়ে পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দু-সারি নৃশংস দাঁত যেন সাদা করাতের ফলা। দাঁতের ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়ছে আঠালো লালা। আর শোনা যাচ্ছে একটা চাপা ক্রুর গোঙানি। মনসুখ ভাটিয়া কিন্তু অত্যন্ত নির্বিকার মুখে নিজের কাজ করে চলেছেন। যেন কোন ছোট ছেলেকে ভোরবেলা দাঁত মাজিয়ে দিচ্ছেন বুরুশ দিয়ে।

অচেনা আগন্তুক দেখে চাপা ক্রুর গোঙানি পরিণত হল সাবধানী গর্জনে। এবং তখনই মনসুখ আমার উপস্থিতি টের পেলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখেই ফাইল রেখে ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আসুন মানিজারবাবু, গরীবখানায় পায়ের ধুলো দিতে আজ্ঞা হোক।

প্রাণীটার মুখের চেহারা এখন স্বাভাবিক হতেই সেটাকে কুকুর বলে চিনতে পারলাম। তবে আকার ও প্রকার দেখে কুকুরের বদলে বাঘের কথাটাই আগে মনে পড়ে। লাল জিভটা বেরিয়ে আছে দাঁতের ফাঁক দিয়ে। তা থেকে ঘাম ঝরছে।

ভাটিয়া সাহেব কুকুরটার পাশেই একটা চেয়ারে বসলেন। ডান হাতটা ঘোরাফেরা করতে লাগল ওটার লোমশ কালো পিঠে। ভাটিয়া সাহেবের গায়ের যা রং, তাতে কুকুরের পিঠে রাখা তার ডান হাতটা যেন সরাসরি অদৃশ্য হয়ে গেছে। এই প্রবল শীতেও পরনে শুধুমাত্র ধোপদুরস্ত প'জামা ও পাঞ্জাবি। গা থেকে ভুরভুর করে বিদেশী সুবাস ভেসে আসছে। গলায় মোটা সোনার চেন আর

...কটা রং-বেরঙের পুঁতির মালা। মালার লকেট হল বহুদিন ধরে শুকিয়ে রাখা একটা কালচে ...—মানুষের নখ।

আমি তাঁর মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসলাম।

মনসুখ ভাটিয়ার গরীবখানায় কোন আয়োজনেরই কমতি নেই। সামনের টেবিলে হুইস্কির খোলা বোতলও পেলাম। গেলাসে পানীয়ের পরিমাণ প্রায় আধাআধি। ঘরের দেওয়াল আধুনিক পদ্ধতিতে ডিসটেম্পার করা। দরজা-জানলায় রঙিন কাপড়ের পর্দা। মাথার ওপরে ঝুলছে অপ্রয়োজনীয় ঝাড়লণ্ঠন। অপ্রয়োজনীয়, কারণ পঁচিশ বাই পঁচিশ ঘরে আরও অন্তত গোটা তিনেক উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। ঘরের মোজেইক করা চকচকে মেঝে সেই আলোর পঞ্চাশ ভাগ ফিরিয়ে দিচ্ছে প্রতিফলনের মাধ্যমে।

মানিজারবাবু, নোতুন জায়গা কেমন লাগছে ?

মনসুখ ভাটিয়ার এই প্রশ্নটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, মাত্র কয়েক সপ্তাহ হল আমি স্থানীয় কোলিয়ারী অফিসে অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার হয়ে এসেছি। এর মধ্যেই জানতে পেরেছি, মনসুখ ভাটিয়া হলেন কয়লার চোরাকারবারীদের চাঁই। এবং শেষতম কারণ, আজ রাতে তিনি আমাকে ...ডতে নেমন্তন্ন করে ডেকে পাঠিয়েছেন। উদ্দেশ্য এখনও জানি না, তবে শিগগিরই হয়তো জানতে পারব।

মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে বলে উঠলাম, জায়গা তো ভালই লাগছে, তবে কাজের চাপ খুব বেশি।

ভাটিয়া সাহেব হাসলেন। সে হাসিতে কোন শব্দ নেই, শুধু দাঁতের ঝিলিক আর রোগা কালো শরীরের ঝাঁকুনি। অবশেষে একসময় নিঃশব্দ হাসি থামিয়ে বললেন, কাজের চাপ তো আপনি খুদ জাব করে ঘাড়ে লিচ্ছেন। নিজেও পড়েশান হচ্ছেন, হাজারো কারবারীকেও পড়েশান করছেন

বক্তব্যের অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। আর তার সঙ্গে হুমকিরও কি সামান্য ইশারা নেই ?

মোটামুটি ভাবে আমার কাজ হল খনি থেকে তোলা কয়লা দিনের শেষে ওজন করে ট্রাকে চাপিয়ে হিসেব মত বিভিন্ন গোডাউনে চালান দেওয়া। আমার মত আরও অনেক অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার একই কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। প্রথম দিন কাজ বুঝে নেওয়ার পর একজন ব্যাচিলার এ এম. নরেন সাহা আমার খুব অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছিল। তারপর তিন চার দিনের মধ্যেই সে যেন আমার বন্ধু হয়ে গেল। একদিন সন্ধের পর সে আমাকে প্রায় জোর করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল এক দহাতী ভাটিখানায়। আমাকে অনেক পীড়াপীড়ি করে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে নিজেই তুলে নিয়েছিল দেশী মদের বোতল আর ভাঁড়। চুমুক লাগাতে লাগাতে নরেন সাহা অনেক কথাই বলেছে।

মিস্টার রায়, আপনি এখানে নতুন লোক। একটু সামলে চলবেন।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছি, কেন ? এ কোলিয়ারী কি অন্য কোলিয়ারীর চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু ?

ফোলা ফোলা দুটো শ্যামবর্ণ হাত নিজের হাঁটুর ওপর রেখেছে নরেন সাহা। লক্ষ্য করলাম, তার ডান হাতে পাশাপাশি তিনটে আংটি। রুপোয় বাঁধানো পলা, গোমেদ এবং নীলা। বুঝলাম, বয়েসের কাঠা চল্লিশ পেরোলেও নরেন সাহা ঘোর জ্যোতিষ-ভক্ত। মুখের ওপর একবার হাত বুলিয়ে সে জবাব দিল, হ্যাঁ, বিপজ্জনক। কারণ অন্য কোলিয়ারীতে তো আর মনসুখ ভাটিয়া নেই !

এরপর বাড়ি ফেরার পথে আরও শুনলাম, চোরাপথে কয়লা কিভাবে লোপাট হয়। কারা সেই চোরা-ব্যবসার নায়ক। সবাই তাদের চেনে, কিন্তু কিছু বলতে সাহস পায় না।

কেন, পুলিশ কোন স্টেপ নেয় না ?

পুলিশ !—নরেন সাহা গলা ফাটিয়ে হেসে উঠেছে, আরে ভায়া, নেহাৎ কিছু লোককে উর্দী পরিয়ে চাকরি দিতে হবে, তাই দেওয়া। ও বেচারীরা এসব ঝামেলায় মাথা গলালে মাথা লোপাট হয়ে যাবে।

শীতের হাওয়া ছুঁচের মত এসে বিঁধেছে গায়ে। দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চোখে পড়ছে কিছু আলোর শিখা। হাইডেল পাওয়ার স্টেশনের বিজলী এখনও সব রাস্তাঘাটে জাঁকিয়ে বসতে পারেনি। চাঁদের আলোয় পাথরের টুকরো ছড়ানো মেঠো পথ ধরে আমি আর নরেন সাহা এগিয়ে চলেছি কোয়ার্টারের দিকে। রাস্তার একদিকে এবড়ো-খেবড়ো পাথরের ঢিবি। আর কোথাও কোথাও শাল-শিরীষ-শিশু গাছের হালকা জটলা। এদিকেই কিছুটা এগিয়ে খোলা জায়গায় ওপেন-কাস্ট মাইনিং চলছে।

ঘনঘন ব্লাস্টিং করা হয় বলে শুনেছি।

নরেন সাহা তার একটা ভারী হাত আমার কাঁধে রাখল। বলল, মনসুখ ভাটিয়া এ অঞ্চলে এসেছে মাত্র বছর পাঁচেক, তার মধ্যে গাড়ি-বাড়ি সব হাঁকিয়ে বসে আছে। গত পাঁচ বছরে ও য করেছে, পুরোন ঘাগু কারবারীরা বিশ বছরেও তা পারেনি। এখন চোরাকারবারের সিংহভাগটাই বলতে গেলে ওর হাতের মুঠোয়। সব ক'টা ম্যানেজার, অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার ভাটিয়ার কাছ থেকে ঘুষ খায়। কারণ ঘুষ না খেলে জান খেতে হবে। তবে এ শর্মা এখনও মাথা নোয়ায়নি।—নিজের বুকে আঙুল ঠুকলো নরেন সাহা।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই এক রক্ত হিম করা চিৎকার শীতের বাতাস কাঁপিয়ে দিল। প্রতিটি পাথরের স্তূপ সেই চিৎকারের প্রতিধ্বনি তুলে তাকে আরও ছমছমে করে তুলল। আকাশে, বাতাসে এমন কি গাছের পাতায় পর্যন্ত ওই হিংস্র চিৎকার যেন থরথর করে কাঁপছে।

দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিন্তু সে এক মুহূর্ত। পরক্ষণেই নরেন সাহা আমার হাত ধরে টান মারল প্রচণ্ড ঝটকায়।

শিগগির মিস্টার রায়! শিগগির কোয়ার্টারে চলুন!

আমরা ছুটতে শুরু করলাম অন্ধের মত। অচেনা জায়গায় এবড়ো-খেবড়ো জমির ওপর দিয়ে ছুটতে খুবই অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু গতি হ্রাস করার উপায় নেই। নরেন সাহাও তার স্থূলকায় শরীর নিয়ে প্রাণপণে ছুটে চলেছে। আমাদের ঘন নিশ্বাসের ফোঁস ফোঁস শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

ছুটন্ত অবস্থাতেই সেই চিৎকার দ্বিতীয়বার শুনতে পেলাম। যেন কোন অপার্থিব আত্মা মুক্তি চাইছে নরকের বন্দীশালা থেকে।

দূরে কোয়ার্টারের টিমটিমে বিজলীবাতি নজরে পড়ল। পা ক্রমে অসম্ভব ভারী হয়ে আসছে। নরেন সাহা কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে, কিন্তু ছুটে আসছে সমান তালে।

প্রথমে নরেন সাহার কোয়ার্টার। ফলে তারই দরজায় এসে দুজন হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। কাঁপা হাতে দরজার তালা খুলল নরেন সাহা। তারপর দুজনে ভেতরে ঢুকতেই দরজায় খিল এঁটে দিল। আমরা বিছানার ওপর বসে হাঁপাতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ পর শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হলে নরেন সাহা বলল, খুব কপালজোরে বেঁচে গেছি।

ওটা কিসের চিৎকার?—আমি উত্তেজিত ভাবে প্রশ্ন করলাম।

মনসুখ ভাটিয়ার কুকুর। তবে লোকমুখে তার কীর্তিকলাপ যা শুনি, তাতে কালো নেকড়ে বললেও ভুল হয় না। কুকুরটা নাকি রাত-বিবেতে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। সাঁওতাল কামিনদের ধারণা, ওটা নাকি অপদেবতা। ওটার চলাফেরা কেউ টের পায় না, শুধু মাঝে মাঝে শোনা যায় ওই রক্ত হিম করা চিৎকার। এক কাজ করুন, আপনি আজকের রাতটা আমার কোয়ার্টারেই থেকে যান—

যুক্তিসঙ্গত ভেবেই নরেন সাহার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম।

সে রাতে আরো অনেক খবর জানতে পেরেছি নরেন সাহার কাছ থেকে। খনি থেকে তোলা কয়লা ওজন হয়ে চালান যাবার পথেই নাকি চুরিটা বেশি হয়। কখনো কখনো খালি ট্রাক ওজন করাবার সময় চোরাকারবারীদের টাকা খাওয়া কুলি-কামিন ম্যানেজার ট্রাকের ওপর বড় বড় পাথরের চাঁই চাপিয়ে ওজন নেয়। পরে ওই ওজনের কয়লা সরিয়ে ফেলা হয় ট্রাক থেকে। নরেন সাহা বহুবার আমন্ত্রিত হয়েছে মনসুখ ভাটিয়ার কাছ থেকে। কারণ সে কঠোর চোখে নজর রাখে ওজনদারির সময়। কোন গরমিল বা বেচাল দেখলেই রিপোর্ট করে অফিসে। এবং সোচ্চারে নিজের সততা ও সাফল্যের কথা জাহির করে বেড়ায়। ভাটিয়া সাহেবের আমন্ত্রণে নির্ভয়ে সাড়া দিয়েছে নরেন সাহা, কিন্তু তার অন্যায় প্রস্তাবে কখনও রাজী হয়নি। সেই কারণেই গত পাঁচ বছর ধরে তার প্রমোশন বন্ধ হয়ে আছে। ভাটিয়া সাহেব ওপরওয়ালাদের মহলে কলকাঠি নেড়ে রেখেছেন। তবুও সে হার স্বীকার করেনি।

ঘরের আলো জ্বেলেই আমরা কথাবার্তা বলছিলাম। রাত প্রায় এগারোটা হলেও আমাদের কারো চোখেই ঘুম নামেনি। আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে কোলিয়ারীর রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনছি আর মনে মনে নরেন সাহার তারিফ করছি। সাহস আছে বটে লোকটার। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালাম, নিজে

আদর্শ বজায় রাখার মত মনের জোর যেন আমার থাকে।

এমন সময় হঠাৎই আলো নিভে গেল। বুঝলাম লোডশেডিং এই দূর জেলাতেও তার রাজত্ব বিস্তার করে ফেলেছে। পরিবেশের জমাট নিস্তব্ধতা নতুন করে আবার অনুভব করলাম। অন্ধকারের মধ্যেই নরেন সাহা বলে উঠল, জানেন, দিন পনেরো আগে একজন মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার উধাও হয়ে গেছে ? আর মাস দুয়েক আগে রোপওয়ে ছিঁড়ে পড়ে একজন চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট মারা যায়।

এখানে রোপওয়েতে করে কয়লা আনা-নেওয়া করা হয়। মাথার ওপর দিয়ে রোপওয়ে চলে। লোহার ক্যারেজগুলো খনি থেকে তোলা কয়লা বয়ে নিয়ে যায় ডাম্পিং গ্রাউণ্ডে, আর ফেরার সময় নিয়ে আসে বালি। কয়লাখনির যেসব পিট বা টানেল থেকে কয়লা বের করে নেওয়া হয়ে গেছে, সেই বালি দিয়ে ওইসব পিটগুলো ভর্তি করে দেওয়া হয়—যাতে খনির ছাদ ধসে না পড়ে। রোপওয়ের ক্যারেজ ছিঁড়ে পড়াটা বেশ অস্বাভাবাবিক ঘটনা। তবে অস্বাভাবিক ঘটনাকেই তো দুর্ঘটনা বলে।

নরেন সাহা গম্ভীর গলায় বলল, যদিও কোন প্রমাণ আমার হাতে নেই, তবু বলব, এই ঘটনাগুলোর পেছনে মানুষের হাত আছে। --কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নরেন সাহা আবার বলল, যদি সৎপথে থেকে চলেন, তাহলে মনসুখ ভাটিয়ার নেমন্তন্ন আপনিও পাবেন। তারপর যা ভাল বুঝবেন, তাই করবেন।

হঠাৎই অন্ধকারে একটা খসখস শব্দ কানে এল। নরেন সাহার কোয়ার্টারকে ঘিরে শব্দটা যেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল ভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে। আমি ফিসফিস করে বললাম, ওটা কিসের শব্দ ?

জানি না। তবে রোজ রাতে শব্দটা আমি শুনতে পাই—সারা রাত ধরে। আর এটুকু জানি, এখন যদি আমি বাইরে বেরোই, তাহলে আর ফিরে আসব না। পরদিন লোক বলবে, এ এম নরেন সাহা উধাও হয়ে গেছে।

একটা থমথমে ভাব আমাদের ঘিরে ধরল। খসখস শব্দটা হয়ে চলেছে ক্রমাগত। আমি পরিস্থিতি হালকা করার জন্য বলে উঠলাম, আপনি উধাও হবেন না। আপনার হাতের পলা, গোমেদ আর নীলা আপনাকে রক্ষা করবে।

একথায় আমরা দুজনেই অন্ধকারে হেসে উঠেছি। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না।

কালো কুকুরটার চাপা গর্জনে বাস্তবে ফিরে এলাম। নরেন সাহার কথামত নেমন্তন্ন আমি পেয়েছি। আর উদ্দেশ্যটাও ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে। গলার স্বরকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বললাম, মিস্টার ভাটিয়া, নিজের পড়েশানি তো বুঝতে পারছি, কিন্তু তাতে হাজার কারবারী কিভাবে পড়েশান হচ্ছে, সেটা তো ঠিক বুঝতে পারলাম না।

কিছুক্ষণ নীরবতা। বোতলের তরল হুইস্কি নেমে এল গেলাসে। গেলাস পূর্ণ হল। এবং মনসুখ ভাটিয়ার তৃষ্ণার্ত ঠোঁট তাকে এক চুমুকে নিঃশেষ করল। তোবড়ানো কালো মুখ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, চোখ শ্বাপদের মত চঞ্চল। কুকুরের পিঠ থেকে হাত তুলে গলার লকেটে—অর্থাৎ শুকনো নখটায় হাত দিল। সেটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। আর নজর আমার চোখে স্থির।

প্রথমটায় আমি অস্বস্তি পেয়েছি। তারপর অনুভব করেছি, শরীরটা যেন অবশ-অসাড় হয়ে আসছে। আমি কি সম্মোহিত হয়ে পড়ছি ?

কমলি, কমলি—! ভাটিয়া সাহেব চোখ না সরিয়েই ডেকে উঠলেন, রায়সাহাব কা খানা লাগাও !

আমি সমস্ত মনের জোর কেন্দ্রীভূত করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ভাটিয়া সাহেবকে বোঝানো দরকার, আমি ভয় পাইনি। বললাম, তার দরকার নেই। আমি খাব না।

আবার সেই নিঃশব্দ হাসি। পানের রসে রাঙানো ঠোঁট বেঁকে গেল তাচ্ছিল্যে। কুকুরের পিঠ চাপড়ে বললেন ভাটিয়া, বসে পড়ুন, রায়বাবু। মনসুখ ভাটিয়ার দাওতে কেউ খানা না খেয়ে যায় না। নোরিন্দার সাহাও খানা খেয়েছিল, তবে ঘুষ খায়নি।

নরেন সাহার কথা বলছেন ভাটিয়া। সুতরাং আমার মনোভাবও তিনি বেশ স্পষ্ট ধরে ফেলেছেন, তাতে সন্দেহ নেই।

রায়বাবু—অনেক নরম ও সহজ হল ভাটিয়া সাহেবের স্বর, বিনা শৌচে সমঝে কোন কাজ করতে যাবেন না। তাতে অন্‌জাম্ ভাল হয় না, আপনি আরো দু-চারদিন ভেবে দেখুন। তাতে পড়েশানি

ভি হবে না, নুকসান ভি হবে না। কি বলিস, ভুলো ?

শেষ কথাটা হিংস্র জন্তুটাকে লক্ষ্য করে। এই বিকটদর্শন দানবের নাম ভুলো ? এটা ভাটিয়া সাহেবের কথায় সামান্য নড়ে উঠল, তারপর মাথা নোয়ালো। তখনই অবাক হলাম। কুকুরটার ডান কানে ফুটো করে লাগানো রয়েছে একজোড়া সোনার মাকড়ি। চোখ ফিরিয়ে মনসুখ ভাটিয়ার দিকে তাকালাম। একই দৃশ্য। ডান কানে একজোড়া সোনার মাকড়ি ! এ কি অদ্ভুত শখ !

এমন সময় এক হাত ঘোমটা টানা লাল পেড়ে সাধারণ শাড়ি পরিহিতা এক মহিলা ঘরে এলেন খাবারের প্লেট সাজিয়ে দিলেন সামনের টেবিলে। চেষ্টা করেও তার মুখ দেখতে পেলাম না। এরই নাম কি কমলি ? এঁর সঙ্গে ভাটিয়ার কি সম্পর্ক ?

মহিলা জড়োসড়ো ভঙ্গিতে একপাশে দাঁড়িয়েছিলেন। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে দেশজ বাংলা ও হিন্দি মিশিয়ে ভাটিয়াকে প্রশ্ন করলেন, তাঁর খানা লাগাবেন কিনা। উত্তরে ভাটিয়া শুধু তিন সেকেণ্ড খর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন অবগুণ্ঠিতার দিকে। মহিলা ভীষণ ভয় পেয়ে ত্রস্তা কাঠবেড়ালীর মত বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও খাওয়া শুরু করলাম। এই মুহূর্তে ভাটিয়াকে চটালে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। মনসুখ ভাটিয়া লোহার ফাইলটা তুলে নিল। ভুলোও সঙ্গে সঙ্গে আগের মত দাঁত খিঁচিয়ে দাঁড়াল। মনিবের প্রতিটি ইঙ্গিতের অর্থ যেন তার চেনা।

মাঝে মাঝে ভুলোর দাঁতে শান দিয়ে দিই,—ফাইল ঘষতে ঘষতে বললেন মনসুখ, খতরনাক জায়গা—এখানে জিন্দা থাকতে গেলে লড়তে হয়।

আমি খেয়ে চলেছি, এবং আড়চোখে দুটি প্রাণীকে লক্ষ্য করছি। ভুলোর চোখ ধকধক করে জ্বলছে।

হঠাৎই অন্দরের একটা জানলার দিকে আমার নজর গেল, রঙিন পর্দা সামান্য সরিয়ে জানলায় উঁকি মারছেন কমলি নামের সেই মহিলা। চুপি চুপি ইশারা করে কিছু একটা যেন বলতে চাইছেন আমাকে। আমি নিজের আচরণ অসহনীয় সংযমে স্বাভাবিক রাখলাম। কৌতূহল ক্রমে বাড়ছে। মহিলা কি কোন বিপদের ইঙ্গিত দিচ্ছেন আমাকে ?

এমন সময় হাতের কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন ভাটিয়া। বললেন, আপনি বসুন, আমি আসছি। তারপর কুকুরসমেত অন্দরের দিকে রওনা হলেন। জানলায় অস্পষ্ট মুখটা চকিতে সরে গেল।

কোথাও পেণ্ডুলাম ঘড়িতে রাত আটটার সঙ্কেত বাজল। অর্থাৎ কোলিয়ারী এলাকায় এটা গভীর রাত। চটপট খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। এমন সময় বিদ্যুৎ ঝলকের মত ঘরে ঢুকলেন কমলি। কাপ-প্লেট-গ্লাস সব গুছিয়ে নিতে নিতে চাপা গলায় বলে উঠলেন, এখান থেকে পালাও, বাবুজী। নইলে জিন তোমাকে শেষ করে দিবে !

কথাটা বলেই মহিলা যেন ছিটকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তার ফাঁকে ঘোমটা সরে গিয়ে এক বীভৎস দৃশ্য আমার চোখের সামনে প্রকাশ পেয়েছে। কমলির মুখের বাঁ দিকটা—গাল, গলা, কাঁধ—পুরোন ক্ষতের দাগে ভরা। মোটা সাদা সাদা নৃশংস দাগ। মাংসপেশীগুলো সেখানে কুঁচকে ভাঁজ হয়ে গেছে। একি কোন অগ্নিকাণ্ডের ফল ?

প্রায় পরক্ষণেই ঘরে এসে ঢুকল ভুলো। গভীর চোখে তাকিয়ে আমাকে দেখতে লাগল। চেহারায় যেন আরো বড়সড় দেখাচ্ছে। চোখের দৃষ্টি যেন নির্ভুলভাবে আমার মনের ভাবনা জরিপ করতে চায়।

আমি একটু ভয় পেলাম। মনসুখ ভাটিয়া কোথায় ? কুকুরটা হঠাৎ করে কিছু করে বসবে না তো ? ভাবছি, ভাটিয়া ঘরে এলেই তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা দেব, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে লোডশেডিং হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা জান্তব গন্ধ ধাক্কা মারল আমার নাকে। একটা খসখস শব্দ শুনতে পেলাম। ঘন অন্ধকারের ভেতরে শত খোঁজাখুঁজি করেও ভুলোর জ্বলন্ত চোখ দুটোর কোন হদিশ পেলাম না। অথচ ওর উপস্থিতি আমি টের পাচ্ছি। এক অজানা আতঙ্কে আমার শরীর কাঁপতে লাগল। মনে পড়ে গেল সেই ভয়ঙ্কর চাঁদনী রাতের চিৎকারের কথা।

রায়সাহাব, ভয় পেলেন নাকি ?

মনসুখ ভাটিয়া কখন ঘরে এসেছেন কে জানে! কি করে আমার মনের কথা টের পেলেন, তাও জানি না। অন্ধকারে আমি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেছি।

কোন ডর নেই। বাড়ি চলে যান। আমার কথাটা ভেবে দেখবেন একটু। —মনসুখ ভাটিয়ার স্বর কেমন জড়ানো অস্পষ্ট হয়ে গেছে। হয়তো নেশার ফলেই।

আমি সদর দরজার অবয়ব আবছা দেখতে পাচ্ছিলাম, সেদিকে পা বাড়ালাম ইতস্তত করে। মনে হল যেনপেছন থেকে মনসুখ ভাটিয়া হাসছেন। অথচ হাসির কোন শব্দ আমি শুনিনি।

কোয়ার্টারে ফেরার পথে বারদুয়েক সেই রক্ত জমাট করা চিৎকার শুনেছি। প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতে একরকম ছুটেই গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছেছি। তারপর আশ্বস্ত হয়েছি।

রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কুকুরটাকে স্বপ্ন দেখলাম। ওটা আমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

পরদিন সকালে রাস্তায় বেরিয়েই দুঃসংবাদটা শুনতে পেলাম। এ-এম নরেন সাহাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। আমার মনটা কু-ডাক ডেকে উঠল। নরেন সাহাকে বোধ হয় আর কোন দিনও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিছুটা এগিয়ে এক তেরাস্তার মোড়ে দেখি জনাকয়েক সাঁওতাল দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে লাল কাপড়, লাল ফতুয়া পরা একটি লোক। মাথায় লাল ফেট্টি বাঁধা। মুখে দাড়ি গোঁফের জঙ্গল। কানে ইয়া ইয়া দুটো মাকড়ি। গলায় জড়িবুটির মালা। কপালে সিঁদুর মাখা। বিড়বিড় করে সে কিসব মন্ত্র পড়ছে। সাঁওতাল কজন একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভক্তিভরে তার কার্যকলাপ লক্ষ্য করছে। দুটো মুরগী গলা কাটা অবস্থায় ধুলোয় পড়ে ছটফট করছে।

ওদের একজনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, 'মানিজার' সাবের উধাও হওয়ার খবরটা ওরা শুনেছে। এখানে ওরা মুরগী বলি দিয়ে 'বোঙার' কাছে মানত করছে। যে 'জিন' এইসব জোয়ান লোকগুলোকে উধাও করছে, তাকে যেন, 'বোঙা' শান্ত করে দেয়।

লাল পোশাক পরা গুণীন মন্ত্র পড়ে পুজোর কাজ সারছে।

একটু পরে ওরা চলে গেলে আমি গুণীনের সঙ্গে আলাপ জমালাম। মুরগী দুটো তেরাস্তার সংযোগস্থলে পড়ে রইল।

ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বললাম, এই পুজো দিলে জিন চলে যাবে?

গুণীন বলল, না বাবু, যাবে না। জিন যে চালাচ্ছে, তাকে খতম করতে হবে।

আমি তার কথার অর্থ ঠিক ধরতে পারলাম না। তারপর কি ভেবে মনসুখ ভাটিয়ার কথা জিজ্ঞেস করলাম। দুটো টাকা গুণীনের হাতে দিতেই সে আমাকে একটা ঘষা তামার পয়সা দিল, তার সঙ্গে বাঁধা একটুকরো শেকড়। বলল, জিন তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, বাবু। —একটুখানি চুপ করে থেকে সে আবার মুখ খুলল, বাবু, মনসুখ ভাটিয়া মন্তর জানে। ও আগে সোঁদর বনে 'বরদার' ছিল...

ক্রমে যা জানতে পারলাম তার সারাংশ হচ্ছে এই : সুন্দরবনের কাঠ চুরি করে জীবিকা নির্বাহ করে স্থানীয় অধিবাসীদের এক বিরাট অংশ। নৌকো নিয়ে একদল যখন জঙ্গলে ঢোকে, তখন তাদের সঙ্গে থাকে একজন গুণীন, যাকে বলা হয় বরদার। সে কাঠ কাটার এলাকা ঘিরে বাণ মেরে দেয়, যাতে কোন জন্তু জানোয়ার সেই গণ্ডী দেওয়া এলাকায় ঢুকতে না পারে। ফলে চোরা-কাঠুরিয়াদের হিংস্র জন্তুর হাতে প্রাণ হারাবার ভয় থাকে না। এর বিনিময়ে বরদারকে তারা চোরাই কাঠের ভাগ দেয়। মনসুখ ভাটিয়া সেখানে আর একজন বরদারকে খুন করে পালিয়ে আসে।

আমার মনে পড়ল, ভাটিয়ার গলায় ঝোলানো শুকনো কালো নখটার কথা।

ওর আসল নাম কেউ জানে না। কি করে এখানে এসে পড়ল, তাও খুব স্পষ্ট নয়। বড়লোক হওয়ার আগে ও নাকি এখানে স্থানীয় আদিবাসীদের জড়ি-বুটির ওষুধ দিত। ওকে গুণীন বলে সবাই মানতো। ফলে এখনো আদিবাসীরা ওর আদেশের নড়চড় করতে ভয় পায়। তবে আমার কোন ভয় নেই। ওই তামার পয়সা ও শেকড়ই আমাকে রক্ষা করবে। জিনের গায়ে ওদুটো ছুঁড়ে মারলেই সে নাকি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তৎক্ষণাৎ।

মনসুখ ভাটিয়া সম্পর্কে এইসব রোমাঞ্চকর তথ্য শুনে বেশ অবাকই হলাম। বাড়ির দিকে ফিরতে

ফিরতে দু-চারটে চেনামুখের সঙ্গে দেখা হল। তারা জানাল, পুলিশ নরেন সাহার খোঁজখবর করছে।

কোয়ার্টারে ফিরে অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি হয়ে অফিসে বেরিয়ে পড়লাম। বুঝলাম, ভাটিয়া সাহেবের কথায় রাজী না হলে আমার অবস্থাও হবে নরেন সাহার মত। এই রকম আনমনা হয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলেছি, হঠাৎই একটা চেনা শাড়ি ও ঘোমটা আমার নজরে পড়ল।

অফিসে যেতে হলে শনি-মঙ্গলের হাট পেরিয়ে যেতে হয়। আজ মঙ্গলবার। হাট বসেছে। সেই হাটেই এক তরকারিওয়ালার কাছ থেকে কি যেন কিনছেন গত রাতের সেই মহিলা। কমলি।

মনসুখ ভাটিয়া সম্পর্কে যত তথ্য জানা সম্ভব, সবই আমাকে জানতে হবে। নইলে তাঁর মোকাবিলা আমি করতে পারব না। সুতরাং চারপাশে একবার নজর চালিয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়ালাম কমলির পাশে। ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের সাহায্যে উনি যেন আমার উপস্থিতি টের পেলেন। তরকারির দাম মিটিয়ে হনহন করে এগিয়ে চললেন একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন অংশের দিকে।

দুটো ঝুপসি অশথ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে উনি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কি চাও, বাবু ?

মনসুখ ভাটিয়া আপনার কে হয় ?

মরদ !

উত্তর শুনে আমি চমকে উঠেছি। ইনি মনসুখ ভাটিয়ার স্ত্রী ? অথচ বেশবাস অত্যন্ত সাধারণ। হঠাৎ দেখলে, কেউ ভাটিয়ার ঝি ভেবে ভুল করবে। চিন্তা করে দেখলাম, চটপট খবর আদায় করতে গেলে, নরেন সাহার প্রসঙ্গ তোলা দরকার। সুতরাং সেকথাই তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম।

একহাত ঘোমটার আড়ালে কমলি ভাটিয়া চমকে উঠলেন। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, জানতাম, এমনি কিছু একটা হবে। কাল রাতে ভুলোর দাঁতে পালিশ দেওয়ার বহর দেখেই বুঝেছি। তবে আমি আপনার জন্য ভয় পেয়েছিলাম।

আমি তখন বললাম যে আমারও প্রাণ সংশয়। এ ধরনের ভয়াবহ ঘটনার প্রতিকার করা দরকার। আমি তাঁর সাহায্য চাই। তারপর সাঁওতাল গুণীনের কাছে তাঁর স্বামী সম্পর্কে যেসব কথা শুনেছি, সমস্ত খুলে বললাম।

নরেন সাহার নিখোঁজ-সংবাদ ও আমার অনুনয়ে নরম হলেন মহিলা। বললেন, বড়লোক হওয়ার আগে আমরা সাঁওতালদের গাঁয়ে থাকতাম। তখন ওই শেতল গুণীনের সঙ্গে আমার স্বামীর সম্পর্ক ভাল ছিল। ফলে তাকে অনেক কথাই বলেছে...

তারপর জানতে পারলাম আর এক ভয়াবহ প্রসঙ্গ। সুন্দরবনে কমলির বাবাকেই খুন করেছিলেন মনসুখ। সে নাকি মেয়ের সঙ্গে এক 'বদ' বরদারের বিয়ে দিতে চায়নি। 'বরদার' বাপকে খুন করে মেয়ে কমলিকে নিয়ে ভেগে পড়েন মনসুখ। ওঁর ওপরে কম অত্যাচার চালায়নি গত দশ বছরে। তারপর এখানে এসে ক্রমে ক্রমে কয়লার চোরাকারবারে ঢুকলেন। কাঁচা পয়সা হাতে পেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল। তারপর ভুলোকে কিনে বসলেন এক সাহেবের কাছ থেকে। তারপর নতুন করে শুরু হল তন্ত্রসাধনা। কমলি বাধা দিতে চেয়েছেন, এবং তার ফলও পেয়েছেন হাতে হাতে। মুখের বাঁ দিকে তারই চিহ্ন আমি পেয়েছি।

কে করেছে এরকম সর্বনাশ ? ওই কুকুরটা ?—উত্তেজিত হয়ে আমি জানতে চেয়েছি।

না, বাবু—

তবে কি আপনার স্বামী ?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কমলি ভাটিয়া বললেন, দুজনে !

তারপর দ্রুতপায়ে সরে যাবার আগে বলে গেলেন, তুমি এখান থেকে পালাও, বাবুজী ! জিনকে আটকানোর ক্ষমতা আমার নেই !

উনি চলে যাবার পরও বেশ কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। ওঁর জবাবের অর্থ কি ? দুজনেই ? তার মানে ?

বেশ চিন্তাকুল অবস্থাতেই অফিসে পৌঁছলাম। লক্ষ্য করলাম, নিখোঁজ নরেন সাহাকে নিয়ে কারোরই যেন মাথা-ব্যথা নেই। ব্যাপারটা যেন অত্যন্ত স্বাভাবিক। তবে টের পেলাম কুলিমজুরদের মধ্যে নতুন করে একটা আতঙ্ক যেন ছায়া ফেলছে।

কমলি ভাটিয়া ও শেতল গুণীনের কথাগুলো ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরছিলাম। ওঁদের কথা যদি সত্যিও হয়, তাতে কোন লাভ নেই। পুলিশ প্রমাণ চাইবে। তাছাড়া এখানকার পুলিশ ভয়ে হোক আর টাকার লোভেই হোক, মনসুখ ভাটিয়ার তাঁবেদারী করে। তাহলে আমার এখন কর্তব্য কি ?

ভাবনায় ডুবে ছিলাম বলেই কালো অ্যাম্বাসাডার গাড়িটাকে একেবারে খেয়াল করিনি। গাড়িতে স্টিয়ারিংয়ে বসে ভাটিয়াসাহেব। পোশাক গত রাতের মতই, তবে দু'চোখে কুটিল সন্দেহ।

আমার গা ঘেঁষে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে তিনি বলে উঠলে, আসুন রায়বাবু। একবার আমার ডেরায় যেতে হবে। একটা মজার জিনিস আপনাকে দেখাবো —

হাত বাড়িয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিলেন তিনি। আমার বুক দুক দুরু করে উঠল। সূর্য ডুবে আঁধার নেমে এসেছে। কাঁচা সড়কের ওপর দ্বিতীয় কোন মানুষ নজরে পড়ছে না। জিনের ভয়ে সবাই বুঝি তাড়াতাড়ি আস্তানায় ফিরে গেছে।

আসুন রায়সাহেব, উঠে আসুন। —মনসুখের স্বর অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

পকেটে হাত দিয়ে শেতল গুণীনের বক্ষাকবচটা একবার অনুভব করলাম। তারপর উঠে বসলাম মনসুখ সাহেবের পাশে। উনি গাড়ি ছুটিয়ে দিলেন। জানলা দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস এসে আমার হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিতে লাগল। ভাটিয়ার মুখে কোন কথা নেই। শীতল দুটো চোখ মেলে তাকিয়ে রয়েছেন সামনের সড়কের দিকে। তাঁর মুখ থেকে ভেসে আসছে মদের গন্ধ।

একটা জিনিস বুঝতে পারলাম, বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাকে লোপাট করার মতলব ভাটিয়ার নেই। কারণ তাতে লোক জানাজানির সম্ভাবনা এবং পুলিশ হয়তো সরাসরি প্রমাণ পেয়ে আর বিশেষ নিষ্ক্রিয় থাকতে পারবে না। কিন্তু সত্যিই কি সে ভরসা আছে ?

এই রকম এলোমেলো চিন্তা করতে করতেই পৌঁছে গেলাম মনসুখ ভাটিয়ার বাড়িতে। বাড়ির সামনেটা অন্ধকার—শুধু চাঁদের আলো যেটুকু জোছনা বিছিয়েছে। পথের দু'পাশে বাগান। গাড়ি থামিয়ে আমাকে সঙ্গে করে বাড়িতে ঢুকলেন মনসুখ। ঘড়িতে সময় প্রায় সাড়ে ছ'টা গড়িয়ে গেছে।

গতকালের ঘরে এসে বসলাম। আজ বাতির বাহার সামান্য কম। কিন্তু তাতেও ভুলোকে আবিষ্কার করতে কোন ভুল হল না। একটা চেয়ারের পাশে বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি অন্দরের জানলার দিকে একবার নজর চালালাম। কমলি নেই।

একটা আজব জিনিস ভুলো কোথা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে। ভাটিয়া হালকা গলায় বললেন, তারপর উঠে গিয়ে কোণের একটা টেবিলের তলা থেকে কালো মত কি একটা জিনিস নিয়ে এলেন। ঠকাস করে আমার সামনে টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে বললেন, দেখুন তো রায়সাহেব, চিনতে পারেন কিনা ?

আমার মাথায় যেন বজ্রপাত হল। ভাবনা-চিন্তা-বুদ্ধি সব ওলোট পালোট হয়ে গেল। এক তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল আমার ঠোঁট চিরে। চোখজোড়া কি ঠিকরে বেরিয়ে আসবে কোটর ছেড়ে ?

টেবিলের ওপরে পড়ে রয়েছে একটা কাটা হাত। কালো রঙের আঙুলগুলো ফোলা ফোলা। আর তিনটে আঙুলে পাশাপাশি তিনটে পাথর বসানো আংটি। পলা, গোমেদ ও নীলা ; জ্যোতিষ শাস্ত্র নরেন সাহাকে বাঁচাতে পারেনি।

আমার মুখে কোন কথা নেই। মনসুখ ভাটিয়া হাতটা তুলে নিয়ে 'লুঃ' বলে ভুলোর দিকে ছুঁড়ে দিলেন। কুকুরটা হিংস্র দাঁতের পাটি বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ল হাতটার ওপর। ওটাকে দাঁতে-নখে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। ওঃ, সে কি বীভৎস দৃশ্য !

ভুলো যখন কষ্ট করে নিয়ে এসেছে, তখন এই হাতটা ওরই পাওনা, কি বোলেন রায়বাবু ? ও...হ্যাঁ, শুনলাম নাকি নোরিন্দর সাহাকে পাওয়া যাচ্ছে না ? একেবারে লোপাট হয়ে গেছে ?

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, আমি এখুনি পুলিশে খবর দেব। লোকে জানুক নরেন সাহাকে কে খুন করেছে।

বিচিত্র হাসিতে ফেটে পড়লেন ভাটিয়া। সে হাসিতে বুক কেঁপে ওঠে, মস্তিষ্কে হিম-আতঙ্ক বাসা বাঁধে।

এক সময় স্বাভাবিক হয়ে তিনি কঠোর গলায় বললেন, আপনার কথায় কেউ বিশওয়াস করবে না,

রায়সাহাব। কারণ ততক্ষণে ভুলো এ হাত লোপাট করে দিবে। —কথা শেষ করে আবার সেই নৃশংস হাসি।

নিজেকে ঘোরতর বিপন্ন জেনেও আমি পাগলের মত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম। চিৎকার করে বললাম, মনসুখ ভাটিয়া, তোমার সব খবর আমি জানি। তোমাকে আর আমি ভয় পাই না। তুমি সোঁদর বনের বরদার ছিলে। সেখানে শ্বশুরকে খুন করেছ। তারপর এখানে এসে চোরাকারবারে নেমেছ, আর দরকার মত মানুষ খুন করে বেড়াচ্ছ! শেতল গুণীন আমাকে সব বলেছে। কমলি ভাটিয়ার কাছেও সব কথা শুনেছি। দাঁড়াও, তোমার হিসেব আমি শেষ করছি!

ঘরের মধ্যে যেন ভূমিকম্প হয়ে গেল। বয়ে গেল অসমশক্তিশালী সাইক্লোন। সব কিছু যেন দুরন্ত গতিতে ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছে। এক অদ্ভুত গর্জন করে উঠলেন মনসুখ ভাটিয়া, কমলি শালী বেতমিজ আওরত!

নরেন সাহার হাতটা আংটিসমেত শেষ করে ফেলেছে ভুলো। উঠে দাঁড়িয়ে সেও একটা চাপা গর্জন করে উঠল। তার চোখ ধকধক করে জ্বলছে। আমাকে অবাক করে এক লাফে অন্দরের দিকে চলে গেলেন মনসুখ। বিদ্যুৎঝলকের মত ভুলোও তাঁর পিছু নিল। ঘরে আমি একা দাঁড়িয়ে রইলাম কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ছুটে পালাব কিনা, সেটাও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

এমন সময় ঝড়ের গতিতে ঘরে ঢুকলেন কমলি। প্রায় কান্নাভাঙা স্বরে বললেন, বাবু, পালাও জলদি! পালাও!

পাশের কোন একটা ঘর থেকে বিচিত্র সুরে শব্দোচ্চারণের বিচিত্র ধ্বনি আমার কানে আসছে। সঙ্গে থেকে থেকে হিংস্র গর্জন। দূর থেকে ভেসে আসছে ওপেন-কাস্ট মাইনিংয়ের ব্লাস্টিংয়ের শব্দ। গুড়ুম! কমলি ঝটিতে উধাও হয়ে গেলেন ঘর থেকে। আমার কানে ভাসছে শুধু দুটি কথা বাবু, পালাও!

হঠাৎই ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল ভুলো। সে একা! কিন্তু এ কোন্ ভুলো? আকারে সে প্রায় দেড় গুণ বেড়ে গেছে। চোখের মণিতে জ্বলন্ত ভাবটা নেই। মুখের অভিব্যক্তিতে এক আশ্চর্য ক্রূর হিংসার ছাপ। তার কানদুটো নড়ছে। সেই সঙ্গে সোনার মাকড়ি জোড়াও।

এমন সময় ঘরের সমস্ত আলো নিভে গেল। লোডশেডিং? আমি মুহূর্তের মধ্যে সদর দরজা লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করলাম। পেছন থেকে ভেসে এল রক্ত বরফ করে দেওয়া এক চিৎকার! সে চিৎকারে প্রতিশোধের আগুন ও উল্লাস যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে। আমি প্রাণপণে ছুটে চলেছি। পলকে বাগান পেরিয়ে সড়কে পা দিলাম। রাস্তা খাঁ খাঁ করছে। চতুর্দিক অন্ধকার। শুধু চাঁদের ফ্যাকাশে আলো দিকনির্ণয়ের একমাত্র সম্বল। আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলাম। পেছন ফিরে দেখার সাহস হচ্ছে না। শুধু কানে আসছে ব্লাস্টিংয়ের শব্দ আর ভয়াবহ জন্তুটার অলৌকিক চিৎকার।

বেশ কিছুটা পথ ছুটে শরীর ক্লান্ত হয়ে এল। কোয়ার্টার এখনো অনেক দূরে। বুঝতে পারছি, আমি অসম প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়েছি। ভারী পায়ে ছুটতে ছুটতে একসময় পেছন ফিরে তাকালাম এবং যে দৃশ্য দেখলাম, তা বোধ হয় কোনদিন ভোলার নয়।

ভয়ঙ্কর দানবটা মানুষের মত শুধুমাত্র পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে ছুটে আসছে অবিশ্বাস্য গতিতে। আমাদের দূরত্ব অনেক কমে এসেছে। চাঁদের আলোতেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কুকুরটার গলায় ঝুলছে মনসুখ ভাটিয়ার রং-বেরঙের পুঁতির মালা। লকেটের নখটা চোখে পড়ছে না।

আমার পা দুটো পাথরের স্তম্ভের মত বসে গেল রাস্তার ওপরে। নড়বার এতটুকু ক্ষমতা আমার নেই। প্রচণ্ড কনকনে বাতাস আমি আর অনুভব করতে পারছি না। অদূরে পাথরের ছোটবড় ঢিবি আমারই মত নিশ্চল। শুধু কতকগুলো ঝাঁকড়া গাছের মাথা এপাশ ওপাশ দুলছে।

পৈশাচিক হাসিতে খলখল করে ফেটে পড়ল অতিকায় কালো জন্তুটা। আমার মাথার ভেতরে সবকিছু যেন গোলমাল হয়ে গেছে। আমি কি সম্মোহিত হয়ে পড়ছি? আর সবাই কি একই রকম পরিস্থিতিতে পড়েই রাতারাতি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে? আমার মনে পড়ল নরেন সাহার কথা, কমলি ভাটিয়ার কথা, শেতল গুণীনের কথা—

একই সঙ্গে পকেটের তামার পয়সা ও শেকড়ের টুকরোটা হাতে ঠেকল। আতঙ্ক ও নৃশংসতার

সমুদ্রে ডুবে যেতে যেতে আমি ওই তুচ্ছ বস্তু দুটোকেই আঁকড়ে ধরলাম। বিশ্বাস-অবিশ্বাস, যুক্তি-অযুক্তি সবই এখন তালগোল পাকিয়ে গেছে। ভয়ঙ্কর পিশাচটা খুব কাছে এসে পড়েছে। নাকে আসছে একটা জান্তব দুর্গন্ধ ও সেই সঙ্গে কড়া মদের গন্ধ। আমি আর দেরি না করে আমার পয়সা ও শেকড়টা ছুঁড়ে মারলাম অতিকায় কুকুরটার গায়ে। এবং তৎক্ষণাৎই ঘটে গেল এক অলৌকিক ঘটনা।

কুকুরটা দপ করে আগুনে জ্বলে উঠল। লকলকে সবুজ আগুন। দুপায়ে ভর করে ধেয়ে আসছিল, এখন সশব্দে পড়ে গেল কঠিন সড়কের ওপর। সবুজ আগুনের অপার্থিব লেলিহান শিখায় সে ছটফট করতে লাগল। অবশেষে তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল এক সুদীর্ঘ ভয়ঙ্কর চিৎকার। তারপর অস্পষ্ট খসখসে স্বরে সে মরণ আর্তনাদ করে উঠল, ইয়া আল্লা-আ আ আ!

এ যে মনসুখ ভাটিয়ারই বিকৃত কণ্ঠস্বর!

আমি আবার ছুটতে শুরু করলাম পাগলের মত। এই শীতেও আমার শরীর ঘামছে। পেছন থেকে ভেসে আসছে চাপা অস্ফুট গোঙানি। আগুনের সবুজ শিখা যেন হাজারো জিভ দিয়ে কালো দানবটাকে চেটেপুটে শেষ করছে। আবার শুনতে পেলাম ব্লাস্টিংয়ের শব্দ। আমি যথাসম্ভব গতি বাড়িয়ে দিলাম।

পরদিন খবর পেলাম, মনসুখ ভাটিয়া মারা গেছেন এবং তাঁর কুকুর ভুলো কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে।

কমলি ভাটিয়ার কথা মনে করেই তাঁদের বাড়িতে গেলাম। লোকে লোকারণ্য। চোখ বুজে অক্ষত শরীরে শুয়ে আছেন মনসুখ। ঠিক যেন ঘুমিয়ে রয়েছেন। তবে তাঁর গলায় সেই রঙিন মালাটি নেই। কমলি লাজ-লজ্জা ত্যাগ করে সকলের চোখের সামনেই বুকভাঙা কান্নায় বারবার আছড়ে পড়ছেন সেই মৃতদেহের ওপর।

জটলার মধ্যে হঠাৎ শেতল গুণীনকে দেখতে পেয়ে তাকে একপাশে ডেকে নিলাম। গত রাতের সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। তারপর রক্ষাকবচের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে পাঁচটা টাকা দিলাম তার হাতে।

সে বলল, বাবু, মনসুখ শরীর চালান জানতো। নিজের 'জান'কে ঢুকিয়ে দিত কুকুরের ভেতর। তখন সে কুকুরের চোখ দিয়ে দেখত। আর বুরা কাম করত। ওই রঙিন মালা ছিল ওর মন্তরের মালা—

কোয়ার্টারে ফেরার পথে মনসুখ ভাটিয়ার কথাই ভাবছিলাম। সোনার মাকড়ি দুটো কি ওর সঙ্গে কুকুরের শরীরের যোগসূত্র রক্ষা করত? শরীর-চালান করার পর কুকুরটা আয়তনে বেড়ে ওঠার কারণ বোধ হয় জন্তুটার শরীরে তখন দুটো আত্মা বাসা বাঁধত। আর মনসুখের অসাড় দেহ পড়ে থাকত বাড়িতে। কুকুরটা তখন মানুষের আচার আচরণ, বুদ্ধি ও জান্তব হিংস্রতা, দুই মিলিয়ে রাতের আঁধারে শত্রু নিধন করত। তবে কাল রাতের ঘটনা বাস্তব বলে এখন আর বিশ্বাস হতে চায় না।

শেতল গুণীনই পরে আমাকে বলেছিল, মনসুখ ভাটিয়ার আসল নাম ছিল হোসেন আলি। সেই জন্যেই মরণের মুহূর্তে সে 'আল্লার' মার্জনা ভিক্ষা চেয়ে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছিল প্রাণপণ চিৎকারে। তবে আল্লা তাকে মার্জনা করেছেন কিনা কে জানে!